শ্রী শ্রী বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ

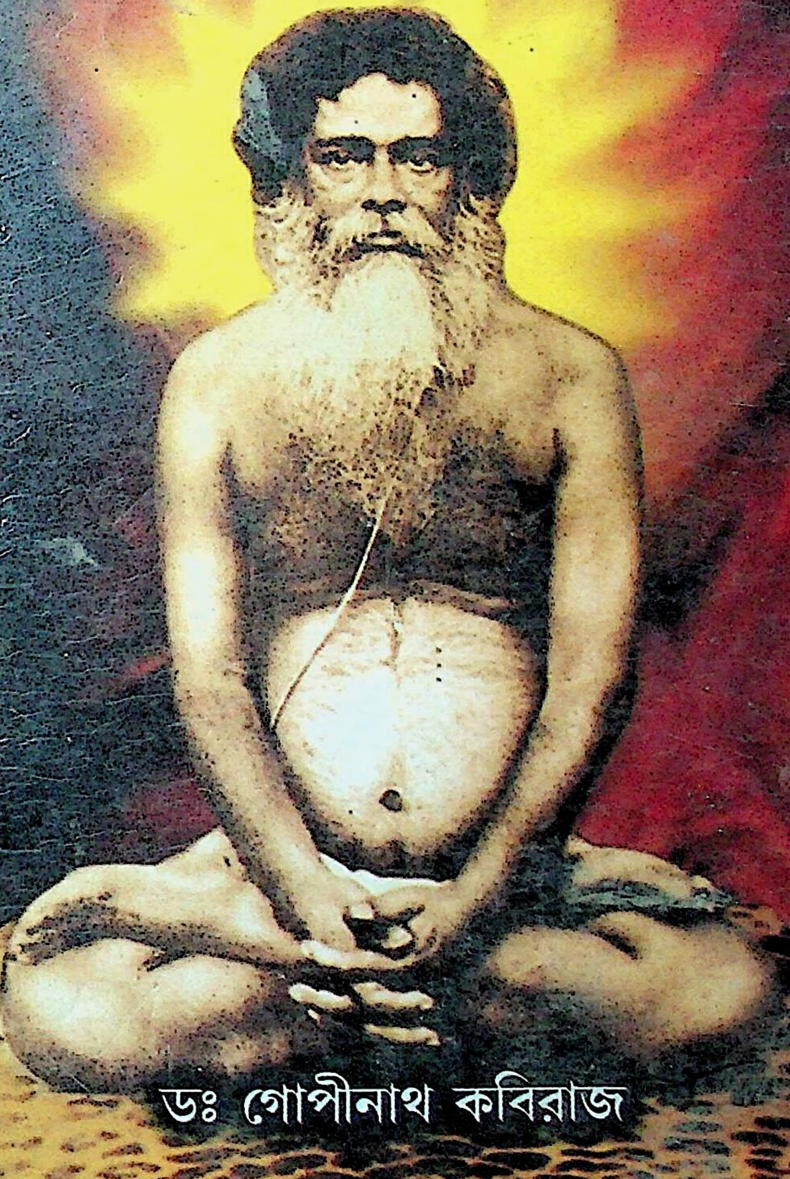

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

S.3

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ

[প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড একত্রে]

মহামহোপাধ্যায়
ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ
(পদ্মবিভূষণ)

প্রাচী পাব্‌লিকেশন্‌স্‌

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম সংস্করণ একত্রিতভাবে ঃ অক্ষয় তৃতীয়া ২০১২

প্রকাশক ঃ
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাব্‌লিকেশন্‌স্‌
৬৩ বি, ন্যাশনাল প্লেস
বাক্‌সাড়া, হাওড়া-৭১১৩০৬
ফোন ঃ ৯৩৩৯১০৮০২৪
Web : www.prachipublications.in

অক্ষর বিন্যাস ঃ
শৈব্যা বুকস্‌ এণ্ড লেজার
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ
আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
কলকাতা।

মূল্য ঃ ৩০০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গপত্র

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ
শ্রীশ্রী ১০৮ যুক্তেশ্বর বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব
গুরুদেবের শ্রীচরণ-কমলে
হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়
সাদরে সমর্পিত হইল।
"ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যদেব সমর্পয়ে।"
শ্রীচরণাশ্রিত

দীন গ্রন্থকার

ভূমিকা

আজকাল পাশ্চাত্যদেশে জীবন-চরিত রচনার একটা প্রবল উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী, জ্ঞানী, গুণী, কলাবিৎ, কর্ম্মবীর—এক কথায় যাঁহারা জীবনে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন—সকলেরই জীবন-বৃত্তান্ত আলোচিত হইয়া থাকে এবং এই প্রকার আলোচনা জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে বর্ত্তমান যুগে নূন্যাধিক পরিমাণে ঐ প্রথা প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনকালেও যে একেবারে ছিল না তাহা বলিতে পারি না।

কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবন সাধারণ মনুষ্যের মতন নহে। তাঁহাদের জীবন আদর্শস্বরূপ হইলেও সর্ব্বস্থানে জগতের অনুকরণযোগ্য হয় না। তাঁহাদের উপদেশ পালনীয় বটে, কিন্তু অন্ধ অনুকরণের দ্বারা তাঁহাদের ন্যায় অবস্থা লাভ হইতে পারে না। তাঁহারা যে উপায়ে বড় হইয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে লোকের উপকার হইতে পারে, এ কথা সত্য, কিন্তু তাহা গুহ্য বিষয় তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে। সদ্‌গুরুর শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আদেশে কার্য করিতে পারিলে দীর্ঘকালের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার ফলে জীবনের উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশ্য শুদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, অস্বাভাবিক অনুকরণে কোন ফল হয় না।

আর ঐ প্রকার জীবনচরিত আখ্যায়িকার ন্যায় লিখিয়া বর্ণনা করিবার বিষয়ও নহে। যিনি সে প্রকার চেষ্টা করিবেন তাঁহারই ধৃষ্টতা প্রকাশ মাত্র হইবে। Renan খৃষ্টের, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা যে সফলতা লাভ করে নাই তাহা বলাই বাহুল্য। যাহাকে যথার্থ জীবনী বলে, তাহা কোন মহাপুরুষেরই হয় নাই। যে লিখিবে, সে যদি ঐ প্রকার উচ্চ অবস্থাপন্ন পুরুষ না হয়, তাহা হইলে সে আলোচ্য জীবনী নিজেই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে না—ঐ জীবনের প্রতি মুহূর্তে যে বিচিত্র রহস্য জাগিয়া উঠে তাহা তাহার দৃষ্টিতে কখনও

পতিত হইবে না—বোধগম্য হওয়া ত দূরের কথা। ইহার ফলে দিব্য চরিত্রে নিজের ভাবানুরূপ ক্ষুদ্রতা ও মানবীয়তা আরোপিত হয়, নিজের ভ্রান্তিপ্রবণ বিবেচনাশক্তির মানদণ্ডে আলোচ্য জীবনের অনুচিত বিচার করা হয়—এক কথায় সত্যের অবমাননা হয়। মহম্মদের জীবন-চরিত পড়িয়া ঠিক ঠিক মহাম্মদকে চিনিতে পারা যায় না। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য—সকলের সম্বন্ধে ঐ একই কথা। বুদ্ধ চরিত বা ললিত-বিস্তর, শঙ্করবিজয় বা শঙ্কর-বিলাস, চৈতন্যচরিতামৃত বা চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কোনটিই যথার্থ জীবনচরিতামৃত বা চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কোনটিই যথার্থ জীবনচরিত নহে।

জীবন-চরিত রচনা বড় কঠিন জিনিস; কঠিন কেন, বোধ হয় এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজনের জীবন আর এক জনে ঠিক ঠিক বুঝিয়া লিখিতে পারে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। নিজের জীবন নিজেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না, অন্যে তাহার কতটুকু বুঝিবে! যে যতই জ্ঞানী হয় ততই তাহার নিজের জীবনও তাহার নিকট রহস্যময় মনে হইতে থাকে। যে বিরাট শক্তি জগতের অন্তরে বাহিরে, অণু ও মহতে খেলা করিতেছে, যাহার খেলা আমরা শুধু অহঙ্কার প্রযুক্ত মোহের আবরণ বশতঃ দেখিতে পাই না, তাহা যে প্রতি জীবনে খেলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা বুঝিতে না পারিলেও তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। অহঙ্কারনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট শক্তির ক্রীড়া যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও সে মহিমার আভাস দেখিতে পায়, মহাশক্তির খেলা দেখিয়া সে ধন্য হইয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

তুমি জ্ঞান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

তখন তাহার দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি জীবন একটি দুর্ভেদ্য রহস্যে আচ্ছন্ন মনে

হয়। তাহার কারণানুসন্ধিৎসা একটি অনন্তশক্তির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীবনের চরমতত্ব যেখানে রহস্যময়, সেখানে জীবন-চরিত রচনার প্রয়াস উপহাস্যস্পদ। আর যদি সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তির খেলা দেখিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে ত জীবনের প্রতি ভাব ও প্রতি ঘটনার মূলে নিজের অহঙ্কারকেই স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু তাহা যে একেবারেই ভুল, সে-কথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। প্রতি মুহূর্তে আমাদের পরিচ্ছিন্ন শক্তির অন্তরালে থাকিয়া একটি অদৃষ্ট মহতী শক্তি কার্য সম্পাদন করিতেছে, কখনও বা তাহার প্রতিবন্ধকতার ক্ষুদ্রশক্তি আপনার অনুরূপ ক্ষুদ্রকার্য সাধনে সমর্থ হইতেছে না। সে শক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও তাহার অস্তিত্ব চিন্তাশীল মানুষ্যমাত্রই চিরকাল অনুভব করিয়া আসিতেছে।

সাধারণ মনুষ্য সম্বন্ধেই যখন প্রকৃত জীবনী নির্ম্মাণ এত কঠিন, তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে ত তাহা অসম্ভবই বলিতে হইবে।

যতদিন পর্যন্ত অহঙ্কার দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে ততদিন পর্যন্ত জীবন-চরিত রচনায় চেষ্টা হইতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু তাহার পরে আর হয় না। তাই মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত নাই। যাহা আছে, তাহা কতকগুলি প্রাণহীন স্থূল ঘটনার সন্নিবেশ মাত্র। তাহা বৃত্তান্ত হইতে পারে, কিন্তু জীবন নহে।

বজ্রদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

ভবভূতির এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। লোকোত্তর পুরুষের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠোর, আবার কুসুম হইতেও কোমল। উহাতে একই সময়ে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ যেমন যাবতীয় বিরোধের একাধার, অথচ তিনি গুণাতীত ও নির্লিপ্ত, তাঁহার ভক্তগণও সেই প্রকার। কে তাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনায় সাহসী হইবে?

আমরা যে মহাপুরুষের পুণ্যময় স্মৃতি আলোচনা করিবার জন্য আজ প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি একজন আদর্শ চরিত্র যুক্তযোগী। এই প্রকার শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা, ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন, জগতে অতি-বিরল। তাঁহার পুণ্যজীবন পর্য্যালোচনা

করিয়া নিজে ধন্য হইবে, এই আশাতেই আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। যাঁহার লোকাতীত জীবনের এক কণা বুঝিতে পারিলে মনে হয় এ জীবন সফল হইল, যাঁহার অসংখ্য বিভূতির দুই একটি সামান্য স্ফুরণমাত্র প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, যাঁহার স্থূল দেহ পর্যন্ত আমাদের সূক্ষ্মতম বিচারের অনায়ত্ত, তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করিবার প্রবৃত্তি আমার হইতে পারে না।

বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার জীবন-চরিত্র নহে—তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত কতিপয় কাহিনী ও তাঁহার উপদেশ মাত্র। ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য নাই, এমন কি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য-সূত্রও সর্ব্বত্র না থাকিতে পারে আর তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টাও কখনও করা হয় নাই। আশ্রিত ভক্তগণের জীবনে আশ্রয়দাতার কৃপা নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহারই দুই-চারিটি নিদর্শন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উচ্ছ্বাসরূপে এখানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে! ভক্তের জীবনে ভগবানে লীলা কত প্রকারে হয়, তাহা কে বর্ণনা করতে পারে? আর তাহার সংখ্যা বা ইয়ত্তা করাই বা কাহার সাধ্য? ভগবান্ নিরপেক্ষ, অহেতুক করুণাশালী, —কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তের আকুল হৃদয় তাঁহার করুণা বিস্মৃত হইতে পারে না। বর্ত্তমান গ্রন্থ এই প্রকার স্মৃতি-চর্চ্চা ব্যতীত অপর কিছু নহে। যাঁহার স্মৃতি, তাঁহার পরিচয়ের জন্য তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত চরিত-কথা বর্ণনা আবশ্যক। প্রথমে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে (প্রথম ভাগ)। তদনন্তর তাঁহার লীলা-প্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী সংযোজিত হইয়াছে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ) ইহার অধিক অগ্রসর হইবার অধিকার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের নাই।

আমাদের সৌভাগ্য যে, এমন একজন মহাপুরুষ আজ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান, যিনি জীবনে অতি কঠোর সাধনাপূর্ব্বক ও অলৌকিক দৈবানুগ্রহে অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের তত্ত্ব সকল অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া তত্ত্বাতীত পরম পদে স্থিতি লাভ করিয়াছেন, যিনি যোগ ও বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়া শাস্ত্রের রহস্যসকল নিজের অচিন্ত্য বিভূতি-বলে যোগ্য অধিকারীকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে

সমর্থ, যিনি আদর্শ যোগী, আদর্শজ্ঞানী ও আদর্শ ভক্ত, যিনি মন্ত্রার্থবিৎ সত্যসংকল্প মহাত্মা, যিনি পরমতত্ত্বের প্রদর্শক ভগবানের অনুগ্রশক্তির সঞ্চারিণী মূর্ত্তিস্বরূপ, যিনি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই ত্রিবিধ স্ফুরণাত্মক মহাত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে সমাজস্যময় অবস্থার অধিষ্ঠাতা, যাঁহার নিকটে দেশ ও কালের সত্তা অলীক ও কল্পিত—এক কথায় যিনি প্রকৃত সদ্‌গুরু শ্রীভগবানেরই প্রকটরূপ। তাঁহারই কৃপায় আজ যেন আমরা তাঁহাকে বুঝিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে, তাঁহারই উদ্দেশ্যে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি। যিনি প্রাকৃতিক বিকারের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সংসৃষ্ট নহেন—অখণ্ড চৈতন্যের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আজ যিনি বিশ্বজগতের হৃদয়-কমলে বিশ্বনাথের ন্যায় অন্তরাত্ম-রূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠুন, তাঁহার শ্রীচরণে ইহাই একমাত্র সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

কাল-প্রভাবে সদ্ধর্ম্মের আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে। মনুষ্য ঋষিজনোচিত দিব্যভাব হইতে চ্যুত হইয়া জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছে, অসারকে সার বিবেচনা করিয়া তাহারই অন্বেষণে অমূল্য সময় ও শক্তি ব্যয় করিতেছে। শাস্ত্রে ও ঋষিবাক্যে বিশ্বাস হারাইয়াছে—সে তপস্যা নাই, সে সরলতা নাই, সত্যের সহিত পরিচয় না থাকাতে সে শ্রদ্ধা ও সত্যানুরাগও নাই। তাহার দেহ অশুদ্ধ, মন অপবিত্র, হৃদয় সঙ্কীর্ণ, দৃষ্টি ক্ষীণ ও বুদ্ধি জড়ভাবাপন্নন সে কি কখনও ধর্ম্মের যথার্থ রূপ দেখিতে পারে? দেখিতে পারে না বলিয়াই তাহার সংশয় কাটে না, বিচারের মোহ ছোটে না, সত্যের উদার ও মাধুর্যময় রূপের আকর্ষণ অনুভব আসে না। সেইজন্যই তাহার বিক্ষিপ্তচিত্তের চাঞ্চল্য কোন উপায়ে দূরীভূত হয় না। যে সুধার আস্বাদনের জন্য অমরধামের অধীশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম কীক্ষ পর্য্যন্ত নিরন্তর সতৃষ্ণভাবে নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহার ক্ষীণ আভাস পাইলেও মুগ্ধ জীব ক্ষণিকের জন্য নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে, যাহা না পাওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না, তাহার অশান্তিরও বিরাম হয় না, বাসনা বদ্ধ বহির্ম্মুখ জীবকে সেই অমৃতধারা পান করাইবার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষগণ কল্যাণময়ী জগন্মাতার প্রেরণাগত মর্ত্ত্যভূমিতে সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত

হইয়া থাকেন।

সে আনন্দরস-পানে চির-প্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসার-তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে।

সদ্‌গুরু ভিন্ন সে আনন্দের সন্ধান চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে আর কেহই জানে না। আজ তিনি আমাদিগকে সেই পরমানন্দের সন্ধান দিয়া বিষয়ের ও কামাদি রিপুনিচয়ের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করুন।

আমি জানি, এ স্মৃতি-চর্চ্চা করিবার অধিকার আমার নাই। শুচি ও সংযত না হইয়া যেমন দেবগৃহে প্রবেশ ও দেবার্চ্চনা করিতে পারা যায় না, সেই প্রকার মলিন ও চঞ্চল অন্তঃকরণের পক্ষে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের স্মরণও নিষিদ্ধ। ইহা জানিয়াও, নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও—আমি যে বর্ত্তমান প্রসঙ্গালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার কারণ আছে।

প্রথমতঃ এই চর্চ্চার ফলে যদি বিন্দুমাত্রও স্বর্গীয় পবিত্রতা, বৈরাগ্য ও বিবেকের আভাস এই মলিন হৃদয়ে স্থান লাভ করে, তাহা হইলে আমি ধন্য হইয়া যাইব। অগ্নি যেমন নিজের সঙ্গ প্রভাবে অশুদ্ধ বস্তুকেও উপেক্ষা বা অনাদর না করিয়া আত্মসাৎ করিয়া পবিত্র করিয়া লয়, তেমনই মহাপুরুষের বিশুদ্ধ সঙ্গ কলুষিত চিত্তকেও অনুকূলভাবে অবশ্যই প্রভাবিত করিবে—এই আমার ভরসা। শ্রীভগবানের করুণায় উপরে দীন ও পতিত জনেরও দাবী আছে। অশুদ্ধদেহে শিশু যেমন পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার না করিয়া গর্ভধারিণীর অঙ্গে উঠিবার জন্য ব্যাকুলভাবে কর প্রসারণ করে, জননীও তেমনই ঐ প্রকার শিশুকে অঙ্কে উঠাইতে কখনই দ্বিধা বোধ করেন না। মাতৃ-অঙ্কের এমনই অপূর্ব্ব মহিমা যে, উহার পূতস্পর্শে শিশুর মলক্ষালন আপনা-আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, আমি যোগ্যতর ব্যক্তিকে এই সুমহৎ কার্যের জন্য অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। যিনি প্রকৃত সত্যপিপাসু, জ্ঞানলিপ্সু, তিনি নিশ্চয়ই সত্যনিরূপণের জন্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। যদি তাঁহাকে জাগাইবার পক্ষে আমার এই কর্কশ রবও কার্যসাধক হয়, তাহা হইলে ইহা সার্থক। নানাকারণে আমি অযোগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া যোগ্যতর

ব্যক্তিকে ডাকিবার অধিকারও যে আমার নাই, তাহা নহে। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, মহার্ঘ্য রত্ন পড়িয়া রহিয়াছে, যিনি অন্বেষক ও পরীক্ষক, তিনি আসিয়া তাহার মূল্য নিদ্ধারণ করুন। হয়ত ভাগ্যে থাকিলে তিনি অতুল সম্পদের অধিকারলাভ করিতে পারিবেন। আমি শুধু একপ্রান্ত হইতে ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি।

"বিশুদ্ধানন্দ-কানন"
কাশীধাম।
শিবরাত্রি, ১৩৩৪

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

+ ५९४
१९२८ ई.

মঙ্গলাচরণম্

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দস্তোত্রম্

নীলম্ভোরুহপঙ্‌ক্তিসোদরবপুর্লক্ষ্মীঃ প্রসাদোত্তর
স্নেহাহভ্যক্তবিশাললোচনরুচা কর্ষন সতাং মানসম্
অনাভিপ্রসরচ্ছরৎ সমুদয়ৎকাশাভকূর্চ্চোজ্জ্বলো
দেবঃ শঙ্কর এব সদ্‌গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথোহবতু ॥ ১॥
যস্মিন্নভ্যুদিতে হৃদন্তরমহাকাশে প্রকাশাহধিকে
তাস্রিস্রাণি চ বাসনাত্মকবপুঃশালীনি যান্তি ক্ষয়ম্।
আনন্দং মকরন্দমন্তরধিকং বিভ্রন্মনঃপঙ্কজং
নিদ্রাং মুঞ্চিত তং ভজে গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং প্রভুম্ ॥ ২॥
যস্মিন্ জাগ্রতি যোগিবৃন্দপরমাচার্য্যে প্রভাবোত্তরে
সূর্য্যস্যেব তু রশ্মিভিস্ত্রিজগদারম্ভপ্রতিষ্ঠোদ্যতে।
প্রাচীনৈঃ করণৈঃ পূবের বিদধৎ সৃষ্টিং বিধাতা ন কিং
লজ্জামঞ্চতি, হন্ত তং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং ভজে ॥ ৩॥
শিষ্য যস্য পদাম্বুজোদ্ভবসুধামাপীয় পীনশ্রিয়ো
বাগীশেন সমং সভাসু বিজয়াস্পদ্ধাং বহন্তৎচ্চকৈঃ।
লক্ষ্মীঃ পদ্মসরো বিহায় সততং দাসীব যং সেবতে
তং বন্দে যমিনাং বরং গুরুবিশুদ্ধানন্দ্‌নাথং প্রভুম্ ॥ ৪॥
বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরঃ· প্রিয়তমামাশ্রিতা শক্তিং নিজাং
স্বেচ্ছামাত্রপরিগ্রহো বিতনুতে যদ্বিশ্বসত্যদ্ভূতম্।
যস্তন্মর্ম্মরহস্যবিত্তদভিদাপন্নো বিপন্নাশ্রয়ে,
স্তং ভক্তৌঘসুরদ্রুমং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং ভজে ॥ ৫॥
বিজ্ঞানানি বহুনি সন্তি বিবিধা বৈজ্ঞানিকেন্দ্রা অপি
প্রায়স্তে বহিরের বুদ্ধিমধমাং ব্যাপারয়ন্তেতমাম।
সর্ব্বশ্চর্য্যকরং ত্রিকালসফলং তৎসৌরবিজ্ঞানকং
যস্মাদাবিরভূৎ স রক্ষতু বিশুদ্ধানন্দযোগীশ্বরঃ ॥ ৬॥

বন্দে নন্দিতভক্তবৃন্দমুদয়দ্বাৎসলাবারানিধিং
বালার্কপ্রতি মল্লদিব্যমহসাং সঙ্ঘাতমুচ্চৈস্তমম।
অজ্ঞানাত্মক ঘোরগর্ত্তপতিতোদ্ধারাধ্বরে দীক্ষিতং
বিশ্বেশং মনুজাকৃতিং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং পরম্ ॥ ৭॥

বন্দে কিঞ্চিদচিন্ত্যশক্তি ভবভীতাত্মৈকশান্তিপ্রদং
কারুণ্যামৃতসিন্ধু সিন্ধুতনয়াবাগ্ দেবতারাধিতম্।
আকারেণ নরং বিনাশিতদরং যৎকর্ম্মণা শঙ্করং
বিখ্যাত ভুবনেষু তং গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং মহঃ ॥ ৮॥

স্বামিন্! সদ্গুরুনাথ! নাথিতবতাং সর্ব্বস্বদানোৎসুকঃ
মোহন্যোঽস্মিন্নবনীতলে সুবিপুলে জাগর্ত্তি সামর্থ্যবান্।
মন্যে বীক্ষ্য বদান্যতামনুপমাং শ্রীমৎপদাব্জোদিতাং
কাষ্ঠীভূয় পলায়িতঃ সুরতরুর্লীনো বনে নন্দনে ॥ ৯॥

দৈবং মানুষপাশবাদিসকলং সর্গং বিধাতুং ক্ষমঃ
খেচর্য্যাদিসমস্ত সিদ্ধিনিবহৈরষ্কাশ্রয়ৈরঞ্চিতঃ।
মূর্দ্ধান্তঃস্থিতশঙ্করঃ সুরভিতাসঙ্খ্যাতরত্নাকরঃ
পায়ান্নঃ প্রতিভাকরো গুরুবিশুদ্ধানন্দযোগীশ্বরঃ ॥ ১০॥

আবাল্যাদতিমানুষৈরবিতথৈঃ পুণ্যাবদানৈর্নিজৈ-
রাশ্চর্য্যং কুতুকং ভয়ং চ জনতাচেতঃসু বিস্তারয়ন্।
স্বাধীনঃ স্ববশীকৃতাখিলমহাভূতঃ প্রভূতদ্যুতি
যোগীন্দ্রো দয়তাং দয়াময়বিশুদ্ধানন্দনাথো ময়ি ॥ ১১॥

সর্ব্বাঙ্গাঞ্চিতরোমকূপবিসরৎসৌরভ্যসম্ভাবিত-
ভ্রামাদ্ভৃঙ্গকদম্বডম্বরভবৎসঙ্গীতসারস্তুতঃ।
শ্রীমাতুঃ স্তনজংধয়ন্নবিরতং বৃদ্ধোঽপি বালোপমঃ
ক্রীড়াকৌতুকিসদ্গুরুর্বিজয়তে যস্তং বয়ং মন্মহে ॥ ১২॥

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দাষ্টকম্

প্রাতরদ্যুৎসহস্রাংশুকোটিকূটস্ফুরত্ত্বিষে।
বিশুদ্ধানন্দনাথায় গুরুবে সততং নমঃ ॥ ১॥

সূর্য্যবিজ্ঞানসম্ভারবিহিতাদ্ভুতকর্ম্মণে।
নমোহস্তুগুরুবে তস্মৈ বিশুদ্ধানন্দবেধসে ॥ ২॥

যৎকৃপাতরিমাসাদ্য তীর্ণোহনেকৈর্ভবার্ণবঃ।
বন্দে পরমহংসং তং বিশুদ্ধানন্দনাবিকম্ ॥ ৩॥

ভৃগুরামকৃপাপাত্রং ছত্রং শিষ্যজনস্য যৎ।
বিশুদ্ধানন্দবিজ্ঞানসত্রমেকং শ্রিতোহস্মাহম্ ॥ ৪॥

রাজরাজেশ্বরীপীনস্তনন্ধয়মপি স্ফুটম্।
বর্ষীয়াংসমহং বন্দে বিশুদ্ধানন্দসদ্‌গুরুম্ ॥ ৫॥

সর্ব্বাঙ্গসৌরভোদ্‌ভ্রান্তভৃঙ্গসঙ্গীতসংস্তুতম্।
বিশুদ্ধানন্দকমলমমলং বিতনোতু মাম্ ॥ ৬॥

বিদ্যুদ্দামস্ফুরদ্ধামনয়নাম্ভোজমঞ্জুলম্।
বর্ষন্তমিব কারুণ্যং বিশুদ্ধানন্দমাশ্রয়ে ॥ ৭॥

যোগপ্রভাবসম্পন্নসিদ্ধিবৃন্দসমেধিতম্।
নারাকারং শিবং বন্দে বিশুদ্ধানন্দনামকম্ ॥ ৮॥

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

চরিত-কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী বণ্ডুল গ্রামে চট্টোপাধ্যায়-পরিবার দীর্ঘকাল হইতে স্বধর্ম্মপালন, অতিথিসেবা ও দেবদ্বিজে ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। কিঞ্চিদধিক ৭০ বৎসর পূর্বে শুভ ফাল্গুন মাসের ঊনত্রিংশৎ দিবসে নববসন্তের সমাগমে এই পরিবারের একটি অতি-মহৎ গৌরবের সময় সমাগত হইয়াছিল। তখন চারিদিকে প্রকৃতির লাবণ্যচ্ছটা বিকাশ হইয়াছিল। চারিদিকে শস্যশ্যামল প্রান্তরের স্নিগ্ধতা, বনভূমির শ্যামলতা, আকাশের নীলিমা, নবোদ্গত পত্রের শোভা, নববিকশিত কুসুমরাজির সৌরভ বণ্ডুল গ্রামটিকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং অদূর ভবিষ্যতের গৌরব-মহিমার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভাস সঞ্চার করিয়াছিল। একদিন প্রকৃতির গুপ্ত-কক্ষ ভেদ করিয়া প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যমালা যিনি প্রকৃতিরই কৃপায় অসাধারণ রূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রকৃতির পূর্ণ উন্মেষের সময়েই ত সেই প্রকৃতির শিশুর আবির্ভাব হওয়া স্বাভাবিক। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে চট্টোপাধ্যায় অখিলচন্দ্র এবং তৎসহধর্ম্মিণী দেবী রাজরাজেশ্বরী ভগবতী জগন্মাতার শুভাশীর্ব্বাদস্বরূপ একটি অপূর্ব্ব পুত্র-রত্ন লাভ করেন।

ধন্য বণ্ডুলগ্রাম, ততোধিক ধন্য চট্টোপাধ্যায়-বংশ, আরও ধন্য অখিলচন্দ্র ও দেবী রাজরাজেশ্বরী। যে-বংশে একজন তত্ত্বজ্ঞানী ও ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, সে-বংশের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সদ্গতি লাভ করে।

নবজাত শিশুকে দেখিয়া পিতামাতা, পরিবারস্থ সকলে এবং প্রতিবেশিগণ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। উত্তরকালে যাঁহার লোকোত্তর সামর্থ্যে জগৎ চমকিত হইয়াছে, তিনি যে জন্মমাত্রই আপন অলৌকিক রূপে সকলের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য

কি? সকলেই অনুভব করিয়াছিল, এরূপ অসামান্য তেজঃপুঞ্জময় দেহ অতি-অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শিশুর চক্ষু দুটি অতীত সংস্কারের মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া যেন কোন্ সুদূর চিরশান্তিময় রাজ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্থির হইয়া থাকিত। যেন বুঝিতে পারিত, এ জগৎ বড় দুঃখের স্থান, বড় বেদনার জায়গা, তাই এ জগতের দৃশ্যমাত্রের প্রতি নিমেষের জন্য করুণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় সেই সদানন্দময় অন্তর্জগতের দিকে তাকাইয়া থাকিত। যে দেখিত, সে-ই মনে করিত, এ শিশু আলোকসামান্য,—বৈষ্ণবী মায়া ইহার স্বচ্ছ অন্তঃকরণকে এখনও তেমনভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহাপুরুষের লক্ষণ শিশুদেহে লক্ষিত হইত।—যাঁহারা লক্ষণজ্ঞ তাঁহারা দৈহিক অনুভাবাদি দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ শিশু একদিন 'রাজচক্রবর্ত্তী' হইবে—অধ্যাত্মরাজ্যের সম্রাট্-পদে অধিরোহণ করিবে।

ধীরে ধীরে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় শিশু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতামাতা আদর করিয়া নাম রাখিলেন—"ভোলানাথ"। নামটি যে সার্থক হইয়াছিল শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনই তাহার প্রমাণ।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'Child is the father of man'. অর্থাৎ মনুষ্য ভবিষ্যৎজীবনে যে অবস্থা লাভ করে, পূর্ব্বজীবনেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। বালক ভোলানাথেরও বাল্য হইতেই অসাধারণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যিনিই তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিবার অবকাশ পাইতেন, তিনিই তাঁহার অসামান্যভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইতেন। তাঁহার জননী, কাকা, খুড়ীমা খেলার সাথী—সকলেই ভোলানাথকে প্রাণাধিক ভালবাসিত। বালকের চরিত্র-বল, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও নির্ভীক প্রকৃতি তাহাকে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছিল।

বাল্যকালে ভোলানাথ ঠাকুর দেবতা লইয়া খেলাধূলা করিতে ভালবাসিত। বাড়িতে শিব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্যামসুন্দর, সিদ্ধেশ্বরী, জয়দুর্গা, মনসা, গজলক্ষ্মী, তাল-বেতাল, লক্ষ্মী-নারায়ণ, নাড়ুয়াগোপাল প্রভৃতি নানা দেব-বিগ্রহ চণ্ডীমণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়া বিরজামান ছিলেন। বালক খেলাচ্ছলে উহাদিগের পূজা করিত—বন হইতে বন্যকুসুম চয়ন

করিয়া আনিত, নিজহস্তে সুশোভন মাল্য গ্রথিত করিত, চন্দন ঘর্ষণ করিয়া পূজাসম্ভারের আয়োজন করিত, তুলসী, বিল্বপত্র তুলিয়া আনিত—এই সকল অবলম্বনে প্রাণের সহিত পূজা করিয়া বালক ক্ষুদ্র হৃদয়ে তৃপ্তি ও আনন্দের আস্বাদন করিত।

বালক কখনই দেবপূজা না করিয়া স্বয়ং জলগ্রহণ করিত না। ভবিষ্যতে আধ্যাত্মরাজ্যের নিগুঢ় তত্ত্বরাজি আবিষ্কার করিয়া যিনি জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বাল্যাবস্থায় দৈবশক্তির সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে স্বাভাবিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বালকের পূজা অমন্ত্রক, বিধি-রহিত, নিয়মের অতীত—তথাপি উহা যে হৃদয়ের গভীরতর অন্তস্থল হইতে প্রাণের স্বাভাবিক উচ্ছাসরূপে উত্থিত হইত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। “ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।” প্রাণের ভাব অথবা ভক্তি পূজার সূক্ষ্মতত্ত্ব। ভাবরহিত পূজা পূজাই নয়—মন্ত্রাদি আয়োজন শুধু হৃদয়স্থ সুপ্তভাবরাশিকে প্রকাশিত করিবার জন্য—উহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বালকের হৃদয়ে জন্মান্তরের শুভসংস্কার-নিবন্ধন, প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে, সৌভাগ্যক্রমে শৈশব হইতেই দিব্যভাবের বিকাশ হইয়াছিল; সুতরাং তাহার পূজা বালসুলভ ক্রীড়া-স্বরূপ হইলেও যে প্রকৃত পূজার আদর্শ ছিল, তাহা নিশ্চিত।

শুনিতে পাওয়া যায়, বালক একদিন সঙ্গিবর্গের সহিত খেলাপ্রসঙ্গে গ্রাম হইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। সেখানে বালিদ্বারা শিব গড়িয়া বিল্বপত্রের দ্বারা তাহা পূজা করিতেছিল; এমন সময়ে একটি দুষ্ট বালক তাহাতে বিঘ্ন ঘটায়। ফলতঃ পূজা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ভোলানাথ তন্ময়চিত্তে পূজায় নিমগ্ন ছিল। হঠাৎ বালকটিকে বালোচিত চপলতার সহিত বলে,—“তুই যখন আমার শিবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিস্ তখন নিশ্চয়ই আমার শিবের সাপ যাইয়া তোকে কাটিবে।” অবশ্য ইহা অভিশাপ নহে, বালচাঞ্চল্যের ফলমাত্র। কিন্তু আশ্চর্য এই পরিহাসচ্ছলে অথবা বালসুলভ ক্রোধবশতঃ যে-কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা সত্যে পরিণত হইল; যথার্থই সেইদিন বালককে সর্পে দংশন করিল, আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভোলানাথের করস্পর্শেই সেই বালক আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

বণ্ডুল গ্রামের উত্তরে ভাণ্ডারডিহির নিকটস্থ শ্মশানক্ষেত্রে বটবৃক্ষতলে বসিয়া নির্জ্জনবাসের সুখ আস্বাদন করিতে বালক ভোলানাথ বড়ই ভালবাসিত। সেই স্থানটি তাহার বড় প্রিয় ছিল। যখনই অবকাশ পাইত, তখনই বালক সেই ঘোর জনহীন স্থানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শুনিতে পাওয়া যায়, শুদ্ধোদন-তনয় গৌতম বাল্যকালে এইরূপ নির্জ্জনে বসিয়া একাকী ধ্যানস্থ হইয়া তন্ময়াবস্থায় থাকিতে ভালবাসিতেন। যিনি এক সময়ে জরা-মৃত্যুর আক্রমণ হইতে দুঃখসঙ্কুল জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, যিনি ধ্যানিগণের অগ্রগণ্য হইয়া বোধিলাভ পূর্ব্বক জগৎকে অষ্টাঙ্গ বোধিমার্গ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে বাল্যে এইরূপ নির্জ্জনতা-প্রীতি ও চিন্তাশীলতা অবশ্যই স্বাভাবিক। অন্যান্য মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বালক ভোলানাথ যে এক সময়ে বিশিষ্ট ও উন্নত অধ্যাত্ম-সম্পদ লাভ করিবে তাহা গ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ অনেকেই এই বিশিষ্ট-প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন!

গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সাধু-সন্ত আসিয়াছেন শুনিলে বালক তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য পাগল হইয়া পড়িত। তখন তাহাকে আবদ্ধ করিয়া বাড়িতে রাখা যাইতে পারিত না। বালক, যে কোন প্রকারেই হউক সুযোগ অন্বেষণ করিয়া দিবসে না হইলেও রাত্রিবেলা সাধুর নিকটে উপস্থিথ হইয়া নিজের দর্শন লালসার তৃপ্তি-সাধন করিত। বয়স অল্প হইলেও বালক সাধুর সঙ্গে সদালাপ করিতে এবং অবস্থাবিশেষে নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক বিতর্ক করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একবার বণ্ডুল হইতে কিছুদূরে কোন স্থানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া বালক সেখানে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ দিবসে যাইতে না পারিয়া রাত্রিবেলা যাইবার জন্য উদ্যত হইল। বালক সেই ঘোর নিশা সময়ে দুই একজন সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে আপন আপন গৃহত্যাগ করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা নির্ভীক বালক একাকীই সেই নিশীথ অন্ধকারের ভিতর দিয়া সুপ্ত প্রান্তর ও বনরাজি ভেদ করিয়া সাধুর

আবাস-স্থানে উপস্থিত হইল। সাধুটি তাহার এই প্রকার অসমসাহস ও তেজস্বিত দর্শন করিয়া বলিয়া ছিলেন—"বালক, কি অদ্ভুতশক্তি তোমাতে প্রত্যক্ষ করিলাম, যে শক্তির প্রভাবে তুমি অল্পবয়স্ক হইলেও এই ঘোর নিশীথে গাঢ় অন্ধকারে বিজন অরণ্য মধ্যে ভয়ঙ্কর শ্মশান ও দিগন্তব্যাপ্ত প্রান্তর একাকী অতিবাহিত করিয়া আমার নিকটে পৌছিয়াছ। তুমি এখন আত্মবিস্মৃত—নিজেকে নিজে চিন না। তুমি কালে কি হইবে তাহা পরে বুঝিতে পারিবে।

একবার কোন কারণ বশতঃ ভোলনাথকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছিল। বালকের বস্তুতঃ কোন দোষ ছিল না, সেইজন্য ভর্ৎসিত হইয়া তাহার চিত্তে দারুণ অভিমানের উদয় হইল। ইহা তেজস্বি-প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু বালক মানুষের উপর কখনই অভিমান করিত না। সে বিশ্বাস করিত যে, মানুষের কিছুতেই কোন কর্ত্তৃত্ব নাই—মানুষ নিমিত্ত মাত্র। তাই তাহার অভিমান স্বভাবতঃ দেবদেবীর উপরেই ন্যস্ত হইত। বালক এবারও অভিমানপূর্ব্বক শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আত্মহত্যার জন্য বাড়ির পুষ্করিণীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু আশ্চর্য এই, পুষ্করিণীর জল গভীর হইলেও বালকের নিকট উহা জানুপ্রমাণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার পক্ষে ডুবিয়া মরা সম্ভবপর হইল না। সে যেদিকে যায়, সেইদিকে হাঁটুজল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়ে। যথাসময়ে ঠাকুরের অন্বেষণ-প্রসঙ্গে পরিবারস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিতে পায় এবং বালক ও ঠাকুরকে লইয়া গৃহে চলিয়া আসে।

বণ্ডুলে চট্টোপাধ্যায় বাড়ির নিকটে বঙ্কিম কুণ্ডু নামক একটি লোক বাস করিত। তাহার ছেলের সহিত ভোলানাথের অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। বঙ্কিম্ কুণ্ডুর ছেলে যখন অত্যন্ত পীড়িত, তখন ভোলানাথ শ্যামসুন্দরের স্নান-জল তাহার কপালে ও মুখে দিয়া তাহার আরোগ্য সম্পাদন করে।

একবার কাকা ভোলানাথকে একখানা কাপড় কিনিয়া আদর করিয়া পরিতে দিয়াছিলেন। চঞ্চল বালক খেয়ালের বসে কাপড়খানা হাত দিয়া ধরিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। উহা দেখিয়া কাকা বালককে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। বালক একটু দুঃখিথ ও বিস্মিত হইয়া ঐ ছিন্ন বস্ত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিতেই উহা পূর্ব্ববৎ

স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বালকের দেবাংশে জন্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

একবার ভোলানাথের কাকা তাহাকে পাঁচ টাকা দামের একজোড়া 'কোম্পানীর জুতা' খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন। বালক ঐ জুতা পাইয়া নিজে ব্যবহার করে নাই,—উহা তাহাদের প্রতিবেশী শশী কর্ম্মকারের পুত্রের বিবাহে দান করিয়াছিল। শশী কর্ম্মকারের পুত্র ভোলানাথের খেলার সাথী ছিল। তাই ভোলানাথ আপন বন্ধুর উৎসব উপলক্ষে ঐ মূল্যবান্ জুতা জোড়া উপহার স্বরূপ না দিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহাতে কাকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বালককে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন। সেকালে পাঁচ টাকা দামের জুতা বড় সহজ সামগ্রী ছিল না, এমন জিনিষ নিজে ব্যবহার না করিয়া একজন বাহিরের লোককে দান করা অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ বাবু গণনা করিয়াছিলেন। এই তিরস্কারে ভোলানাথের মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, বাড়ির চাকরাণীর নিকট হইতে কয়েকটি টাকা ধার লইয়া বালক চাকরের কাঁধে চড়িয়া বর্দ্ধমান গমন করে ও সেখান হইতে টাকা দ্বারা কয়েক ফাইল কুইনাইন আনিয়া গ্রামে খুচরা বিক্রয় করে। তাহাতে বহু টাকা লাভ হয়। ঐ টাকা হইতে চাকরাণীর ধারের টাকা দ্বিগুণ সুদসহ শোধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং বাকী টাকা দ্বারা জুতা খরিদ করিয়া গ্রামের সকলকে বিতরণ করা হয়।

ছয় মাস বয়সের সময় ভোলানাথের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, তখন হইতেই তাহার পিতৃব্য তাহার পিতৃস্থান অধিকার করেন ও তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে থাকেন। বাল্যকালে তাহার পিতৃব্য তাহাকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক তাড়না সহ্য করিয়াও বালক ইংরেজী শিক্ষা করিতে সম্মত হয় নাই। সংস্কৃতের উপর বালকের বিশেষ অনুরাগ ছিল। শুনিতে পাই, নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ভোলানাথ কিছুদিন সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

ভোলানাথের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাহার পিতৃব্য পরলোক গমন করেন। তখন বাড়িশুদ্ধ সকলেই কাঁদিয়া আকুল—কিন্তু

বালকের চক্ষে এক ফোঁটা জল কেহ দেখিতে পায় নাই। ইহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল। বাল্য হইতেই যে মায়ার প্রভাব তাহার উপর কম ছিল, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শুনিতে পাই, প্রায় তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক কাপড় পরিতে চাহিত না, পরাইয়া দিলে উহা কাহাকেও দান করিয়া দিত। কাকা তিরস্কার করিলে বলিত,—কাপড় না পরিয়া উলঙ্গ থাকিলেই বা দোষ কি?—বৃথা আবরণ কিসের জন্য?

এইসব ঘটনা অতি-ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। ইহা হইতে ভাবী জীবনের ধারার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতে পারে। মানুষের মহত্ত্ব ও গৌরব দীর্ঘসাধনার ফল, মানুষ যে জন্মজন্মান্তরের তীব্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ উদ্যমের পরিণতি স্বরূপ উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। বাল্যকালের বৈশিষ্ট্য অতীত সাধনার নিদর্শন এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধির সূচক। যাহারা বাল্যকালে ভোলানাথকে অন্তরঙ্গভাবে জানিতেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে এই সত্য মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

বালকের মাতৃভক্তি শৈশব হইতেই অতি প্রবল ছিল। এরূপ অসাধারণ মাতৃভক্তি এ জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বাবাজী বলেন যে, তাঁহার জীবনের সকল প্রকার উন্নতি জননীর আশীর্ব্বাদে সম্পন্ন হইয়াছে। একবার তাঁহার বাল্যকালে মাতারাণী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। নিজ গ্রামের ও আসন্ন চাতুষ্পার্শ্বিক গ্রামের চিকিৎসকগণের হস্তে চিকিৎসার ভার ন্যস্ত ছিল। চিকিৎসার ব্যবস্থা খুব ভালই হইয়াছিল, শুশ্রূষারও ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু চিকিৎসার প্রভাবে রোগজনিত বিকার কিছুমাত্র উপশম প্রাপ্ত হয় নাই। যতই দিন কাটিতে লাগিল, ততই রোগের অবস্থা সংশয়াপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। চিকিৎসকগণ যত্ন-সহকারে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া লক্ষণ বিশেষ খারাপ বলিয়া মনে করিলেন—এমন কি দিনটি যে ভাল ভাবে কাটিবে তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। ভোলানাথের কাকা ও খুড়ীমা তাহাকে আদর করিয়া 'ক্ষেপা খুড়ো' বলিয়া ডাকিতেন। বালকের কথা কখনই মিথ্যা হইত না বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। খুড়ীমা

ভোলানাথকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক্ষেপা খুড়ো, বল দেখি দিদি সারিবেন কি না?" সংসারনভিজ্ঞ সরল বালক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বলিল, "সারিবেন"। বিসূচিকা কি ভয়ঙ্কর রোগ, তাহার মাতার অবস্থা কি প্রকার সঙ্কটাপন্ন, সরল হৃদয় বালকের সে বোধ ছিল না। সে সংসারে আসিয়া অতি-শৈশবেই পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া একমাত্র মাতার অঙ্কেই লালিত-পালিত হইয়াছে। শয়নে স্বপনে জাগরণে মা ভিন্ন বালকের সংসার ক্ষেত্রে অন্য কোনও আকর্ষণের বস্তু ছিল না, সে যে কখনও মাতৃহারা হইতে পারে, এ ধারণা তাহার মনে কখনই জাগিত না, তাই দিগ্‌বিদিক্ বিচার না করিয়া ঐ প্রকার উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু এদিকে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল, বাড়ির সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, জীবনের যা একটু ক্ষীণ আশা ছিল, তাহাও ক্রমশঃ নিবিয়া গেল—আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া শুধু রোগীর মুখমণ্ডলে নহে, গৃহস্থিত সকলেরই মুখে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বালক একবার জননীর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, একবার আত্মীয় স্বজনগণের গাম্ভীর্য ও দিষাদক্লিষ্ট গতিবিধি পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। মাতৃভক্ত মাতৃগতপ্রাণ বালক আজ ভাবিতে পারিতেছে না যে, তাহার জননী তাহাকে অনন্ত কালের জন্য ত্যাগ করিয়া কোন্ অজানা নূতন দেশে চলিয়া যাইবে,—সে মাতৃহীন হইবে। বালকের বড় অভিমান হইল,—সে যে-সব ঠাকুর-দেবতার পূজা করিত স্বভাবতঃ তাহাদেরই উপর তাহার অভিমান হইল। বালকের চক্ষুঃ ছলছল করিতেছে, বক্ষঃস্থল গুরুতর বেদনায় নিপীড়িত, কিন্তু কাহাকেও না বলিয়া, নিজের অন্তরের বেদনা কাহাকেও না জানিতে দিয়া, সে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া আশ্রয় লইল,—গৃহের পার্শ্বে একটি গো-শালা ছিল, তাহাতে প্রবেশ করিয়া উহার মঞ্চের উপরে যেখানে ঘুঁটে প্রভৃতি সঞ্চিত রাখা হইত সেই অন্ধকার গুপ্তস্থানে একখানা শাবল লইয়া অতি সাবধানে পলাইয়া রহিল। সে মনে মনে ভাবিতে ছে—আজ তাহার পরীক্ষার দিন, —এতদিন যে সকল ঠাকুর দেবতাকে সরলভাবে ডাকিয়াছে আজ তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় কি না। সে মনে মনে ভাবিতেছিল, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহা

হইলে রাতের মধ্যে সমস্ত ঠাকুর ভাঙ্গিয়া ঠাকুর ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে। বালক উক্তভাবে গো-শালায় বসিয়াছিল, গৃহস্থিত সকলে রোগীকে হইয়া ব্যস্ত ছিল বলিয়া তাহার কোন খোঁজ করিতে পারে নাই। ভগবানের কৃপায় ক্রমে রোগীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিল ও চিকিৎসকও আশ্বাস দিলেন। সন্ধ্যাবেলায় বালকের সন্ধান হইল, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাওয়া গেল না। এদিকে শাবলও নাই! খুড়ীমা গোয়ালে আসিয়া শাবল খুঁজিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু ভোলানাথকে কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যাবেলায় মশার জন্য ধোঁয়ার ব্যবস্থা করিতে রাখালকে মাঁচা হইতে ঘুঁটে আনিতে বলিলেন। বলা বাহুল্য, তখনই বালক ধরা পড়িয়া গেল। বালকও মাতার আরোগ্য-সংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল, মুমূর্ষু অবস্থায় মা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুপ্তধন ঠাকুর-ঘরে স্থানবিশেষে প্রোথিত আছে, কিন্তু বালকের তাহাতে কোন প্রকার লোভ উৎপন্ন হয় নাই।

নবম বৎসর বয়ঃক্রম কালে বালকের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উপনয়নের পরে সাবিত্রী দেবীর প্রভাবে বালকের স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ভোলানাথ বণ্ডুলে শিবলিঙ্গের মধ্যে হর-পার্বতীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। শিবলিঙ্গ আপনিই দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে বালক যুগল-মূর্ত্তি ও অন্যান্য দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের জীবনের পরিবর্ত্তন কাহার যে কি উপলক্ষ্য করিয়া সংঘাত হয় তাহা বলা যায় না। লতাতন্তুর ন্যায় অতি-সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-সূত্রের উপর অতি-বৃহৎ ও অতি-জটিল জীবনের সৌধ বিলম্বিত থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্ম, ঈশ্বরের ইচ্ছা অথবা স্বভাবের প্রেরণা একই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় মহাশক্তির কল্পিত পৃথক্ পৃথক নাম মাত্র। লৌকিক ঘটনাবলীকে নিমিত্তরূপে অবলম্বন করিয়া এই মহাশক্তি কাহার কাহার জীবন কি ভাবে নিয়মিত করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। লৌকিক কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইলেও অজ্ঞেয় মূল কারণের তুলনায় তাহা একপ্রকার উপেক্ষার যোগ্য,—যাহাকে আমরা অতি দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করি, দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময়ে তাহাই ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সূচনা করিয়া থাকে। মহামায়ার মঙ্গলময় বিধানে আপাত-প্রতীয়মান অশুভও চরমে মহামঙ্গলের বিগ্রহরূপে পরিণত হয়। এইরূপ একটি আকস্মিক অশুভ ঘটনা ভোলানাথের জীবনকে চিরদিনের জন্য নূতন পথে চালিত করিতে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। এখন প্রসঙ্গতঃ সেই ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

তখন ভোলানাথের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ কিম্বা পঞ্চদশ অতিক্রম করিয়াছে মাত্র, কৈশোরের অবসান তখনও হয় না। একদিন সিঁড়ি হইতে নামিবার সময় অকস্মাৎ একটি ক্ষিপ্ত কুকুর আসিয়া বালকের পাদদেশে দংশন করিল। বালক অন্যমনস্ক ভাবে নামিতেছিল, হঠাৎ এই প্রকারে কুকুরে দংশন করিবে তাহা সে ভাবিতে পারে না। দংশনের ক্রিয়া অতি-অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হইতে লাগিল,—বালকের সমস্ত দেহ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িল। বালক বাড়ির সকলের নিকট দংশনের ইতিহাস বর্ণনা করিল। তাহার দাদা চিকিৎসক ছিলেন; তিনি নিজে অন্যান্য ডাক্তার ও বৈদ্যগণের সহায়তা লইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিয়মিত চিকিৎসা সত্ত্বেও বালকের অবস্থা অনতিবিলম্বেই অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িল। স্থানীয় চিকিৎসাতে বিশেষ কোন ফলাধান হইল না দেখিয়া বালককে গোঁদলপাড়ায় লইয়া

যাওয়া হইল ও সেখানকার প্রসিদ্ধ ঔষধ সেবন করান হইল। কিন্তু তাহাতেও উপকার বুঝিতে পারা গেল না। এদিকে বিষের ক্রিয়া ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—রোগের জ্বালায় সে আর্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। গোঁদলপাড়া হইতে বালক হুগলীতে চলিয়া আসে। সেখানে একটি ময়দার কলের স্বত্ত্বাধিকারী তাহার কাকার বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহার বাড়িতেই সে আশ্রয় গ্রহণ করে। হুগলীতেও রোগের প্রতীকার চেষ্টা কম হয় নাই, কিন্তু সবই বৃথা। বালক হতাশ হইয়া পড়িল। সে বুঝিতে পারিল—এবার তাহার রক্ষা নাই।

তখন সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে। সূর্যদেব অস্ত-গমন করিয়াছেন, পশ্চিমাকাশে রক্তরাগচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়াছে ও ভাগীরথী-সলিলে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া সমস্ত গঙ্গাগর্ভকে রঞ্জিত করিয়াছে। ঈষৎ বায়ু-হিল্লোলে গঙ্গাবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী খেলিতেছিল, বালক একদৃষ্টে তাকাইয়া আন্‌মনে তাহাই দেখিতেছিল। ঐ পবন-হিল্লোলে সঞ্চালিত তরঙ্গমালার ন্যায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কত শত আশা ও আকাঙ্ক্ষার লহরীমালা উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছিল তাহার ইতিহাস কে জানে? অস্তোন্মুখ সূর্য দেখিয়া তাহার মনে হইল, তাহার জীবন-সূর্যও অস্তমিত-প্রায়। বালক কি জানি কি মনে করিয়া ধীর-পাদবিক্ষেপে ভাগীরথীর তটদেশে আগমন করিল—বোধ হয় তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, স্নিগ্ধ-সলিলা জাহ্নবীর শীতল বক্ষে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য তাপিত প্রাণ শীতল করিবে। কিন্তু গঙ্গাতটে আসিয়া সে যে-দৃশ্য দেখিতে পাইল, তাহাতে সে চকিত হইল, তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সে অনিমেষলোচনে ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, গঙ্গাবক্ষে একজন জটাজুটধারী সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী নিরন্তন উন্মজন ও নিমজ্জন করিতেছেন,—আর গঙ্গাজল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভের ন্যায় স্ফীত হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সন্ন্যাসীর বদনমণ্ডল, প্রশান্ত, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল অথচ মধুর, দেখিলেই মনে হয়, যেন অপার্থিব জ্ঞান ও করুণা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া, দুঃখ-পীড়িত, ধরণীর উদ্ধার কামনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সন্ন্যাসী ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ,—তাঁহার অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কিছুই নাই।

তিনি বালকের দিকে নিরীক্ষণ মাত্র তাহার সমস্ত ইতিহাস ও মনোবেদনা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বালককে গম্ভীর ও স্নিগ্ধস্বরে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাচ্ছা! ইত্না কোঁ ঘাবড়াতে হো? দরদ হোতা হৈ? আচ্ছা, হম্ সব অচ্ছা কর দেংগে।" বলিয়া ধীরে উঠিলেন এবং বালকের শিরোদেশে করস্থাপন করিলেন। তাঁহার হস্ত-স্পর্শমাত্রই বালকের মনে হইতে লাগিল, কত বরফের রাশি যেন তাহার মস্তকে চাপা রহিয়াছে। তাহার শরীরের প্রতি শিরায় ও ধমনীতে তপ্ত শোণিতের পরিবর্তে যেন সুশীতল অমৃতের ধারা প্রবাহিত হইতেছে,—তাহার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া গেল, জীবনের নূতন আশার সঞ্চার হইল। সন্ন্যাসী বালককে ঐখান হইতেই একটি ওষধ লইয়া খাওয়াইয়া দিলেন ও তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। বালক বাসায় আসিল। তখন তাহার রোগ-যন্ত্রণা একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। সে দ্বিতীয় দিন গঙ্গাতীরে গেল, মহাপুরুষের নিকট বিনীতস্বরে প্রার্থনা করিল,—"প্রভো। আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন, আপনাকে আমি ছাড়িতে পারিব না। আমাকে দীক্ষা দিন ও ধর্ম্মজীবনের পথ প্রদর্শন করান।" মহাপুরুষ তাহাকে একটি আসন শিখাইয়া একটি বীজ দিলেন। বলিলেন,—"বালক, আমি তোমার গুরু নহি। এই আসনটি অভ্যাস কর ও এই বীজ জপ কর,—ইহা হইতেই তোমার দেহ-শুদ্ধি সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার গুরু নহি। যিনি তোমার গুরু হইবেন তিনি এখন স্থানান্তরে বর্ত্তমান আছেন, তিনি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন—তাহার কৃপায় তোমার সকল অভাব দূরীভূত হইবে এবং তুমি ধর্ম্ম জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া নিজের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। তুমি এখন বাড়ি যাও—আমি গঙ্গাসাগরে যাইতেছি। সময় হইলে আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া তোমার গুরুর নিকট লইয়া যাইব। এখন নিশ্চিন্ত থাক।"

বালক অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ির দিকে আসিল। বাড়ি আসিবার পরে কয়েকদিন পর্যন্ত প্রস্রাবের সঙ্গে ছোট ছোট কুকুরের ছানার মতন পড়িয়াছিল। তখন হইতেই বালক সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল। মা পুত্রের নিকট তাহার অলৌকিক ভাবে আরোগ্য লাভ করিবার

ইতিহাস শুনিয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

মহাপুরুষের চলিয়া যাওয়ার পর দুই এক বৎসর কাটিয়া যায়। তখন ভোলনাথ বর্দ্ধমান কাঞ্চননগর মেসে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সঙ্গে তার মাসতুত ভাই থাকিত। একদিন বিশ্বরূপ সাধু নামক একজন দোকানদারের নিকট সে কুইনাইন ক্রয় করিবার জন্য গিয়েছিল। সেখানে একটি মুসলমানের নিকট শুনিতে পাইল যে, ঢাকাতে একজন অসাধারণ সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ সময় জলে থাকেন—জলে বারংবার উঠা-নামা করেন, জল হইতে উঠিবার সময় জলরাশি স্তম্ভাকারে তাঁহার সহিত উত্থিত হয়; আবার নামিবার সময় নামিয়া মিলাইয়া যায়। মুসলমানটির মুখে এই কথা শুনিবামাত্র ভোলানাথের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কালবিলম্ব না করিয়া সে ঢাকা অভিমুখে প্রস্থান করিল। বর্দ্ধমানে হরিপদ নামক একটি যুবকের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল—সেও ভোলানাথের সঙ্গে একত্র রওনা হইল। ঢাকাতে পৌঁছিয়া উভয়ে সেই অলৌকিক সন্ন্যাসীর দর্শন-লালসায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে রম্‌নার মাঠে একটি বিজন স্থানে সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ভোলানাথ দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল—ইনি তাহার প্রাণদাতা সেই হুগলী ঘাটের সন্ন্যাসী। ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল—“প্রভো! এবার আমাকে গ্রহণ করুন; আর প্রত্যাখ্যান করিবেন না।” সন্ন্যাসী বলিলেন—“একাকী না আসিয়া সঙ্গে আর একজন লোক আনিয়াছ কেন?” যাহা হউক, এই বলিয়া তিনি উভয়কেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জগতের কল্যাণ-সাধনের জন্য যে সকল মহাপুরুষ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সমভাবে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগ ও বৈরাগ্য ভিন্ন জীবন গঠিত হয় না, সাধন-সম্মত্তি আয়ত্ত হয় না ও নিত্যধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সমর্থ্য জন্মে না। বিষয় বাসনাতে আবদ্ধ জীব ভোগ-লোলুপ ত্যাগের মহিমা সে কি বুঝিবে? বস্তুতঃ অমৃতত্ব লাভের ইহাই একমাত্র সোপান। একদিন জীবকে ইহা বুঝিতে হইবে—বুঝিয়া অনিত্যের সেবা ত্যাগ করিয়া নিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য,—যে কোন মহাত্মার জীবন-চরিত্র আলোচনা করা যায়, সর্ব্বত্রই একই কথা দেখতে পাই।

আজ একটি নবীন যুবক ঐ সনাতন ত্যাগের পথ লক্ষ্য কুরিয়া বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় অনন্তের দিকে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিতে উদ্যক হইয়াছে। আজ তাহার হৃদয়ে কি অপার্থিব ভাবের উদয় হইয়াছে, মোহান্ধ সংসারী জীব তাহা হয়ত বুঝিতে পারিবে না। জন্ম-জন্মান্তরের কঠোর তপস্যার ফলে, কত কত সৎসঙ্গের মাহাত্মে, ভগবানের কৃপাতে আজ যুবকের হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে! ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন নিমিত্ত মাত্র। বিমাতার অপমানকে নিমিত্ত করিয়া একদিন ধ্রুব অনন্তপুরুষের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। যুবক ভোলানাথেরও আজ সেই অবস্থা। স্নেহপূর্ণ আত্মীয়-স্বজন, স্নেহময়ী বাৎসল্যশালিনী জননী, চিরপরিচিত গৃহ ও পরিবার, ক্রীড়া-পরিকর, পার্থিব আশা ও আকাঙ্ক্ষা—সকল বিসর্জ্জন দিয়া আজ সে একজন অজ্ঞাত ও অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তদপেক্ষাও অজ্ঞাত ও অপরিচিত পদার্থের অনুসন্ধানে কোন্ এক অজ্ঞাত দেশে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।

মহাপুরুষ ভোলানাথের মনঃ পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,—"তুমি কি আমার সঙ্গে দুর্গমস্থানে যাইতে সাহস কর? তুমি এখনও বালক—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি নিতান্তই যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা

হইলে সন্ধ্যার পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও—আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইব।”

সন্ন্যাসীর আশ্বাসবাণী শুনিয়া ভোলানাথ যার-পরনাই হৃষ্ট হইল। যথাসময়ে সে ও তাহার সঙ্গী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সন্ন্যাসীর সহিত সম্মিলিত হইল। সন্ন্যাসী তাহাদিগের চক্ষু বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নিজের পশ্চাতে থাকিয়া চলিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী নৈশ-অন্ধকারে বনের ভিতর দিয়া ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—যুবকদ্বয় তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কোন্ কোন্ দেশ অতিক্রম করিয়া চলিল, কি ভাবে কোন্ দিকে চলিল তাহা ভোলানাথ কিংবা হরিপদ কেহই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল না। শুধু মনে হইতে লাগিল, একটি কোমল-স্পর্শ আস্তরণের উপর দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে। যদিও তাহারা স্বাভাবিক প্রণালীতেই পদক্ষেপ করিয়া চলিতেছিল, তথাপি বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে, কোন অনৈসর্গিক শক্তির আকর্ষণে তাহারা ব্যোমপথে ভাসিয়া চলিয়াছে। জলের উপরে তরঙ্গ তুলিয়া যেমন জলচর প্রাণী অথবা জলবিহারী পোতাদি সঞ্চরণ করে বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ করিয়া স্তরে স্তরে বায়ুর লহর ভেদ করিতে করিতে যেমন বায়ুযান অথবা ব্যোমচারী বিহঙ্গাদি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাহারাও তেমনি চলিতেছিল। যদিও উভয়ে হাঁটিয়াই চলিতেছিল এরূপ বোধ হইতেছিল বটে, তথাপি তাহা যে সাধারণ ভ্রমণের অনুরূপ নহে তাহা তাহারা অচিরেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। সমস্ত রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর প্রভাত হলে মহাপুরুষ যুবকদ্বয়ের চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিলেন। তখন চারিদিক তাকাইয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল—একটি পর্ব্বতের সমীপে দেবায়তনের পার্শ্বে তাহারা উপস্থিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। চারিদিকে একটিও বাঙ্গালী দেখিতে না পাইয়া তাহারা অনুমান করিল, তাহারা অতি দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল, এই স্থানের নাম বিন্ধ্যাচল এবং এই

দেবায়তনের মধ্যস্থা দেবী স্বয়ং বিন্ধ্যাবাসিনী। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে একরাত্রের মধ্যে নদী ও পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া কি করিয়া যে তাহারা এতদূরে পদব্রজে আসিতে পারিয়াছে ইহা তাহারা নিজেই বুঝিতে পারিল না। তাহাদিগকে অষ্টভুজা মন্দিরের প্রান্তদেশে রক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিপ্রবর অন্তর্হিত হইলেন তিনি যাওয়ার সময়ে বলিয়া গেলেন যে, কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই এবং তিনি কয়েকদিন পরে আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইবেন।

সন্ন্যাসীর অন্তর্ধানের পর ভোলানাথ ও হরিপদ উভয়েই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহারা কখনই দূরদেশে প্রবাস যাত্রা করে নাই, কাজেই এই প্রকার জনমানবহীন শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ স্থানে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল তাহারা বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানিত না, অথচ, যে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে, সেখানে বঙ্গ ভাষা-ভাষী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। ক্বচিৎ কখনও যে দুই একজন লোক দেবীর দর্শন উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হইত তাহারা সকলেই হিন্দী-ভাষী—উহাদের ভাষা উভয়ের নিকটেই সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তাহার পর অদূরে চারিদিকেই নিবিড় বনভূমি দর্শন করিয়া হিংস্র জন্তুর আশঙ্কায় তাহাদের প্রাণে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। যাহা হউক, এই প্রকার উৎকণ্ঠায় কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর একজন শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ উভয়ের উপযোগী আহার্য্য বস্তু সঙ্গে করিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কে এবং কোথা হইতে কাহার আদেশে আসিয়াছেন, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ ভোজ্য বস্তু রাখিয়া চলিয়া যাইবার পর উভয়ে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া সেখানেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ঐ ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার আসিয়া তাহাদিগকে খাদ্য বস্তু দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভোলানাথ মনে করিয়াছিল, তাহার সঙ্গী মহাত্মা সন্ধ্যাবেলা আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া যাইবেন। কিন্তু সন্ধ্যার পরেও তিনি আসিলেন না দেখিয়া স্বভাবতঃই তাহার মনঃ

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। অপরিচিত দেশে বিজন পর্ব্বতশিখরে মুক্ত আকাশের নিম্নে ঘোর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের সন্নিকটে নৈশ অন্ধকারে কি প্রকারে সময় অতিবাহিত করিবে, তাহা ভাবিয়া সে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পরে মনঃ স্থির করিয়া একটি বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিল এবং পরিধেয় বস্তর খুলিয়া নিজের দেহ বৃক্ষের শাখার সঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল। তাহার দেখাদেখি তাহার সঙ্গীও নিজেকে ঐ ভাবে বাঁধিয়া রাখিল।

এই প্রকারে অতি কষ্টে উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে উভয়ে কোন প্রকারে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিল ও রাত্রি প্রভাত হইলে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অষ্টভুজা মন্দিরে যাইয়া স্থান গ্রহণ করিল। দ্বিতীয় দিনও প্রথম দিনের মতই যথাসময়ে কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণটি আসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া চলিয়া গেলেন। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা বনমধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জন শুনিতে পাইয়া তাহারা যার-পর-নাই বিহ্বল হইয়া পড়িল। ভোলানাথ কোন দিন মাতৃ-অঙ্কচ্যুত হয় নাই। আজ এই বিদেশে বিভূমে সে নিজেকে নিতান্তই নিরাশ্রয় মনে করিয়া কাতর হইয়া পড়িল অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল; সুখময়ী গৃহ-স্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। যুবক মনে মনে নিশ্চয় করিল, আজ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই। এই প্রকার চিন্তা, ভয় ও উৎকণ্ঠায় কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সে সুদূর পশ্চিমাকাশে তাকাইয়া দেখিতে পাইল যেন একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক শূন্যপথে তাহারই দিকে ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে। নবোদিত সূর্য কিংবা পূর্ণচন্দ্র যেমন অখণ্ডমণ্ডলাকারে অভিব্যক্ত হইয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়, তদ্রূপ ঐ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলটিও তাহার দৃষ্টির অগ্রভাবে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যতই উহা সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই উহার আকারগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যপথে পতিত হইতে লাগিল। যুবকদ্বয় এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। আরও নিকটবর্তী হইলে বুঝিতে পারা গেল, যাহা দূর হইতে জ্যোতির্ম্মণ্ডল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল তাহা বস্তুতঃ জ্যোতির্ম্মণ্ডল নহে,—একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ও তাহার প্রভাবমণ্ডল মাত্র। মূর্ত্তিটি শূন্যপথে অবতীর্ণ হইয়া

যুবকদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মূর্ত্তির শিরোদেশে জটাজুট, হস্তে ত্রিশূল, ললাটে রক্তচন্দনের বিন্দু, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ও মুখে স্নিগ্ধ ও করুণাপূর্ণ হাস্য রেখা শোভা পাইতেছিল। মূর্ত্তিটি একটি সিদ্ধ ভৈরবীর মূর্ত্তি। ভৈরবী মাতা দয়ার্দ্রস্বরে ভোলানাথকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালা ভাষাতে বলিলেন,—"বৎস, তুমি এত কাঁদিতেছ কেন? আমি তোমার কান্না দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া তোমার নিকটে আসিতে বাধ্য হইয়াছি।" এই বলিয়া তাহাকে কোলে লইয়া জননীর ন্যায় বাৎসল্য সহকারে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা—করিল—"মা, আপনি কে ও কোথায় থাকেন? আমার কান্না কি প্রকারে বুঝিতে পারিলেন? কি ভাবেই বা আপনি এখানে আসিলেন? আমি ত অবাক্ হইয়া গিয়াছি!" ভৈরবী বলিল—"ভোলানাথ, প্রকৃতির রহস্য তোমার নিকট দুর্ভেদ্য। আমি কে, তাহার পরিচয় এখন দিব না—সময়ে আমাকে চিনিতে পারিবে। তবে জানিয়া রাখ, আমি তোমার জননী তুল্য এবং তুমি আমার সন্তান-সদৃশ। আমি যেখানেই থাকি, তুমি আমার কাছেই আছ। তুমি সদাই আমার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছ। ভয়ের কোন কারণ নাই। যিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন আমিও তাঁহারই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি মহাপুরুষ—সময়ে তাঁহার দেখা পাইবে। আজ হইতে আর তুমি ভয় পাইবে না। তবে যদি কখনও ব্যাকুল হও, আমি আবার দেখা দিব—আমাকে সংবাদ দিতে হইবে না। স্মরণ করিবামাত্রই আমার দর্শন পাইবে। এখন আসি।" এই বলিয়া ভৈরবী মাতা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। পরে জানিতে পারা গিয়াছিল—এই ভৈরবী মাতার নাম উমা ভৈরবী।

বিন্ধ্যাচলে পাঁচ ছয় দিন অতিবাহিত হইলে আবার সেই মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার জানিতে পারা গেল—তাঁহার নাম পরমহংস নীমানন্দ স্বামী। তিনি এবারও পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে চক্ষু বাঁধিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। বিন্ধ্যাচল হইতে প্রায় ষোল মাইল দূরে আশ্রম ছিল,—সেখানে বহুসংখ্যক মহাত্মা সমবেত হইয়াছিলেন। ভোলানাথ ও হরিপদকে সেখানে রাখিয়া মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। আবার একদিন আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তুকলী পাহাড়ে

গেলেন। তখন সেখানে একটি গুহাতে শ্যামা ভৈরবী মাতা অবস্থান করিতেছিলেন। যুবকদ্বয় একদিন মাত্র সেখানে থাকিলেন। ভৈরবী মাতা উভয়ের খুব যত্ন করিলেন ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে মহাপুরুষ আসিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। পূর্বোক্ত প্রণালীতে সন্ধ্যার পরে রওনা হইলেন—রাত্রি প্রভাত হইতেই যুবকদ্বয় চক্ষুঃ খুলিয়া দেখিতে পাইলেন—এক অপূর্ব্ব-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—উত্তরাপথের মধ্যে এ একটি প্রসিদ্ধ অথচ অতি-দুর্গম যোগাশ্রম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা নীল মেঘরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছে, মধ্যে মধ্যে নির্ঝরিণী ও গিরিনদী ঝঙ্কার সহকারে প্রবাহিত হইতেছে। উপত্যকার মধ্যস্থল প্রায় ৭/৮ মাইল স্থান ব্যাপিয়া একটি বিরাট আশ্রম। আশ্রমের চারিদিকে প্রাকার বেষ্টন, প্রাকারের চারিদিকে জলপূর্ণ পরিখা, বাহিরের সঙ্গে যাতায়াতের জন্য পরিখার উপরে একটি রমণীয় ধনুরাকার সেতু। আশ্রমটি স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত,—শিক্ষার ক্রম অনুসারে স্তরগুলি সজ্জীত। আশ্রমে যোগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। দীক্ষার পরে শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবস্থার অধিকাংশ সময় এইস্থানে সকলকেই অতিবাহিত করিতে হয়। বিজ্ঞানের বিভাগটি স্বতন্ত্র—তাহা সম্পূর্ণরূপে একজন পৃথক্ আচার্য্যের অধীন। তাঁহার নাম শ্রীশ্রীমৎ শ্যামানন্দ পরমহংস। আশ্রমের মুখ্য অধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ পরমহংস। এই স্থানটি অতি পুরাতন, প্রবাদ আছে ইহার প্রাচীন নাম—'ইন্দ্রভবন" ছিল। পরে ৫৬ শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাচীন স্থানের সংস্কার করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামী ইহার ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এখনও তিনিই ইহার মুখ্য অধিষ্ঠাতা আছেন। এখানে বহুসংখ্যাক লোক অবস্থান করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী উল্লেখযোগ্য—

১। ব্রহ্মচারী যুবক।

২। কুমারী। ইহারাও ব্রহ্মচারিণী।

৩। বিজ্ঞান শিক্ষার্থী। ইহাদের অধিকাংশই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪। সিদ্ধ পরমহংস। এই শ্রেণীর যে সকল মহাত্মা এখানে আছেন তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদের বয়ঃক্রম খুব অধিক—এত অধিক যে সাধারণ লোকের বিশ্বাসযোগ্য নহে ২০০/৩০০ হইতে সহস্রাধিক বৎসরের লোকও এখানে বর্তমান আছেন। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই 'আহার' করেন না—তবে যাঁহারা ততটা উৎকর্ষ লাভ করেন নাই

তাঁহারা সামান্য কিছু গ্রহণ করেন মাত্র।

ভোলানাথ ও হরিপদ জ্ঞানগঞ্জে ৮/১০ দিন থাকিলে পূজ্যপাদ নীমানন্দ স্বামী আপন গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ মহাতপার নিকটে তাহাদিগকে লইয়া যান ও তাঁহার সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেন। শুনিতে পাওয়া যায়, মহাতপার বয়স প্রায় ১২০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। তিনি একজন অতি-শক্তিশালী মহাযোগী পুরুষ। তিনি সাধারণতঃ উক্ত যোগাশ্রমে থাকেন না। তাঁহার কোন আশ্রম নাই। তিব্বতে যে স্থানে তিনি থাকেন সেখানে একটি গুহা আছে—তাহাতে রাজরাজেশ্বরী দেবীর পাষাণমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাই তাহাতে 'রাজরাজেশ্বরী মঠ' বলা হয়। বস্তুতঃ সেখানে ঘর-বাড়ি কিছুই নাই। সেখানে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের ঘর-বাড়ির আবশ্যকতাও নাই। মহর্ষি মহাতপাঃ অধিকাংশ সময় এই স্থানেই বাস করেন—কদাচিৎ যোগাশ্রমে আসেন। কখন কখন আপন গুরু-মাতা ক্ষেপামাইর নিকট মনোহর তীর্থেও গমন করেন। হিমবৎ প্রদেশে উক্ত যোগাশ্রমের ন্যায় আরও কয়েকটি মঠ আছে। সেগুলিও রাজরাজেশ্বর শাসনভুক্ত। মহর্ষি সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা বড় বলেন না, সর্বদাই আপনভাবে বিলীন থাকেন,—বাহ্য জগতের কোন সংবাদ রাখেন না। তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীশ্রীমদ্‌ভৃগুরাম পরমহংসদেব ঐ সকল মাঠের প্রধান অধিষ্ঠাতা ও কার্য্যকর্ত্তা। তিনি পরিদর্শক, নিয়ামক পরীক্ষক—একাধারে সবই।

আমরা পরমহংস নীমানন্দ, শ্যামানন্দ ও জ্ঞানানন্দের কথা বলিয়াছি—তাঁহারা এই ভৃগুরাম স্বামীরই গুরুভ্রাতা। তবে যোগৈশ্বর্য্যে ভৃগুরাম স্বামী একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মহর্ষি মহাতপাঃ ভোলানাথকে শিরঃস্পর্শ পূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার করিয়া বীজমন্ত্র দান করিলেন—দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। আজ ভোলানাথের জীবন সার্থক হইল—ক্ষিপ্ত-কুকুরের দংশনে একদিন যাহার জীবনান্তকাল প্রায় উপস্থিত হইয়াছিল আজ তাহার নিকট ভারতের একজন অতি বড় সিদ্ধ মহাপুরুষের অনুগ্রহে চিদানন্দময় অনন্ত জীবনের দ্বার খুলিয়া গেল—অমরতার পথ প্রকাশমান হইল,—শাপ বরে পরিণত হইল।

আজ হইতে ভোলানাথের নবজীবনের সূত্রপাত হইল,—দেহবেধের ক্রিয়া আরব্ধ হইল। প্রাকৃত জীবন অপ্রাকৃত স্পর্শমণির স্পর্শে কাঞ্চনাভা ধারণ করিল। এতদিন যে যুবক অসাধারণ হইলেও সাধারণ শ্রেণীরই অন্তর্গত ছিল, আজ গুরুকৃপায় সে সত্য-সত্যই অসাধারণতা প্রাপ্ত হইল। আজ নবীন জীবনের সন্ধিক্ষণে আমরা এই দিব্যধামের যাত্রীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি।

দীক্ষান্তে শিক্ষার জন্য কিছুদিন যোগাশ্রমে অবস্থান করিতে হয়। ওখানকার শিক্ষাপ্রণালী অতি-বিচিত্র। পরমহংস শ্যামানন্দের নিকট ভোলানাথ সূর্য-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও পরমহংস ভৃগুরাম স্বামী তাঁহাকে যোগ শিক্ষা দেন। এই শিক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী। বহু বৎসর পর্যন্ত অক্লান্ত অধ্যবসায়, অসীম ধৈর্য ও বিপুল পরিশ্রম সহকারে ভোলানাথ বিজ্ঞান ও যোগ উভয় বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন।

বিজ্ঞানের কথা শুনিয়া কেন যেন মনে না করেন, ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় জড়-বিজ্ঞান। বস্তুতঃ জড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি, তাহাও একান্তভাবে জড় নহে। 'বিশিষ্ট-জ্ঞানই' বিজ্ঞান শব্দের অর্থ। তথাকথিত জড় ও চেতন। উভয়ই বিজ্ঞানের বিষয়। সূর্য ইহার কেন্দ্রস্বরূপ ও প্রধান আশ্রম বলিয়া ইহাকে সূর্য-বিজ্ঞানও বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে যে, এমন একটি পদার্থ আছে যাহার জ্ঞান লাভ করিলে সর্ব্ব-বিষয়ক বিজ্ঞান স্বতঃই উপলব্ধ হয়। শ্রুতির এই অনুশাসন ব্রহ্মবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সে বিজ্ঞানের স্বরূপ কি, কি উপায়ে তাহা কার্যক্ষেত্রে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা যিনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি জানেন যে সূর্যই সকল প্রকার বিজ্ঞানের মূলস্তম্ভ। সৃষ্টি স্থিতি সংহার—এক কথায় জাগতিক ও ব্যবহারিক যাবতীয় ব্যাপারই সূর্যাধীন। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রসার সূর্য হইতেই হইতেছে। শুদু তাহাই নহে। সূর্যই দেবযান পথের লক্ষ্যস্বরূপ। ইহাকে মুক্তিদ্বার বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান—স্বরূপোপলব্ধি—করিতে হইলে সৌরতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ একান্তভাবে আবশ্যক। অতএব যোগের যাহা চরম উদ্দেশ্য বিজ্ঞানেরও তাহাই। সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে

পারা যায়, যে বিজ্ঞানও এক প্রকার মহাযোগ এবং যাহাকে আমরা যোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, মূলতঃ তাহাও বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। শুধু প্রণালীতে ভেদ আছে মাত্র। সুতরাং সাধকের পক্ষে উভয়ই সমভাবে আবশ্যক। যোগপথে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানপথে যোগ পরম সহায়ক।

সূর্য-বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে অন্যান্য বিজ্ঞান—যাহা উহাঁরই অঙ্গ মাত্র—সহজেই আয়ত্ত হয়। যোগশাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব এবং সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব নামক বিশিষ্ট সিদ্ধি যেমন যাবতীয় খণ্ডসিদ্ধির চরম উৎকর্ষ, বিজ্ঞান-রাজ্যে সৌর-বিজ্ঞানেরও তদ্রূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। চন্দ্র-বিজ্ঞান, নক্ষত্র-বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান, স্বর-বিজ্ঞান, দেব-বিজ্ঞান, প্রভৃতি সৌর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত খণ্ড-বিজ্ঞান বিশেষ।

ভোলানাথ অনন্যসাধারণ প্রতিভা-বলে যোগ ও বিজ্ঞান উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে প্রবীণতা লাভ করেন। এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ অন্যত্র দুর্লভ। প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে শিক্ষার যে উৎকর্ষ ছিল তিনি গুরুকৃপা ও স্বীয় অধ্যবসায় বলে তাহাই উপার্জন করিয়াছেন তাই জগৎ জগদীশ্বর ও অনাদি মহাশক্তির রহস্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—প্রাকৃতিক শক্তিমালাকে স্বকীয় ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, লক্ষ্য এবং নিজের মধ্যে কোনও প্রকার আবরণ থাকিতে দেন নাই। শুধু শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া ধর্ম্ম-জীবন লাভ হয় না। শাস্ত্রবাক্য আর্য হইলেও, একহিসাবে অভ্রান্ত হইলেও, পূর্ণজ্ঞান প্রসব করিতে পারে না। শুধু বাক্য হইতে বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না, আর প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে আবরণ ভঙ্গও হয় না। গুরুপদেশ অবলম্বন পূর্বক ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা, সংযম ও অধ্যবসায়ের সহিত অক্লান্ত ভাবে কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি যে গভীর সত্য হৃদয়ের অন্তদেশে উপলব্ধি করিয়াছেন, যে সংশয়-রহিত পরিপূর্ণ বিজ্ঞান-তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা শুধু গ্রন্থপাঠ দ্বারা সম্ভবপর হইত না।

ব্রহ্মচর্যের দ্বাদশবর্ষ কাল কঠিন পরিশ্রম করিয়া তিনি সাধনা করিয়াছেন। শিক্ষার জন্য বহুদিন হিমালয়ে থাকিয়া পরে অভ্যাসের জন্য নানা স্থানে পর্যটন করিয়াছেন। এক-এক স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া

তপস্যা করিয়াছেন। কখনও সঙ্গে সাথী থাকিত, কখনও থাকিত না। অনেক সময়ে ফলমূল খাইয়া থাকিতে হইত। সময়ে সময়ে আবার তাহাও জুটিত না; তখন কতদিন অনাহারেও থাকিতে হইয়াছে। নিবিড় বনে, গিরিগুহায়, শীতাতাপ অগ্রাহ্য করিয়া, হিংস্র পশুর সঞ্চার-পথে প্রাণটি হাতে করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। লোকালয়ের নিকট থাকিলে ভিক্ষা-সংগ্রহের আদেশ ছিল বটে, কিন্তু ভিক্ষা চাওয়ার নিয়ম ছিল না। গৃহস্থের দ্বারে যাইয়া ভিক্ষাপাত্র প্রদর্শন করিতে হইত—যদি সেখানে কিছু পাওয়া যাইত, ভালই। তাহা হইলে আর অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন ছিল না। অল্প হউক, অধিক হউক উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিন্তু কিছু না পাওয়া গেলে গৃহান্তরে যাইতে পারিতেন। সেখানেও যদি কিছু না পাওয়া যাইত, তবে তৃতীয় গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু সেখানে কিছু না পাইলে আর চেষ্টা করিবার আদেশ ছিল না। সেদিন অনাহারেই থাকিতে হইত।

এসকল শুধু ভগবানের উপর নির্ভরশীলতা শিক্ষার জন্য। আমরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মনে করি আমরাই কর্ত্তা—আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই সব হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। যে বিরাট শক্তি জগতের অন্তরে থাকিয়া অনন্যভাবে সমগ্র জগৎকে চালিত করিতেছেন, যাঁহার নিয়ন্ত্রণে চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পাদন করিয়া থাকে, তিলমাত্র কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে সমর্থ হয় না—যাঁহার মঙ্গলময় বিধানে সন্তান-প্রসবের পূর্ব হইতেই তাহার আহারের জন্য মাতৃস্তন্যে অমৃত-ধারার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, সেই বিশ্বজননী আনন্দময়ী মহাশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিলে জীবের আর কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা থাকে না। যখন সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, অন্তরে-বাহিরে, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র তাঁহারই মঙ্গলময় সত্তা প্রত্যক্ষ হয়, তখন ক্ষুদ্র অহঙ্কার সূর্য্যালোকে নক্ষত্রপংক্তির ন্যায় কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যবস্থায় জীবন এমনভাবে নিয়মিত করিতে হয়, যাহাতে সাধকের অহঙ্কার দমিত হইয়া প্রকৃত নির্ভরশীলতার উপলব্ধি ঘটিতে পারে। সাধক নির্ভরশীল হইতে পারিলে

তাহার কোন ভয় বা উদ্বেগ থাকে না—ভগবান্ স্বয়ংই তাহার যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী ভোলানাথের জীবনে এমন ঘটনা যে কতবার ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না।

আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, গির্‌নারে অবস্থানকালে একবার তিনদিন তাঁহাকে অনশনে থাকিতে হইয়াছিল। নিকটে কোথাও লোকালয় ছিল না—ভিক্ষা-সংগ্রহের কোন উপায়ও ছিল না। ব্রহ্মচারীর পক্ষে দেহরক্ষার জন্য উৎকট পুরুষকার অবৈধ। তাই দূরে যাইয়া আহার্যের সংস্থান নিষিদ্ধ মনে করিয়া তিনি ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে একটি গুহা মধ্যে শয়ন করিলেন। মনে হইল—এবার অনশনে দেহপাত অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এইরূপ পথহীন ঘোর বিজনভূমিতে—বিশেষতঃ যেখানে চতুর্দিকে নিরন্তর শ্বাপদাদির সঞ্চার হইতেছে—কোনও পথিকের আকস্মিক সমাগমের সম্ভাবনা নাই। আর হলেও তাহার নিকেটও ত ভিক্ষাপ্রাপ্তির আশা নিষ্ফল। ভোলানাথ নয়ন নিমীলিত করিয়া গুরুদত্ত ইষ্টনাম ধ্যান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার সমস্ত দেহ তন্দ্রার আবেশ হয়। তন্দ্রা হইতে উত্থিত হইয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন, দশ পনেরটি মৃন্ময়পাত্রে নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাঁহার সম্মুখে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ক্ষীর, মুড়কী, চিড়া, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল, সুপেয় সরবত—এই সকল দেখিয়া তিনি জগদম্মার অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিতে করিতে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে তিনদিন অনাহারে ছিলেন তাহা ত এ-জগতে কেহ জানিত না, জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না। এই ভীষণ অরণ্যমধ্যে, গুহার অন্তঃপ্রদেশে, ঠিক তাঁহারই সম্মুখে, এই সকল খাদ্যবস্তু কে রাখিয়া গেল? খাদ্যবস্তুর মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গদেশের সুপরিচিত—খাদ্য—সুদূর পশ্চিমে ইহাই বা কে আনিল? ইহা যে স্নেহময়ী বিশ্বজননীর স্নেহের নিদর্শন, তাহা অনুভব করিয়া তিনি প্রেম ও আনন্দে, গদগদ, হইলেন। এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে অনেক বার হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচর্য অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভোলানাথ মঠের নিয়মানুসারে দণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডী অবস্থাতে উনীত হইলেন। চারি বৎসরকাল দণ্ডধারণ পূর্বক দণ্ড ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসাবস্থাতেও প্রায় চারি বৎসরকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই আট বৎসরকাল তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার লৌকিক জ্ঞান উপার্জন করেন। তপস্যার ত কথাই নাই, তাঁহার সমস্ত জীবনই উৎকট তপস্যার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁহার যে সকল লোকোত্তর বিভূতি আজকাল সকলকে চকিত ও স্তম্ভিত করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্থূলতত্ত্বের অতীত একটি বিরাট শক্তির সত্তা প্রতিপাদন করিতেছে, ব্রহ্মচর্যের অবসান কাল হইতেই সেই সকল সিদ্ধির স্ফুরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। দণ্ডী ও সন্ন্যাসী অবস্থাতে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিশিষ্ট বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল।

যোগবিভূতি সম্বন্ধে নানালোকের নানা ধারণা আছে। এতদ্-বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য যথাস্থানে বিস্তার পূর্বক বলা হইবে। এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ মাত্র দুই একটি কথা বলা হইতেছে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ না হইলে প্রকৃত যোগবিভূতি প্রকাশিত হয় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রে' 'সর্বাত্মভাব'কে মহাবিভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য্য উহার বার্ত্তিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পুরুষ ধাবমান হইলে ছায়া যেমন তাহার অনুসরণ করে, তদ্রূপ আত্মা বা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে ঐশ্বর্য স্বভাবতঃই প্রকটিত হয়—আত্মা হইতে ঐশ্বর্যের পৃথক্ সত্তা নাই। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় বিন্দুর শোধন ও স্থিরতা সম্পাদিত হয়—উহাই জীবদেহের সত্ত্ব। উহা শুদ্ধ ও স্থির হইলে, অর্থাৎ সাধনবলে দেহ শুদ্ধ হইলে—ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি অধিকৃত হইলে—সিদ্ধি সকল আপনিই উপস্থিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না।

ভোলানাথ এই অবস্থায় যোগিজন বাঞ্ছিত অতীব দুর্লভ ও দুষ্কর নাভি-ধৌতি ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ও

কঠোর নিয়ম পালন করিয়া বহুপ্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াও অনেকে নাভি-ধৌতির অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃত যোগমার্গে এই ক্রিয়ার স্থান কত উচ্চ। বলিতে গেলে, যোগের ইহাই একপ্রকার শেষ ক্রিয়া। শুনিতে পাই একদিন তিনি নাভি-ধৌতি ও কিরাত-ধৌতি শিক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা গুরুগম্য—শুধু নিজের চেষ্টাতে এবং অল্প দিনের মধ্যে আয়ত্ত হইবার নহে। তিনি নাভি ধৌতি ক্রিয়া শিখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া যোগাশ্রমে একজন যোগী তাঁহাকে বলিলেন—"ভোলানাথ, তুমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাও। আমরা সুদীর্ঘকাল,—এমন কি শত বর্ষের অধিক সময় পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও যে দুর্লভ ক্রিয়ারত্ন লাভ করিতে পারিলাম না, তুমি বালক হইয়া এই অল্প বয়সেই তাহা অধিকার করিতে ইচ্ছা কর! তোমার ধৃষ্টতা ত কম নহে!" ভোলানাথ বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু জগতে এমন শক্তিশালী পুরুষ কি নাই, যিনি আপন ক্ষমতা-বলে উহা আমাকে এই বয়সেই শিক্ষা দিয়া ও তদনুরূপ যোগ্যতা উৎপাদন করিয়া দিতে পারেন?" যোগিবর ইহা শুনিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার পরিহাস করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার ধারণা সত্য নহে। আমার হৃদয়ের একান্ত বিশ্বাস, দাদাগুরুদেব (অর্থাৎ ভৃগুরাম পরমহংস মহাশয়) ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন।" যোগিবর একজন অতি দীর্ঘজীবী, প্রতিষ্ঠাপন্ন ও ক্ষমতাশালী পুরুষ। তারপর তিনি একটি বৃহৎ মঠের অধ্যক্ষ। সুতরাং একজন অল্পবয়স্ক যুবক যে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইয়াছে ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভোলানাথকে বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করিয়া দণ্ডের ভয় দেখাইলেন। ভোলানাথ মর্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্বয়ং শ্রীযুক্ত ভৃগুরাম স্বামী মহাশয় শূন্যমার্গে* সেখানে আসিয়া

---

*পূজাপাদ শ্রীযুক্ত ভৃগুরাম পরমহংসদেব আকাশ-মার্গেই যাতায়াত করেন—তিনি কখনও ভূমি স্পর্শ করেন না। স্থূল দেহ লইয়া সূর্যালোকে গমন করিবার ক্ষমতা বর্তমান যুগে একমাত্র তাঁহারই আছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তাঁহার স্থূলদেহ আমাদের দেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক ও ষাট্‌কৌশিক দেহ নহে। ইহা 'সিদ্ধ দেহ'।

উপস্থিত হইলেন। তিনি ভোলানাথকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। ভোলানাথকে মর্ম্মপীড়িত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া একটু উগ্রভাবে ধারণ পূর্ব্বক উক্ত যোগিবরের অন্যায় ব্যবহারের জন্য তীব্র দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন এবং তখনই ভোলানাথকে নাভি-ধৌতি ক্রিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিলেন। শত শত বর্ষ দুষ্কর তপস্যা ও নিয়ম পালন করিয়াও যে ক্রিয়ার অধিকার জন্মে না, আজ তিনি নিমেষের মধ্যে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে একজন নবীন যুবককে তাহা দান করিলেন। শক্তিশালী যোগীর ক্ষমতার সীমা নাই। তখন হইতে কিছুদিন নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করিয়া ভোলানাথ নাভি-ধৌতিতে পূর্ণতা লাভ করেন।

কিরাত-ধৌতি নাভি-ধৌতি উন্নত অবস্থা বিশেষ। একটি মখমল বা অন্য কোন প্রকার শুদ্ধ বস্ত্রের ২৫/৩০ হাত দীর্ঘ খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক উহাকে নাভি হইতে মুখ পর্যন্ত যথাবিধি অনুলোম ও বিলোম প্রণালীতে পুনঃপুনঃ চালনা করিতে হয়। এই ধৌতি-কার্যে ভাল অভ্যাস না থাকিলেও "চাত্বর" বা আকাশ গমনের ক্ষমতা পূর্ণ হয় না। দীর্ঘকালের চেষ্টাতে প্রচলিত কুম্ভকের দ্বারাও শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু উত্থিত অবস্থায় কথাবার্ত্তা বলা চলে না এমন কি কেহ কেহ বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া বসেন। এতদ্ব্যতীত উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে চলিবার কালে সময় সময় প্রতিকূল প্রবাহশীল বায়ুর আঘাত জাগিয়া পতনের ভয় জন্মে। নাভি-ধৌতিতে পরিপক্কতা লাভ করিলে দেহ শূন্যময়* হইয়া যায়—সমগ্র

---

*এইজন্যই 'অমনস্ক' "যোগীবীজ" প্রভৃতি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থে "যোগদেহ'কে 'আকার দেহ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

দেহকে ইচ্ছাক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারিলে অণিমা মহিমাদি সিদ্ধি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বাবাজীর দেহে প্রায় তিন চারিশত স্ফটিকশিলার গোলক (Crystal balts) নিহিত আছে। মস্তকের অভ্যন্তরে বাণলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, বৃহৎ স্ফটিকের মালা প্রভলতি সাজানো আছে। প্রয়োজন হইলে তাহা বাহির করেন ও 'পরে ঢুকাইয়া রাখেৰ। অনেকেই তাহা দেখিয়াছেৰ। জপের মালা শিরোহভ্যন্তরে রাখিভার নিয়ম শাস্ত্র মুখে অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু দেখিবার অবসর সকলের হয় না। তাঁহাকে বড় বড় স্ফটিকের গোলক লোমকূপ দিয়া ঢুকাইতে ও বাহির করিতে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। ঐগুলি এক অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া অন্য অঙ্গে সঞ্চালিত করিতেও দেকিয়াছি। কখনও কখনও

দেহের সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিবার ক্ষমতার বিকাশ হয়। তখন একটি লোমকূপের দ্বারে একটি অতি-বৃহৎ পদার্থও প্রবেশ করাইতে পারা যায়। শরীরের যে কোন অংশকে তখন নিজের ইচ্ছানুসারে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করিতে পারা যায়। কিরাত-ধৌতি দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া উহার কোন অঙ্গে বায়ু পূর্ণ করিয়া রাখার নামই কিরাত-কুম্ভক। এই কুম্ভকের বলে শূন্যে উঠিলে কথা বলিতে কোন বাধা হয় না, এমন কি কথা বলিতে বলিতেও উঠা যায়। বাহ্যজ্ঞান থাকে অথচ বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা জন্মে। নাসিকাদি দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিলে সাধারণতঃ তাহা হয় না। পরকায়া-প্রবেশাদির পক্ষেও সাধারণ কুম্ভক অপেক্ষা কিরাত-কুম্ভক অধিকতর উপযোগী। কিরাত-কুম্ভকের দ্বারা যখন দেহে বিশুদ্ধ বায়ু ভরিয়া লওয়া যায়, তখন কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না। অতি প্রবল ও শক্তিশালী তেজোরাশির দর্শন ও সংস্পর্শেও তখন জ্ঞান নষ্ট হয় না।

যখন ভোলানাথ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেন, তখন কখনও কখনও বর্দ্ধমানে আসিয়া স্বীয় জননীকে দর্শন দিয়া যাইতেন। এমন মাতৃভক্ত, মাতার একনিষ্ঠ সেবক, খুব অল্পই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। যাহাতে মাতার মনকষ্ট হইবার সুদূর সম্ভাবনা আছে এমন কাজ তিনি কখনও করিতেন না।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমানে থাকিয়া ডাক্তারি ব্যবসায় করিতেন। তিনি ভোলনাথকে খুবই স্নেহ করিতেন

সঙ্কোচপ্রসারের ফলে দুই-একটি স্ফটিক-খণ্ড দেহ হইতে আপনিই ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। দেহ-মধ্য হইতে নির্গত স্ফটিকাদিতে অতি উগ্র ও বিশুদ্ধ পদ্ম-গন্ধ বহুক্ষণ পর্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। তীব্ররূপে যোগ ক্রিয়া করিলে দেহাভ্যন্তরে যে ভয়ানক তাপ ও অত্যুগ্র তড়িত শক্তির বিকাশ হয়, উহাকে শান্ত করিয়া সাম্যভাবে আনিতে হইলে শীতস্পর্শ স্ফটিকখণ্ড দেহে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতে হয়। কিরাত-যোগের অভ্যাস না থামিলে ইহা পারা যায় না। এই বিষয়ে যাহা যাহা আমি নিজে বুঝিয়াছি ও তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, তাহা পরবর্তী ভাগে বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করা হইবে। বর্তমান স্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

এবং তাঁহার অলৌকিক তপঃশক্তিবশতঃ সম্পর্কে কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে বিশেষভাবে ভক্তি করিতেন। ভোলানাথ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে বিরত হইতেন না। একবার ভূতনাথবাবু ছোট ভাইকে ধরিয়া বসিলেন, বলিলেন,—"ভোলানাথ, শুনিয়াছি তুমি সাধন বলে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছ। আমার একটি চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যদি তুমি নিজের তপঃপ্রভাবে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি নিজের জীবন ধন্য মনে করিব। আমার অনুরোধটি অপর কিছু নহে—আমি আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবকে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি, জীব নিত্য—আত্মা অবিনশ্বর, যাহা-কিছু পরিবর্তন হয়, সে শুধু রূপের। কিন্তু যোগী যোগবলে অতীত ও অনাগত রূপকেও সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তুমি ইচ্ছা করিলেই আমার এই সাধটি মিটাইতে পার।" ভোলানাথ বলিলেন—"দাদা, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য। যোগ অথবা বিজ্ঞান বলে না হইতে পারে এমন কোন কার্য নাই। ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্রের সমরাবসানে শোকাতুরা গান্ধারীকে পরলোকগত আত্মীয় স্বজনকে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। যোগীমাত্রই ইচ্ছা করিলে তাহা পারেন। আর যিনি বিজ্ঞানবিৎ, প্রাকৃতিক রহস্য ভেধ করিতে সমর্থ, তিনি বিজ্ঞানবলেও উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু দাদা, দেখিয়া ফল কি? জানিয়া রাখুন, সকলেই অমর (মৃত্যু শুধু বেশ-পরিবর্তন মাত্র)। যে রূপ একবার এ জগতে দেখিয়াছিলেন আবার সেই রূপ যদি ক্ষণেকের জন্যও দেখিতে পান, তাহা হইলে আপনি ধৈর্যরক্ষা করিতে পারিবেন না। তদপেক্ষা মঙ্গলবিধানে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা স্থিরভাবে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করাই ভাল।" কিন্তু ভূতনাথ বাবু তাহা মানিলেন না, তিনি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ জানিতেন যে, বিশেষ আত্মসংযম না থাকিলে পরলোকগত প্রিয়জনকে দেখিবামাত্রই মানুষ উন্মত্তবৎ হইয়া পড়ে। তাই তিনি যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, দাদার সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব, তখন সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন তাঁহার আদেশ অনুসারে একটি গৃহ সজ্জিত করা হইল—তন্মধ্যে একটি শয্যা প্রস্তুত

হইল। যথাসময়ে স্বর্গীয় পিতৃদেবের মূর্ত্তি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় পরিচিত বেশে ঐ শয্যার উপর আবির্ভূত হইলেন—প্রশ্নের যথা প্রয়োজন উত্তর দিলেন। প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্ত থাকিয়া মূর্ত্তিটি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ভূতনাথবাবু অকস্মাৎ পিতৃদেবকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত, আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আরও একবার তিনি এই প্রকার পর্যটন-ব্যপদেশে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন। সেবার ভূতনাথ বাবু সাময়িকরূপে পীড়িত ছিলেন—নানাপ্রকার চিকিৎসার দ্বারাও কোন উপকার হয় নাই। ভোলানাথ দাদাকে এই কঠিন পীড়া হইতে নিজের অসাধারণ তপোবলে অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধার করেন ও যাওয়ার সময় তাঁহাকে একটি কবচ দিয়া যান। আনুষঙ্গিক নিয়মের মধ্যে পিঁয়াজ ও ডিম খাইতে নিষেধ করেন। বৌদিদিকেও সেবিষয়ে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দেন। কিন্তু ভূতনাথবাবু কোনও নিয়ম মানিয়া চলিবার লোক ছিলেন না। দৈবদুর্বিপাকে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুনরায় নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সন্তানের আসন্ন ঘোর বিপদ লক্ষ্য করিয়া মায়ের প্রাণ নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। ভোলানাথ তখন বহু দূর দেশে অবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, দৈশিক ব্যবধান সত্ত্বেও প্রাণের সহিত প্রাণের যোগসূত্র যাইবে কোথায়? জননীর হৃদয়বেদনা অন্তদর্শী মহাপুরুষ সুদূর হইতেই প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া তড়িদ্‌বেগে বণ্ডুল গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—"মা, দাদা আর বাঁচিবেন না, তাঁহার অন্তিমকাল সমাগত হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে তাঁহার শেষ অবস্থা দেখিতে পাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার মৃত্যুর দিন, তারিখ ও সময় ঠিক ঠিক নিরূপণ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি যে সময় নির্দেশ করিয়াছিলেন ভূতনাথবাবু ঠিক সেই সময়েই মানবলীলা সংবরণ করেন। মা পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া পড়িলে মাতৃগতপ্রাণ পুত্র তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাঁহার শোক নিবৃত্ত করেন ও নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করান। এই প্রকারে মাতার ধৈর্য সম্পাদন করিয়া ২/৩ দিন পরে তিনি চলিয়া যান।

যখন ভূতনাথবাবুর কন্যার বিবাহ হয়, তখন তিনি কোন মত প্রকাশ

করেন নাই। আত্মীয় স্বজনগণ সমস্ত আয়োজন করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে তিনি আপন মাতার নিকট ভবিষ্যৎচিত্র স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—বিবাহের কিছুদিন পরেই বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। কার্যেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসাশ্রমের অবসানে পরমারাধ্য গুরুদেবের আদেশে ভোলানাথ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে উদ্যত হইলেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবক অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গভাষা অবলম্বনে প্রকাশিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন। যিনি কঠোর সাধনা করিয়া দুর্লভ সিদ্ধিরত্ন সকল আয়ত্ত করিয়াছেন, যিনি মনোবৃত্তির উদয়াস্ত ও তাহার হেতু সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য করিয়া নিজের বশে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনধীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন পূর্বক মর্ম্মগ্রহণ করিতে কালবিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? গুরুদেবের অনুগ্রহে স্বকীয় প্রতিভার উন্মেষে, যথোচিত পৌরুষের প্রভাবে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান তিনি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

মর্ম

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী গুস্করা নাম একটি নাতিবৃহৎ গ্রাম আছে। ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইন এই গ্রাম ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—গুস্করা নামে উক্ত লাইনের একটি স্টেশনও আছে। তখন এই গ্রামে চোঙ্গদার বংশ সমৃদ্ধশালী ও প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। এই পরিবারের হরিশ্চন্দ্র চোঙ্গদার মহাশয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা তখন চারিদিকে সকলেই জানিত। ভোলানাথ চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার জন্য গুস্করা গ্রামে গমন করেন এবং উক্ত চোঙ্গদার মহাশয়দিগের কাছারী-বাড়িতে নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। চোঙ্গদার পরিবারের সহিত বণ্ডুলের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অনেক দিন হইতেই আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই গ্রামে থাকিয়া লোকলোচনের সমক্ষে অথচ অন্তরালে, অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে, নিষ্ঠা, নিয়ম, সদাচার, সংযম ও ব্রাহ্মণ্যভাবের সংরক্ষণপূর্বক তপস্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি সহসা কাহারও নিকট ধরা দিতেন না। সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে ভালবাসতেন। তবে কমলে মধু সঞ্চিত হইলে মধুকরকে আহ্বান করিতে হয় না, সে আপনিই আপন রসপিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, গুঞ্জনধ্বনিপূর্বক কমলের গুণগান করিয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। সহস্র প্রকারে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা

সত্ত্বেও ভোলানাথের যশঃসৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। দূরদূরান্তর হইতে অসংখ্য লোক নিরন্তর তাঁহার দর্শন ও কৃপা-প্রত্যাশী হইয়া আসিতে লাগিল।

তিনি চিকিৎসা করিতেন বলিয়া গুস্করাতে 'ডাক্তারবাবু' বলিয়া প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি পাশ্চাত্য প্রণালীতেই চিকিৎসা করিতেন, তথাপি তাঁহার কিছু বিশিষ্টতা ছিল। প্রথমতঃ তিনি যোগ-জ্যোতিষের ধারা রোগীর যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইতেন। যদি বুঝিতে পারিতেন রোগ অসাধ্য, অর্থাৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে তিনি সে রোগীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করিতেন না।

যে রোগীর চিকিৎসার ভার তিনি গ্রহণ করিতেন, সে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিত। কিন্তু যাহার চিকিৎসা করিতে তিনি সম্মত হইতেন না, সে বুঝিতে পারিত যে, তাহার রোগ প্রতীকার সাধ্য নহে। ফলতঃ তাঁহার হাতে প্রায় কোনও রোগীরই মৃত্যু হইত না। কিছুদিন এই প্রকার চিকিৎসায় তাঁহার সুকীর্তি এতদূর বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বহু দূরদেশ হইতে তাঁহার নিরন্তর নানাপ্রকার রোগীর সমাগম হইত। ইহাতে তাঁহার আর্থিক আয় কম হইত না। তিনি দারিদ্রের অকৃত্রিক বন্ধু ছিলেন। তাহাদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইয়া দেখিয়া আসিতেন। বহুস্থলে অবস্থানুসারে নিজহস্তে শুশ্রূষা করিতেন এবং অকাতর নিজ ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

যোগ-জ্যোতিষ ও দেব-জ্যোতিষে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। যোগ-জ্যোতিষ অবলম্বনে কোষ্ঠী-নির্মাণ ও ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দেশ বাবদ তিনি প্রতিমাসে বহু অর্থ উপার্জন করিতেন।

প্রচলিত জ্যোতিষ হইতে যোগ-জ্যোতিষের অনেকাংশে বৈলক্ষণ্য আছে। নানা কারণে সাধারণ জ্যোতিষের গণনা ভ্রান্তিসঙ্কুল হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম গণনা ত এক প্রকার হয় না বলিলেই চলে। কিন্তু যোগ জ্যোতিষ সেরূপ নহে। ইহাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই এবং গণনার সূক্ষ্মতা কল্পনাতীত ভাবে যথেষ্টরূপে সম্পাদিত করিতে পারা যায়। যোগ-ক্রিয়ার বিশিষ্ট উৎকর্ষ লাভ হইলে নানাবিধ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনের বিক্ষিপ্ততা নিবৃত্ত হওয়ার দরুণ কল্পনা প্রভাব একেবারে হীন হইয়া

পড়ে; ফলতঃ জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ প্রজ্ঞাদৃষ্টির সম্মুখে অনাবৃতভাবে প্রকট হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মনুষ্যের দেহাদির অভ্যন্তরে গ্রহসমষ্টির ব্যক্তিগত রূপ তাহাদের ক্রিয়া স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। স্থূলকথা—যোগরাজ্যে উন্নতি লাভ করিলে যোগাঙ্গ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বশতঃ জ্যোতিষ-তত্ত্বে যে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যোগ-জ্যোতিষের ক্ষমতা অসাধারণ। কোন লোককে দেখিবামাত্র, এমনকি, না দেখিয়াও, তাহার জন্মমুহূর্ত নির্ণয় করিয়া, জন্মকালীন গ্রহসংস্থান আবিষ্কার পূর্বক, তাহার ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা অতি সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ করা যায়। যোগিগণ জন্ম বলিতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় গ্রহণ না করিয়া গর্ভধানের মুহূর্ত গ্রহণ করেন। কারণ যে-ক্ষণে পিতৃবীর্য্য ও মাতৃরজঃ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সন্নিকর্ষ ঘটিত নিয়মানুসারে বিন্দুর উৎপত্তি হয়, সেই ক্ষণই যথার্থ জন্মক্ষণ। মাতৃগর্ভে সেই বিন্দু পুষ্টিলাভ করে মাত্র। যথোচিত পুষ্ট ও কাঠিন্য-সম্পন্ন হইয়া বাহ্য-জগতে আগমন করে। এই যৌগিক বিন্দুই শাস্ত্রে বীজ শব্দ অভিহিত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির বীজ যে প্রণালীতে ভূমিতে বা ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া, প্রতিবন্ধক না থাকিলে, ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হয় ও যথাসময়ে ভূমির আবরণ ভেদ করিয়া বাহ্য আলোকের দিকে উত্থিত হয়, মাতৃগর্ভেও সেই প্রকার দেহবীজের ক্রম-পরিণাম সম্পাদিত হয়—পরে কাল পূর্ণ হইলে উহা বাহিরে প্রকাশিত হয়! যোগিগণ কোন দেহ দেখিবামাত্রই তাহার বীজটির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। বীজ জানিতে পারিলে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক শক্তি-নিচয়ের সন্ধান পাইলে তাহার ভবিষ্যৎ আকার জানিতে কোন বাধা থাকে না। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ যেমন herodity ও environment দ্বারা প্রাণিদেহের ও চিত্রের বিকাশ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, নিদানাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেরূপ সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট কারণের দ্বারা, অর্থাৎ predisposing ও exciting cause-এর আলোচনা করিয়া, রোগের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, নৈয়ায়িকগণ যে প্রকার উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ-মালার বিচার করিয়া কার্যোৎপত্তির দার্শনিক উপপত্তি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যোগিগণও

দেহবীজের উপর অভিব্যক্ত জগতের ক্রিয়াশীল যাবতীয় শক্তির প্রভাব বিবেচনা করিয়া ঐ বীজের ক্রমবিকাশ ধরিয়া থাকেন।*

বাবাজীর সহিত যাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে পরিচিত আছেন, তাঁহারা সকলেই যোগ-জ্যোতিষের অদ্ভুত ব্যাপার নানা ভাবে প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার পুরাতন শিষ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় যখন প্রথম বাবাজীর সঙ্গ লাভ করেন, তখনকার একদিনের কথা এইখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ণনাটি উপেন্দ্রবাবু স্বয়ং যেভাবে লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন— "একদিন বর্দ্ধমান হইতে ফিরিবার সময় আমি ও আমার অধীন একটি কর্মচারী (শ্রীযুক্ত বামাপদ বিশ্বাস) তাঁহার (অর্থাৎ বাবাজীর) শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য গুস্করা কাছারী বাড়িতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, ঘরের কোণে একখানা সাধারণ কাষ্ঠাসনের উপর বাবাজীর বসিয়া আছেন। মহাপুরুষ সহাস্যবদনে "কি গো, কেমন আছ?'—বলিয়া নিকটে ডাকিলেন। আমি নিকটে গেলাম। কথায় কথায় বলিলাম— 'আপনি খুব ভাল জ্যোতিষ জানেন। আমার কোষ্ঠীখানা কি একবার আনিব—দেখিয়া দিবেন?" তিনি বলিলেন—'কেন গো, কোষ্ঠী আনিতে কেন হবে? তোমার কোষ্ঠী আমার নিকট আছে! তুমি যে আমার বহুদিনের পরিচিত।' আমি বলিলাম—'কই, দেখি।' অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার নোট-বহিতে আমার জন্মবার তিথি-নক্ষত্র সন-তারিখসহ গ্রহসংস্থান ঠিক করিয়া কুণ্ডলী তৈয়ার করিয়া দিলেন। আমি ভাবিলাম—একি অপরূপ ব্যাপার! ইনি আমার কোষ্ঠী কোথায় পাইলেন? এ জীবনে ত আমার সঙ্গে আর পূর্বে দেখা হয় নাই—তবে ইহা কিভাবে জানিতে পারিলেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'ভাবনা কি গো? সবই হয়। জল খাও।' বলিয়া আমাকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও আম লিচু প্রভৃতি ফল দিয়া নিজ হাতে আহার করাইলেন।

শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চেল মহাশয় বাবাজীর সহিত প্রথম পরিচয়ের

---

*এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গে'র দ্বিতীয় ভাগে থাকিবে।

বর্ণনাসূত্রে যাহা লিখিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখও আবশ্যক মনে হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—‘‘আমি তখন কলিকাতায় থিয়েটার রোডে অবস্থান করিতাম। বহুদিন হইতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করি। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি আমার তত্টা আকর্ষণ ছিল না। আমার ধারণা ছিল, যিনি যথাকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, যিনি আচারবান্ ও সংযমী, এমন ব্রাহ্মণ যদি ভাগ্যবলে কখনও প্রাপ্ত হই, তবে তিনিই আমার আদর্শ হইবেন। তখন একদিন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভট্টাচার্য নামক একজন ভদ্রলোকের মুখে বাবাজীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনতে পাই। মণীন্দ্রবাবু বাবাজীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে ভোলানাথবাবু এমন অদ্ভুত লোক যে, তিনি একই সময়ে তাঁহাদিগের সহিত বসিয়া তাস খেলেন ও চণ্ডীমণ্ডপে কর্তাদের সঙ্গে গল্প করেন। এইরূপ অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা তিনি বলিয়াছিলেন। শুনিবামাত্রই আমার মনে কেমন একটা ভাবের উদয় হইল। আমি মণীন্দ্রবাবুর নিকট ঠিকানা জানিয়া গুস্করায় একখানা জাবাবী টেলিগ্রাম পাঠাইলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে, আমি যাইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি—এখন যাইব কিনা কৃপা করিয়া জানাইবেন। যথাসময়ে উত্তর পাইলাম ‘not now’ (এখন নহে)। কিন্তু এই প্রকার নৈরাশ্যজনক উত্তর পাইয়াও আমি নিরাশ হইলাম না—প্রাণ টানিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ গুস্করায় রওনা হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া বাহিরে বসিয়া রহিলাম—বাবাজী তখন ঘরে ক্রিয়াতে নিযুক্ত ছিলেন! কিছুক্ষণ পরে বাহির হইলেন—গাত্রে পদ্ম-গন্ধ ভুরভুর করিতেছে, ঘর হইতে বিচিত্র সদ্‌গন্ধ নির্গত হইতেছে। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ—অপূর্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। আমি তখন এক পার্শ্বে উপেবশন করিলাম। বাবাজী বলিলেন—‘কি গো, কখন এলে? আমি বলিলাম—‘এইমাত্র এসেছি। আপনার নিষেধ-সত্ত্বেও না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই বলিয়া হ্যান্ডব্যাগ হইতে আমার ও আমার স্ত্রীর কোষ্ঠী দুইখানা বাহির করিতে ইচ্ছা করিলাম। তিনি বলিলেন,—‘ও কি?’ আমি উত্তর দিলাম। তিনি তখনই ঘরে যাইয়া একখানা খাতা লইয়া আসিলেন—দেখিলাম, তাহার মধ্যে একখানা পৃথক কাগজে আমার ও আমার স্ত্রী প্রভাবতী দাসীর নাম জন্মকালাদি

এবং ফলাফল সব লিখিত রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলাম,—আমার নাম আপনি জানিলেন কিরূপে? আমার স্ত্রীর নামই বা কি প্রকারে জানিলেন? আমি যে এখানে আসিব, তাহাই বা জানিলেন কি প্রকারে? উহা ত আমার নিজেরও নিশ্চয় ছিল না। এমন কি, 'তার' করার সময়েও জানিতাম না। জন্মছক প্রভৃতিই বা কি উপায়ে বাহির করিলেন?' তিনি বলিলেন,—'তোমাকে এখন আসিতে বারণ করিয়াছিলাম। তা সত্ত্বেও যখন তুমি রওনা হইলে দেখিলাম, তখন, তোমাদের কোষ্ঠী নির্মাণ করিয়া ফেলিলাম। এই দেখ, নিজের কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলাইয়া লও।' মিলাইলাম—সব মিলিল, শুধু জন্ম-মুহূর্তের একটু সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহার গণনাই ঠিক, আমার কোষ্ঠীর গণনা ভুল। তিনি আরও বলিলেন যে, যদি আমার কোষ্ঠী-প্রদর্শিত লগ্ন ঠিক হইত, তাহা হইলে আমি একজন অবতারকল্প মহাপুরুষ হইতাম! বলিলেন—'দেখ, ঐ সময়ে তোমার জন্ম হইলে আমিই তোমার নিকটে যাইতাম, তুমি আমার নিকট আসিতে না। ঐ সময়ে মনুষ্যের জন্ম হইতে পারে না। ও একটি বিশিষ্ট ক্ষণ'।"

জ্যোতিষ ও চিকিৎসা ব্যাতিরেকে স্বরোদয় প্রভৃতি বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল অবসর মত গুরুদেবের আদেশের অনুবর্তী হইয়া ইহার প্রয়োগও তিনি করিতেন। আমরা সাধারণতঃ স্বরোদয়ের যে সকল গ্রন্থ দেখিয়া থাকি, তাহা হইতে বাবাজীর স্বরোদয়-বিদ্যার গভীরতা অনুমান করা যাইতে পারে না। স্বরোদয় শাস্ত্রের যে সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও রহস্যময় তত্ত্বের কথা মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে প্রসঙ্গত শুনিতে পাই ও তাঁহার নিকটে সময় সময় ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন যেরূপ দেখিতে পাই, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যক্ষদর্শী গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোনও শাস্ত্রের রহস্য অবগত হওয়া যায় না।

এই প্রকার নানাভাবে তিনি প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে বহু অর্থ উপার্জন করিতেন। কিন্তু যিনি আজন্ম ত্যাগী, যিনি গৃহে থাকিয়াও অন্তঃসন্ন্যাসী, দুর্লভ ব্রহ্মপদ যাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাঁহার পক্ষে অর্থ সঞ্চয় সম্ভবপর নহে।

একদিকে তাঁহার যেমন অর্থসমাগম হইত, অন্যদিকে তেমনই অর্থ ব্যয়ও হইয়া যাইত। অতিথি-সৎকার. সাধু সন্ন্যাসী আমন্ত্রণ, দীন ও বিপন্ন পরিবারের সাহায্য দান—নানা প্রকারে জলের স্রোতের মতন অর্থব্যয় হইত। তিনি আয় এবং ব্যয় উভয়েই সমদৃষ্টি রাখিয়া নিঃস্পৃহ অকিঞ্চন সন্ন্যাসীর মত গৃহে থাকিয়াও গৃহহীনভাবে, কাষায়-বসন পরিধান না করিয়াও স্থিরবীর্য্য সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেন।

গুস্করাতে অবস্থানকালেই তিনি দার-পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্বর্গীয় জননী বংশরক্ষার জন্য তাঁহাকে বিবাহ করিতে জেদ করিয়া ধরেন। দীর্ঘকাল বনে-জঙ্গলে তপস্যা করিয়া আরণ্যক জীবনযাপনপূর্বক পূনর্ব্বার সংসারে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। যদিও তখন দেশ ভ্রমণ হইতে বিরত হইয়া একস্থানে বাস করিতেছিলেন, তথাপি তিনি অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা তিনি চিরদিনই শিরোধার্য করিয়া আসিয়াছেন। মাতার আদেশ পাইবামাত্রই তিনি গুরুদেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় অভিপ্রায় যথাবৎ বিনম্রভাবে নিবেদন করিলেন। গুরুদেবও তাঁহাকে বিবাহ করিতে. আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তাঁহার সতীর্থ ও সঙ্গী হরিপদবাবুও এই প্রকার গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। ফলে, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘনবশতঃ তাঁহার তপস্যার প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। তিনি অনেকবার গুরুদেবের শ্রীচরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুদেব আদেশ প্রত্যাহার করিলেন না। বহুক্ষণ রোদনের পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "হরিপদ, তোমার এ জন্ম নিষ্ফল হইল বটে, কিন্তু আগামী জন্ম ভাল হইবে।"

ভোলানাথও যে একেবারে আশঙ্কিত হন নাই তাহা নহে। তবে তিনি অসাধারণ গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি জানিতেন—গুরু মঙ্গলময়। তাঁহার বাক্য, কর্ম্ম, চিন্তা, সবই শিষ্যের কল্যাণের জন্য। শিষ্য পূর্বে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সময়ে তাহা বুঝিতে পারে। তবু তিনি একবার আপন সন্দেহ ভঞ্জন ভজনের জন্য গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বিবাহের ফলে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটিবে কি না? উত্তর

পাইয়াছিলেন—"তোমার তপঃপ্রভাব কোনকালে কম হইবে না। বরং উত্তরোত্তর তপস্যার তেজঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" গুরুদেবের এই স্নেহময় আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ভোলানাথ বিবাহ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিছুদিন পরে শুভমুহূর্তে বর্দ্ধমান জেলাতেই তাঁহার শুভ পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইল। গুরুর আদেশে সন্ন্যাসী আজ গৃহস্থ সাজিলেন—মাতার চিরপোষিত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু বাহিরে গৃহস্থ হইলেও তিনি যেমন সন্ন্যাসী ছিলেন তখনও তেমনই থাকিলেন। যিনি অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী, তাঁহার পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম পালন শুধু রঙ্গমঞ্চের অভিনয় মাত্র। দেবগণের কার্যসাধনের জন্য তাঁহাদিগের অনুরোধে শিব যেমন বিবাহ করিয়াছিলেন, আজ স্বর্গাদপি গরীয়সী গর্ভধারিণী জননীর অনুরোধে গুরুদেবের কোনও অচিন্ত্য মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বালব্রহ্মচারী ত্যাগী যুবক পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। গার্হস্থাশ্রমের মহত্ত্ব আদর্শ গৃহীজীবনের নিদর্শন দেখাইবার জন্য দুঃখ-পঙ্কেনিমগ্ন জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মহনীয় সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য, আজ কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে যুবক গুরুদত্ত 'বিশুদ্ধানন্দ' নাম ও 'তীর্থস্বামী' উপাধি গ্রহণপূর্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। মঙ্গলময়ের সকল বিধানেই পরম মঙ্গল নিহিত থাকে। ইহাতেও যে ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবগণের পরম কল্যাণ নিহিত ছিল, তাহা আজ অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাবাজীর জীবন নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে চালিত হইত। প্রতিদিন সকালবেলা ক্রিয়া হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ বাহিরে যাইয়া ভ্রমণ করিয়া আসিতেন, ঠিক দশটার সময় ভোজন করিতেন এবং তদনন্তর সমাগত ভক্তগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণের সহিত শাস্ত্রালাপ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চা করিতেন। প্রয়োজন হইলে রোগী দর্শন করিতে যাইতেন, নতুবা কখনও কখনও অপরাহ্নে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন। সূর্যাস্ত হইলে আর কোথায়ও থাকিতেন না—আপন পূজাগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিতেন। তখন আর কোনও প্রকার লৌকিক ব্যবহারে কালক্ষেপ করিতেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া একবার কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিতেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় পূজা-গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বাররোধ পূর্বক সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া জগৎপ্রসূতি, কল্যাণময়ী আদ্যাশক্তির স্নেহশীতল অঙ্কে বিশ্রাম করিতেন। পরে আবার ঘর হইতে বহির্গত হইয়া যথাসময়ে প্রাতভ্রমণের জন্য গমন করিতেন। তখন তাঁহার দেহ পদ্ম-গন্ধে আমোদিত থাকিত! যে ঘরে বসিয়া সাধন করিতেন সে ঘরেও দিব্য কমল-গন্ধ সর্বদা বিরাজমান থাকিত। তাঁহার নিকটবর্তী সমগ্র বায়ুমণ্ডলটি যেন ফুটন্ত কমলের অলৌকিক সুবাসে আচ্ছন্ন থাকিত।

তাঁহার একজন ভক্ত তাঁহার এই সময়কার অবস্থা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যখন যাই, দেখি, প্রায় বালক-বালিকারা বাবাজীকে ঘেরিয়া আছে, আর তিনি নানা প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া তাহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন! সদাই আনন্দ। আমার চক্ষে বোধ হইতে লাগিল, যেন গুস্করা আনন্দের হাট। ঘাটে, মাঠে, বাজারে, দোকানে যেন, আনন্দের ছড়াছড়ি। তাঁহার থাকিবার ঘরে সর্বদাই পদ্ম-গন্ধ বিরাজ করিতেছে,—যেন তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ও আপন আপন পুষ্পসম্ভারসহ ছয় ঋতু সেখানে সদা বিরাজমান। বাবার অঙ্গ যেন সাধনা করিয়া লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই বিধাতা নিটোল করিয়া গড়িয়া ছিলেন। কোন কোন দিন দেখিতাম, তিনি রাত্রে দুই তিনবার ও দিনে দুই

তিনবার স্নান করিতেন। দারুণ শীতের মধ্যে গভীর রাত্রিতে হাতে লণ্ঠন লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। তিনি পুষ্করিণীর জলে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ডুবিয়া থাকিতেন—আমি শীতে জড়সড় হইয়া কাষ্ঠবৎ তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতাম। পরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তীরে উঠিতেন—বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন। আবার সাধনার ঘরে কবাট বন্ধ করিতেন, বাড়ি সুগন্ধে মাতিয়া উঠিত। আমি দ্বারের নিকটে তক্তাপোষে বসিয়া থাকিতাম। প্রাতঃকাল সাতটা বা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আর তাঁহার সঙ্গে প্রায় দেখা হইত না! কোন আজানা দেশে, কোন অজানা লোকের রসে মজিয়া অজানা প্রেমে বিভোর হইয়া প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের রাজার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন। প্রাতে যখন ঘরের কবাট খুলিয়া বাহির হইতেন, তখন মনে হইত, যে হৃদয়ের কবাটও খুলিয়া গিয়াছে, যেন বালকভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু ঢুলু-ঢুলু গাত্রময় গন্ধে ভরা, যেন তখনও আবেশের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই, যেন তখনও প্রাণ হইতে প্রাণময় সরিয়া যান নাই, পা তখনও চলিতে চায় না, মুখ ফুটিতে লজ্জা বোধ করিতেছে—যেন এতক্ষণ প্রাণে, মন মনে, হাত হাতে, পা পায়ে, চক্ষু রূপসাগরে ডুবিয়া মিশিয়া গিয়াছিল—এই বাহ্যজগতের সহিত তাহারা সকলেই সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া প্রাণপতি বিশ্বনাথের সেবায় নিযুক্ত ছিল। শিক্ষা দিতেন—এমনিভাবে দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত আরাধনা করিতে না পারিলে ভগবৎ প্রেমে প্রেমিক হওয়া যায় না,—পুরুষের সহিত প্রকৃতির, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার, ভগবানের সহিত ভক্তের, মিলন হইতে পারে না, জীবভাব শিবভাবে পরিণতি লাভ করে না।

অচেনা

আচ্ছন্ন

"বাহিরে আসিয়া বসিতেন, কেহ পাখা লইয়া বাতাস করিত, কেহ বা পাদ-সংবাহন করিত। তখনও নেশার ঘোর কাটে নাই, তখনও মন যেন অজানা রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া আসে নাই প্রায় দেখিতাম—বাহ্যভাব আসিতে এবং কথা কহিতে বহু বিলম্ব হইত।"

"তখন কাছারীর বারান্দায় রোগী, সাধু, গৃহী, বালক, বৃদ্ধ ভোগী, যোগীর সম্মিলন হইয়াছে। সকলের মনঃ ও চক্ষুঃ সেই এক মহাপুরুষের উপর পতিত। তখন মধুরকণ্ঠে সকলের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—'কি গো, কেমন আছ সব?'

"যেন কল্পতরু, সংসার-তাপে ঝালাপালা হইয়া কল্পতরুর ছায়ায় বসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য বদ্ধ জীব, বিষয়াসক্ত জীব, তাঁহার নিকট আসিত। কেহ 'ঔষধ দাও' কেহ বাবা, আমার গতি কি হবে', কে বা পুত্রশোকে কাতর হইয়া, "বাবা, আমাকে শান্তির উপায় বলে দাও', বলিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ধরিত। কেহ কাপড় চাহিত, কেহ আবার বাবাজীর সহিত নির্জ্জনে সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত। কোন কোন লোক হাতে ফল-ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, বালক-বালিকারা প্রসাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিত। যে যাহা চাহিত তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া শান্ত করিতেন।"

সকলে বিদায় হইলে একটি হাত-কাটা জামা পরিয়া পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিতেন—আসিয়া পূর্ব্বদ্বারী ঘরের কোণে নিজের কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ দান করিতেন। মধ্যাহ্নে ভোজনোত্তর নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। শাস্ত্রের গূঢ় ও জটিল রহস্য সকল ব্যাখ্যা করিয়া সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেন। বেলা একটা হইতে চারটা পর্যন্ত গুস্করা গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও প্রতিবেশী আসিতেন—যাহার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকিত, জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে সময় কাটিত। আবার সূর্যদেব অস্ত গমন করিবামাত্রই সায়ংকৃত্য সমাধান করিবার জন্য পূজা ঘরে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন।"

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইত। কিন্তু তাঁহার নিয়মভঙ্গ হইত না। তিনি কঠোর অধ্যবসায়শীল ছিলেন—কিছুতেই হতোদ্যম হইতেন না।

গুস্করাতে বাবাজীর গৃহে একটি বিষধর সর্প থাকিত। ক্রিয়া করিতে যখন শরীর ভীষণভাবে উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, তখন সর্পটিকে দেহে জড়াইয়া রাখিতেন। সর্পের শরীর অত্যন্ত শীতল—উহার স্পর্শে দেহ বেশ স্নিগ্ধ থাকিত। বাবাজী আদর করিয়া ইহাকে 'শিবদাস' বলিয়া ডাকিতেন। ইহা কখনই কাহারও অনিষ্ট করিত না। তবে ঘরে কোন লোক গেলে ফোঁস করিয়া উঠিত ভয় ভয় দেখাইত, কিন্তু দংশন করিত না। বাবাজীর অনুপস্থিতিতে একবার একজন নূতন সেবক ঘর পরিষ্কার

করিতে গিয়াছিল। সে বুঝিতে পারে নাই যে, ঘরে সাপ আছে। অপরিচিত লোকের শব্দ শুনিবামাত্রই সর্প গর্জন করিয়া উঠে। লোকটি দেখিয়াই ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পরে বাবাজী বাড়িতে ফিরিয়া তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন করেন। এরূপ ঘটনা কখনও কখনও ঘটিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একবার তাঁহার বিশ্বনাথ দর্শন করিবার জন্য মন উচাটন হয়। সকলকে বলিলেন—'বিশে ক্ষেপাকে দেখ্‌তে মন টানছে। চল একবার কাশী হইয়া আসি।' শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়—যাঁহাকে ভোলানাথ 'শ্বশুর' বলিয়া ডাকিতেন এবং যিনি ভোলানাথকে 'জামাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন—সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। বাবাজী সম্মত ছিলেন না। তবে তাঁহার পিতার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মোদক প্রভৃতি সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা কাশীধামে যথাসময়ে উপস্থিত হন। সেই সময় এলাহাবাদে কি একটা যোগ ছিল। সেখানে যাইবার জন্য বাবাজী মহাশয় প্রস্তাব করেন। তখন হঠাৎ চোঙ্গদার মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাপমান ১০৬° পর্যন্ত উঠিয়াছিল। এলাহাবাদে যাওয়ার আশা আপাততঃ সকলকেই ত্যাগ করিতে হইল। বাবাজী তখনও আসন হইতে উত্থিত হন নাই। তিনি জ্বরের বিষয় কিছুই জানিতেন না। তিনি উঠিলেই সকলে নিরাশ মনে বলিতে লাগিলেন—"প্রয়াগ যাওয়া বোধ হয় এবার হল না!' শুনিয়া বাবাজী বলিলেন—'তা কেন হবে না? যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা অবশ্যই করিব!' তখন তিনি নিজের পা দুখানি ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"আমি এই পা ছড়াইয়া দিলাম, যজ্ঞেশ্বরের মাথাটি আমার দুই পায়ের মধ্যস্থলে ধরিয়া রাখ।" তাহাই করা হইল। প্রায় ১৫ মিনিট রাখিতেই জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল, শরীর শীতল হইল। যজ্ঞেশ্বরবাবু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা অনেকটা প্রাপ্ত হইলেন। তখন সকলে প্রয়াগধামে যাইয়া ত্রিবেণী স্নান ও আনন্দোৎসবাদি সম্পন্ন করিলেন।

গুস্করায় অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু বাবাজীর পদসেবা করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জগৎ মিথ্যা, এ কথা কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা কি ঠিক?" বাবাজী বলিলেন—"কেহ কেহ জগৎকে মিথ্যা দেখে, কিন্তু যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, প্রজ্ঞা চক্ষু ফুটিয়াছে, তিনি

দেখেন, ঈশ্বরই সব হইয়াছেন।"

উ। আমাদের জ্ঞান হয় নাই। আমরা যাহা দেখি তাহার কি অস্তিত্ব নাই? তবে কেমন করিয়া জগতের সব দ্রব্যই চোখের উপর ভাসিতেছে? কিছু না থাকিলে কি কিছুর উদয় হয়?

বা।—ভ্রমবশতঃ অগত্যে সত্য প্রতীতি হয়! জ্ঞানে যাহা নাই, অজ্ঞানে তাহা থাকার মত দেখায়। ঐ যে জবাপুষ্প দেখিতেছে উহা তোমার চক্ষে জবা, কিন্তু বাস্তবিক কি উহা জবা?

উ।—কেন বাবা? এখনি তুলিয়া আনিয়া আমি আপনাকে দি। দেখুন, উহা জবা কি না।

বাবাজী কিঞ্চিৎ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন। "আচ্ছা, উপেন্দ্র, তোমার জবাফুল নিয়ে এস।"

উপেন্দ্রবাবু উঠিয়া জবা গাছের নিকট গেলেন। ফুল তুলিয়া দেখিলেন উহা জবা নহে গোলাপ ফুল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন—ছিল জবা, গোলাপ কি প্রকারে হইল? গাছটা তবে কি? দেখিলেন, গোলাপ গাছ। তিনি নিরুত্তর হইয়া গেলেন। তদবধি গাছটি গোলাপ গাছই রহিল। বাবাজী বলিলেন—"তোমার চক্ষে যে রঙ্গ আছে, তাহাই দেখিতেছ। ইহা গুণ-বৈষম্যের ফল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ চিত্ত-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে মায়িক জীবের চক্ষের উপর কর্ম্মরূপে বাহিরে প্রকাশ হইয়া কাহারও আনন্দদায়ক, কাহারও অতৃপ্তিকর হইতেছে। ইহাই গুণ-বৈষম্য।"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন—"এই যে আপনি রহিয়াছেন, ইহাও কি মিথ্যা?"

বলিতে বলিতে "আমার অস্তিত্ব কোথায়?" বলিয়া বাবাজী অদৃশ্য হইলেন। উপেন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান। কিছুক্ষণ পরে সদর দরজা হইয়া আবার আসিয়া বসিলেন। উপেন্দ্রবাবুকে তামাক সাজিতে বলিলেন—"বাবা, এক ব্রহ্মই সত্য। ঠিক ঠিক কাজ করিয়া যাও। সবই ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।"

কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বদ্বারী দরজার কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন ও উপেন্দ্রবাবুকে ভিতরে যাইতে বলিলেন। তিনি ঘরে গেলে

বসিতে বলিলেন। একটু পরেই একটি আশ্চর্য ঘটনা দেখাইলেন।

পৃথিবীর গতিও যে শক্তি জগতের সমস্ত দ্রব্যকে ঘুরাইতেছে—একস্থানে স্থিরভাবে থাকিতে দিতেছে না, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। এই অস্থিরের মধ্যে স্থির বস্তু কি প্রকারে উপলব্ধি করিতে হয়,—বোধ করিতে হয়—ও স্থিরের ভিতর চঞ্চলা প্রকৃতি কি গতিতে কর্ম্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য চালাইতেছেন, জড় চৈতন্যের সহবাসে কেমন করিয়া কার্য করে, ইহা ভাল করিয়া দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন।

উপেন্দ্রবাবু দেখিয়া অবাক্। তিনি এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মাথার ভিতর ধরিয়া রাখিতে রাখিতে বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নদীর খরতর স্রোতের ন্যায় শত শত বাধা-বিঘ্ন সেই ভাবকে তাড়াইবার জন্য তীরবেগে আসিতে লাগিল। বাবাজী তাঁহাকে বলিলেন—“বাবা, বিনা সাধনায় কি উহা আটক করিতে পারিবে? যাহা কঠোর তপস্যার ফল, তাহা কি সহজে ধরিয়া রাখা যায়? চিত্ত নির্ম্মল কর। উহা আপনিই আসিবে। অসদ্‌বৃত্তি এখন যেমন সরিতে চায় না, সদ্বৃত্তিও চিত্ত নির্মল হইলে তেমনই সরিবে না। চিত্ত বিকার নিম্নে ও নির্মল-চিত্ত ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। তুমি যাহাতে তোমার চিত্ত নির্মল রাখিতে পার তাহার চেষ্টা করিতে থাক।”

গুস্করার উত্তর-পশ্চিমে কুনুর নদীর ধারে একটি বটতলাতে একবার একজন সন্ন্যসী আসিয়াছিলেন। তিনি কখনও আপন আসন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেন না। লোকে সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার ফলমূল খাদ্যদ্রব্য দিয়া যাইত। কিন্তু তিনি কিছু খাইতেন না। তিনি মৌনী ছিলেন, সাধারণতঃ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না। বাবাজী মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতেন। শুনিয়াছি যে, তিনি বাবাজীর সতীর্থ ও সূর্য বিজ্ঞানাচার্য পরমহংস শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ স্বামী মহাশয়ের শিষ্য ধবলানন্দ স্বামী। একদিন রাত্রে গুস্করা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মোদক ও কালিদাস ঘটক মহাশয়দ্বয় বাবাজীকে সঙ্গে লইয়া পেপে, দুধ প্রভৃতি সহ সন্ন্যাসীটিকে দর্শন করিতে যাত্রা করেন। গুস্করা হইতে ঐ বটতলাতে যাইতে হইলে একটি পুল পার হইয়া যাইতে হয়। পুল হইতে ঐ বৃক্ষমূল প্রায় পাঁচ হাত দূরবর্তী ছিল। পুলের উপর হইতে বৃক্ষমূলে অবলোক

করিতেই দেখা গেল যে, বৃক্ষমূলে একটি জ্যোতিঃ একবার জ্বলিতেছে ও একবার নিভিতেছে। তাহার মধ্যে অবয়বাদি কিছু দেখতে পাওয়া গেল না। তাঁদের সঙ্গে একটি লণ্ঠন ছিল। হঠাৎ ঝট্‌কা বাতাস আসিয়া তাহা নিভিয়া গেল। বিনা আলোতে ঘোর অন্ধকারে যাইতে ভীত হইয়া কেদারবাবু বাবাজীকে ভয়ের কথা নিবেদন করিলেন। বাবাজী একটু হাসিয়া লণ্ঠনের দিকে একটু ফুৎকার করিবামাত্র লণ্ঠন আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বলেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তখন ক্রমশঃ ঐ সন্ন্যাসীর অঙ্গজ্যোতিঃ লুপ্ত হইল। সমীপে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া সন্ন্যাসী একটু অদ্ভুতভাবে হাস্য করিলেন। কেদারবাবু সমানীত ফলাদি সম্মুখে স্থাপন পূর্বক তাঁহাকে কিছু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীপ্রবর মস্তক সঞ্চালন পূর্বক হাস্য করিয়া বলিলেন—"যাবৎ চন্দ্র সূর্য আছে তাবৎ নহে।"

একবার বর্ষার অবসান কালে ১৭/১৮ জন সঙ্গী লইয়া বাবাজী গুস্করা হইতে কামাখ্যাধাম গমন করিতে উদ্যত হন। যথাসময়ে কামাখ্যাধামে উপস্থিত হইয়া ও স্বকীয় আবাসস্থান স্থির করিয়া স্থানীয় পাণ্ডাবর্গকে কুমারী ভোজনের জন্য কুমারী সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাণ্ডাগণ এ বিষয়ে নিজেদের অসমর্থ জ্ঞাপন করিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কামাখ্যাধামে সাধারণতঃ বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়া কুমারী ভোজন করান হয় না। যিনি কুমারী ভোজন করাইতে ইচ্ছা করেন তিনি দেবীর মন্দিরে বা তাদৃশ কোন স্থানে তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পাণ্ডাদিগের এ সকল কথা শুনিয়া বাবাজী নিরুৎসাহ হইলেন না এবং নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি বাড়িতেই কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন তাঁহার আদেশে লুচী প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইল। যথাসময়ে আহার্যসম্ভার যথাবিধি সুসজ্জিত হইল, কিন্তু তখনও একটি কুমারীরও দর্শন নাই। কালিদাস ঘটক, বিমলানন্দ প্রভৃতি বয়স্য ভাবাপন্ন ভক্তগণ বাবাজীকে পরিহাসচ্ছলে বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বাবাজী ধীরস্থির-গম্ভীরভাবে নিজের কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, একটি কুমারী অকস্মাৎ

সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিবামাত্রই ভক্তগণ সমাদর পূর্বক ডাকিয়া আনিয়া ভোজন করাইয়া দিলেন। কুমারী ভোজনান্তে যথাস্থানে চলিয়া গেল—পুনঃপুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও দক্ষিণা গ্রহণ করিল না। ইহার পরে বাবাজী পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্বকঃ শুদ্ধ সংযত বেশে জগদম্বার মন্দিরে যাইয়া ক্রিয়াতে নিবিষ্ট হইলেন। দুই ঘণ্টা কাল মন্দিরে মায়ের আরাধনায় অতিবাহিত করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তখন তাঁহার কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, দেহ স্বেদ-বারিতে নিষিক্ত, মুখে মৃদু ও প্রশান্ত হাস্য,—তাঁহাকে দেখিবামাত্রই উৎকণ্ঠিত ভক্তগণ উৎসাহসম্পন্ন হইয়া পড়িলেন। বাবাজী গৃহে ফিরিতে ফিরিতে চারিদিক্ হইতে অবিশ্রান্ত-বেগে কুমারী আসিতে লাগিল। দীর্ঘকাল এই প্রকারে সমাগত কুমারীদিগের সৎকার সম্বর্দ্ধনা করিয়া ভক্তগণ নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

একবার বাবাজী গুষ্করা হইতে বর্ধমানে আসিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। তখন উপেন্দ্রবাবু পুলিশবিভাগে সাব-ইন্সপেক্টরের কার্য করিতেন। সেই সময়ে সেখানকার পুলিশ সাহেব ছিলেন R. F. Guise। তিনি বড় দুর্দান্ত লোক ছিলেন। বাবাজী দুই একদিনের জন্য মাত্র সেখানে আসিয়াছিলেন। উপেন্দ্রবাবু তখন একজন উদ্যমশীল কর্মী ভক্ত—তিনি বাবাজীকে যারপরনাই যত্নসহকারে সেবা করিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে হঠাৎ একটি ত্রুটি হইয়া যায়। রাত্রে বাবাজীর পূজার ঘরে নৈবেদ্যাদির নিকটে ফুল রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাবাজী যখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্রিয়া করিতে বসিয়া গিয়াছেন তখন পূজাঘরের চারিদিকে অপূর্ব ও মনোহর পদ্মগন্ধে ভরিয়া গিয়াছিল। এই গন্ধ পাইয়া উপেন্দ্রবাবুর ফুলের কথা মনে পড়ে। তিনি সাজিতে করিয়া ফুল আনিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভুলের কথা মনে পড়ায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। আত্মগ্লানিতে মন অবসন্ন হইয়াছিল। প্রাতে আটটার সময় বাবাজী ঘরের কবাট খুলিলেন—কিন্তু লজ্জাবশতঃ উপেন্দ্রবাবু আজ দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন, ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস পান নাই। পরে বাবাজী যখন স্নেহপূর্ণস্বরে তাঁহাকে ঘরে যাইতে বলিলেন, তখন তিনি বুঝিতে

পারিলেন যে অপরাধের মার্জনা হইয়াছে। তিনি অমনি ঘরে গেলেন। যাইয়া দেখেন—শত শত পদ্ম পুষ্পে ঘর পরিপূর্ণ। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন পদ্মগন্ধের মধ্যে ভাসিতেছেন! তাহার উপর বাবাজীর গাত্র হইতে ভুরভুর করিয়া পদ্মগন্ধ, বাহির হইতেছিল। বাবাজী বলিলেন—"স্নান-জল বিতরণ করিলেন। নিজেও গ্রহণ করিলেন। তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। বাবাজী বলিলেন—"উপেন্দ্র, ফুল দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে?"

উপেন্দ্রবাবু—"হ্যাঁ বাবা, আমার অপরাধ হইয়াছে। ক্ষমা করুন।"

বাবাজী—"ছেলের আবার বাবার নিকটে অপরাধ কি আছে রে, বাপু? উপেন্দ্র, তুমি আজ যে ফুল আনাইয়াছিলে সে ফুলে পূজা হইত না। নতুবা আমি নিজেই চাহিয়া লইতাম। বাপু, পূজা করিতে বসিয়া দেখি, একটি পুষ্করিণীতে বড় বড় সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাই মনে করিলাম, আজ ঐ ফুল দিয়াই মায়ের পূজা করিব। তোমার ভুল নহে।" পরে বলিলেন—"আজ তোমাকে একটি আশ্চর্য ঘটনা দেখাইভ। আচ্ছা, শুনিয়াছি তোমার সাহেব নাকি তোমার উপর বড়ই বিরক্ত। তোমার অনিষ্ট চিন্তা করে। দেখ, তুমি আজ তোমার প্রমোশনের জন্য একটি দরখাস্ত লিখিয়া তাহার হাতে দাও ত।"

উপেন্দ্রবাবু—"বাবা, এমন কাজ কি করিয়া করিব? দরখাস্ত দিলে মারিতে আসিবে; আমি কাগজ লইয়া গেলে আমার মুখপানে তাকায় না। কাগজগুলি সম্মুখে ফেলিয়া দি, আর কাজ শেষ হইলে চলিয়া আসি।"

বাবাজী বলিলেন—"আচ্ছা, আজ না হয় আমার জন্য মার খাবে। দেখ না, কি হয়।" যথাসময়ে দরখাস্ত লিখিলেন, আপীসে যাইয়া কাগজ-পত্র ঠিক করিয়া লইলেন। দরখাস্তটিও সঙ্গে রাখিলেন। সাহেব ডাকিলেন, উপেন্দ্রবাবু নিকটে গেলেন, পাশে দাঁড়াইয়া এক এক করিয়া আপীসের কাগজ পেশ করিলেন। পরে 'জয় গুরু' বলিয়া দরখাস্তখানা সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন। অন্য কাগজ দিবার সময় সাহেব নীচের দিকে মুখ করিয়াই প্রত্যেক কাগজে হুকুম দিতেন। কিন্তু দরখাস্তের কাগজখানা দিবার পরে কাগজখানা না দেখিয়াই তাঁহার দিকে স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া কাগজখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—দুইবার পড়িলেন। তাহার পর দরখাস্তের উপর লিখিতে আরম্ভ করিলেন—"তোমার ডবল প্রমোশনের জন্য আমি কলিকাতায় বড় সাহেবকে লিখিলাম। যদি না দেয়, আমি শীঘ্রই যখন নিজে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া যাইব তখন সর্বাগ্রে তোমাকে প্রমোশন দিব।" উপেন্দ্রবাবু কাগজ গুটাইয়া লইয়া আপীসে আসিলেন। বাসায় ফিরিয়া সমস্ত ঘটনা বাবাজীকে নিবেদন করিলেন। বাবাজী বলিলেন—"নারায়ণ কি অবিচার করেন, বাবা? তাঁহার রাজ্যে অবিচার নাই। তিনি যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। জীব তাঁহার মহিমা কি বুঝিবে? জীব যাহা যাহা ইচ্ছা করে সেই সকল পাইলে কি রক্ষা ছিল, বাবা? তিনি না দিলে পাইবার উপায় নাই। তিনি যে সব সময়ে সব জিনিষ দেন না ইহা তাঁহার মঙ্গল বিধান। অন্ধ জীব তমোগুণে কর্ত্তা সাজিয়া বিশ্বপতির কার্য-কৌশল ভুলিয়া যায়। অহঙ্কারে বুদ্ধি কলুষিত করিয়া জীবের প্রজ্ঞা হরণ করে ও নশ্বর বিষয়-সুখ আস্বাদ করাইয়া করাইয়া তাহাকে কুপথগামী করে। সত্যের আদর চিরদিন। মিথ্যার প্রাধান্য সাময়িক হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না।"

নবম পরিচ্ছেদ

বাবাজী স্বীয় সতীর্থগণের মধ্যে বয়সে ন্যূন হইলেও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকর্ষে অনেকেরই নমস্য হইয়াছিলেন। একথা সকলেই অকপটভাবে স্বীকার করিতেন। মহাত্মা ভৃগুরাম স্বামীর বিশিষ্ট কৃপাভাজন হওয়া সাধারণ সৌভাগ্যের কথা নহে। তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা একদিন তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"সবই ত জান। বেশ আছ। তোমার ন্যায় যথার্থ পুরুষেরই সংসারে থাকা কর্তব্য। মহাত্মা মহাপুরুষ ভগবান্ পরমারাধ্য দাদাগুরুদেব শ্রীমদ্‌ভৃগুরাম পরমহংস দেব তোমার বিষয় কত যে বলিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তুমিই যথার্থ ভক্ত, মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানী, ত্যাগী ও গৃহী। অসীম সহ্যগুণ, অথচ ভোগী। দাদাগুরুদেব একদিন সকল যোগীকেই তোমার অসীম যোগের বিষয় দেখাইলেন। এখনও যে উগ্র তপস্যা করিতেছ তাহাও দেখাইলেন। ফিরে দেখি, কিছুই নাই—চকিতে অন্তর্হিত। দেহ কণ্টকিত হইল। পুনঃ দেখি, জগৎ নাই। একি খেলা ভাই? তাই জিজ্ঞাসা করি, জীবের অতীত বয়ঃক্রম হইল। অনেক ম্লেচ্ছ, হিন্দু, মুসলমান শিষ্য করিয়াছি। অনেক দেখিলাম, অনেক করিলাম। তোমার ন্যায় যোগশিক্ষা পরমারাধ্য ভৃগুরাম স্বামী আমায় দিলেন না। আমার ইচ্ছা, তোমার নিকট কিছুদিন থাকিয়া চাত্বর এবং যাগকল্প যোগ শিক্ষা করি? ইহাতে অভিপ্রায় কি? জীবে শিবে পার্থক্য নাই, তবু মানে না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে জীব যৌবনাবস্থাতে কাক-ক্রোধাদির অধীন হইয়া পাপ-পূণ্যত্মক বিবিধ কর্ম আচরণ করে। আহা, জীব দেহের ভোগার্থই কর্মজাল আচরণ করে। দেহ আত্মা হইতে বিভিন্ন। আত্মা ত কিছুই ভোগ করেন না। যদি করেন, তাহা হইলে পাপ-পুণ্যের ভাগী কে?"

বাবাজীর যোগমার্গে উন্নতি দেখিয়া ভৃগুরাম স্বামী সন্তোষপূর্বক তাঁহাকে একটি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন 'হরিহর' নামক বাণলিঙ্গ উপহার দিয়াছিলেন। এই বাণলিঙ্গটি এত অধিক তেজোবিশিষ্ট যে, সিদ্ধ ব্রহ্মচারী ও শক্তিশালী যোগী ভিন্ন অপর কেহ ইহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল স্থিরভাবে কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না। যোগমার্গে কে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই বাণলিঙ্গ দ্বারাই তাহার পরীক্ষা হইত।

এই লিঙ্গটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে দিনমানের বিভিন্ন সময়ে ইহাতে বিভিন্ন প্রকার বর্ণের বিকাশ হইত। শুধু তাহাই নহে—সাধক ইহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলে ইহার মধ্যে কত যে অপূর্ব ব্যাপারসকল দর্শন করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা সিদ্ধলিঙ্গ ছিল। সিদ্ধিলাভের সময় ইহা দীর্ঘকাল বাবাজীর মস্তকে রক্ষিত ছিল। পরে ইহা প্রত্যর্পণ করিবার সময় পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী তাঁহাকে চিরদিনের জন্য ইহা দান করিতে উদ্যত হন। তখন আশ্রমে একটি বিচিত্র কলরবের উদয় হয়। আশ্রমবাসী যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে এই লিঙ্গ আশ্রমের সাধারণ সম্পত্তি—বিশেষতঃ, ইহা দ্বারা যখন বহু সাধকের উপকার হইয়া থাকে, তখন ইহা আশ্রমেই রাখা উচিত, ব্যক্তিগত ভাবে একজনকে দান করা উচিত নহে। কিন্তু ভৃগুরাম স্বামী অতুল্য প্রতাপশালী—তিনি অন্যের মতামতে চালিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি একবার যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিবেনই। তিনি সমবেত যোগিবৃন্দকে বলিলেন—"আমি বিশুদ্ধানন্দকে এই বাণলিঙ্গটি দিতেছি বলিয়া তোমাদের এত বৈমনস্য হইবার কারণ কি? আমি ইহাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়াই দিতেছি। যদিও এ বাণলিঙ্গটি এখন হইতে আর এ আশ্রমে থাকিবে না বটে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের দুঃখিত হইবার কোন হেতু নাই। অদূর ভবিষ্যতে ইহা বঙ্গদেশে স্থানবিশেষ স্থাপিত হইবে। তখন যাঁহার ইচ্ছা সেখানে যাইয়া ইহার পূজাদি করিতে সমর্থ হইবেন। যোগীর পক্ষে দৈশিক ব্যবধান অকিঞ্চিৎকর।" এই বলিয়া তিনি স্বকীয় গুরুদেবের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে অভিবাদন পূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব, আমি আশ্রমের সিদ্ধ বাণলিঙ্গটিকে আজ কল্যাণভাজন বিশুদ্ধানন্দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি জানি, একমাত্র সে-ই এই অসাধারণ বস্তু ধারণের যোগ্য পাত্র। আপনি আশীর্বাদ পূর্বক ইহাতে সম্মতি দান করুন।" গুরুদেব হর্ষপ্রকাশ পূর্ব্ব আশীর্বাদ সহকারে সম্মতি দান করিলেন। বাবাজী এই বাণলিঙ্গটি প্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবের আদেশক্রমে পুনরায় নিজের মস্তাভ্যন্তরে স্থাপন করিলেন। শুধু ক্রিয়া ও পূজার সময়ে মস্ত হইতে মুখাদি কেন দ্বার অবলম্বনপূর্বক বাহির করিয়া

লইতেন। আবার ক্রিয়াবসানে উহাকে যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। এই লিঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন শিবলিঙ্গ তাঁহার ক্রিয়াকালীন প্রকাশমান তীব্র তেজোরাশি ধারণ করিতে সমর্থ হইত না। সে প্রকার চেষ্টাও অনেকবার হইয়াছে। ক্রিয়ার সময়ে সাধারণ কোন লিঙ্গের দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে গেলেই উহা ফাটিয়া চুরমার হইয়া যাইত।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরে পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী বাবাজীর জন্মস্থান বণ্ডুলগ্রামে ঐ বাণলিঙ্গটি স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য একটি মন্দির, আশ্রম ও গুহা নির্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। বাবাজীর ইহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল না। তিনি রেল লাইনের পার্শ্বে শক্তিগড় নামক স্থানে আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তবে গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া তিনি তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলেন। এই লিঙ্গ স্থাপনের ইতিহাস অতি বিচিত্র। কিন্তু এস্থলে তাহা প্রকাশিত করিবার প্রয়োজন নাই। এখন সে সময়ও সমাগত হয় নাই। যথাসময়ে বণ্ডুল গ্রাম বণ্ডুলেশ্বর নামে এই শিব স্থাপিত হইলেন। মন্দির, গুহাদি যথাবিধি আদেশানুসারেই নির্মিত হইয়াছিল। যে স্থানে মন্দির রচিত হইয়াছে, সেই স্থান খনন করিয়া ভুমধ্যে একটি প্রোথিত ত্রিশূল পাওয়া গিয়াছিল। পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী পূর্বেই এই বিষয়ে ইঙ্গিতে সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি বণ্ডুলেশ্বর স্থাপনের ফলে বণ্ডুল গ্রামের মাহাত্ম্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে বহু কথা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বণ্ডুলেশ্বরের মহিমা অবর্ণনীয়। যিনি কর্মী, তিনি কিছুক্ষণ তাঁহার নিকটে স্থিরভাবে বসিলেই তাঁহার অনুপম মাহাত্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। যোগ ও মন্ত্র সাধনার পক্ষে এরূপ অনুকুল স্থান অতি-বিরল।

বণ্ডুলেশ্বর প্রতিষ্ঠার পর হইতে বণ্ডুলে প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় খুব সমারোহের সহিত উৎসব সম্পন্ন হয়। দেশ-দেশান্তর হইতে ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী সমাগত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন। শঙ্কর ভগবানের মহিমা কীর্তনে ও নানাপ্রকার নির্দোষ আনন্দরসে অপূর্বভাবে সময়টি কাটিয়া যায়। ভক্তগণের পরস্পরের মিলন জন্য অনির্ব্বচনীয় সুবিমল আনন্দ এই মঙ্গলোৎসবের অবসরটিকে মণ্ডিত করিয়া রাখে।

গুষ্করাতেই বাবাজীর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এইখানে তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পূজিত হইতেন। গৃহী সন্ন্যাসী,

রোগী ভোগী ও যোগী—তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিত সেখানে এমন কোন লোকই ছিল না। এই স্থানে থাকিতে তাঁহার যে কত বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা পাওয়া যায় না। কত উপলক্ষ্যে কত জনে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে—কিন্তু পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বিরুদ্ধভাবে আসিয়া বিরোধ ভুলিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে, জীবনের চরম সিদ্ধি লাভের সোপান প্রাপ্ত হইয়াছে, ভগবান্ মঙ্গলময়, তাই যদি কেহ তাঁহাকে শত্রুভাবেও আরাধনা করে, তাহা হইলেও তাহার মঙ্গল হয়। তেমনি ভগবদ্‌ভক্ত প্রকৃত মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার সঙ্গগুণে অসাধু পুরুষও সাধুত্ব লাভ করে। কারণ, "মক্ষিকাও মরে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে।" অচিন্ত্য বস্তুশক্তির মহিমা তর্ক ও বিচারের অতীত।

তীর্থস্বামী অবস্থার পরে বাবাজীর অদ্ভুত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়া গুরুদেব অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন ও তাঁহাকে 'পরমহংস' উপাধিতে বিভূষিত করেন। আশ্রমে বিধান-মত তাঁহাকে পরীক্ষাও দিতে হইয়াছিল—পরীক্ষক ছিলেন স্বামী নীমানন্দ পরমহংস। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণ শুধু মঠের নিয়ম পালন মাত্র। দুধ ও জল একত্র মিলিত থাকিলেও হংস যেমন তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দুধকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা ও অনাত্মার বিবেক সাধন পূর্বক আত্মাভিনিবেশ পূর্ণ হইলেই যোগী হংসরূপে পরিগণিত হন। তারপর পরমাত্মার উপলব্ধি হইলে হংসভাবের উর্দ্ধে পরমহংস-ভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে। পরমহংস ভাব দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। এই অবস্থায় জাগতিক দ্বন্দ্বের উপশম ঘটে, নির্দ্বন্দ্ব অদ্বয় পদের প্রাপ্তি হয়। হংস অবস্থাতেই প্রকৃতির উপর স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। আত্মাভিমান একান্তভাবে বিগলিত হইলে ও জগৎস্বামীর সহিত নিজের যোগ প্রতিষ্ঠিত হইলে—অর্থাৎ পরমহংসাবস্থা লাভ করিলে—প্রকৃতি বস্তুতঃই আয়ত্ত এমন কি নিজের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তখন অভিমান থাকে না—একটি শুদ্ধ বোধ মাত্র থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ

পরমহংস উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসর পরে বাবাজী গুস্করা ত্যাগ করেন ও বর্দ্ধমানে রাণীগঞ্জ বাজারে বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইখানে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখানে থাকিবার সময় একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। একজন লোক, ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বাবাজীর সন্ধাগৃহে লুকাইয়া ছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, বাবাজী কি প্রকারে ক্রিয়া করেন তাহা স্বচক্ষে দেখা এবং ক্রিয়ার সময় কোন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে কিনা, তাহা জানিবার চেষ্টা করা। যিনি ঐ লোকটিকে এই কার্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে অধ্যাত্ম-জগতের ব্যাপার জানিতেন না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাবাজীকে পরীক্ষা করা ও তাঁহার সাধনা-প্রণালী অবগত হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। বাবাজী গৃহমধ্যে বায়ুর ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হন। যখন বাহ্যবায়ু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা স্তম্ভিত করিতেছিলেন, তখন গৃহস্থিত বায়ুমণ্ডল স্তিমিত হইতেছিল। যে লোকটি গৃহের একপ্রান্তে অজ্ঞাতভাবে আত্মগোপন করিয়াছিল, সে পূর্বোক্ত প্রকার বায়ু আকর্ষণের সময় শ্বাস-কষ্টে পীড়িত হইয়া 'বাবারে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারধ্বনি শুনিয়া বাবাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল! তিনি লোকটিকে দেখিয়াই অনুমানে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহাকে না বলিয়া বায়ুর সাম্য সম্পাদন পূর্বক তাহার জীবন রক্ষা করিলেন, তাহাকে তাহার অপকার্যের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"দেখ, এই প্রকারে কোন যোগীকে পরীক্ষা করিতে যাইও না। গেলে ভয়ানক বিপদে পতিত হইবে। আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম বলিয়াই তুমি বাঁচিয়া গেলে। নতুবা বাঁচিবার কোনই আশা ছিল না। সময় বিশেষে দেহ পর্যন্ত জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। যোগিগণ গুহ্যভাবে কখন্ কি কার্য করেন তাহা বাহ্য-জগতের পক্ষে জানিবার চেষ্টা করা অনুচিত। যদি তুমি দুর্বাসার ন্যায় প্রকৃতি-বিশিষ্ট যোগীর কোপভাজন হইতে, তাহা হইলে তোমার আজ সর্বনাশ হইয়া যাইত। যাও, এইরূপ কার্য আর কখনও করিও না।"

আর একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। পূজার ঘরের দ্বার ভোজন ছিল—ক্রিয়াতে বসিবার পূর্বে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি বাহির হইলেন না। অন্যান্য দিন যে সময়ে বাহির হইয়া থাকেন সে সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তবুও দ্বার খুলিল না। আশ্রমস্থিত ভক্তমণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কেহ মনে করিলেন, তিনি কোন গুরুত্র কার্যে হয়ত ব্যাপৃত আছেন। কেহ ভাবিলেন হয়ত তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে যোগপ্রভাবে দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন—আসিতে বিলম্ব হইবে। এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই ঘটিত। তিনি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া উপাসনা-গৃহে আসনে বসিয়া গিয়াছেন—ভিতর হইতে দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে। অথচ পরে সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি দূরদেশে কোন স্থানে যাইয়া কোন ভক্তকে দর্শন বা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। কখনও কখনও একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত হইতেন। যোগীর গতিবিধির সন্ধান রাখিবে কে? সেদিন রাত্রিবেলা গৃহদ্বার সময়মত খুলিল না দেখিয়া নানা জনে নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন শিষ্যা* অকস্মাৎ পূজাগৃহের দ্বারে যাইয়া আঘাত করেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল না, সুতরাং আঘাতমাত্রই খুলিয়া যায়! খুলিবামাত্রই গৃহাভ্যন্তরে যে দৃশ্য নয়নগোচর হইল তাহাতে শিষ্যটি বিস্মিতও চমকিত হইলেন। দেখিলেন, বাবাজী একটি ক্ষুদ্র শিশু হইয়া উত্তানভাবে শয়নপূর্বক নিজের পা নিজে চুষিতেছেন। বাঁকুড়া-অযোধ্যানিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল-এম এস, প্রভৃতি সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন।

বর্দ্ধমানে ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ফলিত জ্যোতিষের ব্যবসায় করিতেন। তিনি কখনও কখনও বাবাজীর নিকটে রাণীগঞ্জের বাড়িতে আসিতেন ও খানিকক্ষণ বসিয়া গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া যাইতেন। বাবাজী পৃথক্ আসনে বসিতেন। দর্শক ও ভক্তমণ্ডলীর জন্য পৃথক আসন নির্দিষ্ট ছিল। ক্ষেত্রবাবু নিজেকে অত্যন্ত গুণী বলিয়া জানিতেন। তিনি সাধারণ আসনে বসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। সম্ভবতঃ সেই জন্যই তিনি প্রথম দিন আসিয়া বাবাজীর

---

* ইনি আলীপুর কোর্টের Deputy Superintendent of Police শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দে মহাশয়ের পত্নী।

আসনের একদেশে উপেবশন করেন। প্রথম দিন বাবাজী কিছু বলেন নাই, কিন্তু পরদিনও যখন সেই প্রকার একাসনে বসিতে যান, তখন বাবাজী তাঁহাকে বসিতে নিষেধ করেন ও পৃথক্‌ভাবে স্থান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ক্ষেত্রবাবু নিষেধ বাক্য শুনিয়া নিজেকে অপমানিত মনে করেন ও বলেন—"আপনিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ। আমারও বহু যজমান ও শিষ্য আছে—সমাজে আমারও প্রতিষ্ঠা আছে। তদ্ব্যতীত, আমি বয়সেও প্রবীণ সুতরাং আমার প্রতি আপনার ব্যবহার অত্যন্ত অগৌরবজনক বলিয়াই আমার মনে হয়।" শুনিয়া বাবাজী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"বাঁড়ুয্যে মশায়, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে আপনি তাহা জানেন না। আপনি শুধু কুলক্রমাগত ব্রাহ্মণের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন। যদি নিজে যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন তবে সম্মানের জন্য এত লালায়িত হইতেন না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি কি কখনও সম্মানের প্রত্যাশা করেন? তিনি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন, অন্য গৌরব তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। ব্রাহ্মণ ইন্দ্রাদি দেবগণের পদকেও হীন মনে করেন। শাস্ত্রে আছে, স্বয়ং নারায়ণ ব্রাহ্মণের পদরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।" ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"আজকাল কি আর সে ব্রাহ্মণ আছে। সে কাল নাই, সে ব্রহ্মতেজঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে ব্রাহ্মণের নেত্র হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত, আজকাল কোন ব্রাহ্মণের সেই প্রকার ক্ষমতা আছে? বাবাজী বলিলেন,—"হাঁ, আপনি সত্য বলিয়াছেন। কালপ্রভাবে এখন শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দুর্লভ হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু এখনও একবারে লুপ্ত হন নাই। এখনও যিনি ব্রাহ্মণোচিত আচার ও সাধনার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ঐ প্রকার কত ক্ষমতার বিকাশ হইয়া থাকে। শুধু নেত্র কেন, ব্রাহ্মণের সব অঙ্গ হইতেই তেজঃ নির্গত হয়—ব্রাহ্মণের দেহ অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন। এই বলিয়া বাবাজী ক্ষেত্রবাবুর দিকে একটু আপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কি আশ্চর্য! দৃষ্টিপাতমাত্রই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চাদরটিতে আগুন লাগিয়া গেল। ভদ্রলোক চাদরটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন—কয়েক মিনিটের মধ্যে চাদরখানা দগ্ধ হইয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শুধু নয়ন-রশ্মি দ্বারা দূর হইতে বস্তুকে দগ্ধ করা—তিনি জীবনে এই প্রথম দেখিলেন। এবার তিনি বুঝিলেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণের ক্ষমতা কত অধিক।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দাদাগুরুদেবের আদেশে বর্ধমানে একটি আশ্রম নির্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে কিছু সময় আবশ্যক হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতটা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা ছিল, ততটা হয় নাই। বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন হইতে অনতিদূরে এই আশ্রমটি অবস্থিত। বাবাজীর গুরুদত্ত নামানুসারে ইহা 'বিশুদ্ধাশ্রম'' নামে পরিচিত। আশ্রম নির্মিত হইবার পরেই তাহার পরিচালনার জন্য দাদাগুরুদেব কতকগুলি নিয়ম বন্ধন করিয়া দেন।

আশ্রম এখনও সেই নিয়মানুসারেই পরিচালিত হইতেছে। সাধারণের অবগতির জন্য ঐ নিয়মাবলী হইতে নিম্নে কয়েকটি নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। যথা—

(ক) শিষ্যগণ যোগকর্মে অবহেলা না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং যখন তাহাদের যে বিষয় জানিতে বা দেখিতে ইচ্ছা হইবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দেখাইয়া বা বলিয়া দিবে। ঠিক অধিকারী না হইলে দেখাইবে না, বুঝাইবে দিবে।

(খ) শিষ্যগণের সহিত যোগ বা শাস্ত্র ও গোপনীয় কোন বিষয় কথোপকথন হইলে সেখানে যেন অন্য কেহ না থাকে এমন কি, উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অন্য শিষ্যকেও থাকিতে দিবে না। গুহ্যবিষয় ব্যক্ত হইলে সমূহ ক্ষতি জানিবে।

(গ) বিষয়-কার্য্য বা বিষয় সম্বন্ধে কোন কার্য লইয়া আশ্রমে কেহ না আইসে বা না থাকে।

(ঘ) তুমি যোগ-জ্যোতিষদ্বারা কাহারও সম্বন্ধে কোন বিষয় দেখিবে না, বা বলিবে না। এমন কি তোমার আত্মীয়দিগের সম্বন্ধেও দেখিবে না, বা বলিবে না। যদ্যপি দেখ বা বল, তাহা হইলে তোমার সমস্ত ক্রিয়া ধ্বংস হইবে।

(ঙ) কাহারও কোন ব্যধি বা কোন সম্বন্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা কার্য করিবে না। করিলে তোমার ক্রিয়ার ধ্বংসের কারণ জানিবে।

(চ) আশ্রমে আসিয়া কোন সন্ন্যাসী, যোগী, বৈষ্ণব, ভৈরবী,

ব্রহ্মচারী—যাঁহারা কর্ম্মী হইবেন তাঁহারা যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পাইবেন। তাঁহাদের বিষয় সকলেই লক্ষ্য রাখিবে। কর্মী বা যথার্থ ভক্ত না হইলে আশ্রমে থাকিতে পাইবে না।

(ছ) কোন স্ত্রীলোক সহসা আশ্রমে আসিতে পাইবে না। আসিলে আশ্রমে থাকিতে পাইবে না। শিষ্যগণের স্ত্রী প্রভৃতি সকল সময়ে আসিতে পাইবে, কিন্তু নিকটস্থ এক প্রহর ও দূরস্থ এক দিবস থাকিতে পাইবে। একমাস হইতে ছয় বৎসর পর্যন্ত পুত্র, কন্যা লইয়া কেহ আশ্রমে আসিতে পাইবে না। যদি আইসে, অন্যত্র সন্তান রাখিয়া আসিবে এবং তৎক্ষণাৎ যাইবে।

(জ) আশ্রমে অপরিচিত ব্যক্তি বা স্ত্রীলোক আসিলে রাত্রে থাকিতে দিবে না।

এই সকল নিয়ম শ্রীমদ্ ভৃগুরাম পরমহংস দেবের বিদান। ভাল করিয়া নিয়মগুলি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আশ্রমের উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে ইহারা কতটা উপযোগী। আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে, আশ্রম-প্রতিষ্ঠা এবং বাবাজীকে গুস্করা ছাড়াইতে আনিয়া আশ্রমে স্থাপিত করার কোন বিশেষ সার্থকতা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এক ভাবে ভাবিত ও এক পথের পথিক সাধকগণ যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের আনুকূল্য সম্পাদন পূর্বক জীবনের পথে চলিতে পারে, তাহার সহায়তার জন্য আশ্রমের উপযোগিতা আছে। আশ্রম একটি কেন্দ্রস্বরূপ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া সম্প্রদায়-বিশেষের অধ্যাত্নরাজ্য গঠিত ও ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে, ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্যদেশে, ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি কথা—যে সকল শিষ্য যথার্থ কর্মী, তাহাদিগকে সময় বিশেষে সঙ্গে রাখিয়া অনেক গুহ্যতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে হয় ও ভাল অধিকারী হইলে সংশয় নিরসনের জন্য অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। অবস্থা অনুসারে ব্যষ্টিভাবে কিংবা সমষ্টিভাবে এইরূপে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা আছে। অথচ ধর্মের অন্তরঙ্গ তত্ত্ব সকল বাহ্য-জগতের নিকট প্রকাশিত করাও উচিত নহে। তাহাতে নানা প্রকারে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

সুতরাং বহু শিষ্যের অবস্থানোপযোগী একটি কেন্দ্র স্থাপন ব্যতিরেকে এইরূপ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। বর্দ্ধমানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইহা একটি প্রধান কারণ। উপরি লিখিত (ক) (খ) ও (গ) নিয়ম এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

যোগলব্ধ অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ লৌকিক কার্য-সাধনের জন্য নিষিদ্ধ; শাস্ত্রেও তাহার ভুরি ভুরি নিষেধ আছে। একবার তীব্রভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিতে অনেক সময় আবশ্যক হয়। দেহ বিকারশীল, ব্যাধিসঙ্কুল—তাহার ব্যাধি নিবৃত্তির জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ অবৈধ। ইচ্ছাশক্তির অসাধ্য কোন কার্য নাই—সৃষ্টি ও সংহার পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে ইহার দ্বারা সম্ভবপর হয়। যোগীর ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে এমন ক্ষমতা ত্রিভুবনে কাহারও নাই। যোগীর রোগ প্রতিকার ইচ্ছাশক্তির পক্ষে নিমেষমাত্রেরও কার্য নহে। কিন্তু এই সব কার্যের জন্য ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নহে। (ঙ) চিহ্নিত নিয়মে স্পষ্টভাবে লৌকিক কার্যের জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ নিষেধ করা হইয়াছে।* যোগজ্যোতিষ, ইচ্ছাশক্তি, দেবজ্যোতিষ,

---

*এই সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক প্রকার শঙ্কার উদয় হইতে পারে। সুতরাং সংক্ষেপতঃ এখানে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে—তবে কি যোগিগণ লৌকিক কার্যের জন্য ইচ্ছা প্রয়োগ করেন না? ঋষি ও মহাপুরুষগণের জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের জীবন অলৌকিক ঘটনাতে পরিপূর্ণ। এইসব ঘটনা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। স্থলবিশেষে সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কারণ বশতঃ মহাপুরুষগণের জীবনচরিত বিকৃত হইয়া থাকিলেও সর্বত্রই যে তাহা হয়িয়াছে তাহা মনে করিবার হেতু দেখিতে পাওবা যায় না। সুতরাং এই সকল ঘটনার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের আশঙ্কা অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা নহে। যিনি প্রকৃত যোগী, যিনি ঐশী ইচ্ছার সহিত নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সংগত করিয়া অভিমানরহিত হইয়াছেন, তিনি কখৰই স্বার্থসাধনের জন্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না। জ্ঞানী কখৰও পরমার্থের হানি করিয়া স্বার্থের আকর্ষণে সময়েই পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকেন। তখন তাঁহাদের পৃথক ইচ্ছা থাকে না। সেই অবস্থায় যদি তাঁহাদিগের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়, তবে উহা ঐশ্বরিক ইচ্ছা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। উহার জন্য

মন্ত্রশক্তি কিংবা অন্যান্য যে সকল অলৌকিক শক্তি আছে, তাহাদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। তবে গুরুদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে প্রয়োগের কোন প্রতিবন্ধক নাই। অন্যান্য নিয়মের উদ্দেশ্য—আশ্রমের শৃঙ্খলা স্থাপন, বিশুদ্ধি সংরক্ষণ ও বৈষয়িক ভাবের নিয়ন্ত্রণ। আশ্রমে বিষয়-চর্চা করা কিংবা বৈষয়িক কার্য-সাধনের জন্য আশ্রমে আগমন করা আশ্রমের মূল নীতির বিরুদ্ধ। দেবগৃহে যেমন শুদ্ধ ও পূত না হইয়া প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, আশ্রমেও তেমনই বৈষয়িক ভাব যথাশক্তি মনঃ হইতে পরিহার না করিয়া প্রবেশ অসঙ্গত তাহাতে স্থানের প্রভাব মলিন হইয়া যায়।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী রচিত হইল। আশ্রমের কার্যও যথাবিধি চলিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্বে বণ্ডুলাশ্রম স্থাপনের পরে পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী লিখিয়াছিলেন,—"আশ্রমের অধিকারী তুমি নও, তোমার শিষ্যেরা।" বর্ধমানাশ্রমের সম্বন্ধেও ঐ আদেশ অপরিবর্ত্তিত রহিল। বাবাজী নিষ্কাম ও মমসত্ববর্জিত হইয়া আশ্রমের অধিষ্ঠাতা হইলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তিনি কোনদিনই লেশমাত্র কাতর হন নাই। যখন তাঁহার জননী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরলোক গমন করেন, তখনও তিনি ধৈর্য্য, সংযম ও চিত্তের

তাঁহাদিগের নৈতিক দায়িত্ব নাই। কারণ ঐ অবস্থায় তাঁহারা ঐশ্বরিক সত্তার সহিত অভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত। কিন্তু যখন তাঁহারা যুক্ত অবস্থায় না থাকিয়া যুঞ্জান অবস্থায় থাকেন তখন অবশ্যই ক্ষীণ হইলেও ব্যক্তিগণ ইচ্ছার উন্মেষ সম্ভবপর। উপরি লিখিত (ঙ) চিহ্নিত নিয়ম এই অবস্থার জন্য উদ্দিষ্ট বুঝিতে হইবে। বিধি-নিষেধ মাত্রই তাহাই। ইচ্ছা কামনা বিশেষ। ইহা যেমন অধ্যাত্ম জগতের সর্বপ্রধান মিত্র, তেমনই সর্বপ্রধান শত্রুও বটে। পরমার্থের জন্য কামনা সকল প্রকার মঙ্গলের নিদান, বিষয় কামনা যাবতীয় অনর্থের প্রসূতি। পরমার্থ ভিন্ন যাহা কিছু সবই স্বার্থ। ইহাই বিষয়। বিষয়-কামনা উৎপন্ন হইলেই চিত্ত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, বিষয়ের কিছু অংশ তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে—ফলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু আত্মকামনার ফলে চিত্তের বিক্ষেপ দূরীভূত হয়, একাগ্রতা সম্পন্ন হয়, অবশেষে চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়।

উপশম হইতে মুহূর্তের জন্যও চ্যুত হন নাই। এ প্রকার অদ্ভুত আত্মসংযম অতি বিরল। শাস্ত্র বলেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ, অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে শোক অভিভূত করিতে পারে না, তিনি শোক-মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চিরানন্দ ও পরমা শান্তি উপভোগ করে। জীবন ও মরণ যাঁহার দৃষ্টিতে তুল্যমূল্য, তিনিই জীবন ও মরণের ঊর্দ্ধে শাশ্বতধামে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী লিখিয়াছেন—"সকলেই ক্রিয়া করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে। কেহ মরে না, কেহ বাঁচে না—মরা-বাঁচা স্থূলের খেলা।" তাই জ্ঞানী কখনও স্থূলের খেলায় মোহিত হন না।

বর্ধমানে 'বিশুদ্ধাশ্রম' প্রতিষ্ঠার পরে শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বহু স্থানে তদ্রূপ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে,—ঝালদার 'বিশুদ্ধনিবাস' পুরীক্ষেত্রে 'বিশুদ্ধানন্দ-ধাম' ও বারাণসীতে 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা, বৈদ্যনাথ ধাম, ধানবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে আশ্রম না হইলেও তাঁহার অনুরূপ আবাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে নিকটবর্তী ভক্ত ও জিজ্ঞাসুগণ তাঁহার নিকটে একত্র সম্মিলিত হইতে পারেন*

---

*ঝালদা মানভূম জেলার অন্তর্গত ও পুরুলিয়া হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। B. N. R. নামক রেল লাইনে ঝালদা নামে একটি স্টেশন আছে। এখানকার স্থানীয় ভূস্বামী শ্রীযুক্ত উদ্ভবচন্দ্র সিংহ মহাশয় বাবাজীর একজন ভক্ত শিষ্য। তিনি ঝালদা আশ্রমটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পুরীধামে আশ্রমের নির্মাণ ও ব্যবস্থাদির সমস্ত ব্যয়ভার কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, বাবাজীর পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আশ্রমটি আর্মষ্ট্রঙ্গ রোডের উপরে পুরী জেলা-স্কুলের সন্নিকটে অবস্থিত। কাশীধামে দুইটি আশ্রম স্থাপিত করিয়া থাকেন। শিবরাত্রি একটি বিশিষ্ট উৎসব। অনেকেই এই সময়ের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভৃগুরাম স্বামী বলিয়াছেন যে, এই সময়ে তাঁহার হক্তির মহিমা শিষ্যবর্গের মধ্যে কেহ অবশ্যই অনুভব করিবেন। বস্তুতঃ তাহাই হইয়া থাকে। এই উৎসবের ন্যায় ব্যাপকভাবে না হইলেও বর্দ্ধমানে জন্মাষ্টমীর সময় বেশ সমারোহ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র উৎসব ও কুমারী-ভোজন প্রভৃতি নানা প্রকার নৈমিত্তিক উৎসব প্রতিমাসে এক.প্রকার লাগিয়াই আছে।

বর্দ্ধমান আশ্রমে শ্রীশ্রীগোপাল ও শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। বণ্ডুলাশ্রমে যেমন প্রতি বৎসর ঁশিবরাত্রির সময় বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই প্রকার বর্দ্ধমান আশ্রমেও হইয়া থাকে। ঐ উপলক্ষ্যে দূর ও নিকট নানাদেশ হইতে বহু ভক্ত এবং শিষ্য উৎসবে যথাবিধি যোগদান করিবার জন্য আশ্রমে উপস্থিত হইয়া থাকেন। বাবাজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাবতীয় ব্যবস্থা হয়। প্রথমটি গঙ্গার হনুমান্ ঘাট হইতে অদূরে দিলীপগঞ্জ নামক মহল্লায় অবস্থিত। বাবাজীর ভক্ত শিষ্য, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ঁসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে একটি বাড়ি খরিদ ও তাহাতে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই আশ্রমটি বাসোপযোগী করিয়া দেন। ইহার নাম বিশুদ্ধানন্দ কুটীর। দ্বিতীয়টি বেনারস ক্যান্টন্‌মেন্ট রেল-স্টেশনের সমীপে, মালদহিয়া মহলে একটি বাগানে অবস্থিত। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সম্মিলিত উদ্যোগে এই বৃহৎ বাগান ও আশ্রমটি ক্রীত ও নির্মিত হইয়াছে। ইহার নাম 'বিশুদ্ধানন্দ কানন।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ের যোগাশ্রমে যে প্রকার যোগ, বিজ্ঞান রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনার ব্যবস্থা আছে, বাবাজী তাহারই অনুকরণে লোকালয়ে ক্ষুদ্র ভাবে উহা প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেই জন্য কাশীধামের 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' নামক আশ্রমে একটি 'বিজ্ঞানমন্দির নির্মিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু মন্দিরের উর্দ্ধদেশে একটি নীলরক্তাদিবর্ণময় কাচের ক্ষুদ্র গৃহের আয়োজন এখনও চলিতেছে। এই কাচের গৃহ নির্মিত যথাবিধি সুসজ্জিত না হওয়া পর্যন্ত সূর্য-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানঘটিত প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে না। বহুসংখ্যক এক-ইঞ্চ-গভীর, সুবৃহৎ স্বচ্ছ ও রঞ্জিত কাচখণ্ড দ্বারা এই গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে। পরে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্রাদি ধাতুময় স্থূল ও সূক্ষ্ম তারের দ্বারা সমগ্র মন্দিরটিকে ব্যপ্ত করতে হইবে। কাচ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। আশা আছে, কাচ সংগৃহীত হইলেই অদূর ভবিষ্যতে মন্দিরের উদ্দিষ্ট কার্য আরব্ধ হইতে পারিবে।

যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান-জগতের শিরোমণি, যাহা অধিকার করিতে পারিলে জীব যাবতীয় অভাব হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া নিজের জন্মকালীন উপাদান, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রকৃতি, আমূল পরিবর্তনপূর্বক বিশুদ্ধ অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে, যাহা ভারতবর্ষের নিজস্ব হইলেও এখন দেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে, যাহা অতি দুষ্কর ক্লেশ স্বীকারপূর্বক দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকালের সাধনাদ্বারা তিনি সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় লুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি ইহা যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। এই বিদ্যার প্রভাবে জগতের ক্ষমতা অসাধারণ, এমন কি, অপরিসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাবাজী বলেন যে, যোগশাস্ত্রে এমন কোন অলৌকিক সিদ্ধির বর্ণনা নাই, যাহা অপেক্ষাকৃত সুগম উপায়ে এই বিজ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা না যাইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে, শিব-পুরাণাদি পৌরাণিক গ্রন্থে, তন্ত্র-শাস্ত্রে, বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রের যোগবিষয়ক গ্রন্থাদিতে, সুফী ও খ্রিস্টিয়

যোগিগণের গ্রন্থমালায়, এমন কোন ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই, যাহা সূর্য -বিজ্ঞানবিদের পক্ষে অলভ্য।

আমরা বর্তমান যুগে 'বিজ্ঞান' শব্দ সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, সূর্য-বিজ্ঞান ঠিক সে জাতীয় বিজ্ঞান নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলেই একজন পরম যোগী যিনি আধ্যাত্ম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পদে আরূঢ়, তিনি ইহার দিকে এতটা আকৃষ্ট হইতে পারিতেন না। 'বিজ্ঞান' বলিতে বাবাজী কি বুঝিয়া থাকেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্রের (গ্রন্থকারের নিকট লিখিত) উদ্ধৃত অংশ হইতে কতটা বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"বৎস, সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা। উক্ত ইচ্ছাময়ীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে সকল বিষয়েই বেশ জানা যায়। উক্ত ইচ্ছাময়ীর কৃপা ব্যতীত কোন বিষয়েই কাহারও বুঝিবার শক্তি হয় না। মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে কেন? শুদ্ধ স্বভাবের ভাব ও গুণের বিষয় জানিতে চেষ্টা করে ও অনেক জানিয়াছে, জানিয়া মায়া-জনিত দুষ্কর প্রলোভন হইতে নিস্তারের উপায় করিয়াছে ও করিতেছে বলিয়া। যাহাতে সম্পূর্ণ ত্রিতাপজনিত তাপ হইতে নিস্তার পায়, আর না হয়, এইরূপ চেষ্টাকেই সম্পাদ্যজ্ঞান বলে। ইহাও দুইভাগে বিভক্ত—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। যাঁর দ্বারা সৃষ্টি ও লয় হয়, তিনি কে, কেন এরূপ করিতেছেন ইত্যাদি জানার নাম জ্ঞান। ইহার পরাবস্থা,—সৃষ্টি লয় যিনি করেন তাঁহাকে যিনি করেছেন* ঘোররূপিণী মহাশক্তি ব্যোমাতীত, তাঁর বিষয় জানার নাম বিজ্ঞান। জগৎ মিথ্যা, এক তিনিই সত্য।" (পুরীধাম হইতে ২১ বৈশাখ, ১৩৩২ এ লিখিত পত্র।) তাঁহার অন্য একখানা পত্রে আছে—"বৎস, যাহা দেখিতেছ, তাহা মহাশক্তির ব্যাপার। সচরাচর মানবের চিন্তাশক্তি জড়ের অন্ধশক্তিতে অন্ধীভূত হইয়া বিবিধ ভাবে ভ্রমণ করে, মহাশক্তি-বিজ্ঞান-তত্ত্ব ধরিতে সক্ষম হয় না। সর্বব্যাপিণী শক্তিতে স্থূলতাবোধ যে ভুলের কথা ও তদ্দারা যে মহাশক্তির জ্ঞান সম্ভবে না,

---

*আর এক স্থলে বাবাজী লিখিয়াছিলেন—"যিনি সকলের মঙ্গলপ্রদ ও সকলের আধারে বর্তমান এবং জ্ঞান ও নির্বাণ মুক্তির মূল, তাঁহাকে যিনি প্রসব করিয়াছেন তিনি তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন, এই আমার ইষ্ট" (গুমো হইতে ২০শে মাঘ, ১৩৩৩এ লিখিত পত্র)।

এ বিষয়ে সহজেই জানা যায়। মহাশক্তি-জ্ঞান ও তাঁহার চিন্তা উভয়ই প্রবল যোগে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক পরিমিত পদার্থ কর্ত্তৃক চালিত নয়। উহাদের গ্রীতি মহাকাশভেদী একমাত্র মহাশক্তিতে। এই মহাবিজ্ঞান চিন্তার মধ্যবর্তী আর কেহ নাই। ইহা মহাশক্তির কৃপাতে ফুটিয়া উঠে। মানব-হৃদয়ে যদি সর্ষপ-সদৃশ স্থানে পবিত্রতা থাকে তাহা হইলে অখণ্ড মহামায়াকে বিশুদ্ধ ভাবে চিন্তার যে জ্ঞান, উক্ত জ্ঞানের উজ্জ্বলতেজে সকল প্রকার পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, আসক্তির আবর্জনা প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে মহাশক্তির জগৎশক্তির জ্ঞানামৃত প্রকাশ হইয়া কলুষিত সন্তপ্ত চিত্ত মহাআবরণ হইতে পরিত্রাণ পায়ই পায়। বাহ্যিক ব্যাপার সমস্ত ভুলিয়া যায়। মহামায়ার কৃপা বিজ্ঞান-বলে মহাশক্তির মহাতত্ত্ব স্থূল জগতে আনিতে পারে। সীমাশূন্য মহাশক্তির মহাবিজ্ঞান-আলোকে প্রাণে যে কি হয়—যার হইয়াছে সে-ই জানে। ভাষা নাই, ভাষা থাকিলে লিখিতাম। বেশ বুঝা যায়, যোগ ও বিজ্ঞান ব্যতীত এ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।" (৭ই ফাল্গুন, ১৩২৯, ৭নং কুণ্ডুরোড, ভবানীপুর কলিকাতা হইতে লিখিত।)

এই সকল পত্রাংশ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানের সারাংশই বিজ্ঞান। তত্ত্ববস্তুকে সামান্য ভাবে জানার নাম 'জ্ঞান', আর উহার অশেষ বিশেষ জানিয়া ইহা সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীন করার নাম 'বিজ্ঞান'। জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার তুরীয় ভূমি পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তুর্যাতীত মহাশক্তির স্বরূপ বুঝিতে হইলে, যিনি সকল তত্ত্বের অতীত হইয়াও পরম তত্ত্ব, তাঁহাকে ধরিতে হইলে, বিজ্ঞান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জ্ঞানীর চিত্ত ভগবতী মহামায়ার মায়াচক্রে পতিত হইয়া মোহাবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে পারে, এমন সম্ভাবনা আছে—কিন্তু জ্ঞান যখন বিজ্ঞানে পরিণত হয়, যখন এক পক্ষে শুদ্ধা ভক্তি ও অপর পক্ষে শুদ্ধা কৃপা উদিত হইয়া মহাশক্তির সুশীতল অঙ্কে ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। শিশু যখন জননীর হস্ত অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকে, কারণ দুর্বল শিশুর ক্লান্ত মুষ্টি স্খলিত হইতে কতক্ষণ লাগে? কিন্তু যখন জননী স্বয়ং শিশুকে করাবলম্বন দান করেন, নিজ

হস্তে শিশুকে ধরিয়া চালাইতে থাকেন, তখন আর ভয়ের কোনও কারণ থাকে না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ কতকটা এই প্রকার বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে জ্ঞান ও অজ্ঞান সমসূত্র হইয়া উভয়ই নিষ্প্রভতা প্রাপ্ত হয়। দ্বৈত ও অদ্বৈত, নিত্য ও অনিত্য, গতি ও স্থিতি সমাভাবে দর্শন করিতে হইলে, বিজ্ঞানই একমাত্র আশ্রয়। এই প্রসঙ্গে বাবাজীর আর একখানা পত্র হইতে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—"বৎস, সকল শক্তির মূল যে শক্তি তিনিই প্রথম ও শেষ, সকল বিষয়ে তাঁর প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি শক্তি সঙ্কোচ করিলে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ উপগ্রহ এবং বিচিত্র জগৎ, সকল দেব-দেবী,—যাহা কিছু আছে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না, আর দৃষ্ট হইবে না। একমাত্র পূর্ণ পরমানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী দ্বৈতাদ্বৈত, নিত্য ও অনিত্য লীলায় সুখ-দুঃখ, হা-হুতাশ, পিতা-পুত্র, সেবা-সেবক প্রভৃতি লইয়া মজার খেলা করিতেছেন। প্রয়োজন অপ্রয়োজন নিজেই জানেন। আর যে তাঁহার বিষয় লইয়া আলোচনা করে, সে-ই কিছু কিছু জানে। জীবাত্মা, স্বরূপ-আত্মা, পরমাত্মা, স্থূল-আত্মা, ভুল-আত্মা প্রভৃতি যাহা আছে, সবই মহাশক্তি মায়ের ভাব। এ ভিন্ন আর কিছুই বুঝা যায় না। বাবা, অসার যুক্তি-তর্কে ও কিছু পাওয়া যায় না—প্রত্যক্ষ জিনিসের আবার যুক্তিতর্ক কি? জগৎ-প্রসবিনী প্রত্যক্ষ মা-যোগে ব্রহ্মাতীত-মা-মহাভাবতত্ত্বের সারমর্ম ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ে সর্বদাই গ্রহণ কর, বাহ্যিক ভাবের ভিতরে টলিয়া না পড়িয়া সর্বদাই মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলেই সব হইবে।" (১৭ই চৈত্র, ১৩৩২, ২০ রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর হইতে লিখিত)।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের সহিতই সবিতৃতত্ত্বের ঘনিস্ঠ সম্বন্ধ আছে। সূর্যে সংযম করিলে যে ভুবন-জ্ঞান হয়, যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা যোগশাস্ত্রে আছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সূর্যই সকল পদার্থের প্রসব কর্ত্তা, মূল স্তম্ভ ও কেন্দ্র-স্বরূপ। সূর্যালোকেই পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থ প্রকাশমান হয়। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, সর্বদাই ও সর্বত্রই সৃষ্টির মধ্যে সূর্যই একমাত্র প্রকাশক। সূর্য হইতে যে তেজোদারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া যাইতেছে, তাহাকে সংযত করিয়া

একমুখে প্রবাহিত করিতে পারিলে সমগ্র জগৎ জ্ঞানহীন হইবে,—বাহ্যজ্ঞান, ভেদজ্ঞান—সব লুপ্ত হইয়া যাইবে। সূর্য-রশ্মির বিক্ষেপ হইতে জাগতিক জ্ঞানের উদ্ভব। যখন রশ্মির সংঘাত প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন জীবেরও বিক্ষিপ্ত জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া একাগ্রজ্ঞানের উদয় হইবে। তারপর সেই সংহত রশ্মি, সেই কেন্দ্রীকৃত ঘনীভূত প্রভা-রাশি, যখন সূর্যমণ্ডল ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকিবে, তখন প্রণবের আলোকে পরম-তত্ত্ব প্রকাশমান হইতে থাকিবে, প্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনী শক্তি আহতা ফণিনীর ন্যায় ঘোর নাদ সহকারে ব্রহ্মপথ অবলম্বনপূর্বক মহাব্যোম-রাজ্য ভেদা করিয়া ব্যোমাতীত মহাশক্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহাই বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ। যাহা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে হয়, ক্ষুদ্র দেহরূপ পিণ্ডেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে।

সূর্যকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের বিকাশ সূর্যালোকে দেহ-মধ্যস্থ ইড়ামার্গ-সঞ্চারী চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া স্নিগ্ধ অমৃত-ধারায় সমস্ত দেহকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে। পিঙ্গলাবর্তী সূর্য যখন ক্রিয়া-কৌশলে প্রবল তেজোময় রূপ ধারণ করে, তখন তাঁহারই সংস্পর্শে মধ্যশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া বাম পার্শ্বস্থ ইড়ামার্গে সঞ্চরণশীল চন্দ্রমাকে উগ্রভাবে পরিরত করে। ক্রমশঃ দক্ষিণশক্তি, মধ্যশক্তি ও বামশক্তি—তিনটি শক্তিই সমভাবে উত্তেজিত হয়। ত্রিকোণের তিনটি কোণই সমরূপে বিক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ তিন শক্তি সমষ্টিভূত হইয়া মধ্যস্থ ব্রহ্মবিন্দুকে আঘাত করিয়া জাগাইয়া দেয়—ইহাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ অথবা মন্ত্র চৈতন্যসম্পাদন। সুতরাং সূর্যের প্রবলতা দ্বারাই চন্দ্র-সূর্যের সাম্য স্থাপিত হয়,। পরিশেষে সুষম্নার সহিত অভেদ সম্পন্ন হয়। যখন এই তিনটি পৃথক্ স্রোতঃ এক খাতে পতিত হইয়া সামঞ্জস্য লাভ করে তখন স্বভাবতঃই অদ্বৈতমার্গ উন্মুক্ত হয় ও সেই মুক্ত আলোকে তত্ত্ববস্তুর দর্শন হয়। একাগ্র ভূমির অবসানে নিরোধ আয়ত্ত না হইলে, চিত্তবৃত্তির ঐকান্তিক নিবৃত্তি না হইলে, স্বয়ংপ্রকাশ বিজ্ঞা-তত্ত্বের স্ফুরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। মহাশক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একাগ্রভূমির জ্ঞানকে নিরুদ্ধ করিয়া পরিপূর্ণ বিজ্ঞান শক্তির আশ্রয় গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

তন্ত্রের মাতৃকাতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব গভীরভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ইহাতে সূর্য-বিজ্ঞানেরই রহস্য নিহিত রহিয়াছে। জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সর্ববিধ ব্যাপারেই মাতৃকা-মণ্ডলের ক্রিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষড়ধ্বার বিচার প্রসঙ্গে একদিকে পদ, মন্ত্র ও বর্ণ এবং অপরদিকে ভুবন-তত্ত্ব ও কলার পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বর্ণ ও কলা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিজাড়িত। শিব-শক্তির ন্যায় বাক্ ও অর্থ নিত্যসম্বদ্ধ। বস্তুতঃ অকারাদি বর্ণ-মালা শুদ্ধাবস্থায় বিক্ষুব্ধ সবিতৃবিন্দু হইতে নিঃসৃত নাদময় রশ্মিচক্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শব্দব্রহ্ম-রূপে হিরণ্যগর্ভ বা সবিতা কেন্দ্র-স্থলে, ব্যোমমধ্যে, এক ও অখণ্ড থাকিয়াও রাহ্যভাবে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর কম্পনে ঊনপঞ্চাশং বর্ণল বা রশ্মিরূপে বহির্গত হইতেছেন। এই পঞ্চাশং বর্ণই ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে অকারাদি-ক্ষকারান্ত বর্ণমালা বা অক্ষমালারূপে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ছয়টি চক্রের মধ্যে পঞ্চাশৎ দলে প্রকাশমান হইতেছে। এই বর্ণ বা নাদের তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে না পারিলে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার জন্মে না, কারণ "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।" শব্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি, আবার শব্দেই লয়—এমন কি, সৃষ্টি ও লয়ের অতীত, সঙ্কোচন -প্রসারণের উর্দ্ধস্থিত, অচ্যুত ব্রহ্মবিন্দুতেই যাইতে হইলেও মন্ত্ররূপী শব্দই কর্ণধার। দেবতাদির দেহও এই মন্ত্রময় জ্যোতিঃর দ্বারাই গঠিত। যন্ত্রাদির স্বরূপও তাহাই। শুদ্ধ বিদ্যার দ্বারা আত্মসংস্কার করিয়া এই বিদ্যাধামের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিলে, অর্থাৎ মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বরাদি পদ প্রাপ্ত হইলে, বর্ণ মালার উপর অধিকার জন্মে;—যখন সকল মন্ত্র ও দেবতা কিঙ্করবৎ তাঁহার অধীন হইয়া যায়। তিনি গুরুপদ-বাচ্য সদাশিবাবস্থা লাভ করেন। প্রণব ও ব্যাহৃতির রহস্য যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে বেদের এই বিন্দু ও নাদের সাধনাই দেশোচিত ও কালোচিত নানা আকারে অধিকারভেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। খ্রিস্টিয় মত, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য যোগ সিদ্ধান্ত, সুফী মত এবং অন্যান্য দেশের অন্তরঙ্গ সাধন-প্রণালী, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, সর্বত্র এই একই বিজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। অনধিকারী লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

প্রকৃতির সকল ব্যাপারই রঙ্গের খেলা—যে নির্লিপ্ত দর্শক, সে তটস্থভাবে দেখিতে পায় যে, একটি সর্বব্যাপক শুভ্রাসত্ত্বময় বর্ণের উপর নীলরক্তাদি অনন্ত প্রকার মিশ্র ও অমিশ্র বর্ণের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। ফলতঃ জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল রচিত হইতেছে, অজ্ঞানীর রঞ্জিত নেত্রে ঐ ইন্দ্রজাল বা মায়িক ব্যাপার সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। যতক্ষণ চক্ষুঃ হইতে বর্ণের আবেশ না কাটিবে, যতক্ষণ মোহ নিবৃত্ত না হইবে, ততক্ষণ মিথ্যাদর্শন কাটিবে না। যে শুভ্র ভিত্তির উপর এই অপরূপ মায়াচিত্র ক্রীয়া করিতেছে, তাহাকে যথার্থভাবে দেখিতে না পাইলে এই বিচিত্র জগদ্দর্শনে মোহিত হইতেই হইবে। বৈচিত্র্যের অন্তঃস্থিত সেই ব্যাপক ও অখণ্ড ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করিতে হইলে, চিত্তের ও তৎসহকারী ইন্দ্রিয়গণের মার্জনা আবশ্যক। যে সকল বাসনাত্মক চিত্র-বিচিত্র বর্ণরাশি অন্তদর্পণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া উহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। চিত্ত স্বয়ং শুভ্র হইলে শুভ্রসত্ত্বময় জগদাধারকে সহজেই দেখিতে পায় তখন মায়াবীর মায়া ধরিতে বিলম্ব হয় না।

বিজ্ঞানের উদেশ্যে, এই বিরাট ইন্দ্রজালের মূলসূত্র আবিষ্কার করা। বর্ণমালার সংযোগ ও বিয়োগ হইতেই জগতের যাবতীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। সৃষ্টি ও প্রলয় এই সংযোগ ও বিয়োগেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। বিজ্ঞানবিৎ কার্যমাত্রের উপাদান ও নিমিত্তের স্বরূপ বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া বিধাতার কলা-কৌশল সাক্ষাদ্‌ভাবে ধরিতে পারেন। এমন কি কিয়ৎপরিমাণে বিধাতার ঐশ্বর্য্যও আয়ত্ত করিতে পারেন। শুধু তাহাই নহে। ইচ্ছা করিলে বিধাতাকেও অতিক্রম করিয়া সর্বমূলভূতা অনাদি মহাশক্তির শ্রীচরণপর্যন্ত উপস্থিত হইতে পারেন। বিশ্বামিত্রের জগন্নির্মাণ, ভণ্ডাসুরের নবীন ও বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড-রচনা, সাধন-রাজ্যের ইতিহাসে অপ্রসিদ্ধ ঘটনা নহে।

গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে যেমন প্রথমে বর্ণপরিচয় আবশ্যক, তদন্তর বর্ণের সংযোজন প্রণালী শিখিতে পারা যায়, তদ্রূপ বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রথম সোপান বিশুদ্ধ রশ্মির সহিত পরিচয় স্থাপন। সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনানুসারে শুদ্ধবর্ণ চিনিয়া বাহির করিতে ও ধরিয়া

রাখিতে পারিলে, ভিন্ন ভিন্ন রশ্মির পরস্পর মিলনপদ্ধতি বুঝিতে পারা যায়। বেদান্ত শাস্ত্রে পঞ্চীকরণ ও উপনিষদাদিতে ত্রিবৃৎকরণ প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রিয়াকুশল মর্ম্মজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ ইহা বুঝিতে পারেন না। ইহা যে রশ্মি-সংযোজনেরই একটি অবস্থা মাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, এ বিষয়ে এখানে অধিক লেখা অনাবশ্যক।*

---

*'সূর্য-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে যথাশক্তি বিস্তারপূর্বক আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। তাহা পরবর্তী ভাগে হইবে বলিয়া এখানে স্থূলভাবে দুই চারিটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইলাম। বহু লোকেই বাবাজীর কৃপায় সূর্যবিজ্ঞানের নানা প্রকার প্রয়োগ দেখিয়াছেন। ইংরাজী বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় পাশ্চাত্য ও দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার আলোচনাও করিয়াছেন। কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়া সূর্য-বিজ্ঞানকে ইচ্ছাশক্তিরই অবস্থাভেদ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁহারা বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তি কাহাকে বলে তাহা জানেন না। ইচ্ছাশক্তিতে উপাদানের অপেক্ষা করিতে হয় না। সত্যসংকল্প যোগীর ইচ্ছামাত্রই নিমেষের মধ্যে কার্য উৎপন্ন হয়,—বাহ্য উপাদানের আকর্ষণ আবশ্যক হয় না। ইহা অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-বাদী বৈদান্তিকের সিদ্ধ বা অদ্বৈত ভূমির বহির্মুখ অবস্থা। উৎপলদেব বলিয়াছেন—"চিদাত্মা হি দেবোহন্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাদ বহিঃ। যোগীর নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ।" অভিনবগুপ্তপাদচার্য্য তাঁহার 'ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী'তে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ঈশ্বরসৃষ্টি ও যোগসৃষ্টি উভয়ই নিরুপাদান। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ তাহাতেই বিশ্বপ্রপঞ্চ অভিন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। ইচ্ছা-নিবন্ধন সেই অন্তঃস্থিত পদার্থ বাহিরে প্রকটিত হয় মাত্র। প্রচলিত ভাষায় ইহাকেই 'সৃষ্টি' বলে। সুতরাং সৃষ্টির জন্য আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন নাই। বেদান্ত সিদ্ধান্তও কিয়দংশে এই প্রকার। শুধু মায়ার স্থাননির্দেশে উভয়ে ভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকাদি আচার্যগণ উপাদানের পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সত্যসংকল্প যোগীর সংকল্পমাত্রেই সর্বগত পরমাণুমণ্ডল হইতে অভীষ্ট পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া দ্বাণুকাদি ক্রমে ঝটিতি সম্মিলিত হয় ও ইচ্ছানুরূপ কার্যের রচনা করে। বলা বাহুল্য, উভয় মতেই ইচ্ছাই সৃষ্টির মূল—তজ্জন্য জ্ঞানতঃ উপাদানের অপেক্ষা করিতে হয় না। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতে উপাদানকে প্রত্যক্ষভাবে চিনিয়া লইতে হয় ও তাহার সংযোগ-বিয়োগ প্রণালী যথাবিধি আয়ত্ত করিতে হয়। তদনন্তর যথাপ্রয়োজন কার্যে প্রবৃত্ত

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন দিলীপগঞ্জের আশ্রমে আমি বাবাজীকে কথা প্রসঙ্গে সৃষ্টি-তত্ত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তখন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। বাবাজী বলিলেন,—দুইটি জিনিষের সংঘর্ষ না হইলে কোন কার্য উৎপন্ন হয় না।

হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি জ্ঞানপূর্বক, যোগিসৃষ্টি ইচ্ছাপূর্বক। উভয় প্রণালীতে পার্থক্য এই—প্রথম প্রণালীতে জ্ঞান অঙ্গী ও ইচ্ছা তার অঙ্গস্বরূপ, দ্বিতীয়ে ইচ্ছাই অঙ্গী ও জ্ঞান অব্যক্ত ভাবে তাহার অঙ্গস্বরূপ, দ্বিতীয়ে ইচ্ছাই অঙ্গী ও জ্ঞান অব্যক্ত ভাবে তাহার অঙ্গরূপে বর্তমান। যাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ নহেন, অথচ যোগীও নহেন তাঁহারা উভয় প্রণালীর সূক্ষ্ম ভেদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। উভয় সৃষ্টিই ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক মাত্র নহে। সুতরাং এই অংশে উভয়ে কোন পার্থক্য নাই। Hailucination, Hypnotic Illusion প্রভৃতি স্বপ্নদৃশ্যবৎ প্রাতিভাসিক সৃষ্টির নিদর্শন। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেরূপ স্বপ্নান্তে বিলীন হইয়া যায়, Hullucination প্রভৃতিও তদ্রূপ। ইন্দ্রিয়াদির বিকার প্রশান্ত হইলে তাহারা আপনিই মিলাইয়া যায়। যতক্ষণ প্রতীতি থাকে, ততক্ষণই তাহাদের সত্তা। তাহারা ব্যবহারিক জগতের কার্যসাধনক্ষম হয় না। তাহাদিগকে "দৃষ্টি-সৃষ্টি" বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যোগি সৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি ঐ প্রকার অচিরস্থায়ী বা মিথ্যা নহে। উহা পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগতের ন্যায় তুচ্ছ হইলেও ব্যবহার ভূমিতে সম্পূর্ণ সত্য ও চিরস্থায়ী। জগতের অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থ যে প্রকার, উহাও ঠিক সেই প্রকার। সত্যাসত্য নির্ণয়ের যে সকল pragmatic test আছে তাহা দ্বারা বিচার করিলে উহা সত্য বলিয়াই মানিতে হইবে। "পঞ্চদর্শী' প্রভৃতি গ্রন্থে ঈশ্বরসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টিতে যে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি ও যোগিসৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। জীবের উপাধি মলিন সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ ও তমোমিশ্র সত্ত্ব। এই উপাধি হইতে যে সৃষ্টির উদয় হয় তাহা প্রাতিভাসিক, স্বপ্নদৃশ্যবৎ ভ্রান্তিজাল মাত্র। ইহা বন্ধনের হেতু। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্টি বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা ঈশ্বরোপাধি হইতে উদ্ভুত হয় বলিয়া ব্যবহারিক-সত্তা-সম্পন্ন—ইহাকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। পরমার্থদশাতে ব্যবহার-ভূমি অতিক্রান্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যবহারের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। যোগ ও বিজ্ঞান উভয় বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই যোগ ও বিজ্ঞান বলে যে পদার্থ নির্মিত হয় তাহা সত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

জগতে যে কোন বস্তু দেখিতে পাও, সব এই সংঘর্ষের ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের অংশ আছে—অণু-পরমাণুতে পর্যন্ত এই বিভাগ রহিয়াছে। যাহাতে প্রকৃতির ভাগ অধিক, পুরুষের অংশ অল্প, তাহাতে পুরুষভাব অভিভূত হইয়া থাকে, প্রকৃতিভাবে প্রাধান্য লাভ করে। সেই প্রকার পুরুষাংশের প্রাধান্যবশতঃ পুরুষভাবের বিকাশ হয়। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দুইটি প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ হইতে জাত হয় বলিয়া এই নিয়ম সর্বত্র বর্তমান।” বাবাজীর আসনে একটি গোলাপ ফুল পড়িয়া ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“বাবা, এই গোপাল ফুলটি স্ত্রী কি পুরুষ? ইহাতে প্রকৃতির অংশ অধিক আছে, কি পুরুষের অংশ অধিক আছে।” তিনি গোলাপ ফুলটিকে হাতে লইয়া একবার তাকাইয়া দেখিলেন। পরে বলিলেন যে, এটি স্ত্রী-পুষ্প এবং স্ত্রীর লক্ষণাদি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—“একটি পুরুষ গোলাপ আনিতে পার কি? তাহা হইলে একটি ব্যাপার দেখাইয়া বুঝাইয়া দিব।” সেখানে অন্য ফুল ছিল না। তখন অপরাহ্ণ ভ্রমণের জন্য বাহির হইবার সময় হইয়াছিল। আমি বলিলাম—“এখানে ত আর অন্য গোলাপ নাই। আপনি যদি আদেশ করেন তাহা হইলে বাহিরে যাইয়া আনিতে পারি।” তিনি বলিলেন—“থাক্—প্রয়োজন নাই। তুমি এই গোলাপ ফুলটির পাঁপড়িগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া ফেল। তারপর ওটি আমাকে দাও।” আমি তাহাই করিলাম। বাবাজী দলহীন পুষ্পটিকে হাত লইয়া দুই একবার ঊর্দ্ধাধঃ সঞ্চালন করিলেন, বলিলেন,—“সূর্যরশ্মি অবলম্বনে পুং-গোলাপের বীজ আকর্ষণ করিয়া পুষ্পটির গর্ভাধান করিলাম। এখন এইটিকে একটি ক্ষুদ্র কোমল আবরণের মধ্যে অথবা তোমার মুষ্টির অভ্যন্তরে কয়েক মিনিট আবদ্ধ করিয়া রাখ। বাহিরের শীতবায়ু যেন ইহাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিতে না পারে। দেখিবে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি অভিনব, বৃহদাকার ও অত্যন্ত সুগন্ধি গোলাপের সৃষ্টি হইবে।” দলহীন ফুলটিকে আমি নিজের মুষ্টিমধ্যে রাখিলাম ও মাঝে মাঝে একটু একটু করে খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই দেখিতে পাওয়া গেল যে, একটি অতি বৃহৎ গোলাপফুল নির্মিত হইয়াছে—ইহা আয়তনে ছিন্ন

পুষ্পটির দ্বিগুণ হইবে। বর্ণ ও গন্ধেও উভয়ে অনেকটা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“বাবা, যোগশাস্ত্রে আছে যে, প্রকৃতি বা উপাদানের অপূরণ—অনুপ্রবেশেবশতঃ একজাতীয় পদার্থ অন্যজাতীয় পদার্থে পরিণত হয় (জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রাকৃত্যাপূরাৎ’)। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? তিনি বলিলেন—“হাঁ, তা হইতে পারে। জগতের সকল পদার্থেই সকল পদার্থের উপাদান আছে। এই যে গোলাপ ফুলটি দেখিতেছ, ইহাতে না আছে এমন কোন পদার্থ এ জগতে নাই। তবে গোলাপের উপাদান ইহাতে অধিকমাত্রায় আছে এবং অন্যান্য উপাদান অল্প মাত্রায় আছে, সেইজন্য হাতে গোলাপের প্রাধান্যবশতঃ তাহারই ক্রিয়া লক্ষতি হয়। অন্যান্য উপাদানের সত্তা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু যিনি যোগী অথবা বিজ্ঞানবিৎ তাঁহার দৃষ্টিতে সবাই প্রতিভাত হয়। ইচ্ছা করিলেই তিনি ক্রিয়াকৌশলে যে কোন উপাদানকে বাহ্যজগৎ হইতে তাহার সজাতীয় উপাদান আকর্ষণ পূর্বক পুষ্ট করিতে পারেন। পূর্বে যাহা অব্যক্ত ছিল, তখন তাহা অভিব্যক্ত হইবে এবং যাহা অভিব্যক্ত ছিল তাহা ক্রমশঃ অব্যক্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে। এই প্রণালীতে জগতের যে কোন বস্তু যে কোন বস্তুতে পরিণত হইতে পারে। দেবভাব হইতে পশুভাব প্রাপ্তি আবার পশুভাব হইতে দেবভাব প্রাপ্তি—উভয়ই সম্ভবপর। প্রকৃতির গুণ-প্রধান ভাব হইতেই সৃষ্টির খেলা চলিতেছে। যে কোন বস্তুতে উপাদান গত আপেক্ষিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা অদৃশ্য ও অব্যক্ত হইয়া যাইবে।” এই বলিয়া তিনি পূর্বকথিত গোলাপটিকে একটি জবাফুলে পরিণত করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত জাত্যন্তর-পরিণাম বিজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন। এই ক্রম-পরিবর্তনের স্তরগুলি বেশ অনুধাবন করিয়া দেখিবার বিষয়।

আর একদিন অনুলোম ও বিলোম পরিণামের কথা উঠিয়াছিল। বাবাজী বলিলেন—“দেখ, উভয়বিধ পরিণামই সত্য। দুগ্ধ হইতে দধি হয়, দধি হইতে নবনীত ও নবনীত হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়। ঘৃতের মধ্যে দুগ্ধের উপাদান আত্মগোপন করিয়া বর্তমান থাকে। যিনি প্রকৃত কর্মী, তিনি ইচ্ছা করিলেই ঐ অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন উপাদনকে আশ্রয় করিয়া

বিলোমক্রমে ঘৃতকে পুনরায় দুগ্ধে, এমন কি তৃণরাশিতে পরিণত করিতে পারেন। বালকের মধ্যে বৃদ্ধভাব আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই বালককে দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থা জানিতে পারা যায়। তদ্রূপ বৃদ্ধের মধ্যেও বাল্যভাব নিহিত আছে। তাই বৃদ্ধকে দেখিয়াও তাহার ভূতাবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং পরিণামক্রমের দর্শন হইতেই স্বভাবের নিয়মে অতীতানাগত-জ্ঞান আপনিই উদিত হয়।'' এই বলিয়া একটি প্রস্ফুটিত গোলাপফুলকে তিনি অস্ফুট কোরকাকারে পরিণত করিলেন। পরে সেই কোরকটিকে মার্শেল নীলের কোরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ফুটাইয়া তুলিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পরে ঁপুরীধামে আশ্রমে বসিয়া আছি, বাবাজী আহ্নিক করিয়া আশ্রমের বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। দুই একটি ভক্ত পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন। তখন হঠাৎ চৈতন্যচরিতামৃতের একটি বচন আমার মনে পড়িল, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের বর্ণনা আছে "মৃগমদ নীলোৎপল'' ইত্যাদি) সেই স্থানটি স্মরণ-পথে উদিত হইল। বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—''বাবা, চৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকার অঙ্গ-গন্ধের বর্ণনা আছে তাহা কি স্নিগ্ধ?'' তিনি বলিলেন—''কি কি দ্রব্যের সংযোগে ঐ গন্ধের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া লেখা হইয়াছে? একটি একটি করিয়া উল্লেখ করিয়া যাও।'' আমি গোবিন্দ-লীলামৃতের মতানুসারে নীলপদ্ম, কস্তুরী প্রভৃতি দ্রব্যের নাম করিয়া যাইতে লাগিলাম। বাবাজী এক একটি নাম শুনিয়া হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যখন সবগুলি দ্রব্য উল্লিখিত হইল, তখন হস্তমুষ্টি আমার নিকটে ধরিয়া বলিলেন—''এই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের আঘ্রাণ গ্রহণ কর। যে যে জিনিসের নাম তুমি লইয়াছ, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই উপাদান আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি ও সম্মিলিত করিয়া দিয়াছি। দেখ, কেমন বোধ হয়।'' দেখিলাম, অপূর্ব দিব্যগন্ধে—জগতে তাহার তুলনা নাই। পরদিন একটি শিশি ভরিয়া ঐ অপূর্ব গন্ধ সূর্যরশ্মি দ্বারা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—''বাবা, এতগুলি বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ শুধু নাম শুনিবামাত্র আপনি কি প্রকারে আকর্ষণ করিয়া

লইলেন?” তিনি বলিলেন—“তাতে আর কষ্ট কি? যদি নিজের আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকে ও উপাদানের জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আর কঠিন কি আছে? যতদূর পর্যন্ত সূর্যরশ্মির বিস্তার আছে, ততদূরে যাহা কিছু থাকুক টানিয়া আনা যায়। বৃহৎ বৃহৎ স্থূল বস্তু পর্যন্ত বহু দূরদেশ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করা যায়। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। সমস্ত জগৎটা বিধাতার যে অপূর্ব কৌশলে চলিতেছে, তাহা তোমরা ধরিতে পার না। তাই তোমাদের নিকট এ সব আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। যখন শিখিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, একটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করাও কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে।”

আমি তাঁহাকে স্থানান্তর হইতে থার্মোমিটার আকর্ষণ ও প্রত্যার্পণ করিতে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। বহুমূল্য-হীরক, নানাবর্ণের মণি ও মুক্তানিচয়, সুবর্ণ সন্দেশ, রসগোল্লা, কুইনাইন টেবলেট, বায়োকেমিক ‘নেট্রম ফস’, নারিকেল তৈল, গব্যঘৃত, কার্বলিক অ্যাসিড, ফিনাইল, আঙ্গুর, বেদানা, কুঙ্কুম, কর্পূর, গ্রাফাইট প্রস্তর, ইউকিলাপ্টাস অয়েল, মহাশঙ্খ বটিকা, চ্যবনপ্রাশ, মকরধ্বজ, নানাজাতীয় পুষ্প ও ফল, অডিকোলন, ল্যাভেণ্ডার, মধু গ্রিমন্ট সিরাপ ইত্যাদি নানাপ্রকার পদার্থ নির্মাণ আমি বহুবার দেখিয়াছি। তুলা, ফুল ও পত্রাদিকে প্রস্তরে পরিণত করিতে দেখিয়াছি। দৃষ্টিদ্বারা পলকের মধ্যে সমগ্র পুষ্পোদ্যানের গন্ধরাশি আকর্ষণ করিয়া বস্তুবিশেষের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। স্থূল বস্তুর উপাদানভূত পরমাণুসমূহ কি প্রকারে পৃথক্ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও স্থূল বস্তুর বিনাশ হয়, তাহা দেখিয়াছি। তাঁহাকে সূর্য্যরশ্মি হইতে সচেতন জীব পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি,—মাছি, শতপদী ও চামচিকা আমার চোখের সম্মুখে নির্মিত হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তবে মনুষ্য সৃষ্টি এখনও সম্ভবপর হয় নাই। বাবাজী বিশ্বাস করেন যে, তেমনভাবে চেষ্টা করিলে হয়ত তাহাও চিরদিন অসম্ভব থাকিবে না। দীর্ঘকাল পরে আকর্ষণপূর্বক বিশিষ্ট পরমাণুসকলকে পরস্পর সংঘটিত করিয়া পূর্ব বস্তুর পুনরুৎপত্তি করিতে দেখিয়াছি। এই উপলক্ষ্যে তিনি বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে কোন জিনিষেরই বিনাশ হয় না। একখানা পুস্তক অগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মাৎ করিয়া ফেলিয়া দেশান্তরে ও

কালান্তরে যদি ঠিক সেই পুস্তকখানাই পুনরায় উৎপন্ন করা যায় এবং যদি উহা শুধু দৃষ্টিভ্রম না হইয়া স্থায়িবস্তু বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কোন বস্তুরই যে ঐকান্তিক বিনাশ হয় না, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। যদি গঙ্গার এক ঘাটে এক ঘটি দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল পরে অন্য ঘাটে জল হইতে বিশ্লেষণপূর্বক ঠিক সেই দুগ্ধই বাহির করিয়া দেখান যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন জিনিষেরই স্বরূপনিবৃত্তি কখনই হয় না। এইজন্যই জীব লোক-লোকান্তরে, এমন কি ব্রহ্মলোকে, গমন করিলেও ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানবিৎ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন।

চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি, কামাদি রিপু, জ্বরাদি রোগ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি ভাব—বিজ্ঞানের আলোকে সবই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য-বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে চন্দ্রবিজ্ঞাদি যাবতীয় বিজ্ঞান সহজেই বোধগম্য হয়। দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্তের বিরুদ্ধ তড়িৎ-শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষে, এমন কি, নখ-জ্যোতিঃর প্রভাবে পর্যন্ত সৃষ্টি হইতে পারে। চাক্ষুষ-জ্যোতিঃর দ্বারা, বায়ুর কম্পন হইতে, নক্ষত্রের আলোকে—এমন কি, মানসিক স্পন্দন হইতেও সৃষ্টির প্রবাহ ধরিতে পারা যায়। সৌর-বিজ্ঞান শিখিলে এ সকল বিশেষভাবে পৃথক্ করিয়া শিখিবার প্রয়োজন হয় না।

কাশীধামস্থ আশ্রমে বিজ্ঞানশালা ব্যতিরেকে আর দুইটি মন্দির এস্থলে উল্লেখযোগ্য। একটি শিবমন্দির ও অপরটি গোলাপ-মন্দির। শিবমন্দিরে বৃহৎ গৌরীপট্টের উপর অষ্টোত্তরশত বাণলিঙ্গ স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। গোলাপ-মন্দিরে শ্রীশ্রীগোপালজীর পদচিহ্ন স্থাপিত হইবে।

এই পদচিহ্নের একটু ইতিহাসে আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে পুরীধামের আশ্রমে বাবাজীর রিক্ত আসনের উপর প্রাতঃকালে এই চিহ্ন পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবার অব্যবহিত পরে যখন ইহা দৃষ্টিগোচর হয় তখন ইহা হইতে বিদ্যুদ্দামের ন্যায় জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। বাবাজী তখন ক্রিয়া-গৃহে নিজের আসনে বসিয়া ভক্ত

জয়দেবের রচিত 'দেহি পদপল্লবমুদারম' এই বচনের মনন করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নূপুরের শব্দ শুনিতে পাইয়া নীচে আসিলেন—উপবেশনের স্থানে দৃষ্টি পড়িতেই ক্ষুদ্র দুইখানি উজ্জ্বল চরণরেখা নয়নপথে পতিত হইল। শ্রীভগবানের লীলা দেখিয়া ভাব ও ভক্তিতে আপ্লুত হইলেন। পেন্সিলের চিহ্ন দ্বারা ঐ পদরেখা চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন বর্তমান সময়ে ঐ চরণ-চিহ্ন ৭, কুণ্ডু রোড—ভবানীপুরে কলিকাতার কর্পরেশন-ম্যাজিস্ট্রেট, বাবাজীর পরমভক্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়িতে সযত্নে সংরক্ষিত আছে উহা শীঘ্র কাশীধামে গোপালমন্দিরে স্থাপিত হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমরা সংক্ষেপে বাবাজীর চরিত কথার উপসংহার করিলাম। বহু বক্তব্য অবশিষ্ট থাকিয়া গেল। সময় ও সুযোগ হইলে সময়ান্তরে বিস্তারিত রূপে সেই সব বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাবাজীর দীক্ষা-তত্ত্ব ও গুরু-করণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, তাঁহার উপদেশ শিক্ষা-প্রণালীর বর্ণনা-কালে, বিবৃত হইবে। সাধনাদি সংক্রান্ত মতামতও ঐ উপলক্ষ্যেই বর্ণিত হইবে।

তাঁহার জীবন অতি-বিচিত্র, দেহ অদ্ভুত, সাধনাদি সকলেই আশ্চর্য। নির্মল চরিত্র, কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা অথচ অসাধারণ করুণা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি—এই সকল গুণ তাঁহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন,—"সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। বিশ্বাস করিলেই ঠকিতে হইবে। এই জগতের প্রত্যেকটি পরমাণু তোমার প্রতিকূল। তোমার মিত্র একমাত্র তুমি নিজেই—নিজেকে ভুলিয়া বাহ্য মিত্রের দিকে আকৃষ্ট হইও না। নিজেকে জগতে জড়াইয়া ফেলিয়াছ, এখন জগৎ হইতে নিজের বিক্ষিপ্ত উপাদান গুটাইয়া লও—লইবামাত্রই এক স্থানে নিজের পূর্ণ আদর্শ ঘনীভূতভাবে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। তাহাই তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু, তাহারই অন্বেষণে কত জন্ম কত ভাবে ঘুরিয়াছে, এবার তাহাকে পাইয়া শান্তি লাভ কর। বিশ্বাস বড় দুর্লভ জিনিস। যেখানে সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে নাই। প্রতিপদে সত্যাসত্যে পরীক্ষা করিতে হইবে—তবে ত বিশ্বাস স্থির হইবে। অস্থানে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হওয়ার অপেক্ষা প্রথমে সংশয় করিয়া পরে অটল বিশ্বাসে স্থিতিলাভ করাই শ্রেষ্ঠ।" তিনি বলেন, "তীব্র পুরুষ-কার দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্ম খণ্ডন করা যায়। পুরুষকারের মহত্ত্ব অসীম। যোগাভ্যাসই মুখ্য পুরুষকার। সদ্-গুরুপদিষ্ট পথে তাঁহারই প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া নিরন্তর শ্রদ্ধা ও সংযমের সহিত যোগকর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় ও জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের পরে শুদ্ধ ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ভক্তি পরিপক্ক হইলেই প্রেমের উদ্ভব হয়। তখন হৃদয় গলিয়া যায়। জগদম্বাকে পাইতে হইলে এই প্রেমই একমাত্র সাধন।"

বাবাজী বলেন যে, যোগ অতি গুহ্য ব্যাপার। সাধারণতঃ লোকে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা বস্তুতঃ যোগ নহে। লোকালয়ে খুব অল্পসংখ্যক লোকেই যোগতত্ত্ব অবগত আছে। তিনি শাস্ত্র ও সদাচারের একান্ত পক্ষপাতী, লোকসংগ্রহের জন্য সামাজিক ব্যবস্থার অনুগামী, অথচ শুষ্ক আচারমাত্রে তৃপ্ত থাকার বিরোধী। তিনি বলেন, কর্ম না করিয়া শুধু গ্রন্থাধ্যয়নে কোটি জন্মেও জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। শাস্ত্র শুধু পথনির্দেশক মাত্র—কর্ম দ্বারাই পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

তাঁহার স্বভাব অভিমানহীন, সরল ও বালোকচিত। এত জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও সাধন-সম্পৎ সত্ত্বেও তাহাকে মুহূর্তের জন্য অবিনয়ের প্রশ্রয় দিতে দেখি নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, পরিচয়ের গাঢ়তার সহিত ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকে—কিন্তু তাঁহাকে যিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে চিনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনি তত অধিক মুগ্ধ হইয়াছেন,—যেন অনন্ত বস্তু, দেখিয়া দেখিবার সাধ মিটে না,—প্রতিক্ষণেই নব-নব ভাবের উদয় হয়।

তাঁহার শরীর তীব্র সাধনার ফলে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাহ্য বায়ুর সহিত সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহার শ্বাস নাসাগ্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসে না, বাহিরের বায়ুও তিনি ভিতরে টানেন না। সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ আভ্যন্তর বায়ুর দ্বারাই তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য নির্বাহিত হইয়া থাকে। দেহ শুদ্ধ বলিয়া ভিতরের বায়ু কখনও মলিন হয় না। এই জন্যই তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসে পদ্মগন্ধ বহিতে থাকে, সমগ্র দেহে পদ্মগন্ধ ছড়াইয়া যায়—তীব্র ক্রিয়ার সময়ে সমস্ত ঘর পদ্মগন্ধে ভরিয়া যায়। সুষুম্নাতে বায়ু চালনা করিতে পারিলে ক্রমশঃ দেহ, বায়ু, ও চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া দেহে পদ্মগন্ধের বিকাশ হইয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব ও চৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত।* *তাঁহারা বলেন, ইহা হিন্দু-শুদ্ধির লক্ষণ।* বাহ্য বায়ুর সঙ্গে মিশ্রণ হইলে এই গন্ধ পরিবর্তিত হইয়া গোলাপ, খসখস, চম্পক, যূথিকা প্রভৃতি বিচিত্র গন্ধে পরিণত হয়। যে জামা, কাপড়, প্রভৃতি বাবাজী দুই তিন ঘণ্টা ব্যবহার করেন তাহা সদ্‌গন্ধে এত অধিক আমোদিত হয় যে, ঘরে রাখিলে দুই তিন দিন সমগ্র ঘর সৌরভে ভরিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে

---

*হঠযোগিগণ ঘটাবস্থাতেই দেহে সদ্‌গন্ধের আবির্ভাব স্বীকার করেন।

তাঁহার স্বেদবারি শিশিতে ভরিয়া দেখিয়াছি—উত্তম গন্ধ-জল তাহার নিকটে তুচ্ছ মনে হয়। নাভিতে হাত রাখিয়া উপর হইতে জল ঢালিয়া দিলে জল পদ্মগন্ধে বাসিত হইয়া যায়। তাঁহার দেহে স্বভাবতঃই—অর্থাৎ স্ফূরণ ব্যতিরেকে—এত অধিক তড়িৎশক্তি ক্রিয়া করে যে, বোলতা, ভীমরুল, মশা প্রভৃতি দংশন করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া মরিয়া যায়। আমি ইহা স্ব-চক্ষে বহুবার দেখিয়াছি। তাঁহার চাক্ষুষ তেজঃ যে কত তীব্র তাহা বলা যায় না। একবার একটি সাধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি জ্যোতির্ম্ময় কঠিন শিবলিঙ্গের দিকে সমনেত্রে তাকাইবামাত্র উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আর একদিন একজনের তীব্র রোগ আকর্ষণ করিয়া একটি বাণলিঙ্গে অর্পণ করার ফলে বাণলিঙ্গটি ফাটিয়া গিয়াছিল।

তিনি একবেলা মাত্র অতি অল্প পরিমাণে আহার করেন—বিকালে প্রায় কিছু গ্রহণ করেন না। নিদ্রা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। প্রায় সমস্ত রাত্রিই এখনও আসনে বসিয়া থাকেন।

তাঁহার সিদ্ধি সংখ্যা অগণ্য। আমাকে একদিন তিনি মহিনাসিদ্ধির একটি প্রণালী বুঝাইতে গিয়া নিজের তর্জনী অঙ্গুলীকে এত বৃহৎ ও স্ফীত করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া চিনিতে পারা যায় নাই। তাঁহার অণিমাদি সিদ্ধিও কেহ কেহ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। প্রাপ্তি, আকাশ-গতি, অন্তর্দ্ধান, কায়ব্যূহ প্রভৃতি সময়ে সময়ে কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে।

কিন্তু এ-সব সিদ্ধি তাঁহার নিকট একবারে তুচ্ছ ও নগন্য। যে মহাধনে ধনী হইয়া আজ তিনি অতুল যৌগৈশ্বর্যকেও তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, সেই ভগবৎ-প্রেমরূপ অমূল্য চিন্তামণি আজ যেন আমরা তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে ভুলিয়া না যাই। তাঁহার আশীর্বাদে ও তাঁহার সঞ্চারিত বলে বলীয়ান্ হইয়া আজ যেন আমরা তাঁহার অনুগমন করিতে সমর্থ হই। তিনি আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানালোকে ও মৃত্যুরাজ্য হইতে অমরধামে লইয়া যাউন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদিগের বিনীত ও ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা।

—০—

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ

নবরত্নমালা

নীলোন্মীলদমন্দসৌরভভরাম্ভোজালি তুল্যশ্রিয়ং
কায়ং কাশকুলপ্রকাশবিশদং কুর্চ্চং বহন্তং পৃথুম্।
অক্ষিভ্যাং শরদিন্দুমুগ্ধমধুরজ্যোৎস্নাঞ্চিতাভ্যাং চিরং
বর্ষন্তং করুণারসং, গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং ভজে।। ১।।

ভ্রূক্ষেপক্ষপিতাতিকশ্মলমিলত্তেজঃপ্রকর্ষোজ্জ্বলং
প্রহ্বং শিশ্যজনং ক্ষণাদধিপতিং সিদ্ধের্বিধায় ধ্রুবম্।
সোপেক্ষং পরিলক্ষয়ন্নপি মহাসিদ্ধিং, স বো ভূতয়ে
ভূয়াৎ কোহপ্যতিসিদ্ধিমান্ গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথঃ সদা।। ২।।

কস্তূরীঘনসারসৌরভকৃতোপাদানমুচ্চৈর্বপু-
নিঃসংখ্যৈঃ স্ফটিকৈরশূন্যমপি তচ্ছূন্যং বিচিত্রং বহন্।
পীযুষাদধিকং ধয়ন্নবিরতং স্তন্যং তদুৎসঙ্গগঃ
শ্রীমাতুর্জরঠঃ শিশুর্গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথোহবতু।। ৩।।

ষটচক্রক্রমভেদনেহপ্যবিদিতং নৈকৈর্মহাযোগিভি-
নাভীধৌতিকিরাতকুম্ভকবিধিং সাধ্যং ন সাধারণৈঃ।
শষ্যেভ্যঃ সদয়ং প্রদায় সরলং পন্থানমপ্যাদিশন্
পায়াদ্বঃ করুণার্ণবো গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথোহনিশম্।। ৪।।

একে কর্ম্মসমুৎসুকাঃ কতিপয়ে জ্ঞানৈকবদ্ধাদরা
ভক্ত্যাহন্যে পরমাত্মানোংশমমলং ভিন্নং লভন্তে মিথঃ।
যদ্ভক্তাস্ত্রীতয়ীসমুচ্চয়পথাঃ পূর্ণং লভন্তে শিবং
পূর্ণাত্মা তনুতাং স্বতাং ময়ি বিশুদ্ধানন্দনাথো গুরুঃ।। ৫।।

জগন্মাতুঃ ক্রোড়ে বসতিমনিমেষং বিদধতা
রহস্যং লীলায়াঃ কলিতমখিলং যেন কুতুকাৎ।
ততো ভক্তব্রাতে সদয়মনসা তচ্চ বিততং
বিশুদ্ধানন্দোহসৌ জয়তি যতিরাজঃ শিববপুঃ।। ৬।।

যমালোক্যৌৎসুক্য জ্জ্বলধিমিব শান্তোর্ম্মিমুদয়-
দ্দয়াসারং চেতঃ সপদি ভজতে শান্তিমতুলাম্
যদঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বস্যাশ্রয়ণমখিলার্থপ্রদমতো
বিশুদ্ধানন্দং তং শরণমুপযামো গুরুবরম্।। ৭।।

জগন্মাতুঃ পাতুং স্তনজমমৃতং বাঞ্ছতি চিরা-
দপীতং ব্রহ্মাদ্যৈর্ম্মম কিল মনো দুর্ললিতকন্।
বিশুদ্ধানন্দেশ! প্রণতজনকল্পদ্রুম! গুরো!
কৃপাপাঙ্গালোকৈর্ঝটিতি তদভীষ্টং সুঘটয়েঃ।। ৮।।

জয়তি বিজিতভূতঃ কালমাক্রম্য তিষ্ঠন্
কলিতবিমলযোগঃ সৌরভাণাং নিধানম্।
অতুলিতকরুণায়াঃ সাগরঃ সর্ব্ববেত্তা
গুরুবরসুবিশুদ্ধানন্দনাথো যতীন্দ্রঃ।। ৯।।

গ্রন্থকারের নিবেদন

পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেবের পুণ্য প্রসঙ্গের অন্তর্গত "তত্ত্ব কথা"র কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন সকল তত্ত্বের আলোচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করা গেল না। ঐরূপ আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে করিতে হইলেও অনূন্য এক সহস্র পৃষ্ঠব্যাপী একখানা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নানা কারণে তাহা এখন সম্ভবপর নহে। অবকাশ হইলে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে যত্ন করিবার ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমান খণ্ডে সাধন-জীবন-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা কর্ম্মকুশল এবং উপলব্ধিশালী তাঁহাদিগের মতামত গ্রন্থাদির অধীন নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে চলিতে চলিতে অভিজ্ঞতার উদয় হয়, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া একটি সিদ্ধান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাঁহারা শুধু যন্ত্রের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন না, তাঁহাদিগের সকলেরই আপন আপন মত আছে—এমন কি, আপন আপন পরিভাষাও আছে। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে করিতে তাঁহাদিগের পরিভাষার বিশিষ্ট অর্থ বোধগম্য হয়। মহাপুরুষদিগের পরিভাষা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদিগের উপদেশকে জনসাধারণের ও চিন্তাশীল বিদ্বজ্জনের উপযোগিবেশে উপস্থাপিত করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কঠিন হইলেও ইহা আবশ্যক। এই পারিভাষিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই অনেক সময়ে অতি সহজ কথাও বুদ্ধ্যারূঢ় হয় না।

জগতের নিকট বাবাজীর একটি বাণী আছে— সেটিকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা উচিত মনে হয়। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান সময়ে তাহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। আজ-কাল যেখানে-সেখানে 'অবতারের' উদয় দেখিতে পাই—ইহা দেশের শুভ লক্ষণ, কি তাহার বিপরীত তাহা জানি না। কাহারও জীবনে একটু বৈশিষ্ট্য থাকলেই তিনি অবতাররূপে গণ্য হন। অনেক স্থলে অতি সাধারণ ও গ্রাম্য প্রকৃতির লোকও স্বয়ংসিদ্ধ ভাবে অবতারত্বের দাবী করেন এবং কখনও কখনও বিশ্বাসী ভক্তের নিকটে পূজার অর্ঘ্যও প্রাপ্ত হন। ইহা কাল-মাহাত্মের ফল। এই বিশ্বাসপ্রবণ দেশে বাবাজীর ন্যায় একজন অলোক সামান্য পুরুষ আপনাকে অনায়াসেই অবতার বলিয়া প্রচারিত করিতে পারিতেন। নিরন্তর ঘনিষ্ঠরূপে সংসর্গ করিয়া তাঁহার মধ্যে যে সকল অলৌকিক শক্তির সত্তা ও

লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে তাঁহার তুলনা বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহাস্পদ মনে হয়। কিন্তু তিনি স্পষ্টাক্ষরেই ঈশ্বরত্বের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকারকে কতদিন বলিয়াছেন—"বাপু, জীব কি কখনও ঈশ্বর হয় গো? তোমরা বালক, তাই অল্পেই অভিভূত হইয়া পড়। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, জীব চিরদিন জীবই থাকে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, ইহার মতন শত শত ব্রহ্মাণ্ড নিমেষমাত্রে সৃষ্টি সংহার করিতে পারিলে জীব জীবই—ঈশ্বর নহে। জীব সাধনা দ্বারা মহাশক্তির প্রসাদে ঈশ্বর-সাম্য লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু তবু সে জীবই থাকে। ঐশ্বর্য্যই বল আর সমাধিই বল—কিছুতেই ভুলিও না। মহাশক্তির চরণচ্ছায়া পাইলে জীব না করিতে পারে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু তবু মনে রাখিও জীব জীবই। কপটাচার করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না।" যিনি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মহা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যিনি সত্যসংকল্প ও যোগেশ্বর মহাপুরুষ, তিনি স্বয়ং আজও মুক্তকণ্ঠে এই সত্য ঘোষণা করিতেছেন। জগতের নিকটে তাঁহার প্রধান বক্তব্য—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্ম করিতে হইবে—তাহা হইতে যথাসময়ে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম আপনিই উদিত হইবে শুধু ভাবপ্রবণতা অথবা শুষ্ক গ্রন্থাধ্যয়নমূলক তর্ক-বিচার হইতে প্রকৃত ফললাভের আশা নাই। কর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন।" তাঁহার জীবন ও উপদেশ হইতে কয়েকটি প্রধান শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হই। তাহা এই—

(১) সদাচার প্রতিপালন। সাধনা দ্বারা যিনি যতই উন্নতি লাভ করুন, আচারের অনুবর্ত্তন করিতেই হইবে। নিজে আচারের অধীন না হইলেও লোকশিক্ষার জন্য আচার পালন অত্যাবশ্যক।,

(২) ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষণ। তিনি বলেন চতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বগৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্ব যাইবার নহে। অন্যান্য জাতি সাধনা দ্বারা উন্নত হইলেও—বিভূতি-সম্পন্ন হইলেও—ব্রাহ্মণের নমস্য নহে। অন্য জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণের প্রণাম-গ্রহণ সর্ব্বথা অবৈধ। ব্রাহ্মণের পক্ষেও কিছু বিভূতি দর্শন করিয়াই অন্যকে প্রণাম করা বা তাহার নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ অনুচিত। ব্রাহ্মণ কর্ম্মভ্রষ্ট হইলেও উপাদানগত বা বীজগত মহত্ত্বে মহীয়ান্—শাস্ত্রানুকূল ভাবে সাধনা করিতে পারিলে তাঁহার দীর্ঘকালে আবরণও স্খলিত হইয়া যাইবে, তখন যথার্থ ব্রাহ্মণ-ভাব জাগিয়া উঠিবে। যজ্ঞ-সূত্র-ত্যাগ, সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিহার, যখন তখন ফল্গু-বৈরাগ্যের অনুপ্রাণনায় কাষায়-বাসন-পরিগ্রহ—এসব ব্রাহ্মণের পক্ষে

অনুকরণীয় কার্য্য নহে। আদর্শ ব্রাহ্মণ হইতে পারিলে সর্ব্বজগতের আধিপত্যও তুচ্ছ মনে হয়। গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করিয়াও ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করা যায়। আজকাল সন্ন্যাস-গ্রহণের পক্ষে যে একটা প্রবল আন্দোলন চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অনেকাংশে অমূলক ও সমাজের অপকারক। প্রকৃত সন্ন্যাস অতি দুর্লভ বস্তু, যে তাহা লাভ করিতে পারে, সে সত্যই ধন্য। বাহিরের সন্ন্যাস একটা প্রথা মাত্র। তাহার উপযোগিতা আছে, তবে তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ উর্দ্ধরেতা না হইয়া কাষায়-বস্ত্র-পরিধান অতি বিপজ্জনক ব্যাপার। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া সংযত ও সত্যপরায়ণ থাকিবে, যথাবিধি স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে, সদাচার পালন করিবে, ভগবানে বিশ্বাস রাখিবে ও যথাশক্তি যোগাভ্যাস করিবে—তাহা হইলে জগদম্বার কৃপায় সকল অভাবই মিটিয়া যাইবে। আর ব্রাহ্মণের বিশেষ কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

(৩) শাস্ত্রের মর্য্যাদা পালন। শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিলে কখনই ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। তবে মনে রাখিও, শাস্ত্র অনন্ত—দু'পাতা সংস্কৃত পাঠ করিয়া নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিও না। যোগী ভিন্ন শাস্ত্র রহস্য কেহই জানে না। অহঙ্কার পতনের মূল—বিনয় জ্ঞাণীর ভূষণ। মহাপুরুষগণও লোক-ব্যবহারে শাস্ত্র মানিয়া চলেন। তাঁহারা শাস্ত্রের অতীত—তথাপি সমাজ-রক্ষার জন্য বিধি নিষেধ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যতদিন অন্তরের পরমাত্মায় সাক্ষাৎ বাণী শ্রুতিগোচর না হইবে, যতদিন অন্তরাত্মার প্রেরণায় চালিত না হইতে পারিবে, ততদিন বাহ্য শাস্ত্রের অনুসরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন শাস্ত্রেরই অমর্য্যাদা করিতে নাই—সবই অধিকারানুসারে প্রামাণিক।

(৪) সর্ব্বদেবে সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন। দেবতায় ভেদবুদ্ধি ভগবৎ-কৃপালাভের অন্তরায়। কর্ম্ম-কালে আপন আপন ইষ্টে নিষ্ঠা রাখিবে জ্ঞানতঃ সর্ব্ব দেবতাকে সমান বলিয়া ধারণা করিবে। সব দেবতাই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন। কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সকলকেই আপন আপন ইষ্টপথেই চলিতে হইবে। তাহাতেই পূর্ণতালাভ হইবে। সুতরাং দেবতত্ত্ববিষয়ে উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার মুমুক্ষুর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ। যাহারা যাহা স্বীয় ভূমি তাহাকে তাহাতেই অবস্থিত হইতে হইবে, কাহারও সাধন-পদ্ধতি বা আচরণের নিন্দা করিবে না।

(৫) অভ্যাস-যোগ। আলস্য ত্যাগ করিয়া গুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধন-ক্রমের অভ্যাস করিবে। অভ্যাসের মাহাত্ম্য অনন্ত। তপস্যার ফলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

(৬) চরিত্রের বিশুদ্ধি। সকল প্রকার উন্নতিই চরিত্রের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। কাহারও মনে আঘাত দিবে না, ইন্দ্রিয় জয় করিবে, কায় মনঃ ও বাক্যে সত্য পালন করিবে, গুরুতে অচল শ্রদ্ধা রাখিবে, ধৈর্য্য ক্ষমা ও করুণাবৃত্তির অনুশীলন করিবে, চিত্ত সর্ব্বদাই অনাশক্ত ও প্রশান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই সকল সদ্‌গুণের বিকাশ প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য।

(৭) আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দার পরিহার। কখনও নিজমুখে নিজের প্রশংসা করিবে না ও অন্যের নিন্দা করিবে না। অন্যের কার্য্যের ভাল-মন্দ-বিচার অবৈধ। কে কি উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে বিচারের অধিকার অন্য কাহারও নাই। সাধু-সজ্জনের নিন্দা বা তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা ও দেব-চরিত্রের সমালোচনা একান্ত গর্হিত। সরলভাবে আত্মদোষের অন্বেষণ করিবে ও সংশোধনের চেষ্টা করিবে। কপটতার আশ্রয় কখনই গ্রহণ করিবে না। সকল দোষেরই ক্ষমা আছে, অহঙ্কার ও কাপট্যের ক্ষমা নাই।

(৮) মনুষ্যে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ। মনুষ্য ঈশ্বর না হইতে পারিলেও ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইতে পারে-ঐশ্বরিক শক্তির স্ফুর্তি তাহাতে হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অবতার মনে করা উচিত নহে। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় (বা অন্য জীবের ন্যায়) প্রকাশিত হন, তখনও যেমন তিনি মনুষ্য (বা অন্য জীব মাত্র) নহেন, কিন্তু মনুষ্যভাব সত্ত্বেও ঈশ্বরই, তদ্রূপ মনুষ্যও ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত হইলেও মনুষ্যই থাকে, সত্যসত্য ঈশ্বর হয় না। বাস্তবিক পক্ষে অবতারকে মনুষ্য মনে করা যেমন অন্যায়, তেমনই মনুষ্যকে অবতার মনে করাও অন্যায়।

জগতের সমক্ষে ইহাই বাবাজীর সাধারণ বাণী। বিশেষ অধিকারীর জন্য বিশেষ উপদেশ অবশ্য এখানে আলোচ্য নহে।

"বিশুদ্ধানন্দ-কানন"
কাশীধাম। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
শিবরাত্রী, ১৩৭৫।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপ্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড তত্ত্বকথার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল। কিছুদিন যাবৎ পুস্তকখানি ছাপা না থাকায়, পুনঃ মুদ্রণের জন্য পাঠক সমাজ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছিলেন। পুস্তকখানি আবার প্রকাশিত হওয়ার ফলে, পাঠকবর্গের বহুদিনের অভাব পূরণ হবে বলে আশা করি। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দপরমহংস, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের গুরুদেব। ভারতবিশ্রুত মণীষী ও সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পরিচয় বিদগ্ধ সমাজে নূতন করে দেবার মত কিছুই নেই। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড—তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কাবরাজ মহাশয়ের লেখনীমুখ তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, ভূয়োদর্শন ও বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির সাহায্যে। এই মহামূল্যবান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধিক বলার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না।

পুরানো পুঁথি, আধ্যাত্মিক সাহিত্য এবং জাতীয় চেতনার উদ্দীপক গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ ও সুধীসমাজের নিকট এইরূপ আকার গ্রন্থ থাকিলে আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবেন।

আজিকার দিনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনে এই ধরণের অধ্যাত্ম সাহিত্য সত্যকার শান্তি ও কল্যাণ আনয়নে সাহায্য করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই এই গ্রন্থ-প্রকাশনার কাজে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। ইতি—

প্রকাশক

২৫ ডিসেম্বর
২০০৩

ক্রিয়াযোগীদের এক পরম সম্পদ
লাহিড়ী বাবার অন্যতম প্রিয় শিষ্য
স্বামী প্রণবানন্দ গিরির
প্রণব গীতা ৩০০৲

রাজর্ষি রাঘবানন্দের
অমরযোগী বাবাজী মহারাজের সন্ধানে ১৬০৲
(বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বাবাজী মহারাজের উপর একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ)
মহামানবের সাগরতীরে ১৫০৲
(ক্রিয়াযোগের বহু গুপ্ত কথা নিহিত)

অধ্যাপক হরপ্রসাদ রায়ের এক অনবদ্য কীর্তি
ক্রিয়াযোগী ভূপেন স্যান্যাল ও ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ১৫০৲
(রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হওয়ার বিবরণ)
পরমহংস হরিহরানন্দের স্মৃতি সান্নিধ্যে ১০০৲
মহান ক্রিয়াযোগী হরিহরানন্দ ১৩০৲

কেয়া মিত্রের
ক্রিয়াযোগ ধারক ও বাহক ১৩০৲

হরিহরানন্দজীর
সমাধি ও সাধনা ৩৫৲

রাজর্ষি রাঘবানন্দের : **ক্রিয়াযোগ সার** ১৩০৲
(বহু ছবি সহযোগে ক্রিয়াযোগের গুপ্তকথা নিহিত)

যোগীবর পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের
ধর্ম ও পূজাদি মিমাংসা ১২০৲
(ক্রিয়াযোগীদের অবশ্য পাঠ্য)

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ

তত্ত্বকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে জগতের আধ্যাত্মিক আন্দোলনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্ধান রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, আজকাল অনেক সরল ও চিন্তাশীল মনুষ্যের হৃদয়েই আত্মিক উন্নতির জন্য একটা আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী মোহ-নিদ্রার মধ্যে এখন একটু জাগরণের পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে। নিদ্রার অবসান না হইলেও উহার গভীরতা কিয়দংশে কাটিয়া গিয়াছে, সেই জন্য এখন অনেকের মুখেই ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—অনেকেই এখন জীবনের প্রচলিত ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন।

কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি হইবে? নিজের চিরাভ্যস্ত কর্ম্মজনিত সংস্কার তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। আপ্ত মহাপুরুষের সঙ্গ ও সাহায্য না পাইলে পূর্ব্ব-সংস্কারের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সত্যপথে সঞ্চরণ করা বড় কঠিন। কারণ, সত্যলাভের পথ ক্ষুরধারার ন্যায় অতি দুর্গম—"দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" কঠোর তপস্যা ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, অদম্য অধ্যবসায়, সরল ও নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়, তীক্ষ্ণ বিচারশীলতা, নির্ম্মল বৈরাগ্য—এই সকল সদ্‌গুণের যথোচিত অনুশীলন না হইলে সত্যোপলব্ধির বাধা দূরীভূত হয় না। গুরুকৃপাবলে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার আশা সুদূর-পরাহত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষা এবং মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, সংসারে এই তিনটি অতি দুর্লভ পদার্থ। চৌরাশী কোটী জীবযোনিতে

জন্মগ্রহণ করিয়া উপাদানের ক্রমিক উৎকর্ষলাভ করিতে করিতে মনুষ্যদেহ প্রাপ্তির অধিকার জন্মে, কিন্তু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও ভোগাকাঙ্খা পরিহার পূর্ব্বক মুক্তির কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিবার ইচ্ছা সকলের হয় না। আর ইচ্ছা হইলেও পথপ্রদর্শক ও শক্তিদাতা গুরুর শরণাপন্ন না হইতে পারিলে পূর্ণ সিদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষদর্শী বিভূতিসম্পন্ন আপ্তপুরুষ চিরদিনই সংসারে বিরল—বর্ত্তমান সময়ে কাল-মাহাত্ম্যে ইহা আরও অধিকতর বিরল হইয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং উন্নতিলিপ্সু মনুষ্যের পক্ষে আজকাল অধিকাংশ স্থলে ইচ্ছা সত্ত্বেও সৎপথে চলিয়া সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উৎকট পিপাসার সময় যেমন কোনও ব্যক্তি পানীয় জলের গুণাগুণ নির্ণয়ের অবকাশ পায় না, যে জল প্রথমে হস্তগত হয় তাহা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ না হইলেও তাহার দ্বারাই পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা করে, সেই প্রকার বর্তমান সময়ে আগ্রহশীল সাধনার্থী যোগ্যতার বিচার না করিয়াই যে কোনও স্থানে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হয় সেখানেই মস্তক অবনত করিয়া জিজ্ঞাসুরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রাচীন ও নবীন নানা প্রকার পুস্তক, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ, অল্পজ্ঞ ও অদূরদর্শী লেখকগণের অসার ও ভিত্তিহীন নিবন্ধ—এই সকল উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বহু লোকে নিজের সংশয়ভঞ্জন করিয়া গন্তব্যপথের নিরূপণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে সুফলের পরিবর্তে বিষময় পরিণাম অনিবার্য্য। কার্য্যক্ষেত্রে বহুস্থানেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থকারে লিখিত গ্রন্থের উপদেশ অনুসারে সাধক আপন সাধনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যদি তত্ত্বদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাত্মাও হন, তাহা হইলেও কেবলমাত্র তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ কোনও দিন সাধনমার্গে যথার্থ উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। উপদেশ কিম্বা বর্ণনা চিরদিনই অসম্পূর্ণ, বিশেষতঃ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং অলৌকিক শক্তির বিবরণ মনুষ্যের ভাষায় কখনই সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে না। যতটা হয়, তাহা অতি সামান্য—সেই শুষ্ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ কোনও দিন স্থায়ী কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না। যতদিন পর্য্যন্ত নিজের ব্যক্তিগত প্রকৃতি আমূল রূপান্তরিত না হয়, ততদিন পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করা যায় না। জন্মগত উপাদানের পরিবর্ত্তন একমাত্র যোগাভ্যাসের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু যোগপথ উন্মুক্ত না হইলে যোগাভ্যাস অসম্ভব, আর শক্তিশালী যোগীর শক্তিসঞ্চার ব্যতিরেকে যোগপথও উন্মুক্ত হয় না। সুতরাং আত্মমঙ্গলকামী সাধকের পক্ষে যোগী মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ একান্তই আবশ্যক।

যাঁহারা এই প্রকার পথ-প্রদর্শকের চরণচ্ছায়াতে অবস্থান করিয়া তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অধ্যাত্ম পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা তাঁহাদের পক্ষেই উপযোগী। কিন্তু এই উপযোগিতাও গৌণ ভাবের মাত্র। কারণ, সৎপথে সঞ্চার আরম্ভ হইলে যখন যাহা জানিবার এবং করিবার আবশ্যকতা হয়, তখন তাহা আপনা-আপনিই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যের উপদেশ কিম্বা বর্ণনা না শুনিলেও তত্ত্বের উপলব্ধিতে কোনও প্রকার ত্রুটি থাকে না। স্বচ্ছ অন্তঃকরণে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের নির্ণয় স্বভাবতঃই আবির্ভূত হইয়া থাকে। তবে এই প্রকার আলোচনার সার্থকতা যে একেবারে কিছুই নাই, তাহাও নহে। সাধকের সাধনজাত অনুভূতির সত্যতা নিরূপণ করিয়া উহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আস্থা দৃঢ় করিবার জন্য সংবাদী দৃষ্টান্তরূপে এই সকল উপদেশ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, কৃতকর্ম্মা সাধনসিদ্ধ মহাত্মার জীবন ও চরিত্র হইতে নিজের আদর্শ-জ্ঞান পরিস্ফুট হয় এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত ও তেজোময় বাক্যের দ্বারা নিজের দুর্ব্বল চিত্তে আশ্বাস ও উৎসাহ জাগিয়া উঠে। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপুরুষগণের কিম্বা শাস্ত্রকারদিগের উপদেশের ইহাই প্রধান ফল।

ধর্ম্মের তত্ত্ব যে গুহা-নিহিত, তাহা সকল দেশের শাস্ত্রেরই চরম সিদ্ধান্ত। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সত্যের যে রহস্যময় মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। কিন্তু বাহ্যভাবাপন্ন লঘুচিত্ত জন-সাধারণের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব। কারণ, হৃদয়ের গভীর প্রদেশে নিজের ইন্দ্রিয় মন এবং অহংকার বৃত্তি সকলকে নিমগ্ন করিতে না পারিলে, অনাদি সঞ্চিত অনুকূল এবং প্রতিকূল বাসনারাজির আকর্ষণ হইতে নিজেকে জ্ঞাতসারে পৃথক করিয়া সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হইতে না পারিলে, জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়া নিজেকে যন্ত্ররূপে পরিণত করিতে না পারিলে, ধর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ কখনই আয়ত্ত হইতে পারে না। এই জন্যই পথ-নির্দ্দেশের জন্য মহাজনের জীবন এবং আচরণ গৃহীত হইয়া থাকে। মহাজন ধর্ম্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মজীবনে উহার পরিণাম এবং বিকাশ সম্পাদন পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহার ধর্ম্মময় জীবনের মধ্য দিয়েই সূক্ষ্ম ও জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া থাকে। মহাজনের উপলব্ধি এবং উপদেশ এই জন্যই বিশেষভাবে আলোচনীয়।

যাঁহারা সাধন-পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সত্যনির্ণয়ের যাবতীয় উপায়েরই সহকারিতা গ্রহণ করিতে হয়। গুরূপদিষ্ট মার্গে, নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধার সহিত নিরলসভাবে চলিতে চলিতে সকল তত্ত্বই জানিতে পারা যায় এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেও পাওয়া যায়। তখন নিজের উপলব্ধির সহিত এক দিকে গুরু,

শাস্ত্র এবং মহাপুরুষের বাক্য ও অপরদিকে নিজের শুদ্ধ বিচার, এই উভয়ের সম্মিলন করিয়া উপলব্ধির প্রামাণ্য নিরূপণ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই ত্রিবিধ উপায়ে সত্যবস্তুর সত্যতা সাধকের নিকট পরীক্ষিত হইয়া থাকে,—কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অথবা যুক্তি অথবা শাস্ত্র বা মহাপুরুষের উপদেশ সন্দেহ এবং বিপরীত ভাবনাগ্রস্ত মনুষ্যের পক্ষে সত্যাসত্য নির্ণয়ের পর্য্যাপ্ত সাধন নহে। যতদিন আমাদের মন সংস্কারের অধীন থাকে, ততদিন কেবল-মাত্র প্রত্যক্ষ হইতে সত্যনির্ণয় হয় না। সত্যের যাহা নির্ম্মল ও সার্ব্বভৌম স্বরূপ, তাহা সংস্কাররঞ্জিত চিত্তের সম্মুখে বিকৃতরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুতরাং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সংস্কারের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অভ্রান্তরূপে সত্যের নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। দেহ ও বিষয়সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা এবং স্থূলজগতে ক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ-জনিত দৈহিক অসামঞ্জস্য—এই সকল কারণেও লৌকিক প্রত্যক্ষ অনেক সময় মিথ্যা হইয়া পড়ে। এই জন্য সাধনাবস্থায় প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় আবশ্যক। সর্ব্বদা সচেতন থাকিয়া নিজের অনুভূতিকেও বিচারের কঠোর মানদণ্ডে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহাতেও নিঃসংশয় জ্ঞানের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, সাধনাবস্থায় নানা কারণে প্রত্যক্ষে যেমন দোষ থাকিতে পারে, তেমনি বিচারেও ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। সে-স্থলে প্রত্যক্ষ ও যুক্তির সামঞ্জস্য সত্ত্বেও তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন হয় না। বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অসংস্কৃত মন এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাদিগের সম্বন্ধে তথ্য-নির্দ্ধারণ সিদ্ধ মহাত্মাদের অভ্রান্ত উপলব্ধিমূলক উপদেশের সহায়তা ভিন্ন হইতে পারে না। তিনি যত বড় সাধক অথবা বিচারশীল পুরুষই হউন না কেন, তাঁহাকেও অবশ্যই সিদ্ধ মহাজনের বাণী অথবা শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করিয়া নিজের অনুভব ও বিচারের মূল্য নিরূপণ করিতে হয়।

এইপ্রকারে কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারাও সত্যের রূপ নিশ্চয় করা যায় না। যে যুক্তি প্রত্যক্ষে প্রতিষ্ঠিত নহে, প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহার সমর্থন হয় না, যাহা শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের বিরোধী—তাহা সদ্‌যুক্তি নহে, যুক্তির আভাস মাত্র, তাহা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় কোনই উপকার হয় না। এইজন্যই বেদান্তাদি শাস্ত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এত সমালোচনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রমূলক তর্কই সত্তর্ক, শাস্ত্র এবং মহাপুরুষের নির্ম্মল অনুভূতিকে আশ্রয় না করিয়া যে তর্ক প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কুতর্ক ভিন্ন অন্য কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ঋষিবাক্যে আছে—

> "আর্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা
> যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।।"

বেদাশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কই সত্তর্ক। "যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে", ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কুতর্ক অথবা শাস্ত্রের অননুমোদিত বিচার তত্ত্ব-নির্ণয়ের সহায়ক নহে। যাহারা শুষ্ক যুক্তবাদী অথবা rationalist, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ এবং বিশিষ্ট পুরুষের সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া যুক্তির বৈধতা ঠিক করিতে হয়। যুক্তি-অনুভবমূলক—যাহার অনুভবের রাজ্য যে পরিমাণে বিস্তৃত, তাহার যুক্তি সেই পরিমাণে বলবতী। যতদিন অনুভব সর্ব্বব্যাপক না হইবে, যতদিন নানা প্রকার বাধা ও প্রতিবন্ধকের দ্বারা অনুভবের বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ থাকিবে, ততদিন ঐ প্রকার অনুভবমূলক যুক্তিও স্থিরতা লাভ করিতে পারিবে না। জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষের অনুপাতে যুক্তির আপেক্ষিক বলবত্তা নিয়মিত হয়। বালক তাহার ক্ষুদ্র অনুভবের বলে যাহা যুক্তিসঙ্গত মনে করে, যৌবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যুবক তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রকার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা কোনও স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যুক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষের সমন্বয় আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, তাহার সঙ্গে বিশুদ্ধ অনুভবের তুলনা করিয়া সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হয়। অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ সংশয়বাদ অপেক্ষা যুক্তিবাদ যে অধিকতর উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যুক্তিবাদের যাহা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, তাহাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে যুক্তির অযথা প্রাবল্য ধর্ম্মালোচনার বাধাই উৎপাদন করে।

প্রত্যক্ষ্য ও যুক্তির ন্যায় শুধু শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারাও সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। শাস্ত্র-বাক্য কিম্বা মহাপুরুষের উপদেশ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে নির্দ্দোষ বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষের দ্বারা উহার প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ, যাঁহার কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই এবং যিনি বিচারশীল নহেন, তিনি শাস্ত্রোপদেশ বুঝিবার অধিকারী নহেন। জ্ঞান ও ক্রিয়ার পরস্পর সমন্বয় ভিন্ন কোনও উপদেশই যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া ক্রিয়ার দ্বারা আয়ত্ত করিতে না পারিলে উপদেশের সার্থকতা সম্পন্ন হইতে পারে না। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের অপরোক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই অনুভূতি বিশ্লেষণ করিয়া দেশ কাল ও পাত্রের উপযোগী বেশে অধিকার অনুসারে তাঁহারা জগৎ সমক্ষে প্রচারিত করিয়াছেন। ইহাই শাস্ত্র। যাঁহারা ঋষিগণের এই অবলম্বিত পথ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ অনুসারে অগ্রসর হন, তাঁহারা ক্রমশঃ জ্ঞান ও ক্রিয়ার আবরণ অপসারিত করিয়া সত্যোপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় শাস্ত্র-বাক্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং পক্ষান্তরে নিজের অনুভূতিও শাস্ত্রানুরূপ বলিয়া সত্যরূপে

Shastra

প্রতিভাত হয় ও তাহাতে দৃঢ় আস্থা উৎপন্ন হয়। তখন বিচারশক্তি এই অনুভূতি ও শাস্ত্রবাক্যের অনুকূলরূপে স্বতঃই কার্য্য করিতে থাকে। শাস্ত্রের কথা যে শুধু কথা-মাত্র নহে, তাহার মূলে যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, এই সকল বিষয় বাহির হইতে উপলব্ধি করা যায় না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। পঞ্চীকরণের প্রণালী বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে—অপঞ্চীকৃত ভূত অথবা তন্মাত্রা পঞ্চীকৃত না হইলে স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি হইতে বর্তমানকালের নবীন বৈদান্তিক পর্য্যন্ত বহু আচার্য্যই পঞ্চীকরণের প্রণালী সম্বন্ধে আপন আপন ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল প্রণালী সত্যরূপে সাধারণ লোকের মধ্যে কেহই অনুভব করিতে পারেন না। একটি নির্দ্দিষ্ট আম এবং জামকে বিশ্লেষণ করিয়া যদি আমি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতের সমাবেশ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার পঞ্চীকরণ-বিষয়ক জ্ঞান কিছুই হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। তন্মাত্রা সাক্ষাৎকার, তন্মাত্রার পরস্পর সংযোগের নিয়ম ও প্রণালীর জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা নিজে উক্ত প্রণালী আয়ত্ত করা—এই সকল উপায়ে পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহার তাহা হয় নাই, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতের স্বরূপ ও পরস্পর প্রভেদ প্রতক্ষ্য অনুভব করিতে পারেন নাই, তিনি পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন না। শাস্ত্রে এই বিষয়ে যেখানে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি তাহা কি বুঝিতে পারিবেন? শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সকল লোক এবং লোকবাসী প্রাণীর দেহ পঞ্চীকৃত ভূতের দ্বারা উৎপন্ন, অথচ ভূলোকবাসী মনুষ্যাদির দেহের সহিত স্বর্গ প্রভৃতি উর্দ্ধলোকনিবাসী দেবগণের দেহের যে স্বভাবসিদ্ধ বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও সত্য। পঞ্চীকরণ ব্যাপারের প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকিলে এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় উপদেশ ঠিক ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। বর্তমান সময়ের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিবর্গ অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্রনুশীলন করিয়াও যে শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে পারেন না, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। যোগভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—“তস্মাৎ শাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে।” শাস্ত্র বা আচার্য্যের উপদেশ সত্য হইলেও যতদিন কিছু প্রত্যক্ষ না হয় ততদিন উহাতে সম্যক্ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বিচারের যে আবশ্যকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ যুক্তি এবং শাস্ত্র বা মহাপুরুষের বাক্য, সত্য বা ধর্ম্ম নির্ণয়ের পক্ষে তিনেরই সমরূপে

উপযোগিতা রহিয়াছে। মহাজনগণের উপলব্ধির বর্ণনা ও উপদেশাদি এই জন্য কর্ম্মী ও বিচারশীল সাধকের নিকট আত্মসাধনার রূপে সমাদৃত হয়। শাস্ত্র-বাক্য, মহাপুরুষের বচন ও সদ্‌গুরু-বাক্য—তিনি—তিনের মধ্যে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। কারণ, তিনটিই আপ্তবচন ও অভ্রান্ত। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ইহাদের আপেক্ষিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাস্ত্র কিম্বা মহাজনের বাক্য প্রধানরূপে গ্রাহ্য, কিন্তু সদ্‌গুরুলাভের পরে উহাদের প্রাধান্য থাকে না। তখন গুরুবাক্যই একমাত্র নিয়ামক। বাস্তবিক পক্ষে সদ্‌গুরুর উপদেশ শাস্ত্রবাক্য বা মহাপুরুষের বচন হইতে কোনও অংশে ভিন্ন না হইলেও উহা সাধকের ব্যক্তিগত অধিকার অনুসারে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া কর্ম্ম-প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কিন্তু উহা বুঝিবার জন্য এবং উহাতে নিষ্ঠা দৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনা এবং মহাজনগণের চরিত ও উপদেশাদির আলোচনাও আবশ্যক।

আমরা যে মহাপুরুষের পুণ্য প্রসঙ্গের আলোচনার অঙ্গরূপে এই তত্ত্ব-কথার অবতারণা করিতেছি, তিনিই ইহার প্রাণস্বরূপ। সাক্ষাৎভাবে এবং পরোক্ষে, স্থূল শব্দের আশ্রয়ে এবং অনৌপদেশিক প্রাতিভ জ্ঞানরূপে, শুদ্ধ উপদেশচ্ছলে অথবা জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া, তিনি যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারই অতিক্ষুদ্র একদেশ মাত্র বর্ত্তমান আলোচনায় প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সদ্‌গুরু শিষ্যকে অসংখ্য উপায়ে উপদেশ দিয়া থাকেন—শুধু বাক্য-প্রয়োগের দ্বারাই যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা নহে। অনেক সময়ে বাহ্যদৃষ্টিতে মৌন অবলম্বন করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে বোধ রূপে উদিত না হইলে চিত্তের দৃঢ়মূল সংশয় শুধু শুদ্ধ যুক্তিপূর্ণ কথার দ্বারা বিদূরিত করা যায় না। 'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ—ইহা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। চৈতন্যরূপী গুরু মনোদর্পণে চিদালোক সঞ্চার না করিলে মনের চাঞ্চল্যরূপ সংশয় এবং আবরণরূপ মিথ্যাজ্ঞান কখনই দূর হইতে পারে না। এই শক্তির সংক্রমণ বৈখরী বা স্থূল শব্দকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে, এবং না করিয়াও হইতে পারে। উচ্চতর ভূমির জ্ঞানের প্রকাশ সম্বন্ধে স্থূল শব্দের কোনই কার্য্যকারিতা নাই, উহা সাক্ষাৎভাবে গুরুশক্তির প্রভাবে হৃদয় হইতে আবির্ভূত হয়। সাধকের চিত্তগত অবস্থা অনুসারে জ্ঞানের অবতারণাও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। জ্ঞান নির্ম্মল হইলেও আধারের মলিনতা বশতঃ প্রকাশিত হইবার সময়ে অল্পাধিক মলিন ও বিকৃত রূপ ধারণ করে। সেটা জ্ঞানের দোষ নহে আধারেরই দোষ। বর্ত্তমান স্থলেও তাহাই মনে করিয়া প্রকাশগত অসম্পূর্ণতা উপেক্ষা করিতে হইবে।

প্রতিভাত হয় ও তাহাতে দৃঢ় আস্থা উৎপন্ন হয়। তখন বিচারশক্তি এই অনুভূতি ও শাস্ত্রবাক্যের অনুকূলরূপে স্বতঃই কার্য্য করিতে থাকে। শাস্ত্রের কথা যে শুধু কথা-মাত্র নহে, তাহার মূলে যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, এই সকল বিষয় বাহির হইতে উপলব্ধি করা যায় না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। পঞ্চীকরণের প্রণালী বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে—অপঞ্চীকৃত ভূত অথবা তন্মাত্রা পঞ্চীকৃত না হইলে স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি হইতে বর্তমানকালের নবীন বৈদান্তিক পর্য্যন্ত বহু আচার্য্যই পঞ্চীকরণের প্রণালী সম্বন্ধে আপন আপন ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল প্রণালী সত্যরূপে সাধারণ লোকের মধ্যে কেহই অনুভব করিতে পারেন না। একটি নির্দ্দিষ্ট আম এবং জামকে বিশ্লেষণ করিয়া যদি আমি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতের সমাবেশ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার পঞ্চীকরণ-বিষয়ক জ্ঞান কিছুই হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। তন্মাত্রা সাক্ষাৎকার, তন্মাত্রার পরস্পর সংযোগের নিয়ম ও প্রণালীর জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা নিজে উক্ত প্রণালী আয়ত্ত করা—এই সকল উপায়ে পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহার তাহা হয় নাই, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতের স্বরূপ ও পরস্পর প্রভেদ প্রতক্ষ্য অনুভব করিতে পারেন নাই, তিনি পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন না। শাস্ত্রে এই বিষয়ে যেখানে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি তাহা কি বুঝিতে পারিবেন? শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সকল লোক এবং লোকবাসী প্রাণীর দেহ পঞ্চীকৃত ভূতের দ্বারা উৎপন্ন, অথচ ভূলোকবাসী মনুষ্যাদির দেহের সহিত স্বর্গ প্রভৃতি উর্দ্ধলোকনিবাসী দেবগণের দেহের যে স্বভাবসিদ্ধ বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও সত্য। পঞ্চীকরণ ব্যাপারের প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকিলে এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় উপদেশ ঠিক ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। বর্তমান সময়ের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিবর্গ অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্রনুশীলন করিয়াও যে শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে পারেন না, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। যোগভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"তস্মাৎ শাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে।" শাস্ত্র বা আচার্য্যের উপদেশ সত্য হইলেও যতদিন কিছু প্রত্যক্ষ না হয় ততদিন উহাতে সম্যক্ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বিচারের যে আবশ্যকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ যুক্তি এবং শাস্ত্র বা মহাপুরুষের বাক্য, সত্য বা ধর্ম্ম নির্ণয়ের পক্ষে তিনেরই সমরূপে

উপযোগিতা রহিয়াছে। মহাজনগণের উপলব্ধির বর্ণনা ও উপদেশাদি এই জন্য কর্ম্মী ও বিচারশীল সাধকের নিকট আত্মসাধনার রূপে সমাদৃত হয়। শাস্ত্র-বাক্য, মহাপুরুষের বচন ও সদ্‌গুরু-বাক্য—তিনি—তিনের মধ্যে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। কারণ, তিনটিই আপ্তবচন ও অভ্রান্ত। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ইহাদের আপেক্ষিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাস্ত্র কিম্বা মহাজনের বাক্য প্রধানরূপে গ্রাহ্য, কিন্তু সদ্‌গুরুলাভের পরে উহাদের প্রাধান্য থাকে না। তখন গুরুবাক্যই একমাত্র নিয়ামক। বাস্তবিক পক্ষে সদ্‌গুরুর উপদেশ শাস্ত্রবাক্য বা 'মহাপুরুষের বচন হইতে কোনও অংশে ভিন্ন না হইলেও উহা সাধকের ব্যক্তিগত অধিকার অনুসারে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া কর্ম্ম-প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কিন্তু উহা বুঝিবার জন্য এবং উহাতে নিষ্ঠা দৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনা এবং মহাজনগণের চরিত ও উপদেশাদির আলোচনাও আবশ্যক।

আমরা যে মহাপুরুষের পুণ্য প্রসঙ্গের আলোচনার অঙ্গরূপে এই তত্ত্ব-কথার অবতারণা করিতেছি, তিনিই ইহার প্রাণস্বরূপ। সাক্ষাৎভাবে এবং পরোক্ষে, স্থূল শব্দের আশ্রয়ে এবং অনৌপদেশিক প্রাতিভ জ্ঞানরূপে, শুদ্ধ উপদেশচ্ছলে অথবা জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া, তিনি যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারই অতিক্ষুদ্র একদেশ মাত্র বর্ত্তমান আলোচনায় প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সদ্‌গুরু শিষ্যকে অসংখ্য উপায়ে উপদেশ দিয়া থাকেন—শুধু বাক্য-প্রয়োগের দ্বারাই যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা নহে। অনেক সময়ে বাহ্যদৃষ্টিতে মৌন অবলম্বন করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে বোধ রূপে উদিত না হইলে চিত্তের দৃঢ়মূল সংশয় শুধু শুদ্ধ যুক্তিপূর্ণ কথার দ্বারা বিদূরিত করা যায় না। 'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ—ইহা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। চৈতন্যরূপী গুরু মনোদর্পণে চিদালোক সঞ্চার না করিলে মনের চাঞ্চল্যরূপ সংশয় এবং আবরণরূপ মিথ্যাজ্ঞান কখনই দূর হইতে পারে না। এই শক্তির সংক্রমণ বৈখরী বা স্থূল শব্দকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে, এবং না করিয়াও হইতে পারে। উচ্চতর ভূমির জ্ঞানের প্রকাশ সম্বন্ধে স্থূল শব্দের কোনই কার্য্যকারিতা নাই, উহা সাক্ষাৎভাবে গুরুশক্তির প্রভাবে হৃদয় হইতে আবির্ভূত হয়। সাধকের চিত্তগত অবস্থা অনুসারে জ্ঞানের অবতারণাও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। জ্ঞান নির্ম্মল হইলেও আধারের মলিনতা বশতঃ প্রকাশিত হইবার সময়ে অল্পাধিক মলিন ও বিকৃত রূপ ধারণ করে। সেটা জ্ঞানের দোষ নহে আধারেরই দোষ। বর্ত্তমান স্থলেও তাহাই মনে করিয়া প্রকাশগত অসম্পূর্ণতা উপেক্ষা করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজ্যের আনুষঙ্গিক কতিপয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বাবাজীর মতামত এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রণালীর মাধুর্য্য কেহ আস্বাদন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, একটি খণ্ড পুষ্প হইতে যেমন পুষ্পবনের অখণ্ড মাধুরী ও সুষমা অনুভূত হয় না, সেই প্রকার মহাপুরুষের জীবনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরিহার করিয়া শুধু তাঁহার উপদেশ হইতে তাঁহার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বাবাজীর তত্ত্বব্যাখ্যা-প্রণালীতেও এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যখন যে উপদেশ দান করেন অথবা যে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ পূর্ব্বক যুক্তি-সহকারে ব্যাখ্যা করেন, প্রয়োজন হইলে এবং অধিকারানুসারে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন। ইহার ফলে শ্রোতার মনে ব্যাখ্যাত তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা অঙ্কিত হইয়া যায়। গ্রন্থ পাঠ হইতে এই সকল সৌকর্য্য পাইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, তথাপি শক্তিমান্ মহাত্মার উপলব্ধির দিক্ হইতে তত্ত্বকথার আলোচনাও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আশা করি এই প্রকার আলোচনাও একেবারে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানুষ কি চায়?

জিজ্ঞাসু—বাবা, আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে। অনেক দিন হইতে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, ইহার সমাধান না হইলে আমার চিত্তের শান্তি নাই। প্রশ্নটি আর কিছু নহে—মানুষের জ্ঞেয় বস্তু কি, তাহারই স্বরূপ নির্দ্ধারণ। সংসারে জ্ঞানের বিষয় বহু দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার যে প্রকার রুচি ও প্রবৃত্তি, সে সেই প্রকারেই জ্ঞানের অন্বেষণে তৎপর থাকে—কিন্তু জ্ঞানের অন্বেষণ করিয়াও কাহাকেও পূর্ণ-জ্ঞানসম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে জানিবার বিষয় অনন্ত রহিয়াছে। জানিতে গিয়া জানার অন্ত পাওয়া যায় না, জ্ঞান পিপাসাও নিবৃত্ত হয় না। তাই মনে হয়, মানুষের আপন জ্ঞেয় পদার্থের সহিত পরিচয় নাই।

বক্তা—বৎস, তুমি সত্যই বলিয়াছ, মানুষ জানে না তাহার জ্ঞানের বিষয় কি। যদি তাহা জানিত ও জানিয়া তাহার অনুসন্ধান করিত, তাহা হইলে একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই সফলকাম হইত। যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার বাকী থাকে না, তাহাই জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়। তাহাকে বাদ দিয়া আর যাহাই জানিতে চেষ্টা কর, চেষ্টামাত্রই সার হইবে। কায়াকে বাদ দিয়া ছায়া জানিবার উদ্যম বিচারশীল মনুষ্যের পক্ষে হাস্যাস্পদ নহে কি?

জি।—তাহা হইলে মানুষের যথার্থ প্রশ্ন কি? এমন কি প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর না পাইলে তাহার সংশয়াকুল চিত্তের সংশয় কখনই দূরীভূত হইবে না? জগতের সমগ্র জ্ঞান-সম্পদ ও ক্রিয়াশক্তির অধিকারী হইলেও তাহার চিত্ত শান্তিলাভ করিবে না?

ব।—মানুষ বস্তুতঃ কি চায় ও কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহা লাভ করিতে পারিবে, ইহাই তাহার যথার্থ প্রশ্ন। মানুষের পুরুষার্থ কি ও তাহার সাধন কি—অজ্ঞানী এবং উৎপথগামী জীবের পক্ষে ইহাই প্রথম ও প্রধান জিজ্ঞাস্য। এই জিজ্ঞাসাকে হৃদয়ে জাগরূক না রাখিয়া তুমি অন্য যাহা কিছু জানিতে চেষ্টা কর, জানিবার আকাঙ্খা কখনই নিবৃত্ত হইবে না।

জি।—মানুষ কি চায়, তাহা কি সে জানে না? আমার ত মনে হয়, যে যাহা চায়

সে তাহা জানে—জানে বলিয়াই তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে! কেহ ধন চায়, কেহ যশ চায়, কেহ রূপ চায়, কেহ বা ভোগ-বিলাস চায়—সকলেই যে এক বস্তুই" চায়, এমন নহে। তবে যে যাহা প্রার্থনা করে তাহার জন্যই সে উদ্যম করে। অপ্রার্থনীয় বস্তুর জন্য উন্মত্ত ভিন্ন কে পরিশ্রম করিয়া থাকে।

ব।—মোহ-বিকারে আচ্ছন্ন মনুষ্য উন্মত্তভাবেই ত চলিয়াছে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও বিচার সহকারে জগতের অবস্থাটি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সব বুঝিতে পারিবে। মানুষ নিজেও নিজের প্রার্থনীয় বিষয় জানে না ও তাহার উপলব্ধির সাধন কি, তাহার সন্ধান রাখে না। যদি জানিত, তাহা হইলে তাহার এ দশা হইত না। তাহা হইলে সে চঞ্চল হইয়া হাহাকার করিতে করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিত না। কিসের তাড়নায়, কোন্ মহারত্নের অন্বেষণে, জীব এতকাল হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?—কিসের জন্য সে এই প্রকার দুর্গম অরণ্য, বিশাল মরু-কান্তার, তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখর, চির-তমসাচ্ছন্ন পাতালগহ্বর, অপার সমুদ্র-গর্ভ ভেদ করিয়া চলিয়াছে?—দিবসের কর্ম্মজালে, নিশীথের মহাসুষুপ্তিতে, কখনও নিঃসঙ্গ একাকী, কখনও বা জনসঙ্ঘের কোলাহলে, সুদূরের তীর্থযাত্রীর ন্যায় সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া উদাস প্রাণে বিভোর মনে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে? উত্থানে-পতনে, শয়নে-জাগরণে, সুখে-দুঃখে, পাপে-পুণ্যে, কোন অপূর্ব্ব স্বপ্নময়ী আশা তাহাকে চালিত করিতেছে? মানুষ জীবন-ভোর খুঁজিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু কি খুঁজিতেছে তাহা সে জানে না। সে মনে করে, ধন তাহার কাম্যবস্তু, কিন্তু ধন পাইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না। তখন আরও অধিক ধন আকাঙ্খা করে, অথবা হয়ত তাহার ধনের আকাঙ্খা পুত্রাকাঙ্খায় পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু পুত্রলাভ করিলেই যে তাহার আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয়, তাহা নহে। তখন আবার যশোলিপ্সা তাহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তোলে। আসল কথা, তাহার প্রার্থনীয় কি, তাহা সে নিজেই জানে না। ব্যাপারটি আশ্চর্য বটে, কিন্তু ইহা সত্য। মানুষের এই অশান্তির মূলে যে একটি গভীর অভাব রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ধন, জন, যশ, ভোগ বা রূপ—যাহা কিছু বল, কিছুরই অভাব প্রকৃত অভাব নহে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রাণের অভাব মিটে না। আর সত্য সত্য সে যাহা চায় বলিয়া মনে করে তাহাও সে পায় না। তাহার চাওয়া ও পাওয়া উভয়ই বাস্তবিক পক্ষে ভ্রান্তির বিলাস মাত্র। মানুষ এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে নাট্যলীলাসূত্রে অনাদিকাল হইতে কতবার কত বেশ গ্রহণ করিয়াছে ও ত্যাগ করিয়াছে, তাহা এই চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব মিটাইয়া সমন্বয় স্থাপনের জন্য।

নরকের কীট হইতে ব্রহ্মলোকের আধিপত্য পর্য্যন্ত যাবতীয় অবস্থা সে অনুভব করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার অভাব-নিবৃত্তি হয় নাই। যুগে-যুগান্তরে লোকে লোকান্তরে কত জন্ম ব্যাপিয়া তাহার সাধনা চলিয়াছে, কিন্তু সে "পাইয়াছি" বলিয়া এখনও শান্ত হইতে পারে নাই। যাহা পাইলে সব পাওয়ার আশা চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়, সেই চিন্তামণি ধন এখনও সে পায় নাই।

জি।—বাবা, সত্যই এমন কোন বস্তু আছে কি, যাহা পাইলে আর কিছু পাইবার জন্য ইচ্ছা জাগিবে না, যাহা পাইলে পরমানন্দ ও পরম শান্তির উপলব্ধি হইবে?

ব।—হাঁ, আছে বই কি? আছে বলিয়াই ত আজও সংসারে শত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের ক্ষীণ আভা দেখিতে পাও, তাই অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারেও জ্ঞানের প্রভা একেবারে লুপ্ত হয় না, সেই জন্যই মৃত্যু-রাজ্যে বাস করিয়াও নিরন্তর কালের প্রবল প্রতাপ অনুভব করিয়াও—মানুষের হৃদয় অন্তরে অন্তরে অমৃতের জন্য লালায়িত হয়? তুমি কি মনে কর, মানুষের এ আকাঙ্খা অমূলক ও অসার? তাহা মনে করিও না। সত্যই এমন বস্তু আছে, যাহা পাইলে সব সাধা মিটে, সব কামনা তৃপ্ত হয় সব আশা সফল হয়। যে যাহা চায়, ভুল করিয়া চায়—বাস্তবিক সেই বস্তুই সকলে চায়। দীনের ঐশ্বর্য্য-লালসা, বদ্ধের মুক্তি-কামনা রূপানুরাগীর রূপ-তৃষ্ণা, কামুকের কাম-পিপাসা, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলিপ্সা—যাহার যে আকাঙ্খাই থাকুক, সেই এক আকাঙ্খারই নামান্তর। বৎস, যাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, যে জগতের অন্তর্নিহিত নিবিড় বেদনার অনুভূতিতে বিবশ হইয়াছে, তাহাকে সংসারের আড়ম্বর ও ভোগবিলাসে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। যদি মানুষের কিছু জানিবার থাকে, তবে ইহাই প্রথম ও প্রধান। মানুষ যাহা চায়, তাহাই তাহার পুরুষার্থ, যে উপায়ে পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় তাহাই উহার সাধন।

জি।—বাবা, তাহা হইলে ঐ পুরুষার্থ কি? শাস্ত্রে নানা স্থানে নানা কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল মতে বস্তুতঃ বিরোধ না থাকিলেও আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। তাই এ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত মত কি, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।

ব।—মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বভাবের উপলব্ধি। জীব স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়াই দুঃখের কূপে নিপতিত হইয়াছে। পুনরায় সাধনা প্রভৃতি দ্বারা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তাহার যাবতীয় অভাব মিটিয়া যাইবে। যাহাকে পরমানন্দ ও পরম শান্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা বস্তুতঃ স্বভাবে

অবস্থানের পূর্ব্বাভাস ভিন্ন অপর কিছু নহে। পরম-পদসম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা এই অবস্থা সম্বন্ধে বেশ খাটে। তবে শাস্ত্রের বর্ণনা পূর্ণ সত্যের জ্ঞাপক নহে। যিনি যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ততটুকুই ভাষা মুখে উপদেশরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যিনি যুক্তাবস্থায় পূর্ণ সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও উপদেশ দান ও গ্রন্থ-নির্ম্মাণ কালে আপন আপন চিত্তগত সংস্কার ও বুদ্ধিশক্তির প্রকাশানুযায়ী উহার ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। সেই জন্য উপলব্ধিতে অভেদ থাকিলেও বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভেদ আসিয়া পড়িয়াছে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া প্রকট করিতে গেলে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। অসীম বস্তু সীমার নিগড়ে কখনই আবদ্ধ হতে পারে না। যাহা সীমাতে আবদ্ধ হয়, তাহা অসীম নয়। অপরোক্ষ-তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশিত করা যায় না।

আবরণ-নিবৃত্তি মুক্তির নামান্তর। যে আবরণে আচ্ছন্ন থাকিয়া স্থূলভাবে অভিনিবিষ্ট আছ, যখন সেই আবরণ অপগত হইবে, তখন তুমি সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবে, অর্থাৎ তুমি নিজেকে সূক্ষ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং সকল পদার্থেরই সূক্ষ্মাবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে। স্থূলভাবে নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। স্থূলের সঙ্গ হইতে প্রিয়াপ্রিয়-বোধ জাগে, অথবা সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। স্থূল-সম্বন্ধ না থাকিলে সুখ-দুঃখ বোধ বা যাহাকে প্রচলিত ভাষায় 'ভোগ' বলে তাহা থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই অবস্থাতেও স্বভাবের স্ফূরণ হয় না। তখনও অভাব থাকে—অবশ্য সে অভাব তোমাদের এই পৃথিবীর অভাবের মতন নহে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাই যে একমাত্র অভাব তাহা নহে—তাহা বিশেষভাবে না থাকিলেও অন্যজাতীয় অভাব থাকে। এই স্তরও ভেদ করিয়া উঠিলে পরমানন্দের আস্বাদন পাওয়া যায়। ইহাকেই ভক্তগণ প্রেম বা অমৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহা বৈষয়িক সুখের ন্যায় মোহক নহে, তবুও মোহময়। একটা নিবিড় ও গভীর আনন্দ ভিন্ন এখানে আর কিছুরই অনুভব পাওয়া যায় না। এই অবস্থা পর্য্যন্ত আয়ত্ত হইলে স্বভাব প্রাপ্ত হইতে আর বিশেষ বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ, এই প্রেমেই স্বভাবে স্থিতি হয়। স্বভাবে স্থিতি কি প্রকার, তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না। যাহার সে অবস্থা জাগিয়াছে, সেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। অন্যকে তাহা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। জীব মাত্রেরই তাহাই লক্ষ্য,—তাহাই পরম পুরুষার্থ। তাহার জন্যই চেষ্টা করিতে হয়। বৎস, এই বাহ্যজগৎ হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হও, পরে তাহাও ত্যাগ করিয়া ভিতর-বাহির সমান করিতে চেষ্টা কর। যখন তাহা

পারিবে তখন সেই অদ্বৈতরূপিণী মাতার স্নেহ-শীতল অঙ্কে স্থান লাভ করিয়া ধন্য হইবে। শিশু হইয়া মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করিলে লীলাময়ীর লীলা-রহস্য একটু একটু বুঝিতে পারিবে। 'একটু একটু' বলিলাম—কারণ এ গুহ্য বিষয় ব্রহ্মাদিরও অগম্য। তাঁহারাও এ তত্ত্বাতীত তত্ত্বের নিগূঢ় প্রহেলিকা সম্পূর্ণরূপে ভেদ করিতে সমর্থ হন না।

জি।—বাবা, তাহা হইলে আপনি স্বভাবে স্থিতিকেই জীব মাত্রের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। জীব জানিয়া বা না জানিয়া তাহাই চায়। যতদিন স্বভাবে অবস্থান করিতে না পারে, ততদিন তাহার অশান্তি ও চাঞ্চল্য দূর হইতে পারে না। তবে কি ভগবৎ-প্রেম বা মুক্তি জীবের পরম পুরুষার্থ নহে?

ব—বৎস, মুক্তি না হইলে কি স্বভাবে স্থিতি হয়? স্বভাবের আবরণ বা আবরণাভাসকেই ত বন্ধন বলে। আবরণ না কাটাইতে পারিলে স্বভাবের উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে? আর যে প্রেমের কথা বলিতেছে, তাহাও মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় না। প্রেমাবস্থাতেই পরমানন্দের আস্বাদন হইয়া থাকে। প্রেম পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে আর স্বভাব-প্রাপ্তির বিলম্ব কি? স্বভাবের বিপর্য্যয়ই রোগ—স্বভাবের প্রতিষ্ঠাই রোগ-নিবৃত্তি বা স্বাস্থ্য। জীবমাত্রই বিকারগ্রস্ত হইয়া রুগ্নাবস্থায় প্রলাপ বকিতেছে ও যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদে করিতেছে। বিকার কাটাইয়া যখন স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে, তখন আর কোন প্রকার অশান্তি থাকিবেনা। ইহাই ত সকলে চায়।

জি—বাবা, অনেকে বলেন যে, মুক্তাবস্থায় জীবের জীবভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়। যদি সত্যই তাহা হয়, যদি সত্যই জীব আপন সত্তা স্থির রাখিতে না পারে, তাহা হইলে মুক্তির সার্থকতা কোথায়? যে অবস্থাতে আত্মবিলোপ হয়, তাহা কাহারও জ্ঞানতঃ প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

ব—বৎস, শুধু অসার শব্দজালে নিজেকে জড়িত করিয়া সরল বোধের পথ জটিল করিও না। সরল সত্য চিরদিনই সরল, আমরাই সহস্র আবর্জ্জনাতে তাহাকে কুটিল করিয়া ফেলি। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেই শব্দমোহ কাটিয়া যাইবে—বস্তু-স্বরূপের পরিচয় আপনিই নির্ম্মল অন্তঃকরণে কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিবে। এসব বিষয়ে ভালরূপে আলোচনা করিবার অবকাশ এখন নহে। এখন সংক্ষেপে দু-একটি কথা মাত্র বলিতেছি। দেখ, জীব অনিত্য নহে—জীবত্ব তাহার স্বভাবের অন্তর্গত। জীবত্ব যদি আগন্তুক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে আবরণ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা নহে। ঈশ্বরও যেমন নিত্য-সত্তা, জীবও তাহাই।

তাহার কি ধ্বংস আছে গো? জীবও ঈশ্বর একই অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বের দুইটি পৃষ্ঠ মাত্র—এককে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। কোন অনির্ব্বচনিয় কারণে সে আবরণে আচ্ছন্ন হইয়াছে—জড়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, ক্রিয়াশক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। ইহা মায়ার খেলা। মহামায়ার কৃপায় যখন এ আবরণ কাটিয়া যায়, তখন জীব স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটা যে একটা নূতন অবস্থা তাহা নহে। আবরণ কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আত্মস্মৃতি জাগিয়া উঠে, পূর্ব্বাভাবের উদয় হয়, সে অনাবৃত মুক্তপদে নিজেকে প্রকাশমান দেখিতে পায়। ইহাই জীবের ঈশ্বর সাযুজ্য। জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ আনন্দময়—মুক্ত হইয়াই জীব এই আনন্দের উল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠে। মুক্তির পূর্ব্বে এই রসাস্বাদন সম্ভবপর হয় না। ঈশ্বরের কখনই আবরণ নাই—তিনি সর্ব্বদাই স্বভাবস্থিত। মুক্ত জীবও এই প্রকার ঈশ্বর-ভাব উপলব্ধি করে। মুক্তাবস্থার এই আনন্দই ভক্তি ও প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে অজ্ঞানী ও বদ্ধ, তাহার যেমন ঐশ্বর্য নাই, তেমনই প্রেমেও অধিকার নাই—মুক্তি না হইলে, স্ব-ভাব না জাগিলে, প্রকৃত আনন্দের সম্ভোগ হয় না।

জীবের জীবত্ব কখনই যায় না—মুক্ত হইলেও জীব জীবই থাকে। তবে তাহাতে ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মভাবের বিকাশ হয়, এইমাত্র বিশেষ। এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া তুমি জীবের স্বরূপ—নিবৃত্তি হইল বলিয়া বর্ণনা করিতে পার বটে, কিন্তু তোমার অন্তর্দ্দর্শী নয়ন থাকিলে দেখিতে পাইতে, জীবত্বের লোপ হয় নাই, কখন হইতেও পারে না। ঈশ্বরে যেমন জীবভাব আছে, জীবেও তেমনি ঈশ্বরভাব আছে—যখন যে-ভাবের প্রাধান্য হয়, তখন তাহাই ক্রিয়াশীল হয় ও আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরে জীব-শক্তি আছে বলিয়াই তিনি প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছাবশতঃ জীবরূপে প্রকটিত হইতে পারেন। সেই প্রকার, জীবেও অব্যক্ত ভাবে ঐশী শক্তি আছে বলিয়া সাধনা দ্বারা মুক্তাবস্থায় তাহার বিকাশ হয়। না থাকিলে এরূপ কদাচ হইতে পারিত না। কারণ যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহার স্ফূর্ত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না। জীব ও ঈশ্বরশক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জড়শক্তি সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। যাহাকে তোমরা জড় বলিয়া বর্ণনা কর, তাহাতেও জীবভাব এবং ঈশ্বরভাব, অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ, উভয়ই আছে। নিজের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হইলে তাহারই প্রভাবে জড় বস্তুর সর্ব্বত্রই চৈতন্য দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। অচেতন শুষ্ক জড় পদার্থ বলিয়া জগতে কিছুই নাই, ইহা তখন বুঝিতে পারা যায়। ইহাকেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা বলে।

জ্ঞানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জড় বস্তুর সত্তাই অব্যক্ত হইয়া যায়, এক অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিরাজমান থাকে।

এই প্রকার ভক্তি সাধনার উৎকর্ষে সর্ব্বত্র আনন্দের আস্বাদন হয়। ইহাই ঈশ্বরোপলব্ধি। আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, দূরে নিকটে, মিত্রে ও শত্রুতে, সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই একমাত্র আনন্দময় ঈশ্বরসত্তা অনুভূত হয়,— যে দিকে লক্ষ্য করা যায় সেইদিকে তাহাকেই সম্ভোগ করা যায়, এক অনন্ত অক্ষয় আনন্দ-প্রবাহ ব্যতীত কোথাও আর কিছু বোধগম্য হয় না,—ভিতরে, বাহিরে, নিন্দাতে, স্তুতিতে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বদেশে নিয়ত মধুক্ষরণ হইতে থাকে। প্রহ্লাদ স্ফটিক-স্তম্ভেও হরিকে দেখিতে পাইয়াছিল—সবই তার মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার নিকটে ক্রিয়াশীল জড়শক্তিও হ্লাদিনী শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল—বিষ অমৃতে পরিণত হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে জীবেও অব্যক্তভাবে জড়শক্তি নিহত আছে—তাহার প্রাধান্যবশতঃ জীব বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর-সত্তাতেও অব্যক্তভাবে জড়শক্তি আছে। মোট কথা, সব ভাবেই সব ভাব জড়িত আছে। যখন যেটা প্রধান হয় তখন সেটাই কার্য্য করে—অন্যান্য ভাব তাহার অনুসরণ করে মাত্র।

জীব বল, শিব বল, জড় বল—সবই এক মহাশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ—"একৈব সা মহাশক্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" সবই সত্য, অথচ মূলে কিন্তু এ-সব কিছুই নাই—সাম্য কালে সব একাকার হইয়া এক সত্তাতে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু কিছুরই বিনাশ নাই। সুতরাং জীব যখন শিবত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভ করে, তখনও তাহার জীবত্ব ঘোচে না।

দেখ, কোরক হইতে ফুটন্ত ফুলের বিকাশ হয়, কিন্তু ফুলে আর কোরকের সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সেটা তোমাদের স্থূল দৃষ্টির কথা। আমি এই মুহূর্ত্তে ফুটন্ত ফুলটিকে আবার ঠিক পূর্ব্ববৎ কোরকে পরিণত করিয়া দেখাইতে পারি। প্রসঙ্গতঃ তোমাদিগকে বহুবার বহু প্রকারে তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু তাহার তত্ত্ব-চিন্তা করিয়াছ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কোরকে যেমন পুষ্পভাব বর্ত্তমান আছে, তেমনই প্রস্ফুটিত পুষ্পেও কোরকত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ফুল ফুটিয়াছে বলিয়াই যে কোরকত্বের ধ্বংস হইয়াছে, তাহা নহে—তুমি যেমন কোরকে পুষ্প দেখিতে পাওনা, তেমনি পুষ্পেও কোরক দেখিতে পাওনা— তোমার দেখা ও না দেখার কোনই মূল্য নাই। ঘৃত হইতে দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে তৃণ পর্য্যন্ত বাহির করা যাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে। জগতের যাবতীয় পদার্থ মিশ্র বলিয়া যে-কোন বস্তু হইতে

তোমার ইচ্ছানুসারে আমি যে-কোন বস্তু বাহির করিয়া দেখাইতে পারি। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কিছুরই আত্যন্তিক অভাব হয় না। সুতরাং যখন মুক্তিতে ঈশ্বর-ভাবের বিকাশ হয়, তখনও জীবত্বের লোপ হয় না—তবে ঐশ্বরিক শক্তির প্রাধান্যে জীবশক্তির বিশেষ ক্রিয়া হইতে পারে না, ইহা অবশ্য সত্য।

জি—সমুদ্রে যখন শত শত নদ-নদী মিলিত হয়, তখন কি তাহাদের পার্থক্য থাকে? তখন কি সেই সকল নদী আপন আপন নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে না?

ব—পার্থক্য চিরকালই থাকে, যদি দেখিবার বা অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে তাহা ধরাও যায়। সমুদ্র হইতে আমি গঙ্গাজল ও সিন্ধুনদের জল পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারি। তুমি দশ হাজার মণ জলে এক ছটাক দুধ ঢালিয়া দিলে তাহা আর দেখিতে পাও না—মনে কর, দুধ জলে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা তোমার ভ্রান্তি, দুধ নিজের সত্তা কখনই হারায় না—তবে জলের পরিমাণ অধিক বলিয়া দুধ চিনিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু যে জ্ঞানী ও যোগী, সে তাহা পারে।

জি—ইহা হইতে মনে হয়, ঈশ্বরের সত্তাতে মগ্ন হইলেও জীবের স্বকীয় সত্তা লুপ্ত হয় না। এখন প্রশ্ন এই—এই মগ্ন জীবকে কি পুনরুদ্ধার করা যায়?

ব—মগ্ন হইলেও জীবের সত্তা যে থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে পুনরুদ্ধারও যে না হইতে পারে, তাহা নহে। তবে যে ঈশ্বর-তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া মহাশক্তিতে প্রবিষ্ট হয়, অন্যের পক্ষে তাহাকে বাহির করিতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। কারণ, যে সেই রূপ চেষ্টা করিতে যাইবে তাহার সেই প্রবলাবর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজেরই বোধ হারাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া জীবের সত্তা-লোপ হয়, এমন নহে।

জি—শাস্ত্রে আছে, প্রকৃতি-লয় হইলে পুনরুত্থান হয়, কিন্তু কৈবল্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে আর উত্থান হয় না। বেদান্তেও "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্রে মুক্ত পুরুষের পুনরুত্থান অস্বীকৃত হইয়াছে। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। অর্থাৎ যেখানে গেলে আর ফিরিতে হয় না তাহাই ভগবানের স্ব-ধাম। জৈনগণ বলেন, সিদ্ধশিলা অতিক্রম করিয়া আলোকাকাশে প্রবিষ্ট হইলে আর প্রপঞ্চে আকৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধগণ বলেন, অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধের পরে ব্যুত্থান হয় বটে, কিন্তু যাহার প্রতিসংখ্যা-নিরোধ হইয়াছে, তাহাকে আর ফিরিতে হয় না। অন্যান্য দেশের জ্ঞানিগণও প্রকারান্তরে এই কথা বলিয়াছেন। সকলের মতেই এমন

একটি অবস্থা আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা চিরদিনের জন্য বিদূরিত হয়। আপনি কি তাহা স্বীকার করেন না? তবে কি আপনার মতে নির্ব্বাণ বলিয়া কোন পদার্থ নাই?

ব—স্বীকার করি বই কি। তবে তোমরা যে-ভাবে কর, আমি সে-ভাবে করিনা। জীব নিজের সত্তা না হারাইলেও সত্তা-বোধ হারাইতে পারে। বোধ না থাকিলে সত্তা থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাই। অপ্রকাশমান সত্তাকে অসৎ বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না। এই স্ব-সত্তা-বোধের লোপাবস্থাই নির্ব্বাণ। অবশ্য, দুর্ব্বল জীব অকস্মাৎ প্রবল শক্তির সম্মুখীন হইলে অভিভূত হইয়া পড়ে, অজ্ঞান হয়। যাহার প্রভাবে সে এই প্রকারে জ্ঞান হারায়, তাহার মাত্রা অনুসারে জীবের ব্যুত্থান-সম্ভাবনা নিয়মিত হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধারণ জীব যে স্তরেতে অভিভূত হয়, তদপেক্ষা অধিক শক্তি যাঁহার আয়ত্ত আছে, তিনি ইচ্ছা করিলেই ঐ স্তর হইতে জীবকে বাহির করিয়া আনিতে পারেন। ঈশ্বরাবস্থা পর্য্যন্ত জীবের ব্যুত্থান-সম্ভাবনা আছে, কারণ যোগী স্ব-সত্তা-বোধ সংরক্ষণ করিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারেন। কাজেই, ইচ্ছা থাকিলে এই অবস্থা হইতেও জীবের বহিরাগমন সম্ভবপর।

কিন্তু ইহার পরে যে অবস্থা, তাহার আদিঅন্ত নাই। সেই অকূল পারাবার হইতে পুনরাবর্ত্তন অসম্ভব। সেখানে ইচ্ছা নাই জ্ঞান নাই, ভাব ও অভাব কিছুই নাই— সেখানে ভেদও নাই, অভেদও নাই, এক অনন্ত অপার ও অতল জলরাশি আপন স্তিমিত গাম্ভীর্য্যে আপনি নিমগ্ন, আবার আপনার সহিত আপনিই ক্রীড়া-পরায়ণ। সেইখানে ভোক্তা ভোগ্য ভোগ কিংবা জ্ঞাতা, জ্ঞেয় জ্ঞান কিছুই নাই। এক অনন্ত প্রকাশ বা অপ্রকাশ অনাদিকাল হইতে যেন নিরন্তর আপনাকেই আপনি দেখিতেছে, অথবা যেন দেখা-অদেখার অতীত কি-এক অব্যক্ত অচিন্ত্য পরম ভাবে অথচ ভাবাতীত স্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। ইহাই মহাশক্তির চরণচ্ছায়া। জীব এই অকূল পাথারে প্রবিষ্ট হইলে তাহার আর বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকে না, অন্যের পক্ষেও তাহাকে বাহির করিবার আশা নাই। কারণ, কেহ আপন পৃথক্ সত্তাবোধ রক্ষা করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাহাকে তোমরা ঈশ্বর বল, তিনি এই অনন্ত-স্বরূপা মহা-জননীর অঙ্কস্থিত শিশুমাত্র—ইঁহারই কণামাত্রা শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তিনি নিত্য-যোগীর আদর্শভূতরূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পাদন করিয়াও নিষ্ক্রিয় ধ্রুবাবস্থাতে বর্ত্তমান আছেন। ঈশ্বরেরও এমন সামর্থ্য নাই যে, তিনি মাতৃ-গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার বাহির হইয়া আসেন। তবে মায়ের ইচ্ছা হইলে সকলই সম্ভবপর

আমার মনে হয়, শাস্ত্রের ভাষায় ইহাকেই নির্ব্বাণ বলে। ইহা যে প্রার্থনা করে করুক, কিন্তু যোগীর ইহা প্রার্থনীয় নহে। যোগী জ্ঞান হারাইয়া অভিভূত হইতে চায় না, তাই সেই নির্ব্বাণের প্রার্থী নহে। সে মায়ের কোলে উঠিয়া মায়ের সকল খেলা দেখিতে চায়, এবং মায়ের কৃপায় খেলা দেখাইবার অধিকারও লাভ করে।

জি—কিন্তু ইহা কি সম্ভবপর? সেই বিরাট সত্তার সংসর্গলাভ করিয়াও নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা কি প্রকারে হইতে পারে? প্রবলের সংঘর্ষে দুর্ব্বল চিরদিনই অভিভূত হইয়া থাকে। যদি সত্য সত্যই সেই পরম বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয়, তবে কি আর জীব নিজের পার্থক্য-বোধ রাখিতে পারে?

ব—হাঁ, তা পারে বৈ কি? প্রবলের সংসর্গে অভিভূত হওয়ার ভয় আছে বলিয়াই ত সবল হওয়ার ব্যবস্থা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। এই বল বা শক্তি সঞ্চয়ই ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনার উদ্দেশ্য। শক্তির আরাধনা ভিন্ন শক্তিলাভ হয় না—শক্তি ব্যতিরেকে স্ব-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। তোমরা একটু সামান্য তেজেই অভিভূত হইয়া পড়— সেই প্রবল তেজের সাহচর্য্য কি প্রকারে সহ্য করিবে? প্রথমে তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হও—তবে তাঁহার কোলে উঠিলে আর অভিভূত হইবে না। লৌহখণ্ড যেমন অগ্নির আবেশে অগ্নিময় হইয়া যায়, অথচ অগ্নিময় হইয়াও লৌহই থাকে, তদ্রূপ সেই মহাশক্তির আরাধনা দ্বারা নিজেকে শক্তিময়, তোজোময়, সম্পন্ন কর—পরে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জাগ্রত থাকিতে পারিবে, অনন্তের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াও নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না। যদি সত্য সত্যই মায়ের সন্তান হইতে পার, তবে আর মায়ের কোলে উঠিতে ভয় কিসের? ভগবানের কৃপাবলে বলী হইয়াই ভক্ত ভগবানকেও পরাজয় করে—এ কথা ত বহুবার পুরাণে পাঠ করিয়াছ। জানিও, ইহা খাঁটি সত্য। তাঁহারই অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে হইবে—অন্য কোন অস্ত্র সেখানে কার্য্য করিবে না।

জি—তাহা হইলে নির্ব্বাণের পথে না যাইয়া মায়ের কোলে শিশুর মতন চিরদিনই তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকা যায়। সত্যই ত, যে মাতৃস্নেহের আস্বাদন পাইয়াছে, তাহার আর ভয় কি? কিন্তু একটি কথা। আপনি সেই পরমভাবকে মাতৃভাবে বর্ণনা করেন কেন?

ব—তবে আর কোন্ ভাবে কি করিব? যিনি সকল ভাবেরই স্বরূপভূত হইয়াও সকল ভাবের অতীত, তাঁহার কি বর্ণনা হয় গো? তিনি একাধারে মা ও বাবা—দুই-ই। কিন্তু শিশুর পক্ষে মায়ের চেয়ে অধিকতর নিকটবর্ত্তী আর কে আছে? তাই মাকেই সে চিনে, মাকেই সে ডাকে—মায়েরই প্রতাপে সে

বাবাকে চিনিতে পারে। তখন ক্রমশঃ সকল ভাবের সহিতই তাহার পরিচয় হয়। বৎস, প্রথমে শিশু হও, মনটিকে শিশুর মতন সরল ও নির্ম্মল কর, সংসারের কূট তর্কজালরূপ জটিলতা পরিত্যাগ কর, অহঙ্কার ও কর্তৃত্বাভিমান পরিহার কর, বাহিরের সকল আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া একবার অন্তরের অন্তরতম স্থলে একাকী প্রবেশ কর ও কাতর প্রাণে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে থাক— দেখিবে, সন্তানের ব্যাকুল আহ্বানে বিশ্বজননী আবির্ভূত হন কি না। মায়ের মতন এমন স্নেহ কাহার? যদি প্রকৃত ভালবাসা কোথাও থাকে, ত মায়ের প্রাণেই তাহা আছে। তাই মাকে জাগাও, জাগাইয়া মায়ের কোলে উঠিয়া বস,—সকল অভাব মিটিয়া যাইবে, সকল আশঙ্কা দূর হইবে। শিশুর পক্ষে মাতৃ-অঙ্কই ত প্রকৃত স্থান। সেখানে বসিয়া যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। যখন যে ভাবের উদয় হইবে, তখন সেই ভাবের বিকাশ হইবে—ইচ্ছার উন্মেষ হওয়ামাত্রই পূর্ণতা হইবে। সেই মহাভাব-স্বরূপিণীকে প্রাপ্ত হইলে কোন ভাবই আর অপ্রাপ্ত থাকিবে না। পরে আর ইচ্ছারও উদয় হইবে না, সকল ভাব ঘুচিয়া গিয়া ভাবাতীত অবস্থায় স্থিতিলাভ করিবে। মহাভাবই মা, আর ভাবাতীতই বাবা। —একটি শক্তিস্বরূপ, অপরটি শিবস্বরূপ—অথচ উভয়ে কোন ভেদ নাই। মাতা ও পিতা যখন অভিন্ন হইয়া যান, তখন সন্তানেরও পৃথক্ সত্তা থাকে না! তখন শক্তি, শিব ও জীব—তিন একাকার হইয়া যায়। আবার মায়ের কৃপায় জীবের সত্তা-বোধ ফুটিয়া উঠে—রস-বোধ ফিরিয়া আসে। ইহাই মায়ের খেলা—এই সঙ্কোচ ও বিকাশরূপেই মাতৃলীলার স্ফূরণ হয়। নির্ব্বাণের পথে এই লীলারসের আস্বাদন পাওয়া যায় না। নির্ব্বাণে ব্যক্তিত্ব থাকে না—উহা বিরাট সত্তায় অভিভূত হইয়া যায়।

জি—জগদম্বার কৃপায় জীবভাব অক্ষত রাখিয়াও পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর—সুতরাং জীবত্ব যে আগন্তুক ধর্ম নহে, তাহার যে উচ্ছেদ হয় না, তাহা সত্য কথা।

ব—বৎস, ভাষার বাগুরায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিও না। সাধারণতঃ লোকের জীবভাবের জ্ঞানই নাই—একটা কথা মাত্র শুনিয়া রাখিয়াছে, তাহারই প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন ভাবেরই নাশ নাই, উদ্ভবও নাই—একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে জীব যদি স্ব-ভাবের বোধ রক্ষা করিতে না জানে ও না পারে, তাহা হইলে তাহার অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক। সে অবস্থায় আনন্দ বা শান্তি—কিছুরই বোধ থাকে না। কিন্তু সেখানেও জীবভাব নষ্ট হয় না। যে সে দশায় উপনীত হয়, তাহার পক্ষে

অবশ্য জীবভাব থাকিয়াও না থাকার সমান—কারণ উহার জ্ঞান বা ক্রিয়া কিছুই হয় না। কিন্তু যোগিগণ এই অবস্থা চান না। তাঁহারা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে—স্বয়ং-প্রকাশরূপে মায়ের কোলে সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিতে চান এবং থাকিতে পারেন।

জি—আপনি যাহা বলিলেন, ইহা ত ভক্তগণেরও প্রাণের কথা।

ব— যোগী ভিন্ন আবার ভক্ত কে? যোগীই কর্ম্মী, যোগীই জ্ঞানী, যোগীই ভক্ত ও প্রেমিক—আবার যোগীই সর্ব্বভাবের অতীত। যোগের পরিপক্ক অবস্থাকেই ভক্তি বলে—ভক্তিতেই যোগের চরম উৎকর্ষ।

জি—তবে কি "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার বোধ ভ্রান্তি মাত্র।

ব—ভ্রান্তি বলিতে পার, না বলিতেও পার। ব্যবহারিক ভাষায় সে অবস্থার বোধ প্রকাশিত হয় না। অগ্নিময় লৌহখণ্ড যদি নিজেকে অগ্নি বলিয়া বোধ করে ও বলে "আমি অগ্নি", তবে তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। কারণ, দহন করিবার সামর্থ্য ও অন্যান্য অগ্নিধর্ম্ম তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ উহা মিথ্যাও বটে—কারণ অগ্নিসম্বন্ধচ্যুত হইলে তাহার অগ্নিময়তা থাকে না। তখন সে যে লৌহ, সেই লৌহই থাকিয়া যায়। সুতরাং লৌহ যখন অগ্নিময় হয় তখনও সে বাস্তবিক অগ্নি হয় না। তবে যদি অগ্নির সহিত লৌহের যোগ নিত্য অচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে লৌহের পক্ষে লৌহত্ব সত্ত্বেও 'আমি অগ্নি' এই প্রকার অনুভব সম্ভবপর। সেই প্রকার, যিনি যোগী, যাঁহার যোগ বা সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না, যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে সদাযুক্ত, তিনি ব্রহ্ম না হইলেও নিয়ত-সম্বন্ধ-বশতঃ ব্রহ্মধর্ম্ম সকল তাঁহাতে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব বা বর্ণনা করিলে দোষের হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার স্ব-সত্তা নাই তাহা নহে—তাঁহার স্ব-সত্তা ও তদ্বোধ হারায় না। 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভূতিটিকে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ইহাতেও দুইটি জিনিষ ও তাহার সম্বন্ধ আছে। এই 'আমি'টিই ত বিশুদ্ধ জীবরূপ আত্মা—তাহার বোধ যদি না থাকে তাহা হইলে 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার অনুভব হইতেই পারে না। শুদ্ধ ব্রহ্ম সত্তাতে আমিত্ব নাই—আত্মভাবকে আশ্রয় না করিয়া আমিত্বের অনুভব জাগে না। যখন স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আধারে আমিত্বের স্ফুরণ হয় তখন বন্ধন, আর যখন এই সকল আধার ব্যতিরেকেও তাহার স্ফুরণ হয় তখন মুক্তি। মুক্তাবস্থায় বিশুদ্ধ আত্মবোধ থাকে—উহা ব্রহ্মাশ্রয়ে প্রকাশমান হয়। সুতরাং 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভব একেবারে মিথ্যাও নহে। ইহাই পরমানন্দরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা যোগাবস্থা—এই অবস্থায় আমি-বোধ বা আত্মবোধ লুপ্ত না হইয়া ব্যাপকতা

লাভ করে। ব্রহ্ম যেমন ব্যাপক, ব্রহ্মের সহিত যোগপ্রাপ্ত 'আমি'ও তেমনই ব্যাপক হইয়া পড়ে। অথচ আমিত্বের লোপ না হওয়ার দরুণ বোধ লুপ্ত হয় না। এই অবস্থাকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মভাব বলা যায় না, কারণ ব্রহ্মে অহম্ভাব নাই; অথচ জড় প্রকৃতির আবরণে আচ্ছন্ন জীবভাবও বলা চলে না, কারণ এই অবস্থায় কোন প্রকার আবরণ থাকে না। ইহা ব্রহ্ম ও আত্মার মিলনাবস্থা। এই মিলনই যোগ—ইহাতেই আনন্দ। যোগী এই মিলনেরই প্রার্থী। তিনি একেবারে বোধহীনরূপে মিশিয়া যাইতে চাহেন না। তিনি চাহেন নিজবোধাত্মক, চিদ্‌ঘন পরমানন্দময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে। বোধকে স্থায়ী করিতে পারিলে ইহাই নিত্য আনন্দ— বোধের অতীত হইলে অদ্বৈত-স্থিতিরূপ নির্ব্বাণ বা নির্ব্বাণের আভাস। নির্ব্বাণে 'আমি' থাকে না বলিয়া কোন বোধই থাকে না—যাহা থাকে তাহাকে বোধ বলিতে যাওয়া শব্দের অপব্যবহার মাত্র। যেখানে বোধই নাই সে অবস্থাকে আনন্দময় বলা কিছুতেই চলে না। সেটা আনন্দ ও নিরানন্দের অতীত অবস্থা হইতে পারে, কিন্তু আনন্দ নহে। যাঁহারা নির্ব্বাণকে পরমানন্দময় বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাদের বর্ণিত নির্ব্বাণ পূর্ব্বোক্ত যোগাবস্থারই অন্তর্গত। কারণ দুইটি বস্তুর সংযোগ ভিন্ন আনন্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে না।

জি—হাঁ বাবা, যে সকল বৌদ্ধ-সম্প্রদায় "নির্ব্বাণং পরমং সুখং ততঃ কিং জায়তে ভয়ম্" বলিয়া নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারাও স্পষ্টাক্ষরে উহাকে 'মহাসুখ' বলিয়াই বর্ণনা করেন এবং উহা যে দুইটি বস্তুর পরস্পর সংযোগ হইতে প্রকাশমান হয়, তাহাও বলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে পরমানন্দময় যোগই নির্ব্বাণ-পদবাচ্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণবাদি ভক্ত সম্প্রদায় ঐ অবস্থাকেই দাস্য বলিয়া বর্ণনা করেন, ইহা আমার বিশ্বাস। আত্ম যখন ব্রহ্ম-সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াও ব্রহ্মাশ্রিত ভাবে প্রকাশ পায় তখন উহা দাস ভিন্ন আর কি? মুক্ত হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে দাস্যজ্ঞান বা নিজেকে আশ্রিত বলিয়া বোধ হয়—'এক অনন্ত মহাশক্তির বক্ষে তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া জাগিয়া আছি'; এই বোধ ফুটিয়া উঠে। যে মায়াতীত যোগী, তাঁহারই ভাগ্যে এই বোধ জাগে—সকলে এ আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ, এই দাস্যই প্রভুত্ব বা ঐশ্বর্য্য—কারণ তখন আত্মা আপ্তকাম হইয়া আপন মহিমায় বিরাজ করে। ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যই ঐশ্বর্য্য—জীব তখন জীব থাকিয়াও ঈশ্বর-ভাবাপন্ন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তখন অপ্রতিহত। যে সকল শৈবসম্প্রদায় ঐশ্বর্য্যকেই পরমার্থরূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারাও বস্তুতঃ এই যোগাবস্থারই প্রার্থী।

ব—এই যোগাবস্থাই সকলের প্রার্থনীয়। যিনি যাহাই মুখে বলুন, বাস্তবিক পক্ষে ইহাই তাঁহার কাম্য—নির্ব্বাণ কাহারও প্রার্থনীয় নহে। তবে কেহ জানিয়া চান, কেহ না জানিয়া চান। যিনি জানিয়া চান, তিনি যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে কালক্রমে সফল হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানমূলক নহে, তিনি অনুরূপ উপায় গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হন, ইহাই প্রভেদ।

তবে বোধের অতীত অবস্থাও আছে—এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহা কাহারও পুরুষার্থ নহে। একবার উপাদান নির্ম্মাণ হইয়া গেলে, সবশুদ্ধি ও মুক্তি হইলে, ঐ অবস্থায় যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। জোয়ার-ভাঁটার ন্যায় একবার বোধ জাগিয়া উঠে, আবার ক্ষণেকের জন্য হারাইয়া যায়, আবার জাগিয়া উঠে—এইরূপ চলিতে থাকে। ইহাই মহামায়ার নিত্যলীলা—সন্তানের সহিত চিরন্তন খেলা। কিন্তু ইহা ঠিক ব্যুত্থান ও নিরোধ নহে—কারণ, ব্যুত্থান ও নিরোধ চিত্তের হয়, ইহা চিত্তের ব্যাপার নহে।

জি— যোগীও যখন বোধাবোধের অতীত অবস্থায় যান, তখন নির্ব্বাণ যে যোগেরও চরম ফল তাহা বলিলে দোষ কি?

ব—না, ঐ অবস্থাকে ঠিক নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে না, কারণ নির্ব্বাণের পরে আর বোধ ফিরে না। নির্ব্বাণ হয় বলহীনের—যাহার স্বত্ব জন্মায় নাই, সেই প্রবল শক্তির প্রভাবে আপন বোধ হারাইয়া অনন্তের মধ্যে চিরদিনের জন্য মিশিয়া যায়। যিনি যোগী—তাঁহার নির্ব্বাণ হয় না। তিনি মহাশক্তির উপাদানে নিজেকে গঠিত করিয়াছেন বলিয়া কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষার্থের সাধন

জিজ্ঞাসু—এই যে পরমানন্দময় যুক্তাবস্থার কথা বলিলেন, ইহা কি সংসারের সকলেই পাইতে পারে?

বক্তা—হ্যাঁ, চেষ্টা করিলে সকলেই এই অবস্থা পাইতে পারে। সকলেই স্থূলতত্ত্বের ঘনীভূত আচ্ছাদনে অন্ধীভূত হইয়া জড়ভাবের মধ্যে বিচরণ করিতেছে বলিয়া পরম সাম্যময় জগতের আদিস্বরূপ সে চিন্ময় তত্ত্বকে অন্বেষণ করে না। যিনি সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা শিব-স্বরূপা ও সর্ব্বার্থসাধিকা, যিনি শরণাগত দীন ও আর্ত্তের পরিত্রাণপরায়ণা, যিনি অপার বাৎসল্যশালিনী চিরস্নেহময়ী বিশ্বজননী, যাঁহাকে পাইলে জীবের যাবতীয় অভাব চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়, জীব তাঁহাকেও ভুলিয়া গিয়াছে—ভুলিয়া ক্ষুদ্র সুখের আয়োজনে বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। সমুদ্রে যাহার বাসস্থান, সে আজ এক বিন্দু জলের জন্য তৃষ্ণা-কাতর হইয়া মরুভূমির তপ্ত বালুকার উপরে মরীচিকার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মায়ার প্রভাবে জীব নিজেকে ও নিজের জন্মদায়িনীকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সৎপথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে—তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে কেহই তাহাকে বঞ্চিত রাখিতে পারে না। কিন্তু ভ্রান্তির আবরণে সকলেই সুখ-সুপ্তভাবে চিত্র-বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিতেছে। জাগিয়া দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিবার পরিশ্রম কেহই স্বীকার করিতে চায় না। কিন্তু পরিশ্রম করিলে ফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। চেষ্টা করিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই।

এই চেষ্টাই সাধনা বা পুরুষকার। ইহাকে অবলম্বন না করিয়া শুধু দৈবের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ।

জি—বাবা, আপনার কথা হইতে মনে হয় যে, সাধনা করিলেই সিদ্ধি হয়, চেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। কিন্তু একদিকে প্রাক্তন-কর্ম্মরূপ পূর্ব্ব সংস্কার এবং অপরদিকে ভগবানের কৃপা বা অনুগ্রহ না পাইলে শুধু চেষ্টা করিয়া গেলেই কি ফললাভ ঘটে?

ব—বৎস প্রাক্তন কর্ম্ম কাহার কিরূপ আছে, তাহা ত তোমাদের জানা নাই। সুতরাং প্রাক্তন কর্ম্মের নাম করিয়া শিথিল-প্রযত্ন থাকা সদ্‌বিবেচনার চিহ্ন নহে। "আমার পূর্ব্ব কর্ম্ম ভাল নহে—সুতরাং চেষ্টা করিয়া কি লাভ," এই প্রকার মানসিক ভাব দূষণীয়। তদ্রূপ পূর্ব্বকর্ম্মের সাধুত্ব ও প্রবলতা কল্পনা করিয়া চেষ্টার অনাবশ্যকতা মনে করাও দূষণীয়। পূর্ব্ব কর্ম্ম ভালই থাকুক, আর মন্দই থাকুক অল্পই থাকুক আর অধিকই থাকুক—তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যাহা তোমার জ্ঞানের অগোচর, তাহা লইয়া বৃথা চিন্তায় ফল কি? বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে নবীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কৃতকর্ম্ম কখনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যদি সরল প্রাণে ঠিক পথে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহারই আকর্ষণে সঞ্চিতকর্ম্মের ভাণ্ডার হইতে অনুরূপ কর্ম্মসংস্কার আপনিই আসিয়া যোগদান করে। তাহাকে আহ্বান করিতে হয় না। অল্প পরিশ্রম করিয়া যে কাহাকেও আপাততঃ অধিক ফল পাইতে দেখ, ইহাই তাহার কারণ। বস্তুতঃ যাহার যে প্রকার কর্ম্ম, তাহার ফললাভও সেই প্রকার। বর্ত্তমান সময়ের চেষ্টা অল্প হইলেও পূর্ব্বকৃত সদৃশ কর্ম্মের সংস্কার তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাকে প্রবল করিয়া তুলে। যে সম্পূর্ণভাবে অলস থাকে, সে নিজের প্রাক্তন কর্ম্মের ফললাভ হইতেও বঞ্চিত হয়। পূর্ব্ব সংস্কার যদি প্রতিকূল থাকে তাহা হইলেও চেষ্টার নিষ্ফলতা সিদ্ধ হয় না। কারণ চেষ্টা যদি সংস্কারানুরূপ প্রবল হয়, তাহা হইলে উহার প্রভাবে সংস্কার কাটিয়া যায়। আর যদি উহা সংস্কারাপেক্ষা দুর্ব্বল হয়, তবে চেষ্টার বলাবলের অনুপাতে সংস্কার নষ্ট হয়। সুতরাং কোন স্থলেই সাধু চেষ্টা বিফল হইবার নহে। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—শুভকর্ম্ম অল্প হইলেও কল্যাণ প্রসব করিয়া থাকে। তবে যদি চেষ্টা অত্যন্ত তীব্র হয়, তাহা হইলে সংস্কার ধ্বংস হইবার পরেও তাহার ফল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মোট কথা, পুরুষকার অবলম্বন করিতেই হইবে—নতুবা কৃতকর্ম্মেরও ফললাভ হইবে না। ভগবৎ-কৃপার কথা যে বলিতেছ, তাহাও চেষ্টাসাপেক্ষ। ভগবানের কৃপা অহেতুক, নিত্য, সর্ব্ব-ব্যাপক—তাহা ত সর্ব্বদা ও সর্ব্ব অবস্থাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে কাহারও কোন প্রকার ইষ্টসিদ্ধি হয় না। সূর্য্য সর্ব্বদাই আলোক বর্ষণ করিতেছেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব। কিন্তু যে অন্ধ, সে ত ঐ আলোকে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং আলোক থাকিলেও তাহার ক্রিয়ার অনুভূতি পাইতে হইলে নিজের চক্ষু খুলিতে হয়—নতুবা আলোক ও অন্ধকার উভয়ই সমান। সেই প্রকার ভগবান স্বভাবতঃই কৃপাশালী, তাঁহার কৃপা চাহিয়া লইতে হয় না, ইহা সর্ব্বসাধারণের

জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু তাহা গ্রহণের অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। কর্ম্ম করিলে তাঁহার কৃপায় অনুভূতি পাইতে বিলম্ব হয় না। বৎস, পুরুষকার ও কৃপা পরস্পর-সাপেক্ষ। এক পাখীর দুইটি ডানার ন্যায় প্রত্যেকটি আপন সার্থকতার জন্য অন্যটির উপর নির্ভর করে। পুরুষকারহীনের পক্ষে কৃপার প্রত্যাশা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। ইহা আলস্যের প্রশ্রয় মাত্র। আর কৃপা ভিন্ন পুরুষকারও ফল প্রসব করিতে পারে না।

জি—পুরুষকার বা সাধনা ও কৃপা পরস্পর সাপেক্ষ হইলে পুরুষকার না করিয়া কৃপার প্রত্যাশায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে দোষ কি? আপনি কৃপার কথা না বলিয়া সাধনা অথবা কর্ম্মের উপর এতটা জোর দেন কেন? চাতক যেমন মেঘের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করিতে যায় না, মানুষও যদি সেই প্রকার সকল সাধনা ত্যাগ করিয়া ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা কি দোষাবহ?

ব—বৎস, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা অতি উচ্চাবস্থার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ অবস্থা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। দীর্ঘকাল সংযম, শ্রদ্ধা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কঠোর সাধনা করিলে কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রকৃত নির্ভরের অবস্থায় সত্যই উপনীত হইতে পারেন। কিন্তু গোড়া হইতেই সাধনা পরিত্যাগ করিলে ঐ অবস্থা কখনও আবির্ভূত হইতে পারে না। প্রথমে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থার বিকাশ কি প্রকারে হইতে পারে? তোমরা ত গীতা পড়িয়াছ। সমস্ত গীতাতে কর্ম্মের উপদেশ রহিয়াছে—শুধু অষ্টাদশ অধ্যায়ের অবসানে কর্ম্মত্যাগ ও শরণাপন্ন হওয়ার কথা বর্ণিত দেখা যায়।

জি—কর্ম্ম বা সাধনার প্রাধান্য প্রথমাবস্থায় স্বীকার করিবার হেতু কি?

ব—মানুষ যতদিন স্থূল দেহে অভিনিবিষ্ট থাকে, ততদিন তাহার কর্তৃত্ব-অভিমান বা অহঙ্কার বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় তাহার কর্ম্মেই অধিকার। দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির ক্রিয়াকেই কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লও। স্থূলদেহে আবদ্ধ জীবের পক্ষে কর্ম্ম না করিয়া নিস্তার নাই। 'কর্ম্ম করিব না' বলিয়া বসিয়া থাকিতে গেলেও তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন এমন কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়। এই কৌশল যুক্ত কর্ম্মকেই যোগ বলে। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ যোগ আশ্রয় করিতেই হইবে।

দেখ, কৃপা যেমন ঈশ্বরের ধর্ম্ম, পুরুষকার তেমনি পুরুষের অর্থাৎ জীবের ধর্ম্ম। জীব ভিন্ন ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর ভিন্ন জীবের সত্তা কাল্পনিক। সুতরাং পুরুষকার এবং কৃপাও পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। তবে স্থূল-ভাবাপন্ন জীবের পক্ষে কর্ম্মই প্রথম সোপান। দেহাত্মবোধ হইতে অহঙ্কার হয় এবং অহঙ্কার হইতে কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। যেখান কর্ত্তা নাই সেখানে কর্ম্মও নাই, কর্ম্মের ফলভোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখও নাই। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উভয়ই স্থূলসম্বন্ধমূলক। সেই সম্বন্ধ কাটিয়া গেলে কর্ম্ম ও ভোগ উভয়ই তিরোহিত হয়। জীবাত্মা হইতে স্থূলদেহের অভিনিবেশ কাটিয়া গেলে উহা নিষ্ক্রিয় ও সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া চির শান্তির আলয় হয়। এই স্থূলভাবকে অতিক্রম করাই জীবের প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম সাধনা। কিন্তু স্থূল হইয়া স্থূলকে লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করা, আর আপন ছায়া লঙ্ঘনের চেষ্টা করা—দুই-ই নিষ্ফল। কাজেই, স্থূলদেহে অবস্থান কালে কর্ম্মত্যাগ একেবারে অসম্ভব। যে পথেই চল, তাহাই কর্ম্ম। সব কর্ম্ম হইতে স্থূল ভাবের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া কৌশলযুক্ত কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। ইহারই নামান্তর যোগ।

জি—আপনি ত কর্ম্মেরই প্রশংসাবাদ করিতেছেন। তবে কি কৃপার আবশ্যকতা নাই?

বি—আছে বই কি? কিন্তু কৃপার জন্য চিন্তা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কর্ম্মের আশ্রয় করিলে যথাসময়ে কৃপার বিকাশ হইবেই। অগ্নি যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও সেই নিষ্ক্রিয় অগ্নি দ্বারা দাহ বা প্রকাশরূপ কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, কিন্তু কার্য্যের সাধন করিতে হইলে অগ্নিকে জাগাইয়া লইতে হয়, সেই প্রকার কৃপা সম্বন্ধেও জানিবে। কাষ্ঠে অগ্নি আছে কিন্তু সে আগুনে কাঠ পোড়ে না, কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া ঐ সুপ্ত অগ্নিকে চেতন করিতে পারিলে তবে তাহা দ্বারা কাষ্ঠ দগ্ধ করা যায়। অব্যক্ত অথবা নিষ্ক্রিয় অগ্নি দাহ প্রভৃতি ক্রিয়া করিতে পারে না বলিয়া থাকিয়াও না থাকার সমান। তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া অন্নরূপে পরিণত করা অগ্নির কার্যকারিতা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। তদ্রূপ, জীবের উর্দ্ধগতিও কৃপা ভিন্ন হয় না। ভগবান্ যে জীবকে নিরন্তর নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাই তাঁহার কৃপা। এই স্বাভাবিক আকর্ষণ-শক্তির সাহায্য না পাইলে বদ্ধ জীবের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, তাহা দ্বারা সে তাঁহার চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু অগ্নিকে কার্য্যক্ষমরূপে পাইতে হইলে যেমন কাঠে কাঠে ঘর্ষণ না করিলে

চলে না, তদ্রূপ কৃপার প্রভাব অনুভব করিতে হইলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। ভগবৎ-কৃপা নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপক হইলেও জীব দেহাধ্যাসবশতঃ স্থূল আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া অভিমান গ্রস্ত থাকিবার দরুণ উহা অনুভব করিতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে জীব অনায়াসে ভগবৎ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া চিরদিনের জন্য জগতের শোক-তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। কিন্তু তাহা হয় না, হইবার উপায় নাই। ভগবানের কৃপা সত্য, একমাত্র ঐ কৃপার অবলম্বন ভিন্ন অন্ন কোন উপায়ে যে জীবের উদ্ধার সম্ভবপর নয়, তাহাও সত্য, কিন্তু অহঙ্কারশীল জীবের পক্ষে কৃপা সত্য হইলেও নিষ্ফল। স্থূলের আবরণ যে পরিমাণে নষ্ট হইবে, জীব সেই পরিমাণেই কৃপার প্রভাব উপলব্ধি করিবে। সংঘর্ষণ ভিন্ন স্থূল নাশের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই বলিয়া সংঘর্ষণ হইতেই কৃপার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কাষ্ঠের ঘর্ষণ করিয়া যেমন অগ্নিকে আবাহন করিতে হয় না, অগ্নি আপনিই সমাগত হয় ও স্বকার্য্য সাধন করে, সেইপ্রকার কৌশলপূর্ব্বক অর্থাৎ যথাবিধি কর্ম্ম করিলে কৃপার জন্য আশা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। যথাসময়ে ভগবানের কৃপাশক্তি প্রকাশিত হইয়া অহঙ্কারের বিনাশ সাধন করে। কারণ, স্থূলভাবের নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহাত্মবোধ অর্থাৎ জড়তা এবং কর্তৃত্বাভিমান বিলীন হইয়া যায়। অতএব যোগরূপ কর্ম্মই অধ্যাত্মজীবন লাভ করিবার প্রথম অবলম্বন। জড়কের ধরিয়াই জড়কে ছাড়াইয়া চৈতন্যে উপস্থিত হইতে হইবে।

জি—কর্ম্মই যদি একমাত্র উপায় হয়, তবে কি জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি উপায়ের মধ্যে গণ্য নহে?

ব—না, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতিকে ধরিতে চাও, তবে প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির সন্ধানই পাইবে না। যাহা পাইবে, তাহা আভাস মাত্র, তাহা যে প্রকৃত অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। যে পন্থাই স্বীকার কর, তাহা শুধু বাহ্য চিহ্ন মাত্র। সর্ব্বত্রই কর্ম্মের আসন প্রথম। জ্ঞান-মার্গের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং ভক্তি-পথের নববিধ সাধন-ভক্তি কর্ম্মেরই অন্তর্গত। মোট কথা স্থূলসম্বন্ধবশতঃ মনুষ্য শুধু কর্ম্মেই অধিকারী। সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে কর্ম্ম করিলে পরের অবস্থাগুলি আপনা আপনিই খুলিয়া যায়। কর্ম্মকে প্রধান বলিবার ইহাই একমাত্র কারণ।

জি—কর্ম্মের প্রাধান্য কতকাল থাকে? চিরকাল কি কর্ম্মই করিতে হইবে? যাহাকে কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলে, তাহার কি কোন সার্থকতা নাই?

ব—চিরকাল কর্ম্ম করিতে হইবে কেন? ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার যে একটি

পরাবস্থা আছে, আপনিই তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। যতক্ষণ সে অবস্থার বিকাশ না হয়, ততক্ষণ কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। কর্ম্মত্যাগ ইচ্ছা করিয়া হয় না—উহা যথাকালে আপনিই হইয়া যায়। বাসনা ত্যাগ ভিন্ন কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে পারেনা। স্থূলের সহিত স্থূলের সংঘর্ষকে কর্ম্ম বলে। যথাবিধি এই সংঘর্ষের ফলে যখন চৈতন্যরূপ অগ্নি প্রকাশিত হয়, তখন স্থূলভাব বা জড়ত্ব আর প্রবল থাকে না—অভিভূত হইয়া যায়। যাহাকে তোমরা জড় পদার্থ বল, তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই চৈতন্যরূপ অগ্নি সুপ্তভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন জড়ের তীব্র সংঘর্ষ নিবন্ধন অন্তঃস্থিত অব্যক্ত চৈতন্য ফুটিয়া উঠে, তখন সেই চৈতন্যের তেজে জড় অথবা স্থূল ভাব অভিভূত হইয়া যায়। কাষ্ঠঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া যেমন আপন কারণ ও আধার স্বরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, ইহাও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। এইভাবে স্থূলত্ব কাটিয়া গেলে কর্ম্ম আপনিই নিবৃত্ত হয়। যথাবিধি কর্ম্ম করিলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্ঞানের উদয়ে কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়—কর্ম্মহীন ব্যক্তির কর্ম্ম-সন্ন্যাস অসম্ভব। দেহাত্মাভিমান থাকা পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হইতে পারে না। বলপূর্ব্বক ত্যাগ করিবার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। দেহ কর্ম্মেরই রূপ—"শরীরং কেবল কর্ম্ম"। তাই যতক্ষণ দেহবোধ আছে, ততক্ষণ অন্ততঃ লেশমাত্র কর্ম্ম থাকিবে। ব্যবহার কর্ম্ম-ভূমি। পরমার্থে স্থিতিকালে কর্ম্মের অতীত হইলেও ব্যবহার অবস্থায় কর্ম্ম-সম্বন্ধ কিছু না কিছু থাকিবেই। তবে অভ্যাসশীল যোগীর কর্ম্মে এবং সাধারণ লোকের কর্ম্মে ভেদ আছে। স্বভাবের অনুশীলনই ধর্ম্ম। অস্বাভাবিক কিছুই ভাল নহে। কর্ম্ম যখন স্বভাব হইতে কাটিয়া যাইবে, তখনই যাওয়া উচিত। পূর্ব্বে কাটাইতে চেষ্টা করিলে কপটতা ও মিথ্যা আচরণ হয়—তাহা সাধকের সিদ্ধিলাভের পক্ষে হানিকারক।

জি—বাবা শাস্ত্রানুশীলন ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? আপনি ত কর্ম্ম হইতেই জ্ঞানের উদয় স্বীকার করিতেছেন?

ব—বৎস, কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানের উদয় কি প্রকারে হইবে? শুধু শাস্ত্রপাঠ হইতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা শুষ্ক বা পরোক্ষ জ্ঞান। শুষ্ক জ্ঞান হইতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয় না—উহা অনেক সময়ে প্রকৃত জ্ঞানপথের কণ্টকস্বরূপ। একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে—এই রূপ জ্ঞানের বিকাশকেই প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মীলন বলে। জ্ঞানের বিকাশ হইলে অহঙ্কার কাটিয়া বিষয়াসক্তি ছুটিয়া যায়। তখন সকল পদার্থেরই স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুতে আচ্ছাদন থাকে না।

জি—জ্ঞানের পরে কোন্ অবস্থার আবির্ভাব হয়?

ব—জ্ঞানের পরে ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞানলাভ হইলেই এক দিকে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরদিকে অনুরাগের সঞ্চার হয়। অনাত্মা বা জড় বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য হয়, আর পরমাত্মার প্রতি অনরাগ হয়। ইহাই ভক্তি। চিন্ময় অবস্থার উন্মেষ না হইলে, জড়ত্বের—বিষয়ের—আবরণ-ভঙ্গ না হইলে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইতে পারে না। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যে ভক্তি তাহাতে জড়-সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তাহা ন্যূনাধিক কাম ও স্বার্থময়, তাহা সহেতুক, উদ্দেশ্যযুক্ত। জ্ঞানলাভে আপ্তকাম হওয়ার পরেই বিশুদ্ধভক্তির আবির্ভাব হয়। তখন অন্য আকাঙ্ক্ষা ত দূরের কথা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকেনা। ভোগস্পৃহা কিংবা মোক্ষস্পৃহা শুদ্ধভক্তির প্রতিবন্ধক। তাই বদ্ধ বা স্থূল-ভাবাপন্ন জীবের পক্ষে শুদ্ধভক্তির উদয় অসম্ভব। জ্ঞান আলোকস্বরূপ, তাহাতে বস্তু সাক্ষাৎকার হয়। অনন্তর বস্তুতে প্রাণের আকর্ষণ বা লগ্নতা হয়—ইহাই ভক্তি কর্ম্ম অন্বেষণ, জ্ঞান প্রাপ্তি, ভক্তি আস্বাদন। অতএব জ্ঞানেরই পরিপক্ক অবস্থা ভক্তি।

জি—ভক্তির পরেও কি কোন অবস্থা আছে?

ব—আছে। তাহাই প্রেম। ভক্তির গাঢ় অবস্থাকে প্রেম বলে। ইহা পরমানন্দস্বরূপ। অনেকে ইহাকেই অদ্বৈতসিদ্ধি বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন। এই অবস্থা পূর্ণত্বের দ্বারদেশ—মহাশক্তি বা অসীম-তত্ত্বে প্রবেশের মুখ। ইহার পরেই অকূল পাথার— সেখানে বাক্য ও মনের গতি নাই। অসীম বা অনন্ত সত্তা তত্ত্বাতীত হইলেও তত্ত্বরূপে বর্ণিত হয়। সেখানে দ্বৈতাদ্বৈত কিছুই নাই। উহা এক হিসাবে ঈশ্বরত্বেরও অতীত অবস্থা—পূর্ণতমা মহাশক্তির স্বরূপ বা স্বভাব। "বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা"—বিনা প্রেমে এই পূর্ণত্বে প্রবেশ হয় না।

জি—সুতরাং প্রথমে গুরূপদিষ্ট কর্ম্মকেই অবলম্বন করিতে হয়। নতুবা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হওয়ার উপায় নাই।

ব—হ্যাঁ। ক্রমশঃ কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়া কর্ম্মনিবৃত্তি হয়। জ্ঞান হইতে ভক্তির বিকাশ হয় এবং ভক্তি পরিপক্ক হইয়া প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়ত্ব এবং তাহার পর বার্দ্ধক্য যেমন ক্রমশঃ স্বভাবের নিয়মেই উদিত হয়,—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমও তেমনি আপনিই পর পর ফুটিয়া উঠে। বাল্য না হইয়া যেমন যৌবন হয় না, তেমনই কর্ম্ম না করিয়া জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। বাল্যের পর যৌবন যেমন আপনিই আসে, তখন আর বাল্য থাকে না, তেমনই কর্ম্মনিবৃত্তির অবস্থায় জ্ঞানেই স্থিতি হয়, তখন আর ক্রিয়া থাকে না। বীজ বপন না করিয়া ফললাভের আশা, বন্ধ্যার পুত্র-মুখ-দর্শনের আশা—আর কর্ম্মহীনের জ্ঞানলাভ কিংবা

জ্ঞানহীনের ভক্তিলাভের আশা দুরাশা মাত্র। বাল্য-যৌবনাদি যেমন পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই জীবনের অন্তর্গত, কর্ম্ম জ্ঞানাদিও তেমনই একই সাধন প্রবাহের অন্তর্গত ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ। ইহাই প্রকৃত সমন্বয়। সাধনায় জীবন থাকিলে এ সমন্বয় আপনিই ঘটিয়া থাকে।

জি—অনেকেই বলেন যে, 'ভক্তির্জ্জ্ঞানায় কল্পতে'। প্রথমে ভক্তি, পরে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তি বা বন্ধন-নিবৃত্তি। আপনার কথা ত তাহার বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে।

ব—জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে। তাহাতে স্বার্থানুসন্ধান অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তাহা অহঙ্কারমূলক। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে জড়-সম্বন্ধ বা দেহাধ্যাস বর্ত্তমান থাকে বলিয়া সে অবস্থার ভক্তি একজাতীয় প্রার্থনা মাত্র। তাহাতে ফলের দিকে লক্ষ্য না থাকিয়া পারে না। ফল যদি মোক্ষও হয়, তথাপি সেই উদ্দেশ্যে যে ভক্তি জন্মে তাহা শুদ্ধাভক্তি নহে। আর এক কথা। জ্ঞান বস্তুতত্ত্বের প্রকাশক। যতক্ষণ তাহার উদয় না হয়, ততক্ষণ ভক্তির আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই সমভাবে অপ্রকাশিত থাকে। যেখানে আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই অপ্রকাশিত, সেখানে উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক ভক্তির প্রকাশমানতা অঙ্গীকার করা অযৌক্তিক মনে হয়। ভক্তির অধিষ্ঠান জীব আত্মজ্ঞানরহিত। ভক্তির পাত্র ঈশ্বরও তদ্রূপ অপ্রকট—অনাবির্ভূত। ইহাই অজ্ঞানাবস্থা। এ অবস্থায় ভক্তি হইতে পারে না। জগতে যাহাকে সাধারণতঃ ভক্তি বলে তাহা বস্তুতঃ অভাব-নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা মাত্র।

জ্ঞান ভিন্ন যে মুক্তি নাই ইহা ঠিক। তবে উহা শুষ্ক জ্ঞান নহে, যথার্থ অপরোক্ষ জ্ঞান।

অতএব মুক্তির পূর্ব্বে পরা ভক্তির উদয়ই হইতে পারে না। যখন পাপ-পুণ্য বিগলিত হয়, সুখ-দুঃখ অতিক্রান্ত হয়, জড়ীয় অভাব ও ত্রিতাপ-জ্বালা নিবৃত্ত হয়, তখনই কোন কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে অহেতুক ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান বল আর ভক্তিই বল, যোগাশ্রয় ভিন্ন কিছুরই ঠিক ঠিক ভাবে হইবার উপায় নাই।

জি—অনেকের বিশ্বাস, যোগ অতি দুরূহ ব্যাপার। বর্ত্তমান সময়ে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কেহ বিকৃত-মস্তিষ্ক কিম্বা বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

ব— যোগ যে অত্যন্ত দুরূহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ হইলেও সিদ্ধ যোগীর উপদিষ্ট যোগমার্গ অতি সরল, তাহাতে কোন প্রকার অপায়ের আশঙ্কা নাই। গ্রন্থ অবলম্বনে অথবা অজ্ঞলোকের উপদেশে প্রাণায়ামাদি

বায়বীয় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলে শারীরিক অপকার অবশ্যম্ভাবী। যিনি যোগের রহস্য এবং মানবের দৈহিক ও মানসিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য অবগত নহেন, তাঁহার যোগ-ক্রিয়ার উপদেশ দানের অধিকার নাই। স্বাভাবিক যোগ অতি সরল, তাহাতে কোন প্রকার ভয় অথবা অপকারের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ যোগী অতি বিরল বলিয়াই, যোগ এত দুর্লভ ব্যাপার।

জি— যোগ ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না কেন, তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম দ্বারা যোগলভ্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায় কি না, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ব—বৎস, যোগের স্থান অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম পূরণ করিতে পারে না। একমাত্র যোগ ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই চিত্ত ও দেহের স্থায়ী বিশুদ্ধি সম্পন্ন হয় না। দেখ, প্রকৃতি হইতে যে কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহা নির্ম্মাণ ও ক্রিয়াভেদে দুই প্রকার। নির্ম্মাণটি উপাদান ও ক্রিয়া নিমিত্ত। নির্ম্মাণের ধর্ম্মই আপেক্ষিক স্বধর্ম্ম, ক্রিয়া দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয়—ইহাকেই উৎপত্তি বলে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, রাম ও শ্যাম দুইটি বালক রৌদ্রে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল।

রৌদ্র লাগিবার দরুণ রাম জ্বরে আক্রান্ত হইল, কিন্তু শ্যামের কোন রোগ হইল না। সূর্য্যের তাপ দুইজনের উপরেই সমভাবে লাগা সত্ত্বেও একজনের জ্বর হইল কিন্তু অপর ব্যক্তির কিছুই হইল না—ইহার কারণ কি? কারণের বিভিন্নতা না থাকিলে কার্য্যে ভেদ হইতে পারে না, সুতরাং সূর্য্যের তাপ ব্যতীতও অন্য কিছু কারণ আছে—তাহাই জ্বরের অসাধারণ কারণ! রৌদ্র সাধারণ উদ্দীপক মাত্র। সেই অসাধারণ কারণ আর কিছু নহে—উহা শুধু রামের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা সংস্কার-বিশেষের সমষ্টি। হয়ত তাহার পিত্ত দুর্ব্বল বলিয়া সূর্য্যের তাপে তাহার দুর্ব্বল পিত্ত-যন্ত্র আক্রান্ত হইল ও জ্বরের আবির্ভাব হইল। রৌদ্র না লাগিলে তাহা তখন অবশ্য হইত না। কিন্তু চাপা থাকিত মাত্র। অন্য কোন উত্তেজক কারণ উপস্থিত হইলেই ঐ সংস্কার জাগিয়া উঠিত। এই উপাদানগত বৈচিত্র্যই নির্ম্মাণ-বিকার—রৌদ্রলাগানরূপ ক্রিয়া নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং বুঝিতে হইবে, জ্বরের মূলান্বেষণ কালে শুধু নিমিত্ত আবিষ্কারই যথেষ্ট নহে। নিমিত্ত গৌণ কারণ, উপাদান-বৈশিষ্ট্যই কার্য্যের মুখ্য কারণ। জীব এখন স্থূলভাবাপন্ন—ইহা তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা নহে, বিকারাবস্থা। এই বিকারকে দূর করাই জীবের স্বাস্থ্য-সম্পাদন। ধাতুর সাম্যভাবই প্রকৃতি বা স্বাস্থ্য বৈষম্যই ব্যাধি। এখন প্রশ্ন এই—বিকৃত জীবকে প্রকৃতিস্থ করা কি প্রকারে হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে

নির্ম্মাণগত পরিবর্ত্তন আবশ্যক, শুধু ক্রিয়াগত বা নৈমিত্তিক পরিবর্ত্তনে স্থায়ী ফল হইবে না। নির্ম্মাণে যাহা নাই, ক্রিয়াতে তাহার বিকাশ হয় না। কামের উপকরণ সম্মুখে থাকিলে আমার কাম জাগিয়া উঠে, ক্রোধের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই ক্রোধ জাগিয়া উঠে—উহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমার নির্ম্মাণে অথবা উপাদানে কাম-ক্রোধের বীজ নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত অবসর পাইলেই তাহার স্ফূরণ হয়। কামাদির নিমিত্ত না থাকিলে যদি আমাতে কামাদি না জাগে তাহা আমার নিষ্কামত্ব প্রভৃতির নিদর্শন নহে। যখন প্রবল উত্তেজক কারণ সত্তেও কামাদির আবির্ভাব না হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আমাতে কামাদি নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। 'বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ'—এ কথা ধ্রুব সত্য। অতএব যদি আমাকে আত্মশোধন করিতে হয়, তবে আমাকে নির্ম্মাণ বা উপাদানের শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি আমি কেবলমাত্র চলাফেরা ও ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখি,—তাহাও আবশ্যক—তাহা হইলে লোকদৃষ্টিতে সংযমলাভ হইলেও মূল শুদ্ধি হইবে না। কখনও না কখনও আকস্মিক বন্যার তীব্র বেগে সংযমের কৃত্রিম বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই উপাদানশুদ্ধির উপায় একমাত্র যোগ। যাহাকে স্থূল দেহ বল, তাহা বাসনার সমষ্টিমাত্র। সুতরাং যে প্রণালীতে স্থূলভাব কাটিয়া যায়, তাহাতেই বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বাসনা-ত্যাগের আর কোন নূতন প্রণালী নাই। স্থূলের সহিত স্থূলের তীব্র সংঘর্ষ না হইলে উহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, আর তাহা প্রজ্জ্বলিত না হইলে স্থূলের নিবৃত্তিও হয় না। এই সংঘর্ষই যোগাত্মক কর্ম্ম। স্থূলের দাহ এবং বাসনা-ক্ষয় অভিন্ন ব্যাপার—ইহা জ্ঞানোদয় বা আত্মসাক্ষাৎকারের সমকালীন।

জি—আপনি বলিলেন, সংঘর্ষকেই যোগ বলে। কোন্ দুইটি বস্তুর পরস্পর সংঘর্ষকে আপনার মতে যোগ নাম দেওয়া যাইতে পারে?

ব—আপাততঃ স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষই বুঝিয়া লও। কিন্তু বিষয়টি বড় জটিল। বাস্তবিক পক্ষে স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষ প্রতিনিয়তই হইতেছে। ইহা কিন্তু যোগ নহে। আবার কৌশল থাকিলে ইহা যোগও বটে। স্থূল সূক্ষ্মের রহস্য আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ জানিয়া রাখ, স্থূল জড়, সূক্ষ্ম চেতন এবং লিঙ্গই মনঃ (ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত)। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বকে আত্মা বা পরমাত্মা কিংবা ঈশ্বরও বলিতে পার। লিঙ্গই জীবভাবের বাহ্য চিহ্ন। আমাদের দেহই স্থূলপদ-ব্যপদেশ্য। বাহ্য স্থূল পদার্থই বিষয়। মনঃ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ নিরন্তর হইতেছে, ইহা স্থূলের

সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষ ব্যতীত অপর কিছু নহে। তবে মনে রাখিতে হইবে, লিঙ্গ তটস্থ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যবর্ত্তী। বদ্ধাবস্থায় স্থূলের সংযোগবশতঃ লিঙ্গ স্থূল, মুক্তাবস্থায় স্থূলসম্বন্ধ রহিত হয় বলিয়া ইহা সূক্ষ্ম। অতএব স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষও বাস্তবিক স্থূলের সহিত স্থূলেরই সংঘর্ষ। বাসনাযুক্ত মনঃ স্থূল বই আর কি? এই সংঘর্ষই কিন্তু যোগ নহে লিঙ্গের সহিত শুদ্ধ আত্মা বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংঘর্ষই যোগ। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বদ্ধ জীবের লিঙ্গ অবশ্যই স্থূলভাবাপন্ন। পরমাত্মা ও মন্ত্রাদিরূপে ভূত-কঞ্চুক-বেষ্টিত বলিয়া স্থূলপদবাচ্য। এই সংঘর্ষই জীবাত্মরূপী লিঙ্গ ও পরমাত্মরূপী সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংযোগ, কিংবা মনঃ ও আত্মার সংযোগ। অবশ্য ইহার স্তর আছে। লিঙ্গ ও সূক্ষ্মের পরস্পর ঘর্ষণ হইলেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গাবরণ বাসনা ও সূক্ষ্মাবরণ-ভূত-কঞ্চুক নষ্ট হইয়া যায়—বাহ্য আবরণ ছিন্ন হয়। ইহার ফলে শুদ্ধ-প্রায় লিঙ্গ ও শুদ্ধ-প্রায় পরমাত্মা জাগিয়া উঠেন। ইহাই এক হিসাবে প্রাকৃতিক চিত্তশুদ্ধি ও দেবতা-সাক্ষাৎকার। লিঙ্গ তখন এক প্রকার শুদ্ধসত্ত্ব। উহাতে মলের কিঞ্চিৎ লেশ আছে মাত্র; আর পরমাত্মা অপরা দেবতারূপে অভিব্যক্ত। এই পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক ভাব। ইহা প্রজ্ঞার বিকাশ হইলেও নির্ম্মল অবস্থা নহে, ইহার পরে দ্বিতীয়বার উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় উহাকে উপাসনা বা নিদিধ্যাসন বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে তাহাও কর্ম্ম। প্রথম সংঘর্ষ বহির্যাগ বা বাহ্য কর্ম্ম, দ্বিতীয় সংঘর্ষ অন্তর্যাগ বা অন্তঃকর্ম্ম। উভয়ই কর্ম্ম বা উপাসনা। দ্বিতীয় সংঘর্ষের চরম অবস্থায়ই চৈতন্য-সমাধি হয়, অমল জ্ঞান নির্ম্মল হয়, লিঙ্গ পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হয় এবং দেবভাব ঐশ্বর্য্যে পর্য্যবসিত হয়। এই অবস্থায় লিঙ্গ বিশুদ্ধ আত্মায় যুক্ত হইয়া অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মনে রাখিও লিঙ্গ কখনই শুদ্ধ আত্মভাবে পরিণত হয় না। উভয়ই অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া পরস্পরের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা অভিভূত-প্রায় হইয়া থাকে, সেইজন্য তাহার ভেদ ধরা যায় না। কিন্তু আত্মজ্ঞান বা শুদ্ধ আমিত্ববোধ হইতে জীবের সত্তা অনুমিত হয়। লিঙ্গহীন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে আত্মাবোধও নাই, পরবোধও নাই।

জি—শাস্ত্রেও এ-সম্বন্ধে বহু কথা আছে। সাংখ্য ও যোগের আচার্য্যগণ যাহাকে কৈবল্য বলিয়া বর্ণনা করেন, ইহা কতকটা সেই প্রকার অবস্থা। ঐ যে আপনি দ্বিতীয় সংঘর্ষের পরে জ্ঞানের নির্ম্মলতার কথা বলিলেন, উহাই তাঁহাদিগের জ্ঞান-সম্প্রসাদ। সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধিসাম্য বলিয়া যে অবস্থার লক্ষণ করা হইয়াছে, ইহা কতকটা সেই অবস্থা বলিয়াই মনে হয়। লিঙ্গ সত্ত্ব, আত্মা

পুরুষ,—উভয়ের শোধন সমান হইলে, কৈবল্যাবস্থা হইয়া থাকে। বেদান্তের তৎ-পদার্থের ও ত্বং-পদার্থের শোধন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আচ্ছা, এ অবস্থায় কি জ্ঞান থাকে?

ব—আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বলি, তাহা এ অবস্থায় থাকে না, থাকিতে পারে না। কারণ, লিঙ্গের ক্রিয়া ভিন্ন কোন বৃত্তির উদয় হইতে পারে না। লিঙ্গ যখন বাসনা ও সংস্কাররহিত, স্থূলসম্বন্ধহীন, তখন উহাতে ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। শুদ্ধ পরমাত্মভূমিতে লিঙ্গ অভিভূত, তাই নড়িতে পারেনা। অতএব কৈবল্যে জ্ঞান বা ইচ্ছার সদ্ভাব কল্পনীয় নহে। তবে শুদ্ধ বাসনা বা শুদ্ধসত্ত্ব অবলম্বনে তাহাতে জ্ঞানাদির উদয় হইতে পারে।

চিত্তের বৃত্তি লিঙ্গের ক্রিয়ামূলক। সুতরাং লিঙ্গ যখন নিষ্ক্রিয়, তখন যে চিত্ত বৃত্তিহীন তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-রূপ মুখ্য যোগ। গৌণযোগে একাগ্রবৃত্তি অবশ্য থাকে।

আবার বলিতেছি। লিঙ্গ তটস্থ—যখন ইহা স্থূলে অভিনিবিষ্ট, স্থূলের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ও স্থূল অবলম্বনবিশিষ্ট, তখন ইহাতে যে ক্রিয়া হয়, তাহা হইতেই বিষয়জ্ঞানের উদ্ভব হয়। আবার লিঙ্গশুদ্ধির পরে লিঙ্গ যখন সূক্ষ্মগত, যখন ইহা সূক্ষ্ম অবলম্বনবিশিষ্ট ও সূক্ষ্মের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত, তখন ইহাতে যে ক্রিয়া হয় তাহা হইতে আত্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আনন্দ-ঘন লিঙ্গ নিষ্ক্রিয়—অসৎকল্প। অতএব বিষয়জ্ঞান কিংবা আত্মজ্ঞান উভয়ত্রই লিঙ্গের বা মনের ক্রিয়া আবশ্যক। বিষয়জ্ঞান স্থলেও কিঞ্চিৎ আত্মজ্ঞান অস্পষ্টভাবে থাকে, তাহা ধর্তব্য নহে। আত্মজ্ঞান স্থলেও কিঞ্চিৎ বিষয়জ্ঞান অস্পষ্টভাবে থাকে। কারণ, সূক্ষ্ম, লিঙ্গ ও স্থূল বৈষম্যাবস্থায় মিশ্রভাবে থাকে—কাহারও প্রাধান্য হয়, ইহাই মাত্র বিশেষ। সাম্যাবস্থায় লিঙ্গ নিরালম্ব হওয়াতে তাহাতে ক্রিয়া থাকে না বলিয়া জ্ঞান প্রভৃতি নিরুদ্ধ হয়। তখন একমাত্র স্বভাবই থাকে। স্বভাব স্বতন্ত্র, স্বপ্রতিষ্ঠ—আর সবই পরাধীন। এ জগতে কোন বস্তুই অবলম্বন ছাড়িয়া সত্তারক্ষা করিতে পারে না। অবলম্বন ছাড়া হইলেই বস্তুর পৃথক্ সত্তাবোধ থাকে না—উহা স্বভাবে মিশিয়া যায়। এই জন্যই জগতের সবই আপেক্ষিক—শুধু স্বভাবই পূর্ণ। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম—ইহাকে প্রাপ্ত হইবার সোপানত্রয়।

বদ্ধাবস্থার জ্ঞান, জ্ঞান নহে, অজ্ঞান। যোগের প্রভাবে ইহা নিবৃত্ত হয় ও প্রজ্ঞার উদয় হয়—অর্থাৎ সকল বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভিন্ন সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। ইহার প্রথমাবস্থায় ভেদাভেদ থাকে—অর্থাৎ তখন বিষয়ের ভেদ ও তাহার অন্তর্গত আত্মার অভেদ উভয়ই জ্ঞানের বিষয়ীকৃত হয়। এই ভূমিতেই

সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। বলা বাহুল্য, ইহাও আত্মদর্শনমূলক। আত্মজ্ঞান না হইলে সর্ব্বজ্ঞান হইতে পারে না। যতদিন আত্মজ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিন জ্ঞানবৃত্তি প্রতিহত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। আত্মজ্ঞান হইলে জ্ঞান নির্ম্মল ও বাধাহীন হয়। তখন বহির্নিবেশ থাকা পর্য্যন্ত আত্মভিত্তিতে বিশ্বদর্শন—জগতের যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান—হইয়া থাকে। ক্রমশঃ অভেদভাব প্রবল হইতে থাকে—আত্মবোধ বিষয়বোধ হইতে পৃথক হইয়া স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞান অভিভূত হইয়া আত্মজ্ঞানই প্রধানভাবে বিরাজ করিতে থাকে—বিষয়ের দিকে লক্ষ্য থাকে না, আত্মার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ইহাই অভেদ অবস্থা। ইহার পরে অভেদ-বোধও কাটিয়া যায়—যাবতীয় বিকল্প তিরোহিত হয়। তখন ভেদাভেদের অতীত অবস্থা,—তখন সর্ব্বজ্ঞানও থাকে না, আত্মজ্ঞানও থাকে না। অর্থাৎ এ সকল অতিক্রান্ত হইয়া লিঙ্গের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন হয়। ফলে যাহা থাকে, তাহা ঈশ্বরও নহে, জীবও নহে, জড়ও নহে। তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্য বা স্বভাব। ইনিই পূর্ণ, শুদ্ধ, সনাতনী মহাশক্তি। ইনি তত্ত্বাতীত তত্ত্ব, ব্যোমাতীত ব্যোম, গুণাতীত হইয়াও গুণময়ী, গুণময়ী হইয়াও নিত্য নির্গুণা, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, পরমরহস্যস্বরূপা।

আত্মজ্ঞানের পরে ভক্তি ও প্রেমের চরমাবস্থা পর্য্যন্ত এই স্বভাব-প্রাপ্তির ইতিহাস। ইহা চিদ্বিলাসময়। ঐশ্বর্য্য, জীবত্ব বা জড়ত্ব সব, এখানে সম রস হইয়া এক বিচিত্র বিলাসের উদ্ভব হয়। এই বিলাসের সূচনাই ভক্তি এবং সমাপ্তিই প্রেম। ইহার পরেই স্বভাব—যাহার বর্ণনা চলে না। স্বভাবই স্বতন্ত্র, ইহাতে আশ্রিত হওয়াই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যলাভ।

ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—এই মহাশক্তির ক্রীড়াপীঠ। ইনি যেমন সকলকে চালান, সকলই তেমনই চলে, ইহাকে ছাড়িয়া কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই।

জি—ইনিই যদি সকলকে চালান, তবে জীবের দায়িত্ব কি? শুভাশুভের জন্য জীবের সামর্থ্য কোথায়? তবে অন্য-কৃত কর্ম্মের জন্য জীবের সুখ-দুঃখ ভোগ হয় কেন? জীব তাহা হইলে এই প্রবল শক্তির দাস। তাহার কোন কর্ম্মের জন্য তাহার ভোগ উচিত নহে।

ব—বৎস, স্বভাবই যে সকলকে চালান, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে একটু কথা আছে। জীব যখন কর্ম্ম করে, তখন সে অভিমান বশতঃ নিজেকে কর্তা মনে করে, তাই তাহার ফলভোগ হয়। দেহাত্মবোধ আছে বলিয়া এ অভিমান অবশ্যম্ভাবী। যখন দেহাত্মবোধ থাকিবে না, চৈতন্য ও জড়ের গ্রন্থি উন্মুক্ত হইবে, কুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্য লাভ করিবেন, তখন এ অভিমান থাকিবে না।

যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ অভিমান-বৃত্তি একেবারে নষ্ট হইতে পারে না। লৌকিক অভিমান তিরোহিত হইলেও সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান এবং আত্মজ্ঞতার অভিমান থাকিয়া যায়। লৌকিক অভিমান ক্রিয়াশ্রিত এবং স্থূলসম্বন্ধমূলক। কিন্তু অলৌকিক অভিমান জ্ঞানাশ্রিত এবং সূক্ষ্মসম্বন্ধমূলক। সুখ-দুঃখের অনুভব বা ভোগ স্থূল দেহে হইয়া থাকে বলিয়া স্থূলদেহকে ভোগায়তন বলে। অহঙ্কারমূলক ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল স্থূলদেহ। অতএব ক্রিয়াশ্রিত কর্ত্তৃত্ববোধ হইতে ভোগের উদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান সগুণ ব্রহ্মে এবং আত্মজ্ঞতার অভিমান নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশের সময়, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মুক্তিলাভ কালে, উদিত হয়। এই অলৌকিক অভিমান ক্রিয়াশ্রিত নয় বলিয়া ইহার ফলে সুখ-দুঃখবোধ বা ভোগের উৎপত্তি হয় না। ইহা জ্ঞানাশ্রিত বিশুদ্ধ অহং-ভাব মাত্র। ইহাই আত্মবোধের স্বরূপ—প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে ইহাকে অভিমান না বলিলেও ক্ষতি হয় না। তবে মনে রাখিও, ইহাও প্রকৃত সাক্ষী নহে। আত্মজ্ঞানই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু ইহা বৃত্তিরূপ জ্ঞান, এই বৃত্তি একাগ্রভূমিতে আত্মাকে অবলম্বন করিয়া উদিত হইলেও ইহা বৃত্তি ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহার নিরোধ হইয়া যখন সর্ব্ববৃত্তির উপশম হয়, তখনই যথার্থ অভিমান-নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য বা সাক্ষিভাব-প্রাপ্তি হয়। তখনই প্রকৃত বোধের বিকাশ হয়— চৈতন্যের আলোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরপারে স্বভাবের চালকতা বুঝিতে পারা যায়। অজ্ঞানবশতঃই জীবের দায়িত্ব, অজ্ঞান কাটিয়া গেলে তাহার দায়িত্ব কোথায়? অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব জীব গ্রহণ করে, তাই পুরুষের স্বরূপানুগত সাক্ষিত্ব ফলের সহিত রঞ্জিত হইয়া ভোক্তৃত্ব রূপ ধারণ করে। উভয়ত্রই বাসনা মূল।

যখন জীব নিজেকে সর্ব্বাংশে আশ্রিত বলিয়া বোঝে, স্বভাবস্থ বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকে না বলিয়া ভোগও থাকে না। যতক্ষণ অহঙ্কার বিগলিত না হইতেছে, ততক্ষণ জোর করিয়া পুণ্যপাপের অতীত হওয়া চলে না। জীব যে স্বভাবের দাস, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রথমতঃ, পরিচ্ছিন্ন স্বভাবের দাস—যাহা তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার-সমষ্টি ভিন্ন অপর কিছু নহে। চরমে জ্ঞানোদয়ে নিত্যস্বভাবের দাস—তাহা পরমানন্দাবস্থা।

জি—কার্য্য হয় কি প্রকারে? স্থূলদেহ ভিন্ন কার্য্য হয় না, অথচ শুধু দেহেরও কোন সামর্থ্য নাই।

ব—স্থূল জড়, লিঙ্গ যেমন তাকে চালায়, সে তেমনই চলে। কিন্তু বাস্তবিক

সঞ্চালন-শক্তি লিঙ্গতেও নাই। তাহা আত্মায় আছে। আত্মার সঞ্চালন-শক্তি লিঙ্গকে চালিত করে, লিঙ্গ চালিত হইয়া স্থূলদেহকে চালিত করে। সেইজন্য লিঙ্গ আত্মায় যুক্ত হইলে স্থূলদেহ নিশ্চল হইয়া যায়। স্থূলদেহ নিশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থূল জ্ঞানাদিরও আবির্ভাব হয় না। তখন লিঙ্গ আত্মগত হইয়া কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হয় মাত্র—তাহার ফলে আত্মজ্ঞান উদিত হয়। পরে লিঙ্গ নিঃস্পন্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। তাহাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি— চৈতন্যস্থিতি। তখন যেমন অন্তঃকরণের ক্রিয়া হয় না, তেমনই দেহেরও ক্রিয়া হয় না। দেহের বায়বিক ক্রিয়া বা প্রাণক্রিয়াও মূলতঃ লিঙ্গ ক্রিয়া-সাপেক্ষ। তাই প্রকৃত সমাধিতে দেহ শববৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। চৈতন্য-সমাধি চিন্ময়-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ। জড়-সমাধি সমাধিই নহে। জড়-সমাধিতে লিঙ্গ চৈতন্যে স্থিতিলাভ করে না—জড় প্রকৃতিতেই প্রতিবদ্ধ হইয়া নিষ্ক্রিয়বৎ বর্ত্তমান থাকে।

জি—আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে, সাধনার পদ্ধতি-সম্বন্ধে এতদিন আমার যে ধারণা ছিল, তাহা ভ্রান্তিমূলক। যোগ ভিন্ন নিত্য কল্যাণের পথে পদার্পণ করা যায় না। যোগী না হইয়া প্রকৃত জ্ঞানী বা ভক্ত হওয়ার উপায় নাই। চিত্তকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ করিবার কৌশলই যখন যোগ এবং চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতি যখন জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষের জন্যও আবশ্যক, তখন যোগের প্রাধান্য অস্বীকার করা চলে না। যোগহীন জ্ঞান জ্ঞান-যোগ নহে, উহা শুষ্ক জ্ঞান মাত্র। তদ্রূপ যোগহীন ভক্তিও প্রকৃত ভক্তি নহে। উহা ভক্তির অনুকরণ মাত্র। একটি সামান্য বিষয়ের তত্ত্বাবিষ্কার যখন যোগ ভিন্ন হয় না, তখন সকল তত্ত্বের ঊর্দ্ধস্থিত পরম তত্ত্বের উপলব্ধি যে বিনা যোগে হইতে পারিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

আপনার অভিপ্রায় আমি কতকটা এইরূপই বুঝিয়াছি। কিন্তু প্রশ্ন এই, বর্ত্তমান যুগে যোগানুষ্ঠানের অধিকারী কে এবং যোগ-সাধনার উপদেশক আচার্য্যই বা কোথায়?

ব—বৎস, যোগে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার আছে। তবে সকলের অধিকার সমান নহে—উত্তমাদি ভেদে অধিকারের তারতম্য আছে। যে যতটা ধারণ করিতে পারে তাহাকে ততটা ভারই দিতে হয়। হস্তীর ভার ছাগলকে দিলে সে তাহাতে পিষ্ট হইয়া যায়, আবার ছাগলের ভার হস্তী গ্রাহ্যই করেনা। অল্পাধিকারীকে প্রথমতঃ অল্প অধিকারই দিতে হয়, ক্রমশঃ তাহার সামর্থ্য অনুসারে অধিকার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সংযম ও নৈতিক উৎকর্ষ

যেমন অন্যান্য বিষয়ে আবশ্যক, তেমনি যোগ-পথেও উন্নতির ভিত্তি-স্বরূপ। যাহারা বলে, কলিতে জীবের যোগে অধিকার নাই, তাহারা যোগের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা জানে না। প্রচলিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা দৈহিক ব্যায়াম অথবা বায়ুর ক্রিয়া-বিশেষকেই যোগ মনে করিয়া থাকে। তাই তাহারা যোগ হইতে রোগোৎপত্তির আশঙ্কা আছে মনে করিয়া বর্ত্তমান কালে যোগ অনুপাদেয় বলিয়া বিবেচনা করে। বস্তুতঃ, যোগ হইতে রোগ উৎপন্ন হয় না—যাহা হইতে ভবরোগ পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়, তাহা হইতে রোগোৎপত্তির আশঙ্কা হাস্যাস্পদ নহে কি? যোগের উপদেষ্টা গুরুর অভাব হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই যোগ সম্বন্ধে এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছে। আজকাল ঘরে ঘরেই যোগী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অভিমানী গুরুর মৌখিক উপদেশ ও লিখিত গ্রন্থাদি হইতে দেশের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। মনে রাখিও, প্রকৃত যোগী অতি বিরল। এক কোটী লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত যোগী খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। যিনি সাক্ষাৎ মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশে জগতের উদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তিনিই যোগী—অন্য সকলে নামধারী মাত্র।

জি—আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে প্রকৃত যোগানুষ্ঠান কার্য্যক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে। কারণ, আপনার আদর্শানুরূপ যোগী বা মহাপুরুষ সংসারে সত্য সত্যই বিরল। সূক্ষ্মবাবে অথবা ছদ্মবেশে বহু মহাপুরুষ এবং সিদ্ধপুরুষ বিচরণ করিলেও যতক্ষণ আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইব এবং দেখিয়া চিনিতে না পারিব, ততক্ষণ তাঁহারা থাকিলেও আমাদিগের কোন লাভ নাই।

ব—মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহারই প্রদর্শিত প্রণালীতে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হইয়া থাকে। মহাপুরুষের আশ্রয় ভিন্ন শুধু গ্রন্থ-পাঠ অথবা ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সাধন-পথে প্রবেশ করা যায় না। সুতরাং কঠিন হইলেও মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ একান্তই আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাধনার মূল—মহাপুরুষের আশ্রয়

জিজ্ঞাসু—মহাপুরুষ কাহাকে বলে? মহাপুরুষকে আশ্রয় করিতে হইবে, কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে চিনিতে পারিব? এমন কোন লক্ষণ বা নিদর্শন কি নাই—যাহার দ্বারা মহাপুরুষের পরিচয় অভ্রান্ত ভাবে উপলব্ধ হইতে পারে? আজকাল বাহ্যাড়ম্বরের প্রবলতা এত অধিক যে, সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতারিত হইবার আশঙ্কা পদে পদে রহিয়াছে। বাবা, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সম্বন্ধে আপনার মত কি তাহা বলুন।

ব—বৎস, ফুল ফুটিলে মধুলিপ্সু ভ্রমরকে কে দেখাইয়া বা চিনাইয়া দেয়? যে স্বভাবে থাকিতে চেষ্টা করে—স্বভাবই তাহাকে শিক্ষা দেন। আমরা স্বভাবকে ভুলিয়া কৃত্রিমতার মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি— সেই জন্য যাহা নিতান্তই সহজ, তাহাও কঠিন বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ কৃত্রিমতা আছে, ততক্ষণ লক্ষণের আবশ্যকতা —নতুবা কোন নিদর্শন দেখিবার আবশ্যকতাই হয় না। শিশু নিজের মাকে চিনিতে পারে—যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে সে স্বতঃই বুঝিতে পারে, কে তাহাকে ভালবাসে, সেজন্য বিচার-বিতর্কের আবশ্যকতা হয় না। যে পুষ্প যে ঋতুতে ফুটে, তাহা আপনি তখন ফুটে, যে পাখী যে কালে গান করে, সে আপনিই তখন গায়—কাহারও উপদেশের আবশ্যকতা হয় না। স্বভাবই সেস্থলে পরিচালক। যে যে জিনিষের জন্য তীব্রভাবে ব্যাকুল হয়, যাহাকে না পাইলে তাহার সোয়াস্তি নাই, শয়নে স্বপনে জাগরণে যাহার জন্য সে আনমনা হইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে—ঠিক যখন যে বস্তুটি উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চিনাইয়া দিতে হয় না। সে নিজেই বুঝিতে পারে, তাহার কাম্য বস্তু আসিয়াছে। ঠিক সেই প্রকার যখন জীবের নিরাশ্রয় ভাব উদিত হয়, যখন সে সত্য সত্যই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠে, তখন সে মহাপুরুষের দর্শন পায় ও মহাপুরুষকে দেখিবামাত্রই তাঁহাকে আশ্রয়দাতারূপে অস্ফুটভাবে চিনিতে পারে। তাহাকে লক্ষণ মিলাইয়া চিনিতে হয় না। খাঁটি জিনিষ স্বভাবসিদ্ধ। খাঁটি পরিচয়ও স্বাভাবিক। বাহ্য লক্ষণ মিলাইয়া চিনিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

জি—তবে লক্ষণ-শাস্ত্র কি নিরর্থক? আপনি কি বলিতে চান, বাহ্য লক্ষণ মিলাইবার আবশ্যকতা নাই? সত্য ও মিথ্যার একরূপতা বা সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। অনেকেই যে এই ভাবে প্রতারিত হয়, তাহা সত্য। যদি তাহারা লক্ষণজ্ঞ হইত, যদি তাহারা চিনিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় খাঁটি জিনিষকে ধরিয়া ফেলিত।

ব— দেখ, লক্ষণ-শাস্ত্র ব্যর্থ নহে। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, যাহার যখন যে-বস্তুর যথার্থ আবশ্যকতা হয়, সে তখন সে-বস্তুকে প্রাণের টানেই বুঝিয়া লয়—বুঝাইবার জন্য অন্যের উপদেশ দরকার হয় না। তবে যখন সে সময় উপস্থিত না হয়, তখন নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। যে সরল-হৃদয়, যাহার কাল আসন্নতম হইয়াছে, তাহাকে কেহই প্রতারিত করে না। তুমি আপন অন্তঃকরণ হইতে কুটিলতা, প্রবঞ্চনা, বদ্-খেয়াল, অসদ্ভাব—এ সব বিদূরিত করিয়া ফেল, দেখিতে পাইবে, এ জগতে কেহই তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিবে না। ক্রিয়া অনুসারেই প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। যাহার নিজের মধ্যে হিংসা আছে, সেই ভীত হয় এবং তাহার নিকটেই হিংসার প্রকাশ হইয়া থাকে। যে জগৎকে অভয় দিতে পারে, তাহার আবার কিসের ভয় হইবে? যাহার মধ্যে প্রেমতত্ত্ব অচল কমলের ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কাছে সিংহ ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হিংসাবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়—তাহারাও প্রেমভাবে বশীভূত হইয়া নানাপ্রকারে তাহার আপ্যায়ন করিতে থাকে। শত শত বার এই সব আমি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং অধিকারানুসারে অনেককে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছি।

তুমি কাহাকেও স্বপ্নেও প্রতারণা করিও না— কেহই তোমাকে প্রতারণা করিতে পারিবে না। প্রতারিত না হইবার ইহাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। জীব যখন বাস্তবিকই সংসার তাপে তাপিত হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে, যখন দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হইতে তাহার অন্তরের যাবতীয় মল অপগত হইয়া যায়, যখন তাহার সরল ও স্বচ্ছ প্রাণ একান্ত আকুল হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন নিশ্চয় জানিও, সেই আদ্যাশক্তিই তাহার নিকট মহাপুরুষরূপে, অভয়প্রদ আশ্রয়স্বরূপ হইয়া তাহার শোকাপনোদনের জন্য প্রকটিত হন। সে সময়ে তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারে, এরূপ শক্তি জগতে কাহারও নাই। তবে যতক্ষণ তাহার চিত্ত মলিন থাকে, ততক্ষণ তাহাকে পরীক্ষার জন্য, পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে শোধিত করিবার জন্য, নানাপ্রকার ইন্দ্রজালের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তখন অবশ্য সে প্রতারিত হইতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু কাল পূর্ণ হইলে আর প্রতারণা থাকে না। কারণ, প্রতারণাত্মিকা

ছলনাময়ী মায়া স্বয়ং তাহার কল্যাণদায়িনী মাতৃরূপে মহামায়া-রূপ পরিগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ সংসার-জ্বালায় ব্যাকুল-হৃদয় জীব শিশুকে আপন সুশীতল অঙ্কে স্থাপনা করিয়া তাহার তাপ দূর করিয়া থাকেন।

জি—বাহ্যলক্ষণ দ্বারা কি তবে চেনা যায় না?

ব—যাবে না কেন? যে জানে, সে অবশ্যই তাহা পারে। তবে তাহাও সহজ নহে। যিনি মহাপুরুষ, তিনি যদি আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছা না করেন, যদি তিনি ধরা দিতে না চান, তবে কাহার সাধ্য তাঁহাকে লক্ষণ দ্বারা চিনিয়া লয়? জানিয়া রাখ, তিনি অলক্ষ্য বস্তু—নিজের উপাধি সঙ্কোচ করিলে কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারি না, এমন কি দেখিয়াও লক্ষ্য করিতে পারে না। আর, তিনি যদি নিজে ধরা দেন, তবে যে-ভাবে আবির্ভূত হইলে জীব ধরিতে পারিবে, সেই ভাবেই আবির্ভুত হন। লক্ষণ জানা না থাকিলেও জীব তাঁহাকে চিনিতে পারে।

আসল কথা, কৌশল বা বলপূর্ব্বক মহাপুরুষকে বুঝিবার চেষ্টা করা বাতুলের প্রয়াস মাত্র। যদি তাহা পারা যাইত, তাহা হইলে মহাপুরুষ অথবা অবতারাদিকে সকলেই সমভাবে চিনিতে পারিত—মতভেদ পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু তাহা কি কোথাও হইয়াছে? তুমি ত ইতিহাস জান—তুমি নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবে।

মহাপুরুষ বালকের ন্যায়, জড়বৎ, উন্মত্ত ও পিশাচবৎ আচরণ করেন— তোমার এমন কি ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছে যে, তুমি বাহ্যভাবের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যাহা মহাপুরুষ মাত্রের নিত্য ও সামান্য-রূপ ও যাহা সদা-প্রকাশমান তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পার? জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন না হইলে কোন বস্তুরই যথার্থরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না— যে অজ্ঞানী, সে মহাপুরুষকে চিনিবে কি প্রকারে? সে নিজেকেই চিনিতে পারে না।

যদি বল দৈহিক লক্ষণ অথবা ব্যবহার বা আচারের দ্বারা অজ্ঞানীর পক্ষেও মহাপুরুষকে চিনা সম্ভবপর—তবে প্রশ্ন এই, যদি শক্তিশালী পুরুষ গুপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কোন লক্ষণই তাঁহার অঙ্গে প্রকট হইবে না। তখন চিনিবার উপায় কি থাকিবে? ব্যবহার বা আচারে তাঁহারা বদ্ধ নহেন। তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট আচার নাই—বস্তুতঃ তাঁহারা বিধি-নিষেধের অধীন নহেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী, লীলাময়। তাঁহাদের খেয়ালের ভিতরে ঢুকিয়া স্বরূপ দর্শন করা কি সহজ কথা।

তবে একটি কথা আছে। যখন তাঁহারা তটস্থ থাকেন—অর্থাৎ কাহারও প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল-ভাব-বিশিষ্ট না থাকেন—তখন লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায় বটে।

এই লক্ষণ যে শুধু স্থূল-দেহ-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে—স্থূল, লিঙ্গ

ও কারণ সকল দেহেই প্রযোজ্য। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে স্থূলের অতীত বস্তু অতীন্দ্রিয় বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন লক্ষণ কার্য্যসাধক হয় না। অবশ্য, সাধন-বলে আপন সত্তার বিকাশ হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ও বিশুদ্ধতর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ও তদনুসারে সিদ্ধান্ত স্থাপনা করা যায়।

যাঁহারা ইচ্ছামাত্র অন্যের লিঙ্গশরীর দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা লিঙ্গ দেহের বর্ণ, গতি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হইতে উক্ত লিঙ্গাভিমানী জীবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বুঝিতে পারেন। যাহা কিছু জানা আবশ্যক, সব উহা হইতেই জানিতে পারেন। কিন্তু মহাপুরুষগণ লিঙ্গাতীত—কারণ, তাঁহারা মুক্ত। সুতরাং যাঁহাদের কারণদেহ বা মহাকারণদেহ পর্যন্ত দেখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারাই স্বয়ং লিঙ্গাতীত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে সমর্থ।

কিন্তু সাধারণ জীব স্থূল দর্শনের অগোচর কোন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সেইজন্য উক্ত অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য হইতে বস্তুজ্ঞান করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এই জন্যই স্থূল লক্ষণ দ্বারা জানিবার চেষ্টা।

জি—মানুষ সিদ্ধিলাভ করিলে তাঁহার দেহে কোন পরিবর্ত্তন বা লক্ষণ প্রকাশ হয় কি? যদি হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা হয়ত পরিচয়ের কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে।

ব—তপস্যা করিলে দেহের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এমন কি পরমাণু পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। যাঁহার ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার স্থূলদেহ স্থূল হইলেও অন্যান্য লোকের দেহের ন্যায় নহে। বার বার সঙ্গ করিতে হয়—দীর্ঘকাল সঙ্গে থাকিলে বহু অলৌকিক লক্ষণ ঐ দেহে দৃষ্টিগোচর হয়। দেখ যাঁহার কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইয়াছে, যিনি সিদ্ধি এবং যোগলাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে একটু বৈশিষ্ট্য থাকে। এই জন্য ঐ বৈশিষ্ট্য দ্বারা একখানা ফোটোগ্রাফ হইতেও কাহারও যোগসিদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে একটু বৈশিষ্ট্য থাকে। এই জন্য ঐ বৈশিষ্ট্য দ্বারা একখানা ফোটোগ্রাফ হইতেও কাহারও যোগসিদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা জানিতে পারা যায়। যোগী, রোগী ও ভোগী—শুধু চক্ষুর চাহনি হইতেই ধরা পড়ে। যোগীদের ললাটেরও পরিবর্ত্তন হয়। তা-ছাড়া, যাঁহার কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে ও সুষুম্না-পথ সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল থাকে, তাঁহার দেহে সর্ব্বদা পদ্ম-গন্ধ খেলে, তাঁহার নিঃশ্বাসে পদ্ম-গন্ধ বহিতে থাকে, তাঁহার নাভির নিকটে কোন পাত্র রাখিয়া উপর হইতে জল ঢাকিলে ঐ জল নাভিস্পর্শে পদ্মের সুগন্ধি আতরের ন্যায় হইয়া পাত্রে সঞ্চিত হয়। যোগাদিগের ব্যবহারকালেও নাসিকাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে না—নাভি-পথে ও লোমকূপের পথে চলে। শুধু তাহাই নহে—তাঁহারা তোমাদের

ন্যায় পুনঃ পুনঃ বায়ু গ্রহণ করেন না। বাহ্য বায়ু যখন তাঁহারা গ্রহণ করেন, তখন উহা নাভিপথে নির্ম্মল ভাবেই গৃহীত হয়—মলাংশ বাহিরে পড়িয়া থাকে। ঐ বায়ু দীর্ঘকাল শরীরের ভিতরে ধরা থাকে—ভিতরে ভিতরেই উহা সঞ্চরণ করিতে থাকে। এই জন্যই যোগিগণ বাহ্যভাবে অভিভূত হয় না। চিত্তে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির উদয়, কাম-ক্রোধাদি ভাবের সঞ্চার—সবই বাহ্যবায়ুর সহিত সংঘর্ষের ফল। যিনি বাহ্য-বায়ুর সহিত সম্বন্ধ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার নির্ব্বিকার ভাব ও একাগ্রতা কিছুতেই নষ্ট হয় না—বহির্জগতের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াও তিনি বিষয়ে লিপ্ত হন না। বহিঃস্রোত তাঁহার অন্তরে প্রবেশ-পথ পায় না। যিনি যোগী, তাঁহার দেহ সিদ্ধদেহ। তিনি ইচ্ছামাত্রই নিজের দেহকে সঙ্কুচিত করিতে পারেন, এমনকি পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র করিয়া অদৃশ্য হইতে পারেন, আবার প্রসারণ করিয়া বিরাট আকারে পরিণত করিতে পারেন। ইহাকেই তোমরা অণিমা ও মহিমা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাক। শুধু দেহ কেন, দেহের যে কোন অবয়বকে কিংবা বাহ্য বস্তুকেও তিনি ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ করিতে পারেন। দেহকে ইচ্ছানুরূপ হাল্কা ও ভারী করাও তাঁহার আয়ত্ত। তিনি দেহকে কর্দ্দমপিণ্ডের ন্যায় পিণ্ডীভূত করিতে পারেন অথবা সন্ধি-সকলকে শিথিল করিয়া প্রত্যেকটি অংশকে পৃথক্ করিয়া ফেলিতে পারেন। নাভিরন্ধ্র অথবা লোমকূপ দ্বারা বাহিরের যে কোন পদার্থ আকর্ষণ করিয়া ভিতরে ঢুকাইতে পারেন। সে পদার্থ যত বড় বা যে পরিমাণ হউক, তাহাতে কোন বাধা নাই। তিনি এক দেহকে বহু প্রকারের বা একই প্রকারের বহু দেহে বিভক্ত করিয়া এক বা বহু স্থানে যুগপৎ প্রকাশিত হইতে পারেন। প্রাচীর বা অন্য কোন কঠিন আবরণের ভিতর দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে যোগি-দেহ প্রতিহত হয় না। তাঁহার দেহে এত অধিক পরিমাণে তাড়িত-শক্তি সঞ্চিত থাকে যে, হিংস্র ভাব লইয়া যে-কোন জীব তাহা স্পর্শ করিতে যাইবে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহা যে তাঁহার ইচ্ছাতে হয়, তাহা নহে—স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। বিষধর সর্পের উগ্র বিষও যোগিদেহে বিষক্রিয়া করিতে পারে না—দৈহিক তেজের সংঘর্ষে উহা ভস্ম হইয়া যায় ও দংশনকারী সর্পাদি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। উচ্চ স্থান হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলে যোগিদেহ ভূমিস্পর্শ করে না—কারণ দেহে ঊর্দ্ধগতিশীল নির্ম্মল বায়ু সঞ্চিত থাকে বলিয়া পড়িবার সময়ে উহা বিক্ষুব্ধ হইবামাত্র দেহ আপনিই শূন্যপথে উপর দিকে উঠিতে থাকে। যোগীর নেত্রে এত তেজঃসঞ্চয় হয় যে, তিনি তীব্রভাবে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়—এমন কি, অতি

কঠিন প্রস্তর বা লৌহ পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ছোট ছোট বালক-বালিকা—যাহারা অক্ষুণ্ণ-ব্রহ্মচর্য্য-যোগীর নয়নে তাকাইলে নানা প্রকার দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পায়। একটু গভীরভাবে নিবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যোগীর দেহ হইতে জ্যোতির ছটা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে—দেহ-প্রভায় অন্ধকার ঘরও আলোকিত হইয়া পড়ে। এইরূপ কত যে লক্ষণ আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যোগী নির্ভীক, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ ও মধুর-প্রকৃতি হইয়া থাকেন। যাহা হউক, এ সকল লক্ষণ দ্বারা সাধারণ লোকের পক্ষে মহাপুরুষ চিনিবার সহায়তা হয় বটে। কিন্তু মনে করিও না, ইহা দ্বারাই সকল অবস্থাতে সত্য পরিচয় পাইবে। আর এ সকল লক্ষণ বাহ্যতঃ তুমি দেখিতে না পাইলেও যে মহাপুরুষের অভাব লক্ষণ করিবে, তাহা যেন না হয়।

জি—বাবা, বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে মহাপুরুষের ৩২ লক্ষণ ও ৮৪ অনুব্যাঞ্জনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকলও বাহ্য চিহ্ন। তন্ত্রশাস্ত্র ও লক্ষণ-গ্রন্থেও মহাপুরুষের চিহ্নের বিবরণ আছে। কিন্তু আসল কথা, নিজের দৃষ্টিশক্তির বিকাশ অথবা হৃদয়ের সত্য ব্যাকুলতাই মহাপুরুষকে ধরিবার প্রধান উপায়।

যাহা হউক, মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ যে অত্যাবশ্যক বলিয়া আপনি বর্ণনা করিতেছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? ইহাই ত গুরুকরণ। গুরুর সাহায্য ভিন্ন কি জীব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না?

ব—না, জীবে যতক্ষণ গুরুর শক্তি সঞ্চারিত—পতিত না হয়, ততক্ষণ সে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক কর্ম্মে অধিকারী হয় না, সে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। গুরুদত্ত শক্তিই সাধনার মূলধন।

জি—ইহার কারণ কি? গুরুকরণ না হইলে ধর্ম্মজীবন যাপন করা যায় না কেন? নিজের উন্নতি পরের উপর নির্ভর করিবে—ইহা বড়ই অসঙ্গত কথা বলিয়া মনে হয়। জগতে কত কত শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইয়াছেন, তাঁহারা গুরুবাদ স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারাও ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সকল জীবের কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না? গুরুর মাধ্যস্থ্য স্বীকার করিতে হইলে নানা প্রকার দোষের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। পোপের অধীনতায় ক্যাথলিক সমাজের যে দুর্গতি হইয়াছে, আমাদের দেশেও গুরুবাদের প্রভাবে সেই প্রকার, এমন কি, ততোধিক, অপকার হইয়াছে। ইহা আপনাকে মানিতেই হইবে। মানুষ—বিবেকবান্ বিচারশীল মানুষ—অন্য একজন মানুষের অধীন কেন হইবে? এইভাবে আমাদের ব্যক্তিত্ববোধ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

ব—বৎস, তোমরা এখনও বালক। তাই সহজেই মাতোয়ারা হইয়া পড়— কোন বিষয় তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা কর না। আমি গুরু বা কৃপা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে তুমি এ প্রকার প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইতে না। তোমার সব শঙ্কার সমাধান আমি এক প্রকার করিয়াই দিয়াছি। তবু বিষয়টি জটিল বলিয়া প্রকারান্তরে আবার বলিতেছি। গুরুকরণ ভিন্ন যে ধর্ম্মজীবন লাভ হয় না, তাহা সত্য কথা। বিশুদ্ধ আধারে প্রকাশমান চিৎ-শক্তির সহকারিতা না পাইলে জড়ত্বের আবরণে আচ্ছন্ন জীব কি প্রকারে আবরণ কাটাইয়া নিজের চৈতন্যময় স্বরূপ উপলব্ধি করিবে? যে শক্তি ঈশ্বরে আছে, তাহাই জীবেও আছে—সত্য; কিন্তু ঈশ্বরে সে শক্তি প্রকট, কার্য্যকরণ সমর্থ, অভিব্যক্ত; জীবে তাহা অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয় অপ্রকট, জড়ত্বের ভারে অবসাদগ্রস্ত। জীবশক্তিও যে চিৎশক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা অবিদ্যাগ্রস্ত। উহার বলাধান করিতে হইলে বাহির হইতে উহার সমান বস্তু দ্বারা উহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। ঐ শক্তিকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলে। উহা বদ্ধজীবে প্রসুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে—উহাকে ক্রিয়া-কৌশলে, গুরু-কৃপায়, যে কোন উপায়ে হউক, জাগাইতে হইবে। তবে ত ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইবে। কুণ্ডলিনী নিদ্রিত থাকা পর্য্যন্ত জীবের বদ্ধতা, নিদ্রাভঙ্গে জীবের মুক্তি। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন নিদ্রিত থাকে, জীবদেহে কুণ্ডলিনী সেইপ্রকার নিদ্রিত থাকে। কাষ্ঠস্থ অগ্নিকে চেতন করিতে হইলে দুই উপায়ে করা সম্ভবপর—

(১) প্রথমতঃ কাষ্ঠের তীব্র সংঘর্ষ দ্বারা উহার অন্তঃস্থ অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

(২) অথবা, বাহ্য প্রদীপ্ত অগ্নির সঞ্চারে কাষ্ঠস্থ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাষ্ঠে যদি স্বাভাবিক অগ্নি না থাকিত তাহা হইলে বাহ্য অগ্নি দ্বারা তাহা দগ্ধ হইত না—বাহ্য অগ্নির কোন ক্রিয়াই তাহার উপর হইত না। বাহ্য অগ্নি অভিব্যক্ত, প্রকাশ-কালকে পাইয়াছে—তাহার সংসর্গে কাষ্ঠের অব্যক্ত অগ্নিও অভিব্যক্ত হয়, প্রকাশ-কালকে প্রাপ্ত হয়। ইহা সঙ্গের মহিমা—সৎ-সঙ্গের ফল। যিনি চেতন, তাঁহার সংস্পর্শে অচেতনও চেতন হইয়া উঠে। অচেতনেও চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া আছে— চেতনের সঙ্গবশতঃ উহা প্রকট হয়। যাহাতে প্রসুপ্তভাবে চৈতন্য নাই, তাহা চেতনের স্পর্শেও চেতন হয় না।

চৈতন্যের অভিব্যক্ত রূপকেই গুরু বলে। বিশাল অব্যক্ত চৈতন্য যাহা জীবাধারেও আছে, তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে হইলে ঐ অভিব্যক্ত চৈতন্য বা গুরুর দ্বারাই করিতে হয়। একমাত্র গুরুই চেতন করিতে পারেন। সত্বগুণের বিশেষ বিকাশ মনুষ্যে —যতই তাহা আবৃত থাকুক। তাই মনুষ্যের

সত্ত্বে নিহিত অব্যক্ত-চৈতন্য জাগরণযোগ্য। মনুষ্যেতর জীবে সত্ত্ব মন্দভাবাপন্ন —সেখানে বিচার-শক্তি, বিবেকশক্তি, বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই—স্থাবরে সত্ত্ব তমোভাবের দ্বারা সমাচ্ছন্ন, সেখানকার ত কথাই নাই। সুতরাং, গুরুশক্তির সঞ্চার শুধু মনুষ্যদেহেই হয়। তাই মনুষ্য জন্মের এত প্রশংসা।

জি—কাষ্ঠস্থ অগ্নি যেমন দুইভাবে চেতন হইতে পারে—জীবের সুপ্তা প্রাণশক্তিও তেমনি দুইভাবে জাগিতে পারে—বাহ্য-গুরুশক্তির সাহায্যে, অথবা আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে। প্রথমটি কৃপা, দ্বিতীয়টি পুরুষকার। পুরুষকারের পথও আছে— সে পথে গুরু না হইলে চলিতে পারে না কি?

ব— দেখ, পুরুষকারের মধ্যেও ঐশীশক্তি রহিয়াছে। গীতায় আছে—"পৌরুষং নৃষু"। পুরুষকারও তাঁহারই বিভূতি। পুরুষকার ও কৃপা অন্যোন্যসাপেক্ষ—একটিকে ছাড়িয়া অপরটি কার্য্যক্ষম হয় না। এ কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। তবে যাহাকে আমরা কৃপা বলি, তাহাতে কৃপাংশের প্রাধান্য থাকে, পুরুষকারে পুরুষকারের প্রাধান্য থাকে। ইহাই ভেদ। অব্যক্তশক্তির দ্বারা কার্য্যসাধন করিতে হইলে তাহাকে জাগাইতেই হইবে। চিৎশক্তি প্রবুদ্ধ হইলে তাহাকে ঐশ্বরিক শক্তি বা বিভূতি বলে। চিৎশক্তি প্রসুপ্ত থাকিলে বদ্ধ জীবশক্তি খেলিতে থাকে—ইহা জড়শক্তি; ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন রূপ। জড়শক্তির অন্তরালে চিচ্ছক্তি আছে—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বস্তুতঃ জড়শক্তি চিৎশক্তিরই বিক্ষিপ্ত ও আচ্ছন্ন অবস্থা মাত্র। ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যাহার ও অন্তঃকরণের নিবৃত্তি হইলে একাগ্রতার পরমাবস্থায় চিৎশক্তি জাগিয়া উঠে। আবার ঘুমাইয়া পড়ে—ইন্দ্রিয়াদির ব্যুত্থান হয়। ক্ষণমাত্র চৈতন্য প্রকট থাকিলেও তাহার ফলে বাসনা ও সংস্কার-রাশি দগ্ধ হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতে হইতে বাসনাদি ক্ষীণ হইয়া যায়, চিৎশক্তি মেঘান্তরিত সূর্যের ন্যায় অনাবৃত-প্রায় ভাবে প্রকাশিত হয়, অবিদ্যা অনেকটা নিবৃত্ত হইয়া যায়। এ যেন উষাকালে অন্ধকারের তিরোভাব। তারপর জ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয়ে সব আবরণ কাটিয়া যায়, লেশও থাকেনা। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, যাবতীয় ক্রিয়া—সব পুরুষকার বা কর্ম্ম। কিন্তু ভিন্ন কৃপা শুধু পুরুষকারের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে না। পুরুষকার ততক্ষণ যতক্ষণ অভিমান থাকে। তারপর যখন কৃপার সঞ্চার হয়, অভিমান বিগলিত হয়, তখন শান্তি আসে। কৃপার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত অভিমান কাটে না, কর্ম্মনিবৃত্তি হয় না। দৌড়িয়া যেমন নিজের ছায়া লঙ্ঘন করা যায় না, তদ্রূপ শুষ্ক পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম কাটান যায় না। পুরুষকার যেমন প্রবৃত্তি-মার্গের মূল, তেমনি কৃপা নিবৃত্তি-মার্গের মূল। পুরুষ যখন আদ্যা প্রকৃতিকে—স্বভাবকে—আশ্রয় করেন তখন

পুরুষকার কাটিয়া যায়। তখন প্রকৃতিই সব করেন, পুরুষকার বা চেষ্টা আর থাকে না, পুরুষ তখন নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া প্রকৃতির ক্রীড়া দর্শন করেন মাত্র। এই যে প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ, ইহাই অভিমান-ত্যাগের ভিত্তি, ইহাই কৃপা মার্গের সূত্রপাত। আশ্রয় গ্রহণ, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি ভিন্ন কৃপার বিকাশ হয় না। আবার কৃপা ব্যতিরেকে অভিমান ছাড়িয়া শরণাপন্ন হওয়াও যায় না।

কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া স্বাভাবিক পথকে অবলম্বন করিতেই হইবে—স্বাভাবিক পথে পদার্পণ না করিলে স্বভাব বা স্বরূপের উপলব্ধি হইতেই পারে না। কৃত্রিম উপায় ততক্ষণ, যতক্ষণ স্বভাবের আশ্রয় না লওয়া হইয়াছে। ততক্ষণ বিকারের সভা অবশ্যম্ভাবী। স্বাভাবিক পথকে অবলম্বন করাই গুরুপদাশ্রয়। নদীর স্রোতঃ সমুদ্রপানে বহিয়া যাইতেছে—তাহাতে নৌকা ভাসাইয়া দিলে স্রোতের টানেই তাহাকে বিনা আয়াসে সমুদ্রে লইয়া যাইবে। তদ্রূপ অন্তঃ প্রবাহশালিনী জাগ্রৎ চিৎ-শক্তির আশ্রয় লইলে তাহাই জীবকে চৈতন্য-সমুদ্রে পৌঁছাইয়া দিবে। অভিমান পূর্ণভাবে গলিত না হওয়া পর্য্যন্ত তদনুপাতে অঙ্গীভূতরূপে পুরুষকারের আবশ্যকতা আছে। অভিমান ক্ষীণ হইয়া থাকিলে তাহারও ততটা প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং পুরুষকারের পথে চলিলেও পরিশেষে প্রকৃতির আশ্রয় লইতেই হয়—কৃপার অপেক্ষা করিতেই হয়। প্রকৃত রাস্তা না খুলিয়া দিলে জীবের সাধ্য কি অগ্রসর হয়? দ্বার অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে—দ্বার মুক্ত করিবেন প্রকৃতি অর্থাৎ ঈশ্বর (নারায়ণ-নারায়ণী), তাঁহার শক্তিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। পুরুষাকার দ্বারা দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিতে পারে। তাহাতে দ্বার খোলা যায় না। তবে দ্বারে আসিয়া মাথা নীচু করিবামাত্রই দ্বার খুলিয়া যায়।

পক্ষান্তরে, শুধু কৃপা হইতেও ইষ্ট সিদ্ধি হয় না, যদি তাহার সঙ্গে পুরুষকারের যোগ না থাকে। ঐশ্বরিক শক্তি প্রায় পূর্ণমাত্রায় কৃপারূপে প্রকট হইলেও বদ্ধজীবের শক্তি, পুরুষকার, যদি লেশমাত্র তাহার সহিত যুক্ত না হয়, তবে ফলসিদ্ধি হইবে না। জীবকে অন্ততঃ কৃপা গ্রহণ ও ধারণ করিতে হইবে—তাহাও শক্তি বা পৌরুষসাপেক্ষ। যাহাকে আমরা প্রার্থনা বলি, তাহাও পুরুষকার। অন্ততঃ ততটুকু পুরুষকার, শুভেচ্ছারূপ, জীবের চাই-ই। নতুবা কৃপা নিষ্ফল।

তবে একটি কথা আছে। তীব্র পুরুষকার থাকিলে আবশ্যক কৃপা আপনিই জাগে, আশ্রয়-গ্রহণ আপনিই হইয়া যায়। যে তীব্র পুরুষকারবান্, সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না। ইহা নিশ্চয়। তখন পুরুষকার আপনিই কাটিয়া যায়। আবার তীব্র কৃপা হইলে আবশ্যক পুরুষকার জীবের মধ্যে আপনিই ফুটিয়া উঠে, যাহার দ্বারা সে ঐ কৃপাকে গ্রহণ করিতে পারে। গুরু

যদি তেমনভাবে শক্তি প্রকট করেন, তবে প্রথমতঃ তাহাই জীব-হৃদয়ে শুভেচ্ছারূপে ও অবস্থাবিশেষে কর্ম্মরূপে প্রকটিত হয়। পরে কর্ম্ম বা পুরুষকার নিবৃত্ত হইয়া (ইচ্ছাও নিবৃত্ত হইয়া) শান্তি উৎপন্ন হয়।

যদি কাহারও মনে মুক্তির ইচ্ছা, শুভ ইচ্ছা, ভাল হইবার ইচ্ছা, জাগিয়া থাকে, জানিবে তাহাও ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন। যদি আমার প্রতি তাঁহার কৃপা না হয় তবে তাঁহাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা আমাতে হইতে পারে না, আত্ম-জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এসব তাঁহার দয়ার নিদর্শন। তেমনি যদি দেখিতে পাও কাহারও উপর তাঁহার কৃপা হইয়াছে, তবে নিশ্চয় জানিও উহার অতি তীব্র পুরুষকার পশ্চাতে রহিয়াছে। কত জন্মের খাট্‌নি, কত হাহাকার ও ব্যাকুলতা, কত আর্ত্তি ও বেদনা, কত নীরব অশ্রুপাত কাটিয়া গিয়াছে—এখন তাই কৃপার সঞ্চার হইয়াছে। শুধু বর্ষার ধারা দেখিতে পাও—তৎপশ্চাতে নিদাঘের শুষ্ক তাপ কি চোখে পড়ে না? হঠাৎ কোন জিনিষ হয় না। একজনে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কৃপা পাইল, আর একজন সমস্ত জন্ম খাটিয়াও তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিল না—মনে করিও না, ইহার কোন তাৎপর্য্য নাই। যে অল্প দিনে কৃপা পাইয়াছে, তাহার অতীত জীবনের ইতিহাস একবার জ্ঞান-দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা কর, তাহার তপস্যার উগ্রতা ও কঠোরতা বুঝিতে পারিবে। যে সমস্ত জীবন খাটিয়াও কৃপা পাইল না, জানিও, তাহাকে এখনও আরও খাটিতে হইবে। ফাঁকি দেওয়ার উপায় নাই। কেহ অল্প বয়সেও বৈরাগ্যবান্ হয়, কেহ বৃদ্ধবয়সেও বিষয়-তৃষ্ণা ছাড়িতে পারে না। জানিও, ঐ বৈরাগী বয়সে বালক হইলেও বস্তুতঃ বৃদ্ধ, কারণ সে প্রবৃত্তি-চক্র ছাড়িয়া নিবৃত্তি-মুখে আসিয়াছে, আর ঐ বিষয় লোলুপ বৃদ্ধ এখনও বালক, কারণ, এখনও তাঁহার বিষয-তৃষ্ণা মিটে নাই, এখনও তাঁহার নিবৃত্তি-পথে আসিবার উপযুক্ত ক্লান্তি আসে নাই। ঐ বালক শীঘ্র মুক্ত হইয়া সংসার-মণ্ডলের ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইবে, তাহার গতি নিরুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তাহার তৃষ্ণা গতপ্রায় ও বিষয়-সম্বন্ধ শিথিল, কারণ সে প্রকৃতির আশ্রয়ে চলিতেছে। আর ঐ বৃদ্ধ এখনও দীর্ঘকাল সংসারে ভ্রমণ করিবেন। এখনও বহু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তর্পণ তাঁহার বাকী আছে। অতৃপ্তি ও ঋণ লইয়া কেহ মুক্ত হইতে পারে না। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ক্লান্ত হইয়া ক্ষণিকের জন্য যখন জীব ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তখন চমকিয়া বুঝিতে পারিবে, তাহার অন্বেষণের ধন বাহিরে নাই—অন্তরেই আছে। তখন হইতে তাহার নিবৃত্তির আরম্ভ—অন্তর্মুখে যাত্রার সূচনা।

প্রকৃতির অন্ত ও নিবৃত্তির আরম্ভ—এই মধ্যস্থলেই গুরু প্রকট হন। গুরুশক্তির আবির্ভাব ভিন্ন প্রবৃত্তির অবসান ও নিবৃত্তির অবসান ও নিবৃত্তির

প্রারম্ভ হইতে পারে না। অন্তর্জ্জগতে প্রবেশের চাবি গুরুর হাতে — অন্তর্জ্জগতে প্রবিষ্ট না হইলে নিবৃত্তি-মার্গে চলা সম্ভবপর হয় না, নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার হয় না, স্বাভাবিক কর্ম্ম হয় না।

জি—নিষ্কাম কর্ম্ম কি পুরুষকার নহে?

ব— দেখ, কর্ম্মমাত্রই পুরুষকার নহে—নিষ্কাম কর্ম্ম পুরুষের কৃতি-সাধ্য নহে বলিয়া উহাকে পুরুষকার বলা উচিত নহে, উহা প্রাকৃতিক কর্ম্ম। পুরুষকার মূলে অভিমান আছে, নিষ্কাম কর্ম্মের মূলে অভিমান বা কর্ত্তৃত্ববোধ নাই। বস্তুতঃ, গুরুকৃপাতে মধ্যপথ খুলিয়া গেলে স্বভাবের প্রেরণায় যে নিবৃত্ত-কর্ম্ম হয়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। উহাতে বন্ধন ত হয়ই না, বন্ধন খসিয়া যায় ও জগতের কল্যাণ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মভিন্ন চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোদয় অসম্ভব।

ইহারই অপর নাম যোগ। ইহা কর্ম্মের কৌশল। যোগরূপ নিবৃত্ত-কর্ম্ম ভিন্ন যাবতীয় কর্ম্মই কামনাধিকৃত ও বন্ধনের হেতু।

জি—সুতরাং গুরুশক্তির প্রভাবে মধ্যপথ খুলিলে যোগরূপ কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইতে পারে। এই প্রকার কর্ম্মভিন্ন যখন কর্ম্ম কাটাইবার এবং জ্ঞানলাভের অন্য কোন উপায় নাই, তখন আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে গুরুর স্থান অদ্বিতীয়। যে পথ খুলিলে প্রকৃত কর্ম্ম হইতে পারে, সে-পথ খুলিয়া দেওয়াই যখন গুরুর কার্য্য, তখন গুরুকরণ ভিন্ন কর্ম্ম অধিকার হয় না।

ব—মধ্যপথই ত ব্রহ্ম-পথ। অন্য পথ কুপথ—বিষয়মার্গ। মধ্যপথে শক্তির স্রোত উজানে বহিতে থাকে। যে সকল শক্তি ইন্দ্রিয়াদির পথে এখন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, চিৎশক্তির প্রবোধনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সব একাগ্র হইয়া, পুঞ্জীভূত হইয়া, চিৎ-প্রবাহের মধ্যে পতিত হইয়া আপনা-হারা হয়। হোমাগ্নি যেমন সমিদাহরণে সমিদ্ধ হয়—বর্দ্ধিত হয়, দেহমধ্যস্থ চিদ্‌বহ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইলে ও ইন্দ্রিয়াদির আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত হইলে তেমনি প্রবলাকার ধারণ করে। উহা ঊর্দ্ধস্রোতে চলিতে চলিতে অনন্ত চিৎসাগরে যাইয়া আত্ম-সমর্পণ করে। ইহাই চিন্ময়ী জীবধারার—জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীর — চৈতন্যসমুদ্রে বিলীন হওয়া।

মধ্যপথে সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজঃ খেলে—দক্ষিণ ও বামমার্গে বিষয়স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মতেজঃ ভিতরের দিকে চলে, বিষয়স্রোতঃ বাহিরের দিকে চলে; একটি ঊর্দ্ধাকর্ষণ, অপরটি মাধ্যাকর্ষণ বা অধঃকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট নীচভাবাপন্ন জীবকে এই ঊর্দ্ধস্রোতে যুক্ত করিয়া দেওয়াই গুরুর কার্য্য। স্রোতের কার্য্য স্রোতঃই করিবে—তাহা স্বাভাবিক। গুরু শুধু স্বভাবের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া দেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুরু তত্ত্ব

জিজ্ঞাসু—এতক্ষণ যাহা শুনিলাম, তাহা হইতে মনে হইতেছে যে, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ বা গুরুকরণ ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে আপনার সকল উপদেশই আমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছি। অনেক বিষয়ে আমার সংশয় দূর হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য বাকী রহিয়াছে। গুরুকরণের আবশ্যকতা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গুরুর স্বরূপ কি, তাহা জানা আবশ্যক। গুরু-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে আনুষঙ্গিক সকল শঙ্কাই সহজে মীমাংসিত হইয়া যায়।

বক্তা—বৎস, আমি এতক্ষণ তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে এবং বুঝিবার চেষ্টা করিলে গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নিজেই বুঝিতে পারিবে। যাহা হউক, বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বোধগম্য করিবার জন্য আমি আরও কিছু বলিতেছি। শাস্ত্র বলেন—'গু' অন্ধকার এবং "রু" আলোকের বাচক। যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান, অথবা যিনি অন্ধকার-রাজ্যে আলোকের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া আসেন, তিনি গুরু। যিনি এই সংসারারণ্যের পথ প্রদর্শক, দুস্তর ভবসমুদ্রের কর্ণধার, তিনি গুরু। অসত্য, অজ্ঞান ও মৃত্যুরাজ্য হইতে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় নিত্যধামে প্রবেশ করা একমাত্র তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করে।

গৃণীতে তত্ত্বমাত্মীয়মাত্মীকৃতজগত্রয়ম্।
উপায়োপেয়রূপায় শিবায় গুরবে নমঃ।।

যিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তত্ত্ব-বস্তু দেখাইয়া দেন—আত্মা, অনাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত করেন—যিনি অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিয়া অনন্ত মহাশক্তির বিরাট্ বিশ্বলীলা দেখাইতে দেখাইতে আত্মস্বরূপ দর্শনে স্থিতি লাভ করিবার যোগ্যতা দান করেন, তিনিই গুরু। জীবের যাহা স্বভাব তাহাই তাহার প্রিয়তম। স্বভাবে থাকা, স্বাভাবিক পথে চলা—ইহা হইতেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। জীব স্বভাব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। কেন ও কখন পড়িয়াছে, সে বিচার এখানে তুলিবার

প্রয়োজন নাই। স্বভাবচ্যুত হইয়া সে বিকারগ্রস্ত হইয়াছে—তাই আজ সে আনন্দের অন্বেষণে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু অন্বেষণ করিয়াও প্রকৃত আনন্দের সন্ধান সে পাইতেছে না। যদি পাইত তাহা হইলে তাহাকে আর অন্বেষণ করিতে হইত না, সে চিরদিনের জন্য তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত। কিন্তু এমন হয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, জীব স্বভাবচ্যুত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ যখন হইতে বর্ত্তমান জীবভাবের উন্মেষ হইয়াছে, তখন হইতেই সে নিজের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে। তাই সে কোন জিনিষেরই প্রকৃত রূপ চিনিতে পারে না। প্রতিপদে ভুল করিয়া বসে—এককে আর মনে করে। কিন্তু জলের তৃষ্ণা দুধে মিটিবার নহে। সে দুধ দেখিয়া মনে করে, ইহাতেই তাহার তৃষ্ণা শান্ত হইবে, কিন্তু ইহা যে তৃষ্ণার উপশমকারক সুশীতল জল নহে, তাহা সে বুঝিতে পারে না। সে ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া জলবোধে দুধই গ্রহণ করিতে যায়। কিন্তু পরে বুঝিতে পারে, তাহা হইতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে না। তখন আবার অন্য জিনিষে ঐ প্রকার জল-ভ্রম উৎপন্ন হয়— সে দুধ ছাড়িয়া উহাই গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু ইহারও পরিণাম পূর্ব্বের ন্যায় নৈরাশ্যজনক। ভাগ্যহীন জীব জীবন-ভোর তৃষ্ণকাতরই থাকিয়া যায়, তাহার শান্তি-সলিল কোথাও জোটে না। ভাবিয়া দেখ, সকলেরই এই অবস্থা। কিন্তু এমনটা কেন হয়? ভুল ভাঙ্গে না কেন? ভুলের মূল অবিদ্যা রহিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ অবিদ্যা ছিন্ন না হইবে, ততক্ষণ ভুল ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই, নিত্যই নূতন নূতন ভ্রমের উন্মেষ হইতে থাকিবে। ইহা স্থির সত্য, জানিও। তুমি নিজেকে যতই চতুর মনে কর না কেন, বিশ্ব-চতুরের চাতুরীকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারিবে না। তোমার যাবতীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সেই মহামায়াবীর বিরাট ইন্দ্রজালের অন্তর্গত, জানিও।

জীব যখন স্বভাব হইতে পতিত হইয়াছে, তখনই এই ঘোর-রূপা অবিদ্যা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। অজ্ঞানের প্রভাবে জীব এখন সুপ্তপ্রায়, —আত্মবিস্মৃত। আবার তাহাকে ফিরিয়া নিজের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে— তবে ত সে সুস্থ হইবে। কিন্তু সে ফিরিবে কি প্রকারে? রাজপুত্র আজ কাঙ্গাল হইয়া কাঙ্গালের বেশে দীনভাবে হাহাকার করিতেছে— কে তাহাকে আত্মপরিচয় দান করিয়া তাহার শোকাপনোদন করিবে? সেই জন্য এমন একজন দয়ালু, শক্তিশালী ও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের আবশ্যকতা হয়, যিনি তাহাকে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতে পারেন, তাহাকে আপন স্বভাবে ফিরাইয়া

লইতে সাহায্য করিতে পারেন। যিনি নিজে জাগিয়েছেন, তিনিই নিদ্রিতকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন নিদ্রিত নিদ্রিতকে জাগাইতে পারে না। যিনি জ্ঞানী, সদা জাগ্রৎ, বিভূতিসম্পন্ন ও দয়াময়, তিনিই জ্ঞানের অঞ্জন-শলাকা দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধ জীবের অজ্ঞান-তিমির বিনষ্ট করিয়া তাহার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলন করিয়া দিতে পারেন। অজ্ঞানী তাহা পারে না। সুতরাং, বস্তুতঃ স্বয়ং পরমেশ্বরই গুরু। তাঁহারই কৃপায় জীব তাঁহাকে চিনিতে পারে।

জি—আপনি বলিতেছেন—পরমেশ্বরই গুরু। এ কথার তাৎপর্য্য কি? প্রচলিত ব্যবহারে ত 'গুরু' শব্দে মানুষই বুঝাইয়া থাকে।

ব—'ঈশ্বরই গুরু' এ কথার অর্থ এই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, পাইতে পারে না। তিনি স্বয়ং গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে জীব অনন্তকাল খুঁজিয়াও তাঁহাকে ধরিবার পথ আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

তিনি শুদ্ধচৈতন্যময়—তাঁহার স্বরূপ এক-রস। তাই তিনি অদ্বিতীয় বস্তু, একেলা অসঙ্গ। দ্বিতীয় কোন বস্তু, কোন ভাব কোন শক্তি সেখানে থাকিতে পারে না। যাইতেও পারে না। কে জীবকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে?

তাঁহার স্বরূপ-ভূতা কৃপাশক্তি, তাঁহার ইচ্ছায় নামিয়া আসে। আসিয়া জীবকে ক্রমশঃ তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া লয়, পরে জীবকে শোধিত করিয়া স্বরূপে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। যে স্বচ্ছ আধার অবলম্বনে এই কৃপাশক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাকেই গুরু বলে। সুতরাং একমাত্র পরমেশ্বরই গুরু—নির্ম্মল চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ।

একটু ভাবিয়া দেখলেই বুঝিতে পারিবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে মনুষ্যাদি কেহই গুরু হইতে পারে না।

জি—আপনি বলিতেছেন যে, ভগবানই একমাত্র গুরু। তিনি জ্ঞানশক্তি দ্বারা জীবকে উদ্ধার করেন। জীব তাঁহার কৃপাতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া সেই জ্ঞানের আলোকে সত্যবস্তু যথার্থভাবে দেখিতে পায়।

ব—হাঁ তাই বটে। শুধু যে দেখিতে পায়, তাহা নয়। দেখিয়া চিনিতে পারে—আপন বলিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারে। দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের অবসানে চিরপরিচিত অন্তরঙ্গ বস্তুর প্রাপ্তি হইলে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। যে বুঝাইতে চেষ্টা করে সে তাহা জানে না, যে জানে সে ঐ প্রকার বৃথা চেষ্টা করে না। তাহা

"মুকাস্বাদনবৎ" বোবার রসোপলব্ধির অনুরূপ, অর্থাৎ অবর্ণনীয়।

জি— বেশ কথা। কিন্তু আপনি বলিলেন যে, ভগবানই গুরু, এতৎ-সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, 'ভগবানই গুরু' এই কথা সত্য না 'গুরুই ভগবান্' এই কথা অধিকতর সত্য? এই দুইটি কথার মধ্যে। একটা সূক্ষ্ম ভেদ আছে—তাহাই মনে করিয়া আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব—তুমি এখনও গুরু-তত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পার নাই। 'গুরু ভগবান্' এ কথার কোন অর্থই বুদ্ধিগোচর হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত গুরু শব্দের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হয়। গুরু বলিতে যদি শুদ্ধ-চৈতন্যময় বস্তুটি বুঝ, আর 'ভগবান্' শব্দটিও যদি সেই বস্তুরই বাচক বলিয়া বুঝিতে পার, তাহা হইলে ত কোন প্রশ্নেরই অবকাশ থাকে না। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পার না। ভগবান্ অনন্ত শক্তিময় তাঁহার অনন্তরূপ। তন্মধ্যে তাঁহার অনুগ্রহ শক্তির রূপকেই 'গুরু' বলে। সম্প্রতি ইহাই বুঝিয়া রাখ। অনন্ত চৈতন্যশক্তিকে তাঁহার অনুগ্রহের দিক্‌টা লক্ষ্য করিয়া গুরু বলা হয়। দুঃখ নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমানন্দের বিকাশই অনুগ্রহের স্বরূপ।

যাহা হউক, এসব বাক্য-বিন্যাসের ভেদ-বিলাস মাত্র। তোমার প্রকৃত সংশয় কি, তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

জি—আমার জিজ্ঞাস্য এই—ভগবানের যখন অনন্তরূপ, তখন জীব ও জড়—স্থাবর ও জঙ্গম, সকল পদার্থই তাঁহার রূপ। যদি তাহাই হয়, আর গুরুও যদি তদ্বৎ ভগবানের রূপই হন, তাহা হইলে উভয়ে পার্থক্য কোথায় থাকিল এবং গুরুর প্রাধান্যই বা কোথায় থাকিল?

ব—ভগবান্ যে বিশ্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং যে কোন রূপ প্রতীতি-গোচর হয়, তাহাও তাঁহারই রূপ। তথাপি গুরু ও অন্যান্য রূপে অনেক ভেদ আছে। অবশ্য, বাস্তবিক ভেদ কোথাও নাই। অজ্ঞান শক্তির সত্তা-গত অনন্ত ভেদ অনুসারে জগতে অনন্ত জীবভেদ আবির্ভূত হইয়াছে। জ্ঞানশক্তি শুদ্ধরূপে চৈতন্যরূপা ও অদ্বিতীয়া—তাহাতে স্বগত ভেদ নাই, উপাধির সংমিশ্রণ নাই, গুণাবিকার নাই। অন্ধকার হইতে যেমন আলোক প্রধান, সেই প্রকার অজ্ঞান হইতে জ্ঞান স্বভাবতঃ প্রবল। তাই অজ্ঞান শক্তি অনন্ত বৈচিত্র্যসম্পন্ন হইলেও এবং অনাদি কালের সঙ্ঘাতবশতঃ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হইলেও, জ্ঞানের নিকটে হীনপ্রভ। জ্ঞানের প্রাধান্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ। চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক হইলেও গুরুরূপে তাঁহার যে নির্গুণ প্রকাশ, তাহা গুণাধিকার স্থিত অজ্ঞান-বিকারমূলক কোটী কোটী খণ্ড প্রকাশ অপেক্ষা

অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ।

এই জন্য ভেদ-দৃষ্টতে দেবতা অপেক্ষাও গুরুর স্থান উচ্চে। ‘‘শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।’’ মনুষ্য, পশু, পক্ষী বা অন্যান্য জীব-জন্তুর কথা ত আলোচনাই নহে। গুরুর উপরে কোন্ তত্ত্ব নাই। গুরু তত্ত্বাতীত তত্ত্ব।

জি—আপনার কথাতে আমার অনেক সংশয় দূর হইল। কিন্তু আপনি এ একটা সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিলেন মাত্র। ব্যবহার জগতে এ সিদ্ধান্তের কোনই উপযোগিতা নাই।

ব— কেন নাই? তোমার কি মনে হয়?

জি—পরমেশ্বর গুরু হইতে পারেন—কিন্তু জীবের তাহাতে কি লাভ? জীব ত আর তাঁহাকে পাইতে পারে না। তিনি যাহাই হউন, আপনি তাঁহাকে যতই দয়ালু বা শক্তিধর বলিয়া মনে করুন, জীবের পক্ষে তিনি দুরধিগম্য।

আপনি বলিতেছেন পরমেশ্বরই উপায়, আবার তিনিই উপেয়। অর্থাৎ তাঁহার সাহায্যেই তাঁহার কাছে যাওয়া যায়। তাঁহাকে ধরিতে পারিলে তবে ত তিনি গম্যস্থানে অর্থাৎ স্বভাবে পৌছাইয়া দিবেন। বদ্ধ জীব কি-প্রকারে সেই নির্ম্মল বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

ব— সেই জন্যই ত তিনি নামিয়া আসেন। তিনি নামিয়া আসিয়া জীবের কাছে ধরা দেন, জীবকে আকর্ষণ করেন, তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যান। তিনি যদি না নামিতেন, তাহা হইলে জীব কদাপি তাঁহাকে পাইত না, আত্মোদ্ধারের পথ চিনিতে পারিত না। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে চিনাইয়া দেয়, এই কৃপাই গুরুর শক্তি।

জি—তবে কি গুরু ও অবতার সমান? উভয়ের মধ্যে কি কোন ভেদ-নির্দ্দেশ করা চলে না?

ব—এক হিসাবে দুই-ই সমান বটে। তবে একটু কথা আছে। সাধারণতঃ অবতার বলিতে যাহা বুঝায়, গুরু-তত্ত্ব তাহা হইতে এক প্রকার পৃথক্ হইলেও প্রকারান্তরে অভিন্ন। শুদ্ধ স্বরূপ হইতে শক্তি-প্রবাহক্রমে প্রপঞ্চে নামিয়া আসাই অবতারবাদের মূল কথা। জ্ঞান-শক্তির ধারা নামিয়া আসিলেই সাধারণতঃ ‘গুরু’ শব্দের প্রয়োগ হয়। অবান্তর শক্তির প্রবাহ অবতীর্ণ হইলে ‘অবতার’ শব্দের ব্যবহার হয়। জগতের আপেক্ষিক সাম্য সংরক্ষণই অবতারের উদ্দেশ্য। ইহা সাময়িক ব্যাপার। ইহাকেই ধর্ম্ম-সংস্থাপন বলে। ধর্ম্ম জগতের রক্ষক, যখন প্রতিকূল শক্তির আক্রমণে ধর্ম্ম আচ্ছন্ন হয়, তখন

স্বভাবের প্রেরণাতে মহাশক্তি হইতে তাঁহার অংশ বাহির হইয়া আসিয়া গ্লানিপ্রাপ্ত ধর্ম্মকে উজ্জীবিত করে ও পুনঃস্থাপিত করে, জগতের ঘোরতর বিপ্লব দূরীভূত করে। ইহাই মোটামুটি অবতারবাদ। গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি অনেক প্রকার অবতার আছেন। সে-সব কথা এখানে আলোচ্য নহে। জীবকে স্বভাবে লইয়া যাওয়া অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—অবশ্য গৌণভাবে তাহাও সত্য। কিন্তু গুরুর মুখ্য কার্য্যই পতিত জীবকে উঠাইয়া লওয়া—ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া। জ্ঞান দান করাই গুরুর কার্য্য, তাহাতেই তাঁহার সার্থকতা। প্রধান ও প্রাসঙ্গিক ভাবে সাধারণতঃ অবতারের কার্য্য উহা নহে। তবে অবতারও প্রয়োজন হইলে গুরু-ভাব গ্রহণ করিতে পারেন এবং গুরুরূপে আসিয়াও ইচ্ছা হইলে অবতারের কার্য্য, অর্থাৎ ধর্ম্ম-সংস্থাপন, ন্যূনাধিক পরিমাণে করিতে পারেন। দুই-ই পরমেশ্বরের লীলা। সুতরাং ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।

আর এক কথা। অবতার যে শুধু ভগবানেরই হয়, তাহা নহে। তাঁহার ভক্তগণেরও হইতে পারে—নিত্য-মুক্ত ও সিদ্ধ জীবগণের হইতে পারে। তাঁহার শক্তি অনন্ত— যে কোন শক্তির অবতার হইতে পারে। এমন কি বৃত্তি নামে পরিচিত কাম, ক্রোধাদি শক্তিরও অবতার হইয়া থাকে। কিন্তু গুরু একমাত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না।

জি—যখন ভগবান্ই গুরু, তখন তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র গুরু। সুতরাং গুরু ত অনেক হইতে পারে না। তবে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নাম শাস্ত্রে পাই এবং ব্যবহার-ভূমিতেও গুরুর ভেদ স্বীকার করিয়া থাকি, তাহার হেতু কি?

ব—ভগবানই যে সকলের গুরু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং গুরু-তত্ত্ব এক ভিন্ন অধিক হইতে পারে না। শুধু গুরু তত্ত্ব কেন, কোন তত্ত্বই বহুসংখ্যক হইতে পারে না। তুমি কি মনে কর, জগতে বাস্তবিক পক্ষে দুইটি মাতা বা দুইটি পিতা আছে? পিতা এক ভিন্ন দুই নাই, মাতাও তাই, সখা ও প্রিয়জনও তাই। কিন্তু ইহা শুদ্ধ তত্ত্ব-বস্তু—ইহা আস্বাদন নাই। আস্বাদন বা আত্মপ্রকাশ মূর্ত্তি অথবা রূপ ব্যতিরেকে হয় না। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে, বিভিন্ন আধারে, একই তত্ত্ব বিভিন্ন দ্রষ্টার ভেদ-রঞ্জিত দৃষ্টির সম্মুখে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাতে বস্তু-সত্তার ভেদ হয় না। একই নির্ব্বিশেষে শুক্লবর্ণ যেমন উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীল রক্তাদি নানাপ্রকার বিশিষ্ট বর্ণে প্রকাশিত হয়, ইহাও তদ্রূপ। সৌন্দর্য্য যেমন এক ও অখণ্ড, অথচ আমাদের

অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ।

এই জন্য ভেদ-দৃষ্টতে দেবতা অপেক্ষাও গুরুর স্থান উচ্চে। "শিরে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।" মনুষ্য, পশু, পক্ষী বা অন্যান্য জীব-জন্তুর কথা ত আলোচনাই নহে। গুরুর উপরে কোন্ তত্ত্ব নাই। গুরু তত্ত্বাতীত তত্ত্ব।

জি—আপনার কথাতে আমার অনেক সংশয় দূর হইল। কিন্তু আপনি এ একটা সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিলেন মাত্র। ব্যবহার জগতে এ সিদ্ধান্তের কোনই উপযোগিতা নাই।

ব— কেন নাই? তোমার কি মনে হয়?

জি—পরমেশ্বর গুরু হইতে পারেন—কিন্তু জীবের তাহাতে কি লাভ? জীব ত আর তাঁহাকে পাইতে পারে না। তিনি যাহাই হউন, আপনি তাঁহাকে যতই দয়ালু বা শক্তিধর বলিয়া মনে করুন, জীবের পক্ষে তিনি দুরধিগম্য।

আপনি বলিতেছেন পরমেশ্বরই উপায়, আবার তিনিই উপেয়। অর্থাৎ তাঁহার সাহায্যেই তাঁহার কাছে যাওয়া যায়। তাঁহাকে ধরিতে পারিলে তবে ত তিনি গম্যস্থানে অর্থাৎ স্বভাবে পৌছাইয়া দিবেন। বদ্ধ জীব কি-প্রকারে সেই নির্ম্মল বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

ব— সেই জন্যই ত তিনি নামিয়া আসেন। তিনি নামিয়া আসিয়া জীবের কাছে ধরা দেন, জীবকে আকর্ষণ করেন, তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যান। তিনি যদি না নামিতেন, তাহা হইলে জীব কদাপি তাঁহাকে পাইত না, আত্মোদ্ধারের পথ চিনিতে পারিত না। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে চিনাইয়া দেয়, এই কৃপাই গুরুর শক্তি।

জি—তবে কি গুরু ও অবতার সমান? উভয়ের মধ্যে কি কোন ভেদ-নির্দ্দেশ করা চলে না?

ব—এক হিসাবে দুই-ই সমান বটে। তবে একটু কথা আছে। সাধারণতঃ অবতার বলিতে যাহা বুঝায়, গুরু-তত্ত্ব তাহা হইতে এক প্রকার পৃথক্ হইলেও প্রকারান্তরে অভিন্ন। শুদ্ধ স্বরূপ হইতে শক্তি-প্রবাহক্রমে প্রপঞ্চে নামিয়া আসাই অবতারবাদের মূল কথা। জ্ঞান-শক্তির ধারা নামিয়া আসিলেই সাধারণতঃ 'গুরু' শব্দের প্রয়োগ হয়। অবান্তর শক্তির প্রবাহ অবতীর্ণ হইলে 'অবতার' শব্দের ব্যবহার হয়। জগতের আপেক্ষিক সাম্য সংরক্ষণই অবতারের উদ্দেশ্য। ইহা সাময়িক ব্যাপার। ইহাকেই ধর্ম্ম-সংস্থাপন বলে। ধর্ম্ম জগতের রক্ষক, যখন প্রতিকূল শক্তির আক্রমণে ধর্ম্ম আচ্ছন্ন হয়, তখন

স্বভাবের প্রেরণাতে মহাশক্তি হইতে তাঁহার অংশ বাহির হইয়া আসিয়া গ্লানিপ্রাপ্ত ধর্ম্মকে উজ্জীবিত করে ও পুনঃস্থাপিত করে, জগতের ঘোরতর বিপ্লব দূরীভূত করে। ইহাই মোটামুটি অবতারবাদ। গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি অনেক প্রকার অবতার আছেন। সে-সব কথা এখানে আলোচ্য নহে। জীবকে স্বভাবে লইয়া যাওয়া অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—অবশ্য গৌণভাবে তাহাও সত্য। কিন্তু গুরুর মুখ্য কার্য্যই পতিত জীবকে উঠাইয়া লওয়া—ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া। জ্ঞান দান করাই গুরুর কার্য্য, তাহাতেই তাঁহার সার্থকতা। প্রধান ও প্রাসঙ্গিক ভাবে সাধারণতঃ অবতারের কার্য্য উহা নহে। তবে অবতারও প্রয়োজন হইলে গুরু-ভাব গ্রহণ করিতে পারেন এবং গুরুরূপে আসিয়াও ইচ্ছা হইলে অবতারের কার্য্য, অর্থাৎ ধর্ম্ম-সংস্থাপন, ন্যূনাধিক পরিমাণে করিতে পারেন। দুই-ই পরমেশ্বরের লীলা। সুতরাং ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।

আর এক কথা। অবতার যে শুধু ভগবানেরই হয়, তাহা নহে। তাঁহার ভক্তগণেরও হইতে পারে—নিত্য-মুক্ত ও সিদ্ধ জীবগণের হইতে পারে। তাঁহার শক্তি অনন্ত— যে কোন শক্তির অবতার হইতে পারে। এমন কি বৃত্তি নামে পরিচিত কাম, ক্রোধাদি শক্তিরও অবতার হইয়া থাকে। কিন্তু গুরু একমাত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না।

জি—যখন ভগবান্ই গুরু, তখন তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র গুরু। সুতরাং গুরু ত অনেক হইতে পারে না। তবে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নাম শাস্ত্রে পাই এবং ব্যবহার-ভূমিতেও গুরুর ভেদ স্বীকার করিয়া থাকি, তাহার হেতু কি?

ব—ভগবানই যে সকলের গুরু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং গুরু-তত্ত্ব এক ভিন্ন অধিক হইতে পারে না। শুধু গুরু তত্ত্ব কেন, কোন তত্ত্বই বহুসংখ্যক হইতে পারে না। তুমি কি মনে কর, জগতে বাস্তবিক পক্ষে দুইটি মাতা বা দুইটি পিতা আছে? পিতা এক ভিন্ন দুই নাই, মাতাও তাই, সখা ও প্রিয়জনও তাই। কিন্তু ইহা শুদ্ধ তত্ত্ব-বস্তু—ইহা আস্বাদন নাই। আস্বাদন বা আত্মপ্রকাশ মূর্ত্তি অথবা রূপ ব্যতিরেকে হয় না। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে, বিভিন্ন আধারে, একই তত্ত্ব বিভিন্ন দ্রষ্টার ভেদ-রঞ্জিত দৃষ্টির সম্মুখে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাতে বস্তু-সত্তার ভেদ হয় না। একই নির্ব্বিশেষে শুক্লবর্ণ যেমন উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীল রক্তাদি নানাপ্রকার বিশিষ্ট বর্ণে প্রকাশিত হয়, ইহাও তদ্রূপ। সৌন্দর্য্য যেমন এক ও অখণ্ড, অথচ আমাদের

বাসনাভেদে অনুরঞ্জিত নয়নের সম্মুখে উহা মূর্ত্ত হইয়া খণ্ড রূপের মধ্যে অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্য সহকারে প্রকাশ পায়, গুরুও তেমনই এক ও অদ্বিতীয়। তবে নামরূপের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভেদরাজ্যে তিনি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যে ভিন্ন ভিন্ন গুরুর কথা জানিতে পার, ইহাই তাহার কারণ। রস-তত্ত্ব এক হইলেও যেমন খণ্ড রস বহুসংখ্যক, এমন কি বস্তুতঃ অনন্তও বলা যাইতে পারে, সেই প্রকার গুরু-তত্ত্ব এক হইলেও তাঁহার আবির্ভাব বহু হইতে পারে।

জি—আপনি বলিতেছেন, গুরু-তত্ত্ব এক, কিন্তু তাঁহার বাহ্য প্রকাশ বহু। অবশ্য ইহা উপাধির বহুত্ব-নিবন্ধন। এখানে একটি বিষয়ের জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। এক ব্যতিরেকে কখনও বহুভাবের অভিব্যক্তি মানিতে পারা যায় না। উপাধির বহুত্বও উপাধির ঐক্যমূলক। অর্থাৎ একটি ব্যাপক উপাধিই খণ্ডিত বা খণ্ডিতবৎ হইয়া বহু উপাধির সূচনা করে। মূলে যদি উপাধি না থাকে, তাহা হইলে বহু উপাধি আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং বহুভাগের পূর্ব্বে উপাধির সত্তা-স্বীকার যুক্তিসিদ্ধ। এই যে আদিম উপাধির কথা বলা হইল, ইহাকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্ব-বস্তু রূপ-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ইহা যাবতীয় রূপের সমাহার স্বরূপ পরম-রূপ। ইহাই তত্ত্বাতীত সত্তার প্রথম আবির্ভাব—ইহা এক ও অদ্বিতীয়। বিম্ব ভিন্ন প্রতিবিম্ব হইতে পারে না।

ব—হাঁ, তুমি সত্যই বলিয়াছ। এক হইতেই বহুর উদয় হয়, পুনরায় বহু একের মধ্যেই বিশ্রাম লাভ করে। যাহা অরূপ, তাহা সহসা বহুরূপে পরিণত হয় না। সর্ব্বাগ্রে তাহা একমাত্র রূপ-সামান্যে প্রকাশমান হয়—অবশ্য ইহাও ব্যাপক উপাধির সম্বন্ধ-নিবন্ধন। পরে সেই এক রূপ কাল প্রভাবে বহুরূপে পরিণত হয়। জগতের যাবতীয় বিশিষ্ট রূপ সেই একমাত্র মূল রূপের বিকৃত ছবি। এই যে মূল রূপের কথা বলিলাম, ইহা ভগবানের নিত্য-রূপ। পাঞ্চরাত্রগণ ইহাকে 'নিত্যোদিত' রূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীর নিকট ইহা 'শান্তোদিত'-ভাবে প্রকটিত হয়। সুতরাং ভগবান্ যে একই কালে অরূপ ও রূপবান্, নিরাকার ও সাকার, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অবশ্য, এই রূপের কথা শুনিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক রূপের কথা যেন তুমি মনে করিও না। সাধারণতঃ যোগী বা ভক্তগণও তাঁহার এই পরম-রূপের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে ভগবানের যে-রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরম-রূপ বলিয়াই

তিনি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভ্রান্তি অপনোদন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বহু কথা বলিবার আছে—তাহা সময়ান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ ইহা স্মরণ রাখ যে, গুরু-তত্ত্বও ঐ প্রকার প্রথমে এক মূলরূপে প্রকাশমান হইয়া পরে দেশ ও কালের ক্রম-বৈচিত্র্যবশতঃ উপাধির বিভাগ অবলম্বনে নানা প্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

জি—গুরুর সেই নিত্যরূপ কি সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না? যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিতে গুরুর দর্শন পান, তাঁহারাও কি সেই মূলরূপ দর্শন করিতে পারেন না?

ব—গুরুর সেই নিত্যরূপ সাধারণ লোকে দেখিতে পায় না। যাহা সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সেই পরমরূপ নহে। সংস্কার-রঞ্জিত নেত্রে সকলেই আপন আপন বাসনানুরূপ গুরু দর্শন করিয়া থাকেন। একই গুরু-রূপ অনাদিকাল হইতে সময় অনুসারে সকলের নিকট প্রকাশিত হইতেছে। গুরু অভিন্ন হইলেও সকলে আপন আপন ভাবময় রূপেই তাঁহার দর্শন পাইতেছে —তাঁহার স্বরূপের দর্শন কেহই পাইতেছে না। তবে যিনি ভাবের অঞ্জন মুছিয়া ফেলিয়া গুরুর রূপ দেখিতে পান, তিনি নিশ্চয়ই গুরুর ভাবাতীত ও মহাভাবময় নিত্যরূপই প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু শব্দকোষে এমন কোন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায়। তখন বুঝিতে পারা যায়, জগতের মধ্যে প্রকাশিত অনন্তরূপের মধ্যে ঐ একমাত্র রূপই প্রকাশ পাইতেছে। সে প্রকাশের আবরণ নাই অথচ দ্রষ্টার নয়ন আচ্ছন্ন বলিয়া সেই মুক্তরূপও কেহ দেখিতে পায় না। তাই প্রত্যক্ষ বস্তুর উপরেও—যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একমাত্র অপরোক্ষ বস্তু—তাহার সম্বন্ধেও জগতে সংশয় ও ভ্রান্তির অবসান ঘটে না।

জি— বৌদ্ধগণ, জৈনগণ, খ্রীষ্টানগণ, মুসলমানগণ সকলেরই তাহা হইলে সেই একমাত্র গুরু। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সর্ব্বত্রও তাই।

ব—নিশ্চয়ই তাই। শুধু তাহা কেন? ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিরও যিনি গুরু, কপিল ব্যাস অগস্ত্য বামদেব শুকদেব, প্রভৃতিরও যিনি গুরু, তোমার-আমার গুরুও তিনিই। ধর্ম্মমাত্রেরই প্রবর্ত্তক তিনি —প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি-ধর্ম্ম তাঁহা হইতেই বাহির হইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, যাবতীয় বিদ্যা, কলা, শিল্প—সবই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। জ্ঞান যেমন নানাপ্রকার হইলেও এক, সেই প্রকার জ্ঞানের আধারও মূলতঃ এক।

জি—তাহা, হইলে পরমেশ্বরই আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানাদি বিদ্যা প্রবর্ত্তন করেন? কিন্তু

সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? ইহার অন্যথা কি কোথাও দেখা যায় না?

ব—বস্তুতঃ ইহার অন্যথা কোথাও হয় না। জ্ঞানের আদি প্রবৃত্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে—কারণ, তিনি আদিগুরু। তবে যে মহাপুরুষ আপন স্বচ্ছ আধারে তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া লন, তিনি অবশ্য জগতে তাহা সঞ্চার করিতে পারেন। কেহ তাঁহাকে জ্ঞানদাতা মনে করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ত স্বভাবসিদ্ধ নহে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কপিল ও আসুরির কথা বলা যাইতে পারে। কপিলকে আদি-বিদ্বান্ বলা হইয়া থাকে—তাহা তুমি জান। তিনি একজন সিদ্ধ ছিলেন—পূর্ব্বকল্পে সাধনা সমাপ্ত করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈবল্য তখনও তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। এদিকে প্রলয়কালে জগৎ অব্যাকৃত রূপ ধারণ করিল। প্রলয়ান্তে প্রকৃতির নবীন উন্মেষের সময় তিনিও জ্ঞানময়রূপে সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত হইলেন। তাই তাঁহাকে আদি বিদ্বান্ বলে। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে যাঁহারা যাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সকলেই কপিলের কনিষ্ঠ। কপিল আবির্ভূত হইয়া, অর্থাৎ নির্ম্মাণকায় ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসু আসুরির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। এই জ্ঞান শাস্ত্র সাংখ্যজ্ঞান নামে পরিচিত। কিন্তু মনে রাখিবে, কপিল বর্ত্তমান সৃষ্টির আদি-বিদ্বান্ হইলেও, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবান্ নহেন। সে শুধু একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। সুতরাং পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু।

জি—'নির্ম্মাণকায়' কি? নির্ম্মাণকায় গ্রহণ না করিয়া কি তিনি জ্ঞান দিতে পারিতেন না?

ব—নির্ম্মাণকায়ের বিস্তৃত বিবরণ অন্য সময়ে বলিব—এখানে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে সংক্ষেপে দুই একটি কথা মাত্র এখানে বলিতেছি।

জ্ঞান দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে—এক, শব্দ আশ্রয় করিয়া, দ্বিতীয়, শব্দরহিত ভাবে। প্রথম জ্ঞানকে শাব্দজ্ঞান বলে। যোগ শাস্ত্রে দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানকে প্রাতিভ জ্ঞান বলে। ইহা অনৌপদেশিক জ্ঞান। উপদেশ মাত্রই প্রথম প্রকার জ্ঞানের হেতু, কিন্তু প্রাতিভ জ্ঞান উপদেশ-নিরপেক্ষ। কিন্তু উপদেশের আবশ্যকতা না থাকিলেও গুরু ভিন্ন কোন জ্ঞানেরই উদয় হইতে পারে না। সাধারণতঃ গুরু প্রথমতঃ ঔপদেশিক জ্ঞান দান করেন—কিন্তু শিষ্যের যোগ্যতা অধিক হইলে, যখন শিষ্য বিকল্পময় শব্দরাজ্য অতিক্রম করিয়া উঠে, তখন গুরু হইতেই অনৌপদেশিক জ্ঞানের উদয় হয়।

ঔপদেশিক জ্ঞানদানের জন্য দেহ আবশ্যক হয়। যোগিগণ বিদেহ হইলেও শুদ্ধ উপাদান গ্রহণ পূর্ব্বক সংকল্পমাত্রে দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক প্রয়োজনানুসারে জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারেন। এই দেহকে নির্ম্মাণকায় বলে, নির্ম্মাণচিত্তও বলে। এই অবস্থায় দেহ ও চিত্ত অভিন্ন বলিয়া বস্তুতঃ নির্ম্মাণকায় ও নির্ম্মাণচিত্তে মূলে কোন পার্থক্য নাই। নির্ম্মাণকায় নানা উপায়ে নির্ম্মিত হইতে পারে। তবে যোগিগণের ধ্যানজাত নির্ম্মাণকায়ে কর্ম্মাশয় থাকে না—অন্যান্য কায়ে কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়। তত্ত্ব উপদেশ করিবার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ আধার।

ঋষি-মহর্ষিগণ, সিদ্ধমণ্ডলী—ইঁহারাও নির্ম্মাণকায়ের অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তকে দর্শন দিয়া থাকেন। পাঞ্চভৌতিক দেহে ঠিক ঠিক তত্ত্বোপদেশ হয় না—নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক আছে। তাই নির্ম্মাণকায় আবশ্যকতা হয়। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা জীবদ্দশাতেও অনেক সময়ে বিশুদ্ধ অস্মিতা হইতে নির্ম্মাণকায় আকর্ষণ করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন।

কখনও কখনও অবশ্য দেহের প্রকাশ মোটেই হয় না—অথচ আকাশবাণী রূপে উপদেশ শ্রুত হয়। বহু স্থলে শ্রুতির উৎপত্তি প্রকার ইহাই।

জি—আত্মস্বরূপোপলব্ধি ও দুঃখনিবৃত্তি যে জ্ঞান হইতে হয় তাহা কি শাব্দজ্ঞান, অথবা প্রাতিভজ্ঞান?

ব— যোগিগণ জানেন যে, তারক-জ্ঞান বা বিবেকজ-জ্ঞান হইতেই সংসার নিবৃত্ত হয়, সংশয় ছিন্ন হয়। এই জ্ঞান উপদেশ দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রবৃত্ত হয় না। সেই জন্য ইহাকে অনৌপদেশিক জ্ঞানও বলে—ইহা জীবের হৃদয় হইতে প্রতিভানরূপে স্বভাবতঃই উত্থিত হয়। ইহা অপরোক্ষ অনুভূতি—ইহার কোন উপদেষ্টা নাই। তবে যাঁহারা আগমবিৎ ও শব্দের মূলরহস্যজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে, ইহাও শব্দানুবিদ্ধ। তাঁহারা শব্দের যে সূক্ষ্ম স্তর দেখিতে পান, সেখানে জ্ঞানমাত্রই শব্দানুবিদ্ধ জানিতে পারা যায়।

প্রাতিভ জ্ঞানে ক্রম থাকে না। ইহার দ্বারাই জীব সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে। শাক্যমুনি বোধিলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই প্রাতিভ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার নামান্তর দিব্যচক্ষুঃ। ইহার দ্বারা তিনি—"দদর্শ নিখিলং লোকমাদর্শ ইব নির্ম্মলে"। এই বিশ্বদর্পণ-দৃশ্যমান নগরী-তুল্য—সমগ্র বিশ্ব তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অর্জুন যে ভগবদ্দত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা এক স্থানে অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পন্ন সমগ্র জগৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই বিশ্বরূপ দর্শনও প্রাতিভ জ্ঞানেরই একটা বাহ্য অবস্থা মাত্র।

আত্মদর্শনের পূর্ব্বে এইরূপ জগদ্দর্শনও হইয়া থাকে। যিনি এই চক্ষু দান করেন, তাঁহাকে গুরু বলে।

শব্দজ্ঞান ও প্রাতিভজ্ঞান, উভয় জ্ঞানই গুরু হইতেই হয়। প্রতিভার পরে যে আত্মদর্শন হয় তাহাও গুরু হইতেই হয়। স্বভাবই গুরু, পরমেশ্বরই গুরু—তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কোন জ্ঞানেরই উদয় হয় না।

মনে রাখিও, গুরুর শ্রেষ্ঠ রূপ অব্যক্ত। এই অব্যক্ত অনন্ত স্বরূপ হইতে যে জ্ঞান-প্রাপ্তি হয়, তাহাই জ্ঞানের বিশুদ্ধতম রূপ। তাঁহার স্বপ্রকাশময়, অখণ্ড ও শুদ্ধ ব্যক্তরূপ—যাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বাধারে প্রকাশমান—তাহা হইতে যে জ্ঞান উদিত হয়, তাহাও অতি বিশুদ্ধ জ্ঞান। তবে জীব যতক্ষণ ভাবাতীত না হইতে পারে, ততক্ষণ এই দ্বিবিধ জ্ঞানের স্ফূরণ তাহাতে হয় না। তখন ভগবানেরই কোন বিশিষ্টরূপ অবলম্বনে অথবা কোন দিব্যবাণীরূপে অথবা ভাবরূপে অন্তরাত্মায় যে জ্ঞানের স্ফূরণ হয়, তাহা তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান। ইহাও সাধারণ লোকের ভাগ্যে প্রথমে ঘটে না। যখন স্থূল দেহে ভগবৎসত্তার আবেশ হয়—যখন কোন স্থূলাভিমানী জীবকে, সাধনশুদ্ধ জীবকে, আশ্রয় করিয়া ঐ উপাধির সামর্থ্যানুসারে ভগবৎশক্তির প্রকাশ হয়, তখন ঐ জীব হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই চতুর্থ জ্ঞান। ইহাই প্রথমাবস্থায় মনুষ্যলোকে সম্ভবপর। তবে এ অবস্থার জীবও—ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট জীবও—এ সংসারে বিরল। সাধারণতঃ ইহারাই গুরুপদবাচ্য। কিন্তু মনে রাখিও, মনুষ্যরূপে উপদেশ দান করিলেও প্রকৃত উপদেষ্টা জীব নহে, তাহার অন্তঃস্থ পরমাত্মা। জীব কখনও জীবের উপদেষ্টা হইতে পারে না।

জি—উপনিষৎ বলিয়াছেন—প্রত্যেক দেহেই দুইটি আত্মা আছেন—একটি ভোক্তা জীব, অপরটি ভোগনির্মুক্ত শুদ্ধ দ্রষ্টা বা সাক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা। অন্তরাত্মারূপে প্রতি আধারেই জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্য সখা পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন।

যখন সর্ব্বত্রই পরমাত্মা আছেন, তখন নিজের মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ না করিয়া অন্যের কাছে যাইবার প্রয়োজন কি? তিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে রহিয়াছেন— কোথাও তাঁহার ন্যূনতা বা আধিক্য নাই। সুতরাং "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।"

ব—তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপক হইলেও তাঁহার প্রকাশমানতা, অভিব্যক্তি, সর্ব্বত্র সমান নহে। শুধু সত্তা হইতে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। সৎ হইয়াও যদি অব্যক্ত হয় তবে তাহার দ্বারা কাহারও কোন প্রয়োজন

সিদ্ধ হয় না। এই প্রকার নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সৎকে লৌকিক মানদণ্ডে অসৎ বলিলেও ক্ষতি হয় না। অতএব সৎকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে, তবে তাহার দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে পারিবে। আগুন না আছে এমন কোন স্থান নাই, প্রসুপ্তরূপে অগ্নি সর্বত্র বর্তমান আছে। একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সে অগ্নি হইতে তাপ বা আলো কিছুই পাওয়া যায় না। যিনি তাপ বা আলোকপ্রার্থী, তাঁহাকে উদ্দীপিত অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে— যে কোন কারণে, যে কোন উপায়ে, কোন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে সেখান হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের সংস্পর্শে তাহাকেআপন বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া লইতে হইবে।

জি—কিন্তু যে তাপ বা আলোক চায় না?

ব—তাহার পক্ষে ত কোন শঙ্কাই নাই। কিন্তু জীবের ত সে অবস্থা নহে। সে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকে অন্ধকার দূর করিতে হইবে। যে আলো জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান আছে—তাহা হইতে অন্ধকার দূর হয় না। কারণ, তাহা অন্ধকারেও বর্ত্তমান আছে। তাহার সঙ্গে কিছুরই বিরোধ নাই। অন্ধকার দূর করিতে হইলে অভিব্যক্ত আলোকের আবশ্যকতা। সেই প্রকার সর্ব্বত্র-ব্যাপক বিশুদ্ধ চৈতন্য হইতে জীবের অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। যদিও অন্তরাত্মা বা পরমাত্মরূপে তাহা জীবেও আছে বটে তথাপি তাহা অজ্ঞান-নিবর্ত্তক নহে। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য যে আধারে জ্ঞান বা বিদ্যারূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে, প্রজ্জ্বলিত হইয়া আছে, সেখান হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া অজ্ঞানের নাশ করিতে হইবে। যে আধারে জ্ঞান উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে তাহাকেই গুরু বলে। একটি জ্বলন্ত দীপের সংস্পর্শে যেমন অপর একটি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ ঐ উজ্জ্বল আধারের স্পর্শে যখন বদ্ধ জীবের নিজের আধারেও সুপ্ত অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন নিজের অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠেন। তখন ভিতরেই গুরুকে দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি জীবের নিত্যসহচর, চিরদিনের সখা, যিনি সৃষ্টির প্রবাহকাল হইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্ম ও ভোগের মূক দর্শকরূপে চলিয়া আসিতেছেন, তিনি জীবের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষ হন। তখন বাহিরের গুরুতেই অন্তরের গুরুর দর্শন পাওয়া যায়।

তবে মনে রাখিও, ঐ আধারে যে অগ্নি আলো দিতেছে, এই আধারে সেই অগ্নিরই প্রকাশ। অগ্নি আধার ভেদে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশমান হইলেও অগ্নিরূপে সত্তা এক ভিন্ন দুই নহে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিই গুরু।

জি—সাধারণ জীবের মধ্যে কি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নাই? সুপ্ত অগ্নি ত আছেই—কিন্তু প্রদীপ্ত অগ্নি কি জীবে নাই?

ব—প্রদীপ্ত অগ্নিও আছে। কিন্তু থাকিলে কি হইবে—তাহার সঙ্গে জীবের জ্ঞানতঃ যোগ নাই। সহস্রারে যে আগুন নিত্য প্রকাশমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। কিন্তু বহির্মুখ জীব তাহার সন্ধান রাখে না। জীবকে সেই জন্য অন্তর্মুখ হইয়া নিজের সুপ্ত আগুন জাগাইতে হয়। পরে সেই আগুনের সহায়তায় সহস্রারে জ্যোতির্ম্ময় ধামে গমন করিতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দীক্ষাতত্ত্ব—মন্ত্র ও দেবতা

জিজ্ঞাসু—গুরু যে বস্তুতঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তাহা বুঝিলাম। যে স্বচ্ছ আধারে পরমেশ্বরের স্বরূপ-শক্তি প্রকাশিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাও গুরুপদ-বাচ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, গুরু কি প্রণালীতে শিষ্যের অন্তঃকরণে জ্ঞানশক্তি সঞ্চার করেন।

বক্তা—যাহাকে জ্ঞানশক্তির সঞ্চার বলিতেছে তাহাকে প্রকারান্তরে শিষ্যের হৃদয়স্থিত সুপ্ত জ্ঞানশক্তির উদ্বোধনও বলিতে পার। ইহাকেই গুরু-কৃপা বলে। এই কৃপা-প্রকাশের প্রণালী বা পদ্ধতিকে শাস্ত্রকারগণ দীক্ষা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দীক্ষা ভিন্ন জীবের পশুত্ব ঘুচে না—পাপক্ষয় হয় না,—বিশুদ্ধ অবস্থার উপলব্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহার দীক্ষা হয় নাই, তাহার দেহ অশুদ্ধ। অশুদ্ধ দেহে দেবার্চ্চনা প্রভৃতিতে অধিকার নাই। অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে জীবের সদ্গতি লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। শাস্ত্রে বহুপ্রকার দীক্ষার বর্ণনা থাকিলেও দীক্ষা-ব্যাপার সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন।

জি—দীক্ষা না হইলে ইষ্ট দেবতা বা ভগবানের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না কেন? হৃদয়ে যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে দীক্ষা না হইলেই বা ক্ষতি কি? নৈতিক উৎকর্ষ, ব্যাকুলতা এবং সরল বিশ্বাস থাকিলে, ভগবৎ-কৃপালাভে বঞ্চিত হওয়ার কোন কারণ আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে দীক্ষানুষ্ঠান একটি কৌলিকপ্রথা বা আচার ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

ব—সকল গভীর জিনিষই কালক্রমে গভীরতা হারাইয়া প্রথামাত্রে পরিণত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া উহার মূল তত্ত্ব নষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র পরমেশ্বরই জগতের আদিগুরু। তাঁহা হইতে নানাদিকে নানারূপ জ্ঞান-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। যে কোন ধারায় তাঁহার কোন বিশিষ্ট শক্তি প্রকটিত হইয়াছে, সেই ধারায় নিরবচ্ছিন্নরূপে চৈতন্যের প্রকাশ থাকে। গুরুর শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়, শিষ্যের শক্তি তাহার শিষ্যে—এই প্রকার একটি একটি করিয়া প্রতি আধারে ক্রমশঃ শক্তির ধারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই গুরু-শিষ্য-পরম্পরাকেই শাস্ত্রে সম্প্রদায় বলা হইয়াছে। গুরু দীক্ষাদ্বারা শিষ্যের

এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেন। তখন সম্প্রদায়ক্রমে যে শক্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, উহা শিষ্যের হৃদয়েও অভিব্যক্ত হয়। এইজন্যই সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র অথবা ক্রিয়া সবই বিফল। দীক্ষার ফলে জীব শুধু যে পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষ লাভ করে, তাহা নহে, ঐ শক্তির প্রকাশ যে কোন আধারে আছে, তাহার সঙ্গেও যোগ-যুক্ত হইয়া যায়।

জি—দীক্ষা বস্তুতঃ একবার হয় কি বহুবার হয়?

ব—প্রকৃত দীক্ষা একবার ভিন্ন বহুবার হয় না, কিন্তু না হইলেও স্তরে স্তরে নব নব রূপে শক্তির উন্মেষ হওয়ার দরুণ বহুবার দীক্ষা হয় বলিলেও দোষ হয় না। ইহাকেই ক্রমদীক্ষা বলে। কিন্তু দীক্ষার যাহা মুখ্য লক্ষণ, তাহা সকলের অন্তিম স্তরেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞানশক্তি একবার ভিন্ন দুইবার অভিব্যক্ত হয় না। সুতরাং দীক্ষাও বার বার লইবার প্রয়োজন হয় না। তবে মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ মানুষের যে প্রকার মানসিক অবস্থা, তাহাতে প্রথম অবস্থাতেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার সম্ভবপর নহে। এইজন্য কর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হয়। শিষ্য গুরুপদিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করে। জ্ঞানের পূর্ণতা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের কৃপা-দৃষ্টি সাপেক্ষ। ইহা হইলেই পূর্ণাভিষেক সম্পন্ন হয়, জীব পাশমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করে। ইহাই প্রকৃত দীক্ষা। ইহার অব্যবহিত পরেই মুক্তি হয়। বলা বাহুল্য, এই দীক্ষা সকলেই জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরের নিকটই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জি—চরম দীক্ষার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিব না। কারণ, তাহা স্বয়ং পরমেশ্বর মুক্তিদানের পূর্ব্বে প্রত্যেক জীবকে দিয়া থাকেন। কিন্তু যে দীক্ষাতে প্রধানতঃ কর্ম্মেরই উপদেশ থাকে এবং যাহার গুরু পরমেশ্বরভাবাপন্ন জীব, সে-সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

ব— তোমার যাহা প্রশ্ন আছে তাহা নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

জি—দীক্ষা-প্রসঙ্গে মন্ত্র ও দেবতা বিচারের সার্থকতা কি? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মন্ত্রের আবশ্যকতা কি? দেবতার সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ কি? শিষ্যের অধিকার নির্ণয়ের প্রয়োজনই বা কি? এই প্রকার বহু প্রশ্নই দীক্ষা-তত্ত্বের আলোচনাকালে মনোমধ্যে উদিত হয়।

ব—বৎস, দীক্ষার স্বরূপ এক হইলেও আধার-ভেদে দীক্ষার প্রকারভেদ হইয়া থাকে। তদ্রূপ ইষ্ট-দেবতা ও মন্ত্র পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন হইলেও সাধকের সাধন-ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাহাতে ভেদ আরোপিত হয়।

জি—ইষ্ট-দেবতা ও মন্ত্র-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে দীক্ষা সম্বন্ধে আমি আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করি।

আমার প্রশ্ন এই—দীক্ষা যখন শক্তি-সঞ্চার-মূলক এবং শক্তি যখন বস্তুতঃ অভিন্ন, তখন মন্ত্র ও দেবতাদির বিচারের আবশ্যকতাই বা কি? আর সে বিচার কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাও জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হইতেছে।

ব—বৎস, সকল মনুষ্য সমান অধিকার-সম্পন্ন নহে বলিয়াই এই বিচারের ব্যবস্থা। যদি সকলেরই অধিকার এক প্রকার হইত, তাহা হইলে অবশ্য বিচারের আবশ্যকতা হইত না। দেখ, যিনি সুচিকিৎসক, তিনি রোগ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে রোগের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন। তারপর সেই বিশিষ্ট রোগ অনুসারে বিশিষ্ট ঔষধের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রোগের সামান্য লক্ষণ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রোগের বিশেষ লক্ষণ না জানা থাকিলে কোন্ ঔষধ কোন্ রোগীর পক্ষে উপযোগী, তাহার নিরূপণ হইতে পারে না। সেই প্রকার বিচারশীল আচার্য্য মনুষ্যের অধিকার ও যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তদনুসারে তাহার সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই অধিকার বিচার ঠিক ঠিক ভাবে হয় না বলিয়াই আজকাল অনেকস্থলে সাধনার প্রত্যক্ষ ফল অনুভবগম্য হয় না। যদি রোগ-নির্ণয় সত্য হয়, ঔষধ-নির্ব্বাচন সত্য হয়, ঔষধের ব্যবহার নিয়মিত হয় এবং কোন প্রকারে প্রতিকূল আচারের দ্বারা রোগীর স্বাস্থ্য-মর্য্যাদার লঙ্ঘন না ঘটে, তাহা হইলে ঔষধের ক্রিয়া প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনা-ক্ষেত্রেও ঠিক এই প্রকার হইয়া থাকে। যদি সাধকের চিত্তস্থ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের সাধন-সংস্কার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া তাহার অধিকার নিরূপণ করা যায়, যদি সে সেই অধিকার অনুরূপ শক্তির উদ্বোধন ও সাধনক্রম প্রাপ্ত হয়, যদি সে ঐ নির্দ্দিষ্ট পথে যথাবিধি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা সংযম এবং উৎসাহের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধনায় তৎপর থাকে, এবং যদি সে শাস্ত্রবিগর্হিত অসদাচারের প্রশ্রয় দান না করে—তাহা হইলে সাধনার ফল প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে অভ্যাস ও নিয়মানুবর্তিতা সাধকের কর্ত্তব্য এবং অধিকার-নির্ব্বাচন এবং তদনুসারে সাধনার মার্গ-নির্দ্দেশ গুরুর কর্ত্তব্য। তুমি যে দীক্ষা-সংক্রান্ত বিচারের কথা উত্থাপন করিয়াছ, তাহা গুরুর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। এই বিচার কিরূপ, তাহা সংক্ষেপে তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস শুধু এক জীবনেই আবদ্ধ নহে। তুমি আজ যে অবস্থায় আছ, তাহা যেমন তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের জ্ঞান ও কর্ম্মের

বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, তোমার বর্ত্তমান জন্মও সেই প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের ফল-স্বরূপ। কর্ম্ম-সংস্কার হইতেই দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে,— দেহ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সংস্কার স্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায়। একটি বৃক্ষ যেমন সূক্ষ্মভাবে বীজের মধ্যে নিহিত থাকে, এবং ঐ বীজ বিশ্লেষণ করিলেই ভবিষ্যৎ বৃক্ষের সমগ্র ইতিহাস জানিতে পারা যায়, সেই প্রকার গর্ভাধানকালে পিতার বীর্য্য ও মাতার রজঃ সংযুক্ত হইয়া যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ দেহের বিকাশ হয়—ঐ দেহাশ্রিত জীবের ইতিহাস ঐ বীজকে বিশ্লেষণ করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে যে নাদ, বিন্দু ও বীজের রহস্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে স্বরূপতঃ এই পিতৃভাব, মাতৃভাব ও উভয়ের সংঘটজনিত সন্তান-ভাবের ব্যাপার মাত্র। সৃষ্টির মূল-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে এই সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়া ইহা আয়ত্ত করিতে পারিবে। ঐ বীজে যেমন অনাগত অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনিই অতীত অবস্থারও সন্ধান পাওয়া যায়। যোগী ও বিজ্ঞানবিৎ দেহের বীজ প্রত্যক্ষ করিয়া উহা হইতে একদিকে পিতা ও মাতার সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং অপর দিকে উৎপন্ন জীবের পূর্ব্বজন্মের পরিচয় প্রাপ্ত হন। মনুষ্যের চিত্তে যে সকল সাধন-সংস্কার নিহিত আছে তাহার সম্যক্ নিদর্শন এই বীজাবস্থাতেই দৃষ্টিগোচর হয়। গুরুর প্রথম কর্ত্তব্য, এই সাধন-সংস্কারের পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহার অনুকূল ভাবে সাধকের গতি নির্দ্দেশ করা। মনে কর, একজন লোক কোন জন্মে গোপাল-মন্ত্রের উপাসনা করিয়া কতকটা অগ্রসর হইয়া পরলোক গমন করিল। বলা বাহুল্য, উপাসনা হইতে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই লোকটির দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। এই ক্ষেত্রে যদি পরবর্ত্তী মনুষ্য-জন্মে ঐ লোকটির সাধন-পথ নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যকতা হয়, তবে গুরুর কর্ত্তব্য ঐ পূর্ব্বসংস্কার অবগত হইয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মের সাধনপথে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইবার শক্তি দান করা। কর্ম্মফল কখনই নষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত সাধন-সংস্কারকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে, বর্ত্তমান জন্মে উহার অনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। নতুবা উহা বিনষ্ট না হইলেও নিষ্ক্রিয়ভাবে চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, —উহা নিষ্ফল না হইলেও কার্য্যতঃ এক প্রকার নিষ্ফল। যিনি যোগী ও সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাকে এই পূর্ব্ব সংস্কার প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ সাধনার উপদেশের দ্বারা উহারই ক্রমিক পুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মের যদি তোমার গোপাল উপাসনা চারি আনা মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমান জন্মে যদি

তুমি ঐ পথে চালিত হইতে পার, তাহা হইলে চারি আনা সাধনা করিয়াই আট আনার ফল লাভ করিতে পারিবে। কেন না, সাদৃশ্য বশতঃ পূর্ব্বজন্মের সাধন-সংস্কার বর্ত্তমান জন্মের সাধনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া উহার পোষণ করিয়া থাকে।

এই প্রকারে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে দেহত্যাগ হইলেও পূর্ব্ব পথের সঙ্গে যোগ ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া ক্রমশঃই সাধনার বিকাশ হইতে থাকে। এই বিকাশেরও একটি মাত্রা আছে— সেই মাত্রা পূর্ণ হইলে সাধনা বা উপাসনা রূপ কর্ম্ম সম্যক্ জ্ঞানে পরিণত হয়। যিনি গোপাল-উপাসনায় অভ্যাস দ্বারা প্রতিজন্মেই কিছু কিছু নূতন সংস্কার আধান করিতে পারেন, তাঁহার গোপাল-সাধনা উত্তরোত্তর উপচয় প্রাপ্ত হইয়া একদিন সিদ্ধি বা জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবে। তোমরা অনেক সময় শুনিতে পাও যে কোন কোন সাধক অল্প পরিশ্রম করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ইহা অসম্ভব কথা নহে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ না হইলে কেহই সিদ্ধি বা জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। তবে যে বর্ত্তমান জন্মে অল্প পরিশ্রমেও কাহারও সিদ্ধিলাভের কথা শুনা যায়, তাহার কারণ, তাহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনার সংস্কারের মাত্রা খুব অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকাতে বর্ত্তমান জন্মে সাধনার আবশ্যকতা খুব বেশী হয় না। ঠিক পথে অল্প পরিমাণ পরিশ্রম করিতেই ঐ সকল পূর্ব্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মজনিত সংস্কারের সহিত মিলিত হয় ও জ্ঞানের বিকাশ করে। স্থূলদর্শী ব্যক্তি এই প্রকার অল্প পরিশ্রমে অধিক ফল দেখিতে পাইয়া ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অমূলক দোষের উদ্ভাবন করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে, সাধনের উপদেশ-দাতার দায়িত্ব কত অধিক। পূর্ব্ব সংস্কারের বিচার না করিয়া উপদেশ দিল তাহা অধিকাংশ স্থলেই নিষ্ফল হইয়া থাকে। এইজন্যই প্রকৃত যোগী ভিন্ন কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। এই যে বিচারের কথা বলিলাম, ইহা অন্ততঃ তিন জন্মের সংস্কার লইয়া করিলে ভাল হয়, কারণ তাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে অধিক পরিমাণে অনুকূল সংস্কারের সমষ্টি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। জাতকের প্রকৃতি বিচার করিয়া তাহার অনুরূপ মন্ত্র ও দেবতার ব্যবস্থা যে তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়, তাহারও তাৎপর্য্য ইহাই। কিন্তু যোগদৃষ্টি না থাকিলে শুধু গ্রন্থোক্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া অভ্রান্তভাবে মানব-প্রকৃতির বিচার করা চলে না। জ্যোতিষশাস্ত্রে যেমন গণনার সাঙ্কেতিক প্রণালী আছে, তন্ত্র-শাস্ত্রেও সেই প্রকার আছে। কিন্তু শাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব অবগত না হইলে এবং নিজের

দৃষ্টিশক্তি সাধনা দ্বারা নির্ম্মল করিতে না পারিলে গণনা কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না। উপাদানগত সাদৃশ্য বিচার করিয়া যেমন পতি ও পত্নীর পরস্পর সম্বন্ধের ব্যবস্থা করিতে হয়, তেমনই উপাদান-সাদৃশ্যের উপরেই মন্ত্র ও দেবতার নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত। যাহার যে প্রকার স্বভাব, তাহার উপাস্যও সেই প্রকার। কিন্তু কোন ব্যক্তির স্বভাবের পরিচয় একমাত্র যোগ-দৃষ্টিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব দীক্ষা দান করিতে হইলে যোগের দ্বারা প্রকৃতি ও সংস্কারের বিচার অত্যাবশ্যক।

জি—আচ্ছা, বিচারের আবশ্যকতা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু দেবতা-নিরূপণ হইলেই ত সাধকের উপাসনাকার্য্য চলিতে পারে—মন্ত্র-বিচারের আবশ্যকতা কি? মন্ত্রের সহিত দেবতার সম্বন্ধই বা কি?

ব— দেবতার নিরূপণ হইলে মন্ত্র-বিচারের বাকী কি থাকিল? মন্ত্র ও দেবতায় কোন পার্থক্য নাই, দেবতার স্বাভাবিক নামকেই—অর্থাৎ যে নাম ধরিয়া ডাকিলে দেবতার আবির্ভাব বা অন্য প্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাকেই মন্ত্র বলে। নাম না জানা থাকিলে অনন্ত সত্তার গর্ভ হইতে নিজের ইষ্ট-মুক্তিকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। নামের সহিত রূপের নিত্য সম্বন্ধ। নামকে আশ্রয় করিলে রূপের প্রকাশ আপনিই হইয়া থাকে। দেবতা বাচ্য, মন্ত্র তাহার বাচক—উভয়ের মধ্যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ।

জি—দীক্ষার সময়ে গুরু মন্ত্রই দিয়া থাকেন, তিনি ত ইষ্ট দেবতার রূপ দেখাইয়া দেন না। তবে কি ইষ্ট-মূর্ত্তি ধ্যানানুসারে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া লইতে হইবে?

ব—বৎস, গুরু মন্ত্রই দেন বটে, কিন্তু মন্ত্র ত অক্ষরসমষ্টি মাত্র নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে উহা হইতে বিবেকশীল বিচারবান্ জীবের পক্ষে কোনই সুফলের আশা ছিল না। বস্তুতঃ মন্ত্র চৈতন্যস্বরূপ—চিৎশক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ। উহা শব্দের আশ্রয়ে প্রকটিত হইলেও স্বরূপতঃ জড় পদার্থ নহে। মন্ত্র যে কত বড় প্রবল শক্তি, তাহা যথাবিধি মন্ত্রের কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

গুরু যখন শিষ্যের কর্ণমূলে মন্ত্র দান করেন, তখন বাস্তবিক পক্ষে শব্দবাহী জ্ঞান বা চৈতন্য-শক্তিরই সঞ্চার করিয়া থাকেন—ইহাই দেবতার স্বরূপ। সদ্‌গুরুর প্রদত্ত মন্ত্র শব্দ-মাত্র নহে, উহা চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি বা দেবতার আত্মপ্রকাশ। তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যক্ষ-অনুভূতির সমকালে শিষ্য-হৃদয়ে সংক্রমণ করেন, সেই জন্য এই চেতন মন্ত্র বা সিদ্ধ মন্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই শিষ্যের অন্তঃকরণে দিব্য চৈতন্য-মূর্ত্তির

আবির্ভাব হইয়া থাকে। স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হইলে কল্পনার সাহায্য লইতে হয় না। ধ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া তদনুসারে মনোময়ী মূর্ত্তি গঠন করা কল্পনার খেলা, ইহা প্রকৃত উপাসনার অঙ্গ নহে। মন্ত্র ও দেবতা যখন অভিন্ন, শুধু প্রকাশকালের তারতম্য বশতঃ ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, তখন মন্ত্রের সহিত সাধকের মনের সংঘর্ষ হইতে দেবতার মূর্ত্তি আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠে, তজ্জন্য ভাবনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। মন্ত্র-চৈতন্য না হইলে শুধু শব্দ হইতে এই প্রকারে জ্ঞানের বিকাশ সহজসাধ্য নহে। নবীন সাধকের পক্ষে মন্ত্রকে চেতন করিয়া লইয়া তাহার আরাধনা করা অতি কঠিন। এইজন্য গুরুই বিচারপূর্ব্বক মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া উহাকে প্রত্যক্ষ বা সিদ্ধ করিয়া—অর্থাৎ উহার চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক—শিষ্যকে প্রদান করেন। সুতরাং যিনি নিজে অসিদ্ধ বা অজ্ঞানী, তিনি গুরু নামের অধিকারী নহেন।

জি—মন্ত্র বলিতে কি আপনি নামকে লক্ষ্য করিতেছেন অথবা বীজকে লক্ষ্য করিতেছেন? বীজ ত নিরর্থক অক্ষর-সমষ্টি মাত্র।

ব—বৎস, আমি প্রধানতঃ বীজকেই লক্ষ্য করিতেছি—বীজই মূলমন্ত্র। শাখা পল্লব পুষ্প ফল সবই সুন্দর বটে, কিন্তু বীজ না হইলে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না এবং এই সকল সুন্দর বস্তু আপন সত্তা লাভ করিতে পারে না। দেবতত্ত্বের বিচারেও বীজের স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বীজের মহত্ত্ব ও শক্তি অচিন্ত্য, অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীজমন্ত্র-প্রভাবেই দেব-দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জাগতিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা আমি একটি একটি করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতে পারি। বীজ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন —ইহার সহিত অন্য কিছুর তুলনা হয় না। বীজের অর্থ নাই, কে বলিল? ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার অর্থ নিরূপণে অপারগ, ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যায়, ইহা হইতে প্রগল্‌ভতা আর কি হইতে পারে?

জি—প্রণবের সঙ্গে বীজের সম্বন্ধ কি? বীজ ভিন্ন প্রণব কিংবা প্রণব ভিন্ন বীজের সাধনা চলিতে পারে কি?

ব—বৎস, এ সকল অত্যন্ত গুহ্য বিষয়। তবে তোমার আগ্রহ-নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি। প্রণবের সঙ্গে বীজের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। প্রণব বীজের পুট স্বরূপ—বীজ শক্তি, প্রণব উহার ব্রহ্মরূপী সেতু। তুষ ভিন্ন শুধু তণ্ডুল কিংবা তণ্ডুল ব্যতিরেকে শুধু তুষ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্বৎ বীজ ভিন্ন প্রণব কিংবা প্রণব ভিন্ন কেবলমাত্র বীজ ফল উৎপাদন করে না।

উভয়ের সম্বন্ধ আবশ্যক। তবে বীজের মধ্যে প্রণবের উপাদান অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে প্রণবকে গ্রহণ না করিলেও যথাসময়ে উহা আপনিই ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। কিন্তু শুধু প্রণব নিষ্ফল।

তবে পূর্ব্বে বীজ সংগৃহীত থাকিলে প্রণব তাহার বিকাশ সাহায্য করিতে পারে। আলোক, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও যেমন বীজ ভিন্ন বৃক্ষ হইতে পারে না, সেই প্রকার বীজ না থাকিলে কেবল প্রণব হইতে পরমামৃতের আস্বাদন পাওয়া যায় না। প্রণবের কার্য্য প্রস্ফুটিত করা, প্রকাশিত করা, অব্যক্ত সত্তাকে অভিব্যক্ত করা—কিন্তু যাহাকে ফুটাইতে হইবে বা প্রকাশিত করিতে হইবে, তাহা ত চাই। তাহাই সত্ত্ব বা শক্তি —যাহা বীজ-মন্ত্রের বাচ্যার্থ। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বোপহিত চৈতন্যই দেবতার তত্ত্ব।

জি—বাবা, প্রণবের অধিকার কি সকলেরই আছে?

ব—না। স্ত্রীদেহ ও শূদ্রাদিদেহ সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রণবসাধনার যোগ্য নহে। কেন যোগ্য নহে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায়। দীর্ঘকালের সংঘর্ষের ফলে ব্রাহ্মণাদির দেহ প্রণবের তেজে স্বভাবতঃই তেজোময় তাই প্রণব গ্রহণের অধিকারী। যে অবস্থালাভ শূদ্রাদির পক্ষে প্রণবে অধিকার না থাকিবার দরুণ বহুকালের প্রযত্নসাধ্য, তাহা প্রণবের সাহায্যে ব্রাহ্মণাদি শীঘ্রই লাভ করিতে পারেন। শূদ্র প্রণবাদি মন্ত্রের ধারণা করিতে পারে না—যিনি শূদ্রকে প্রণব দিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি বস্তুতঃ তাহার অপকারই করিয়া থাকেন। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেও তাহাই। স্ত্রীদেহের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, অতি উচ্চ ব্রাহ্মণ কূল-সম্ভূত হইলেও উহা প্রণব-গ্রহণের যোগ্য নহে। স্ত্রীদেহে গর্ভধারণ হওয়ার জন্য কুণ্ডলিনীশক্তির অবস্থিতি একটু স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। তবে মনে রাখিও যে, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সাধন সংস্কার বর্ত্তমান থাকিলে যথাসময়ে ভিতর হইতেই প্রণব জাগিয়া উঠে—বীজমন্ত্র আপনা আপনিই প্রণবের দ্বারা পুটিত হইয়া যায়। অবশ্য ইহা অতি বিরলাবস্থা—কিন্তু অসম্ভব নহে। মতঙ্গ প্রভৃতি ঋষি এবং মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী রমণীর দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতে পার। বীজ হইতে প্রণবের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং প্রণব না দিয়া ক্ষেত্র-বিশেষে কেবল বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধারণাবস্থায় কেবল প্রণবের দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। উহা হইতে পূর্ব্ব-বর্ণিত নির্ব্বাণ বা সত্তাবোধের লোপ হইবার সম্ভাবনা।

জি—প্রণব বা অন্যান্য মন্ত্র কি প্রত্যক্ষ করা যায়?

ব—যায় বই কি? নাভি হইতে প্রণব প্রভৃতি সকল মন্ত্রই উদিত হয় —মূলধার

হইতেও বলিতে পার। কুণ্ডলিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হইলেই একটি নাদময়ী শক্তির ধারা সুষুম্না-পথে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকে। তখন সহস্রার হইতে অপর একটি ধারা প্রবাহিত হইয়া অধোমার্গে আসিতে থাকে। আজ্ঞাচক্রে বিন্দুস্থানে ঐ দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহ সম্মিলিত হইয়া একটি সুস্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ও কমনীয় জ্যোতিষ আকারে প্রকাশিত হয়। উহা বহিরাকাশে প্রতিফলিত হইলেই নেত্রের সম্মুখে বাহ্যভাবে প্রত্যক্ষ হয়। যে যোগী নাভি-ধৌতি ও কিরাত-ধৌতিতে অভ্যস্ত, তাঁহার নাভিকুণ্ড হইতে ধৌতকালে একটি জ্যোতিঃ-প্রবাহ স্তম্ভাকারে বহির্গত হইয়া বক্রভাবে স্বতঃই শিরোদেশে গমন করে ও দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাহির হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক ধনুর আকার দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রশক্তি তীব্রভাবে বাহ্যাকাশে প্রকাশিত হইলে সমীপস্থ দুর্ব্বল দর্শকের পক্ষে উহাতে জ্ঞান হারাইবার সম্ভাবনা। বৎস, যাহা কিছু অন্তরাকাশে অথবা দহর-কমলে প্রকাশিত হয়, তাহাকে বাহিরে আনিয়া ইন্দ্রিয়গোচরভাবে নিজে দর্শন অথবা অপরকে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তবে এ সকল অতি গুহ্য তত্ত্ব অনধিকারীকে দেখান উচিত নহে।

জি—আমরা যে হৃদয়-কমল, নাভি-কমল প্রভৃতির বর্ণনা শাস্ত্র-মুখে শুনিতে পাই, তাহা কল্পনা নহে—প্রত্যক্ষ সত্য। আপনি আমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যেদিন নাভি-কমল প্রত্যক্ষ দেখাইয়া কুণ্ডলিনী ও ষট্‌চক্রের তত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই আমার এ ধারণা দৃঢ়মূল হইয়াছে। এখনও আমার মানস-নয়নে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছে।

ব—বৎস, তোমাকে মৃণাল সহকারে প্রস্ফুটিত নাভিপদ্ম নাভি-মার্গে বাহির করিয়া দেখাইয়াছিলাম। প্রয়োজন হইলে হৃদ্‌পদ্মও আর একদিন বাহির করিয়া দেখাইয়া দিব। নাভি-কমলের বর্ণ যেমন বাল-সূর্য্যের ন্যায় রক্তিমাভাযুক্ত, হৃদয়-কমল সে প্রকার নহে। প্রত্যেকটি কমলই বাহির করা যায়। এ-সব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। আজকাল দুই পাতা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পুস্তক পাঠ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং ঈশ্বরকল্প ঋষিগণের বাক্যেও আমরা শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছি—ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর পাশ্চাত্য শিক্ষারই বা-দোষ কি? দেশে কর্ম্মী ও তত্ত্বদর্শীর অভাব হইয়াছে—সাধন-জগতের কোনও নিগূঢ় ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যদি সে ক্ষমতা কাহারও থাকিত, যদি ধর্ম্মের নামে কপটতা ও প্রবঞ্চনা এতটা প্রসার লাভ না করিত, তাহা হইলে লোকের মনে

এ প্রকার গভীর অবিশ্বাস উৎপন্ন হইত না। তুমি যে বিষয়ে উপদেশ দান করিবে, যদি তাহা তুমি নিজে কখনও উপলব্ধি না করিয়া থাক, এবং অন্যকে প্রত্যক্ষ দেখাইবার ক্ষমতাও তোমার না থাকে, তাহা হইলে তোমার উপদেশের মূল্য কি? বলিতে পার—তুমি ঋষিবাক্যের অনুসরণ করিয়া উপদেশ দিতেছ। সত্য কথা, কিন্তু তুমি যে ঋষি-বাক্য ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? যাহা হউক, তবুও ইহা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তবে যদি তুমি স্বয়ং ঐ বাক্যের অর্থ নিজে অনুভব করিয়া উহা প্রয়োগ করিতে, তাহা হইলে অবশ্য উহার শক্তি বৃদ্ধি হইত।

জি—ঐ যে জ্যোতির কথা বলিলেন, উহা কি মন্ত্রেরই প্রকাশ?

ব—নিশ্চয়ই। মন্ত্রই ক্রিয়া-কৌশলে জ্যোতীরূপে ফুটিয়া উঠে—ইহা দিব্য জ্যোতিঃ। দীর্ঘ সময় অভ্যাস করিলে জ্যোতির মধ্যে রূপ অথবা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—বস্তুতঃ যাহা জ্যোতিঃ বলিয়া মনে হয়, তাহা ঐ রূপেরই অঙ্গপ্রভা মাত্র, অথবা জ্যোতিই ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হয়। বাষ্প ও বরফে যেমন ভেদ নাই, জ্যোতিঃ ও রূপেও তেমনই ভেদ নাই—দুই-ই এক বস্তু। ব্যবধান কালে যাহা জ্যোতিঃ, ব্যবধানান্তে নৈকট্য হইলে তাহাই মূর্ত্তি— এক চৈতন্যময়ী সত্তাই উভয়ভাবে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিকে নিরাকার তত্ত্ব মনে করিতে পার এবং মূর্ত্তিকে সাকার বলিয়া ধরিয়া লইতে পার—কিন্তু মনে রাখিও, সাকার ও নিরাকার পৃথক্ বস্তু নহে। যেখানে আকার আছে, সেখানেই নিরাকারও আছে— সেই জন্যই ত আকার অবলম্বন করিয়াও নিরাকারের উপলব্ধি হইতে পারে, আকারের মধ্যে আবদ্ধ হইবার আশঙ্কা নাই। আর যাহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতেও অনন্ত প্রকারের আকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। সকল আকার সমসূত্রে অবস্থান করিলে কোন আকারেরই অভিব্যক্তি হয় না— সেই সাম্যাবস্থাকেই নিরাকার বলে। তাহা অনন্ত আকারের সমন্বয় ভিন্ন অপর কিছু নহে। যাঁহার আকারের নির্ণয় নাই, ইয়ত্তা নাই, পরিচ্ছন্নতা নাই, তিনিই নিরাকার। সুতরাং দেবতাকে নিরাকার জ্যোতিঃ বা চৈতন্যস্বরূপ বলিলেও কোন দোষ নাই অথবা জ্যোতির্ম্ময় আকার বিশিষ্ট বলিলেও কোন দোষ নাই। সাধক বা ভক্তের ইচ্ছানুসারে আকারের স্ফূরণ হয়। নিরাকার যখন অনন্ত আকারের সাম্যাবস্থা, কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে যখন তাহা সীমাবদ্ধ নহে, তখন উপাসকের আকাঙ্ক্ষানুসারে উহা হইতে যে কোন আকারের অভিব্যক্তি না হইবে কেন? মন্ত্র হইতেই জ্যোতিঃ ও রূপের বিকাশ হয়, মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ—বাচ্য ও বাচকে বাস্তবিক পার্থক্য কিছুই নাই।

জি—সত্যই কি দেবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে? অনেকে দেব দর্শনের কথা বলেন বটে, কিন্তু তাহা যে উপাসকের কল্পনা-প্রসূত নহে, তাহার প্রমাণ কি? স্বপ্নাবস্থায় কত রূপ প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহা যে অলীক, তাহা ত সকলেই জানে। তদ্রূপ, ধ্যানাবস্থায় যে দর্শন হয় তাহাও ত মিথ্যা হইতে পারে? তীব্রভাবে চিন্তা করিলে চিন্তার অনুরূপ মূর্ত্তি দর্শন হইতে পারে, কিন্তু তাহার সত্যতা কোথায়?

ব—এই জন্যই বীজমন্ত্রের আবশ্যকতা। বীজগর্ভে যদি শক্তি থাকে, তবে তাহা ক্ষেত্রে পতিত হইলে যথাকালে অঙ্কুরাদিক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয়। বৃক্ষের চিন্তা না করিলেও বৃক্ষের বীজ ভূমিতে পতিত হইলেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে—যদি প্রতিবন্ধক না থাকে। ঠিক সেই প্রকার বীজকে চেতন করিয়া, অর্থাৎ শক্তিসংযুক্ত করিয়া, তাহার সাধনা করিলে বীজ-মন্ত্র হইতে দেবতার আবির্ভাব হইবেই। দেবতার অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি ধ্যান করিয়া ফুটাইবার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যবহারক্ষম সত্য পদার্থ। শুধু ছবি ধ্যান করিয়া ঐরূপ সত্য বস্তুর আবির্ভাব সহজে হয় না। যে দৃষ্টিতে তুমি, আমি ও জগৎ সত্য পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই দৃষ্টিতে দেবতারও সত্তা আছে।

জি— দেবতার সঙ্গে কি সাধক সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন — দেবতা কি সাধকের কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দেবতাকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

ব—বৎস, সমগ্র জগৎটিই ত মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। যাহা এখন দেখিতেছ, বা ভাবিতেছ, বা বলিতেছ, সবই মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অথচ সবই সত্যস্বরূপ। যে-ভাবে এই জগতের যাবতীয় পদার্থ সত্য, ঠিক সেই ভাবেই দেবতাও সত্য। দেবতা আবির্ভূত হইয়া কথা বলেন বই কি? ভক্ত যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর দেন, ভক্তকে সর্ব্বদা সৎপথে চালিত করেন, ভক্তের মনোরঞ্জন করেন, ভক্তের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করেন, সবই করিয়া থাকেন। যে-ভাবে তুমি-আমি কথা বলি বা বাদ-প্রতিবাদ করি, ঠিক সেই ভাবেই তাঁহার সঙ্গেও বাদ-প্রতিবাদ হয়, হাস্য-পরিহাস হয়। অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। ভক্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন, মাতৃভাবে আসিলে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া সত্যই শয়ন করিতে পারেন। ভক্ত যেমন ভাবে তাঁহাকে সাজাইতে চান, তিনি তেমনই সাজিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বতোভাবেই ভক্তের অধীন।

জি—বাবা, তাঁহার দর্শন হইলে কি জীবের আর কিছু প্রার্থনীয় থাকে না?

ব—যাহা যাহার ইষ্ট, তাহা যদি সে সত্যই প্রাপ্ত হয়, তবে আর তাহার কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? কিন্তু ইষ্ট-প্রাপ্তির একটা ক্রম আছে। যতদিন প্রাপ্তির পূর্ণতা না হয়, ততদিন অবশ্য প্রার্থনা থাকেই, কিন্তু চরমাবস্থাতে সকল প্রার্থনাই নিবৃত্ত হইয়া যায়। মন্ত্রাত্মক ব্রহ্মতেজঃই দেবতা—সাধককে আরাধনা করিবার সময় স্বয়ং দেবতা হইতে হয়। নিজে তেজোময় হইয়া সেই তেজঃকে বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক অর্থাৎ নিজেকে নিজের সত্তা হইতে বিবিক্ত করিয়া পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিতে হয়। যদি ন্যাস প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন হয়, তবে সাধকের দেহ ও চিত্ত উভয়ই মন্ত্রময় হইয়া যায়। কিন্তু যোগাভ্যাস ভিন্ন তাহা হওয়ার উপায় নাই। সুচিরকাল সাধুমার্গে অবস্থান করিয়া যোগাভ্যাস করিলে নিজের সত্তা দেবতাময় হইয়া পড়ে— দেবতার জ্যোতিঃ রূপ, শক্তি ও সত্তা, সবই নিজের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য ও ক্রিয়ার প্রভাব বশতঃ সাধক তখন স্বয়ংই সাধ্যরূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তথাপি উভয়ে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকে। ভক্ত সে ভেদটুকু যত্ন-পূর্ব্বক পোষণ করেন। তাহা না থাকিলে বোধহীন সুষুপ্তিবৎ ঘোর মোহে আচ্ছন্ন হইবার ভয় থাকে। " দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" — একথা খুবই সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, দেবতা হইয়াও যখন দেবতার যজন হইতে পারে, তখন উপাস্য ও উপাসকে একটা ভেদ যে থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। যতক্ষণ বোধ আছে, ততক্ষণ ভেদ একেবারে তিরোহিত হয় না। এইজন্য ভক্তের ভজন কখনই শেষ হয় না। কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে পরাভক্তির নিবৃত্তি হয় না। বস্তুতঃ, জ্ঞানোত্তরই ঐ প্রকার ভক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভবপর।

জি—বাবা, মন্ত্র ব্যতিরেকে কি যোগলাভ হইতে পারে না? লয়-যোগ, হঠ-যোগ, রাজ-যোগ প্রভৃতির ন্যায় মন্ত্র-যোগও যোগের প্রকারভেদ মাত্র। মন্ত্রের এত মহিমা কিসের জন্য?

ব—না গো, না—তা পারে না। মনকে ত্রাণ করিবার কৌশলকেই মন্ত্র বলে। মনের জড়তা নাশ করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করাই মন্ত্রের কার্য্য। যে কোন উপায়েই মনকে চেতন করিতে চেষ্টা কর, মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, ব্রহ্ম পথ বা সুষুম্নামার্গ না খুলিতে পারিলে কোন উপায়ই ফল দান করে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধন-জীবনে বিশ্বাস ও বিচার।

জিজ্ঞাসু—বাবা, প্রকৃত বিশ্বাস কি? বিশ্বাসের স্থান সাধন জীবনে কোথায়? কেউ বলে, বিশ্বাস করা ভাল নয়—উহাতে মনের দুর্ব্বলতা বাড়ে। বিনা পরীক্ষায় কিছু গ্রহণ করিতে নাই। আবার অন্যপক্ষে, কেহ বলেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" এ বিষয়ে আপনার মত কি?

বৎস—বৎস, উভয় মতই আংশিকভাবে সত্য। জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বিশ্বাসকে অন্ধ-বিশ্বাস বলে। প্রকৃত বিশ্বাস জ্ঞানের পরেই উৎপন্ন হয়। প্রহ্লাদের বিশ্বাস ছিল, ধ্রুবের বিশ্বাস ছিল তাই—সর্ব্বত্রই তাহারা ঘোর বিপদের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গল হস্তের স্পর্শ অনুভব করিত। জ্ঞানবান্ ভিন্ন অজ্ঞানী কখনও ভগবানে প্রপন্ন হইতে পারে না—প্রপন্ন হইলে সে সর্ব্বত্রই আশ্রয়দাতার অভয় হস্ত নিরীক্ষণ করিতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণই ত ইহাই। সে সর্ব্বব্যাপক মঙ্গলময় বিরাট সত্তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারে—তাই তাহাতেই নিজের ব্যক্তিত্ব পরিহার করিয়া গা ঢালিয়া দেয়, বিচার-বিতর্ক করে না—করিবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। সে বুঝিতে পারে, তাহার ভিতরে বাহিরে এক অদ্বিতীয় শক্তিরই খেলা চলিতেছে—তাই সে শুধু নয়ন ভরিয়া সেই প্রেমময়ী লীলা নিরন্তর দর্শন করিয়া ধন্য হয়। ইহাই বিশ্বাসের অবস্থা—ইহা বড় উচ্চ অবস্থা। এ অবস্থায় অসম্ভব কিছু থাকে না। কিন্তু সংশয় ভঞ্জন না হইলে প্রকৃত বিশ্বাস আসে না। মনের সংকল্প-বিকল্পই সংশয়। জ্ঞানের উদয় হইলে মনের বিকল্পবৃত্তি বিনষ্ট হয়, তখন বিশুদ্ধ সংকল্পমাত্র থাকে। বস্তুতঃ, তখন মনঃও থাকে না—কারণ, মনঃ সংকল্প-বিকল্পাত্মিক। মনঃ তখন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয় বা অধ্যবসায়—ইহাই সংকল্পের শুদ্ধ রূপ। এই অবস্থায় সংশয়ও থাকে না, ভ্রমও থাকে না। এই শুদ্ধ সংকল্পময় অবস্থার দুই দিক আছে—একটি জ্ঞানময় ও দ্বিতীয়টি ইচ্ছাময়। যে অবস্থায় সংশয় থাকে না তাহাই বিশ্বাসের অবস্থা। এই বিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর।"

জি—শাস্ত্রে আছে—"ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথম-লক্ষণম্।" যাহাদের সিদ্ধি অদুরবর্ত্তিনী তাহাদের চিত্তে সংশয় জাগে না। সফলতার দৃঢ় ধারণা চিত্তে থাকে—তাই সফলতা জন্মে।

ব—ইহা সত্য কথা। দৃঢ় প্রতীতির নাম বিশ্বাস। ইহা কখনও ব্যর্থ হয় না। বাক্-সিদ্ধি, সংকল্প-সিদ্ধি সব এই বিশ্বাসেরই রূপান্তর। সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিশ্বাস জন্মে না, বিশ্বাস ব্যতিরেকে "বস্তু মিলে" না—সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব সিদ্ধির মূল সত্য প্রতিষ্ঠা।

জি—তবে বিশ্বাসঘাতকতা হয় কেন? বিশ্বাস করিয়া যে প্রতারিত হইতে হয়, নিষ্ফল হইতে হয়—তাহার কারণ কি?

ব—প্রকৃত বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, সে কখনও প্রতারিত হয় না। অন্ধবিশ্বাস হইতেই প্রতারণা হয়। যতক্ষণ জ্ঞানোদয় না হয়, ততক্ষণ অন্ধ-বিশ্বাস থাকিবেই। জ্ঞানীর বিশ্বাস ত আর অন্ধ নহে—জ্ঞানী কখনও বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হন না। তাঁহার প্রতীতি মিথ্যা হইবার নহে। এমন কি, খেয়ালের বশেও যদি তাঁহার কোন প্রতীতি জন্মে, তাহাও সত্য হয়। মনে কর, চূণের জল দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার দুগ্ধ-স্মৃতি জাগিল—বলা বাহুল্য, ইহা ইচ্ছা নহে, তথাপি এই স্মৃতিরূপ প্রতীতিও সত্যমূলক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ উক্ত শ্বেতবর্ণ জল বস্তুতঃই তখন দুগ্ধে পরিণত হয়—দুগ্ধ হইয়া যায়। সত্যের এমনই মহিমা যে, ইহাকে লাভ করিলে মিথ্যাও সত্য হইয়া যায়।

জি—এইখানে একটি কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে। যিনি যোগী, যিনি সত্যসংহিত, তাঁহার ইচ্ছা অমোঘ—উহা সফল হইবেই হইবে। সুতরাং তিনি যদি উক্ত জলকে "দুধ হউক" বলিয়া ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উহা দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু মূলে যদি সংকল্প না থাকে—শুধু প্রতীতি মাত্র থাকে, তাহা হইলে ত সৃষ্টি হওয়ার কথা নহে। আর এক কথা, জলকে তিনি জল না দেখিয়া দুগ্ধরূপে দেখিতে পাইলেন—সত্যনিষ্ঠ পুরুষের এরূপ মিথ্যা দর্শনই বা হইবে কেন? অবশ্য, অন্য লোকের পক্ষে তাহা দুগ্ধই বটে। কিন্তু এরূপ প্রতীতিতেও মিথ্যার লেশ ত রহিয়া গেল।

ব— বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। যিনি যোগী বা জ্ঞানী, তিনি কখনও মিথ্যা দর্শন করেন না। সূর্য্যের নিকট যেমন মেঘের গমন-সামর্থ্য নাই, সেই প্রকার জ্ঞানীর নিকট মিথ্যার আবির্ভাব অসম্ভব। জ্ঞানী একমাত্র সত্য বস্তুই দেখেন। আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু—জ্ঞানী সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তাহাই দর্শন করেন। তিনি জগতে কোথাও বহু বস্তু দেখেন না। আমরা যাহাকে বহু বলি, আমাদের জ্ঞানে—অজ্ঞানে—

যাহা নানা আকারে প্রতিভাসমান হয়, জ্ঞানীর প্রজ্ঞানেত্রে তাহা এক অদ্বিতীয় সত্তারই প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং জ্ঞানী যুক্ত-যোগে যখন সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করেন, তখন যদি সংস্কারের উদয় হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা ঘনীভূত হইয়া আকার ধারণ করে। এই যে সংস্কারের উদয়ের কথা বলিলাম, ইহা স্বভাব হইতেই হইয়া থাকে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, স্বভাবের বশে যখন আত্মচৈতন্যে নিহিত সংস্কার-বিশেষ উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই সৃষ্টির সূচনা হয়। আত্মার উহাতে কর্ত্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। ইহাকে স্বাভাবিক সৃষ্টি বলে। ইহার মূল ইচ্ছা নহে। জ্ঞানী বা যোগী যখন যুঞ্জান অবস্থায় থাকেন—ইহাও অবশ্যই যোগাবস্থা—তখন শুদ্ধ উপাধি থাকে। এই উপাধি তখন ইচ্ছারূপে আকারিত হইতে পারে। যখন তাহা হয়, অর্থাৎ যখন ইচ্ছার উদয় হয়, তখন তদনুসারিণী অর্থসৃষ্টি আপনিই হইয়া থাকে। এই সৃষ্টি ইচ্ছামূলক।

যুক্ত জ্ঞানীর সৃষ্টি অবোধপূর্ব্বক—স্বাভাবিক। যুঞ্জান জ্ঞানীর সৃষ্টি বোধপূর্ব্বক—ইচ্ছাপূর্ব্বক—আলোচনাপূর্ব্বক। যুক্ত জ্ঞানীকে স্রষ্টা না বলিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না— সেখানে স্বভাবই মূল। যুঞ্জান জ্ঞানীর সৃষ্টি অভাবমূলক, ইনিই স্রষ্টা। বলা বাহুল্য, ইনি যোগী। যোগ না থাকিলে, স্বভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে, সৃষ্টি হইত না। চৈতন্যের শুদ্ধ ও ঔপাধিক দুইটি অবস্থা আছে—শুদ্ধাবস্থায় সংকল্প নাই, জ্ঞান নাই, ইহাই ব্রহ্ম-স্বরূপ। ঔপাধিক অবস্থায় বিশুদ্ধ (বিকল্পহীন) সংকল্প আছে, শুদ্ধবোধ আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে—ইহাই ঈশ্বর-স্বরূপ। অথচ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একই অভিন্ন বস্তু। বুঝাইবার জন্য ভাগ করিয়া বলা হইল মাত্র।

কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যের নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ অবস্থা ব্রহ্ম, সক্রিয় সগুণ অবস্থা প্রকৃতি। সুতরাং ঈশ্বর ও প্রকৃতি সমানার্থক।

মহাশক্তি উভয়াত্মক হইয়াও উভয় ভাবের অতীত।

জি—এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। সৃষ্টি-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—সময়ান্তরে জিজ্ঞাসা করিব।

ব—তুমি প্রশ্ন করিয়াছ—জ্ঞানীর মিথ্যা দর্শন হয় কেন? বস্তুতঃ ইহা অমূলক প্রশ্ন। কারণ, জ্ঞানীর মিথ্যা দর্শন হয় না। তুমি জল দেখিতেছ, পরে দেখিলে, তাহা দুগ্ধ হইয়া গেল। সুতরাং তুমি যদি জলকে দুধ দেখিতে, দুধ বলিয়া মনে করিতে, প্রতীতি করিতে তবে তাহা মিথ্যা হইত। কারণ, তোমার নিকট জল ও দুধ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ—ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞানী একমাত্র আত্মসত্তাই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা দেখেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে কদাপি মিথ্যা দর্শনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার নিকট জলও যাহা, দুধও তাহাই—অর্থাৎ উভয়ই অভিন্ন-

সত্তাত্মক আত্মবস্তু। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তিনি জ্ঞানী হইতেন না। জ্ঞান-চক্ষুঃ ফুটিলে যেমন সংশয় থাকে না, তেমনি ভ্রান্তি -দর্শনও থাকে না। বস্তুতঃ তাঁহার নিকট পৃথক্ ভূতসৃষ্টি নাই। জলেতে বুদ্বুদের উদয়, জলে স্থিতি, জলেই লয়—সুতরাং বুদ্বুদও জলময়। যিনি জ্ঞাননেত্রে অদ্বৈত জলসত্তাই দেখিতেছেন, তাঁহার নিকট সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সমানার্থক। ব্রহ্মাকাশে সর্ব্ব পদার্থের ব্রহ্মাত্মক ভাবে নিত্যস্থিতি আছে। যক্তাবস্থায় তিনি তলাইয়া যান বলিয়া তাহা দেখেন না। এইটি ব্রহ্ম-সাম্য। উপরে ভাসিলে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ থাকেন—এইটি ঈশ্বরসাম্য। কিন্তু এ অবস্থাতেও জ্ঞান থাকে—কারণ, জীব সর্ব্বজ্ঞাবস্থাতেও ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞাননেত্র খুলিলেই ঈশ্বরসাম্য হয়—শিবত্ব জাগে। এই শিবই আদ্যাশক্তি। তার পরেও অবস্থা আছে। তখন শিবত্বও বিলীন হইয়া যায়। ইহা শক্তির অন্তলীনাবস্থা। কোন তত্ত্বেরই পৃথক্ সত্তা তখন উপলব্ধিগোচর হয় না। থাকেন একমাত্র তত্ত্বাতীত বস্তু,—যাহাকে স্বভাব বা পরমার্থ বলা হইয়া থাকে। তাহাই মহাশক্তি বা পরমশিব।

স্বভাবের প্রেরণায় যুক্ত-জ্ঞানীরও সংস্কার জাগিতে পারে। মনে রাখিবে, যুক্ত-জ্ঞানী, আত্মস্বরূপ বা চৈতন্য অভিন্নার্থক। সংস্কার জাগিলেই সৃষ্টির উদয় হয়। বস্তুতঃ, সংস্কার কথাটা ঠিক নহে। 'সৃষ্টি-বীজ' শব্দ অনেকটা পরিস্ফুট। এই বীজ জাগিলেই সৃষ্টি হয়। এই বীজ-জাগরণই চৈতন্যের প্রকৃতিরূপ গ্রহণ বা ঐশ্বর্য্য-বিকাশ।

এই বীজকে অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। তাহার মূলে অভাব আছে বলিয়া ইচ্ছা আছে, জ্ঞান আছে, চেতনা বা সংজ্ঞা আছে। ইচ্ছাদির বিষয় এই বীজ। এই বীজ-সমষ্টিই জ্ঞেয় জগৎ, ইহা জ্ঞাতা হইতে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। ভেদভাব অবশ্য থাকেই, নতুবা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই নামকরণই হইত না। ইহা ভেদাভেদ। ঈশ্বর-সাম্য অবস্থার বৈশিষ্ট্যই ইহাই।

যখন বিকল্পের উদয় হয়, সংশয় জাগে, তখন অভেদাংশ বিগলিত হইয়া যায়—শুধু ভেদমাত্র থাকে। ঈশ্বরপদ-ভ্রষ্ট হইয়া বদ্ধ বা খণ্ড জীবভাবের উদয় হয়। ঈশ্বরভাবেও জীবভাব থাকে বটে—তাহা শুদ্ধ ও অখণ্ড যুক্ত-জীবভাব। কারণ, অভেদের মধ্যে তখন ভেদ-দর্শনের আভাস থাকে। ঈশ্বরভাবে জীব ও ঈশ্বর পরস্পর-মিলিত, এরূপ বোধ থাকে।

খণ্ড জীবভাবে সংশয় প্রধান বৃত্তি। বক্রগতি ইহার বৈশিষ্ট্য। তির্য্যক্ বায়ু ইহার প্রাণ। ইড়াপিঙ্গলা বা কালমার্গ ইহার সঞ্চারভূমি। এই সঞ্চারকেই শ্বাস-ক্রিয়া বলে।

এই শ্বাস বিগত হইলেই বি-শ্বাস জন্মে। শ্বাস-সাম্যের বা ইড়াপিঙ্গলা সাম্যের সঙ্গে সঙ্গে বক্রতা দূর হয়, স্থূলতা কাটিয়া যায়, সংকল্প ও জ্ঞান বিশুদ্ধ হয়, জীবভাব নির্মল হইয়া ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়, স্বভাবের সঙ্গে যোগ স্থাপন হয় বলিয়া অভাব উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তি হইতে থাকে।

বস্তুতঃ ইহাই নির্ভরের অবস্থা। বিশ্বাস কি যে-সে জিনিষ? যে বস্তুতঃ বিশ্বাসী, তাহার কোন চেষ্টা থাকে না। অভাব জাগিবামাত্রই স্বভাব তাহার নিবর্ত্তন করেন। এই অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত কি ভক্তি হয়? তোমরা শুধু উন্মাদিনী ভক্তিই দেখিয়া থাক, তাই জ্ঞানকে ভয় পাও, পাছে ভক্তির শ্রোতঃ তাহার তাপে (?) শুষ্ক হইয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, তোমাদের পরিচিত জ্ঞানও শুষ্ক জ্ঞানমাত্র—অন্তঃসারবিহীন। প্রকৃত জ্ঞান কখনও নীরস নহে।

জি—আপনি বলিতেছেন—শ্বাস বিগত হইলেই বিশ্বাস জন্মে—তৎপূর্ব্বে নহে। তবে কি যাঁহারা বিশ্বাসবান্ জ্ঞানী ও ভক্ত, তাঁহাদের শ্বাস নাই?

ব—তাতে আর সন্দেহ কি? শ্বাস হইতেই সংশয়ের উদয় হয়, বিকল্প আবির্ভূত হয়, জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচিত হয়—কিন্তু যখন শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না, বায়ু যখন সুষুন্না মধ্যে সঞ্চরণশীল হয়, তখন কর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার থাকে না, সংশয়ভঞ্জন হয়, জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হয়। ইহাই বিশ্বশক্তির হস্তে যন্ত্রবৎ হইয়া যাওয়া, স্বভাবের দ্বারা চালিত হওয়া, গুরুশক্তির অধীন হওয়া—ইহাই নির্ভর, শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদন। তখন বায়ু সুষুন্নার মধ্যে সঞ্চরণ করে—রেচক ও পূরক, অর্থাৎ বাহ্য বায়ুর আদান-প্রদান নিবৃত্তি হইয়া যায়। অজপা-রহস্যের আলোচনাকালে ভবিষ্যতে এ-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব।

বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ হইতেই বিকল্প ও সংশয়ের উদয় হয়। এই সম্বন্ধ বায়ুঘটিত। সুতরাং বাহ্য বা স্থূল বায়ুর আকর্ষণ বন্ধ হইয়া গেলেই সংশয় কাটিয়া যায়। সূক্ষ্ম বায়ুর ক্রিয়া সুষুন্না মধ্যে তখনও হইতে থাকে বটে—কিন্তু ঐ ক্রিয়া স্বভাবতঃই সরল পথে হয় বলিয়া উহা জ্ঞানের প্রকাশক হয়, আবরক হয় না। বিশ্বাসের গাঢ়তম অবস্থায় আন্তর শ্বাসও থাকে না— সেটা প্রাপ্তির অবস্থা। তখন সংকল্পও থাকে না। বিশ্বাস ও নির্ব্বিকল্প দশা প্রায় সমান। ইহা অতি উচ্চ অবস্থা।

জি—আপনার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি—'সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, করিলেই ঠকিতে হইবে।' ইহাও কি যথার্থ মত?

ব—ইহাও অবশ্যই সত্য। যাহার জ্ঞানোদয় হয় নাই, যাহার বিশ্বাস অন্ধ, সে ত মায়িক ব্যাপারে মোহিত হইবেই। সে ত প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতারিত হইতেছে।

সে ত নিজেই নিজেকে প্রতারিত করিতেছে—অন্যে যে করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আসল কথা এই—জ্ঞানলাভ না হইলে চিত্ত মলিন থাকে, চিত্তে প্রতারণা বীজ নিহিত থাকে, তাই জগতের সর্ব্বত্রই সে প্রতারিত হয়। অজ্ঞানীকে সকলেই বঞ্চনা করে— তাহার নিজের মনঃ, নিজের ইন্দ্রিয়, কেহই তাহাকে সত্যের সন্ধান দেয় না। সকলেই তাহার সঙ্গে রিপুবৎ ব্যবহার করে। কিন্তু এই মনঃ ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানীকে বঞ্চনা করিতে পারে না, করে না—অর্থাৎ যে জ্ঞানী, সে ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করে তাহা ব্রহ্মময়, মনঃ দ্বারা যাহা বোধে আনে তাহাও ব্রহ্মাত্মক। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাহার ব্রহ্মসত্তারই অনুভব হইয়া থাকে। তাহার কাছে মিথ্যার আবির্ভাব হয় না। ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি— কোন অবস্থাতেই তাহার ব্রহ্মদর্শন খণ্ডিত হয় না।

অতএব, সাধারণ লোকের পক্ষে অবিচারিতভাবে কিছু গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। বিচারে ভ্রান্তি আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেও বিচার অপরিহার্য্য। অবশ্য সদ্বিচার করিবে—কুতর্ক করিবে না। কুতর্ককে বিচার বলে না।

আজকাল অন্ধবিশ্বাসের প্রবলতা বড় বেশী দেখিতে পাই। অন্ধবিশ্বাসেও কুতর্কের ন্যায় সর্ব্বথা পরিহার্য্য। অন্ধবিশ্বাস করিয়া কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যা-তা বিশ্বাস করিবে কেন? পরীক্ষা না করিয়া বিশ্বাস করিও না। তোমার নিকট সত্যনির্ণয়ের যে সকল পরীক্ষাসাধন আছে, সর্ব্ব প্রয়োগ করিয়া দেখ—তবে মানিতে প্রবৃত্ত হও। চিলে কান লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া চিলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কোন ফল নাই। আগে হাত লাগাইয়া স্পর্শ দ্বারা জান, তোমার কান আছে, কি গিয়াছে—যদি না থাকে, তখন বিচার কর, ঐ স্থানে ও ঐ সময়ে চিল আসিবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি থাকে, তবে সন্ধান লও, সত্যই চিলকে আসিতে কেহ দেখিয়াছে কি না। যদি দেখিয়া থাকে, তখন সন্ধান লও, তোমার কান চিলে লওয়া কাহারও প্রত্যক্ষ হইয়াছে কিনা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শুধু শোনা কথার বিশেষ মূল্য নাই। যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তবে সে লোকটি আপ্ত কিনা—অন্ততঃ তাহার বিরুদ্ধে কিছু ভাবিবার আছে কি-না, তাহা নিরূপণ কর। এতটা বিচার করিলে তবে বিশ্বাস করিতে পার। কিন্তু এত করিয়াও তোমার প্রকৃত বিশ্বাস হইবে না, সম্ভাবনা-বুদ্ধির উপরে তুমি উঠিতে পারিবে না। ব্যবহার-জগতে এই পর্য্যন্তই সম্ভবপর ও আবশ্যক। এতটার পরে এই যে বিশ্বাস, ইহাও কিন্তু মিথ্যা হইতে পারে।

কিন্তু হইলেও লৌকিক দৃষ্টিতে তোমার খেদ করিবার হেতু নাই। কারণ, যতটা পরীক্ষা করিতে পারা যায়, ততটা করিয়া তবে তুমি আস্থা স্থাপন করিয়াছিলে। এই প্রকার বিশ্বাস না করিলে ব্যবহার কঠিন হইয়া পড়ে। এই বিশ্বাস যদিও প্রকৃত বিশ্বাসও নহে—কারণ ইহা জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সঞ্জাত, তথাপি ইহা অন্ধবিশ্বাস নহে। কারণ, ইহা পূর্ব্বে বিচার রহিয়াছে। মূলতঃ ইহাও প্রত্যক্ষের উপরে স্থাপিত। অন্ধবিশ্বাসে মনঃ নিস্তেজঃ হইয়া যায়। যুক্তি ও বিচার হইতে পরাঙ্‌মুখ হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। প্রকৃত বিশ্বাস আসিলে যুক্তি নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে—তাহার আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসের পূর্ব্বে, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, সদ্বিচার ও সদ্‌যুক্তির আবশ্যকতা আছেই।

জি—যাহা অসম্ভব, তাহা বিশ্বাস করা কি অন্ধবিশ্বাস নহে? অনেকে বিনা দ্বিধাতে অনেক অনেক অসম্ভব বিষয়ও মানিয়া থাকেন। ইহা কি অন্ধবিশ্বাসের নিদর্শন নহে?

ব— কোন্‌টা সম্ভব, আর কোন্‌টা অসম্ভব—তাহার কোন মানদণ্ড আছে কি? সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্—সব জিনিষেই সব জিনিষ আছে, সবই সর্ব্বময়। শুধু তাহাই নয়—আত্মাতে বিশ্ব আছে, বিশ্বে আত্মা আছেন— যে দেখিতে জানে, সে দেখিতে পারে। যে শক্তিশালী ও তত্ত্বজ্ঞ, সে জানে কিছুই অসম্ভব নহে। জ্ঞানের আবরণ খসিয়া গেলে অচিন্ত্য শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে— দেখিবে, তুমি এখন যাহা চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছ না, তাহাও সম্ভবপর, ঐ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির প্রভাবে তাঁহাও সংঘটিত হইতে পারে—অনেক স্থলে হইয়াও থাকে। এইজন্য "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ", অচিন্ত্য ভাব সম্বন্ধে বৃথা তর্ক করিবে মা। যিনি ক্ষমতাশালী, যিনি ব্রহ্মবিৎ যোগী, যিনি প্রকৃতির রহস্যজ্ঞ, যিনি মায়াধীশের অনুগ্রহে মায়াকে অতিক্রম করিয়াছেন ও মায়াকে চালনা করিতে সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তিনি কি না পারেন? ঈশ্বর-সাম্য লাভ করিয়া যে যোগী যৌগেশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন যে, বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। যাহার যতটুকু ক্রিয়াশক্তি, সে ততটুকুই সম্পাদন করিতে পারে, যাহার জ্ঞানশক্তি যতটা বিকশিত, সে ততটাই ধারণা করিতে পারে—তাহার বেশী পারে না। একজনে যাহা পারে না, আর একজনে শক্তির আধিক্য-বশতঃ তাহা পারে, অন্য একজনে তদপেক্ষা অধিক পারে। শক্তির আবরণ

যতই অপগত হইতে থাকে, ততই সম্ভাবনার রাজ্যের প্রসার বাড়িয়া যায়। যখন শক্তি অনাবৃত ও মুক্তাবস্থা লাভ করে, তখন সবই সম্ভবপর হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিৎ যোগী মহাশক্তির কৃপায় কিছুই অসম্ভব দেখেন না।

বস্তুতঃ, এ জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই--অথচ সবই আশ্চর্য্য। যিনি প্রকৃত যোগী, তিনি কিছুতেই আশ্চর্য্য হন না, কারণ তিনি এমন বস্তুর উপলব্ধি করিয়াছেন, যেখানে যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমন্বয় হইয়াছে, যেখান হইতে সর্ব্বভাবের সম্ভব হইতেছে—তিনি দেখেন সবই হইতে পারে। সর্ব্বত্র যখন সর্ব্ববিধ সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে এবং পরম সত্তা যখন অখণ্ডভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তখন না হইতে পারে এমন কি আছে? দেশ, কাল ও নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টিতে আবদ্ধ করিতে পারে না। যে-স্থানে যে-ভাবের অভিব্যঞ্জক সামগ্রী আছে, সেখানে সেই ভাবই প্রকটিত হয়—বাকী সব অব্যক্ত থাকে। কিন্তু অব্যক্ত থাকিলেই সব ভাবেরই সত্তা আছে—প্রতিবন্ধকতা বশতঃ শুধু তাহাদের অভিব্যক্তি হইতেছে না। প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অথবা বিজ্ঞান-কৌশলে প্রতিবন্ধক দূর করিতে পারিলে যে-কোন স্থানে যে-কোন ভাবের প্রকাশ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে লক্ষ লক্ষ বার ত আমি সহস্র প্রকারে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছি। যে-ভাব প্রবল হয়, তাহাই অন্যান্য ভাবকে অভিভূত করিয়া ফুটিয়া উঠে—জগতের লোকে সেই অভিব্যক্ত ভাবটিকেই একটি বিশিষ্ট বস্তুরূপে দেখিতে পায়। কিন্তু যে জ্ঞানী, তাঁহার জ্ঞান-নেত্রে অব্যক্ত ভাবও গোচর হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলেই যে-কোন অব্যক্ত ভাবকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এই যে অব্যক্ত ভাবের কথা বলিলাম—ইহাই বীজ। তাই জ্ঞানী কিছুতেই আশ্চর্য্য হন না—তাঁহার নিকট প্রকৃতির সব চালাকী ধরা পড়িয়া যায়, ফাঁকি চলে না। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার যে কৌশলের উপরে চলিতেছে, তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি কিছুতেই মোহিত হন না—সর্বদাই স্বরূপস্থ থাকেন। ইন্দ্রজালে মোহিত হওয়া বা আত্মস্বরূপকে দেখিতে না পাওয়াই আত্মবিস্মৃতির প্রধান নিদর্শন। জ্ঞানী বা যোগী তাই উদাসীন, সমদৃষ্টি, নির্লেপ ও নিরঞ্জন। এই গেল এক পক্ষের কথা।

পক্ষান্তরে যিনি জ্ঞানী বা যোগী, তিনি দেখেন, এ জগতের সবই আশ্চর্য্য। একটি ধূলি-কণার মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা তিনি দেখিতে পান। এই যে পরিচিত জগৎ, যাহা অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, তাহা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব। তিনি সর্ব্বত্র সেই

মহাশক্তির খেলাই দেখিতে পান, দেখিয়া বিস্মিত হন। সেই পরম মহানের মহত্ত্ব তিনি ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যেও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন—একবিন্দু বীর্য্য হইতে এই সুন্দর অপূর্ব্ব চমৎকারশালী দেহ উদ্ভূত হয়, একটি বীজ হইতে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এক স্ফূলিঙ্গ অগ্নি হইতে বিশাল দাবানলের সৃষ্টি হয়। একটি ক্ষুদ্র ফলে বা পুষ্পে যে সৃষ্টিকৌশল লক্ষিত হয়, সূক্ষ্মদর্শী ও ধীর-প্রকৃতি তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হন। এই জগতের অতি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে মহাপ্রলয়ের সূচনা হয়, একটি মাত্র ক্ষণের দৃষ্টিপাত হইতে চির-জীবনের সত্য স্থাপিত হয়—আশ্চর্য্য কোন্‌টি নয়? যাহাকে ঘোর বিপদ মনে করিতেছ, দেখিবে, তাহাতেও পরম মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। জ্ঞাননেত্রে যাহা দেখিবে, যাহা কিছু ভাবিবে—সর্ব্বত্রই অদ্ভুত দেখিবে। কোথাও বিস্ময়ের অন্ত পাইবে না। অচিন্ত্য মহাশক্তির লীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইবে, কৃত-কৃত্য হইবে, হৃদয়ে পরম ভাবের উদয় হইবে। জ্ঞানী ভিন্ন কাহারও পক্ষে বিশ্বরূপ-দর্শন, বিশ্ব-নাট্যের অভিনয় দর্শন, সম্ভবপর নহে।

অতএব আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কোথাও না থাকিলেও সর্ব্ব বস্তুই পরমাশ্চর্য্যময়। যাহা অতি কঠিন, তাহাই অতি সরল ও সহজ; যাহা দূরে—অতি দূরে, তাহাই অতি সমীপস্থ—একেবারে নিজের অঙ্কগত—ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য কি আছে? একটি ক্ষণের মধ্যে—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে—সমগ্র অতীত ও অনাগত কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, বিন্দুরমধ্যে সিন্ধু খেলা করিতেছে। যাহা ছোট, তাহাও বড় দেখায়, যাহা বড়, তাহাও ছোট দেখায়— সে জন্য এরূপ হইয়া থাকে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে জানা যায় যে, কিছুই অসম্ভব নাই, জানা জায় যে, যাহা "অণোরণীয়ান্" তাহাই আবার "মহতো মহীয়ান্"—অথচ স্বরূপতঃ তাহা অণুও নহে, মহৎও নহে।

জি—তবে ত 'অন্ধবিশ্বাস' কথাটাই ভুল বলিতে হইবে। কারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে যখন অসম্ভব কিছুই নাই তখন আর বিচারের আবশ্যকতা কি? সবই ত বিশ্বাসযোগ্য—অবিশ্বাসযোগ্য কিছুই নাই।

ব— যে সত্য সত্যই ধারণা করিতে পারে যে, সবই সম্ভবপর, যে সত্যই ভুয়োভূয়ঃ অচিন্ত্য ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও করিতেছে, যে প্রাকৃতিক শক্তির বৈচিত্র্য ও মহিমা জানে, তাহার পক্ষে উহাতে বিশ্বাস করা অন্ধবিশ্বাস নহে—না করাই মূর্খতা। ব্যোমযানে শূন্যপথে যাওয়া যায়, এখন বহু লোক ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছে। যদি কোন লোক তাহা না মানিতে চায়—তাহাকে নানা প্রকারে বুঝান ও প্রত্যক্ষ দেখান আবশ্যক। তবু যদি সে বিশ্বাস না করে, তবে তাহার

মূর্খতা। নিশ্চয়ই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত। আর যে কখনও ব্যোমযান দর্শন করে নাই, যাহার পক্ষে তাহা করিবার সম্ভাবনাও নাই, যাহার ভাগ্যে এমন কোন আপ্ত পুরুষ মিলে নাই— যে উহা দেখিয়া তাহার নিকট উহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, প্রত্যুত যে এইরূপ ব্যাপারে কৌশলমূলক বলিয়া বহুবার অনুভব করিয়াছে —তাহার পক্ষে যার-তার কাছে ব্যোমযানে শূন্যে গমনের কথা শুনিয়া উহাতে আস্থা স্থাপন করা নিশ্চয়ই অন্ধবিশ্বাস বলিয়া পরিগণিত হইবে। ব্যোমযানে শূন্যপথে যাত্রা সত্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় তাহাতে বিশ্বাস করা অযৌক্তিক ও বিচারহীনতার পরিচায়ক। অন্ধবিশ্বাসে সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। কোন কিছু শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিচার করিবে, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিবে, প্রত্যক্ষেও ভ্রান্তি হইতে পারে বলিয়া যথাসম্ভব ভ্রান্তির কারণ দূরীভূত করিবে, পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিবে, অন্যের অনুভূতির সঙ্গে সম্ভবপর হইলে তুলনা করিবে, ব্যবহার ক্ষেত্রের মানদণ্ড দ্বারা দর্শনের তথ্যতা বা বিতথ্যতা নির্ণয় করিবে, উহার অর্থক্রিয়াকারিতা নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে—তবে ত বিশ্বাস স্থাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এক কথা। অন্ধবিশ্বাস যেমন খারাপ, তেমনি অসম্ভব বলিয়া পরিহাস করাও অসঙ্গত। কারণ, প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যরেখা এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যাহা এক সময়ে সকলেই অসম্ভব মনে করিয়াছে, কালান্তরে তাহা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই কথাটি মনে রাখিলে আত্মাভিমানের দৃপ্ততা কাটিয়া যাইবে, চিত্তে নম্রতা আসিবে। কিছু শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করা যেমন সাধারণ লোকের পক্ষে অনুচিত, তেমনই তাহা অসম্ভব বলিয়া তৎক্ষণাৎ বিনা বিচারে ও বিনা সম্যক্ অনুসন্ধানে পরিহার করা ততোধিক অনুচিত। যাহা সত্য তাহাকে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেই সে উড়িয়া যায় না। তাহাতে শুধু নিজেরই অদূর-দর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়।

জি—এবার আমার অনেক সংশয় দূর হইয়াছে। একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। মনুষ্যকে ঈশ্বর মনে করা, পাথরকে চেতন মনে করা—এরূপ বিশ্বাসের সমর্থন হয় কি?

ব—যাহার প্রকৃত বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। কেন না, তাহার পক্ষে সবই সম্ভবপর। বিশ্বাসের বলে না হইতে পারে, এমন কি আছে? বিশ্বাসের প্রভাবে মনুষ্যে ঈশ্বরত্বের বিকাশ হইতে পারে অথবা মনুষ্য-নিহিত অব্যক্ত ঐশ্বর্য্যও উপলব্ধ হইতে পারে। পাথরও চেতন—কারণ চৈতন্য সর্ব্বগত, তবে আধার মলিন বলিয়া স্ফূটভাবে প্রকাশিত হয় না। সেই জন্য

পাথরকে জড় বলিয়া বোধ হয়। যে বিশ্বাসী, সে পাথরকে চেতন মনে করিবামাত্রই ঐ অব্যক্ত চৈতন্য আধার বিশুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হইয়া উঠে, তখন ঐ পাথর চেতনের ন্যায় ব্যবহার করে,—চলিতে পারে, কথা বলিতে পারে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে সত্যসন্ধ ও বিশ্বাসী—অর্থাৎ যে যোগী, জ্ঞানী বা ভক্ত তাহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সাধারণ অবস্থায় মনুষ্যে ঈশ্বরবোধ, শিলায় দেববোধ হইতেই পারে না। শাস্ত্রে অবশ্য ভাবনা করার উপদেশ আছে বটে, কিন্তু তাহার রহস্য আছে। উপাদান সংগ্রহ না করিয়া শুধু ভাবনা দ্বারা কোন ফল লাভ হইতে পারে না। এই গোলাপ ফুলটি আমি ভাবনা-বলে এই মুহূর্ত্তে ইচ্ছানুরূপ অতি কঠিন প্রস্তরখণ্ডে অথবা অন্য কোন পদার্থে বা জীবে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না। কারণ, তোমাদের ভাবনা-সিদ্ধি হয় নাই— তোমরা এখনও উপাদান সংগ্রহ করিতে পার নাই। সত্ত্বশুদ্ধি পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের বিকাশ না করিতে পারিলে সংকল্প কখনও সিদ্ধ হয় না, বিকল্পের পরিহার হয় না, একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। ভাবনাই ত কল্পনা। জীবভাবের কল্পনা দ্বারা ব্যবহারিক সত্তার অভিব্যক্তি হয় না, ঐশ্বরিক কল্পনা দ্বারা হইতে পারে। ঈশ্বরের কল্পনা সত্যমূলক— তাই তিনি সৃষ্টি প্রভৃতি করিতে পারেন। জীব ঐশ্বর্য্যলাভ না করা পর্যন্ত তাহা পারে না। মনুষ্যমাত্রে ঈশ্বরভাব, শিলাদিমাত্র দেবভাব ইত্যাদি জ্ঞানী উপাসকের লক্ষণ। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ভূতশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ন্যাস—যাহাদের ইহা হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভবপর হয় না। অজ্ঞানীর ভাবনা ও জ্ঞানীর ভাবনায় অনেক ব্যবধান। সচরাচর উপাসনার বিষয়ে যে সকল আলোচনা হয়, তাহা অজ্ঞানীর উপাসনা। বস্তুতঃ, ঐ সকল স্থলে ভাবনা প্রাতিভাসিক সত্তার উর্দ্ধে অন্য কিছু প্রকটিত করিতে পারে না। জ্ঞানীর ভাবনাই প্রকৃত উপাসনা—তাহাতে ব্যবহারিক সত্তা পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয়। পারমার্থিক সত্তা ত নিত্যসিদ্ধ অদ্বয়-ব্রহ্মসত্তা বা আত্মস্বরূপ;—তাহা ত ভিত্তিরূপে বোধভূমিতে থাকিবেই। বিকল্প ত্যক্ত হইল, পরিশেষে সংকল্পও পরিত্যক্ত হইলে, প্রতিভাস ও ব্যবহারের অধিষ্ঠানভূত, সর্ব্বত্র ব্যাপক অখণ্ড চিৎসত্তারূপিণী পরমানন্দময়ী অথচ আনন্দাতিগা মহাশক্তি প্রকটিত হন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বরূপোপলব্ধির পথে—পূর্ব্বস্মৃতি।

জিজ্ঞাসু—জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ঋষি ও আচার্য্যগণের মতভেদ দেখিয়া আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের বিচার-মোহ উপস্থিত হয়। আপনি এ-সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য বাকী রহিয়াছে। কেহ বলেন, জীব ব্রহ্মস্বরূপ ও চিন্ময়, কিন্তু অনাদি মায়ায় আত্মবিস্মৃত আছে বলিয়া নিজেকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারিতেছে না। অভেদ-জ্ঞানের উদয় হইলে যখন মায়ার নিবৃত্তি হইবে, তখন নিজেকে নিজে চিনিতে পারিবে। তারপর সকল বৃত্তির উপশম হইয়া ব্রহ্মরূপে স্থিতি হইবে। কেহ বলেন জীব পুরুষোত্তম বা পরমাত্মার পরা-প্রকৃতি—ইহা দ্বারা সমস্ত জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। কাহারও মতে চিৎশক্তিরূপ জীব এবং অচিৎশক্তিরূপ গুণময়ী প্রকৃতি ঈশ্বরের অঙ্গস্বরূপ ও নিত্য। প্রকৃতির আবেশবশতঃ জীবের বন্ধন হয়, কিন্তু উহা কাটিয়া গেলেও জীবের নিত্য সত্তা বাধিত হয় না। আবার কাহারও মতে পরমেশ্বরের তটস্থা শক্তিকেই জীব বলে। তাঁর স্বরূপ শক্তি যেমন তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া তাঁহা হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ তাঁহার তটস্থশক্তি বা জীব তাঁহা হইতে একভাবে অভিন্ন হইলেও প্রকারান্তরে ভিন্ন। এইপ্রকার আরও অসংখ্য প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত জীবের নিত্যতা এবং সর্ব্বব্যাপকত্ব সম্বন্ধেও নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার প্রশ্ন এই—গুরুকরণের পরে সাধনমার্গ প্রাপ্ত হইয়া জীব যখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে কি উপলব্ধি করিতে থাকে?

বক্তা—বৎস, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বীরের ন্যায় একনিষ্ঠা ও ধৈর্য্যসহকারে সাধন করিয়া যাও, কালপূর্ণ হইলে সব তত্ত্ব নিজেই বুঝিতে পারিবে। নিজের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রের বিভিন্ন মত শুনিয়া সত্যনির্ণয় করিতে পারিবে না। শাস্ত্রকারগণ এক এক জন একভাবে এক এক সিদ্ধান্তের

অবতারণা করিয়াছেন—তাহার কোনটিই মিথ্যা নহে। তবে পূর্ণ সত্যের রূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারিবে না। জীব যে নিত্য এবং ভগবদাশ্রিত চিন্ময় তত্ত্ববিশেষ, একথা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু প্রকারান্তরে জীবভাবকে অনিত্য ও মায়াকল্পিত যে না বলা যায়, তাহা নহে। সুতরাং শুধু শব্দবিন্যাসের বৈচিত্র্য হইতে বাস্তবিক সত্যাসত্যের নিরূপণ হয় না। কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের বিকাশ হইলে কিছুই জানিবার বাকী থাকিবে না। সুতরাং, অলস্য ত্যাগ করিয়া অধ্যবসায়ের সহিত জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর—নিজেই সব বুঝিতে পারিবে। জ্ঞানের উদয় হইলে জীবের আবরণ যখন একটু একটু করিয়া কাটিয়া থাকে, তখন তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ-পথে জাগিয়া উঠে। সে তখন নিজেকে চিনিতে পারে, এবং জগৎকেও চিনিতে পারে। কোন্ বস্তু নিত্য ও কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।

জি—এই যে আত্মবোধের আবরণ, তাহা কাটিবার কি কোনও ক্রম আছে?

ব—আছে বই কি? প্রথমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগে, কর্ম্ম ও সংস্কার সকল প্রত্যক্ষ হয়। জীব কবে কোথায় ছিল, কি কর্ম্ম কখন করিয়াছে, তাহার ফলে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কোন্ সময়ের কোন্ কর্ম্ম হইতে কবে কোন্ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়াছে—সব স্মরণ করিতে পারে। কাহার সহিত কখন কি সম্বন্ধ ছিল, সব তার মনে পড়িতে থাকে। দেখ, জ্ঞান, কর্ম্ম, অনুভূতি, সুখ-দুঃখ-ভোগ, যাহা কিছু আমাদের ঘটিতেছে, কিছুই লুপ্ত হয় না—লিঙ্গ দেহে সবই সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে। স্থূলদেহের পরিবর্ত্তন হয় বটে—কিন্তু লিঙ্গদেহ এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সৃষ্টির আদিতে লিঙ্গদেহের বিকাশ হইয়াছে—জন্ম-জন্মান্তর সেই একই লিঙ্গদেহ কর্ম্মানুরূপ পৃথক্ পৃথক্ স্থূলকোষে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি এই লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। যখন জ্ঞানের আভাস লিঙ্গে জাগে, তখন সেই আলোকে লিঙ্গস্থ সংস্কাররাজি চলচ্চিত্রের ন্যায় সজীব হইয়া প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হয়। অবশ্য প্রথমে স্মৃতিরূপে বোধ জাগে, পরে তাহা প্রত্যভিজ্ঞার আকার ধারণ করে। যেমন একটি সূত্রে সহস্র মণি গ্রথিত থাকে, তেমনি একই লিঙ্গাত্মায় সহস্র সহস্র জন্মের সংস্কার আহিত থাকে।

জি—সাধারণতঃ লোকের পূর্ব্ব-সংস্কার জাগে না কেন? দুই একজনের জাতিস্মরতার বিষয় অবশ্য শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা বাদ দিলে সাধারণতঃ জীবের পূর্ব্ব-স্মৃতি থাকে না কেন? সাধনা দ্বারা স্মৃতি যখন অবশ্যই জাগে, তখন জন্মান্তর-তত্ত্ব যে সত্যমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কোন্ কোন ধর্ম্মে তাহা অঙ্গীভূত হয় নাই কেন?

ব—বৎস, লিঙ্গে সংস্কার থাকিলেও যতক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জিত না হয়, ততক্ষণ তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তবে বলিতে পার, স্মরণ হইতে বাধা কি? বলিতে পার—"বর্ত্তমান জন্মের অতি প্রাচীন ঘটনাও ত স্মৃতি পথে আরূঢ় হয়, উপযুক্ত উদ্দীপক কারণ পাইলে জাগিয়া উঠে। অবশ্য কোন কোন সংস্কার এত অভিভূত হইয়া থাকে যে, তাহাকে জাগান কঠিন হয়, তথাপি বর্ত্তমান জন্মের স্মৃতি যে মানুষের জাগে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিতে বাধা কি? সব স্মৃতি না জাগিতে পারে, বহু স্মৃতি ত জাগিতে পারে।"—ইহার রহস্য আমি বুঝাইয়া দিতেছি। দেখ, লিঙ্গ যদিও এক বটে, তথাপি তাহা স্থূলের সঙ্গে এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া থাকে যে, তাহা স্থূলের অংশ না লইয়া থাকিতে পারে না। লিঙ্গ স্থূলাশ্রয় ভিন্ন কোন প্রকার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ নহে। এমন কি, মৃত্যুর পরেও স্থূলাভাস তাহাতে লাগিয়া থাকে—ইহাকেই কর্ম্মাশয় বলে। চিত্তের শোধন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থূল হইতে লিঙ্গকে বিবিক্ত করা যায় না। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সব লিঙ্গেরই বৃত্তি-অনুযায়ী নাম মাত্র। এই সকল বৃত্তিও স্থূলাসাপেক্ষ। এমনকি, ইন্দ্রিয়গুলিও স্থূলদেহকে আশ্রয় না করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। তবে স্থূলের তারতম্য আছে, ইহা সত্য। এখানে স্থূলদেহ যে প্রকার, ভুবর্লোক বা স্বর্লোকের স্থূলদেহ ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার। কিন্তু সকল প্রকার ভেদ সত্ত্বেও স্থূলদেহের যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা সর্ব্বত্রই আছে। ব্রহ্মালোক হইতে অধস্তন লোক পর্য্যন্ত সবই পঞ্চাকৃত ভূতে নির্ম্মিত। লিঙ্গ যে লোকেই থাকুক, স্থূলকে আশ্রয় করিয়াই তাহার ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান অজ্ঞান ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি লিঙ্গস্থিত যাবতীয় ভাবই আত্মপ্রকাশের জন্য স্থূলদেহের উপর নির্ভর করে। নিরাকারে লিঙ্গ নিষ্ক্রিয় ও অসৎকল্প—সুতরাং জ্ঞানাদি কিছুই নাই। স্থূলাকার মাত্রেরই প্রাকট্য পঞ্চীকরণ-সাধ্য। এখন কথা এই— যে স্থূলদেহ বা আকার অবলম্বন করিয়া লিঙ্গ যখন কার্য্য করে, সেই স্থূলদেহের একটা ছাঁচ তখন লিঙ্গে পতিত হয়, লিঙ্গ তদ্ভাবে ভাবিত হয়। স্থূলদেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গের এই মৌলিক ভাবনাও পৃথক্ হইয়া যায়। স্থূলদেহের সহিত অজ্ঞানজনিত লিঙ্গের অধ্যাসই ইহার একমাত্র হেতু। অতএব যতদিন অজ্ঞান আছে, ততদিন সত্য সত্য লিঙ্গের অভিন্নতা সত্ত্বেও আকার-ভেদবশতঃ একটি

কল্পিত ভেদ থাকে। জলের বা বায়ুর আকার না থাকিলেও পাত্র-ভেদে তাহার আকার হয় ও তাহা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তদ্রূপ লিঙ্গ—বিশুদ্ধ লিঙ্গ—আত্মা বা চৈতন্যের ন্যায় নিরাকার হইলেও স্থূল সম্বন্ধ যতদিন আছে, ততদিন তাহার আকার আছে এবং সে আকারের বৈশিষ্ট্যও আছে। লিঙ্গ যে এক, এটা এখন তোমার শোনা কথা। যখন ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, তখন ইহাতে যে যে আকার আরোপিত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সহিত যে যে স্থূলদেহের সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিবে। লিঙ্গ নিরাকার হইলেও পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ইহাতে নির্লিপ্তভাবে সহস্র সহস্র আকার প্রতিভাত হইবে। এক সূত্রে যেমন বহু-সংখ্যক মণি ও এক শক্তিতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত—তদ্বৎ এক লিঙ্গে বহু বহু আকার প্রতিবিম্বিত বলিয়া বোধ হইবে। এখন দেহাধ্যাস আছে বলিয়া লিঙ্গ ও দেহ জড়িত হইয়া মাখামাখি হইয়া আছে। এই অবস্থায় যত দেহ, কার্য্যতঃ তত লিঙ্গ। লিঙ্গকে দেহ হইতে পৃথক্ করিতে পারিলেই লিঙ্গে অভিন্নতা প্রতিভাত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র দেহাভাস তাহাতে ফুটিয়া উঠে। বিশ্বরূপ দর্শনে যেমন "তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা" দেখা যায়, এও সেই প্রকার একটি লিঙ্গের মধ্যেই নিজের সমস্ত ধারাটি— চৌরাশি লক্ষ যোনিতে কোটি কোটি জন্ম, অসংখ্য আকার সমস্ত বৈচিত্র্য, অনুভূত হয়। এসব আকার যে আমারই আকার, তাহা তখন প্রথমে অস্ফূট স্মৃতিরূপে, পরে পরিস্ফুট প্রত্যভিজ্ঞারূপে, উদ্বুদ্ধ হয়। পরে আকার মিলাইয়া গেলেই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

যতদিন অজ্ঞান থাকে, ততদিন স্থূলের সহিত লিঙ্গের তাদাত্মবশতঃ লিঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ থাকে। সেইজন্য এক স্থূলদেহের অনুভূতি সেই দেশাশ্রিত ও সেই দেহের আকারে আকারিত লিঙ্গ ভিন্ন অন্যাকার যুক্ত লিঙ্গে প্রকাশিত হয় না। সংস্কার সম্বন্ধেও সেই কথা। আমাদের আত্মবোধ স্থূলদেহাবলম্বনেই প্রকাশিত হয়। এইজন্য ইহা সর্ব্বদাই খণ্ডিত হইয়া জাগিতেছে। খদ্যোতের অঙ্গজ্যোতিঃ যেমন একবার জ্বলে, একবার নিভে, আমাদের দেহাশ্রিত আত্মবোধও সেইপ্রকার কখনও জাগে, কখনও নিবৃত্ত হয়—সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকে না। বলাবাহুল্য, থাকিতে পারেও না। স্থূলবায়ুর ক্রিয়া—শ্বাস-প্রশ্বাস—হইতে এরূপ হইয়া থাকে। ইহাকেই বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলে। মৃত্যুকালে সাধারণ জীবমাত্রেরই এই আত্মবোধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেখানেই জাগরণ সমাপ্ত হয়, মহানিদ্রার সূত্রপাত হয়। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা সব স্বপ্নবৎ, মূর্চ্ছিতবৎ, মূঢ়বৎ। পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে স্থূলবায়ুর প্রভাব

থাকে না বলিয়া জ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়। জীব মাতৃগর্ভে লিঙ্গের অভিন্নতা প্রত্যক্ষ করে বলিয়া সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি তাহাকে আকুল করিয়া তোলে। তখন দেহাধ্যাস থাকে না। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই বাহ্য বা স্থূলবায়ুর ক্রিয়া হয়, বিস্মৃতি আসে, বিক্ষিপ্ত ভাবের উদয় হয়, একাগ্রতা কাটিয়া যায়, খঞ্জ আত্মবোধ বিচ্ছিন্নভাবে জাগে। এই প্রকারে কত জন্ম কাটিয়া যাইতেছে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। সাধারণ মনুষ্য মৃত্যুর সময় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়। জ্ঞানের উদয় নাই বলিয়া মনুষ্য ত অজ্ঞান-মধ্যেই থাকে—তবে যতদিন বিক্ষিপ্তভাবে থাকে, ততদিন শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে, বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া থাকে, খণ্ডিত বা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান থাকে। ইহা অজ্ঞানমূলক বিক্ষেপ। মৃত্যুকালে বাহ্য বায়ুর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়, প্রাণাপানের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, অজ্ঞান-মূলক লয় আসিয়া জীবকে অভিভূত করে। এই আবরণই মৃত্যু। তখন জীবচৈতন্য তমোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু যে জ্ঞানী, তাহার মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ সে আত্মবিষয়ক অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান লাভ করিয়াছে বলিয়া মৃত্যুকালে অভিভূত হয় না, বোধ হারায় না। মৃত্যু কি? না, দেহ স্খলিত হওয়া, লিঙ্গ ও স্থূলের পৃথকতা হওয়া। জ্ঞানীর যখন তাহা হয়, তখন সে তাহা দেখিতে থাকে। অজ্ঞানীর মৃত্যু এক প্রকার ক্লোরোফর্ম্মের অবস্থা। আর যে জ্ঞানী ও যোগী, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করে। দেহত্যাগের সময় তাহার জ্ঞান ত থাকেই—বিশেষতঃ উহা তাহার ইচ্ছামূলক।

সুতরাং অজ্ঞানী লোক যখন জন্মান্তর লাভ করে, তখন নবদেহের সঙ্গে লিঙ্গে নবাকার জড়িতভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি থাকে না। নিদ্রাতে পূর্ব্বস্মৃতি যায় না—কারণ স্থূলদেহ অভিন্ন থাকে বলিয়া লিঙ্গের মৌলিক আকার অখণ্ডিত থাকে। যদিও মৃত্যুও একজাতীয় নিদ্রা বটে, তথাপি ঐ সময় স্থূলদেহের ত্যাগ ও নবীনদেহের গ্রহণ হইয়া যায় বলিয়া পরে নূতন দেহে প্রাচীন দেহের কর্ম্মের স্মৃতি থাকে না।

তবে যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা কর্ম্মবিশেষের ক্ষয়ের জন্য অথবা অন্য কারণে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা জন্ম হইতেই স্মতিশালী থাকেন। তাঁহারা জাতিস্মর হন। তবুও স্থূলদেহে অবিদ্যার প্রভাব এত বেশী যে, জ্ঞানের প্রবলতা না থাকিলে শীঘ্রই বিস্মৃতি আসিবার সম্ভাবনা আছে। উর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া—অবতীর্ণ হইয়া—যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্ট জ্ঞানী বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি রাখিতে পারেন। তবে যদি তাঁহারা

ইচ্ছা করিয়া জ্ঞানকে চাপা দিয়া জন্মগ্রহণ করেন—স্থূল-লীলা আস্বাদনের জন্য—তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

জি—সাধনা দ্বারা জীব যখন চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, যখন সে লিঙ্গের একত্ব ও শুদ্ধরূপ প্রত্যক্ষ করে, যখন সে জ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হয়, যখন সে নিজেকে চিনিতে পারে, তখন তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। প্রত্যেক জীবেরই এক একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। সাধক তখন নিজের ধারাই স্মরণ করে। যুগ-যুগান্তরে কোন্ কোন্ লোকে কোন্ কোন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কেন করিয়াছিল, তখন কি কি করিয়াছিল, কাহার কাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, সব মনে পড়ে। শুধু মনে পড়ে না— সেই সব ব্যাপার ও দৃশ্য আবার সম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। সকল জন্ম, সকল ব্যবহার, সকল পরিচয়—কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত। পূর্ব্বস্মৃতি না জাগা পর্য্যন্ত কর্ম্মরহস্য বুঝা যায় না। আমার ত এইরূপই মনে হয়।

ব—"কর্ম্মণো গহনা গতিঃ"—জ্ঞানী ভিন্ন কর্ম্মতত্ত্ব আর কেহ জানিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ের অনুভূয়মান সুখ, দুঃখ, সম্বন্ধ, পরিচয় রাগ, দ্বেষ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ—কিছুই অহেতুক নহে। যখন পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিতে পারিবে, তখন দেখিতে পাইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু ঘটনা ও ভাবের সহিত এইগুলি কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে জড়িত রহিয়াছে। আজ একজনকে দেখিবামাত্রই তোমার অকারণ প্রীতির বা দ্বেষের উদয় হইল—মনে করিও না, ইহা সত্য-সত্যই অকারণ। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে সব কারণ বুঝিতে পারিবে। আজ একজনে তোমার অপকার করিল—ইহারও কারণ আছে। এক বৎসরের হিসাব যেমন আর এক বৎসরে জের টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সেইপ্রকার এক জন্মের হিসাব আর এক জন্মে চলিয়া যায়—এইরূপ সহস্র সহস্র জন্মের কর্ম্ম জালের ন্যায় জড়িত হইয়া যায়। কোন্ জন্মের বা কোন্ লোকের কৃতকর্ম্ম কোন জন্মে ও কোন্ লোকে ফলদান করিবে, তাহার কি ঠিকানা আছে? চিত্রগুপ্তের খাতা পাঠ করা বড় কঠিন ব্যাপার।

জি—তবে কি আপনি বলতে চান, নূতন কর্ম্ম কিছুই নাই? এই জন্মের প্রতি কর্ম্মেরই মূল যদি পূর্ব্বে থাকে, তবে ত আর নূতন কর্ম্ম কিছুই নাই, বলিতে হয়।

ব—নূতন কর্ম্ম আছে বই কি? তবে কোন্‌টি নূতন কর্ম্ম, আর কোন্‌টি পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ, তাহা বুঝা বড় কঠিন। নূতন বা ক্রিয়মাণ কর্ম্মই কালান্তরে প্রাক্তনরূপে পরিণত হয়।

জি—পূর্ব্বস্মৃতি যখন জাগিয়া উঠে, তখন এই জগতের বহু স্থানই বোধ হয় পরিচিত বলিয়া মনে হয়। বহু লোকের সঙ্গেই যে পরিচয় ও সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝা যায়। সমস্ত বিশ্ব একটি বিরাট পরিবার বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানে যে আত্মভাবের বিস্তার হয়, জগৎ আপন হইয়া যায়—তাহা বেশ ধারণা হইতেছে।

ব—ইহাও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অবস্থা নহে। জ্ঞানের আভাস মাত্র। যখন জ্ঞান আরও এক স্তর উপরে উঠে, তখন সমষ্টি লিঙ্গের সহিত ব্যষ্টি-লিঙ্গের তাদাত্ম্য অনুভূত হয়। প্রতি জীবেরই এক একটি লিঙ্গদেহ আছে। স্থূলদেহে অভিমান থাকা পর্য্যন্ত ঐ লিঙ্গগত একতাবোধ আসে না। বস্তুতঃ, সে অবস্থায় লিঙ্গ বহু বলিয়াই ধরিতে হইবে। পরে আত্মজ্ঞানের সূত্রপাত হইলে লিঙ্গ ও স্থূলে বিবেক বা পার্থক্য হয়। তখন স্থূলের সম্বন্ধ ছাড়াইয়াও লিঙ্গকে দেখিতে পারা যায় বলিয়া লিঙ্গের শুদ্ধতা ও একতাবোধ আসে। এই অবস্থাতেই পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি জাগিতে পারে। অবশ্য, অভিনিবেশ যদি আকারের দিকে না থাকে, তবে না জাগিতেও পারে। তবে জাগিবার যোগ্যতা অবশ্যই হয়। যখন এই জ্ঞানের বিশুদ্ধি অধিকতর হয়, তখন দেখা যায় যে, যে-লিঙ্গকে এক বলিয়া দেখিতাম, সেইরূপ আরও কোটি কোটি লিঙ্গ আছে। প্রত্যেকেই আপন আপন ধারায় বহিয়া যাইতেছে। এইগুলি সব ব্যষ্টি। পরে দেখিতে পাওয়া যায়, এ সব লিঙ্গই একটি বিরাট ব্যাপক সমষ্টি-লিঙ্গের অংশ বা পৃথক্ পৃথক্ আভাস মাত্র। মূলতঃ, সমষ্টি-লিঙ্গই একমাত্র লিঙ্গ। এই অবস্থায় উপনীত হইলে—অর্থাৎ এই সমষ্টি-লিঙ্গে অভিমান হইলে—সমগ্র স্থূল জগৎটি নিজেরই রূপ বলিয়া মনে হয়। যত জীব আছে—মনে হয়, সব আমারই রূপ; নানা জীব এক জীবেরই বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র। সেই এক জীব আমি। যাহা জীবের সঙ্গে জীবের কর্ম্মগত সংঘর্ষ ছিল, এখন আর তাহা সেভাবে দেখা যায় না। বহু জীবই যখন বস্তুতঃ নাই—তখন আর কর্ম্ম কোথায় থাকে? রাগ দ্বেষ কোথায় থাকে? সব আত্মলীলারূপে স্ফূরিত হয়। সুখে আনন্দ, দুঃখে আনন্দ—পাপ নাই, পুণ্য নাই, সর্ব্বত্রই একটি ক্রীড়াশীল স্বাধীন ইচ্ছার আনন্দ-লহর নানা আকারে খেলিতেছে। একমাত্র মূল জীব বহু হইয়া পরস্পরের সঙ্গে খেলিতেছে। এই জীবই ঈশ্বরের জীবশক্তি ও ঈশ্বর এই জীবের স্বকীয় ঐশ্বর্য্য। এই সমষ্টি-লিঙ্গে উপনীত হইলে পরে কারণ দেহকে আশ্রয় করিয়া অভিমান প্রকটিত হয়। তাহাই ঈশ্বরভাব। সেখানে আর বহু নাই। সুতরাং ঈশ্বর এক—তাঁহার জীবশক্তিও এক, উভয়ে নিত্য

ভেদাভেদ-সম্বন্ধে জড়িত আছেন। উভয়ে নিত্য-মিলিত, নিত্য-মিথুন, নিত্যলীলা-মগ্ন। জীবশক্তি এক হইলেও আভাস অনন্ত। ইহাই অনন্ত জীবসঙ্ঘ। আবার প্রত্যেকটি অভাসের অনন্ত আকার—অনন্ত স্থূলদেহ। ইহাই ব্যষ্টি জীবের জন্ম বৈচিত্র্য।

সুতরাং, জীব ঈশ্বরাবস্থায় যাইয়া দেখিতে পায়— সে নিজেই সব হইয়াছে, নিজেই সব সাজিয়া খেলা করিতেছে—"অহং মনুরভবং" ইত্যাদি।

জি—ঈশ্বর "একোহহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" বলিয়া খেলিতেছেন—ইহাই ত সৃষ্টি। লোকে যাহাকে সৃষ্টি বলে, সেটা তাঁহার আত্মলীলা। কিন্তু তিনি কেন খেলেন? কে খেলায়?

ব—শাস্ত্র বলেন—তিনি খেলেন আপন স্বভাবে—"দেবস্যৈব স্বভাবোহয়ম্"। স্বভাবই তাঁহাকে খেলায়—স্বভাবই মূল। তিনি স্বতন্ত্র—তাঁহার স্বভাবই সর্ব্বমূল।

জি— যোগশাস্ত্রে আছে যে, সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংস্কার কি দৃশ্য?

ব—হাঁ, দৃশ্য বই কি? অতীন্দ্রিয় হইলেই কি অদৃশ্য হয়? অতীন্দ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ আছে। প্রজ্ঞার আলোকে সবই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন চিত্ত বা লিঙ্গদেহ সাক্ষাৎকৃত হয়, তখন লিঙ্গদেহস্থিত সংস্কারও দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সংস্কারানুসারে জন্ম ও কর্ম্ম উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়।

জি—জীবের পূর্ব্ব পরিচয় বলিতে কি এই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বুঝিতে হইবে?

ব—না, তা কেন? প্রথমতঃ, জ্ঞানের সঞ্চার হইলে পরে যখন লিঙ্গ-শোধন হইতে থাকে, তখন এই স্মৃতি জাগিতে থাকে বলিয়া ইহা প্রথমাবস্থার পরিচয়। বিশুদ্ধ লিঙ্গদেহ প্রতিষ্ঠার পরে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে এই লিঙ্গদেহ গ্রহণই জন্ম। ইহা বস্তুতঃ একবার হয় বলিয়া তখন জন্মও এক ভিন্ন অধিক মনে হয় না। লিঙ্গদেহ গ্রহণ হইতে লিঙ্গ ত্যাগ পর্য্যন্ত জীবের জীবন—আয়ুঃ। ঐ দেহগ্রহণই জন্ম, ঐ দেহত্যাগই মৃত্যু। এ জন্মও একবার মাত্র, এ মৃত্যুও তাই। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সেইজন্য জীবের একাধিক জন্ম—জন্মান্তর-বাদ—স্বীকৃত হয় নাই। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জন্ম বলি, অর্থাৎ লিঙ্গের সহিত স্থূলের সম্বন্ধ, তাহা লিঙ্গ শুদ্ধ হইলে আর জন্ম বলিয়া মনে হয় না। লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইলে অভিমান লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাই তখন লিঙ্গই আত্মরূপে প্রতিভাত হয়— যেমন এখন স্থূলদেহে আত্মরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রকার। সেইজন্য সহস্রবার স্থূল সম্বন্ধ

হইলেও উহা জন্ম বলিয়া বিবেচিত হয় না। যেমন একটি বস্ত্র গ্রহণ করিলে জন্ম হয় না, ছাড়িলেও মৃত্যু হয় না—তদ্রূপ স্থূলের গ্রহণ ও ত্যাগ বস্তুতঃ জন্ম ও মৃত্যু নহে। সকল জীবের একবারই জন্ম হয়, একবারই মরণ হয়।

ইহার পরে অন্যান্য লিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। তদনন্তর সমষ্টি-লিঙ্গ দর্শন হয় ও তাহাকে আশ্রয় করিয়া অভিমান হয়। তখন জানা যায় যে, সব লিঙ্গ ঐ মহালিঙ্গেরই অংশ। এই অবস্থায় নিজেকে বিশ্বব্যাপকরূপে জানা যায়। ইহাই জীবের স্বরূপ বলিতে পার। একদিকে যিনি নিত্য-ঈশ্বর, অন্যদিকে তিনিই নিত্য-জীব —অথচ বস্তুতঃ তিনি শুদ্ধচৈতন্য মাত্র।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বরূপসিদ্ধি—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিভূতি

জিজ্ঞাসু—কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয়, একথা আপনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, কিন্তু যাহাকে প্রচলিত ভাষায় ঐশ্বর্য্য বা যোগবিভূতি বলে, তাহাও কি কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়? অনেকে বলেন, বিভূতি জ্ঞানের পরিপন্থী, সুতরাং উহা হেয়। জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান এবং মুক্তি। বিভূতি প্রকাশিত হউক বা না-ই হউক, তাহাতে জ্ঞান বা মুক্তির বাধা জন্মাইতে পারে না।

বক্তা—বৎস, যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে যোগ-বিভূতি বলে, তাহা যোগ-প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে প্রকাশিতই হয় না। লৌহ দহন-সামর্থ্য লাভ করিলে ঐ শক্তিকে তাহার বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। বিভূতি পরমাত্মার স্বাভাবিক শক্তি-স্বরূপ। যখন আবরণ কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে জীব নিজের পরিচয় কিছু কিছু প্রাপ্ত হয় ও পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়, তখন হইতেই তাহার শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বিভূতি আগন্তুক ধর্ম্ম নহে, সুতরাং তাহার জন্য পৃথক্ প্রয়াস করিতে হইবে। ইহা আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় না—চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আপনিই জাগে। রোগ কাটিয়া গেলে যেমন দেহে বল-সঞ্চার হয় এবং ঐ বল যেমন স্বাস্থ্যের লক্ষণ, সেই প্রকার অবিদ্যা কাটিয়া গেলে আত্মশক্তির স্ফূরণ হয় এবং ইহা অবিদ্যা-নিবৃত্তির লক্ষণ।

জি—পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ব্যুত্থানাবস্থায় যাহা সিদ্ধি, নিরোধ অবস্থার পক্ষে তাহা অন্তরায়স্বরূপ। সিদ্ধি যদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে তাহাকে অন্তরায় বলা হইত না। পতঞ্জলি এবং তদনুযায়ী যোগিসম্প্রদায়ের মতে বিভূতি সকল নির্ম্মল আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে উদিত হয়। উহারা জ্ঞান ও কৈবল্যের প্রতিবন্ধক।

ব—বৎস আত্মা যদি স্বভাবতঃ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন না হইতেন, তাহা হইলে তাহাতে শক্তির বিকাশ অন্তরায়-রূপে পরিগণিত হইতে পারিত। অগ্নির সঙ্গে দাহিকা শক্তির যে সম্বন্ধ, প্রদীপের সঙ্গে প্রভার যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত আত্মশক্তিরও সেই প্রকার সম্বন্ধ জানিবে। আত্মা সর্ব্বশক্তির আশ্রয়-স্বরূপ—নিখিল শক্তির স্ফূরণ আত্মা হইতেই হইয়া থাকে, এবং উহাদের লয়-স্থানও

আত্মাই। দেবলোক, গন্ধর্বলোক, নরলোক এবং অন্যান্য যে-কোন লোকে যে-কোন শক্তি দেখিতে পাও, সবই আত্মারই শক্তি, জানিও। আত্মার অনন্তশক্তি আধার-ভেদে অভিমান ও প্রকাশের তারতম্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শক্তির পরিচ্ছন্ন প্রকাশই জড়ত্বের নিদর্শন। জীবাত্মা যতদিন শক্তি-দরিদ্র থাকে, ততদিনই উহার বন্ধন ও জড়ত্বের আবেশ জাগরূক থাকে—অভিমানের সত্তাও ততদিন পর্য্যন্ত। কিন্তু যখন অভিমানরূপ গণ্ডী অতিক্রান্ত হয়, জড়ভাবের আচ্ছাদন অপগত হয়, তখন বিশুদ্ধ আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নিখিল শক্তি ক্রমশঃ অনাবৃতভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই জ্ঞানলাভ বা শক্তি-প্রকাশের তিনটি অবস্থা আছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য আমি তাহাকে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি ও অতিসিদ্ধি এই তিন প্রকার নামকরণ করিতে ইচ্ছা করি। সিদ্ধি অবস্থায় শক্তি দ্বৈতভাবে উপলব্ধ হয়—ইহা জ্ঞেয়, ভোগ্য বা দৃশ্যরূপে আত্মায় ফুটিয়া উঠে। আত্মার সহিত ইহার অভিন্নতা-সম্পাদন সাধনার পরিপাকে দ্বিতীয় অবস্থায় হইয়া থাকে। তখন অনন্ত শক্তির অন্তর্গত কোন শক্তিরই বাহ্য স্ফূর্ত্তি থাকে না, শক্তিপুঞ্জ তখন আত্মাতে অন্তর্লীনভাবে বিদ্যমান থাকে, আত্মা হইতে পৃথক্ বা দৃশ্যরূপে তাহাদের সত্তা থাকে না। তখন একমাত্র আত্মা আপনাতে আপনি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে থাকেন—ইহাকেই আমি মহাসিদ্ধি বলি। তোমরা হয় ত ইহাকে কৈবল্য বা অদ্বৈত-স্থিতি বা অন্য কোন নামে অভিহিত করিবে। কিন্তু ইহার পরেও অবস্থা আছে। এই অদ্বৈত অবস্থা হইতে ইচ্ছানুসারে শক্তির বহিরুন্মেষ অথবা দ্বৈতের উদয় অতিসিদ্ধির লক্ষণ। একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি কথাটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর, তোমার ভোগ্য অন্ন যখন তণ্ডুলাদিরূপে বর্ত্তমান ছিল, তখন উহার অপক্ক বা অসিদ্ধ অবস্থা। আগুন জ্বালাইয়া তাহার সাহায্যে জল প্রভৃতি উপকরণ অবলম্বন করিয়া ঐ তণ্ডুলকে পরিপক্ক করা হইল এবং উহা অন্নরূপে পরিণত হইল—ইহা সিদ্ধাবস্থার নিদর্শন। এই অবস্থায় ভোগ্য বস্তু ভোগ্যরূপে অথচ ভোক্তা হইতে পৃথগভাবে, বর্ত্তমান থাকে। ইহার পর যখন তুমি ঐ অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলে তখন অন্নেন পৃথক্ সত্তা আর থাকিল না—উহা তোমাতে মিশিয়া তোমারই দেহের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, দেহ হইতে অন্নের পৃথক্ অস্তিত্ব আর থাকিল না। মহাসিদ্ধির অবস্থা কতকটা এইরূপ। দীর্ঘকাল পরেও যদি তুমি আপন দেহ হইতে ঐ অন্ন—এমন কি, ঐ তণ্ডুল পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিতে পার, তবে উহাকে

অতিসিদ্ধির উদাহরণস্বরূপ মনে করিতে পার।

বৎস, ব্যুত্থান এবং নিরোধকে সমান করিয়া উভয়কে সমরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে অতিসিদ্ধি অবস্থার উদয় হয়। যোগী কোন অবস্থারই দাস নহেন। দ্বৈত অথবা অদ্বৈত কোন অবস্থাতেই তিনি বদ্ধ হন না—অথচ তিনি সর্ব্ব অবস্থারই দ্রষ্টা ও উপলব্ধি কর্ত্তা।

আমি যে-ভাবে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি এবং অতিসিদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা কবিলাম, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে একটি অবস্থাই ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে হইতে চরমাবস্থা পর্য্যন্ত উপনীত হয়। কিন্তু যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কিন্তু মহাসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তিনি দ্বৈত অবস্থায় বর্ত্তমান। এ অবস্থায় উপাস্য বা উপাসকের ভেদ বর্ত্তমান থাকে। ইহাকে লৌকিক ও অসিদ্ধ সাধকের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইও না। যে অসিদ্ধ, তাহার সাধ্য অথবা উপাস্য বস্তুর বিকাশই হয় নাই। কিন্তু আমি যে সিদ্ধ অবস্থার কথা বলিতেছি, তাহাতে উপাস্য অথবা ধ্যেয় বস্তু সিদ্ধ সাধকের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়—সাধকের দৃষ্টিতে তখন কোনও আবরণ থাকে না। কিন্তু উপাস্য বস্তুর প্রকাশ হইলেও উপাসকের সহিত তাহা অভেদাপ্রাপ্ত হয়না—তখন উপাস্য এবং উপাসকের ভেদ পরিস্ফুটরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ এই অবস্থাকেই ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ইহার পরের অবস্থায় এই ভেদ আর থাকে না, তখন উপাস্য এবং উপাসক পরস্পর মিলিত হইয়া এক অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়। তখন যে স্বয়ংপ্রকাশ সত্তা বিরাজমান থাকেন, তাঁহাকে উপাস্য কিম্বা উপাসক কিছুই বলা চলে না। ইহাই মহাসিদ্ধির অবস্থা। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই অদ্বৈত অবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা এবং ইহার পরে আর কোনও অবস্থা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইচ্ছার স্ফুরণমাত্র এই অবস্থা হইতে যদি পূর্ব্ববৎ ভেদাবস্থা জাগান যায় এবং ইচ্ছামাত্রই উহাকে নিরুদ্ধ করিয়া অদ্বৈত অবস্থার প্রাদুর্ভাব করান যায়, তাহা হইলে উহাকে যোগের অতিসিদ্ধ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি ব্যুত্থান এবং নিরোধ উভয়ের অতীত, যিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়ের অতীত এবং যিনি সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয় অবস্থার অতীত, তিনি সর্বাবস্থায় সর্বভাবে অসঙ্গ স্বরূপেই বিদ্যমান থাকেন। নিজের এই অবস্থার উপলব্ধি করাই অতিসিদ্ধির লক্ষণ। অতিসিদ্ধ যোগী ক্রিয়াশীল হইয়াও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ব্বদা কর্ম্মপরায়ণ। কিছুতেই তাঁহার বন্ধন নাই। সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত

বলাও ভাষার অপপ্রয়োগ মাত্র। ঈশ্বরের সংকল্পে যখন সৃষ্টির উদয় হয়, তখন কি তুমি মনে কর, ঈশ্বর আবদ্ধ হইয়া পড়েন? তুমি কি মনে কর, ঈশ্বরের সত্তা হইতে যাহা প্রবাহক্রমে বহির্গত হয় তাহার দ্বারা ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হন? এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যখন তিনি কোনও শক্তির স্ফূরণ করেন, তখন উহা তাঁহা হইতে যেন কতকটা পৃথক্‌ভাবেই প্রকাশমান হয়। কিন্তু বাস্তবিক পার্থক্য কখনই হয় না। তদ্রূপ আবার যখন উহাকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া আত্মস্বরূপে বিলীন করেন, তখন উহা তাঁহার সঙ্গে অভিন্নবৎ বর্ত্তমান থাকে। ভেদের সময় ভেদও যেমন অলীক, অভেদ অবস্থায় অভেদও তেমনি অলীক—অথচ দুই-ই সত্য।

এবার তোমার প্রশ্নের সমাধান বুঝিতে পারিবে। সিদ্ধি ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা দৃশ্যরূপে আত্মা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত থাকে। ভেদদৃষ্টি থাকিবার জন্য ঐ অবস্থায় আসক্তি কিম্বা প্রলোভন অথবা অহঙ্কার অত্যন্তসূক্ষ্ম আকারে থাকিবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ দ্বৈতভাব থাকা পর্য্যন্ত অভয়-পদের প্রাপ্তি হইতেই পারে না। তুমি সিদ্ধিকে যে অন্তরায়রূপে গণনা করার কথা বলিয়াছ, তাহা এই অবস্থায় সম্পূর্ণ সত্য, কারণ ঐ সকল শক্তি আত্মশক্তিরূপে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা অভেদজ্ঞান ও তন্মুলক উপশম প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কিন্তু যখন ঐ সকল শক্তি আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যে আত্মশক্তিরূপে পরিণত হইয়া যায়, উহাদের পৃথক্ অস্তিত্ববোধ আর থাকে না, উহাদিগকে আত্মারই স্বাভাবিক স্ফূরণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, শুধু তাহাই নহে—যখন আত্মস্বরূপে উহারা সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তাহার পর মহাশক্তির কৃপায় পূর্ববর্ণিত অতিশক্তির অবস্থার উদয়ে আবার যখন যোগীর ইচ্ছানুসারে প্রকটিত হয়, তখন উহাদের অন্তরায়ত্ব থাকে না। বস্তুতঃ দ্বৈত এবং অদ্বৈত বিকল্প হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে স্বাতন্ত্র্যরূপা নির্ব্বিকল্পসিদ্ধি আয়ত্ত হয় না।

জি—আপনি এই যে অতিসিদ্ধি নামক অবস্থার কথা বর্ণনা করিলেন, ইহাই কি সিদ্ধির পূর্ণরূপ? অথবা ইহার উপরেও শ্রেষ্ঠ অবস্থা আছে?

ব—বৎস, ইহা সিদ্ধির পূর্ণরূপ বটে, কিন্তু পূর্ণতর অথবা পূর্ণতম রূপ নহে। কারণ, এই অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান থাকে। ইচ্ছা থাকিলেই অভাব থাকিবেই কারণ, যেখানে অভাব নাই সেখানে ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না। কিন্তু অভাব থাকিলেও এই অবস্থার অভাব প্রচলিত অভাবের ন্যায় নহে।

তোমরা জগতে যে প্রকার অভাব দেখিতে পাও, তাহা হইতে এই অবস্থার অভাবের প্রভেদ এই যে, ইহা স্বভাবের সঙ্গে যোগকালে উদিত হয় বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই অভাব-নিবৃত্তিকেই শাস্ত্রে পরমানন্দের আস্বাদন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অভাব-বোধই বিরহ এবং উহার নিবৃত্তিই মিলন। স্বভাবের সম্বন্ধে এই মিলন ও বিরহ চক্রবর্ত্তক্রমে নিত্যলীলারূপে বিরাজ করিতেছে। ইচ্ছার উদয় ভিন্ন আনন্দের আস্বাদন হইতেই পারে না। যে তৃষ্ণার্ত্ত নহে সে জলের আস্বাদন কি করিয়া বুঝিবে? শুধু জলে মাধুর্য্য থাকিলেই উহার অনুভব হয় না—উহার জন্য পিপাসা থাকা চাই। সেইরূপ, স্বভাবরূপ অমৃত ভাণ্ডার বর্ত্তমান থাকিলেও যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষা না জাগে এবং উহার সঙ্গে সংযোগ না হয়, ততক্ষণ অমৃতের আস্বাদন পাইবার কোনই উপায় নাই। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে অমৃত-হ্রদে ডুবিয়া গেলেও তাহার আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে না। আমি অতিসিদ্ধি নামে যে অবস্থা সম্বন্ধে তোমাকে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহা মহাশক্তির চরণ স্পর্শ জনিত পরমানন্দ উপলব্ধির অবস্থা মাত্র। ইচ্ছাশক্তি এইখান হইতেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় যেমন অভাব জাগে, তেমনিই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিবৃত্তি হয়। স্বভাবের সঙ্গে যোগের এমনিই মহিমা। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, অভাব যখন নিবৃত্তই হয়, তখন উহার জাগিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর তোমাকে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার একমাত্র প্রয়োজন আনন্দের আস্বাদন। মা সন্তানকে এই কৌশলে নিজের অপার মাধুরী উপভোগ করাইয়া থাকেন। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এইখানে করিবার প্রয়োজন নাই, উহা সময়ান্তরে হইতে পারিবে।

জি—আপনার কথা হইতে বুঝিতে পারিলাম, এই অতিসিদ্ধি অবস্থাই ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা। এই আনন্দময় অবস্থার পরের অবস্থা কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ব—যখন আনন্দেরও আর স্ফুরণ হয় না, তখনকার অবস্থাকে ঠিক আনন্দময় বলিয়া নিরূপণ করা চলে না। উহা আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়েরই অতীত। জগন্মাতার কোলে উঠিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার পর আনন্দও কাটিয়া গেলে এই দ্বন্দ্বাতীত ও মোহের অতীত অবস্থার স্থিতি হয়। তোমরা কি বলিবে জানি না—আমি কিন্তু ইহা বর্ণনার দ্বারা বুঝাইতে পারিব না। ইহার বর্ণনা সম্ভবপর নহে।

জি—বাবা, আপনি অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। আমাকে নিম্নভূমির অনেক কথা

জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আপনি একটু নামিয়া আসিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ দিন।

আচ্ছা, আপনি যে সিদ্ধির বর্ণনা করিলেন, ইহা কি এক, অথবা বহু। সিদ্ধির সংখ্যা কত। পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধি আয়ত্ত করিবার উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ উপায় আছে কি?

ব—সিদ্ধি বাস্তবিক পক্ষে এক ও অখণ্ড, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিভক্তবৎ হইয়া তাহা লোকের নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকে। আমি যাহাকে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি এবং অতিসিদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকে প্রকারান্তরে ক্রিয়াসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি এবং ইচ্ছাসিদ্ধি বলিয়া মনে করিতে পার। তোমাদের পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে যে সকল খণ্ডসিদ্ধির উল্লেখ আছে, তাহার অনেকগুলি এই ক্রিয়াসিদ্ধিরই অন্তর্গত। কতকগুলিকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধিও বলা যাইতে পারে। নিজের উপাদান বিশুদ্ধ করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহাকে নানাভাবে কার্য্য করাইতে পারা যায়। বলিতে কি, পাতঞ্জলে যে কয়টি সিদ্ধির উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক সিদ্ধি ইচ্ছামাত্রই প্রকাশ করা যাইতে পারে। যাহার উপাদান বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহাতে কিছুই বাহাদুরী নাই। যে ভাল করিয়া বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের প্রক্রিয়া অবগত আছে, তাহাকে যেমন শব্দের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করিতে বেগ পাইতে হয় না, ঠিক সেই প্রকার যিনি শুদ্ধসত্ত্বরূপা শক্তির তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি এই স্থূলজগতে না করিতে পারেন এমন কোন কার্য্য নাই। ভূত-জয়, ইন্দ্রিয়-জয় এবং বিবিধ সংযম হইতে যে সকল সিদ্ধি আবির্ভূত হয়, শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত যোগীর সঙ্গে তাহা অকিঞ্চিৎকর। অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাপ্তি, যত্রকামাবসায়িত্ব, —এই অষ্টসিদ্ধি ব্যতিরেকে আকাশগমন, পরকায়া-প্রবেশ, পরচিত্ত-জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি এবং আরও বহুসিদ্ধির কথা যোগশাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধি পৃথক্ ভাবে কোন সিদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিতে হয় না। যোগী যোগমার্গে অগ্রসর হইলে অবস্থা বিশেষে সিদ্ধি সকল আপনিই উদিত হয়,—যে লঘুচিত্তে সিদ্ধির প্রার্থনা করে, সে কখনই প্রকৃত যোগ-সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

জি—আকাশ-গমন কি প্রকারে স্থূলদেহে সম্ভবপর হয়? দেহ যতক্ষণ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন, ততক্ষণ শূন্যে উত্থান ও শূন্যপথে গমনাগমন কি প্রকারে

হইতে পারে? আর যোগীর পক্ষে শূন্যগমনের আবশ্যকতাই বা কি?

ব—দেহের উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া নবকলেবর উৎপন্ন হইলে, ঐ দেহ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এবং সঙ্কোচবিকাশশীল হইয়া থাকে। শূন্যে উঠিবার সময় স্থূল সংস্কারসমূহ ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়। যতদূর পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব, ততদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানের বিকাশ থাকে, পরে আরও উপরে উঠিয়া গেলে জ্ঞান ও অন্যান্য বৃত্তি নিস্তব্ধ হইয়া যায়। অপক্ক দেহ লইয়া, ঊর্দ্ধগমন চলে না, উপরে উঠিতে উঠিতে দেহের অস্থি মাংস প্রভৃতি একাকার হইয়া পিণ্ডীভূত হয়, সমস্ত শরীরটি কোমল হইয়া তরল—এমন কি বাষ্পময়—অবস্থা ধারণ করে। আকাশমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রাদি সর্ব্বত্রই স্থূলদেহে যাতায়াত করা যায়। যে স্থানে যাইতে হয়, সেই স্থানের পরমাণু আকর্ষণ করিয়া স্থূলদেহের উপাদান গড়িয়া লইতে হয়। মৎস্য যেমন জল মধ্যে সন্তরণ করে, যোগীর স্থূলদেহ সেই প্রকার এই বিশাল বায়ুমণ্ডলে সন্তরণ করিতে করিতে তীব্রবেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। শূন্যপথে চলিবার সময় শুধু গম্য স্থানটি একাগ্রভাবে স্মরণ করিতে হয়—তাহা হইলে স্বভাবের নিয়মে সরলরেখা অবলম্বনে দেহ আপনিই সেইদিকে অগ্রসর হইতে থাকে, পথের পরিচয় বা দিঙ-নির্ণয়ের আবশ্যকতা হয় না। উড়িয়া যাইবার সময় পৃথিবীর কোন স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইলে তৎক্ষণাৎ মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া হইয়া হঠাৎ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, —প্রথম অভ্যাসকালে এই প্রকার বিপদের আশঙ্কা খুবই থাকে। আমি একবার গুস্করায় একটি বাদাম গাছের উপর পড়িয়া গিয়াছিলাম—শরীরে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়াছিল। আর একবার একটি ছাদে পড়িয়া গিয়াছিলাম—অবশ্য ইহা প্রথম সময়ের কথা। স্থূলদেহে শূন্যমার্গে পৃথিবীর কোন স্থানে যাইতে হইলে একটু বেশী পরিমাণ উপরে উঠিয়া যাওয়াই সঙ্গত। তাহা হইলে কোন প্রতিবন্ধক বাধা দিতে পারে না। শূন্য পথে চলিবার বাধা অনেক প্রকার। উচ্চ পর্ব্বতাদি পথে থাকিলে দেহ স্বাভাবিক আকর্ষণে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম বায়ু-মণ্ডলে যে গভীর আবর্ত্ত আছে, তাহাতে আটকাইয়া যাইবার আশঙ্কা খুব অধিক। ইহা ছাড়া এক এক স্থানের প্রাকৃতিক আকর্ষণ এত বেশী যে, তাহার টানে পথভ্রষ্ট হইয়া ভ্রান্ত হইবার ভয় আছে। তীব্রভাবে বল প্রয়োগ করিয়া ও বিশেষ সংযমের সহিত ঐ সকল সঙ্কট স্থান উত্তীর্ণ হইতে হয়। অনেক সময় মেঘের ন্যায় বাতাবরণে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া চলিতে হয়—সেই অবস্থায় যোগীর গতি কেহই

দেখিতে পায় না। তবে যোগী ইচ্ছা করিলে লোককে দেখাইয়াও চলিতে পারেন। যদি অন্ধকার রাত্রে বেশী ঊর্দ্ধে ও অত্যন্ত বেগের সহিত গমন করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে দেখিলে মনে হইবে, যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

জি—আকাশ-গমনকালে কি যোগীর বাহ্যজ্ঞান থাকে?

ব—উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে বাহ্যজ্ঞান রাখা যাইতেও পারে। তবে বাহ্যজ্ঞান রাখিয়া তীব্রবেগে চলা যায় না, চলিতে গেলে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। দেহসিদ্ধি করিয়া সেই দেহকে গম্যস্থানের উপযোগী উপাদানে নির্ম্মান করিতে হয়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন এই পৃথিবীতে যেভাবে দেহের সন্নিবেশ দেখিতে পাও, তখন তাহা ঠিক সেইরূপ থাকে না। নিজের লক্ষ্য ভিন্ন অন্যকোন বিশেষ চিন্তা বা ভাব তাহাতে উদিত হইলেই উহা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা। চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ না হইলে ইহা সম্ভবপর নহে। চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক বা অন্যান্য লোক—যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তদনুসারে দেহকে গড়িয়া লইতে হয়। যে দেহে চন্দ্রালোকে যাওয়া যায়, সেই দেহে সূর্য্যলোকে গমন সম্ভবপর হয় না। যাইতে চেষ্টা করিলে ঐ দেহের ধ্বংস অনিবার্য্য। স্বর্গের দেহ, নরকের দেহ, লোক-লোকান্তরের দেহ—সবই পৃথক্ পৃথক্। সর্ব্বত্রই পরমাণু ও তাহার সংস্থানের তারতম্য আছে। মোট কথা, মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত শক্তির বিকাশ করিয়া মাধ্যাকর্ষণকে অভিভূত করিতে না পারিলে ব্যোমপথে বিচরণের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। জীবের নীচ-ভাব সকল মাধ্যাকর্ষণ হইতে ফুটিয়া উঠে। স্থূল বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বর্ত্তমান, পার্থিব বাসনা ও কামনাদির ছায়া ঘেরিয়া রহিয়াছে। মৃত্যুর পরেও জীব এই সকল বাসনাতে জড়িত থাকে বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্থূল বায়ুর সীমা লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মল নভোরাজ্যে বিচরণ করিবার সামর্থ্য না হইলে মৃত্যুকে জয় করিয়া জন্মের অতীত শুদ্ধ দশা প্রাপ্ত হওয়ার আশা নাই। স্থূল বায়ুচক্রের ঊর্দ্ধে অতি মধুর, অতি স্নিগ্ধ, অতি লঘু, সুশীতল আনন্দময় বায়ুর লহর খেলিতেছে। সেই বায়ুর লহরে লহরে যোগী উঠিয়া যান। তখন বিভিন্ন জাগতিক পদার্থের স্মৃতি থাকে না—রাখিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। তবে চেষ্টা করিলে তাহাও পারা যায়। তবে নাভিধৌতিতে অভ্যস্ত না হইলে নিজের সর্বদা সজাগ রাখিয়া প্রবল শক্তির মধ্যে সঞ্চরণ করা যায় না।

জি—বাবা, বুদ্ধদেব, মুসা, খ্রীষ্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মাগণ সকলেই শূন্যপথে সঞ্চরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু এ খেচরী সিদ্ধির আবশ্যকতা কি? ইহা না হইলে কি যোগপথে উন্নতি করা যায় না?

ব—যোগমার্গে উন্নতি করিলে এ ক্ষমতার বিকাশ হইবেই। ইহা বায়ু ও ব্যোম-তত্ত্বের সিদ্ধি। যোগীকে একটি একটি করিয়া সকল তত্ত্বই আয়ত্ত করিতে হয়—তবে ত সেই নিরাবরণ চিদাকাশে অবস্থান ও সঞ্চরণ সম্ভবপর হয়। বৎস, কঠিন সাধনা ভিন্ন যোগী হওয়া যায় না।

জি—ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে প্রবেশ পূর্ব্বক সহস্রদল কমলের কর্ণিকার মধ্যস্থিত সুধাবর্ষী চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে আপ্লুত হইয়া চিদানন্দময় স্বরূপে রসধারা পান করাই, চক্রভেদপরায়ণ যোগীর লক্ষ্য। আকাশগমনাদি সিদ্ধি লাভ না করিলেও ত ইহা হইতে পারে?

ব—বৎস, নাভির সহিত সহস্রবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নাভিক্রিয়াতে পরিপক্ক না হইলে সহস্রারের প্রবল তেজরাশির মধ্যে অভিভূত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। আকাশ-গমনের ক্ষমতা নাভিক্রিয়া-সিদ্ধির লক্ষণ। কুণ্ডলিনীকে চেতন করিতে হইলে নাভিচক্রে যে ব্রহ্মগ্রন্থি আছে, তাহার উন্মোচন করিতে হয়—পরে বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থিরও উন্মোচন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

জি—ইচ্ছাশক্তি এবং অন্যান্য যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে একটি একটি করিয়া অনেক বিষয় জানিবার আছে। দেহতত্ত্ব, নাড়ীচক্রের স্বরূপ, সৃষ্টি-রহস্য, বিজ্ঞান-রহস্য—অনেক বিষয়ের আলোচনাই এখন বাকী রহিয়া গেল।

ব—যোগ এবং সূর্য্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার ইহা অবকাশ নহে। ঐ সকল তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য। তবে অবকাশ অনুসারে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সাধন-তত্ত্বের সমালোচনা-উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে যোগসম্বন্ধে অতি সামান্য দু-একটি কথা যাহা বলিয়াছি, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট। জগদম্বার ইচ্ছা হইলে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শুধু শ্রবণ করিয়া এই সকল গুহ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ হয় না—অবিরাম পরিশ্রম করিয়া ইহা উপলব্ধি করিতে হয়। গ্রন্থাদিতে যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম কিম্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ দেখিতে পাও, তাহা অত্যন্ত অল্প। তাহা হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। ষট্‌চক্রের চিত্র এবং বিবরণ আজকাল ঘাটে-পথে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু

যাঁহারা এই সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মাত্র। চক্রাদির স্বরূপ এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান কিছুমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সময়ের এমনি প্রভাব যে, এই সকল ভ্রান্ত শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য সরল এবং স্বাভাবিক সাধন মার্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেকটি চক্র প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারা যায়—উহার বর্ণ, দল, বীজ, শক্তি, ক্রিয়া—সবই প্রত্যক্ষগোচর। যিনি চক্রভেদ করিয়া মাতৃকামণ্ডলীর অধিষ্ঠাতৃরূপে সহস্রারে অবস্থান করেন, তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ—শক্তি তাঁহার বশবর্ত্তিনী। বস্তুতঃ, মহাশক্তির কৃপার আবেশপ্রাপ্ত না হইলে স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র অতিক্রম করিয়া অনন্ত এবং অতল চৈতন্য-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না। দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় অবয়বকে যোগরূপ মন্থনশক্তির দ্বারা মথিত করিয়া অভিন্ন অখণ্ড, অচ্ছেদ্য পিণ্ডরূপে পরিণত করিতে না পারিলে সাধনের উচ্চতর ভূমিতে আরোহন করিবার চেষ্টা করা বামনের চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শের প্রয়াসের অনুরূপ। যোগীর স্থূল শরীর, লিঙ্গ শরীর এবং কারণ শরীর চিন্ময় সিদ্ধশরীর রূপে পরিণত হয়। এই জন্য যোগীর স্থূল দেহ সাধারণ লোকের স্থূল দেহ হইতে বিলক্ষণ। যোগীর লিঙ্গদেহ এবং কারণ দেহেও সেই প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। বাস্তবিক পক্ষে যাহাকে তোমরা স্থূল লিঙ্গ ও কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, যোগীর নিকট তাহা অভিন্ন ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য যোগদেহ দ্বারা প্রয়োজন অনুসারে স্থূল অথবা লিঙ্গ, অথবা কারণ, সকল অবস্থারই কার্য্য হইয়া থাকে। ভগবান্ যেমন 'কুর্ব্বন্নপি ন করোতি', অর্থাৎ সমস্ত কার্য্য করিয়াও নিষ্ক্রিয় থাকেন, যোগীও তেমনিই স্থূলদেহ প্রভৃতির কার্য্য করিয়াও ঐ সকল দেহের দ্বারা আবদ্ধ হন না। যোগী ইচ্ছা করিলেই প্রাচীর প্রভৃতি ভেদ করিয়া চলিতে পারেন। সাধারণ স্থূল দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাচীরের দ্বারা অবরুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে স্থূল কোষ ত্যাগ করিয়া লিঙ্গ দেহে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবাধে পর্য্যটন করিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিও, যোগীর লিঙ্গ শরীর বাস্তবিক লিঙ্গ-শরীর নহে—উহা একটি আভাস মাত্র। যিনি প্রকৃত যোগী; তিনি সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত থাকেন বলিয়া যে কোনও স্থানে মুহূর্তের মধ্যে আবির্ভূত হইতে পারেন।

যাহা হউক এই সব বিষয় অধিক বলিবার এখন প্রয়োজন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-সমর্পণ—সন্ন্যাস।

জিজ্ঞাসু—বাবা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিভূতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে শুনিব। আপাততঃ আমার দু একটি প্রশ্নের সমাধান হইলেই আজিকার জন্য বিশ্রাম করিব। শুনিতে পাই, ত্যাগ বা সন্ন্যাস ভিন্ন না কি মুক্তি হয় না। যদি আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসের আবশ্যকতা কি? কারণ, আত্মজ্ঞান ত চিত্তশুদ্ধি ও গুরু-কৃপা হইলে যে কোন অবস্থাতেই হইতে পারে। তাহাতে এক মাত্র সন্ন্যাসীর অধিকার হইতে পারে না।

বক্তা—বৎস, সন্ন্যাস কি? সম্যক্ প্রকার ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। কি ত্যাগ করিবে? কেন ত্যাগ করিবে? ত্যাগের ফলাফল কিছু আছে কি? এ সব বিচার্য্য প্রশ্ন। দেখ, যাহা তোমার বস্তু নয়, তাহা তুমি ত্যাগ করিতে পার না—কিন্তু কি বস্তু তোমার আপনার, তাহা ভাবিয়া দেখ। যাহা তোমার নিজের হইবে, তাহার উপর তোমার স্বামিত্ব বা অধিকার থাকিবে। এ জগতের কোন্ বস্তুর উপর তোমার তেমন অধিকার নাই। এমন কি, এত যে ঘনিষ্ঠ দেহ, —যাহার সহিত তুমি জড়িত হইয়া আছ, —যাহাকে তুমি আপনার বলিয়া জান, — যাহাকে তুমি ভ্রান্তিবশতঃ নিজের স্বরূপ বলিয়াই মনে কর, তাহাও তোমার আপনার নহে। তোমার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে তাহা চালিত হয় না। তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে চালিত হয়—তোমার ইচ্ছা এখনও এত বিশুদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হয় নাই যে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া নিজের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। তোমার দেহও বস্তুতঃ তোমার আপন নহে। ইচ্ছা মাত্র দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করা তোমার আয়ত্ত নহে। ইচ্ছা করিলে তুমি দেহকে ছোট বড় হাল্কা বা অদৃশ্য করিতে পার না, তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পার নাই, দেহকে অধীন করিতে পার নাই—এ দেহ লইয়া স্বামিত্বের অহঙ্কার করা তোমার সাজে না। মনঃ সম্বন্ধেও সেই কথা। জগতের অন্যান্য সকল বস্তুই এই দেহ, মনঃ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার সহিত সম্বন্ধ। যদি তুমি দেহাদির স্বামীই না হইতে পারিলে, তবে জগতের কোন্ জিনিষটিকে তুমি আপন বলিতে পারিবে? আসল কথা, বস্তুতঃ তোমার নিজস্ব বলিতে সত্য

সত্যই কিছুই নাই। তুমি আবার কি ত্যাগ করিবে?

জি—তাহা হইলে কি সব আপনার করিয়া লইতে হইবে? জগতের যাবতীয় বস্তু—দেহ, মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, সব জয় করিয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে? তবে কি সব জিনিষের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে আর ত্যাগ করিব কেন? আর পরিশেষে ত্যাগ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অর্জ্জন করার প্রয়োজন কি? ইহা কি শুধু ব্যর্থ শ্রম নহে?

ব—না। ব্যর্থ শ্রম নহে। ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ ভোগের অধিকার জন্মে না। আবার ভোগাধিকার না থাকিলে ত্যাগের অধিকার হয় না। যাহারা অমৃত-পিপাসু, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে—"ত্যাগেনৈকেন দেবা অমৃতত্বমানশুঃ"। ত্যাগই অমরত্ব লাভের একমাত্র পথ। ত্যাগরূপ যজ্ঞ ভিন্ন অমৃত বা সুধার প্রাপ্তি দুর্ঘট। ত্যাগাত্মক সোপানে আরোহন করিয়াই দিব্য ভূমিতে যাইতে হয়। ঐ দিব্যাবস্থায় ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় হইয়া যায়।

ত্যাগ করিবার জন্যই অর্জ্জন আবশ্যক। অর্জ্জন করিয়া সব আপন করিতে হইবে—বিশ্বজগৎ আত্মরূপে পরিণত হইবে। কিছুই পর থাকিবে না। দেখিবে,—প্রথমতঃ, সবই তোমার স্বকীয় বিভূতি। এই জগৎটি তোমারই আপন শক্তির বিকাশ—আত্মবিভূতি। দ্বিতীয়তঃ, বুঝিবে সবই তুমিময়—তুমি সব সাজিয়া আছ। অর্জ্জনের চরমাবস্থায় সর্ব্বত্রই নিজেকেই দেখিতে পাওয়া যায়—সবই নিজের রূপ বলিয়া বোধে আসে। আপন রূপ ছাড়া দ্বিতীয় কিছু থাকে না।

এই অবস্থায় পৌঁছিলে নিজের মধ্যেই একটি অসীম অনন্ত বস্তুর আভাস জাগিয়া উঠে। ঐটিই তখন আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরে ঐ অসীম বস্তুতে সর্ব্বময় আমিকে বিসর্জন দিতে হয়। ইহাই আত্মনিবেদন বা ত্যাগ। ইহার ফলই পরমানন্দ লাভ বা অমৃতত্ব-প্রাপ্তি। যাহাকে দিব্যভাব বলে। ঐ অসীম বস্তুটি নিজের অন্তর্য্যামিরূপে অন্তরাত্মায় প্রকটিত হন। ঐ পরমানন্দের আস্বাদন বা অমৃত পান বস্তুতঃ মহাশক্তিময়ী জগদম্বার স্তন্যরস পান বা পরম ঐশ্বর্য্যলাভ। মায়ের কোলে শিশু হইতে হইলে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। নিবেদন করিবার পূর্বে নৈবেদ্যের সংগ্রহ করিতে হইবে। যাহাকে তোমরা যোগবিভূতি বল, যদি তাহা বাস্তবিক হয়, তবে উহা এই নৈবেদ্যসংগ্রহ। যাহার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতির উদয়ই হয় নাই সে আবার কি ত্যাগ করিতে পারে? সে ত নিঃস্ব দীনহীন পথের ভিখারী—তাহার ত্যাগের অধিকার নাই। সকল জগৎকে আপন

করিয়া লও—আপনাকে বিস্তার কর, আত্মশক্তির বিকাশ কর, সেই শক্তির দ্বারা অনাত্মভাবকে গ্রাস বা অভিভূত কর, সর্ব্বত্র আত্মভাবের প্রকাশ কর, পরে অসীম তত্ত্বাতীত অনন্ত চৈতন্যময় সত্তা সাগরে ঐ আত্মভাবের নিরোধ কর, তবে ত অমর হইতে পারিবে। বাপু, শুধু বাব্‌লা পাতার রস খাইলে কি অমর হওয়া যায়?

জি—ঐ যে পরমানন্দের আস্বাদন, উহাকেই ত আপনি জীবের কাম্যধন বলিয়া পুরুষার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন?

ব—তাহাতে আর সন্দেহ কি? উহাই ত মুক্তি। ত্রিতাপের জ্বালায় অধীর জীব দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ভ্রমণ করিতেছে, কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছে না, —সত্য বলিতে কি, শান্তি বা স্থিতি কোথাও হইতেছে না। ঐ অমৃত-পান না করা পর্য্যন্ত তার তৃপ্তি নাই। ঐ পরমানন্দ-রস যখন সে পাইবে, তখন তাহার সকল ভ্রমণ সমাপ্ত হইবে, সব অন্বেষণ শেষ হইবে, চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইবে। মায়ের কোলের শিশু আবার মায়ের কোলে আরোহণ করিয়া মাতৃস্তন্যের রসাস্বাদন করিয়া বিভোর হইয়া যাইবে।

এই অমৃতপানই মায়ের প্রসাদ। ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ লইতে হয়, যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজন করিতে হয়—ইহাই ঐ প্রসাদ বা অমৃত।

জি—সন্ন্যাস বা ত্যাগ ভিন্ন যে মুক্তি হয় না, তাহা ত ঠিকই মনে হইতেছে। জ্ঞান ভিন্নও মুক্তি হয় না, শুনিতে পাই। উভয় কথার তাৎপর্য্য কি?

ব—পূর্বে তোমাকে ত সবই বুঝাইয়া দিয়াছি। জ্ঞান ভিন্ন কি ত্যাগ হয়? বিদ্বৎ-সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তবে যে বলা হয় সন্ন্যাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না—সে শুধু বিবিদিষা-সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া। তাহা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে। বিবিদিষা-সন্ন্যাসে কর্ম্ম থাকে। ঐ কর্ম্মই জ্ঞানকে জাগাইয়া বিদ্বৎ-সন্ন্যাস, উৎপাদন করে।

জি—কর্ম্ম বা যোগই জ্ঞানোদয়ের হেতু। তারপর সন্ন্যাস। আচ্ছা, মনে করুন, জ্ঞানের উদয় হইল, অথচ ঐশ্বর্য্যের বা বিভূতির বিকাশ হইল না—তাহা হইলে কেমন হইবে? তখন কি ত্যাগ করা হইবে? এমন অবস্থাও ত আছে।

ব—বৎস, জ্ঞানের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্যের উদয় না হইয়া পারে না। ঈশ্বরভাবই ঐশ্বর্য্য—তাহা আত্মার স্বরূপ হইতে পৃথক জিনিষ নহে। জ্ঞানের উদয়ে যখন আত্মার আবরণ তিরোহিত হয়, তখন আত্মার স্বভাব আপনিই জাগিয়া উঠে। জ্ঞানের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইবেই—ফুল ফুটিলেই তাহাতে

মকরন্দের বিকাশ হইবে। ইহাই অর্জ্জন। ইহার পর ঐশ্বর্য্যের বিসর্জ্জন বা নিবেদন—ইহাই ত্যাগ। ইহার ফল পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠা। আত্মভাব না জাগাইলে পরমাত্মভাবে প্রবেশ লাভ হয় না। আত্মার স্বভাবকে জাগাইয়া, পরে উহাকে নিরুদ্ধ করিতে হয়। এই নিরোধের পূর্ণতা হইতে অমৃতত্ব লাভ ঘটে।

আত্মার স্বভাবকে জাগান আর কুণ্ডলিনীর জাগরণ সমান কথা। সুতরাং কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া পরে তাহাকে অনন্ত-মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে হয়—পরমশিবের অঙ্গে বিলীন বা যুক্ত করিতে হয়—তাহাই জীবের অমৃতলাভের উপায়। পরমশিব ও মুক্ত কুণ্ডলিনী বা পরাশক্তির মিলন হইতে নিত্য যে সুধাস্রাব হয় বা আনন্দ ক্ষরণ হয়, জীব—মুক্ত জীব, তাহাই পান করে, আস্বাদন করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিত্যলীলা

জিজ্ঞাসু—বাবা, এই জগতের যাবতীয় ব্যাপারই ত ইন্দ্রজাল-সদৃশ—মহাপুরুষগণ, ও শাস্ত্রমুখে ঋষিগণ, পুনঃপুনঃ ইহা বলিয়াছেন। তথাপি কেন আমরা ইহা বুঝিতে পারি না? কেন অসত্যকে অসত্য বলিয়া বুঝিয়াও তাহাকে সত্যবৎ মনে করি ও তদনুসারে ব্যবহার করি? ঐ ইন্দ্রজালের ঐন্দ্রজালিক কে, আর কে-ই বা ইহা দেখিতেছে?

বক্তা—দেখ, বৎস, ঈশ্বরই এই বিরাট ইন্দ্রজালের প্রদর্শক, আর জীব—বদ্ধজীব, ইহার দ্রষ্টা। জীবের নেত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মিথ্যার আবরণ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত সে সত্য বস্তুর দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকে। ঈশ্বর মায়াবী—মায়া দ্বারা বদ্ধ জীবকে বিমোহিত করিয়া সত্যস্বরূপের দর্শন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখেন ও নানাপ্রকার বিচিত্র ভাবের প্রদর্শন করেন। আত্মাই সত্য বস্তু—তিনি চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু জীব মোহবশতঃ আত্মাকে দেখিতে পাইতেছে না, অতি সন্নিহিত হইলেও তাহার উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। অবিদ্যাই-সম্বন্ধ ইহার হেতু। ঈশ্বর কি বস্তু তাহা ত জান? বিশুদ্ধ চৈতন্য বস্তু শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রকাশমান হইলে যে উজ্জ্বল আলোকের প্রকাশ হয়, সেই আলোকই ঈশ্বর। ইনি যে শুদ্ধ ঐশীশক্তির বাহ্যপ্রকাশ। অব্যাহত জ্ঞান, অপ্রতিহত ইচ্ছা প্রভৃতি ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহাতে স্বভাবের প্রেরণায় সংকল্পের উদয় হয়—ইনি সত্যপ্রতিষ্ঠ বলিয়া এই সংকল্পবীজ বিকল্পদ্বারা উপহত হয় না এবং বাহ্যরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাই সৃষ্টি। সংকল্পই ইহার মূল। এই যে বাহ্যরূপে বিকাশ বলিলাম, ইহাও অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরাবস্থায় সৃষ্টিই নাই—একমাত্র আত্মসত্তা নিস্তরঙ্গ-ভাবে প্রতিভাত হয়, আর অপরাবস্থায় আত্মসত্তায় শক্তির উন্মেষরূপ তরঙ্গ তাহাতেই সংযুক্তভাবে তদাত্মকরূপে প্রকটিত হয়। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মসত্তার পর অপর কোন ভাবই প্রত্যক্ষ হয় না, চৈতন্য-সাক্ষাৎকার হয় না—সাক্ষাৎকার হয় যাহার, তাহা জড়প্রকৃতি ও তাহার বিকার। কিন্তু বস্তুতঃ জড় বলিয়া পৃথক্ কিছু

নাই—চিৎশক্তিই অজ্ঞানবশতঃ জড়রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। সেইজন্য সৃষ্টি বা দৃশ্যপদার্থ ঈশ্বর হইতে অভেদাত্মক হইলেও অজ্ঞানী জীব তাহাকে পৃথকরূপে এবং জড়ভাবেই দেখে। পৃথক্ ভাবে দেখাই বাহ্যদর্শন। জ্ঞানের উদয় হইলে এই বাহ্যদৃষ্টি থাকে না—অন্তর্দৃষ্টির স্ফুরণ হয়। তখন জড়ত্ব ও ভেদবোধ লুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে যাহা দেখা যায়—তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময় স্ফুরণমাত্র, ঐশ্বরিক সংকল্পের আত্মভূমিতে প্রকাশ। ইহাই বিশ্বরূপ-দর্শন। এটা বিশুদ্ধ সত্ত্বের তরঙ্গিত অবস্থা। এ অবস্থায় আত্মদর্শন হয়—তাহার কোলে কোলে জগদ্দর্শনও হয়। বলা বাহুল্য, এই জগৎ আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়—অবশ্য তখনও কিঞ্চিৎ ভেদাভাস থাকে, নতুবা জগৎ বলিয়া জ্ঞান হইত না। তবে এই অবস্থায় বাহ্যভাব থাকে না এবং জড়ত্ব-বোধ লুপ্ত হয় বলিয়া এ জগৎও চৈতন্যোজ্বল সত্ত্বময় বলিয়া প্রতীত হয়। এ যেন দর্শনে দৃশ্যমান নগরী। বস্তুতঃ, বিশ্ব তাহাই। ভগবান্ যখন অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষুঃ দান করিয়াছিলেন, তখন এই বিশ্বরূপই দেখাইয়াছিলেন। এটা সবিশেষ আত্মারই দর্শন। স্থূলদৃশ্যের ন্যায় এ বিশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গোচর নহে—কিন্তু অতীন্দ্রিয়। বিশোধিত মনঃ বা প্রজ্ঞা দ্বারাই ইহার দর্শন হয়। ইহার পরে ক্রমশঃ চিত্তদর্পণ বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তাহার স্বচ্ছ পৃষ্ঠ হইতে দৃশ্যমান প্রতিবিম্বীভূত বিশ্বনগরীর চিত্র মুছিয়া যায়, বিকল্প ত পূর্ব্বেও ছিল না—শুদ্ধ সংকল্পও তখন স্তিমিতভাবে ধারণ করে, আত্মা তখন অন্তর্লীন শক্তিভাবে প্রকাশমান হন। ইহাই নির্ব্বিশেষ আত্মার দর্শন। চিত্ত তখন আত্মার সমশুদ্ধ হইয়া অদৃশ্য বা অব্যক্ত হইয়া যায়। তাহার স্ফূরণ থাকে না।

স্থূল উপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হইবামাত্রই, সংস্কার না জাগিলে, বিশ্বরূপ দর্শন অবশ্যম্ভাবী। সংস্কার জাগিলে জড়ভাব থাকে বলিয়া ওটা অলীক বিকল্পময় দর্শন হয়।

জি—এ বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল দেখে কে? কে তাহাতে মোহিত হয়? কেন হয়? এ ইন্দ্রজাল কাটিবার উপায় কি?

ব—এ ইন্দ্রজাল বদ্ধজীব। বিশুদ্ধ চৈতন্য যখন মলিন-সত্ত্বগুণে রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ লইয়া খণ্ডিত এবং আবৃতভাবে প্রকাশমান হন, তখনই তাঁহাকে বদ্ধজীব বলে। রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধ হইতেই বন্ধন হয়—জীবের স্বরূপগত উপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্বের অংশ। এই জন্যই জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। এই স্বরূপোপাধি লইয়া থাকিলে জীব জীবভাবেই মুক্তিলাভ করে।

জীব নিত্যবস্তু, ঈশ্বরও নিত্যবস্তু—অংশও নিত্য, অংশীও নিত্য। অংশ বলিতে টুক্‌রা মনে করিও না—আভাস বুঝিও। তাই জীবমাত্রই ঈশ্বরের আভাস। জীব যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিজের স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়, তখন নিজের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়—সে ঈশ্বরত্ব বা শিবলাভ করে। ইহার পরেও অবস্থা আছে—কারণ, ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেই স্বভাবস্থিতি হয় না। ঐশ্বর্য্য ফুটাইয়া পুনরায় তাহাকে নিরোধ করিলে তবে অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাহাই সকলের লক্ষ্য।

যুক্ত জীব এবং ঈশ্বরে অভেদ ও ভেদ না থাকিলেও ভেদাভেদ সম্বন্ধ—মুক্তিকালে অভেদ ও ভেদ উভয়ই প্রকাশমান হয়। কিন্তু বদ্ধজীব মলিন দ্বৈতভাবে আবদ্ধ। ঈশ্বর ও জীবের আত্মা অভিন্ন বস্তু। ঈশ্বরের সংকল্প হইতে শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল যে সৃষ্টির স্ফুরণ হয়, যাহাকে মুক্ত-জীব আত্মা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ ভাবে দেখে না, তাহা বদ্ধজীবের নেত্রে সংকল্পাত্মক ভাবে স্ফুরিত হয় না, প্রতিভাসময় মনে হয় না, ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট বলিয়াই প্রতীত হয়। বদ্ধজীব ঐ শুদ্ধ সংকল্পময় সৃষ্টিকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া, সুতরাং অচেতন, পৃথক্ ও মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ করে। ইহার কারণ অজ্ঞান—অর্থাৎ তাহার আত্মজ্ঞান নাই বলিয়া সে বুঝিতে পারে না যে ঐ সৃষ্টি আত্মশক্তিরই বিজৃম্ভণ ভিন্ন অপর কিছু নহে। তাই উহা সত্য মনে করে-মনে করে, যেন তাহার নিজের সত্তা ছাড়া উহার একটা পৃথক্ সত্তা আছে। সে সৃষ্টি-দৃষ্টি-বাদী হয়। আত্মজ্ঞানের প্রথম বিকাশমাত্রই দৃষ্টি-সমকালীন সৃষ্টি হয়, সিদ্ধ সংকল্পাবস্থায় উদয় হয়—তখন সে দৃষ্টি-সৃষ্টি-বাদী হইয়া থাকে। ইহার পরাবস্থায় সৃষ্টিই থাকে না। তাহাই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান। বদ্ধজীব সংকল্পকে—আভ্যন্তর ভাবকে—বাহ্য রূপে, জড় রূপে, পদার্থ রূপে, অনুভব করে। তাই সে জগৎকে সত্যভাবে অনুভব করে-যাহার স্ফুরণে জগতের বিকাশ, তাহা সে জানে না। যতক্ষণ সংকল্পের সঙ্গে বিকল্পের মিশ্রণ থাকে, ততক্ষণ ইহা হইবেই। বিকল্প উঠে চাঞ্চল্যবশতঃ, বায়ুর প্রভাবে, রজোগুণের প্রাবল্যে। কিন্তু মূলে তমঃ না থাকিলে, আত্মবিস্মৃতিরূপ আবরণ না থাকিলে, বিকল্পের উদয় হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানের উদয় হইবামাত্রই তমোনিবৃত্তি হয়—সেই জন্য রজঃও স্থির হইয়া সত্ত্বে বিলীন হইয়া যায়—বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রকটিত হয়। তখন আর জীব ভেল্কি দেখিয়া ভুলে না।

জি—ইহা হইতে এই বুঝিলাম, বদ্ধজীবই ইন্দ্রজালের দ্রষ্টা—তবে সে

ইন্দ্রজালকে অজ্ঞানবশতঃ ইন্দ্রজাল বলিয়া, অলীক বলিয়া, জানে না—সত্য বলিয়া মনে করে ও তাহারই অনুধাবন করে। তাহার মোহিত হইবার কারণ এই যে, তাহার দৃষ্টি অবিদ্যাচ্ছন্ন। সুতরাং অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানের উদয় ভিন্ন এই ইন্দ্রজালকে ধরিবার উপায় নাই। জ্ঞান না হইলে জগৎকে সত্য মনে করিতেই হইবে।

ব—ঠিক কথা। জ্ঞানী ভিন্ন প্রকৃতির চালাকী কাহার সাধ্য ধরিতে পারে? জ্ঞানী ভিন্ন প্রকৃতির কাহারও নিকট নিজের রহস্য প্রকট করেন না। যে জ্ঞানী, সে কখনও প্রকৃতির দ্বারা মোহিত হয় না—কারণ, সে সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই প্রত্যক্ষ অনুভব করে—আত্মভাবে বোধ করে। নিরন্তর আলো জ্বালিয়া রাখিলে যেমন অন্ধকার কাছে আসিতে পারে না, তদ্রুপ নিরন্তর আত্মজ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত থাকিলে অনাত্মভাবের উদয় হইবার অবকাশ হয় না। জড়রূপে যে দৃশ্যদর্শন হয় তথা অনাত্মভাব। আত্মজ্ঞান অভিভূত না হইলে তাহা কদাপি জাগিতে পারে না। সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন বলিয়া, দ্বিতীয় কিছুই তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয় না। আত্মশক্তির উন্মেষকালে যাহার ভান হয় সেই জগৎও চৈতন্যাত্মক, ব্রহ্মময়। এই প্রকার জ্ঞানবান যোগীর নিকট প্রকৃতির লুকাচুরি কিছু প্রচ্ছন্ন থাকে না। জ্ঞানী জানেন, প্রকৃতি একমাত্র বস্তুকেই বাসনাবাসিত অজ্ঞানীর নেত্রে নানা প্রকার চিত্র-বিচিত্র বর্ণে ফুটাইয়া তোলেন—অজ্ঞানী তাহা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মনে করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তাহাকে পাইয়া তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। অর্ন্তদ্দর্শী জ্ঞানী দেখিতে পান, যাহা কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্য আছে, সব তাঁহারই আত্মা—যাহা নিত্যসিদ্ধ নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু। তাই জ্ঞানী নির্ব্বিকার, আপ্ত-কাম, অচঞ্চল ও ধীর। তাঁহার বাসনা নাই, কামনা নাই, স্পৃহা নাই চলন নাই। প্রকৃতি বা ঈশ্বরই এই ইন্দ্রজাল দেখাইতেছেন। যে অবিদ্যাগ্রস্ত, সে ইহা দেখিয়া বাহ্য-বোধে মোহিত হইতেছে। জ্ঞানের অঞ্জনে অজ্ঞান-তিমির অপসারণ কর, দেখিবে, কোথাও ইন্দ্রজাল নাই—সর্ব্বত্র ঐশ্বরিক শক্তির লীলা চলিতেছে। ইন্দ্রজাল প্রতারণামাত্র—অসত্যকে সত্যরূপে দেখান। বস্তুতঃ, উহা ঈশ্বরের কার্য্য নহে—কারণ তিনি সত্যময় বস্তু, প্রতারণা তাঁহাতে নাই। বদ্ধজীবের অন্তরে প্রতারণার বীজ রহিয়াছে বলিয়া সে প্রতারিত হইতেছে। ভ্রান্তিবশতঃ যেমন অস্ফুটালোকে রোজ্জুকেও সর্প মনে হয়, তদ্বৎ অজ্ঞানের প্রভাবে আত্মশক্তির বিকাশকে জড়, দ্বৈত ও অনাত্মভূত মনে হইতেছে। তাই অজ্ঞানীকে বলিতে হইলে বলিতেই হইবে যে, তাহার

দর্শন অলীক—জগৎ মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। তাহাই বলা হয়, ঈশ্বর ইন্দ্রজালের প্রদর্শক। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, যাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, তাঁহার নিকট কোথাও ইন্দ্রজাল নাই—মায়াও নাই, মায়াবীও নাই—তিনি দেখেন জগৎ সত্য, যাহাকে অজ্ঞানাবস্থায় জগৎ বলিয়া মনে হইত, তাহা আত্মশক্তিরই লীলা মাত্র, তাহা ব্রহ্মময়, চৈতন্যময়। যে শক্তির ক্রীড়া হইতেছে, তাহা ব্রহ্মশক্তি, চিৎশক্তি, জ্ঞানীর আত্মশক্তি-জড়শক্তি নহে। সুতরাং জ্ঞানী সমগ্র জগৎকে ভগবান্ পরমাত্মার লীলারূপেই দর্শন করেন। জ্ঞানী ব্রহ্মময় জগৎকে সত্যই দেখেন—মিথ্যা দেখেন না। জ্ঞানী কদাপি প্রতারিত হন না—তিনি সত্যকে সদ্ভাবেই দেখিতে পান। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি কখনও জগৎকে মিথ্যা দেখেন না।

সুতরাং একটি নিত্যলীলা চলিতেছে—তাহাই বদ্ধ অজ্ঞানী জীব জড়ভাবে বাহ্যভাবে দেখিতেছে। ইহাই ভ্রান্তিদর্শন। মুক্ত জীব, জ্ঞানী, তাহাকে চিৎশক্তির বিলাসরূপে ও আন্তরভাবে দেখিতেছে।

এক অনাদি মহাশক্তিই ঈশ্বর ও জীবভাবে নিজের সঙ্গে নিজেই দ্বৈতাদ্বৈতের মধুর লীলা করিতেছেন। যিনি যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত—তিনি সেই লীলার দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারেন। বদ্ধজীব মায়াচ্ছন্ন বলিয়া মহামায়ার লীলার আস্বাদন পায় না। সে জড়ত্বের আবরণে আবদ্ধ থাকে।

সৃষ্টি ও সংহার এই লীলাভিনয়ের দুইটি দিক্ মাত্র। তুমি জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া মধ্যরেখাতে প্রবেশ কর—দেখিবে, সব তাঁহারই আত্মলীলা। পরে বিন্দুতে প্রবিষ্ট হইলে দেখিবে, ব্যক্ত লীলা অবসান হইয়াছে। একটি স্বপ্রকাশ চিরস্থিত বস্তুই আপনাআপনি ভাসিতেছে। এসব কথা বলিয়া বুঝাইবার নহে। যে ক্রিয়া করিবে, করিয়া নিজে সব উপলব্ধি করিবে, সে-ই বুঝিতে পারিবে।

জি—পুজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী আপনাকে বলিয়াছিলেন—"এ খেলার খেলা যিনি দেখাইতেছেন, তিনি জানেন না। যিনি জানেন, তিনিই জানেন।" তবে কি এই বিশ্বলীলার তিনি সূত্রধার, তিনি স্বয়ং ইহার কিছুই জানেন না? জ্ঞান ভিন্ন যে-লীলার দর্শন হয় না, সে-লীলার অভিনয় কি অজ্ঞানে হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বুঝিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ব—হাঁ, দাদাগুরুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবই জীবেশ্বরভাবে এই লীলার অভিনয় করিতেছেন। এই বিশ্বলীলার মূল ইচ্ছাশক্তি নহে; কিন্তু স্বভাব। ইচ্ছাশক্তি নিজেও এই লীলা

বা সৃষ্টিরই অন্তর্গত। যে ভূমিতে ইচ্ছাশক্তি বা জ্ঞানশক্তির স্ফুরণ হয়, তাহার পূর্ব্বাবস্থাতেই লীলার সূত্রপাত। জ্ঞান ও ইচ্ছা স্বভাব হইতে স্ফুরিত হয়। সুতরাং স্বভাব জ্ঞানের অতীত। তাই বলা হইয়াছে, তিনি জানেন না। বস্তুতঃ আমরা যাহাকে জ্ঞান বা অজ্ঞান বলি, তাহা সেখানে নাই। লীলা-স্ফূর্ত্তি স্বভাব হইতে হইতেছে বটে, কিন্তু এ লীলার দর্শক কে? এ লীলার দর্শক তিনি, যিনি আত্মজ্ঞান নিবন্ধন সাক্ষিভাবাপন্ন। অর্থাৎ যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত—এই বিশ্বলীলার দর্শক ও উপভোক্তা। ঈশ্বর ও ঈশ্বর-সাম্যপ্রাপ্ত জীব (মুক্তজীব) এই লীলার দর্শক। জীবের বদ্ধাবস্থায় অজ্ঞানের পরদা থাকে বলিয়া লীলাদর্শন হয় না।

স্বভাবই এই খেলা খেলাইতেছেন, আবার জীবেশ্বরভাবে তিনিই ইহা দেখিতেছেন। স্বভাব সুধার সমুদ্র—তিনি তিনিই। যে তাহা পান করে, সে-ই তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করে। নিজের মাধুর্য্য নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইলেই নিজেকে জীব ও ঈশ্বরভাবে বিভাগ করিয়া লইতে হয়। তাই তিনি অবিভক্ত থাকিয়াও নিত্য জীব ও ঈশ্বররূপে খেলা করিতেছেন। জড়জগৎ এই খেলার উপকরণ মাত্র।

এস, আজ আমরা এই স্বভাবরূপিণী জগদম্বাকে প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতে চাই। সমায়ান্তরে আবার তাঁহার পুণ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

আমাদের প্রকাশনার পুস্তক সমুহ

শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের–

১। আর্যশাস্ত্র প্রদীপ (১-৪) সেট--৪৫০। ২।-দুর্গাচ্চনা ও নবরাত্র তত্ত্ব, ৪০্।
৩। মানব তত্ত্ব ২৫০। ৪। পরলোক তত্ত্ব, ২০০।
৫। শিবরামের অভেদতত্ত্ব ও শ্রীরাম অবতার কথা ৫০্।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজের–

৬। সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (১-৬) খণ্ড প্রকাশিত মূল্য--৩৮৫্। ৭। পত্রাবলী ৪৫্।
৮। জ্ঞানগঞ্জ ১০০্। ৯। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ১৫০্। ১০। স্বসংবেদন, ১১। সূর্য্যবিজ্ঞান ১২০্।
১২। কাশীর সারস্বত সাধনা, প্রকাশিত মূল্য–৩৫্। ১৩। অখণ্ড মহাযোগ ১০০্।
১৪। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন--৫০।
১৫। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (১-৫) খণ্ড প্রকাশিত সেট্ ২৪০। ১৬। সাহিত্য-চিন্তা ৪০্।
১৭। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর–যজ্ঞ কথা ১০০্। ১৮। দিলীপকুমার রায়ের–মীরাবৃন্দাবনে ২০্।
১৯। স্বামী সোমেশ্বরানন্দের--সর্পাষদ শ্রীরামকৃষ্ণ (চিত্রে)
২০। ব্যবসা ম্যানেজমেন্টে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা ৮০্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থের–

২১। চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র (১-৩) প্রকাশিত মূল্য ১৫০্।
২২। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ (বৈষ্ণব সংস্কৃতি গবেষণা বিষয়ে গ্রন্থ) মূল্য ৪০্।
২৩। ডঃ সজল বসুর–সম্পাদনায় ভারতের সমাজ ভাবনা ১৫০্।
২৪। 'West Bengal the Violent years Rs. 25.00
২৫। শিবনাথ শাস্ত্রীর–মহান পুরুষের সান্নিধ্যে ৫০্।
২৬। ডঃ বেণীশঙ্কর শর্মার–বিবেকানন্দের জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায় ৫০্।
২৭। রামদয়াল মজুমদারের–গীতা পরিচয় ৩০্।
২৮। স্বামীমুক্তানন্দের–মাধব পাগলা ও রামঠাকুরের কথা (দুই খণ্ড) মূল্য–৬০্।
২৯। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের–গীতার কথা ৯০্।
৩০। ভাগবতের কথা ৮০্। ৩১। মহাজন সংবাদ ১৫০্।
৩২। সুর সুধাকর দিলীপ কুমার রায়–জীবনে ও গানে ৭৫্।
৩৩। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদ-বেদান্ত দর্শন যোগের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অভয়ের কথা ৮০্।
৩৪। বিভূপদ কীর্তির--রমন মহর্ষি ও শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ৮০্।
৩৫। মোহিতলাল মজুমদারের–জয়তু নেতাজী ৮০্।
৩৬। পূর্বা সেনগুপ্তর–দেব-দেবীর কথা ৬০্ শিব মহিমা ৭০্।
৩৭। পরিব্রাজক গঙ্গানারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের–গুরুসঙ্গে দাক্ষিণাত্য ৮০্।
৩৮। রাজর্ষি রাঘবানন্দের ক্রিয়াযোগের সিংহ দুয়ার ১৫০্।
৩৯। স্বামী প্রত্যাগানন্দ সরস্বতীর হিন্দু ষড়্দর্শন ৪৫্।
৪০। গোরা মুখোপাধ্যায়ের– ১. প্রশ্নোত্তোরে বালানন্দ ১০০্।
২. শ্রী বালানন্দ গল্পমালিকা ১০০্।
৪১। আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী– এই বাংলার গুপ্তযোগী (সেট) ৩১৫্।
৪২। সৎপুরানন্দ অবধূত--তন্ত্রের কথা ৩০্।
৪৩। আদ্যাপীঠ-এর বিমলা মা ও আনন্দ ভাইয়ের সান্নিধ্যে--জয়ন্তি চট্টোপাধ্যায় ৫০্।
৪৪। অনির্বাণের আলোয় পাতঞ্জল যোগদর্শণ--অনির্বাণ ৫০্।
৪৫। স্বামী প্রণবানন্দ গিরির প্রণব গীতা ৩০০্।
৪৬। ডঃ সন্ধ্যা বাগচীর–সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাচিন্তা ৮০্।
৪৭। রথীন ব্যানার্জীর--প্রেমাবতার গৌরদেব ৫০্।

অমিয় কুমার মজুমদার-এর

‘পুণ্যদর্শন শ্রীম’ ২৫০্

(মহান সাধক জ্ঞান তপস্বী শ্রীম’-র পূণ্য কথা, গম্ভিরানন্দজীর ভূমিকা সম্বলিত)

গৌতম বিশ্বাস-এর

পশ্চিমবঙ্গের কালী ও শক্তি সাধনা ২৫০্

(সর্বপ্রথম বিভিন্ন কালী মন্দিরের জেলা ভিত্তিক বিবরন ও অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণনা)

পশ্চিমবঙ্গের শিবস্থান ও তার অলৌকিক মাহাত্ম্য ১৫০্

(সর্বপ্রথম বিভিন্ন শিব মন্দিরের জেলা ভিত্তিক বিবরন ও অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণনা)

রাজর্ষি রাঘবানন্দজীর

ক্রিয়াযোগ সার ১০০্

(ক্রিয়াযোগের বহু গুপ্ত কথা নিহিত)

অমরযোগী বাবাজী মহারাজের সন্ধানে ১৩০্

(মাতা সর্বাণীর ভূমিকা সমৃদ্ধ গ্রন্থখানিতে বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য নিহিত)

ড. নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কৈবল্যনাথ শ্রীশ্রী রামঠাকুর প্রসঙ্গে ১০০্

সাধিকা মিতা মা-এর

আদ্যা তত্ত্ব মঞ্জুরী ৩০্

(সর্বপ্রথম আদ্যা মায়ের উপর বহু বিশ্লেষণ ও গুপ্তকথা নিহিত)

—সমগ্র বাংলা আলোড়িত যে গ্রন্থে—

রাজেন্দ্র লাল আচার্য্যের

মৃত্যুর পরপারে ৪০০্

স্বামী অভেদানন্দ বিদেহী আত্মায় এসে এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন। এই প্ল্যানচেটে আরো যারা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রাখাল মহারাজ, যোগী ত্রিপুরী লিঙ্গ, তৈলঙ্গ স্বামী, স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রমুখ সাধুসন্তগণ। বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম প্ল্যানচেটের উপর এক অসাধারণ গ্রন্থ প্রকাশিত হল।

ভারতের আধ্যাতিক জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

ড. গোপীনাথ কবিরাজ-এর পুস্তকসমূহ

সাধনা ও সিদ্ধি ২৫০্ **তত্ত্ব ও সাধনা** ৩০০্

(দীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, সাধনার স্বরূপ ও ব্যাখ্যা-সাধনার সঠিক পথ ও মৃত্যু বিজ্ঞান, গায়ত্রী মন্ত্র রহস্য, প্রণব মন্ত্র রহস্য, কুলকুণ্ডলী রহস্য বিষয়ক সুদীর্ঘ আলোচনা)

শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (১-৫) সম্পূর্ণ মূল্য ২৫০্

বহু অজানা তথ্যসমৃদ্ধ এক মহান গ্রন্থ

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (১-৬) সম্পূর্ণ মূল্য ৪৬০্

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ২৫০্ পত্রাবলী ও কাশীর সারস্বত সাধনা ১৮০্ অখণ্ড মহাযোগ ১৩০্ জ্ঞানগঞ্জ ১২০্ সূর্যবিজ্ঞান ১২০্ সাহিত্য চিন্তা ৪০্ তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন ৫০্

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের (বিশুদ্ধানন্দের ডাইরী)

যোগীরাজাধিরাজ শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ২০০্

স্বামীবিবেকানন্দ অভেদানন্দের যোগ শিক্ষা গুরু শিবরামকিঙ্কর যোগত্রান্দের (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ)

আর্যশাস্ত্র প্রদীপ ৪৫০্ পরলোকতত্ত্ব ৩০০্ মানবতত্ত্ব ২৫০্ দুর্গাদুর্গার্চন ও নবরাত্রতত্ত্ব ৪০্ শিবরামের অভেদতত্ত্ব ও রামঅবতার কথা ৫০্ রামকৃষ্ণ কথামৃতের পর এত ভালো গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হল

বালানন্দ গল্পমালিকা ১০০্ প্রশ্নোত্তরে বালানন্দ ১০০্

প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস, বাকসাড়া, হাওড়া-৭১১১১০
ফোন : ৯৩৩৯১০৮০২৪

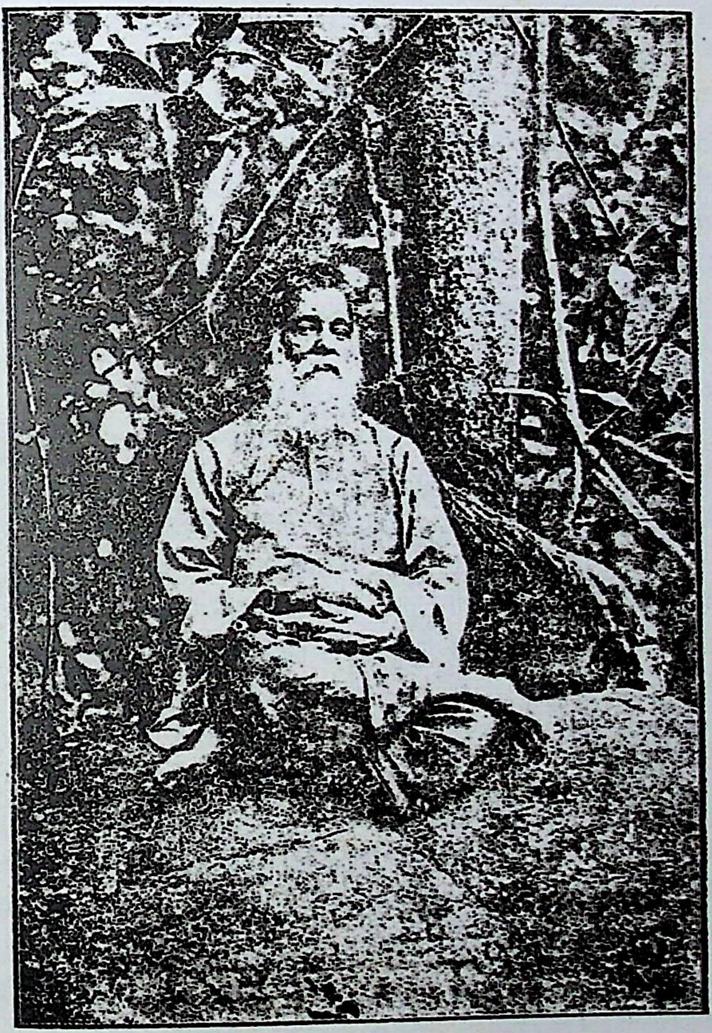

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব।

সূচীপত্র

ভূমিকা i-xxvi
১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ... ১-৭০
২। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৭০-৭৬
৩। শ্রীযুক্ত শিবরাম বন্দোপাধ্যায় ... ৭৬-৮৬
৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৮৬-১০১
৫। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য ... ১০২
৬। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দে ... ১০৩-১০৮
৭। শ্রীযুক্ত মুণিন্দ্রমোহন কবিরাজ ... ১০৯-১১২
৮। শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১১২-১১৪

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য প্রসঙ্গের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে তাঁহার শিষ্যগণের স্বমুখ-বর্ণিত বর্ণনা যথাবৎ প্রদত্ত হইয়াছে। একমাত্র শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিষ্য নহেন। তাঁহার কঠোর সাধনা, নির্ম্মল বৈরাগ্য অদ্ভূত যোগৈশ্বর্য্য, গভীর করুণা ও শিষ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার কিঞ্চিৎ আভাস ইহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাঁহার বহু শিষ্য। প্রতি শিষ্যের জীবনে ও সমক্ষে এমত কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহা সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে একটি বৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করিবে। সকল শিষ্যের সমস্ত ঘটনার সমষ্টি ত অতি বিরাট্ ব্যাপার-বিশেষ, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পাদন করা এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য।

অসম্ভব হইলেও যথাশক্তি তাহা করিতে হইবে। যিনি ভবিষ্যতে মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনচরিত রচনা করিবেন, তাঁহার কার্য্যের সহায়তার জন্য এখন হইতেই উপাদান সংগ্রহ আবশ্যক। আমি অগ্রণী হইয়া কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আশা করি, আরও যোগ্যতর ব্যক্তি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অধিকতর শ্রম ও অনুসন্ধানের পরিচয় প্রদান করিবেন।

এই লীলা-কথা-প্রসঙ্গে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই অমূলক নহে। সকলগুলিই প্রত্যক্ষদর্শীর স্বলিখিত বিবরণ। পক্ষপাত-শূন্যচিত্তে এই গুলি আলোচনা করিলে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষের লোকোত্তর বিভূতি ও অসীম চরিত্র-মাধুর্য্য ইহার সর্ব্বত্র স্পষ্ট দেদীপ্যমান। অন্যের কথা বলিতে চাই না—আমি নিজের জীবনে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে বাবাজীর যে সকল অলৌকিক ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিচার করিলে বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়। অনেক সময়ে মনে হয়, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও প্রেম যুগপৎ সমভাবে মিলিত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় মহাভাবের প্রকাশ হইয়াছে।। তাহা অন্যকে বুঝাইয়া বলিবার বিষয় নহে। শুধু নিজে নিজে আস্বাদন করিবার সামগ্রী।

গত ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি স্বর্ব্বপ্রথম বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করি। সে আজ ত্রয়োদশ বর্ষের পুরাতন কথা। কিন্তু এখনও সেদিনটি আমার স্মৃতি ফলকে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। তখন অপরাহ্ন হইয়াছে, বেলা বোধ হয় চারিটা হইবে। একটি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী যুবকের সহিত হনুমান ঘাটের সমীপস্থ আশ্রমে (দিলীপগঞ্জ, বিশুদ্ধানন্দ কুটীর) দ্বিতল গৃহে আমি মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারের জন্য গমন করি। যাইয়া দেখি, সমস্ত গৃহটি লোকে পরিপূর্ণ,

একপ্রান্তে একখানা তক্তাপোষের উপর ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। সুন্দর সদানন্দ মূর্ত্তি, প্রসন্ন বদন, উজ্জ্বল চক্ষুঃ, দীর্ঘ-বিলম্বিত শ্মশ্রু, প্রশস্ত ললাট, পরিধানে গৈরিক কৌষেয় বসন,—দেখিলেই মনে হয়, যেন প্রজ্ঞা ও করুণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিতাপ তাপিত মর্ত্ত্যধামের উদ্ধার সাধনের জন্য অবতীর্ণ। তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, কাহাকেও বা বিজ্ঞান-তত্ত্বের দুই একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইতেছিলেন, দেখিয়া ও শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কারণ, ঐ প্রকার জোরের সহিত আমি কাহাকেও তত্ত্বোপদেশ দিতে দেখি নাই। ঐ প্রথম দর্শনেই আমার মন তাঁহার শ্রীচরণে নত হইয়া পড়িল। বুঝিলাম, আমি যাহা এতদিন অন্বেষণ করিতেছিলাম, এখানে তাহা পাইব। কবি বলিয়াছেন—"মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্"। জন্মান্তরের সম্বন্ধমূলক সংস্কার সকল চিত্তক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে, পরে বিশিষ্ট উদ্দীপক কারণের যোগাযোগ হইলে ঐ সকল সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। তখন পূর্ব্বজন্মের অনুভূত সম্বন্ধ প্রভৃতি চিত্তের আপেক্ষিক বিশুদ্ধি অনুসারে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠে। বাবাজীকে দর্শন করিবামাত্রই আমার যেন বোধ হইতে লাগিল—'ইনি আমার চিরদিনের পরিচিত, যেন কত দিনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আজ অর্দ্ধ-স্বচ্ছ আবরণের ব্যবধান ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।" তিনিও আমাকে প্রথম দর্শনের মহূর্ত হইতেই অতি-পরিচিতের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

ইহার পর প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে যাইতে লাগিলাম। বেলা পড়িয়া আসিলেই মন উচাটন হইয়া পড়িত, কোন লৌকিক কার্য্য ভাল লাগিত না, আশ্রমে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম। তখন বৈকাল বেলা বাবাজী বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমিও প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম। কখনও গঙ্গাতটে হনুমান্ ঘাট হইতে অসিসঙ্গম পর্য্যন্ত, কখনও বা নৌকা-যোগে গঙ্গাবক্ষে পঞ্চগঙ্গা ঘাট হইতে অসি বা নাগোয়া পর্য্যন্ত, আবার কোন কোন দিন আদিকেশব পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিতেন। এক এক দিন, কুরুক্ষেত্র ও দুর্গাবাড়ির পার্শ্ব দিয়া সঙ্কটমোচনের দিকে যাওয়া হইত। সঙ্গে অনেক লোক থাকিত। ঠিক সূর্য্যাস্তের সময় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। সূর্য্যাস্তের পরে তিনি কখনই বাহিরে থাকিতেন না।

একদিন সাংখ্য দর্শনের কথা-প্রসঙ্গে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। বাবাজী সরল ভাষায় সৃষ্টি-রহস্য বুঝাইয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে—জগতের প্রতি বস্তুই যে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে গঠিত, তাহা দৃষ্টান্তরূপে একটি গোলাপ ফুলের সাহায্যে দেখাইয়া দিলেন। নিকটে একটি গোলাপ ছিল, হাতে লইয়া বলিলেন, "দেখ, এই ফুলটি মেয়ে। একটি পুরুষফুল (গোলাপ) হইলেই ইহাতে গর্ভসঞ্চার করাইয়া একটি নতুন গোলাপের সৃষ্টি করা যায়।"

বলিয়া পুষ্পের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির লক্ষণ কি প্রকার তাহা দেখাইয়া দিলেন ও গোলাপের পাঁপড়িগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নিকটে পুরুষ-জাতীয় গোলাপ না থাকায় সূর্য্যরশ্মি হইতেই উহার বীজ আকর্ষণ করিয়া উহাতে সঞ্চার পূর্ব্বক সৃষ্টি-প্রণালী দেখাইয়া দিলেন। তখন শীতকাল ছিল। তিনি আমাকে ঐ পাঁপড়িশূন্য গোলাপটি হাতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিলেন। যাহাতে শীতের সংস্পর্শ না লাগে, তাহার জন্য বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই মুষ্টি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দেখিতে পাইলাম একটি পাঁপড়ি বিশিষ্ট গোলাপফুল নির্ম্মিত হইতেছে। ক্রমশঃ তাহার আয়তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—পরে যে গোলাপটির পাঁপড়ি খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ একটি পুষ্প তৈয়ার হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "এই প্রকারে স্বভাবের নিয়মে সর্ব্বত্রই প্রকৃতি-পুরুষের যোগে সৃষ্টি হইতেছে। যিনি বিজ্ঞানবিৎ, যিনি স্বভাবের উপাসক স্বভাবের আরাধনা করিয়া তিনিও ঐ প্রকার সৃষ্টি সাধন করিতে সমর্থ। উর্দ্ধতম স্তর হইতে সর্ব্বনিম্নতম ভূমি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার শক্তি অব্যাহত।"

তখনও আমার দীক্ষা হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলা আহ্নিক করিতে উঠিবার কিছু পূর্ব্বে আমি বাবার তক্তাপোষের পার্শ্বদেশে বসিয়া আছি। শাস্ত্রালাপ হইতেছিল। হঠাৎ বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হার্টের অসুখ হইয়াছিল? এখনও তোমার হার্ট দুর্ব্বল দেখিতেছি।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "হাঁ, বাবা, ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমার অসুখ হইয়াছিল। তাহার জন্য প্রায় এক বৎসর কাল আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম। তবে এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি।" বাবা বলিলেন, দীক্ষা হইলে সব সারিয়া যাইবে, কোন চিন্তার কারণ নাই।" বলিয়া আমার খাদ্যক্রম সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম বলিয়া দিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত করুণার নির্দশন পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

আমি অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্প বিস্তর প্রাণের আকর্ষণও যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। বিশেষতঃ একজন মহাপুরুষের অপার্থিব কৃপা ও ভালবাসা আমি অযোগ্য হইয়াও প্রায় সাত বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করিয়া আসিয়াছি। অনেক সময়ে তাঁহাকে আত্মজীবনের আদর্শস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছি ও নীরবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছি। তেমন সাধনা, তেমন পাণ্ডিত্য (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নবীন ও প্রাচীন সর্ব্ববিষয়ে), তেমন শাস্ত্র-বিশ্বাস, সদাচার ও উদার হৃদয় আমি পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার নিকটেও আমি কখনই দীক্ষা প্রার্থনা করি নাই। করিলে তিনি দিতেন কি না, তাহা জানি না। তবে আমার মনে হইত,

আমার কাল পূর্ণ হইলে, যোগ্যতা অর্জ্জিত হইলে, আমি ন চাহিলেও আমার প্রাপ্য বস্তু পাইবই। ভগবানের রাজ্যে কেহ কদাপি বাস্তবিক পক্ষে বঞ্চিত হইয়া থাকে না। তাই বাবাজী যখন সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইঙ্গিতে আমার নিকট দীক্ষার কথা বলিলেন, হঠাৎ আমার মনে পূর্ব্বভাব ফুটিয়া উঠিল। ভাবিলাম, হয়ত, বা এবার সময় হইয়া থাকিবে। যদিও তিনি স্পষ্টতঃ আমাকে কিছুই বলেন নাই, তথাপি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই আমি বুঝিয়া লইলাম যে, আমি একটু উন্মুখ হইলেই তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবেন। বুঝিলাম বটে, কিন্তু তখনও কিছুই প্রকাশ করিলাম না।

এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। কত উপদেশ শুনিতাম, কত অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতাম, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকট দিয়া গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা ভ্রমণের সময় আমার মনে একটি প্রশ্ন উঠিল, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, যোগীর পরিচয় কি? যোগ সাধনা করিয়া কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে, যোগ সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে? বাহিরের লোকই বা যোগীকে চিনিবে কি করিয়া?" শুনিয়া বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, সে সব অনেক কথা—পরে বুঝিতে পারিবে। তবে সংক্ষেপে ইহা জানিয়া রাখ যে, প্রকৃত যোগী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হন। যিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন, তিনিই যোগী। যোগীর নিকটে কিছুই অসম্ভব থাকিতে পারে না।" আমি বলিলাম "এ ত ঈশ্বরের কথা আপনি বলিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা ঈশ্বরের ধর্ম্ম—মানুষের ধর্ম্ম নহে। অসম্ভবকে সম্ভব করা মায়ার ব্যাপার,—মায়া ঈশ্বরের অধীন শক্তি-বিশেষ।" বাবা বলিলেন, "যোগীও ত তাই। ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্যের বিকাশ না হইলে মনুষ্য কদাপি যোগিপদবাচ্য হইতে পারে না। ঈশ্বরই যোগী, যোগীই ঈশ্বর।"

বুঝিলাম, কথাটি অতি-সত্য। আত্মার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য অবিদ্যার আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া তাহার চিত্তে তৃষ্ণা ও বাসনা নিরন্তর উত্থিত হইতেছে। অভাব না থাকিলে আকাঙ্ক্ষা জাগিবে কেন? কিন্তু অভাব ত কল্পিত—অজ্ঞান কাটিয়া গেলে কল্পনা থাকে না—কল্পিত অভাবও থাকে না। যাহা থাকে, তাহা নিত্য ও স্থির সত্য। যোগবলে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয় ও আত্মার নিত্যৈশ্বর্য্যের বিকাশ হয়।*

---

*ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্যমীশ্বরত্বং হি তস্য নাস্তি পৃথক্স্তিতিঃ। পুরুষে ধাবমানেঽপি ছায়া তমনুধাবতি। অনন্তশক্তিরৈশ্বর্য্যং নিয্যন্দাশ্চণিমাদয়ঃ। স্বস্যেশ্বরত্বে সংসিদ্ধে সিধ্যন্তি স্বয়মেব হি।"—মানসোল্লাসঃ ১০—৪—৫।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে পাতঞ্জল দর্শন ও তাহার ব্যাসভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমি বলিয়াছিলাম, "যোগ সম্বন্ধে,—শুধু যোগ কেন, গভীর মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত,—এরূপ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরল।" বাবা বলিলেন, "বৎস, গ্রন্থ ভাল কি মন্দ, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থ হইতে জ্ঞান জন্মে না। চিত্তের সংস্কার ব্যতিরেকে জ্ঞানের উদয় হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সদ্‌গুরুনির্দ্দিষ্ট ক্রম ও প্রণালী অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্তের সংস্কার হইতে পারে না। অসংস্কৃত চিত্তে কি তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে? শুষ্ক জ্ঞানের কোনই মূল্য নাই।" আমি জাত্যন্তর পরিণামের কথা উঠাইলাম। বলিলাম, "দেখুন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতে জাত্যন্তর-পরিণাম ও তাহার নিয়ামক কারণ সম্বন্ধে বহু প্রকার সমালোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎ, এমন কি, স্থাবর জগতেও প্রাকৃতিক নিয়মে জাত্যান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। কখন ও কি ভাবে এই প্রকার পরিণাম ঘটিয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহার আলোচনা করেন বটে, কিন্তু পরিণাম-রহস্য তাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। মূল কারণ তাঁহাদের দৃষ্টিতে গভীর কুহেলিকাচ্ছন্ন—সেই জন্যই এই পরিণামকে তাঁহারা স্বেচ্ছায়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে ও ব্যাসভাষ্যে জাত্যান্তর-পরিণাম তত্ত্বের কারণ-রহস্যের উপপাদন আছে।" বাবা বলিলেন, "সত্য কথা, কিন্তু তাহাতেই বা লাভ কি? তুমি কি বলিতে চাও, পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়া কেহ যোগী হইতে পারিবে? কেহ কি জাত্যন্তর-পরিণামের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনিয়া পরিণামক্রম স্বায়ত্ত্ব করিতে পারিবে কিংবা প্রাকৃতিক রহস্য কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ভিন্ন করিতে পারিবে? তাহা হইতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে কোন রহস্যই উদঘাটিত হইবার নহে। আচ্ছা, পাতঞ্জলে জাত্যন্তর সম্বন্ধে কি আছে, তাহা বল।" আমি বলিলাম, "এক জাতীয় বস্তুর অন্য জাতীয় বস্তুতে পরিণত হওয়াকে জাত্যন্তর পরিণাম বলে। প্রকৃতি বা উপাদানের আপূরণ হইতে এই প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্বভাবতঃ পরিণামশালিনী, কোন আগন্তুক কারণ হইতে তাহার পরিণাম হয় না। মূল প্রকৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্যের আদি কারণ। তাহা হইতেই নিমিত্ত-ভেদ নিবন্ধন বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে সকল কার্য্য হইতে পারিলেও বস্তুতঃ সকল কার্য্য হয় না। কারণ, যতক্ষণ পরিণাম-পথের প্রতিবন্ধক অপগত না হয় ততক্ষণ পরিণাম সিদ্ধ হয় না। নিমিত্ত বিশেষের দ্বারা প্রতিবন্ধক বা আবরণ-বিশেষ বিদূরিত হইলে প্রকৃতি অনুরূপ-কার্য্যরূপে আপনিই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং নিকৃষ্ট পদার্থ যেমন উৎকৃষ্ট পদার্থে পরিণত হইতে পারে, তেমনই উৎকৃষ্ট পদার্থও নিকৃষ্ট হইতে পারে। উভয়ত্রই প্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ আবশ্যক। শাস্ত্রে আছে, নন্দী ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিল, আবার নহুষ ইন্দ্রপদ হইতে

ভ্রষ্ট হইয়া সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কর্ম্মানুসারে সবই সম্ভব। এই জাত্যন্তর-পরিণামবাদ কর্ম্মবিজ্ঞানের মূল সূত্র। এবং অকাট্য সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সত্যের এরূপ ব্যাপক রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।" বাবাজী বলিলেন, "তোমার কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু জাত্যন্তর-বিজ্ঞান পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়া কেহ আয়ত্ত করিতে পারে কি? যোগভ্যাস না করিলে যোগ শাস্ত্রের কোন রহস্যই সম্যক প্রকারে বুঝিবার উপায় নাই।" এই বলিয়া বাবাজী আমাকে একটি ফুল লইতে বলিলেন। আমি নিকটস্থ একটি গোলাপফুল হাতে তুলিয়া লইলাম। তিনি ফুলটি আমার হাত হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই ফুলটি গোলাপ, কি অন্য কিছু?" আমি বলিলাম, "উহা গোলাপই বটে।" তিনি বলিলেন, "তুমি ইহাকে গোলাপ দেখিতেছ, কিন্তু আমি ইহাতে সবই দেখি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও এমন কিছু নাই, যাহা ইহাতে নাই। ইহাতে সবই আছে।" এই বলিয়া তিনি ফুলটিকে হাতে লইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সংযোগে টিপিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, গোলাপ ফুলটি জবাফুলে পরিণত হইয়াছে। ফুলটি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলাম, অতি সুন্দর জবাফুলই বটে।

এই প্রকার বহু সময়ে বহু প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়া শাস্ত্রের রহস্য বুঝাইয়া দিতেন। একবার একটি ফুটন্ত ফুলকে অস্ফুট কোরকে পরিণত করিয়া প্রতিলোম পরিণাম বিষয়ক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বলেন কুঁড়িতে যেমন ফুল আছে, ফুলেও তেমনই কুঁড়ি আছে। বীজে যেমন বৃক্ষ আছে, তেমনই বৃক্ষেও বীজ আছে। প্রকাশ কাল বা অভিব্যক্তির কারণসামগ্রী পাইলেই কুঁড়ি পুষ্পরূপে ও বীজ বৃক্ষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। স্বভাবের নিয়মে সর্ব্বত্রই ইহা হইতেছে। ক্ষেত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের অনুকূলতা এই জন্যই বিকাশের পক্ষে আবশ্যক। আবার ঐ সকল বাহ্য কারণ যদি পুষ্প হইতে আকর্ষণ করিয়া সরাইয়া দেওয়া যায় অথবা পুষ্প মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত কুড়ির সত্তা যদি তাহার সজাতীয় উপাদানের দ্বারা পুষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ঐ পুষ্পটি দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার কোরকে পরিণত হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "তাহা হইলে দই হইতেও দুধ বাহির করা যায়?" বাবা বলিলেন নিশ্চয়ই। শুধু দই কেন, ঘৃত হইতেও ঘাস পর্যন্ত বা তাহারও পূর্ববর্তী যে কোনো কারণ পর্যন্ত বাহির করিয়া লওয়া যায়। কারণে যেমন কার্য্য অব্যক্তভাবে থাকে, সেই প্রকার কার্য্যেও কারণ অব্যক্তভাবে থাকে।" আমি বলিলাম, "তাহা হইলে ঈশ্বরে যেমন জীবত্ব আছে, তদ্রূপ জীবেও ঈশ্বরত্ব নিহিত আছে, মানিতে হইবে?" বাবাজী বলিলেন, 'তাহা ত সত্যই। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কি জীব চেষ্টা করিয়া ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারিত? যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কদাপি আবির্ভূত হইতে পারে না।

১৯১৮ সালের প্রারম্ভভাগে আমি দীক্ষা গ্রহণ করি। ইহার পর হইতে বাবাজীর লোকোত্তর শক্তি অন্তর্জগতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু সে সব কথা সাধন-রাজ্যের গুপ্ত ও গোপনীয় বিষয়—তাহা লোক-সমক্ষে প্রচারিত করা সর্ব্বথা অনুচিত মনে করিয়া সে-সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। তবে ইহা বলিতে পারা যায় যে, বাবাজীর উপস্থিতি ও প্রভাব বহুদূরে থাকিয়াও সদা-সর্ব্বদাই অনুভব করিতাম। কখন কোথায় যাইতাম, কোথায় বসিতাম, কি কথা বলিতাম, কিভাবে সময় যাপন করিতাম, বাবা সে সকল বিষয়ে প্রতিনিয়তই সন্ধান লন, তাহা দু-চার দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। শুধু পদ্মগন্ধ বা অন্য কোন প্রকার দিব্যগন্ধ দ্বারা নহে। আরও বহু উপায়ে তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারিতাম। তিনি প্রায়ই সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের বাড়িতে আসিতেন—অনেক সময়ে অন্যান্য মহাপুরুষগণও আসিতেন। কখন কখন কেহ কেহ দেখাও দিতেন। যখন কোন গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত, যোগ অথবা ধর্ম্মের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হইত, তখন প্রায়ই বাবা উপস্থিত হইতেন। স্বর্গীয় গন্ধে সকলকে মোহিত করিয়া ও নিজের সত্তা জ্ঞাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তর্হিত হইতেন। এই সব সম্বন্ধে এত অধিক সংখ্যক ব্যাপার ঘটিয়াছে যে, তাহার উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক বোধ হইতেছে না। রাস্তায় চলিতে চলিতে, স্মরণ করিতে করিতে, প্রাসঙ্গিক ভাবে তাঁহার কথা আলোচনা করিতে করিতে, তাঁহার উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছি।

কত সময়ে বাড়িতে কত ঘোর বিপৎপাত হইয়াছে—তিনি যেখানেই থাকুন আসিয়া বিপৎ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এমন কতবার হইয়াছে। ১৯২২ সালে যখন আমার পত্নী সিঁড়ী হইতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হন ও ভীষণ হিষ্টীরিয়া রোগে আক্রান্ত হন, তখন কোন চিকিৎসাতেই ফল হয় না; ইঞ্জেকশন দিয়াও দৈহিক আক্ষেপের নিবৃত্তি ও নিদ্রার উদয় হয় নাই। নিরাশ হইয়া পুরীধামে বাবাজীকে তার করিয়াছিলাম। তখন প্রায় ৩৬ ঘণ্টা কাল অশান্তিতে কাটিয়া গিয়াছিল—উপশমের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। আর কিছুক্ষণ ঐভাবে কাটিলে জীবন রক্ষা অসম্ভব হইবে মনে করিয়াই অনন্য-গতি হইয়া তার করিয়াছিলাম। তার করিবার দেড় কিংবা দুই ঘণ্টার পরেই রোগিণীর গৃহ পদ্মগন্ধে ভরিয়া গেল। গৃহে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বুঝিলেন, বাবার শুভাগমন হইয়াছে। ফলেও তাহাই হইল। পদ্ম গন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই রোগিণী শান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখা গেল, রোগ নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, প্রাণে স্ফূর্তি আসিয়াছে, দেহে নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে। আর একবার আমার স্ত্রীর পুনঃপুনঃ রক্ত বমন হয়—ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। ঔষধে কোন ফল হয় না। অকস্মাৎ বাবার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বমন নিবৃত্ত হয় ও রোগ-

শান্তি ঘটে। গত বৎসর পুনর্ব্বার তাঁহার ভয়ঙ্কর অবস্থা হইয়াছিল। নিরন্তর বমন, রেচন, হিক্কা, হৃৎপিণ্ডের কম্পন, ঘোরতর জ্বর, জ্ঞানলোপ, হিষ্টীরিয়া, আত্যন্তিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি অসংখ্য উপসর্গ যুগপৎ আক্রমণ করে। জীবনের আশা ত ছিলই না। এমন কি, রাত্রি যে কাটিবে, সে ভরসাও বিন্দুমাত্র ছিল না। তখন গুরুদেব সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নিরাময় করেন। শুধু তাহাই নহে, রোগিণীর হস্তে কয়েকটি বটিকা দিয়া তাহার ব্যবহারবিধি বলিয়া অন্তর্হিত হন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগিণী যাবতীয় উপসর্গের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া শান্তিলাভ করেন। এইরূপ আরও বহু ঘটনা আছে। সদ্‌গুরু যে সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার জ্ঞানের অগোচর যে কিছুই থাকিতে পারে না, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। আমি ত কোন প্রকার সংবাদ দিই নাই, দিবার সময় ও সুবিধা কিছুই ছিল না। এমন কি, তার দ্বারা জানাইবারও অবকাশ ছিল না—অথচ গুরুদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আবির্ভূত হন ও অযাচিত ভাবে আসন্নমৃত্যু রোগীকে রোগের কবল হইতে ক্ষণেকের মধ্যেই উদ্ধার করেন। ইহাতে সদ্‌গুরুর সর্ব্বজ্ঞত্ব, করুণা এবং লোকোত্তর শক্তিমত্তা সমকালে প্রকাশিত হইতেছে।

একদিন এই বিষয়ের অবতারণা করিলে বাবাজী বলিয়াছিলেন, "বৎস গুরু যে কি বস্তু তাহা তোমরা এখনও চিনিতে পার নাই। যোগী ভিন্ন কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। শিষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণের ভার গুরু স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যোগী গুরু আপন ব্যাপক সত্তার প্রভাবে যুগপৎ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাজাগ্রদ্‌ভাবে বিদ্যমান থাকেন। ভক্তের আর্ত্তধ্বনি তাঁহাকে আবিভূর্ত করায়। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের প্রত্যেকের নিকটে রহিয়াছি; তোমরা ক্রিয়াতে উন্নত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে।"

গত ১৯২৮ সালে জুন মাসে কলিকাতায়, বাবাজী রূপনারায়ণ নন্দন লেনে অবস্থানকালে আমি সেখানে গিয়াছিলাম। একদিন (বোধ হয় ৭ই তারিখ) সকাল বেলা প্রাতর্ভ্রমণের পরে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। বাবা বলিতেছিলেন—"ষট্‌চক্রের কথা আমার 'প্রকৃতিতত্ত্বে' কিছু আছে। তাহাও ভুল। সাধারণতঃ অন্যত্র যা দেখা যায়, তাহাও ভুল। উহা এমন জটিল যে, ভাষায় বুঝান যায় না। তবে কমলের দল সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝা ও বোঝানো যায়। দলের সংখ্যা ৪, ৬, ১০, ১২, ১৬ ও ২। কুণ্ডলিনী জাগিলেই একটি তেজোময় জিনিষ প্রকাশিত হয়। নাভিকুণ্ড হইতে নিম্নপর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী সুপ্তাবস্থায় ছড়াইয়া আছে। সেই তেজোমধ্যে চারিটি স্তর বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার তিনটি ইড়াদি তিন নাড়ীর তিন বর্ণ হইতে ও চতুর্থটি সমষ্টিবর্ণ হতে উদ্‌ভূত। সাধনবলে এই চারিটি উঠিতে থাকে—ইহার প্রতবিম্ব তথায় বর্ত্তমান থাকে। উর্দ্ধস্তরে ইড়াও পিঙ্গলা নিস্তেজ থাকে বলিয়া উভয়ের সাম্য-জনিত

সুষম্না উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশমান থাকে। ইহার উর্দ্ধস্তরের একটি বর্ণ থাকে। মোট ছয়টি বর্ণ তখন ফুটিয়া উঠে। এই প্রকারে ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে। আজ্ঞাচক্রে শুধু দুইটি বর্ণ। পঞ্চ চক্রের ৪৮টি বর্ণ একাকার হইয়া গেলে তাহার সারাংশ এক হইয়া উর্দ্ধে যায়। ইহাই জ্ঞান চক্ষুঃ। উর্দ্ধে যাইয়াই সেখানকার আবরণ সরাইয়া ফেলে। তখন উপর হইতেও একটি তেজঃ নামিয়া আসে। আজ্ঞাচক্রে উভয় তেজের মিলন হয়! এই জন্য ইহা দ্বিদল। সহস্রারের তেজঃ নিরন্তর আসিতেছে, কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্ত জীব তাহা বুঝিতে পারে না। যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারে। ইহাই আজ্ঞা-চক্রের ব্যাপার, সমস্ত চক্রের শক্তির সার অংশই জ্ঞান—ক্রিয়া হইতেই ইহার বিকাশ হয়। তখন সকল বর্ণ একাকার হইয়া যায়, বৈচিত্র্য থাকে না; অর্থাৎ বৈচিত্র্যের অন্তরে অভেদ দেখা যায়। পরে ভেদ-বোধ কাটিয়া যায়। ক্রিয়া হইতে চক্র-ভেদ হইতে থাকে। নিম্ন নিম্ন স্তরের সারাংশ লইয়া উপরে উঠিতে হয়, সার বাহির করিতে না পারিলে উপরে উঠা যায় না। কেহ যদি জোর করিয়া উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলেও উপরে থাকিতে পারে না। আজ্ঞাচক্রে না গেলে বোধ হয় না। সবই হয় বটে, কিন্তু উপলব্ধিতে আসে না। কুণ্ডলিনী জাগিলেই নাভিপদ্ম ফোটে। এই পদ্ম সকলের দেহেই আছে—কিন্তু মুদ্রিত হইয়া আছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণ আর অন্তঃসূর্য্যের উদয় একই কথা। ইহাই জ্ঞান-সূর্য্য—ইহার উদয়ে পদ্ম আপনিই ফোটে।” এই বলিয়া তিনি বলিলেন, “আমরা প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আমরা কিছু মানি না।” ইহা বলিতে বলিতে তিনি নিজের নাভির চারিদিকে কয়েকবার হাত দিয়া টিপিলেন। দেখা গেল নাভির গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে—মধ্য হইতে অতি মনোহর কান্তিযুক্ত একটি লাল কমল বাহির হইতেছে। ক্রমশঃ উহা অধিকতর প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমরা শুঁকিয়া দেখিলাম, অতি মনোহর কমলের সৌরভ—আঘ্রাণ করিলাম। ব্রহ্মনালের উপর কমলটি ফুটিয়া ছিল, নীচে মৃণাল। বাবা বলিলেন, ‘বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি—এসব পৌরাণিক বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই কমল ফুটে না। নাভিতে গ্রন্থিবন্ধন আছে ইহার উন্মোচন ভিন্ন সিদ্ধিলাভের আশা দূরাশা মাত্র।”

কথাপ্রসঙ্গে একদিন সাক্ষী ও লীলা-তত্ত্ব বুঝাইতেছিলেন। আমি বলিলাম, “বাবা, আপনি যে মহাশক্তির কথা বলেন, তাঁহার সহিত গুণময়ী প্রকৃতির সম্বন্ধ কি?” বাবা বলিলেন, “বৎস, মহাশক্তিই্ ত প্রকৃতিকে লইয়া খেলিতেছেন। আবার তিনি নিজেই নিজের খেলা দেখিতেছেন। প্রকৃতিতে সুধাও আছে, বিষও আছে—আলো-আঁধার দুইই আছে। তবে যেদিকে আলো, সেদিকে আঁধার নাই, যেদিকে অন্ধকার, সেদিকে আলো নাই। কিন্তু আলোর এমনি প্রভাব যে, তাহার

আঘাতে অন্ধকার সরিয়া যায়। কিন্তু অন্ধকার আলোককে অপসারিত করিতে পারে না। প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যিনি মহাশক্তির চরণতলে পৌঁছিয়াছেন, তিনি প্রকৃতির এই খেলা দেখিতে পারেন। প্রকৃতিকে লইয়া তিনি খেলিতেও পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দায়িত্ব নাই। তিনি মহাশক্তির নিমিত্তমাত্র হইয়া খেলা করেন। তিনি মায়াতীতও পাপপুণ্যের অনধীন। যাহারা মায়ার অধীন, তাহারা এই খেলা দেখিয়া সত্য বলিয়া মোহিত হয়। কিন্তু যিনি যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত, তিনি খেলা দেখেন মাত্র, তিনি খেলাকে খেলা বলিয়াই জানেন। এই জন্য তিনি নিজে মোহিত না হইয়া অজ্ঞানীকে খেলা দেখাইতে পারেন। অজ্ঞানীর চোখে আবরণ আছে বলিয়া তাহার নিকটে এক বস্তুতে আবরণ দিয়া অন্য বস্তুর প্রকাশ করা চলে—অবশ্য ইচ্ছার প্রভাববশতঃ। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টি নির্ম্মল, তাহাকে ঈশ্বরও ভুলাইতে কিংবা মোহিত করিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বদাই মূল সত্তাটি দেখিতে পান—তাই সেখানে আবরণ চলে না। তাঁহাকে কেহই ফাঁকি দিতে পারে না।” আমি বলিলাম, “আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটি অজ্ঞানের ব্যাপার। আপনি যাহা বুঝাইলেন তাহাতে মনে হইতেছে যে, উভয় বস্তুই সমভাবে মিথ্যা বলিয়া একটিকে অন্যটির মতন দেখান সম্ভবপর হয়। গোলাপ ফুলকে জবাফুল করিয়া দেখান যায়—জবাফুল করিতেও পারা যায়, কারণ গোলাপ ও জবা উভয়ই ফাঁকি। গোলাপকে আবৃত করিয়া সেখানে বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে জবার প্রস্ফুরণ করা চলে। কিন্তু যিনি মহাসত্তাকে দেখিতে পান, যিনি গোলাপ জবা উভয়ই প্রাতিভাসিক বলিয়া জানেন, তাঁহাকে ভুলান যায় না। সে অবস্থায় সবই প্রাতিভাসিক। প্রতিভাস স্বভাবের অধীন—কাহারও ইচ্ছা সেখানে কার্য্যকরী হয় না। তাই এ অবস্থাতে স্বাধীনতার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। এখানকার নিয়ামক একমাত্র স্বভাব—এমন কি স্বেচ্ছাও নিয়ামক নহে। আমার ত এইরূপই মনে হয়।” বাবা বলিলেন, “হাঁ, কতকটা ঐরূপই বটে।”

একদিন মন্ত্রতত্ত্বের আলোচনা হইতেছিল। প্রসঙ্গতঃ গায়ত্রীর বিষয়ে কথা উঠিল। বাবা বলিলেন, “গায়ত্রী উপাসনা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। আজ-কাল ব্রাহ্মণের ছেলে সন্ধ্যা-গায়ত্রী ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা শুভলক্ষণ নহে। ব্রাহ্মণ যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অভাব কি? সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণের অধীন।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “গায়ত্রী মন্ত্র বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। মন্ত্রমাত্রই শব্দসমষ্টি বলিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই—গায়ত্রী মন্ত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কী?” বাবা উত্তরে বলিলেন, “সকল মন্ত্রেই বৈশিষ্ট্য আছে, তবে গায়ত্রীর বৈশিষ্ট্য কিছু বেশি।” তিনি আরও বলিলেন, “আমি গায়ত্রীর তেজঃ ঘনীভূত করিয়া

আবরণের দ্বারা পুটিত করিয়া শিশিতে রাখিয়াছি। তুমি তাহার কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিয়া একটি তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপর গায়ত্রী মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে, গায়ত্রী-মন্ত্রগত শব্দের কি প্রভাব। তাম্রপাত্রটি গঙ্গাজল দ্বারা ধৌত করিয়া লইও এবং ঐ পদার্থের চারিদিকে তূলার দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিও।" এই বলিয়া তিনি আমাকে একটি শিশি হইতে কৃষ্ণাভ একটি বস্তু দিলেন—আমি উহা লইয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী একটি তাম্রকুণ্ড ধুইয়া উহার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিলাম ও চারিদিকে তুলা দিয়া ঘেরিয়া গায়ত্রী মন্ত্র উহার উপর মনে মনে জপ করিলাম। হস্ত দ্বারা বস্তুটিকে স্পর্শ করি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, জপ সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুটিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রদীপ্ত অগ্নি তুলারাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

এইরূপ কত সময় যে কত বিষয় দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, তাহার গণনা নাই। অণিমা ও মহিমা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন আঙ্গুল মোটা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। আধলা হইতে গিনি তৈয়ার করা, টাকা বা অন্য কোন বস্তু উড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ পরমাণুরূপে অব্যক্ত করিয়া ফেলা, ইড়াপিঙ্গলা ও সুষুন্নার এবং লিঙ্গদেহের পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ আকর্ষণ করিয়া দেখান, প্রেতাকর্ষণ, শরীরাভ্যন্তরে স্ফটিকাদি ঢুকাইয়া দেওয়া ও বাহির করা, নারিকেল তৈল, পুরাতন ঘৃত, সদ্যোনির্ম্মিত গব্য ঘৃত, চাটনি, নানাপ্রকারের সন্দেশ, রসগোল্লা, চমচম পানের উৎকৃষ্ট মসলা, জাফরান, কারবোলিক এসিড, ফিনাইল, কুইনাইন চুর্ণ কুইনাইন টেবলেট, ধূপ, বেদানা, মহাশঙ্খবটী, চ্যবনপ্রাশ, মকরধ্বজ, লৌহময়ী সূচী, বোতলের মধ্যে ভায়লেট গাছ, হীরক সুবর্ণ মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শত শত প্রকারের বস্তুর নির্ম্মাণ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জীবের মধ্যে মাছি, চামচিকা প্রভৃতি জীবজন্তু তৈয়ার করিতে দেখিয়াছি। সকল বিষয় লিখিয়া বর্ণনা করা চলে না। বিশেষতঃ অন্তর্জগৎ ও সাধন রাজ্যের সম্বন্ধে কোন কথা ব্যক্ত করিয়া প্রচার করা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

এই সব ব্যাপার নিরন্তর দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রকৃত যোগী অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। প্রত্যেক মনুষ্যই চেষ্টা করিলে ও ঠিক পথে অগ্রসর হইলে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। মানুষ যে কত মহৎ, কত বড়, তাহা আত্মবৃস্মিত হইয়া সে ভুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন সৎ পথে চলিতে পারিলে আবার সব বুঝিতে পারিবে। তিনি এই জন্যই কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইয়া থাকেন। এই সব দেখিয়া যখন মনুষ্য বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে, শুধু কর্ষণের অভাবে তাহার বিকাশ হইতেছে না, তখন সে বহির্মুখতা ও বিষয়-লিপ্সা ত্যাগ করিয়া যথার্থ বৈরাগ্য ও বিবেককে সঙ্গে

করিয়া অনাসক্ত কর্ম্মিরূপে পরমানন্দময় শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। যিনি সর্ব্বজগতের ও যাবতীয় ভাবের মূল উৎস, তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের আর কোন্ অভাবই বা থাকিতে পারে? দেবদেবীতে অবিশ্বাস, শাস্ত্রে অবিশ্বাস গুরু ও মহাজন বাক্যে অবিশ্বাস, ইহাই বর্ত্তমান সমাজের অবনতির কারণ। কিন্তু ইহাও অহেতুক নহে। দীর্ঘকাল তপঃসাধন পূর্ব্বক সত্যের উপলব্ধি এখন অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। তাই সত্যলাভের মহত্ত্ব প্রায় কেহই প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে না। বহির্ভাবপ্রবণ মানব কিছু লোকোত্তর শক্তির প্রভাব দেখিতে না পারিলে শুধু বাক্‌প্রপঞ্চে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, বিভূতি দেখান উচিত নহে, তাহাতে সাধকের ক্ষতি হয়। কেহ মনে করেন, বিভূতি তুচ্ছ জিনিষ, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার কোন হেতু নাই। কেহ বলেন, বিভূতি অনিত্য ধর্ম্ম, নিত্য বস্তুই সাধ্য—অনিত্য ধর্ম্মের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ উচিত নহে। অন্য কোন কোন লোকের ধারণা, জ্ঞানী বা যোগী মায়াতীত ও নিস্ত্রৈগুণ্য পদে আরূঢ় হইলে বিভূতি অতিক্রম করিয়া যান—তিনি বিভূতি দেখাইবেন কি প্রকারে? এই সকল শঙ্কার সমাধান-চেষ্টা এখানে নিষ্প্রয়োজন হইলেও সংক্ষেপে দুই একটি প্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

যোগবিভূতি সম্বন্ধে এই সকল ধারণাই অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। লোকোত্তর ব্যাপার মাত্রই বিভূতির নিদর্শন বটে, কিন্তু উহা যোগবিভূতি নহে। পরম পদার্থের সহিত সংযোগ হইলে জীবভাব অভিভূত হইয়া তাহাতে যে ঐশ্বর্য্য ভাবের উদয় হয় তাহাই যোগ-বিভূতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিরূপে উহা ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করে। সমবাহু ত্রিকোণের তিন বিন্দুই উন্মেষপ্রাপ্ত শক্তিত্রয়ের প্রকটিত রূপ। বিভাগের পূর্ব্বে ইচ্ছাদি শক্তিত্রয় মধ্যবিন্দুতে একাত্মভাবে পরাশক্তিরূপে বিলীন থাকে। এই মধ্যবিন্দুতে অবস্থিতিই যোগ—এখান হইতে যে স্ফুরণ হয়, তাহাই যোগবিভূতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে এই স্ফুরণ প্রকাশিত হয় বলিয়া ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে যোগবিভূতি বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যায় বিদ্বান না হইলে স্থিতি হয় না, পরম সাম্য সংঘটিত হয় না, নিরঞ্জন সাক্ষিভাবের বিকাশ হয় না। যোগ হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়। সুতরাং যোগবিভূতি ব্রহ্মজ্ঞানেরই নিদর্শন। বস্তুতঃ চিন্ময়ী পরাশক্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে যোগীর অসাধ্য কি থাকিতে পারে? তখন মহামায়ার কৃপায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বশীভূত হয়—ইহাই ঐশ্বর্য্য। কারণ, মায়াকে অধীন করার নামই ঈশ্বরত্ব। ইহা অখণ্ডৈশ্বর্য যাবতীয় খণ্ডৈশ্বর্য্য ইহারই ভিন্ন ভিন্ন আংশিক বিকাশ মাত্র। যোগী এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর তাঁহার চ্যুত হইবার ভয় থাকে না। আত্মবিস্মৃত জীবকে আপন স্বভাবে

ফিরাইয়া লইবার জন্য যোগিগণ অধিকার ও যোগ্যতা বিচার করিয়া কাহাকেও কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া থাকেন—কিন্তু ইহাও তাঁহারা পরমেশ্বরের আদেশানুসারেই করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা কি? প্রকৃত যোগীর আসক্তি ও অহঙ্কার থাকে না—তাঁহার যোগ কখনই খণ্ডিত হইবার নহে। পাতঞ্জল দর্শনে মধুমতী অবস্থার কথা যে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নভূমির কথা। সিদ্ধযোগী পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত—তিনি পাতঞ্জল সম্প্রদায়ের চতুর্থ ভূমিরও অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। উপাদান ও নিমিত্ত অভিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত, অদ্বৈত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত, যোগিপদবাচ্য হওয়া যায় না। কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন নিবন্ধন প্রজ্ঞানেত্রের উন্মীলনের ক্রম-পরিণতিতে শিবত্বের বিকাশ পূর্ণতালাভ করিলে প্রকৃত যোগভাবের উপলব্ধি হয়। বিশুদ্ধ চৈতন্য নিত্য স্বপ্রকাশ হইলেও এই অবস্থাতেই আত্মপ্রকাশ করে। যোগী তখন শক্তিচক্রের নাভিতে অধিরূঢ় হইয়া অনন্ত শক্তি লইয়া খেলা করিতে পারেন, আবার নিজের খেলা নিজেই দেখিতেও পারেন। বস্তুতঃ মহাশক্তির সঙ্গে যোগ-যুক্ত বলিয়া তাঁহার পক্ষে খেলা করা ও খেলা দেখাতে কোন প্রভেদ নাই। যে অহঙ্কার বিমূঢ় সে গুণাত্মিকা প্রকৃতির খেলাকে নিজকৃত মনে করিয়া নিজে কর্ত্তা সাজিয়া বসে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে অহঙ্কারবিহীন ও গুণাতীত শুদ্ধ চিদবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হইয়াও সব কার্য্য করেন এবং অখিল কার্য্য করিয়াও নির্লিপ্ত সাক্ষীই থাকেন। তিনি স্বভাবে আছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে খেলা করা ও খেলা দেখা একই ব্যাপারের এ-পিঠ ও-পিঠ মাত্র।

অলৌকিক ব্যাপার মাত্রই যোগ-বিভূতির নিদর্শন নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাহ্য উপাদান অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া-কৌশলে তাহাকে ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। নিমিত্ত ও উপাদানের ভেদ থাকে বটে, কিন্তু জ্ঞানোৎকর্ষ বশতঃ উপাদানকে আয়ত্ত করিয়া তাহার দ্বারা অভীষ্ট কার্য্যসংসাধন করা চলে। ইহাই বিজ্ঞান। মূল সূত্রের ভেদে বিজ্ঞানের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। সূর্য্যবিজ্ঞান বিজ্ঞানজগতের শিরোমণি। চন্দ্র, নক্ষত্র, বায়ু ও ক্ষণ অবলম্বন করিয়াও এক এক প্রকার বৈজ্ঞানিক পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে। সূর্য্য-বিজ্ঞানের কথা চরিত-কথায় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের রহস্যও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এই সকল বিষয়ের বিস্তরিত বিবরণ লিখিবার ইহা স্থান নহে। যদি গুরুদেবের কৃপা হয়, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এখানে শুধু ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, সাধারণতঃ লোকে যাহাকে বিভূতি বলে তাহা বিজ্ঞানেরই ব্যাপার—তাহা যোগবিভূতি নহে। পাতঞ্জল দর্শনে বিভূতিপাদে যে সকল বিভূতির বর্ণনা আছে তাঁহার অধিকাংশ বিজ্ঞানেরই

অন্তর্গত। বিজ্ঞান মতে কার্য্যোৎপত্তি তৎ তৎ কারণ সাপেক্ষ, কিন্তু যোগী নিখিল কার্য্য স্বাত্মভাব হইতেই প্রাদুর্ভূত করিতে পারেন। এখানে পৃথক কার্য্যকারণভাবের স্বীকার আবশ্যক হয় না। ইহার কারণ এই, বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা সমগ্র কারণ-চক্রকে স্বায়ত্ত না করিলে যোগ ও জ্ঞানের উদয় হয় না, কিন্তু বিজ্ঞানে কারণকে পৃথক রাখিয়াও তাহাকে বশীভূত করিয়া শক্তি প্রভাবে কার্য্যোৎপাদন করিতে পারা যায়। যোগে পূর্ণ-আত্মাতে স্বাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইচ্ছামাত্রই কার্য্যের স্ফুরণ হয়—উপাদানের অপেক্ষা থাকে না। যে মূল সত্তা হইতে যাবতীয় কার্য্যের সৃষ্টি হয় তাহা যোগীর আয়ত্ত—তাই ইচ্ছা করিবামাত্রই ঐ সত্তা হইতে ইচ্ছানুরূপ প্রতিভাসের আবির্ভাব হয়। যোগীর অপ্রাপ্ত কিছুই নাই—সেই জন্য উপাদেয়ও কিছুই নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন।—

চিদাত্মা হি দেবোহন্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাদ্ বহিঃ।
যোগীব নিরূপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ।।

ইহাই যোগিসৃষ্টির রহস্য। কিন্তু বিজ্ঞানের সৃষ্টিতে পৃথক্ উপাদানের আবশ্যকতা আছে। সাধারণ লোকে সূক্ষ্ম উপাদান দেখিতে পায় না বলিয়া যোগ ও বিজ্ঞানের পরস্পর ভেদ বুঝিতে পারে না।

যাঁহারা বিভূতিকে তুচ্ছ মনে করেন, তাঁহারা যদি বিভূতির অধীশ্বর হইয়া বিভূতির তত্ত্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহারা বিভূতিকে তুচ্ছ মনে করিবেন না। যে সকল লোক বিভূতির স্বরূপ অবগত নহে, তাহারা যদি আত্মমাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য অনধিগত ও অনধিগম্য বস্তুর নিন্দাবাদ করে, তাহা হইলে উহা অমূলক ভাষণ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য। যে নিঃসম্বল দরিদ্র সামান্য দুইটি পয়সার জন্য চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তাহার মুখে কোটি-পরিমিত স্বর্ণমুদ্রার নিন্দা শোভা পায় না। পূর্ণ অর্থ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াও যদি তাহাতে চিত্ত অবিকৃত থাকে, তবে ধনী হইয়া ধনের নিন্দাবাদ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। অর্থ স্বভাবতঃ অপকারক বস্তু নহে, অর্থের ব্যবহার হইতেই উপকার বা অপকার ঘটিয়া থাকে। অর্থের দ্বারা উপকার করা যায়, অপকারও করা হয়—অর্থবানের মানসিক ভাবের উৎকর্ষ বা অপকর্ষই অর্থের বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগের মূল কারণ। তদ্রূপ বিভূতি স্বভাবতঃ খারাপ জিনিষ নহে। যোগাভ্যাস ও সূক্ষ্মবিজ্ঞান তত্ত্বের অভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে বিভূতি আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়। তাহাকে পৃথগ্‌ভাবে আবাহন করিবার প্রয়োজন হয় না। আগুন জ্বালিয়া যেমন তাপকে আমন্ত্রণ করিতে হয় না, সেই প্রকার সাধন-পথে প্রবিষ্ট হইয়া অধিকারী হইলে সিদ্ধিকে আকর্ষণ করিতে হয় না। সিদ্ধি আপনিই আসে।

বুদ্ধদেব, মুসা, এলিসা, যীশুখ্রীষ্ট, এপলোনিয়স, নাগার্জ্জুন, গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ, শঙ্করাচার্য্য, কবীর, নানক, চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মগণ সকলেই শক্তিশালী ছিলেন। প্রাচীন যুগের অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণের অলোকসামান্য ক্ষমতার কথা ত আলোচনা করাই অনাবশ্যক। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে মৌদগলায়ন, সারিপুত্র প্রভৃতি, গোরক্ষের সম্প্রদায় মধ্যে চর্পটি, চতুরঙ্গী প্রভৃতি, যীশুর মতানুসরণকারিগণের মধ্যে পলা ও আসিসির সেন্টফ্রান্সিস, ডায়োসপলিসের সেন্ট জর্জ প্রভৃতি সকলেই বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অবসর বুঝিয়া ও প্রয়োজনানুসারে যোগ-বিভূতি প্রভৃতির প্রয়োগ করিতেন—একথা যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। বিভূতিকে তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা নিজেদের মহত্ত্ব খ্যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জ্ঞানী এবং শ্রদ্ধেয় নহেন, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে শাস্ত্রে যে কোন কোন স্থানে বিভূতিকে উপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, তাহা প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করিয়া। অবশ্য, ইহা মার্গস্থ সাধকের জন্যই বুঝিতে হইবে। মার্গের অবসানে পরা সিদ্ধি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রের শাসন-বাক্য তাঁহার জন্য নহে। সাধক অবস্থায় খণ্ড সিদ্ধির উদয় হইলে উহাকে সংযত করিয়া রাখিতে হয়, তাহাতে একপক্ষে যেমন সংযম বশতঃ সিদ্ধির উৎকর্ষ হয়, অপর পক্ষে তেমনই ঊর্দ্ধভূমিতে আরোহণ করিবার সৌকর্য্য জন্মে। জ্ঞানের প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ না করিয়া অন্যকে উপদেশ দিতে যাওয়া যেমন ধৃষ্টতা মাত্র, তেমনই সিদ্ধির পূর্ণতা লাভ না করিয়া তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন করাও মূঢ়তা। সিদ্ধিকে অন্তরায় বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। রোগনিবৃত্তি হইলে যেমন বলাধান হইবেই, তেমনি আত্মার মলনিবৃত্তি হইলে ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হইবেই। বল যেমন সুস্থদেহের চিহ্ন, ঐশ্বর্য্যেও তেমনি যোগের নিদর্শন। সুতরাং ইহা উপেক্ষণীয় নয়।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, অধ্যাত্মপথে সিদ্ধির কোন সার্থকতা আছে কি? অবশ্য অন্যকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তাহার বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সিদ্ধির উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু সিদ্ধিলাভে নিজের কোনও কল্যাণ সাধিত হয় কি? ইহার উত্তর এই—নিশ্চয়ই হয়। ভোগ না করিয়া যেমন ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে, করিতে গেলেও উহা কপটাচার মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সেই প্রকার ঐশ্বর্য্যলাভ না করিয়া প্রকৃত আত্মসমর্পণ হয় না। আত্মসমর্পণ ব্যাতিরেকে পরম পদার্থে স্থিতি হওয়ারও উপায় নাই। আমার বিক্ষিপ্ত উপাদান সমগ্র জগতে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই জন্য চারিদিকে আমার প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া জড়াইয়া পড়ে। আমার নিজের অংশ যদি জগতে বিক্ষিপ্ত না থাকিত, তাহা হইলে আমি আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া স্থির থাকিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা পারি না।

সুতরাং আবার আমাকে ঐ সকল আপন উপাদানরাশি টানিয়া আনিতে হইবে, একত্র জমাইয়া ঘনীভূত করিতে হইবে, একাগ্র করিতে হইবে, তবে ত আমি সমগ্রতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। এই একাগ্রতা বা সমগ্রতাই সিদ্ধি। এই অবস্থা আয়ত্ত হইলে কিছু [illegible]ভাব থাকে না। তখন নিরোধ আপনিই অভিমুখ হয়, কারণ সিদ্ধি পরমার্থের বা পরম চৈতন্যের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে। সিদ্ধ চিত্ত চৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই আত্মসমর্পণ সম্পন্ন হয়, ইহার ফল মহাসিদ্ধি বা আত্ম স্বরূপের আবির্ভাব—অর্থাৎ স্বভাবে স্থিতি। বলা বাহুল্য, বিক্ষিপ্ত চিত্ত আত্মসমর্পণের অধিকারী নহে।

বিভূতি অনিত্য কি নিত্য, সে আলোচনা নিষ্ফল। এক হিসাবে জগতে সবই অনিত্য হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে সবই নিত্য। অজ্ঞানীর চক্ষুতে যাহা জড়, জ্ঞানীর ব্রহ্মদৃষ্টিতে তাহা চৈতন্যস্বরূপ। বিভূতি বা সিদ্ধি শক্তিস্বরূপ। শক্তি বিভক্ত ও খণ্ডভাবে অনিত্য হইলেও অবিভক্ত ও অখণ্ডভাবে চিন্ময়ী এবং নিত্য। সুতরাং আত্মা যখন পরমাত্মায় যুক্ত হয়, তখন তাহার শক্তিও খণ্ডতা ও পরিচ্ছিন্নতা পরিহারপূর্ব্বক পরা শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। পরমেশ্বর যেমন নিত্য, তাঁহার এই পরাশক্তিও তেমনই নিত্য। উভয়ই চৈতন্যস্বরূপ। বাস্তবিক পক্ষে উভয়ে কোন ভেদ নাই। দ্রষ্টৃভাবে শিবত্বের ও দর্শন দৃশ্যভাবে শক্তিত্বের আরোপ হয় মাত্র—কিন্তু উভয়ে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। শক্তিই অনন্ত আকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন—পরমেশ্বর সকলের মধ্যে অনুস্যুত থাকিয়াও সকল ভাব হইতে পৃথকরূপে উদাসীন ও সাক্ষী হইয়া নিরন্তর আপন শক্তির ক্রীড়া দেখিতেছেন। শুদ্ধ জগৎ, মিশ্র বা মায়িক জগৎ এবং অশুদ্ধ বা গুণাত্মক প্রাকৃত জগৎ—সর্ব্বত্র শক্তিরই সঙ্কোচ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির অন্তর্লীনাবস্থা আছে বলিয়া বিভূতিকে অনিত্য বলা যাইতে পারে—কিন্তু মহাশক্তির লয় নাই বলিয়া চরম দৃষ্টিতে বিভূতিও নিত্য পদার্থ।

যোগী ত্রিগুণ ও মায়ার অতীত হইলে চিত্ত অব্যক্ত হইয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, মায়াতীত অবস্থায় বিভূতির স্ফুরণ হইতে পারে না। ইঁহাদের বিশ্বাস, প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইতে বিভূতির উদয় হইতে পারে—গুণাতীত অবস্থায় সত্ত্বগুণ থাকে না বলিয়া এবং পুরুষ সত্ত্ব হইতে পৃথকভাবে প্রকাশমান হয় বলিয়া সিদ্ধি থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাস আপেক্ষিক সত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের ব্যাপক রূপ দেখিলে ইহা নির্ম্মল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সত্ত্বশুদ্ধি হইতে যে বিভূতির স্ফূরণ হয়। তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞান পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে পরবৈরাগ্যের দ্বারা অতিক্রান্ত হইলে যে বিভূতি থাকে না, তাহাও সত্য। কিন্তু ইহা ঈশ্বরোপাসকের পক্ষে সত্য নহে। কারণ অপ্রাকৃত ও বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ উপাধির

সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকাতে পরমেশ্বর নিত্যমুক্ত ও নিত্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন—জীব যখন তাঁহার কৃপায় এই অপ্রাকৃত সত্ত্বে অবস্থান করে, তখন তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহারই সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়। তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, অথচ বিশুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে পরমমঙ্গলময় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। তখন প্রাকৃত সত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাকৃতিক বিভূতির তিরোধান হইলেও পরমেশ্বর সম্বন্ধ নিবন্ধন মহাবিভূতির উন্মেষ হয়।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। পাতঞ্জলমতে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, ইহাতে সত্ত্বগুণ বা প্রকাশধর্ম্ম, রজোগুণ বা প্রবৃত্তিধর্ম্ম এবং তমোগুণ বা স্থিতিধর্ম আছে। কিন্তু তিন গুণ সকল চিত্তে সকল সময়ে সমভাগে থাকে না। কোন চিত্তে কখনও কোন গুণের আধিক্য থাকে, অন্যান্য গুণের ন্যূনতা থাকে। তবে প্রত্যেক চিত্তেই সব গুণ বর্ত্তমান থাকে। চিত্তের মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পঞ্চভূমি গুণভেদ-নিবন্ধন। ইহার মধ্যে প্রথম দুই ভূমি যথাক্রমে তমঃ ও রজোগুণের প্রাধান্য বশতঃ যোগ-সাধনার একান্ত অযোগ্য, কারণ ঐ ভূমিতে সমাধির উদয় হয় না। দৈত্যদানবগণের চিত্ত ও বিষয়-লোলুপ মনুষ্যগণের চিত্ত ক্ষিপ্ত—সর্ব্বদাই রজোগুণের দ্বারা তৎতদ্ বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয় বলিয়া অত্যন্ত অস্থির। রাক্ষস-পিশাচাদির চিত্ত ও মাদকাদি সেবামত্ত পামরগণের চিত্ত মূঢ়—তমোগুণের আধিক্যবশতঃ নিদ্রালু ও জড়ত্ববিশিষ্ট। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে—যে ভূমিতে নিম্নস্তরের দেবগণ ও জিজ্ঞাসুগণ অবস্থিত—সমাধি হয় বটে, তবে উহা অপ্রধান, বিক্ষেপই উহাতে প্রধান। বিক্ষেপের প্রাধান্যবশতঃ তদঙ্গীভূত—সমাধি যোগের অনুকুল হয় না। প্রবল বিরোধীবর্গের মধ্যে থাকিলে স্বকীয় কার্য্য সাধনে সামর্থ্য জন্মে না। একাগ্র ও নিরুদ্ধভূমিই প্রকৃত যোগভূমি। ইহার মধ্যে আবার নিরোধই মুখ্যযোগরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য, তবে একাগ্র-ভূমিতে ধ্যেয় ভিন্ন অপর সকল ভাব তিরোহিত হয় বলিয়া উহাকেও গৌণযোগ বলা যাইতে পারে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাতাবস্থা—এই অবস্থায় সত্য পদার্থের প্রকাশ হয়, অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ ক্ষীণ হইতে থাকে, কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়, এবং নিরোধ অভিমুখ হয়। ইহার পর যাবতীয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে পতঞ্জলি সম্মত যথার্থ যোগের আবির্ভাব হয়। তখন দ্রষ্টা পুরুষ আপন শক্তিস্বরূপে স্থিতিলাভ করে।

যখন চিত্তসত্ত্বে রজঃ ও তমোগুণের সংসর্গ থাকে—অর্থাৎ চিত্তাকারে পরিণত সত্ত্বে যখন তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ও পরস্পর সমভাগে রজঃ ও তমোগুণ অনুবিদ্ধ থাকে—তখন চিত্তে ঐশ্বর্য্য ও বিষয় প্রীতিকর বোধ হয়। তখন চিত্ত সত্ত্বপ্রধান বলিয়া যদিও তত্ত্ব প্রণিধান করিতে অভিলাষী হয়, তথাপি তত্ত্ব তমোগুণের আবরণে আবৃত থাকিবার দরুণ ভ্রমবশতঃ বিভূতিকেই তত্ত্ব

মনে করিয়া উহারই প্রণিধান করিতে ইচ্ছা করে। ক্ষণমাত্র প্রণিধান করেও বটে। কিন্তু তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। কারণ, রজোগুণ তখনই তাহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আইসে। ফলে বিভূতির অনুরাগ মাত্রই তাহাতে থাকে, বিভূতিলাভ হয় না। শব্দাদি বিষয়ের প্রতি এই প্রকার চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়। যখন তমোগুণ রজোগুণকে জয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন রজঃ চিত্তসত্ত্বের আবরক তমঃকে উৎসারিত করিতে না পারার দরুণ তামসিক চিত্ত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য যুক্ত হয়। যখন ঐ চিত্তসত্ত্বে সত্ত্বের—আধিক্য হয়, তখন উহা সর্ব্বতঃ দ্যোতমান হয় ও উহার মোহাবরণ ক্ষীণ হয়। যখন রজোগুণ সত্ত্বের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি হয়। আর যখন ঐ চিত্তসত্ত্বে রজোগুণের লেশরূপ মলও থাকে না, তখন উহা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তসত্ত্বের মল বিদূরিত হয়। চিত্তের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হইলে বিষয় ও ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাহার হয়। কিন্তু তখনও চিত্তের কর্ত্তব্যরূপ অধিকার সমাপ্ত হয় না। তখন তাহার একমাত্র কার্য্য অবশিষ্ট থাকে—তাহা সত্ত্ব ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি বা বিবেকখ্যাতি। এই অবস্থায় ধর্ম্মমেঘসমাধি বা পরম প্রসংখ্যান উদিত হয়। এই সমাধির অবস্থায় চিত্ত অত্যন্ত নির্ম্মল ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু নির্ম্মল হইলেও ইহা প্রকৃতির বিকার বলিয়া পরিণামশালী ও পুরুষের সহিত তুলনায় মলিন। পুরুষ অথবা চিৎশক্তি পরিণামশূন্য, বিষয়েতে সঙ্গহীন, শুদ্ধ এবং অনন্ত। বিবেকজ্ঞানের অবস্থায় চিত্ত অত্যন্ত শুদ্ধ হইলেও গুণাত্মক বলিয়া পুরুষের বিপরীতভাবাপন্ন। কাজেই, একবার পুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে চিত্তের এই স্বাভাবিক মলিনতা অনুভূত হয় বলিয়া ইহারও পরিহার হইয়া যায়। চিত্ত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ বিষয়াকারে পরিণত হয়। কিন্তু চৈতন্যে ধর্ম্ম, লক্ষণ অথবা অবস্থা কোন প্রকার পরিণাম নাই বলিয়া ইহা ক্রিয়ারূপ ধারণ করে না এবং চিত্তের সংযোগেও অপরিণামী স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই চিত্তস্থ বিষয়কে প্রকাশিত করে। এই জন্যই চৈতন্যের সংক্রমণ এবং বিষয়াকারপ্রাপ্ত বুদ্ধিতে আরোহণ কখনই সম্ভবপর হয় না, অথচ চিদালোকে বিষয়ের প্রকাশ হইতে বাধা জন্মে না। পুরুষ বা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিলে বিবেকজ্ঞানের উপরও এইজন্য বিতৃষ্ণা জন্মে। এই বৈরাগ্যই শাস্ত্রে পরবৈরাগ্য অথবা জ্ঞান-প্রসাদ নামে বর্ণিত হইয়া তাকে। যে বৈরাগ্যে ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহা নিম্নভূমির বৈরাগ্য। পরবৈরাগ্য হইতে গুণমাত্রের প্রতিই পরান্মুখ-ভাব উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে বিবেকজ্ঞানও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন চিত্ত শুদ্ধ সংস্কাররূপে পর্য্যবসিত হয়। ইহাই নির্বীজ সমাধি। এই অবস্থায় কিছুরই বোধাবোধ (সম্প্রজ্ঞান) থাকে না বলিয়া ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। পতঞ্জলির মতে ইহাই প্রকৃত যোগ।

অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ, শুভ ও অশুভ কর্ম্মাশয় এবং জন্ম আয়ু ও সুখদুঃখভোগ—এই সকল বীজ, যোগ লাভ করিলে, বিনষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় বৃত্তিহীন সংস্কারমাত্রাবিশেষ চিত্ত পুরুষের বিষয়ীভূত হয় না। কারণ বিবেকজ্ঞান (নিবৃত্তিমার্গীর পক্ষে) ও বিষয়ভোগ (প্রবৃত্তিমার্গীর পক্ষে), এই উভয় প্রকার পুরুষার্থ নিরুদ্ধচিত্তে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া চিত্ত বিষয়হীন ও অব্যক্ত হইয়া পড়ে ও চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা পুরুষ আপন ভাবে স্থিতিলাভ করেন।

এবার পতঞ্জলির নির্দ্দিষ্ট যোগভূমিগুলি আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। সম্প্রজ্ঞাত যোগের চারিটি ভূমি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ভূমিতে আরূঢ় অভ্যাসশীল যোগী প্রথম-কল্পিক নামে অভিহিত হন। ইঁহার জ্ঞানজ্যোতিঃ কেবলমাত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও বশীভূত হয় নাই। যাঁহারা যোগশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে চিত্তস্থৈর্য্যের সাধক দুই প্রকার প্রবৃত্তি মনে উদিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম বিষয়বতী প্রবৃত্তি ও দ্বিতীয়টির নাম বিশোকা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি। প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার দিব্যগন্ধ, দিব্যরস, দিব্য রূপ প্রভৃতির অনুভব হইতে থাকে—ক্রমশঃ চিত্ত স্থির হইতে, থাকে, সংশয় দূর হয় ও প্রজ্ঞার উদয় হয়। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, মণি, রত্ন প্রভৃতির আভারূপেও সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিষয়বতী বলিয়া প্রথম প্রকার প্রবৃত্তির অন্তর্গত হইলেও কিয়দংশে বিশোকা জ্যোতিষ্মতীর প্রকার বিশেষ। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি দুই প্রকার—তন্মধ্যে একটি বিষয়বতী, যাহা ভাস্বর আকাশকল্প ব্যাপক বুদ্ধিসত্ত্বে স্থিতি-বৈশারদ্য হইতে চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রভারূপে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি অস্মিতামাত্র, যাহা অস্মিতা ভাবে সমাধান বশতঃ নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের ন্যায় শান্ত ও অনন্ত। এই দ্বিতীয় প্রকার প্রবৃত্তিতে বিষয়বতী প্রবৃত্তির ন্যায় নানা প্রভা খেলে না। অস্মিতা রজঃ ও তমোগুণশূন্য সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ। উভয় প্রকার বিশোকাকেই জ্যোতিষ্মতী বলা হইয়া থাকে। মনের জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোক যে কোন দুরবর্ত্তী, ব্যবহিত এবং সূক্ষ্ম পদার্থে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুটরূপে উদ্ভাসিত করা যায়। যোগের প্রথম ভূমিতে এই জ্যোতির উদয় হয় বটে, কিন্তু ইহা আয়ত্ত থাকে না বলিয়া ইহা দ্বারা সাধক অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না।

ক্রমশঃ প্রথমকল্পিক যোগী মধুমতী নামক দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। এই অবস্থায় নির্ব্বিচার সমাধির পরিপক্কতা হয়, চিত্ত অধিকতর নির্ম্মলতা লাভ করে এবং ঋতম্ভারা প্রজ্ঞার উদয় হয়। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা উদিত হইলে সকল বিষয়েই যথার্থ জ্ঞান অধিগত হয়—তখন যোগী স্বয়ং অজ্ঞানজনিত তাপ হইতে মুক্ত হইয়া দুঃখনিমগ্ন সমগ্র জগতের সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন ও ঐ সকল দুঃখের কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার

জন্য ইচ্ছা করেন। এই প্রজ্ঞাই আনন্দের উৎপাদক বলিয়া মধুপদবাচ্য। দ্বিতীয় ভূমিতে ইহার উদয় হয় বলিয়া এই ভূমিকে মধুমতী ভূমি বলা হইয়া থাকে। যোগী এই ভূমিতে আরোহণ করিলে দেবতাগণ নানা প্রকার প্রলোভনের জিনিষ দেখাইয়া তাঁহাকে যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। তখন সাধকের অন্তরে আসক্তি অথবা অহঙ্কার না জাগিলেই ঐ সকল প্রলোভন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যে প্রজ্ঞালোক দ্বিতীয় ভূমিতে উপলব্ধ হয়, উহা বিবেকজ-জ্ঞানের আংশিক বিকাশ মাত্র। ইহাকে যোগীগণ যোগ-প্রদীপ নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই প্রদীপের আলোকেই অবিদ্যাদি যাবতীয় ক্লেশের আবরণ তিরোহিত হয় এবং প্রাতিভজ্ঞানরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বের উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় যোগীকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। কারণ, বিষয়সম্বন্ধবশতঃ আসক্তি অথবা গর্ব্ব জাগিলেই পতিত হওয়ার আশঙ্কা। এই অবস্থায় ভূত ও ইন্দ্রিয় যোগীর বশীভূত হয় না। তবে তাহার সূচনা হয় মাত্র। চিত্তসত্ত্ব প্রকাশ স্বভাব বলিয়া সকল পদার্থদর্শনে সমর্থ। তথাপি তমোদ্বারা আবৃত থাকিলে দর্শন করিতে পারে না। যখন রজঃ চিত্তসত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত করে, তখন জ্ঞানের উদয় হয়—যেখানে বা যে বিষয়ে উদ্‌ঘাটিত করে, সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। রজঃ ও তমঃ—এই গুণদ্বয়ের উপচয়ই অশুদ্ধি, ইহাই আবরণাত্মক চিত্ত-মল। যখন অভ্যাস ও বৈরাগ্যবশতঃ এই মল দূরীভূত হয়, যখন চিত্তের অনভিভূত স্বচ্ছ স্থিতিপ্রবাহ (বৈশারদ্য) ঘটিয়া থাকে, তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয় ও সর্ব্বার্থবিষয়ক ক্রমাননুরোধী শুদ্ধ ও পরিস্ফুট প্রজ্ঞালোক উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রাজ্ঞ অবস্থা। এই সময়ে প্রজ্ঞালোকে নিজেকে সর্ব্বোপরি দেখা যায় ও দুঃখমগ্ন সর্ব্বজগৎ-এর প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। ইহা সত্যময়ী বলিয়া ঋতম্ভরা নামে অভিহিত হয়। এই প্রজ্ঞা বিশেষগ্রাহক বলিয়া শ্রুত ও অনুমানপ্রজ্ঞা হইতে বিশিষ্ট। কারণ, আগম ও অনুমান হইতে বস্তুর সামান্যধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, বিশেষ ধর্ম্ম জানা যায় না। লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশেষ জ্ঞান হয় বটে, তবে তাহাতে ভ্রম সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। এই সমাধিপ্রজ্ঞা হইতেই ভূতসূক্ষ্মগত ও পুরুষগত উভয় প্রকার বিশেষ জানা যায়। কারণ, পরমাণুতে পরমাণুতে স্বাভাবিক ভেদ আছে, পুরুষে পুরুষেও আছে। এই ভেদ সমাধিপ্রজ্ঞা ভিন্ন জানিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নির্ব্বিচার সমাধির উৎকর্ষ হইতেই জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয় ভূমিতে ভূত ও ইন্দ্রিয় উভয়ই জিত হইয়া যায়। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পাঁচ প্রকার রূপ আছে। ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত হয়, দেহ বজ্রের

ন্যায় সুদৃঢ় হয় এবং পঞ্চভূতের কোনটিই আপনাপন গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা যোগীর গতিতে বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। আকার, গুরুত্ব, আবরণ, স্থৈর্য্য, কাঠিন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চবিশেষ—ইহাদের সমষ্টিকে স্থূল পৃথিবী বলে। স্নেহ, শৈত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং শব্দ প্রভৃতি চারিটি বিশেষ (গন্ধহীন)—ইহাদিগকে স্থূল জল বলে। এই প্রকার শব্দাদি তিনটি বিশেষ এবং উর্দ্ধগতি, দাহকতা, লঘুত্ব, ভাস্বরতা প্রভৃতি ধর্ম্ম একসঙ্গে স্থূল অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়। স্থূল বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এবং বক্রগতি, চাঞ্চল্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। শুদ্ধ শব্দ এবং সর্ব্বব্যাপকতা, অব্যূহ ও অবিষ্টম্ভ—ইহাদের সমষ্টি স্থূল আকাশ। ভূতগণের দ্বিতীয় রূপ স্থূলরূপের সামান্য ভাব। স্থূল ভাবসকল এই সামান্য ভাব বা স্বরূপেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র। মূর্ত্ততা, স্নিগ্ধতা, উষ্ণতা, পরিণামিতা ও অবকাশদান—ইহারা যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়। এই স্বরূপ ও স্থূলভাবের সমষ্টিকে সাধারণতঃ দ্রব্য বলা হয়। ভূতগণের তৃতীয় বা সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র। তন্মাত্রসকল পরস্পর মিলিত হইয়া পরমাণুরূপে পরিণত হয়। পরমাণু হইতেই দ্রব্য গণনা হইয়া থাকে—কিন্তু ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ দ্রব্যাত্মক নহে। প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতিশীল স্বত্ত্বাদি গুণত্রয় ভূতগণের চতুর্থরূপ। যোগীগণ ইহাকে অন্বয় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ত্রিগুণের মধ্যে যে ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থতা রহিয়াছে, তাহাই ভূতগণের পঞ্চমরূপ, ইহার নামান্তর অর্থবত্ত্বা। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত এবং যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ সর্ব্বত্রই ত্রিগুণ অনুস্যূতরূপে বর্ত্তমান বলিয়া অর্থবত্ত্বা না আছে এমন কোন পদার্থই নাই। যোগীগণ সংযমের দ্বারা ভূতগণের প্রত্যেকটি রূপকে পৃথকভাবে সাক্ষাৎকার করেন এবং আয়ত্ত করেন। ইহারই নাম ভূতজয়। ইহার ফলে ভূতপ্রকৃতি সকল বশীভূত হইয়া যোগীর সঙ্কল্পের অনুসরণ করে। অণিমাদি সিদ্ধি ও কায়সিদ্ধি প্রভৃতি ভূতজয়ের ফলমাত্র। নিজের দেহাদিকে অণুরূপে সঙ্কুচিত করিবার সামর্থ্যের নাম অণিমা—দেহাদিকে ইচ্ছানুরূপ লঘু অথবা বৃহৎ করিবার সামর্থ্যকে যথাক্রমে লঘিমা এবং মহিমা বলা হয়। লঘিমা দ্বারা শরীর প্রভৃতি এত হালকা হয় যে অনায়াসে আকাশে বিচরণ করা যায়। যে কোন জিনিষ যত দূরেই থাকুক না কেন, তাহা সর্ব্বদাই যোগীর সন্নিহিত—ইচ্ছামাত্রই যোগী তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার শাস্ত্রীয় নাম প্রাপ্তি। পঞ্চভূতের স্থূল রূপকে সংযম দ্বারা জয় করিলে এই চারিটি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। ভূতগণের দ্বিতীয়রূপ আয়ত্ত হইলে প্রাকাম্য নামক সিদ্ধির উদয় হয়। এই অবস্থায় যোগীর রূপকে ভূতগণের স্বরূপ বাধা দিতে পারে না। যেমন মূর্ত্তি অথবা কাঠিন্য পৃথিবীর স্বরূপ, কিন্তু যোগী ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে ঠিক জলের মতন ডুবিতে এবং উঠিতে পারেন—পৃথিবীর কাঠিন্যবশতঃ তাঁহার কোন প্রকার বাধা উৎপন্ন হইবে

জন্য ইচ্ছা করেন। এই প্রজ্ঞাই আনন্দের উৎপাদক বলিয়া মধুপদবাচ্য। দ্বিতীয় ভূমিতে ইহার উদয় হয় বলিয়া এই ভূমিকে মধুমতী ভূমি বলা হইয়া থাকে। যোগী এই ভূমিতে আরোহণ করিলে দেবতাগণ নানা প্রকার প্রলোভনের জিনিষ দেখাইয়া তাঁহাকে যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। তখন সাধকের অন্তরে আসক্তি অথবা অহঙ্কার না জাগিলেই ঐ সকল প্রলোভন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যে প্রজ্ঞালোক দ্বিতীয় ভূমিতে উপলব্ধ হয়, উহা বিবেকজ-জ্ঞানের আংশিক বিকাশ মাত্র। ইহাকে যোগীগণ যোগ-প্রদীপ নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই প্রদীপের আলোকেই অবিদ্যাদি যাবতীয় ক্লেশের আবরণ তিরোহিত হয় এবং প্রাতিভজ্ঞানরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বের উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় যোগীকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। কারণ, বিষয়সম্বন্ধবশতঃ আসক্তি অথবা গর্ব্ব জাগিলেই পতিত হওয়ার আশঙ্কা। এই অবস্থায় ভূত ও ইন্দ্রিয় যোগীর বশীভূত হয় না। তবে তাহার সূচনা হয় মাত্র। চিত্তসত্ত্ব প্রকাশ স্বভাব বলিয়া সকল পদার্থদর্শনে সমর্থ। তথাপি তমোদ্বারা আবৃত থাকিলে দর্শন করিতে পারে না। যখন রজঃ চিত্তসত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত করে, তখন জ্ঞানের উদয় হয়—যেখানে বা যে বিষয়ে উদ্‌ঘাটিত করে, সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। রজঃ ও তমঃ—এই গুণদ্বয়ের উপচয়ই অশুদ্ধি, ইহাই আবরণাত্মক চিত্ত-মল। যখন অভ্যাস ও বৈরাগ্যবশতঃ এই মল দূরীভূত হয়, যখন চিত্তের অনভিভূত স্বচ্ছ স্থিতিপ্রবাহ (বৈশারদ্য) ঘটিয়া থাকে, তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয় ও সর্ব্বার্থবিষয়ক ক্রমাননুরোধী শুদ্ধ ও পরিস্ফুট প্রজ্ঞালোক উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রাজ্ঞ অবস্থা। এই সময়ে প্রজ্ঞালোকে নিজেকে সর্ব্বোপরি দেখা যায় ও দুঃখমগ্ন সর্ব্বজগৎ-এর প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। ইহা সত্যময়ী বলিয়া ঋতম্ভরা নামে অভিহিত হয়। এই প্রজ্ঞা বিশেষগ্রাহক বলিয়া শ্রুত ও অনুমানপ্রজ্ঞা হইতে বিশিষ্ট। কারণ, আগম ও অনুমান হইতে বস্তুর সামান্যধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, বিশেষ ধর্ম্ম জানা যায় না। লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশেষ জ্ঞান হয় বটে, তবে তাহাতে ভ্রম সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। এই সমাধিপ্রজ্ঞা হইতেই ভূতসূক্ষ্মগত ও পুরুষগত উভয় প্রকার বিশেষ জানা যায়। কারণ, পরমাণুতে পরমাণুতে স্বাভাবিক ভেদ আছে, পুরুষে পুরুষেও আছে। এই ভেদ সমাধিপ্রজ্ঞা ভিন্ন জানিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নির্ব্বিচার সমাধির উৎকর্ষ হইতেই জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয় ভূমিতে ভূত ও ইন্দ্রিয় উভয়ই জিত হইয়া যায়। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পাঁচ প্রকার রূপ আছে। ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত হয়, দেহ বজ্রের

ন্যায় সুদৃঢ় হয় এবং পঞ্চভূতের কোনটিই আপনাপন গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা যোগীর গতিতে বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। আকার, গুরুত্ব, আবরণ, স্থৈর্য্য, কাঠিন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চবিশেষ—ইহাদের সমষ্টিকে স্থূল পৃথিবী বলে। স্নেহ, শৈত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং শব্দ প্রভৃতি চারিটি বিশেষ (গন্ধহীন)—ইহাদিগকে স্থূল জল বলে। এই প্রকার শব্দাদি তিনটি বিশেষ এবং উর্দ্ধগতি, দাহকতা, লঘুত্ব, ভাস্বরতা প্রভৃতি ধর্ম্ম একসঙ্গে স্থূল অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়। স্থূল বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এবং বক্রগতি, চাঞ্চল্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। শুদ্ধ শব্দ এবং সর্ব্বব্যাপকতা, অব্যূহ ও অবিষ্টম্ভ—ইহাদের সমষ্টি স্থূল আকাশ। ভূতগণের দ্বিতীয় রূপ স্থূলরূপের সামান্য ভাব। স্থূল ভাবসকল এই সামান্য ভাব বা স্বরূপেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র। মূর্ত্ততা, স্নিগ্ধতা, উষ্ণতা, পরিণামিতা ও অবকাশদান—ইহারা যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়। এই স্বরূপ ও স্থূলভাবের সমষ্টিকে সাধারণতঃ দ্রব্য বলা হয়। ভূতগণের তৃতীয় বা সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র। তন্মাত্রসকল পরস্পর মিলিত হইয়া পরমাণুরূপে পরিণত হয়। পরমাণু হইতেই দ্রব্য গণনা হইয়া থাকে—কিন্তু ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ দ্রব্যাত্মক নহে। প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতিশীল স্বত্তাদি গুণত্রয় ভূতগণের চতুর্থরূপ। যোগীগণ ইহাকে অন্বয় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ত্রিগুণের মধ্যে যে ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থতা রহিয়াছে, তাহাই ভূতগণের পঞ্চমরূপ, ইহার নামান্তর অর্থবত্তা। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত এবং যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ সর্ব্বত্রই ত্রিগুণ অনুস্যুতরূপে বর্ত্তমান বলিয়া অর্থবত্তা না আছে এমন কোন পদার্থই নাই। যোগীগণ সংযমের দ্বারা ভূতগণের প্রত্যেকটি রূপকে পৃথকভাবে সাক্ষাৎকার করেন এবং আয়ত্ত করেন। ইহারই নাম ভূতজয়। ইহার ফলে ভূতপ্রকৃতি সকল বশীভূত হইয়া যোগীর সঙ্কল্পের অনুসরণ করে। অণিমাদি সিদ্ধি ও কায়সিদ্ধি প্রভৃতি ভূতজয়ের ফলমাত্র। নিজের দেহাদিকে অণুরূপে সঙ্কুচিত করিবার সামর্থ্যের নাম অণিমা—দেহাদিকে ইচ্ছানুরূপ লঘু অথবা বৃহৎ করিবার সামর্থ্যকে যথাক্রমে লঘিমা এবং মহিমা বলা হয়। লঘিমা দ্বারা শরীর প্রভৃতি এত হালকা হয় যে অনায়াসে আকাশে বিচরণ করা যায়। যে কোন জিনিষ যত দূরেই থাকুক না কেন, তাহা সর্ব্বদাই যোগীর সন্নিহিত—ইচ্ছামাত্রই যোগী তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার শাস্ত্রীয় নাম প্রাপ্তি। পঞ্চভূতের স্থূল রূপকে সংযম দ্বারা জয় করিলে এই চারিটি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। ভূতগণের দ্বিতীয়রূপ আয়ত্ত হইলে প্রাকাম্য নামক সিদ্ধির উদয় হয়। এই অবস্থায় যোগীর রূপকে ভূতগণের স্বরূপ বাধা দিতে পারে না। যেমন মূর্ত্তি অথবা কাঠিন্য পৃথিবীর স্বরূপ, কিন্তু যোগী ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে ঠিক জলের মতন ডুবিতে এবং উঠিতে পারেন—পৃথিবীর কাঠিন্যবশতঃ তাঁহার কোন প্রকার বাধা উৎপন্ন হইবে

না। এই প্রকার অন্যান্য ভূত সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। *ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ সংযমের দ্বারা অধীন করিতে পারিলে বশিত্ব নামক সিদ্ধির উদয় হয়। এই সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগী পঞ্চভূত ও সকল প্রকার ভৌতিক পদার্থের অধীশ্বর হইতে পারেন, অথচ নিজে কাহারও বশীভূত হন না তন্মাত্র ও পৃথিব্যাদি পরমাণুর বশীকরণ নিবন্ধন সকল কার্য্যই বশীভূত হয়। যে কোন বস্তুকে যে কোন ভাবে রাখিতে ইচ্ছা করা যায়, তাহা তেমনি ভাবেই থাকে। ভূতগণের চতুর্থরূপ আয়ত্ত করিতে পারিলে ঈশিতৃত্ব নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবস্থায় ভূত ও ভৌতিক পদার্থের মূল প্রকৃতি আয়ত্ত হয় বলিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ সৃষ্টি ও বিনাশ করিতে সামর্থ্য জন্মে এবং তাহাদের সংস্থান ও আকারাদির পরিবর্ত্তনও করিতে পারা যায়। ভূতগণের অর্থবত্তারূপ পঞ্চমরূপ স্বায়ত্ত হইলে যোগীগণ যত্রকামাবসায়ী অথবা সত্যসঙ্কল্প অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিবার সামর্থ্য জন্মে—ইহাকেই জৈবিক ইচ্ছাশক্তি বলে। এই অবস্থায় যোগী যে কোন বস্তুকে যে কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য সঙ্কল্প দ্বারা নিয়োগ করিতে পারেন—বিষয় তখন অমৃতের কার্য্য করে। অমৃতও বিষের কার্য করে। যোগীর সঙ্কল্প অনুসারে সকল বস্তুরই শক্তির বিপর্য্যয় হইতে পারে। শক্তির পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেও যোগীগণ পদার্থের বিপর্য্যয় করেন না। জাতি, দেশ, কাল ও অবস্থার ভেদবশতঃ শক্তি সকলের স্বভাব নিয়ত নয় বলিয়া যোগী ইচ্ছামাত্র শক্তির বিপর্য্যয় সাধন করিলেও বিশেষ কোন হানি হয় না। কারণ তাহাতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা বা আদি-সঙ্কল্প লঙ্ঘিত হয় না। কিন্তু পদার্থের বিপর্য্যয় সাধনে আদি-সঙ্কল্প খণ্ডিত হয় বলিয়া যোগী কখনও তাহা করেন না অথবা করিতে চেষ্টা করেন না।

এবার ইন্দ্রিয় জয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ভূতের যেমন পাঁচটি অবস্থা আছে, ইন্দ্রিয়েরও তেমনই পাঁচটি অবস্থা আছে—যথা গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্তা। গ্রাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকার পরিণামকে আলোচন বা গ্রহণ বলে। সামান্যবিশেষাত্মক দ্রব্যই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের বিষয়ীভূত বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়। অবশ্য বৌদ্ধ যোগীগণ এ মত স্বীকার করেন না—তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয় সামান্যভাবকে আর মনঃ বিশেষ ভাবকে গ্রহণ করে। কিন্তু পাতঞ্জল যোগীগণ বলেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিশেষ ভাবের গ্রহণ না হইলে মনঃ দ্বারা তাহার অনুধ্যব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ মনঃ বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয় রূপকে স্বরূপ বলে। অহঙ্কারের

---

*যোগিদেহ প্রস্তরে ঢুকিয়া যাইতে পারে জলে ক্লিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, বায়ুতে চালিত হয় না, অনাবৃত আকাশেও অদৃশ্য থাকিতে পারে। এমন কি, সিদ্ধগণও যোগীর দেহ দেখিতে পান না। এই সবই দ্বিতীয় ভূতরূপজয়ের ফল।

সাত্ত্বিকাংশ হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ইন্দ্রিয়ের সামান্য ও বিশেষ উভয় ভাবেই প্রকাশাত্মকতা রহিয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে যে করণত্ব আছে তাহাই ইন্দ্রিয়ের সামান্য ভাব। এক এক ইন্দ্রিয় এক এক প্রকার বিষয়কে গ্রহণ করে—ইহাই তাহার বিশেষ ভাব। অতএব প্রকাশাত্মক চিত্তসত্ত্বের যে সামান্য ও বিশেষ ভাবের সমষ্টি—যাহা অযুতসিদ্ধ ভেদানুগত সমূহ বা দ্রব্যরূপে—পরিচিত তাহাই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ। অস্মিতা অথবা অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ের তৃতীয়রূপ। ইহা সামান্য—প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ইহার বিশেষ অভিব্যক্তি। অন্বয় বা প্রকাশাদিশীল গুণত্রয় ইন্দ্রিয়ের চতুর্থরূপ। এই গুণত্রয় ভূতেরও চতুর্থরূপ—একথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ত্রিগুণ গ্রাহ্য ও গ্রহণভেদে দ্বিবিধি রূপবিশিষ্ট—তন্মধ্যে গ্রাহ্যাংশ হইতে পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চভূত ও ভৌতিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। আর উহার গ্রহণাংশ হইতে অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। অর্থবত্তা ভূতসকলের ন্যায় ইন্দ্রিয়েরও পঞ্চমরূপ। সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পঞ্চরূপ বশীভূত হইলে যোগী মধুপ্রতীক নামক তিন প্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার দেহও মনের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যে সুদূর দেশে গমন করিতে সমর্থ হয়। ইহাকে মনোজবিত্ব বলে। ইন্দ্রিয় সকল দেহকে আশ্রয় না করিয়াও যোগীর অভীষ্ট দেশে, কালে ও বিষয়ে বৃত্তিলাভ করে বা কার্য্য করে। তখন বহুদূরস্থ বস্তুর দর্শন ও আঘ্রাণাদি এবং শব্দাদির শ্রবণ প্রভৃতি হইয়া থাকে, দূরবর্ত্তী অতীত ও অনাগত কালের বিষয়ও সাক্ষাৎকৃত হয় এবং অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তুসকলের দর্শন হয়। তৃতীয় সিদ্ধি প্রধান-জয় বা প্রকৃতির যাবতীয় বিকারের বশীকরণ। আমরা সংক্ষেপে তৃতীয় যোগভূমির বর্ণনা করিলাম। এই ভূমিতে ভূত ও ইন্দ্রিয় জয়ের ফলে পরিচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার অবান্তর সিদ্ধিও আয়ত্ত হয়। বিশোকা হইতে পরবৈরাগ্য পর্য্যন্ত অবস্থা এই ভূমিতে অধিকৃত হয় না।

চতুর্থ ভূমিতে চিত্তসত্ত্ব হইতে রজঃ ও তমোমল অপগত হয় বলিয়া চিত্ত শান্তির আলয় হয় ও যোগীর বশীভূত হয়। তখন উহা সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকখ্যাতিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সদ্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব জন্মে। ইহা বিশোকানাম্নী সিদ্ধি। যোগী তখন স্বামিত্বলাভ করেন—সর্ব্বাত্মক গুণ সকল জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে স্বামীর নিকট অশেষ দৃশ্য ভাবে সাজিয়া উপস্থিত হয়। ইহা ক্রিয়ৈশ্বর্য্য। তদ্বৎ ঐ সকল গুণ শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া তখন যোগীর নিকটে বিবেকজজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই জ্ঞানে ক্রম থাকে না—সকল ভাবই যুগপৎ প্রকাশিত হয়। ইহা জ্ঞানৈশ্বর্য্য। বিশোকা সিদ্ধির অধিকারী যোগী সর্ব্বজ্ঞ ও বশিরূপে জগতে বিহার করিয়া থাকেন।

পরে এই সিদ্ধির প্রতিও বৈরাগ্য হইলে বৈরাগ্যের পূর্ণতা হয়। তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে প্রাকৃতিক সিদ্ধি প্রকৃতিবিযুক্ত স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ পুরুষের থাকে না। ঐ সকল সিদ্ধি চিত্তসত্ত্বের ধর্ম্ম—চিত্ত অব্যক্ত হইয়া গেলে উহারা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বরের উপাদি বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতির অতীত—উহা কখনও অব্যক্ত হয় না। ঈশ্বরোপাসক ভক্ত যোগী পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইলে পারমৈশ্বর্য্যরূপা মঙ্গল্য শক্তির অধিকারী হন—উহা মহাবিভূতি ও অবিনশ্বর।

সুতরাং পাতঞ্জল দর্শনোক্ত বিভূতি যোগের চরম বিভূতি নহে। পুনৈশ্বর্য্যই মহাবিভূতি, তাহা আরও ঊর্দ্ধে। আগমে সাংখ্যোক্ত পুরুষের উপরে একাদশ তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে—এই সকল তত্ত্ব ক্রম-সাধনায় জয় করিতে পারিলে তবে পূর্ণতায় উপনীত হইতে পারা যায়। পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী আপন স্বাতন্ত্রবশতঃ আণবমল, মায়ামল ও কর্ম্মমল—ক্রমশঃ এই ত্রিবিধ মল পরিগ্রহ করিয়া পশু সাজিয়া থাকেন, আবার এই সকল মল অপগত করিয়া স্বরূপে উপস্থিত হন। আণবমল দ্বারা তাঁহার সঙ্কোচ হয়, তিনি অণুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে মায়া প্রভাবে অণু আত্মবিস্মৃত হইয়া মায়াবৃত হইয়া পড়ে। তখন কর্ম্মমল তাহাতে সংলগ্ন হয়—সে কর্ত্তা সাজে, ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। প্রথম মলমাত্র আবরণে বিজ্ঞানাকল অবস্থা, প্রথম ও দ্বিতীয় মলে প্রলয়াকল অবস্থা এবং মলত্রয়ে সকল অবস্থার উদয় হয়। সাংখ্যের কৈবল্য এক জাতীয় বিজ্ঞানাকল অবস্থামাত্র—তখনও আণবমল থাকে, তাই প্রকৃত যোগসিদ্ধি হয় না।

কৈবল্য হইলেই যে জীব পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইবে, তাহা বলা যায় না। কৈবল্যে পুরুষ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রাকৃতিক গুণসম্বন্ধ হইতে নির্মুক্ত হয়—তাহাই সাংখ্য ভূমিতে যোগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যে ঈশ্বরের সহিত যথার্থ যোগ, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্রদ্ধা হইতে ক্রমশঃ সমাধি ও প্রজ্ঞার উদয় হয়—পরে প্রজ্ঞার নিরোধ হইয়া পুরুষ স্বরূপস্থিতি লাভ করে। ঈশ্বরের সহিত পুরুষের অঙ্গাদি সম্বন্ধ বা ঐ প্রকার অন্য কোন সম্বন্ধ পাতঞ্জলে অঙ্গীকৃত হয় নাই। সুতরাং পুরুষের আত্মস্থিতি ঠিক ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বর-যোগ নহে।

এই জন্যই পাশুপত যোগীগণ চিত্তদ্বারা আত্মা ও ঈশ্বরের সম্বন্ধকেই যোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যোগ ক্রিয়া ও ক্রিয়োপরম ভেদে দুই প্রকার। পতঞ্জলির মুক্তি কেবলমাত্র দুঃখ-নিবৃত্তি। পাশুপত যোগীগণ বলেন যে পরমৈশ্বর্য্য-যোগরূপ মুক্তি উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ ঐ অবস্থায় সর্ব্ব দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ত হয়ই, উপরন্তু জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়। জ্ঞানরূপা শক্তি এক হইলেও বিষয় ভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তি তিন প্রকার—

মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব ও বিকরণধর্ম্মত্ব। যে কোন কার্য্য ইচ্ছামাত্র সম্পাদন করিবার সামর্থ্য মনোজবিত্ব। কর্ম্মের সহকারিতা ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ইচ্ছাবশতঃ যে কোন প্রকার রূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অধিষ্ঠান করার সামর্থ্য কামরূপিত্ব। দেহেন্দ্রিয় ব্যতীত নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য লাভই বিকরণধর্ম্মত্ব। এই জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরই নামান্তর মাহেশ্বর্য্য—ইহা পরমেশ্বরে স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বদাই আছে। ইহা হইতে অবশ্যত্ব, অনাবেশ্যত্ব, অবধ্যত্ব, অভয়ত্ব, অক্ষয়ত্ব, অজরত্ব, অমরত্ব, অপ্রতিঘাত, মহত্ব ও পতিত্ব, এই দশ প্রকার সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইলে যোগী স্বাধীনতা লাভ করেন, কাহারও অধীন থাকেন না—ইহাই অবশ্যতা। যোগীর জ্ঞানকে অন্য কেহ অভিভূত করিতে পারে না—ইহার নাম অনাবেশ্যতা। যোগীকে কেহ বধ করিতে পারে না (অবধত্ব), কোন ভয় আক্রমণ করিতে পারে না (অভয়ত্ব, যোগীর ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না (অক্ষয়ত্ব), তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য কখনও হয় না (অজরত্ব), তাঁহার মৃত্যু নাই (অমরত্ব), যোগীর ইচ্ছাকে স্বয়ং মহেশ্বরও প্রতিহত করেন না (অপ্রতিঘাত), যাবতীয় জীবের ঐশ্বর্য্য হইতে যোগী অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ করেন (মহত্ব), ও তিনি স্বামীত্ব প্রভাবে যে কোন জীবকে যে কোন কার্য্যে পরিচালিত করিতে সমর্থ হন (পতিত্ব)।

বলা বাহুল্য, পুরুষের কৈবল্যাবস্থায় পতঞ্জলির মতে কোন ঐশ্বর্য্য থাকে না। সত্ত্বশুদ্ধি হইতেই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়। সত্ত্ব হইতে পুরুষের বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, প্রভৃতি সবই নিবৃত্ত হয়। সুতরাং পাতঞ্জল যোগী ও পাশুপত যোগীর অবস্থা অত্যন্ত বিলক্ষণ। বস্তুতঃ কৈবল্যাবস্থাতেও জীবের পরমেশ্বর সম্বন্ধের অভাব বশতঃ ঐশ্বর্য্যের উদয় হয় না। তবে নিরঞ্জনভাবের উপলব্ধি হয় বটে। *পাতঞ্জল শাস্ত্রে পুরুষ প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া কি প্রকারে পুরুষ-বিশেষ বা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ লাভ করিতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত পরিস্ফুটভাবে বর্ণিত হয় নাই। পাশুপত যোগীগণ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ লাভ করিবার উপায় ও তৎফল বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইঁহাদের মতে পশু তত্ত্বতঃ পরমেশ্বর বা পতি হইতে পৃথক্। এমন কি পশুত্বের হানি—অর্থাৎ মহেশ্বরের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধ বা যোগ বশতঃ পশুত্বের অত্যন্ত নিরোধ—হইলেও

---

*পশু সাঞ্জন ও নিরঞ্জন এই দুই প্রকার। যাহার শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাকে সাঞ্জন পশু বলে। সাঞ্জন পশুই সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে। আট প্রকার দেবতা, পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌যোনী ও মনুষ্য, এই চতুর্দ্দশপ্রকার জীব সাঞ্জন বলিয়া অভিহিত হয়। নিরঞ্জন পশু তিন প্রকার—যথা, সংহত, কৈবল্যগত ও নিষ্ঠাযোগযুক্ত। সুতরাং কৈবল্য লাভ করিলেই যে ঐশ্বর্য্য হয়, তাহা নহে। দীক্ষা দ্বারা পাশ বিনাশ না হইলে পরমেশ্বর সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ-নিষ্ঠা-যোগ হয় না।

পশুর ধ্বংস হয় না। কারণ পরমেশ্বরের ন্যায় পশুও নিত্য। মূলাজ্ঞান কাটিয়া গেলে চিত্ত নিশ্চলভাবে ঈশ্বরে স্থিতি লাভ করে। ইহাই নিষ্ঠাযোগ বা প্রকৃত যোগীভাব। তখন তাঁহার নয়টি লক্ষণ প্রকাশ পায়—তিনি অসঙ্গী, যোগী, নিত্য, অজ, মৈত্র, এক, ক্ষেমী, নিষ্ক্রিয় ও বীতশোক হন। তিনি মুক্ত হন ও সমস্ত দুঃখবীজ রহিত হইয়া ঈশ্বরের ন্যায় পুনৈশ্বর্য্যযুক্ত হন।

প্রত্যভিজ্ঞা ও স্পন্দ শাস্ত্রের দিক হইতে আমরা আগমের আলোচনা এখানে স্থানাভাব বশতঃ করিতে পারিলাম না। পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণবাগম ও শাক্ত আগমের এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনশাস্ত্রের আলোচনাও এখানে করা সম্ভবপর হইল না। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের উদয় মায়ার অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত হয় না। যোগীগণ পরম পদার্থে যুক্ত হইয়া জগতের কল্যাণার্থ এবং স্বেচ্ছাক্রমে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলাকথা উত্তরার্দ্ধ সমাপ্ত হইলে আমরা উপসংহার কালে আলোচনা করিয়া এই উপক্রমস্থ বিবৃতির সহিত সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার অসংখ্য বিভূতি নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত বিভূতির সঙ্গে তাহার সঙ্গতি স্থাপন যথাসম্ভব সংক্ষেপে করিবার জন্য যত্ন করা যাইবে।

কিন্তু লীলাকথার পাঠক শুধু বিভূতি দেখিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না। যাঁহারা এই প্রকার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার অসাধারণ মাধুর্য্য—দয়া, প্রেম, সহৃদয়তা, ক্ষমাদি কোমল ভাবনিচয়— দেখিয়াও মোহিত হইবেন। তিনি একাধারে সর্ব্বভাবের সমন্বয় দেখিতে পাইবেন। অধিক লেখা আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র।

আমি নিজের কথা অতি অল্পই বলিয়াছি—দুই চারিটি ব্যাপারের কথা প্রসঙ্গতঃ ব্যাখ্যানবৈশদ্যের জন্য উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। গুরুশক্তি এই অকিঞ্চন মলিন হৃদয়ে কি অপূর্ব ও অলৌকিক আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে, তাহার রহস্য বাহিরে প্রকাশনীয় নহে। যে আমার মতন ক্ষুদ্র ও মলিন, সেও যে করুণাময়ের বিশ্বপাবনী শক্তির অধিকার বহির্ভূত নহে, ইহা আমি আজ স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে স্পর্দ্ধা করিয়াই বলিতে পারি। ইহার অধিক বলিবার ইচ্ছা করা আমার পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে প্রগল্‌ভা মনে করি।

আমার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া বিজ্ঞগণ গ্রন্থনায়কের ঐশ্বরিক চরিত্রে মনোনিবেশ করিয়া লাভবান্ হইবেন, ইহাই সকলের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।

"বিশুদ্ধানন্দ কানন"
৺কাশীধাম
১৫ই পৌষ, ১৩৩৭।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ

লীলা-কথা

(পূর্ব্বার্দ্ধ)

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী

অবসর-প্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর—
পোঃ দামোদরবাটি, জেলা-বাঁকুড়া

আমি ইং ১৮৮৯ সালে পুলিস বিভাগে অনিচ্ছার সহিত প্রবিষ্ট হইয়া ২৬ বৎসর কাল চাকরি করিয়া পরমহংসদেবের আদেশে পেন্সন গ্রহণ করি। ১৯০০ সালে আমি ইঁহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। যদিও ইঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, তথাপি এতদিন দর্শন লাভের অবসর ঘটে নাই। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি শুভক্ষণে মেমারির নিকট জামালপুর থানা হইতে আউসগ্রামে থানায় বদলি হই। তখন গুস্করা স্কুলের হেডমাস্টার বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তিনি ধর্ম্মচর্চাতেই প্রায় অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। সেই সময় পরমহংসদেব গুস্করায় ৺হরিশ্চন্দ্র চোঙ্গদার মহাশয়ের কাছারি বাড়ীতে থাকিতেন। সেখানে থাকিয়া সর্ব্বজনের সমক্ষে কি প্রকার কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা অনেকেই জানিত না। এমন কি, রাখালবাবুও তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়াও কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। আমি তখন সাধু-সন্ন্যাসীর অন্বেষণ করিয়া পাগল। আমার সন্তানাদি না হওয়ায় আমি অনেক প্রকার দৈব কর্ম্ম করিয়াছিলাম ও ঐ উপলক্ষ্যে বহু সাধুর কৃপা-ভিখারী হইয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া একদিন রাখালবাবু বলেন—"গুস্করায় একজন ভাল লোক আছেন—তিনি কবচ দেন, কোষ্ঠীর বিচার করেন। যাহাকে যাহা দেন বা বলেন, সফল হয়। আমি তাঁহাকে তোমার কথা বলিব।" তিনি তাঁহাকে আমার কথা বলিয়াছিলেন। বাবাজী ঈষৎ হাসিয়াছিলেন। ইহার ১০/১৫ দিন পর একদিন আমি গুস্করা ষ্টেশনে রেলে চড়িয়া বর্দ্ধমান যাইতেছি,—এমন সময় গুস্করার দফাদার আমাকে বলিল—"ডাক্তারবাবু (বাবাজ তখন গুস্করায় ডাক্তারী করিতেন) আপনাকে অনেকক্ষণ দেখিতেছিলেন। বলিলেন—এই দারোগাটি আমার বহু দিনের পরিচিত—এখন সব ভুলিয়া গিয়াছে। আমি বললাম—দারোগাবাবুকে ডাকিব কি? তাহাতে তিনি বলিলেন—না না, সময়ে হবে।"

ইহার কিছুদিন পরে আমি একদিন বর্দ্ধমানে যাইতেছি—গাড়ীতে গুষ্করানিবাসী কালীপদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, “ডাক্তারবাবু প্রায় আপনার কথা বলেন। তাঁহার সঙ্গে কি আপনার জানা-শোনা আছে?” আমি বলিলাম—আমার মনে হয় না।” এই প্রকারে কিছু দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু তখনও দর্শনের সুযোগ হয় নাই। অথচ মনে হইত, তিনি যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

এই সময় হঠাৎ আমি সাতগেছে থানায় বদলি হই। তখন আর দর্শন পাইতাম না। ৩/৪ মাস পরে আমি পুনরায় অল্প দিনের জন্য আউসগ্রাম থানায় আসি। ইহা ১৯০২ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসের কথা।

এই সময় আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত দীর্ঘনগর গ্রামের শ্মশানে জগদানন্দ ও তাঁহার শিষ্য শিবানন্দ নামক দুইজন ব্রহ্মচারী আশ্রম করিয়া সাধনা করিতেন। আমাকে উভয়ে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমি তখন অসুখে অত্যন্ত ভুগিতেছিলাম।

এই দুই মহাত্মার অপরূপ রূপ ও আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং গুণ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

শিষ্য শিবানন্দ যেন গুরু অপেক্ষা উন্নত ও কঠোর তপস্বী ছিলেন। আমি প্রায় তাঁহাদের আশ্রমে যাইয়া আনন্দ করিতাম। তাঁহাদের আশ্রম এখনও আছে। ৺শিবানন্দের পত্নী আশ্রমে থাকিতেন। জগদানন্দ ঐ আশ্রমেই দেহ রাখেন। শিবানন্দ কিছুদিন একাই থাকেন। এই সময় আমি শিষ্য হইবার জন্য তাঁহার আশ্রমে ঘটনাচক্রে দুই তিন দিন অবস্থান করি। সেই সময় তিনি আমাকে সস্নেহে বলেন, “উপেন্দ্র বাবা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু ভোলানাথ। বাবা, রত্ন কাপড়ে ঢাকা আছে। গুষ্করার বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামী তোমার গুরু হইবেন। তিনি প্রস্তুত আছেন। শীঘ্র তুমি তাঁহার দর্শন লাভ করিবে।”

এই সময়ের দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি—একদিন আমি ও কালনার ইন্‌স্পেক্টরবাবু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উভয়ে শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে যাই। উক্ত ইনস্পেক্টরবাবু প্রত্যহ পদ্মফুল আনাইয়া রাত্রে মা ভবতারিণীর পূজা করিতেন। আমরা আশ্রমে পৌঁছিলে ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রসাদ খাইতে বলেন। একটি ছোট ঘরের মধ্যে আহার করিতেছি, হঠাৎ দুইটি বৃহৎ সর্প (শ্বেত খরিশ) ঘরের কোণ হইতে বাহির হইয়া আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। দেখিয়া আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। শিবানন্দ ব্রহ্মচারী দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদিগকে উঠিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, “বস বস, তোমরা খাও ওরা এখন আসুক।” বলিয়া হাতে করিয়া সর্প দুইটিকে ঠেলিয়া দিলেন। বলিলেন, “যাও যাও, তোমরা আবার কেন এমন সময় এলে?” তাহারা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

আর একটি ঘটনা এই। শিবানন্দ প্রভুর সহিত ঐ আমার শেষ দেখা। তাহার পর তিনি ৺কাশীধামে গিয়া, পরিব্রাজকাচার্য্য শিবানন্দ পরমহংস উপাধি পাইয়া কিছুদিন পর স্ব-ইচ্ছায় ৺কাশীলাভ করেন। গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, তিনিও তখন শিবানন্দের নিকট ছিলেন। দিন স্থির করিয়া সেই দিন দেহত্যাগ করেন।

কার্য্যগতিকে আমি একদিন তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বলেন। আমি বলিলাম—"নিকটবর্ত্তী আলগ্রাম দেয়াসা গ্রামে একটু কাজ আছে। ঘন্টা দুইয়ের মধ্যে শেষ করিয়া প্রসাদ লইব।" তিনি বলিলেন—"আর আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।" তাহাই ঘটিল। এ জীবনে তাঁহার সহিত আর দেখা হইল না। আমার কাজ সারিতে প্রায় বৈকাল হইয়া গেল। ফেরত আসিয়া খোঁজ করিয়া শুনিলাম, তিনি এড়ালবাহাদুরপুরে বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী গিয়াছেন। আমার জেদ চাপিল—ঘোড়ায় চড়িয়া এড়াল গ্রামে গেলাম। যাইয়া শুনিলাম, তিনি শুয়াতাগ্রামে সাতুবাবুর বাড়ী গিয়াছেন; তখন রাত্রি হইয়াছে—তথায় না গিয়া থানায় ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিলাম, আবার একদিন আসিয়া সাক্ষাৎ করিব। ইতিমধ্যে ৺কাশীধামে যাইয়া তিনি দেহ রাখিলেন। অন্তরের দুঃখ অন্তরেই রহিয়া গেল।

ইনি আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়ার পর আমি একদিন বন পার হইয়া গুস্করায় ট্রেণ ধরিবার জন্য যাইতেছি। দেখিলাম, জঙ্গলের দক্ষিণ দিক হইতে একটি সাধু বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"উপেন্দ্র, ভাল আছ?" আমি দেখিয়া চমকিয়া গেলাম। কোথায় দেখিয়াছি, ঠিক মনে হইতেছে না, অথচ বেশ মুখ চেনা, যেন তাঁহাকে এতদিন ধরিয়া খুঁজিতেছিলাম, ইনি তিনিই। তিনি বেশি কথা না কহিয়া উত্তর দিকের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। আমি অশ্বপৃষ্ঠে ভাবিতে ভাবিতে গুস্করা চলিয়া গেলাম। মনে করিলাম, এখানকার বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। কিন্তু বিধি না ঘটাইলে ঘটিবার নহে। তাই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল।

তবে বুঝিলাম, শুভদিন আমার অতি-নিকট।

১৯০২ সালের মে মাসে কোন সরকারি কার্য্য উপলক্ষ্যে বেলা ৯/১০টার সময় শুভদিনে মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গুস্করায় পৌছি। তথাকার জমিদার তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদার মহাশয়ের বাড়ীতেই কাজ ছিল। আমার থাকিবার স্থান কোথায় হইবে, সেই কথা হইতেছে, এমন সময় গুস্করা গ্রামের ৺কালীপদ ঘোষের ভ্রাতা মাহাতাব ঘোষ আমাকে সঙ্গে করিয়া কাছারি বাড়ীতে লইয়া গেল। তখন আমার মস্তকোপরি মা শুভ-শঙ্করী উড়িতেছেন—ভগবান্ লাভ হইবে। আমার হৃদয়ের ধন, আমার হারানিধি, মা আজ আমাকে দিবেন তারই আয়োজন। চারিদিকে শুভলক্ষণ দেখিতে দেখিতে আমি পশ্চিম মুখে কাছারির সদর দরজা পার

হইলাম। দেখিলাম—সম্মুখে পুষ্পোদ্যান, নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়াছে। নিকটে একটি বৃহৎ বাদাম বৃক্ষ। বারান্দায় একটি কৌপীন শুকাইতেছে। সেই শুভক্ষণে বারান্দায় পদার্পণ করিতেই হঠাৎ একটি সুঘ্রাণ আমার নাকে প্রবেশ করিল। মাহাতাব পাইল কিনা, জানি না। আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তখন জানি না, যে আমার ভবপারের কাণ্ডারী তরী লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

আমি দেখিলাম দুইটি কুঠরী—একটি পূর্ব্বদ্বারী ও অপরটি পশ্চিমদ্বারী, মধ্যে বৃহৎ চাতাল। চাতালের মধ্যে দুইটি তক্তাপোষ। দক্ষিণদিকে বারান্দা। উত্তর দেওয়ালে দুইটি বড় বড় জানালা তক্তাপোষের সঙ্গে মেশামেশি হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদ্বারী ঘরের উত্তরদিকের কোলঙ্গায় তাম্রকুণ্ডে বিল্বপত্র ও স্নান-জল রহিয়াছে। পূর্ব্বদ্বারী ঘরের দরজার নিকটবর্ত্তী তক্তাপোষে আমি বসিলাম। যেমন বসিয়াছি, অমনি সেই ঘরের নৈঋত কোণে একটি মহাপুরুষ আমার দিকে ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃপা ও স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন—"ভাল আছেন?" দীর্ঘ ও উন্নত ললাট; কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু, উজ্জ্বল নেত্রযুগল—আমি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম, ইনিই সেদিন জঙ্গল মধ্যে "উপেন্দ্র, ভাল আছ" বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, ইনিই আজ আবার "ভাল আছেন, ভিতরে আসুন" বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। আমার চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল—ক্ষণকাল বাহিরে আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না। যেন লোহাতে চুম্বক টানিতে লাগিল। লাফাইয়া ঘরের মধ্যে গেলাম। ঐ ঘরের পশ্চিম ধারের পাইখানা ঠাকুর ব্যবহার করিতেন। ঘরের উত্তরে একটি বড় পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর উত্তরে কিছু মাঠ পার হইয়া নদী। নদীর ধারে শ্মশানে ঠাকুর সাধনা করিতেন। ঐ স্থান তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া কি স্বর্গীয় গন্ধ—কি অপরূপ পদ্ম-গন্ধ, আমাকে মোহিত করিয়া ফেলিল! আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে, বাহ্যজ্ঞান নাই বলিলেই হয়। তিনি যে কত কথা, কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কানে একটিও গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। বলিলেন, "পাগল আর কি।" যেন ভাব চাপিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া তক্তাপোষের উপর বসিলেন। ভাবিলেন, উপেন্দ্র বুঝি এখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। বাহিরে আসিয়া মাহাতাবকে ডাক দিয়া বলিলেন—"দারোগা বাবুর জন্য শীঘ্র জলখাবার আন। হুঁকা কোথা? এইখানেই মাগুর মৎস্যের ঝোল ভাত সকাল করিয়া বন্দোবস্ত কর।"

হায়রে হায়, দুর্ব্বল কি মহাভাব সহ্য করিতে পারে? উপেন্দ্রকে কি তিনি সে ভাবে বক্ষে নিয়া থাকিতে পারেন? তাই ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভাবে অভাব দেখাইলেন। কিন্তু তখন কি তাই বুঝি? তাহা হইলে ভাবে বিভোর হইয়া ভাবের সমুদ্রে ডুবিয়া ভাব-রস পান করিয়া জীবন সার্থক করিতাম।

সব যেন কোথায় সরাইয়া দিলেন। খাটী দারোগাবাবু সাজাইলেন—"তামাক খান" "বসুন" ইত্যাদি আহ্বানে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

মনে ভাবিলাম, এ কি? কি একটা স্বপ্নাবেশ হইতে দারোগাবেশে কে আনিল? ঘরে প্রবেশ করিয়া যে নেশা আসিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল!

আহারান্তে বসিয়া অনেক প্রকার কথাবার্তা চলিতে লাগিল। পার্শ্ব ছাড়িয়া যাইতে এক দণ্ডের জন্য ইচ্ছা হয় না। সরকারি কাজ কোথায় রহিল! সে চাহনি, সে ভালবাসার কথা, আর সে কৌতূহলপূর্ণ গল্প কখন শুনি নাই। মন-মাতান প্রাণ-জুড়ান কথা হৃদয়ে আজ পর্যন্ত দীপ্যমান। সরকারি কাজ সারিলাম। নিকটে বসিয়া সব দেখিলেন। প্রাণের স্রোত, জীবনের হারান ধন, অল্প সময়ের মধ্যে মিলিয়া গেল। আর এ জীবনে কি তাহা পাইব না?

সন্ধ্যা হয়-হয়, তাঁহার নিকট হইতে উঠিলাম। কে যেন মাথা নুয়াইয়া দিয়া শীতল চরণে লুটাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আবার আসিবেন।" মনে করিলাম 'আসিবেন' না বলিয়া 'আসিবে' বলিলেন না কেন?" বুঝিলাম, আমি দারোগা কিনা, তাই লৌকিক ব্যবহার বজায় রাখিলেন—অন্তরঙ্গের ভাব গোপন করিলেন।

মনে মনে নানা চিন্তা করিতে করিতে থানায় ফিরিলাম। মনে শান্তি নাই। কিছুই ভাল লাগে না। বাসায় ফিরিয়া তাঁহার চিন্তা করিতেছি, এমন সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। রাগের বশে একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলাম। মনে গ্লানি আসিল।

প্রাতঃকালে থানার বারান্ডায় বসিয়া আছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া একটি পত্র দিল। দেখিলাম, লিখিয়াছেন "রাত্রে রাগের বশে যে কাজ করিয়াছ, তাহা ঠিক হয় নাই। ওরূপ ভাবে রাগ প্রকাশ করিলে গুরুতর কার্য্য কি প্রকারে সুসম্পন্ন করিবে?"

মনে মনে ভাবিলাম, রাত্রের ঘটনা আমি ভিন্ন কেহ জানে না, এত প্রত্যুষে তিনি কি করিয়া জানিলেন!

অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া রোমাঞ্চ হইল।

সরকারি কার্য্য ছাড়া প্রায় সকল সময় তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কাটাইতাম। সুযোগ পাইলেই শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রাণ শীতল করিতাম। তেমন ভালবাসা, সে প্রকার নানা দ্রব্য দিয়া ভোজন করান, জীবনে বিধাতা এই প্রথম দেখাইলেন।

জীবনের স্রোত তীরবেগে পরিবর্ত্তনের দিকে ছুটিতে লাগিল। ক্ষুদ্র নদীপ্রবাহ আজ সাগরাভিমুখে ছুটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রাণের হা-হুতাশ জাগিয়া উঠিল। মন-প্রাণ মাতিয়া গেল।

একদিন বর্দ্ধমান হইতে ফিরিবার সময় আমি ও আমার অধীনস্থ একটি কর্ম্মচারী (বামাপদ বিশ্বাস) তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য কাছারি বাড়িতে হাজির হইলাম।

দেখিলাম, সেই ঘরের সেই কোণে একটি সামান্য কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া আছেন সেই মহাপুরুষ। সহাস্য বদনে "কি গো কেমন আছ" বলিয়া নিকটে ডাকিলেন। এখন আর "আপনি আসুন, বসুন" বলা প্রায় শেষ হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে সঙ্গে বসিয়া দাবা-বোড়ে খেলিতেন। ভাবিতেন, এখন দারোগার যত প্রকার অসৎ বৃত্তি জাগিয়া রহিয়াছে। গায়ে হাত বুলাইয়া, লা পড়া দয়া সাপের বিষ তাড়ানোর মত, যেন জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার নষ্ট করিয়া আপনার মনের মতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

আমি তামাক সাজিয়া দিলাম। "খাওয়া হউক" বলিয়া কলিকা দিলেন। পূর্ব্বে নিকটে বসিয়াই তামাক খাইতাম, এখন যেন একটু বাধ-বাধ ঠেকে। নিকটে বসিয়া তামাক খাইতে আর যেন মন চায় না—এখন কৃপা-ভিখারী হইয়াছি।

কথায় কথায় বলিলাম, আপনি খুব ভাল জ্যোতিষ জানেন। আমার কোষ্ঠী কি আনিব—একবার দেখিবেন? "কেন গো কোষ্ঠী আনতে কেন হবে? তোমার কোষ্ঠী আমার নিকটে আছে। তুমি কি আমার আজকার পরিচিত?" আমি বলিলাম—"কৈ দেখি?" সঙ্গে সঙ্গে আমার নোট বহিতে আমার জন্ম বার তিথি নক্ষত্র সন তারিখসহ গ্রহ-সংস্থান করিয়া কোষ্ঠী-চক্র লিখিয়া দিলেন। এ কি অপরূপ সম্মিলন! যা খুঁজি, তাই প্রস্তুত। ইনি আমার কোষ্ঠী কোথায় পাইলেন! এ জীবনে ত আমার সঙ্গে আর পূর্ব্বে দেখা হয় নাই। তবে এ সকল কোথা পাইলেন! জিজ্ঞাসায় একটু হাসিয়া বলিলেন—"ভাবনা কি গো, সবই হয়। জল খাও"—বলিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন, আম, লিচু ও নানাজাতীয় ফল দিয়া নিজ হস্তে আহার করাইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমাকে বিদায় দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। মরা মন লইয়া আমি বাসায় ফিরিলাম। সঙ্গী বাবুটি দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন।

আমার অনেক জ্যোতিষীর সঙ্গে আলাপ ছিল। আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মানুষ দেখিয়া আপনারা সঠিক কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে পারেন কি? অন্য দেশে যে লোক আছে তাহাকে না দেখিয়া তাহার জন্ম-বার, তিথি-নক্ষত্র, সন-তারিখ প্রভৃতি দিয়া জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারেন কি?" তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন,—"আপনার কোষ্ঠীচক্র কোন প্রকারে তিনি পাইয়া থাকিবেন।" আমি বলিলাম,—"যিনি জগৎশুদ্ধ লোকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনি কি প্রকার? এ বিদ্যা এ জগতের নহে—দেবলোকের।"

যখন যাই, দেখি, প্রায় বালক-বালিকারা ঘেরিয়া আছে, আর তিনি তাহাদিগকে নানাপ্রকার ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া সন্তোষ করিতেছেন। সদাই আনন্দ—আমার চক্ষে বোধ হইতে লাগিল যেন গুষ্করা আনন্দের হাট। ঘাটে, মাঠে, বাজারে-দোকানে, ফলে-ফুলে যেন আনন্দ ছড়াছড়ি! তাঁহার থাকিবার ঘরে যেন পদ্ম-গন্ধ সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। যেন তেত্রিশ কোটী দেবদেবী তথায় বিরাজ করিতেছেন— যেন ষড়্ ঋতু বর্তমান।

বাবার অঙ্গ যেন সাধনা করিয়া লোকশিক্ষা দিবার জন্যই বিধি নিজে নিটোল করিয়া গড়িয়াছিলেন।

কোন কোন দিন দেখিতাম, রাত্রে দুই তিনবার ও দিবসে দুই তিনবার স্নান করিতেন। দারুণ শীতের মধ্যে হাতে লণ্ঠন লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। তিনি পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া প্রায় অর্ধ ঘন্টার উপর থাকিতেন। আমি শীতে জড়সড় হইয়া কাষ্ঠবৎ পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতাম।

যখন জল হতে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তীরে উঠিতেন, দেখিতাম যেন স্বভাবের তালে তালে নাচিতে নাচিতে—ছন্দে ছন্দে নাচিতে নাচিতে—আমাকে শিক্ষা দিতেন যে, এমনি করিয়া স্ব-ভাবে থাকিয়া, স্ব-চ্ছন্দে থাকিয়া ছন্দে ছন্দে নৃত্য না করিলে যেন নিত্যানন্দ লাভ হয় না।

ঘরে আসিয়া সেই সাধনার ঘরে কপাট বন্ধ করিতেন। বাড়ী সুগন্ধে অপরূপ গন্ধে মাতিয়া উঠিত। আমি দরজার নিকট তক্তাপোষে বসিয়া থাকিতাম। রাত্রি একটা হইতে প্রাতঃকাল সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত আর তাঁহার সঙ্গে প্রায় দেখা হইত না, কোন অজানা দেশে, কোন অজানা লোকের রসে মজিয়া অজানা প্রেমে বিভোর হইয়া প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের রাজার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন।

প্রাতে যখন ঘরের কপাট খুলিয়া বাহির হইতেন তখন মনে হইত, হৃদয়ের কপাটও নাকি খোলা—যেন বালক ভাব, চক্ষু ঢুলু ঢুলু, গাত্রময় গন্ধে ভরা, যেন এখনও ঘোর কাটে নাই, যেন এখনও প্রাণ হইতে প্রাণনাথ সরিয়া যান নাই। যেন পা এখন চলিতে চায় না, মুখ ফুটিতে লজ্জা বোধ করিতেছে—কথা বলিলে পাছে ব্যাভিচার স্পর্শ করে! যেন এতক্ষণ মন মনে, প্রাণ প্রাণে, হাত হাতে, পা পায়ে। চক্ষু রূপ-সাগরে ডুবিয়া মিশিয়া গিয়াছিল! এই বাহ্য জগতের সহিত তাহারা সকলেই সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া প্রাণপতির—বিশ্বপতির সেবায় ও আরতির কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। শিক্ষা দিতেছিলেন, এমনিভাবে পতিসেবা না করিলে পতি-সোহাগিনী হয় না। এমনি ভাবে শিক্ষা না করিলে প্রকৃতি পুরুষে, জীবাত্মা পরমাত্মায়, জ্ঞানী ব্রহ্ম-সমুদ্রে, ভক্ত-ভগবানে মিলিতে মিশিতে পারে না। এমনি প্রেমে উন্মত্ত না হইলে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয় না। এমনি করিয়াই নরত্ব শিবত্বে পরিণত হয়।

বাহিরে বসিলেন। কেহ পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল, কেহ তামাক সাজিয়া দিল। কিন্তু তখনও হুঁকার ডাক সতেজ নহে, তখনও যেন হুঁকার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ ঠিক ঠিক হয় নাই তখনও মন যেন অজানা রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া আসে নাই। প্রায় দেখিতাম, বাহ্যভাব আসিতে বহু বিলম্ব হইত এবং কথা কহিতেও বিলম্ব হইত।

তখন কাছারির বারান্ডায় রোগী, সাধু, গৃহী, বালক, বৃদ্ধ, ভোগী, যোগীর সম্মিলন হইয়াছে। সকলের মন ও চক্ষু সেই এক মহাপুরুষের উপর পতিত—খণ্ড যেন অখণ্ডে মিশিতে চাহে। সকলেই একদৃষ্টে মুখপানে তাকাইয়া আছে। আজ সূর্য্যরশ্মিসমূহ বুঝি সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবার প্রয়াসী হইয়াছে!

তখন মধুর কণ্ঠে, সেই ঢলঢলে, ফ্যালফ্যালে চাহনি চাহিয়া বালক-ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন—"কি গো, কেমন আছ সব।"

যেন ছায়ায় বসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য বদ্ধ জীব, মায়িক জীব, বিষয়াসক্ত জীব ঝালাপালা হইয়া ত্রিতাপে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ক্ষণিক শীতলতা লাভ করিবার জন্য কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

কেহ 'ঔষধ দাও', কেহ 'বাবা, আমার গতি কি হবে', কেহ বা পুত্রশোকে কাতর হইয়া, কেহ বা 'বাবা, কাপড় দাও', কেহ বা 'বাবা, একটু নির্জনে আসুন, গোটাকয়েক কথা বলিয়া ঠাণ্ডা হই' বলিয়া, কেব বা 'যাহা দিয়াছিলেন সফল হইয়াছে' বলিয়া, আর কেহ কেহ বা ফল-ফুল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বালক-বালিকারা 'দিন, আমাদের প্রাপ্য দিন', বলিয়া প্রসাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত। যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই দিয়া ক্ষণিক শান্তি দিয়া নিস্তব্ধ করিতেন। বালক-বালিকাদিগকে ফল দিয়া, মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া মিষ্টরসে তুষ্ট করিতেন। এই শ্রেণীর লোকে প্রায় কাছছাড়া হইত না।

"উপেন্দ্র, জল খাও" বলিয়া স্বহস্তে ফল দিয়া মিষ্টান্ন দিয়া খাওয়াইতেন। সর্ব্বপ্রথমে, স্নান-জল দিয়া মা ভগবতীর নিকট উপেন্দ্রের মঙ্গল কামনা করিতেন, দীর্ঘ জীবনের জন্য মায়ের কাছে কাঁদিতেন।

সকলে বিদায় হইলে একটি হাত-কাটা জামা পরিয়া পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। এক ঘন্টা পরে ফিরিয়া আসিতেন। আসিয়া সেই পূর্ব্বদ্বারী ঘরের ভিতর বায়ু কোণে নিজের কাষ্ঠাসনে বসিয়া অমৃত-বর্ষণ করিতেন। কত কত উপদেশ দিতেন—মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, চরিত্র-গঠন, পরোপকার, সাধু সেবা ইত্যাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া জগতে কিরূপে চলিতে হয়, এই সব শিক্ষা দিতেন।

মধ্যাহ্নে সেবা করিবার জন্য কীর্ত্তির মার বাড়ী যাইতেন। ধন্য কৃত্তিবাস আর ধন্যা তোমার মাতা ঠাকুরাণী! প্রায় ত্রিশ বৎসর একভাবে নবরূপী

নারায়ণের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নিজেকে ধন্য করিয়াছ, আর কি প্রকারে নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের সেবা করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে শিক্ষা দিয়াছ। কীর্তির বাড়ী গুস্করা গ্রামেই। মাতা-পুত্রে ঠাকুরের আশ্চর্য্য সেবা করিয়াছিল।

আহারান্তে তক্তাপোষে বসিয়া পাতঞ্জল, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। শাস্ত্রের গূঢ় ও জটিল রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেন। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তত্ত্ব বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভাব অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। সে মধুর রস আমার জীবনে পরিপাক করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ।

এই সময়ে মধ্যে করটীয়ার খাঁকি বাবা ও কুড়ুম্বার রতন ক্ষেপা ইঁহার নিকট আসিতেন ও ভোলা ক্ষেপা বলিয়া আহ্বান করিতেন। রতন ক্ষেপা দেহ রাখিবার পর গুস্করায় প্রতি বৎসর রতন মেলা হইত। এখনও বোধ হয় পৌষ মাসে হইয়া থাকে।

বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত গুস্করা গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও প্রতিবাসী প্রায় আসিতেন—কেহ সদালাপ করিতেন, আর কেহ বা দাবা-পাশা খেলায় বৃথা আমোদে সময় কাটাইয়া যাইতেন। দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলে পশ্চিমে নিজ পাটে বসিবার উপক্রম করিতেন। তাই দেখিয়া ঠাকুরও নিজ পাটে বসিবার উদ্যোগ করিতেন।

বৈকালে ঘরে ধূনা দেওয়া হইত। তিনি একবার মাত্র পাইখানায় যাইতেন—তাহা এই দিবা সাড়ে চারটার সময়। কানে পৈতা দিলেই বুঝা যাইত, এইবার উঠিবেন। পাইখানা হইতে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া স্নান করিয়া আসিয়া লেঙ্গট ও বস্ত্র বারান্ডায় শুকাইয়া দিতেন, আর রাজরাজেশ্বরের দরবারে যাইবার জন্য দরবেশ ও ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া দিনকর অস্তাচলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দরজার কপাট বন্ধ করিয়া কাহার উদ্দেশ্যে, কি সাধনার জন্য, কোন্ হিংসা-দ্বেষ-শূন্য জরা-মরণ-শূন্য ধীর শান্তি নিকেতনে, প্রকৃতির স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মন মাতাইয়া প্রতি কম্পনে, প্রতি ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে নিজ-জনসমক্ষে উপস্থিত হইতেন, তাহা তিনিই জানেন।

দরজায় প্রহরিরূপে কালীপদ ও আমি কতক্ষণে উঠিবেন এই প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণনয়নে প্রায় দণ্ডায়মান থাকিতাম।

রাত্রি প্রায় ৮টা বা ৮॥০টার সময় কপাট খুলিতেন। বাহিরে তক্তাপোষে বসিলে দেখিতাম, সমস্ত দেহ ঘামে কাদা হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেক অঙ্গ যেন খুলিয়া গিয়াছে, যেন অঙ্গের প্রতি কব্জার পেঁচ সব খুলিয়া গিয়াছে। বসিতেন, যেন এক খণ্ড বৃহৎ মাংসের স্তূপ। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা বলিতেন। তখন রাত্রের জলখাবার প্রস্তুত থাকিত। বঙ্ক সাধু নামক জনৈক ব্যক্তি—বাড়ী মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত বালডাঙ্গা গ্রামে। কাছারি

বাড়ীর সম্মুখে তাঁহার দোকান ছিল। তিনি নিজে ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ প্রাণপণে ঠাকুরের সেবা করিতেন। রাত্রে জলখাবার তাঁহার দোকানেই প্রস্তুত হইত।

রাত্রের আহার নাম মাত্র। পাঁচ খানি বা ছয় খানি ছোট ছোট লুচি, আলু ভাজা, অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ, দুই একটা ঘরে প্রস্তুত করা মিষ্টান্ন। লুচির মধ্যে তিনখানি সেবা করিতেন, বাকি প্রসাদ থাকিত—আমার জন্য একখানি, বঙ্কর জন্য একখানি ও একটি কুকুর ছিল তাহার জন্য একখানি। এই ছিল নিত্য বন্দোবস্ত। তা ছাড়া গুস্করা গ্রামের জমিদার মহাবিষ্ণু চোঙ্গদার মহাশয়ের বাড়ী হইতে তাঁহার ছেলে যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য আনিয়া প্রসাদ করাইতেন ও গুস্করার পূজনীয় ৺কালিদাস ঘটক ও কেদারনাথ মোদক মহাশয় নানা দ্রব্য আনিয়া প্রায় প্রসাদ করাইতেন।

রাত্রে জলযোগের পর প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে, ও কালীপদ ঘোষ আসিলে তাহার সঙ্গে, উল্লসিত মনে নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেন। কোন দিন গুস্করার টোলের প্রধান অধ্যাপক আসিয়া যোগ দিতেন।

শাস্ত্রালাপ করিতেন। আমি একা থাকিলে গুহ্যতত্ত্ব প্রত্যক্ষ দেখাইতেন; রাত্রি ১১টার পর শয়ন। কখন কখন নিজের কাছে শোওয়াইতেন। একটু পরে উঠিয়া দেখিতাম, ঠাকুর নাই। কোথায় গেলেন বুঝিতাম না! এক এক দিন দেখি, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। তখন বুঝিতাম, ঘরে তপস্যা করিতেছেন। কোন কোন দিন দেখিতাম, ঘর অন্ধকার, বাড়ী অন্ধকার, কেউ কোথায় নাই। রামলাল নগদির ভাই মধ্যে মধ্যে থাকিত। কিন্তু সেও নাই। প্রথম প্রথম কোথায় গেলেন, ভাবিয়া ভয় ও কষ্ট হইত। তাহার পর শুনিলাম, রাত্রে মহানিশায় নদীতীরে শ্মশানে গমন করেন। অল্প অল্প রাত্রি থাকিতে আসিয়া খাঁটী সরিষার তৈল শিশি হইতে লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন। আমিও মধ্যে মধ্যে মাখাইয়া দিতাম। ৺কালীপদ ঘোষও দিতেন। স্নানান্তে পূর্ব্বমত পূর্ব্বদ্বারী ঘরে কপাট বন্ধ হইত।

এরূপে যথাসময়ে যথানিয়মে শাস্ত্রমত ঠিক ঠিক ভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষ জীবনে আমার এই প্রথম দেখা। বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, কাম-ক্রোধ-অভিমানশূন্য অপূর্ব্ব সাধক ও যোগীরাজ আমার এই প্রথম ও শেষ দেখা।

যদি কার্য্যগতিকে কোথাও যাইতে হইত, যথাসময়ে আসা চাই। গুস্করার লোককে প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সকলেই বলিতেন, ঐ একই নিয়মে আহার, শয়ন, নিদ্রা, ভজন বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। ভিতরে প্রবেশ করে, কাহার সাধ্য।

সিংহের ন্যায় শক্তি, পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল কথা। কোন বিষয়ে কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, কাহারও নিকট কোন বিষয়ের প্রত্যাশা নাই। খাঁটী কথা, খাঁটী খাঁটী ব্যবহার, খাঁটী খাঁটী ভজন—ভয় নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, মন-রাখা কথা নাই।

গুষ্করার ৺হরিশচন্দ্র চোঙ্গদার জমিদার মহাশয় বলিতেন, "ইনি একটি শালগ্রাম। কেহ কিছু ব'ল না, আমার সময়-গুণে আসিয়াছেন।" শুনিয়াছি তাঁহার কন্যা প্রমোদবাবুর পত্নীর কঠিন পীড়া হয়। চোঙ্গদার মহাশয় বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন। কথার ছলে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হবে বাবা!" উত্তরে গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'কর্ত্তা, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিলেও আপনার কন্যা বাঁচিবেন না।" দিন-সময় নির্ঘন্ট করিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ দিনে এত ঘন্টা, এত মিনিটের সময় তাঁহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। কর্ত্তা ভয়ে ভয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রায়ই সাহস করিতেন না।

গুষ্করার লোক প্রায় অনেকেই ব্যভিচারী ও অবিশ্বাসী। কাহাকেও নিজের অপেক্ষা কোন গুণে বড় দেখিতে চাহিত না। বলিত "তিনি (গুরুদেব) যাহাকে যাহা বলেন, যদি তাই হয় তবে আরও দুই-চারিটা বলুন।" শুনিয়াছিলাম, সেই সময় ময়রাদের একটি লোক অসুস্থ হইয়া ভুগিতেছিল। তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর মুখে কিছু না বলিয়া একটি কাগজে লিখিয়া নিরপেক্ষ ভদ্রলোকের জিম্বায় বাক্সের মধ্যে তাহা রাখেন। ভাল-মন্দ মুখে কিছুই বলেন নাই। শুধু বলিয়াছিলেন, "অমুক দিনে কাগজ খুলিয়া দেখিবে, ভাল-মন্দ সবই উহাতে লেখা রহিল।" নির্দ্দিষ্ট দিনে কাগজ বাহির করিয়া দেখা গেল যে, মৃত্যুর দিন ও সময় লেখা রহিয়াছে। সেই দিনই তাহার মৃত্যু হয়।

দেরিয়াপুর গুষ্করার নিকট। তথায় হুগলী জেলার অধীন বদ্যিপুরের জমিদার জগদ্বন্ধু ও দীনবন্ধবাবুর কাছারিবাড়ী ছিল। জগদ্বন্ধুবাবুই প্রায় তথায় থাকিতেন। জমিদার জগদ্বন্ধুবাবুর সহিত আমার দেখা হইত ও গুরুদেবের কথা লইয়া অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন হইত। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, গুষ্করার ভোলানাথ সাধুর কথা তিনি দীর্ঘনগর আশ্রমের শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট শুনিয়াছিলেন।

জমিদার দীনবন্ধুবাবু ও বর্দ্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার শান্তিপুরনিবাসী বাবু হরিদাস পালও সেই সময় বাবার নিকট আসিতেন। একদিন জমিদার দীনবন্ধুবাবু কাছারিবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি গায়ের শাল বিছাইয়া গুরুদেবকে তক্তাপোষে বসাইয়া বিনীতভাবে অনেক কথা জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "প্রভু, আপনার ৺শিবঠাকুরের পূজার কি কিছু পাকা বন্দোবস্ত আছে?" বাবাজী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আতপ চাউল আর রম্ভা যখন যাহা জোটে, তাহাই দিয়া থাকি।"

এই কথার পর বদ্যিপুরের উক্ত জমিদার দীনবন্ধুবাবু অতি বিনীতভাবে বলেন, "অনুমতি করিলে ৺শিবঠাকুরের সেবার জন্য আমি একখানি মৌজা দানপত্র লিখিয়া দিই।" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি দিবে

গো? আমি যাঁর সেবা-পূজা করি তিনি মনে করিলে বহুরাজ্যের অধীশ্বর করিতে পারেন।" বলিয়া প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। দীনুবাবু ও অন্যান্য সকলেই নিস্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

একদিন অনেক মিনতি করিয়া গুষ্করা হইতে আউসগ্রামে আমার বাসায় যাইবার জন্য বলায় স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "কল্য প্রাতে ৺পূজা করিয়া যাইব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয় ফিরিব, থাকিতে বলিলে থাকিব না।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা তাহাই হইবে।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসে বেলা প্রায় ৯টার সময় তিনি আউসগ্রাম থানায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় আম আনিযা আমার মেয়ে বিজনবাসিনীকে দিয়া বলিলেন, "নাও, খাবে" বিজনের বয়স তখন পাঁচ বৎসর। তাহাকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "এ মেয়েটি তোমার ভাবী গিন্নি হইবে। পিতৃ-মাতৃ সমান অংশ লইয়া ইহার জন্ম।" বাস্তবিকই বিবাহের পর সেই বৎসর বিধবা হইয়া সে আমার ঘরের গিন্নি হইয়া রহিয়াছে। ইহার রহস্য পরে বিশদভাবে লিখিব।

আউসগ্রামের গোস্বামী মহাশয়েরা অনেকে আসিয়া গুরুদেবের আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পরে ইঁহাদের বংশের বৈদ্যনাথ গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন।

বাবাজী কয়েক ঘন্টা থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে গুষ্করায় ফিরিয়া যান। আমার কন্যাটির পর পাঁচ ছয় বৎসর পুত্রাদি না হওয়ায় এবং আমার পত্নীর গুরুতর পীড়া হওয়ায় সন্তানাদির আশাও ছিল না। বহু চিকিৎসায় দুরারোগ্য রোগ কিছুতেই সারিল না। আমার অগ্রজ দুর্গাদাস চৌধুরী আমার নিকট গিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার প্রস্তাব করেন। আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম, "ভগবান্ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।" তিনিও সম্মত হইলেন। এদিকে দাদা বাঁকুড়ায় নিজ ওকালতী ব্যবসায়ে যোগ দিতে চলিয়া গেলেন। আমি প্রভুর নিকট ঐ কথা উত্থাপন করিলে, তিনি বলিলেন, "কেন গো, বিবাহ আবার কেন? পুত্র চাও কি? ও-সব ত বাবা বন্ধন।" আমি বলিলাম, "সংসারী হলে সবই দরকার হয়।" এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে এই বৎসরেই তোমার পুত্র লাভ হইবে। রোগ সারিয়া যাইবে। এই ঔষধ দিবে আর এই কবচ ধারণ করাইবে।" বলিয়া ঔষধ ও কবচ দিলেন।

আমার পরিচিত একটি লোক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য জেদ করিয়া ধরিলে বাবাজী আমায় গোপনে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তির ব্যভিচার দোষ আছে। ও ভেদিয়া গ্রামে একটি ছোট-লোকের স্ত্রীলোকের অবৈধ প্রেমে মাতিয়া রহিয়াছে, কি করিয়া কৃপা হয় বল।" সেই লোকটিকে আমি গোপনে জিজ্ঞাসা

করায় সে তাহা স্বীকার করিল। বাবাজী বলিয়াছিলেন, সে তাহার উপপত্নী ত্যাগ করিলে যাহা হয় দেখিবেন ও করিবেন।

কিছুদিন পরে আমি সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, "কি হে, ছাড়িয়াছ? উত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, ত্যাগ করিয়াছি।" সেই কথা ঠাকুরকে আমি বলিলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কৈ, ছাড়ে নাই। সেদিন সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তবে ফুস ফুস করিয়া কথা কহিতেছিল কেন?" ইহা সঠিক কি না জানিবার জন্য আমি সেই লোকটিকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় সে স্বীকার করিল যে, একদিন সন্ধ্যার পর তাহার সহিত নির্জনে কথা কহিয়াছিল। আমি বলিলাম, "ভাই, ইঁহার নিকট কোন বিষয় ছাপাবার নাই।" তাহাকে আর আশ্রয় দিলেন না।

আমি সেই সময় অত্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলাম। এই ম্যালেরিয়ার জন্য ইহার পূর্ব্বে তিন মাসের ছুটি লইয়া নানা স্থানে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ছুটি অন্তে হাজির হইলে আমাকে আউসগ্রামে বদলি করিল।

এই বারেই বাবাজীর অনুগ্রহ লাভ করি। আমি জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি দেখিয়াও তিনি কিছুই বলেন নাই। অনেক লোক ঔষধ লইয়া আরোগ্য হইতেছে, আমি কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলি নাই।

একদিন বর্ধমান হইতে গুস্করায় বাবাজীর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি নাই,—প্রাতঃকালে যে প্রকার পূজান্তে বেড়াইতে যান, সেইরূপ গিয়াছেন। ৺কালীপদ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, "ডাক্তারবাবু বাহিরে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন—উপেন্দ্র আসিলে আজ আউসগ্রাম যাইতে দিবে না। আমি এখনই আসিতেছি। তাহাকে এই ঔষধটি খাওয়াইয়া দিবে।" আর একটি কথা বলি-বলি করিয়া চাপা দিবার উপক্রম করিতে লাগিল। জেদ করিয়া ধরায় বলিল, "ডাক্তারবাবু (গুরুদেব) বলিয়া গিয়াছেন, আজ তার কঠিন দিন। আউসগ্রাম যাইতে দিও না।" আমি ঔষধ সেবন করিয়া বসিয়া আছি। দেখিতে দেখিতে ঠাকুর আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ঔষধ খাইয়াছ? আজ এখানেই থাক, যেয়ে কাজ নাই।"

বেলা প্রায় দশটার সময় জ্বর এরূপ কঠিনভাবে আক্রমণ করিল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। বেলা প্রায় ৪টার সময় একটু ঠিক হইলে বলিলেন, "তোমার আজ খুব যন্ত্রণা হইতেছে, আজ তোমার কঠিন দিন ছিল, তাই যাইতে দিই নাই। আজ একেবারে রোগের শেষ করিব।" বলিয়া নিজের দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি আমাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে বলিলেন। বিছানায় বসিয়া রহিলেন। অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র কি ভয়ঙ্কর রূপে ঘাম হইতে লাগিল। বিছানা ও দুই তিন খানা লেপ যাহা গায়ে ছিল, ভিজিয়া গেল। অর্দ্ধ

ঘন্টা পরে গাত্র যেন বরফ আর হৃদয়ে স্ফূর্তি। আমি তখন ক্ষিধেয় অস্থির। বলিলেন, "তোমার যা ইচ্ছা, তাই খাও।" পেট ভরিয়া নানা প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়া রাত্রে গাঢ় নিদ্রাসুখ অনুভব করিলাম। সেইদিন হইতে আর একদিনও জ্বর হইল না। একটি বড় বোতলে লাল রঙের ঔষধ দিয়াছিলেন। খাইয়া মোটা হইয়াছিলাম।

এমন ঘটনা কতবার হইয়াছে। আমার গুপ্তরা যাইবার কোন কথাই নাই, কিন্তু কাছারির চাকর মহাদেবকে ও ৺কালীপদ ঘোষকে বলিতেন, "আজ রাত্রি ১১টার সময় উপেন্দ্র আসিবে, তাহার আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত রাখিবে।" ঠিক ১১টার সময় আমি হাজির। শীতকালের সমস্ত রাত্রি, কি আনন্দে কাটিয়া যাইত, কি তন্ময়ভাবে, কি একাগ্রভাবে, কি অপরূপ রূপ দর্শনে, কি সুন্দর সুন্দর গল্প ও শাস্ত্রালাপে ভোর হইয়া যাইত, তাহা সেই আনন্দময় মহাপুরুষই জানিতেন।

একদিন কথায় কথায় বলিলেন, "তোমার বদলি হইবে ও তোমাকে বহু ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হইবে। দাদা গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস বলিয়াছিলেন, উপেন্দ্রের কেহ কিছু করিতে পারিবে না। তবে আমি তাহাকে তাহার কায়েতী বুদ্ধি ছাড়াইবার জন্য নিজে দণ্ড দিব।"

ইহার অল্পদিন পরেই ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে হঠাৎ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য সাহেব আমাকে আসানসোল থানায় বদলি করিলেন। আমি তথায় চলিয়া গেলাম। তিনি আমাকে কাছছাড়া করিলেন। কিন্তু দৈনিক উপদেশ-পূর্ণ পত্র দিয়া সজাগ ও সতেজ রাখিতে লাগিলেন। যাইবার সময় তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে বলিয়া অনুতাপ করিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া ফেলিলাম। মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "দূর কোথা গো! অজ্ঞানেতেই নিকটের জিনিষকে দূরে দেখে। আমি তোমার কাছছাড়া নই। তথায় গিয়া পত্র দিবে।"

মাথা স্পর্শ করিবামাত্র আমার মন ও হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। ভাবিলাম 'অন্তর্যামী কি আর অন্তর ছাড়িয়া থাকিতে পারেন!' বাস্তবিকই তিনি আমাকে ছাড়িলে আমার দেহ একদণ্ডও থাকিতে পারে না। আমি হৃষ্টমনে আসানসোল গমন করিলাম। আমি এই সময় ইদানীং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্তগণের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করিতাম। আমাদের দামোদরবাটী গ্রামের ৺রামানন্দ দাস নামক জনৈক ভগবদ্ভক্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আমি প্রায় ধর্ম্মালোচনা করিতাম। আমি কুলগুরুর নিকট দীক্ষা ও বাহিরে বৈষ্ণবের আচরণ গ্রহণ করি। তখন আমি গলায় মালা ধারণ করিয়া লোক-দেখানো সাধু ছিলাম। একদিন প্রভু আমায় বলিলেন, "উপেন্দ্র, তুমি বাহিরে তিলক, গলায় মালা, মস্তকে শিখা রাখিয়া বৈষ্ণব সাজিয়া আছ। কিন্তু ভিতরে কি তোমার যথার্থ

বৈষ্ণবের ভাব আছে, না, ভিতর কুভাবে পরিপূর্ণ রাখিয়া বাহিরে লোক-দেখানো বৈষ্ণব সাজিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের পরকালের পথ পরিষ্কার করিতেছ? জানো, বৈষ্ণব কাহাকে বলে? গুণ-বৈষম্য থাকিতে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। "বিষ্ণুঁ জানাতি বৈষ্ণবঃ," তোমার এ-ভাব আমি নষ্ট করিব। অগ্রে চরিত্র রক্ষা কর, যাহাতে মনে কুবাসনা উদয় না হয়, পরস্ত্রী মাতৃবৎ বোধ হয়, তাহা কর। 'বশ কর মন প্রথম শশি' তাহার পর সংযম! মনের মধ্যে যদি ২৪ ঘন্টা রিপুর উদয় হয়, তবে তুমি কি প্রকারে হরিপাদপদ্মে মন নিবিষ্ট করিয়া হরিসাধনা করিবে? বৎস, অগ্রে যাহা যাহা করা ব্যবস্থা, তাহাই করা উচিত। পরের কর্ম্ম পূর্ব্বে ও পূর্ব্বের কর্ম্ম পরে করিলে কি কখন কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়? প্রস্তুত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে যজ্ঞ পণ্ড হয় না। আর অপ্রস্তুত হইয়া কর্ম্ম করিতে নামিলে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত হইতে হয়। কদাপি মনে কুপ্রভাব পোষণ করিও না। ভগবদ্ভক্ত হইলে গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই, সাধু ভাব, সাধু ব্যবহার, সাধুর চরিত্র গঠন করিতে হয়। ছলচাতুরী ক্রমে ক্রমে ত্যাগ না করিলে কি বাব, সাধু হওয়া যায়? এ দেশের মানুষ সে দেশে যাইতে পারে না। সে দেশের মানুষ এ দেশে আসে না। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' তুমি সর্ব্বদা সৎচিন্তা করিবে, কর্ম্ম কি এবং কি করিলে কর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে বুঝা যায়, তাহা পরে পরে তোমাকে শিক্ষা দিব। কোনকালে যাহা প্রকৃতপক্ষে তুমি নহ, তাহা ছল করিয়া ছদ্মবেশী হইও না। সত্য যাহা, তাহাই থাকিতে চেষ্টা করিবে। সত্যের উপর দাঁড়াইয়া সত্য রক্ষা করিবে। ঠিকের উপর দাঁড়াইয়া ঠিকের ঘরে ঠিক দিবে, গোঁজা মিল দিও না, কালে মানুষ হইতে পারিবে।"

আমি আসানসোল গিয়া বাস্তবিকই বড়ই ঝঞ্ঝাটে পড়িলাম। এত কাজ ছিল যে, রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া কার্য্যের শেষ হয় না। সমস্ত দিন ও রাত্রি প্রায় ২/৩টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া ঝঞ্ঝাট শেষ করিতে পারি নাই।

সেই সময় ২/১ দিন অন্তর তাঁহার পত্র আসিতে লাগিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে গা শিহরিয়া উঠিত। অসাধারণ শক্তি আসিয়া মাতাইয়া দিত। রাশি রাশি কর্ম্ম আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। নানা প্রকারের জটিল বিষয় আসিয়া জুটিলে তাহা অতি সহজেই সরল হইয়া যাইত। সকলেই আমার কার্য্য-কৌশল ও শীঘ্রগতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। যে সময়ে মানসিক দুর্ব্বলতা আসিবার উপক্রম হইত, ঠিক সেই সময় উপর্য্যুপরি পত্র আসিয়া সেই দুর্ব্বলতার ভাবকে কোথায় চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত করিয়া দিত, প্রবল বেগে কর্ম্মস্রোত বহিতে থাকিত। এই ভাবে দুই এক মাস থাকার পর এক গুরুতর জটিল খুনের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমার বিশেষ বিবরণ লিখিলে বহু বিস্তার হইয়া যাইবে, সুতরাং বিস্তারিত ভাবে লিখিলাম না। ফল কথা, এই মোকদ্দমা আমার

উপরই ইন্‌স্পেক্টর পাঠাইলেন, তাঁহার মাথায় কিছুই প্রবেশ করিল না। বহু বিচক্ষণ বহুদর্শী ইন্‌স্পেক্টর দিগম্বর অধিকারী প্রভৃতি উপরিস্থ কর্ম্মচারী আসিয়াই গোলে পড়িলেন ও কিছুক্ষণ থাকিয়া স্থানত্যাগ করিলেন। তাহার পর সাবডিভিসনল অফিসর, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিভিসনল কমিশনর প্রভৃতি মোকদ্দমার অবস্থা দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই চুপ করিয়া থাকিলেন, কেহ কোন কিছু স্থির করিয়া উপদেশ পর্য্যন্ত দিলেন না। তাহার পর সেই মোকদ্দমা দুইবার সেসন ও দুইবার হাইকোর্টে বিচার হয়। সকলেই আমার শত্রু এমন কি লাট সাহেব পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন।

এই সময়ে সকলেই আমাকে অকূল বিপদ-সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া আমার অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিপদের কাণ্ডারী মধুসূদনের নিকট আমি নিরপরাধ, তাই ভবপারের কর্ণধার আমার জন্য নৌকা লইয়া তীরে আসিলেন। মাভৈঃ রবে আমাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "উপেন্দ্র, দাদা গুরুদেব লিখিয়াছেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোক বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে উপেন্দ্রের কিছুই করিতে পারিবে না। উপেন্দ্র যাহা করিয়াছে, তাহাই টিকিবে।" ঘটনার প্রায় তিন বৎসর শেষ হইতে না হইতে শ্রীগুরুদেবের কথাই সত্য হইল।

আলিপুরের সরকারী উকিল ৺আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় ঐ মোকদ্দমা আলিপুর সেসনে বিচার হইবার সময় বলিয়াছিলেন, 'এত লোক এই দারোগার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, কিন্তু এই ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছে, তাহাই হইবে।" বিপক্ষের উকিল ছিলেন বাবু হেমেন্দ্রনাথ মিত্র। জজ্ রিচার্ডশন সাহেব একপ্রকার করিলেন, কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট আমার প্রস্তাবেই মত দিলেন। যাহা শ্রীগুরুর মুখে দুই বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম আজ তাহাই ঠিক হইল।

এই সময় আমার আকস্মিক মৃত্যু হইবার কথা কোন কোন জ্যোতিষী পণ্ডিত নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। আমি সেই কথা প্রভুর নিকট উত্থাপন করিলে তিনি কোনই উত্তর দেন নাই। বুঝিলাম, বিপদ অতি-নিকট—অচিরেই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিবে।

সেই সময় মধ্যে মধ্যে প্রভুর নিকট গিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া অমূল্য নিধি সংগ্রহ করিতাম।

ইংরাজি ১৯০২ সালের ২২শে আশ্বিন হঠাৎ আমার দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কোথায় উড়িয়া গেল। পর দিবস প্রাতে এক পত্র পাইলাম। প্রভু লিখিয়াছেন, "২২শে আশ্বিন পার করিতে কি কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তুমি আসিলে দেখাইব। তুমি শীঘ্র আসিবে, তোমাকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।" আমি পত্র পাইয়া বাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিবামাত্রই

বাবার চক্ষু দুইটি জলে ডব্-ডব্ করিতে লাগিল। বলিলেন, "উপেন্দ্র, আজ আর তোমার অস্থি-মাংস-বিশিষ্ট দেহ-পুরে তোমাকে এই চক্ষে দেখিতে হইত না। অনন্ত জগৎ-সমুদ্রের কোন দেশে তলিয়ে যাইতে, কিনারা থাকিত না।"বলিয়া পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভৃগুরাম পরমহংস দেবের চিঠি দেখাইলেন। বলিলেন, "তোমার এই প্রকার বিপদ হইবার আশঙ্কা দেখিয়া আমি বিন্ধ্যাচলে পরমহংস নিমানন্দ স্বামীর নিকট যাই। তিনি বলিলেন, "এই অনাদি অনন্ত প্রকৃতির স্রোতে কত জীব স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে অনন্তকাল হইতে ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, উঠিতেছে, তাহার গতি রোধ করা ঠিক নয়। উপেন্দ্র কর্ম্মফলে ভাসিয়া যায় যাক্, তুমি স্থির থাকিয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাক।"

স্বামী পূজ্যপাদ নিমানন্দ পরমহংস দেবের এইরূপ প্রস্তাবে আমি মর্ম্মাহত হই। ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভাবিলাম, উপেন্দ্রকে এ-যাত্রা রক্ষা করিতেই হইবে। ক্রমে পাঞ্জাব পার হইয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়া তিব্বতে রাজরাজেশ্বরের পাহাড়ে উপস্থিত হইলাম। আমার অভীষ্টদেবের চরণ বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ক্রমশঃ নানা কথার পর পূজ্যপাদ স্বামী ভৃগুরাম পরমহংস মহারাজের নিকট তোমার কথা আরম্ভ করি।

তিনি সমস্ত শুনিয়া গেলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। গুরুদেব মহাতপাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই। পুনঃপুনঃ দাদা গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস দেবের কৃপা-ভিখারী হইলাম। তিনি বলিলেন, "যা হবার হইয়া যাক্, দেখিবার দরকার নাই।" তিন দিবস অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "দাদা গুরুদেব, আমি আপনার যেরূপ প্রাণের জিনিষ, উপেন্দ্র কি আমার সেই প্রকার নহে? যদি আপনি না দেখিবেন, আমার কর্ম্ম ও আয়ু দিয়া আমি তাহাকে রক্ষা করিব।" এই কথা শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বিশুদ্ধানন্দ, তুমি যাও, আমি ব্যবস্থা করিব।" আমি আরও দুই দিন থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। আমি আসার পর তিনি কি কি করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন দেখ। দেখিলাম,—পত্রের শেষভাগে লেখা রহিয়াছে, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু যদ্যপি চেষ্টা করেন, উপেন্দ্রের বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারিবেন না। যাহা করিব, আমিই করিব।" আজ তোমাকে দেখিয়া আমার আনন্দ ধরে না, ধন্য গুরুর কৃপা। পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামীর কথা-প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন "পরমহংস মহারাজ ভৃগুরাম স্বামী সর্ব্বসময়েই গুরুদেব মহাতপার নিকট থাকিয়া তাঁহার শরীর রক্ষা করেন। গুরুদেব অতি দীর্ঘজীবি। তাঁহার আহার নাই, বায়ু ও ভস্ম আহার করিয়া দেহ রক্ষা করেন। অস্থি চর্ম্ম থলথলে। চক্ষুর ভ্রূর চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়া চক্ষু ঢাকা পড়িয়াছে। বক্ষঃস্থলের চর্ম্ম ঝুলিয়া পেটের সঙ্গ ধরিয়াছে। অতি সন্তর্পণে তাহার দেহরক্ষার ভার কেবল ভৃগুরাম স্বামীর উপর ন্যস্ত।"

ভৃগুরাম স্বামীর বয়সও কম নহে। তিনি ভয়ঙ্কর তেজস্বী ও উগ্র তপস্বী। পৃথিবীর কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। চক্ষু বড় বড়, ঈষৎ খর্ব্ব, মুখ চুল দাড়ি যেন প্রাতঃকালীন সূর্য্যের রঙ, দীর্ঘ ললাট, তপস্যার শক্তি ও তেজঃ দেখিয়া যেন ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ সশঙ্ক। তিনি গুরুদেবের পরম আদরের ধন।

একবার পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী কোন একস্থানে (জ্বালামুখীর সন্নিকটে) ভৃগুর আশ্রম নামক আশ্রমে কোন ইংরাজ রাজপুরুষ ভৃগুরাম পরমহংস দেবের নিকট আসিয়া কিছু যোগ-বিভূতি দেখিবার প্রয়াসী হন। পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে চাও?" সাহেব "আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাই দেখান" এই কথা বলিলেন। তৎক্ষণাৎ পরমহংস মহারাজকে আর সেই স্থানে দেখা গেল না। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ঐ সাহেবের একটি ১৯/২০ বৎসরের ছেলে সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে হঠাৎ পড়িয়া গেল। অমনই পরমহংস দেব ঐ বালকের বক্ষঃস্থলে বসিয়া তাহার পেট চিরিয়া নাড়ী-ভুঁড়ি টানিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। বালক মরিয়া গিয়াছে ও একজন সন্ন্যাসী তাহার নাড়ী-ভুঁড়ি বাহির করিতেছে, দেখিয়া সাহেব ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহিরা করিয়া ঐ সন্ন্যাসীর দিকে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটি গুলিও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল না। কে যেন উহা হাতে করিয়া ঠেলিয়া দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীবর বাতাসে ভর দিয়া শূন্যমার্গে চলিতে চলিতে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। সাহেব ও মেম পুত্রশোকে কাতর হইয়া অত্যন্ত কাঁদিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী কোথা হইতে আসিয়া হাসিমুখে বালককে হস্ত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন। বালকও হাসিতে লাগিল। মেম ও সাহেব বুঝিলেন না, ইহা কি ব্যাপার! সন্ন্যাসীবর বলিলেন, ইহাই যোগ-বিভূতি। সাহেব সেই অবধি নানা উপচারে, স্বামীজী যতদিন সেইস্থানে ছিলেন, সেবা করিয়া যাইতেন।

আপন গুরুদেবের সঙ্গে থাকা কালে পরমহংস মহারাজ ভৃগুরাম স্বামী দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে জলের স্রোতঃ তীব্র গতিতে বিকট শব্দ করিতে করিতে নীচে পতিত হইতেছে। সেই শব্দে গুরুদেবের কর্ণে আঘাত লাগিতেছে। দেখিতে দেখিতে পরমহংস মহারাজ পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া পতিত জলস্রোতকে হাতে ধরিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে নামিয়া পড়িলেন। জলস্রোতও সেই সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গা বহিয়া নীচে নিঃশব্দে পতিত হইতে লাগিল। এইপ্রকার আরও অনেক ঘটনা শুনিয়াছিলাম।

আমার রাত্রি যাপন প্রায়ই বাবাজী গুরুমহারাজের সঙ্গেই হইতে লাগিল। কোথায় আসানসোল আর কোথায় গুষ্করা, যেন মুহূর্তমধ্যে তাঁহার নিকট গিয়া পড়িতাম। আমি সদর দরজার নিকট দাঁড়াইবামাত্র ভিতর হইতে কে সেই

করুণা-মাখা শব্দে "উপেন্দ্র আসিয়াছে" বলিয়া নিমেষের মধ্যে দরজার নিকট আসিয়া কপাট খুলিয়া দিতেন।

তিনি যে কুঠ্‌রীতে তপস্যা করিতেন, সেই কুঠ্‌রী হইতে সদর দরজা কিছু দূর। চীৎকার করিয়া ডাকিলে শুনা যায়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমি দরজার নিকট দাঁড়াইবামাত্র কে যেন দরজার অন্য দিক দিয়া "উপেন্দ্র আসিয়াছে" বলিয়া কপাট খুলিয়া দিতেন।

সমস্ত রাত্রি চক্ষে আমার ঘুম আসিত না, তিনি একাসনে একভাবে থাকিয়া কত কৌতূহলপূর্ণ গল্প ও কত সদুপদেশ দিয়া আনন্দ বর্ষণ করিতেন।

ক্রমশঃ ১৯০২ সাল গত হইয়া গেল। আসানসোলে নানা প্রকার ঝন্‌ঝাটে আমাকে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিল। বিপদের উপর বিপদ—যেন জীবন-সমস্যার একটা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। এই সুযোগে ইহাই আমার শুভদিন। ভাবিলাম, বিপদ না হইলে ভগবানের কৃপা, শ্রীগুরুর কৃপা ও ভালবাসা, অনুভব শক্তিতে আনিবার সুযোগ হয় না। ইহাই প্রকৃত সুবিধা।

আজ আমার ভবপারের কাণ্ডারীর কৃপায় আমি প্রায় সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে লাগিলাম। জানি না, অন্তর্য্যামীরূপে কে আমাকে বিপদ-সমুদ্র হইতে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ভিতর হইতে 'ভয় নাই' 'ভয় নাই' বলিয়া টানিয়া আনিয়া তীরে তুলিতে লাগিলেন। আমি প্রত্যেক বিপদের মধ্যেই আনন্দে ভাসিতে লাগিলাম। দেখাইলেন, জগতে এক আনন্দ ছাড়া কিছু নাই, ইহা আনন্দময়ের আনন্দের হাট। প্রকৃতকাণ্ডারী বিহনে জীব জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারাবদ্ধ হইয়া তুফানে পড়িয়া মায়ামরীচিকায় হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের ভাব মনে অঙ্কিত করিয়া ডুবিতেছে, উঠিতেছে; আর পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের অদৃষ্টের কথা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সময়ে বণ্ডুলে হর-হরি প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া বাবা আমাকে সংবাদ দেন।

একদিন (২৯শে জানুয়ারী, ১৯০৩) আসানসোলের উত্তরে ২০/২২ মাইল দূরে আমি এক কঠিন বিপজ্জালে জড়িত হইয়া জাল ছিঁড়িয়া পলাইবার পন্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, যে-দিকে তাকাই সে দিকেই অসীম বিপদ-সমুদ্র আমাকে ঘিরিয়া আছে। অন্যদিকে দেখি, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড—অগ্নিশিখা লক্‌লক্ করিতে করিতে আমাকে তাহার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে বলিতেছে, যেন পুড়াইয়া ছারখার করিতে চায়। রাত্রি প্রায় তখন ২টা—নিদ্রা চক্ষে আসে নাই। চিন্তাবায়ু আমাকে উগ্রমূর্ত্তিতে তোলপাড় করিতে লাগিল। প্রাতঃকালেই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ আসিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, কূল-কিনারা নাই। যে বাসায় থাকিতাম তাহার উত্তর ধারে একটি নদী আছে, সেই রাত্রে সেই নদী-তীরে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া কি করিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব,

তাহার প্রতিকারকল্পনায় চিন্তাকুল প্রাণে হা-হুতাশ করিতেছি। জানি না, শ্রীগুরু-ভগবানের কি অচিন্তনীয় শক্তি,—বিদ্যুদ্‌গতিতে কি এক আলোক আমার নয়ন-পথে পতিত হইল। আলোর নিকটে যাইতেছি, এমন সময় অন্তর্য্যামীরূপে কে বলিল, 'উহা মায়িক আলোক, উহাই তোমার ধ্বংসের প্রতিমূর্ত্তি, যাইও না।' এখনও সেই শব্দ আমার কর্ণে বর্ত্তমান, আমি ক্ষিপ্রগতিতে ফিরিয়া পাথরের উপর বসিলাম। প্রায় ভোর হয়, একটি ব্রাহ্মণ নদী পার হইতেছে, দেখিলাম। তিনি বলিলেন, "চিন্তা কি? উপায় হবে।" বলিয়া তিনি নদীগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

আমি বাসায় ফিরিবার মুখে দেখি, বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার শত শত উপায় আমার সম্মুখে উপস্থিত। গ্রহণ করিলাম না। অশ্রুতে চক্ষু ও বক্ষ ভাসিতে লাগিল। কি অদ্ভূত একাগ্রতা আসিয়া চর্তুদিকেই বিপদ কাণ্ডারীকে দর্শন করিতে লাগিলাম।

বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম—সব স্থির, কে যেন কোথায় সমস্ত বিপদ রাশি সরাইয়া দিয়াছেন। আনন্দে সেদিন আর আহার পর্য্যন্ত করি নাই। সকলেই আসিয়া কার্য্য দেখিয়া আনন্দে চলিয়া গেলেন। তাহার পরদিন পত্র পাইলাম। "চিন্তা কি? বৃথা চিন্তা করিও না, নির্ভর করিতে শিক্ষা কর, নির্ভর ভিন্ন জীবের গতি নাই।

ক্রমশঃ শীত গত হইল। বসন্ত আসিয়া শীতের স্থান দখল করিয়া বসিল। কিন্তু তবুও আমার বিপদের শেষ নাই। উপরি উপরি বিপদ আসিয়া পড়িতে লাগিল।

গুরুজী আমার পত্নীকে কবচ ও ঔষধ দেওয়ার পর তাহার দুরারোগ্য রোগ কোথায় চলিয়া গেল। এখন সে অন্তঃসত্ত্বা। সেই সময় তাহার ভ্রূর মধ্যস্থলে এক ব্রণ উঠিয়া সমস্ত মুখ হাঁড়ির মত ফুলিয়া গেল। প্রাণের মধ্যে বড়ই ভয় হইল। প্রভুর নিকট চলিয়া গেলাম। স্নান-জল আনিয়া দিলাম। ক্রমশঃ সারিতে লাগিল। তাহার পর তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুদিন পর আমি অত্যন্ত অসুখে পড়ি। ১৭ দিন জ্বর ত্যাগ হয় নাই। সেই সময় আমার শত্রুকূল আবার আমাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। তখন বাবাজীর সহিত আমার খুব শীঘ্র শীঘ্র সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। শত্রুদের মধ্যে অনেকেই এখন আমার গুরুভাই হইয়াছে। তাহারা আমার ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া নানা বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াও পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে থাকায় সন্ধানে জানিল, উপেন্দ্র প্রায় তাহার গুরুর নিকট যায়, তাহার গুরু বড়ই তেজস্বী ও উগ্রতপস্বী, সমস্ত বিপদ হইতে তিনিই উপেন্দ্রকে রক্ষা করিতেছেন। সেই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমার গুরুকে হস্তগত করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবে। এই প্রস্তাব আঁটিয়া তাহারা গুরুজীর সন্ধান লইয়া তাহার নিকট গতিবিধি করিতে লাগিল। তাহারা যাইতে আরম্ভ করিলে

অন্তর্যামী গুরুজী তাহাদের অন্তরের ভাব জানিতে পারিলেন। ভাব গোপন করিয়া তাহাদিগকে আদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহারা যায়, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন কথা সাহস করিয়া উত্থাপন করিতে পারে নাই। তাহারাও গুরুজীর সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু খল প্রকৃতি ছাড়ে নাই।

একদিন গুরুজীর নিকট আমার বিরুদ্ধে ২/৪ কথা আরম্ভ করিলে গুরুদেব বলিয়াছিলেন, "উপেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তোমরা আমার নিকট আসিও না, ইহা বিবাদ-কলহের স্থান নয়। ইহা আনন্দ নিকেতন।" তাহাদের মুখ সেইদিন রুদ্ধ হইল। তাহারা যাওয়া-আসা কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিল। কিন্তু একজন আর বন্ধ করিল না। প্রায় যাওয়া-আসা করিতেছিল।

তাহার পর বিপক্ষগণ একে একে বিপজ্জালে জড়িত হইতে লাগিল, আর বিপদ-কাণ্ডারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে লাগিল।

একদিন আমি শ্রীচরণ-প্রান্তে বসিয়া পদ-সেবা করিতেছি, এমন সময় গুরুজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার অনেক শত্রু। বাবা, তোমার গুণও যত, দোষও তত। দোষের ভাগ নষ্ট করিয়া উহা গুণে পরিণত করাই গুরুর কর্ত্তব্য। দোষযুক্ত জীব কি কখন শিবত্ব প্রাপ্ত হয়? সমস্ত সদ্‌গুণ যতদিন জীবকে আশ্রয় না করে, ততদিন কি ভগবান লাভ হয়? ইহার মূল কারণ গুণ-বৈষম্য। গুণ-বৈষম্যই সৃষ্টি চলিতেছে, সমগুণে সৃষ্টি হয় না। কল্পনায় চিত্ত কলুষিত হয়। তোমার অসৎ বৃত্তি ছাড়াইতে আমার অনেক সময় লাগে। তুমি এক মুহূর্তে যে দূষিত বৃত্তি চিত্তে আন, সেই এক বৃত্তিকে নষ্ট করিতে কি কম পরিশ্রম করিতে হয়? এখন তোমার ব্যভিচারী মনকে নষ্ট করিতে হইবে, তোমাকে কিছু দণ্ড দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। দণ্ড ভোগ ভিন্ন কি চিত্ত শুদ্ধ হয়? যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে হইবে, আর সেই ছট্‌ফটানির তীব্র যন্ত্রণায় ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে ময়লা পরিষ্কার হইবে। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে।"

আমার ভারি দুশ্চিন্তা উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, বড় কঠিন পথ, কিছু কুকাজ করা দূরে থাক্, মনে চিন্তা করিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। চিত্তে কোন কলুষিত বৃত্তি উদয় হইতে না হইতে, কিছু চিন্তা না করিতে করিতে, ইনি সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন। বুঝি আবার কি বিপদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে অপেক্ষা করিতেছে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। গুরুজীর নিকট রাত্রে নানাভাবে আনন্দে কাটাইলাম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক এক বিপদের ভাবনা ভাবিয়া চমকিয়া উঠিতাম।

কালীপদ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সাহস দিলেন যে, গুরুজী আছেন, ভাবনা কি? বলিলাম, "তিনি নিজেই যখন কঠোর দণ্ড দিবেন তখন

দাঁড়াই কার কাছে? রাম নিজেই মারিতেছেন তো দোহাই দিব কাহার? চিন্তা করিতে করিতে স্বস্থানে ফিরিলাম। অনুসন্ধান করিলাম, কিছুই বিপদের কথা জানিতে, কি শুনিতে পাইলাম না।

তবে পরে জানিলাম, যেদিন গুরুজী বলিয়াছেন ঠিক সেই দিনই গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র হইয়া গিয়াছে।

এই সময় আমার উপরিস্থ ইন্‌স্পেক্টর এক সাহেব প্রভুর শুভাগমন হইল। বাঙ্গালীর স্থানে ইংরাজ ইন্‌স্পেক্টর আসানসোলে আসিল। সাহেব প্রভু আসিয়া কথার মিষ্টতায় আমার সঙ্গে খুব মেশামেশি করিতে চাহেন কিন্তু আমি তফাৎ তফাৎ থাকি। তিনি বন্ধুভাব রাখিতে চান, আমি মনিব-প্রভুর যে সম্বন্ধ, তাহাই বজায় রাখিতে চাই। কি জানি কালসর্প কোন্ সময় দংশিবে—বিষে ছট্‌ফট্ করিব। পরিণামে প্রভুর কুদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। ঘরের ২/১ জন শত্রু কুমীর হইয়া প্রভুর সঙ্গে যোগ দিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবার চক্রান্ত আরম্ভ করিল।

এই সময় দক্ষিণাপ্রসাদ রায়চৌধুরী (এখন আমার গুরুভাই) ঐ সাহেব প্রভুর কেরাণী হইয়া আসিলেন। ইঁহার সহিত আমার শুভক্ষণেই দেখা, বলিতে হইবে—ইনি আমার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। স্বভাব সুন্দর, ব্রাহ্মণ-পুত্র, আচারী ও নিষ্ঠাবান্। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী বি. এ. মহাশয় রাণীগঞ্জের নিকট উখরা স্কুলে হেড্‌মাস্টারি করিতেন। তিনিও কয়েকদিন পর আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন।

চোখাচোখি হইবার পর হইতেই আত্মায় আত্মায় মিল হইয়া গেল। তিনি মধ্যে মধ্যে ২/৩ দিন আমার নিকট থাকিতেন। সদাই ভগবানের কথা, হাসি হাসি মুখ, ডব্‌ডবে জল-ভরা চক্ষু দুটি। তাঁহার সহিত দেখা হবার পর গুরুজীর কথা উত্থাপন করি। তিনি বলিলেন, "সেই দীর্ঘনগরের নিকট আদরা-কৈতারা আশ্রমের শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট আমি গুষ্করার গুরুজীর নাম শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার দর্শন পাই নাই। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার বড়ই ইচ্ছা।" আমাকে বলিলেন, "দাদা, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে?" আমি সম্মত হইলাম।

শুনিলাম, রাধিকার পিতা সরপি-নিবাসী ৺গিরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী খুব নিষ্ঠাবান সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দক্ষিণা ও রাধিকা এই সময় হইতেই প্রায় আমার সঙ্গে গিয়া রাত্রি বাস করিয়া আসিতেন। রাধিকা ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু, দক্ষিণা কিন্তু তখন তাহা নহেন। চাকরির উন্নতি কিসে হইবে, সেই জন্যই দক্ষিণার যাওয়া। তবে উভয়ের আধার ভাল। দক্ষিণাও আমাকে বন্ধুভাবে দেখিতেন, এবং আমার বিপদকে নিজের বিপদ জ্ঞান করিতেন। কথায় কথায় বলিলেন, "আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঠিক হইয়াছে।" একদিন থানার কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় গিয়া শুইয়া আছি, একটু নিদ্রাও আসিয়াছে, এমন সময় এক সিপাই গিয়া বলিল, "বাবু, থানায়

আসুন, সাহেব আসিয়াছেন।” বলিয়া ডাক দিল। মনে করিলাম, আসানসোলে সাহেবের অভাব নাই, গার্ড, ড্রাইভার প্রভৃতি কেহ আসিয়া থাকিবেন।

একটু পরে থানায় গিয়া দেখি, তিনটি উচ্চতর, উচ্চতম, বড় প্রভুরা আসিয়া বারান্ডায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। আমি উপস্থিত হইবামাত্র বড় প্রভু বলিলেন, “তোমার পোষাক কই, বিনা পোষাকে কেন আসিলে?” বলিলাম, “সাহেব, আমরা কি পোষাক পরিয়া খাইয়া বাসায় শুইয়া থাকি? তোমরা আসিয়াছ, আমি কি প্রকারে জানিব? কোন সংবাদ দাও নাই কেন?” এই সকল সাহেবের পার্শ্বে আমার ইন্‌স্পেক্টর সাহেব Mr A. O. Toda দাঁড়াইয়া, বিষধর সর্পের ন্যায় ফোঁস্-ফোঁস্ করিতেছেন। শুনিলাম, ইনিই প্রভুদিগকে আনিবার জন্য স্টেশনে গিয়াছিলেন। অন্য সময় কোন উচ্চপদস্থ প্রভু আসিলে আনিবার ভার আমার উপরই থাকিত, এবারে সব গোপন। থানার আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ অনেকেই জানিত, কিন্তু আমার নিকট সবই গোপন রাখিয়াছিল। হায়রে বিশ্বাসঘাতক বাঙালি! যাহাদের শত শত দোষ আমি নিজের মাথায় চাপাইয়া তাহাদিগকে কত শত বার বাঁচাইয়াছি, যাহাদের জন্য ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে আমার বিরোধ, তাহারাই আজ ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের পক্ষ হইয়া আমাকে ধ্বংস করিবার অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

দাঁড়াইয়া বুঝিলাম, আমার বিরুদ্ধে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব গোপনে গোপনে রিপোর্ট করিয়াছেন। সেই রিপোর্টের তদন্ত জন্য বড় বড় সাহেব আসিয়াছেন।

আমাকে বলা হইল, “তুমি কি বলিতে চাও?” আমি বলিলাম, “কিছুই না।” তাহারা বলিল, “ কেন?” আমি বলিলাম, “তোমরা বিচার করিতে আস নাই। তোমরা পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়াছ, তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।” আমার বিরুদ্ধে প্রসিডিং হইল। তাহাতে আমাকে ডিগ্রেড করা হইল। ভাবিলাম, অদ্ভুত বিচার, চাকরির হিসাব এই প্রকারই বটে। গুরুজীর পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, “আমিই এ দণ্ড করিয়াছি। মায় সুদ ওয়াশীল আমিই করিয়া দিব।”

দেখিতে দেখিতে বর্ষার শেষ হইয়া আসিল। গুরুজীর পত্র পাইলাম—“উপেন্দ্র অতঃপর বর্দ্ধমানে বদলি হইবে। প্রস্তুত হও। আর তুমি সংবাদ দাও নাই। বধূমাতা অন্তঃসত্ত্বা। এখন নির্দোষ নহে, শান্তি ও প্রতীকার দরকার। শীঘ্র মধ্যে একটি লাল রঙের শাড়ি খরিদ করিয়া বিন্ধ্যাচলে পূজ্যপাদ নিমানন্দ পরমহংসের নিকট পাঠাইয়া দিবে, বিলম্ব করিবে না।” আমি পত্র পাইয়া কলিকাতায় গিয়া একটা লাল রঙের বেনারসী শাড়ি ৯০ টাকায় খরিদ করিয়া বিন্ধ্যাচলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলাম এবং গুরুজীকে সংবাদ দিলাম।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে কামরূপ-কামাখ্যা হইতে পত্র পাইলাম, “তোমার শাড়ির কার্য্য হইয়া গিয়াছে। কোন্ ঠিকানায় ঐ শাড়ি পাঠাইব, তাহা লিখিবে।”

গুরুজীর আদেশ লইয়া আমি নিবেদন করিলাম যে, শাড়িতে আমার আবশ্যক নাই। যাহা ইচ্ছা, করিতে পারেন। ইহার কিছুদিন পরে বর্দ্ধমানে আমার বদলি হইল। আমি বর্দ্ধমানে রিজার্ভের দারোগা হইয়া গেলাম। গেলাম বটে, কিন্তু মনে সুখ নাই। যে সাহেব (Mr. R. F. Guise) সম্প্রতি নূতন বদলি হইয়া আসিয়াছেন, ইনি খুব বিচারক বটেন, কিন্তু অদৃষ্টচক্রে তিনি আসানসোল পরিদর্শন করিতে আসিয়া কাগজে-কলমে আমার কোন দোষ পান নাই, কিন্তু লাগান-বাজানে কান ভারি করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, যতদূর পারি, কার্য্য সুস্থিরভাবে করিয়া যাই। আমার সুবিধা হইল। গুষ্করা বর্দ্ধমানের নিকট, প্রায় রত্রিবাস গুরুজীর সঙ্গে হইয়া থাকে। ছুটি পাইলে দিবসে, না পাইলে রাত্রে গিয়া পদসেবা করিতাম।

একদিন রাত্রে বলিলেন, "আমি তোমাকে যে কাজ করিতে নিষেধ করি, তুমি তাহা কেন কর। নিজে কষ্ট পাও, দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব, আমি এখন সততই বিপদ খুঁজিতেছি। যতই বিপদে পড়ি, ততই আমি আপনার কৃপা উপলব্ধি করি।" তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিতেন, আমি বিপদকে আহ্বান করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতাম। জলে ডুবিতাম, অগ্নিতে দগ্ধ হইতাম. তবু আদেশ পালন করিতাম না। উদ্দেশ্য, অনেকটা পরীক্ষা করাও ছিল। পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতাম, আর ভগবান গুরুদেবের অশেষ কৃপা ও অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করিতাম। কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! গুরুদেব, আজ দন্তে তৃণ লইয়া আপনার নিকট শত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিতে গিয়া বিপদরূপ অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কতই কাঁদিয়াছি। আর আপনাকে আমার জন্য কতই কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে! আজ আর ঘৃণায় ও লজ্জায় মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। তাই ভাবি, কি দুর্ম্মতি আসিয়াছিল। তাই আপনাকে অযথা কষ্ট দিয়া নিজেকে কলুষিত করিয়াছি। আজ সকল অপরাধের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কৃপাময় গুরু রুষ্ট হইলে জীবের আর স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি যত রকমে পরীক্ষা করিতে গিয়াছি, আপনি সদয় হইয়া প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে কৃপাবর্ষণ করিয়া আমার বিশ্বাস দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়িক আমি নীচকুলোদ্ভব, আমি আপনার গুণ কি বুঝিব, প্রভু! যতটুকু দয়া করিয়া দেখাইয়াছেন, বুঝাইয়াছেন, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যতটুকু প্রবেশ করে এতটুকুই দিয়াছেন। অসীম কৃপা, অসীম ভালবাসা, ইহা জন্ম-জন্মান্তর হৃদয়ে অঙ্কিত-খোদিত থাকিবে। এ ভালবাসা এ-জগতের নয়, এ যে স্বর্গীয় ভালবাসা, এ-যে দেবতার ভালবাসা, ইহা জীবনে যাবে না, মরণে যাবে না, প্রলয়ে যাবে না। হে দয়াময়, হে হৃদয়ের রাজা, আমায় ক্ষমা করুন। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

এই সময় তাঁহার নিকট ৺শিবরাত্রি করি। তিনি সম্মুখে বসাইয়া ৺শিব

ঠাকুরের পূজা দেখাইয়া দেন। তিনি আর আমি গুষ্করার কাছারি বাড়ির চাতালে বসিয়া পূজা করিলাম। চারি প্রহরে চারি বার পূজা সমাধা করা হইল। তাঁহার পদ-সেবায় সমস্ত রাত্রি কাটিল। তিনি কত রকমের উপদেশপূর্ণ কথা ও গল্প বলিতে লাগিলেন।

ভোর ভোর উঠিয়া স্নান করিয়া তিনি ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া বাহিরে আসিলেন। অদ্ভূত রকমের মিষ্টান্ন, মালুপুয়া, কচুরি, ফল ক্ষীর প্রভৃতি প্রসাদ স্বহস্তে বিতরণ করিলেন। বলিলেন, "এই বৎসর দুইজনায় শিবরাত্রি করিলাম। ইহার পর ক্রমশঃ কি সমারোহ হইবে, তাহা দেখিবে। দাদাগুরুদেব বণ্ডুলে ৺হরহরি প্রতিষ্ঠা ও আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য মহা জেদ করিতেছেন। আমি অনেক প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিতেছি, কিন্তু কি তাহারা বুঝিয়াছেন, জানি না। আমার কথা শুনিতে চাহেন না।

আমার এই হরহরির পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ হইয়াছে, এইবার উহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুমতি আসিতেছে।" তিনি আরও বলিলেন, "আমি লিখিয়াছিলাম, 'হরহরি আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিব। আপনি কেহ উহা প্রতিষ্ঠা করিতে ও শিষ্য করিতে আদেশ দিতেছেন? শিষ্য আবার করে! কে বাপু অত ঝঞ্ঝাট বাড়ায়? শিষ্য ভূতে করে, আমার কি দরকার।' তাহাতে দাদাগুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস মহারাজ লিখিয়াছেন, 'দেখ, তুমি নদীতে, পাহাড়ে, সমুদ্রে যে স্থানেই উহা রাখ, আমি উহা বাহির করিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠা করাইব। গুরুদেব মহাতপার আদেশ, তোমাকে করিতেই হইবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে জীবের মঙ্গল-সাধনা কর'।"

আর একদিন বলিলেন, "দেখ, দেব-জ্যোতিষ তাঁহারা দিয়াছিলেন, উহা ব্যবহার করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া সদ্ব্যয় করিব বলিয়া রাখিয়াছিলাম, সে সমস্ত অর্থ আমার নিকট হইতে লইলেন, জ্যোতিষ আলোচনা বারণ করিলেন। দাদা গুরুদেবের নিকট হইতে চিঠি আসে, তুমি আর জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করিবে না।" সেই সময় আমি দেখিয়াছি যে, গুরুজী কোষ্ঠী লিখিতেছিলেন। পত্র লেখা সত্ত্বেও বন্ধ করেন নাই। দ্বিতীয় বারের পত্র একটু উগ্র হাতে লিখিয়াছেন, 'জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করিলে গুরুহত্যার পাতকী হইবে, আর তোমার তপঃপ্রভাব নষ্ট হইবে।" এই পত্র পাইবার পর আর কোষ্ঠী রচনা করিতেন না।

এই সময় আমাদের গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গোস্বামী মহাশয় আমার নিকট বর্দ্ধমানে আসেন। এই ব্রাহ্মণ বড়ই সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বহু শিষ্য করিয়া গিয়াছেন। ইনিও শিষ্য করিতেন। আমাকেও শিষ্য করিবার অভিপ্রায়ে ছিলেন। পরে গুরুজীর কথা আমার নিকট শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা আমার নিকট প্রকাশ করেন।

আমিও তাহাকে সঙ্গে লইয়া গুষ্করায় যাই। সেখানে গুরুজীকে দর্শন করিলেন, কিন্তু মনে একটু অভিমান আসিল। ভাবিলেন, "আমারও অনেক শিষ্য, আমিও ত গুরু। সুতরাং আমিই বা কম কিসে?"

বাহিরে বসিয়া বসিয়া তিনি এই রকম চিন্তা করিতেছেন, আর আমি গুরুজীর নিকট ঘরের ভিতর বসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছি। গুরুজী বলিলেন, "ওঁকে কোথায় পেলে?" আমি বলিলাম, "আমাদের গ্রামে ওঁর শিষ্য সেবক অনেক আছে।" তিনি বলিলেন, "এই ব্যক্তির অভিমান আসিয়াছে, তাই বাহিরে বসিয়া আছেন। এখনও ঠিক ঘরে দাঁড়াইতে উঁহার অনেক দেরি গো।" আমি বলিলাম, "ওঁকে একটু কৃপা করিবেন।" তাহাতে গুরুজী বলিলেন, "আমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তবে বিলম্ব আছে। আহা, বেচারার বড়ই কষ্ট, সংসারে ঝালাপালা হইয়া বেড়াইতেছে।" ইনি পরে ১৯০৯ সালে গুরুজীর শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে রাঁচিতে শিষ্যালয়ে দেহ রাখেন।

গুরুজী আদর্শ চরিত্রের সাধু ছিলেন। গুষ্করায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সমস্তরে তাঁহার আদর্শ চরিত্রের ভুয়োভুয়ঃ প্রশংসা করিতেন। তাঁহারা তখন পর্য্যন্ত অনেকেই ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। তবে ইনি যে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, ইহা সকলেই জানিত।

একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের স্বামী অনেক দিন আইসে নাই। একদিন সে গুরুজীকে সামান্য মানুষ জ্ঞানে বলে, "তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে?" গুরুজী বলিলেন, "তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? তিনি কি বলেন?" স্ত্রীলোকটি অধোবদনে দাঁড়াইয়া নীচুমুখে মাটি খুঁটিতেছিল। এমন সময় দৈবগতিকে তাহার পিতা সেই স্থানে উপস্থিত হন। তাহার পিতাকে দেখিয়া গুরুদেব বলেন, "হ্যাঁ গা, তোমার কন্যা আমার সঙ্গে থাকিতে চায় কেন? উহাকে বিবাহ দিয়াছ, উহার স্বামীকে আনিবার ব্যবস্থা কেন কর নাই? ওকে বাপু কিছু বোলো না। তোমার টাকা না থাকে, আমি কিছু দেব, উহার স্বামীকে আসিবার জন্য খবর পাঠাইয়া দেও।"

তিনি রাত্রিকালে কখন কখন কাছারি বাড়ির পূর্ব্বদ্বারী ঘরের মধ্যে তপস্যা করিতেন, আর কখন কখন মহানিশায় নিকটবর্ত্তী নদী-তীরে শ্মশানে গমন করিতেন।

গ্রামের অনেক ছোক্‌রা সন্ধান নেয় যে, ইনি রাত্রে কোথায় যান। তাহারা কয়েক রাত্রি কাছারি বাড়ির বাহিরে লুকাইয়া থাকে। একদিন মহানিশায় পরম যোগরাজি মহাশ্মশানে জগদম্বার আরাধনা করিতে যাইতেছেন, সেই সময় ২/১টি ছোক্‌রা বাবাজীর পেছু নেয়। ইনি তাহা জানিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করেন ও বলেন, "তোমরা নিরস্ত হও। পেছু পেছু আসিও না, আসিলে বিপদে পড়িবে।"

ইহাদের সঙ্গে চোঙ্গদার জমিদারদের রামলাল নগ্‌দীর ভাইও থাকিত। সেদিন তাহারা ফেরত আসে। বাবাজী সকালে রামলালকে তাহার ভাইকে ঐরূপ দুষ্ট ছোক্‌রাদের সঙ্গে মিশিয়া রাত্রে এই সকল করিতে নিষেধ করিতে বলেন। তাহারা কাহারও কথা না শুনিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন ঐ প্রকার করিলে হঠাৎ রাত্রে রাম নগ্‌দীর ভাইয়ের সমূহ বিপদ হয়। সে কাছারি বাড়ির উত্তর ধারের পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছিল। বাবাজী নদীতীর হইতে শব্দ শুনিতে পাইয়া পুষ্করিণীর নিকটে আসেন ও তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া রামলালকে সংবাদ দেন। রামলাল তাহার ভাইকে ওখান হইতে দেশে পাঠাইয়া দেন।

একদিন রাত্রিতে বসিয়া পদসেবা করিতেছি, এমন সময় বলিলেন, "বাবা, জগতে সত্যের আদর ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। যাহাদের সত্যের আঁট নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাহারা কোন্‌কালে ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারে না। সত্যই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব ধন। সত্যহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-সমান। যে সত্যকে যে পরিমাণ ত্যাগ করিয়া অসত্যকে আশ্রয় দিয়াছে, সে সেই পরিমাণ মায়ার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি সত্য-রক্ষার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, তোমরাও সত্য লইয়া থাক। বড় বড় উপাধিধারী পণ্ডিত, মুখে উচ্চ-উচ্চ কথা বলেন। শ্লোক সকল অনর্গল আবৃত্তি করেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নামিয়া ঠিক ঠিক কর্ম্ম করিতে পারেন না। সেদিন বাবা কলিকাতা হইতে দুইটি বড়লোক তিন চারটি খুব বড় বড় পণ্ডিত লইয়া আমার নিকট আসিলেন। গুপ্ত অভিপ্রায় ছাপাইয়া কথা আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, 'নাভিধৌতি কি আপনার জানা আছে? আপনার অনেক শক্তির কথা শুনিয়া আমরা আসিয়াছি। দয়া করিয়া কিছু শিক্ষা দেন," ইঁহারা আমার বুজরুকী ভাঙিবার জন্য পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'বাবু, আমি কি শিক্ষা দিব? তোমরা আমার বুজরুকী ভাঙ্গ না। ভালই ত'। এই কথা বলিবামাত্র একটি ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া জোড় হস্তে বলিলেন, 'বাবা রক্ষা করুন। আমরা বাস্তবিক এই কল্পনা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। বাস্তবিকই আপনি অন্তর্য্যামী। আপনার নিকট কিছুই ছাপাইবার জো নাই। অপরাধ গ্রহণ করিবেন না'।

একদিন সন্ধ্যার পর আমি পদসেবা করিতেছি। তিনি শাস্ত্র-কথা, যোগের বিভূতি ইত্যাদি উপদেশ দিতেছেন। এমন সময়ে কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, সবই ত শুনিয়া যাইতেছি, কিন্তু কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিব? আপনি সর্ব্বদাই বলেন, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া না জানিলে কিছুই ঠিক জানা যায় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্যই বা কি, আর মিথ্যাই বা কি তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

গুরুদেব। বাবা, মনে মনে বুঝিলে চলিবে না, ইহা তপস্যার দ্বারা জানিতে হয়। নিজে খাঁটি না হলে কি সদ্বস্তু জানা যায়? অসদ্বৃত্তি থাকিতে সত্যের উদয়

হয় না। উপরে লোক-দেখান ভজনে কিছু হবে না। সংযম ও অন্তর্মুখতা না হলে হয় না। সে-দেশের সবই উল্টা।

বলিয়া মধুর কণ্ঠে এক গান গাহিলেন। গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। সেরূপ মধুর কণ্ঠে গান আমি আর শুনি নাই। অদ্যাবধি কোথাও গান শুনিতে গেলে আর গান ভাল লাগে না। সেই গান, সেই মধুর নাদ, আজ পর্য্যন্ত আমার কর্ণে রহিয়াছে। তিনি প্রায় প্রতি রাত্রেই (গভীর রাত্রে) আপন মনে, আমি যখন অন্যমনস্ক হইতাম, এমনি গান আরম্ভ করিতেন; আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। মধুর শব্দ শ্রবণে বিষধর সর্প যেমন ফণা উচ্চ করিয়া স্থির থাকে, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইত এখনও সেই প্রকার সুমিষ্ট গান শুনাইবার জন্য অনেকবার বলিয়াছি—কিন্তু আর হয় না। বলেন, "উপেন্দ্র সেদিন আর নাই।"

আমি সন্ধ্যার সময় একদিন পদসেবা করিতেছি, এমন সময় বলিলাম, "জগৎ মিথ্যা বলে; ইহা কি ঠিক?" উত্তরে বলিলেন, "কেহ মিথ্যা দেখে, আর যাহার জ্ঞান হইয়াছে, প্রজ্ঞা-চক্ষু ফুটিয়াছে, সে দেখে, ঈশ্বরই সব হইয়াছেন।" আমি বলিলাম, "আমাদের জ্ঞান হয় নাই। আমরা যাহা দেখি, তাহার কি অস্তিত্ব নাই? তবে কেমন করিয়া জগতের সর্ব্বদ্রব্যই চক্ষের উপর ভাসিতেছে? কিছু না থাকিলে কি কিছুর উদয় হয়।"

গুরুদেব। ভ্রমে অসত্যে সত্য-প্রতীতি হয়, জ্ঞানে যাহা নাই, অজ্ঞানে তাহা থাকার মতন দেখায়। ঐ যে জবা পুষ্প দেখিতেছ, উহা তোমার চক্ষে জবা। কিন্তু বাস্তবিকই কি উহা জবা?

আমি বলিলাম "কেন বাবা, এখনই তুলিয়া আনিয়া আমি আপনাকে দিই, দেখুন উহা জবা কিনা।" কিঞ্চিৎ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কই, তোমার জবা ফুল আন।" আমি উঠিয়া জবা গাছের নিকট গেলাম। ফুল তুলিয়া দেখিলাম, উহা জবা নহে, গোলাপ পুষ্প। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ভাবিলাম, জবা ছিল, গোলাপ কি প্রকারে হইল! গাছটা তবে কি? দেখি, গোলাপ গাছ । আমি নিরুত্তর। তদবধি উহা গোলাপই রহিল। তিনি বলিলেন, "তোমার চক্ষে যে রং আছে, তুমি তাহাই দেখ—গুণবৈষম্য। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহ মিশ্র গুণের সহিত সম্বন্ধ করিয়া এই জগৎ উৎপন্ন করিতেছে। মানসিক বৃত্তিসমূহ চিত্ত-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে মায়িক জীবের চক্ষের উপর কর্ম্মরূপে বাহিরে প্রকাশ হইয়া কাহারও আনন্দদায়ক, কাহারও বা অতৃপ্তিকর হইতেছে। ইহার গুণবৈষম্য।" আমি বলিলাম, "এই যে আপনি রহিয়াছেন, ইহাও কি মিথ্যা?" বলিতে বলিতে "আমার অস্তিত্ব কোথা" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান! কিছুক্ষণ পরে সদর দরজা হইয়া আবার আসিয়া বসিলেন। তামাক সাজিতে বলিলেন তামাক দিলাম। খাইতে

খাইতে বলিলেন,—"বাবা, এক ব্রহ্মই সত্য। ঠিক্ ঠিক্ কাজ করিয়া যাও। সবই ক্রমশঃ বুঝিবে।"

কি জানি কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বদ্বারী দরজার কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আমাকে ডাকিয়া ভিতরে যাইতে বলিলেন। আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বলিলেন "বস। আমি বসলাম। একটু পরেই এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইলেন। পৃথিবার গতি ও কোন শক্তিতে, কি গতিতে, জগতে সমস্ত দ্রব্যকে ঘুরাইতেছে, একস্থানে স্থিরভাবে থাকিতে দিতেছে না, তাহাই প্রত্যক্ষ করাইলেন। এই অস্থিরের মধ্যে স্থির বস্তু কি প্রকারে উপলব্ধি করিতে হয়, বোধ করিতে হয়, এবং স্থিরের ভিতর চঞ্চলা প্রকৃতি কি গতিতে কর্ম্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য চালাইতেছে, তাহাই দেখাইলেন। জড়, চৈতন্যের সহবাসে কেমন করিয়া কার্য্য করে, ইহা তাহাই। আমি যেন এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা স্বপ্নবৎ দেখিতেছি। আমি অবাক্। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মাথার ভিতর ধরিয়া রাখিতে বহু চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নদীর কি খরতর স্রোত, যেন সেই ভাবকে ভাসাইয়া দিবার জন্য শত শত বাধা-বিঘ্ন তীর বেগে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। বলিলেন "বাবা, বিনা সাধনায় কি উহা আটক করিতে পারিবে? যাহা কঠোর তপস্যার ফল, তাহা কি পড়িয়া-দেখিয়া রাখা যায়? চিত্ত নির্ম্মল কর, আপনি আসিবে ও থাকিবে। অসদ্‌বৃত্তি যেমন এখন সরিতে চায় না, সদ্‌বৃত্তিও তেমনি চিত্ত নির্ম্মল হইলেই সরিবে না। চিত্ত-বিকারই নিম্নে ও নির্ম্মল চিত্ত ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। তুমি যাহাতে তোমার চিত্ত নির্ম্মল রাখিতে পার, তাহার চেষ্টা করিতে থাক।"

আমি এই সময় তাঁহার তিনটি প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলাম, "প্রভো, আমার এই তিনটি প্রার্থনা আছে।" তিনি দুটি স্বস্তি করিলেন। তৃতীয় প্রার্থনা ছিল, "প্রভু আপনার নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া ও অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া আমার হৃদয় ও মন আনন্দে ভরিয়াছে, আর আপনাকে আমি সাক্ষাৎ নররূপী শিব প্রত্যক্ষ্য করিতেছি। এই সময় আমার মানসিক বৃত্তিসমূহ আমাকে যে নির্ম্মল আনন্দে রাখিয়াছে, জগৎ ভুলাইয়া দিয়াছে, সদ্বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটাইয়া আত্মবিস্মৃতি আনিয়াছে, এই ভাব যেন জীবনে আর না যায়। আমি যেন চিরদিনই এ আনন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকি।" আমার প্রার্থনা শুনিয়া তিনি নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। তারপর বলিলেন, "উপেন্দ্র, তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি। তোমার অন্য দুটি প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। কিন্তু বাবা, শেষের প্রার্থনা স্বস্তি করিতে পারিব না। উহা যে তপস্যা করিয়া রাখিতে হয়। গুরুবাক্যে সবই হয় সত্য, কিন্তু সদ্‌গুরু শিষ্যকে কর্ম্ম করাইয়া, কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া এবং অনেক বাধা-বিঘ্ন নিজেও সরাইয়া দিয়া, তাহাকে নিজালয়ে লইয়া যান। যাহারা কর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া, তপস্যা ও সত্যের আদর না করিয়া, জিতেন্দ্রিয় না হইয়া, সমস্ত ভোগের সামগ্রী উপভোগ করিয়া,

ভগবৎ-প্রেমে মজিতে, ডুবিতে ভিজিতে যায়, তাহারা আত্মঘাতী। যে স্থানে যাইবার যে পথ, ভগবৎ-শাস্ত্র ও সদ্‌গুরু তাহা বিশেষভাবে স্থির করিয়া দিয়াছেন। বৎস তোমাকে তাহা পালন করিয়া যাইতে হইবে। দুর্ব্বলতা আনিও না, কঠোর তপস্যারূপ মরুভূমি পার না হইলে স্নিগ্ধ, রসাল তরুতল কি পাওয়া যায়, বাবা? যার মন ঠিক, তার কর্ম্ম ঠিক তার ভজন-সাধনও ঠিক ঠিক ভাবে হইয়া যায়। মনকে নিজের বশে আন। তুমি তাহার পিছু পিছু দৌড়াইয়া বিষয়রূপ মনের ও ইন্দ্রিয়ের মোহে মজিও না। কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। শক্তিতে না কুলায়, গুরুর নিকট, ভগবানের নিকট, আদ্যাশক্তি মা মহামায়ার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে শক্তি ভিক্ষা কর, তাঁহাদের দয়া হইবে। যাঁহার রাজ্যে যখন বাস করিতে হয়, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা জীবের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এক গৃহে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ঘরের কর্ত্তার সম্মান বজায় রাখিবেন, তাঁহার সেবা করিবেন। যাঁহার রাজ্যে বাস, তাঁহার কৃপা হইলেই অনেক কষ্টের লাঘব হয়। মা মহামায়ার রাজ্যে বাস, আদ্যাশক্তি ভগবতীর রাজ্যে বাস, ঘোর মায়াময় মরুর মধ্যে বাস, দাও রাজার দোহাই দাও। আর তাঁহার শক্তি নিজে আরোপ করিয়া এক এক রাজ্যের সীমার বা গণ্ডীর বাহিরে তীব্রবেগে উগ্র তপস্যা ও কঠোর বৈরাগ্য লইয়া চলিয়া যাও। রাজার শক্তি আরোপ করিলে, রাস্তায় কেহই কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া রাস্তা ছাড়িয়া দিবে।"

ইংরাজি ১৯০৩ সাল—শীত একটু একটু পড়িয়াছে। একদিন ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে, তিনি সাধনার ঘরে নৈর্ঋত কোণে সর্ব্বদা যে কাষ্ঠাসনে প্রায়ই বসিয়া থাকিতেন তাহার নিকট বসিয়া আছেন। চর্তুদ্দিকে আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ একটি আলমারী ছিল। আমি বলিলাম, "বাবা, আপনার বসিবার স্থানটি ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি।" তিনি বলিলেন, "না বাবা, উহাতে আমার অনেক সম্পত্তি আছে। ও ঘর তোমাকে পরিষ্কার করিতে হইবে না।"

আমি ও কালীপদ ঘোষ উভয়ে জেদ করিয়া ধরায় বলিলেন, "তবে যাও।"

একটি কাষ্ঠের পিঁড়ি ছিল, উহার চারিদিকে ময়লা। আমরা যেমন কাষ্ঠের পিঁড়ি সরাইব, অমনি তাহার নীচে দেখি, নানা জাতীয় জীব রহিয়াছে—ইন্দুর-বাচ্ছা, বিছে, ছোট ছোট পোকা ও নানা প্রকারের জীব-সমষ্টি একত্রে বাস করিতেছে। কেহ কাহার হিংসা করে নাই, বেশ সুখে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। প্রভু তাহাদের উপর আসন করিয়া বসিয়া থাকেন।

বলিলেন, "বাবা, আর একটা সম্পত্তি থাকে, সেটা বাহির হইয়া গিয়াছে, এরপর আসিবে।" বলিলাম, "বাবা সেটা কি?" বলিলেন, "খরিশ সাপ। ঐখানেই থাকে। একটু পরে আসিবে। তোমরা ভয় পাবে, নতুবা এখনি ডাকিলে আসিত।"

আমি। না বাবা ভয় পাব না, আনুন।

তিনি। আচ্ছা পরে হবে।

আমরা সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলাম। বাবা বলিলেন, "যা, তোরা অনেক দিনের ময়লা সাফ করিয়া দিলি।"

একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে আমি বর্দ্ধমান হইতে গুষ্করায় যাইতেছি। গাড়িতে গুরুজীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার চক্ষে জল আসিল। আমার বাম পার্শ্বে একটি লোক বসিয়াছিল। সে সময় ঐ লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাইবেন?" আমি বলিলাম, গুষ্করায় গুরুর বাড়ি যাইব।" "গুরু কে" জিজ্ঞাসায় বলিলাম, "বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামী আমার গুরুদেব।"

তিনি বলিলেন, "বেশ হবে, চলুন। আমিও তাঁহার নিকট যাইব। মনে করিলাম, ইনিও তবে বাবাজীর শিষ্য হইবেন।

তখন গুরুজীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার অদ্ভুত দৈবশক্তি ও আমার উপর অকৃত্রিম ভালবাসার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আমার মনের অবস্থা প্রায় বাহ্যশূন্য হইয়াছে। আমি আর তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ইহাও মনে নাই।

গুষ্করা পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব আছে, তিনি সেই সময় আমাকে বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার মন ঠিক নাই। আপনি প্রভুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। আপনি কি প্রত্যহ তাঁহার নিকট যান?" আমি বলিলাম, "হাঁ প্রায় যাই। আপনি আমার মনের অবস্থা কি করিয়া জানিলেন?"

তিনি। আমি মাকে ডাকিলে মা আসিয়া আমাকে সমস্ত বলিয়া দেন, আমার সহিত আপনার গুরুজীর পরিচয় নাই। আমি এই প্রথম তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছি। তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির কথা পরস্পরের নিকট শুনিয়া আমি তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া যাইতেছি। তিনি বলিবেন কি?

আমি। হাঁ, বলিবার মতন হইলে বলিবেন। আপনার কি আর কেহ আলাপী আছেন?

তিনি। না, আমি তাঁহার নিকটেই যাইব। আমার আলাপী কেহই নাই। তাঁর নিকট থাকিবার স্থান কি আমার হবে?

আমি। হাঁ, হবে, আমার সঙ্গে যাবেন!

গাড়ী গুষ্করা ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট দিয়া গুরুজীর নিকট চলিলাম। কাছারি বাড়ির সম্মুখে গিয়া দেখি, বাবাজী বঙ্ক সাধুর দোকানে গোপাল ভাবে বসিয়া আছেন,—সেই সহাস্যবদন, চক্ষু যেন পদ্মফুল, গায়ে একটি বিলাতি কম্বল। মাথার চুল ঈষৎ বড় হইয়াছে। একটি গান করিতেছিলেন। বলিলেন, "কি গো এসেছ!"

আমি যাইবার একটু পরে ঐ লোকটি পৌঁছিলেন।

গুরুজী। ইনি কে? (লোকটিকে দেখাইয়া)

আমি। ইনি কলিকাতা হইতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য আসিয়াছেন।

গুরুজী। বেশ, চল, জল খাবে, চল।

এই কথা বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া উঠিলেন। বঙ্ক সাধু বলিল, "উপেনাবাবু এসেছেন, গুরুজী আর থাকিবেন না।" এ কি ভালবাসা! যেন স্বার্থের গন্ধ নাই, যেন কোথাও ইহার নমুনা নাই। গুরুজী কাছারি ঘরের বাগানে তক্তাপোশের উপর বসিলেন। আমরা দুইজনে নীচে বসিলাম। লুচি সন্দেশ ইত্যাদি নানা দ্রব্য দিয়া উভয়কে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। আমি গুরুজীর মুখপানে তাকাইয়া বসিয়া আছি, সেই লোকটি গুরুজীর সঙ্গে আলাপ করিতেছে। রাত্রি প্রায় ৯৷৷ টা। গুরুজী বলিলেন, "তোমরা পূর্ব্বধারের কুঠুরীর মধ্যে শোবে।" কালীপদ ঘোষ আসিলেন। তোষক, লেপ সব আনা হইল। আমরা শুইলাম।

তাঁহার সঙ্গে নানা কথা বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মা আমার কথা শুনেন। আপনি যা মনে করেন, আমি সমস্তই বলিয়া দিতে পারি।"

আমি। আচ্ছা বলুন।

বলিয়া আমি একটি বিষয় মনে করিলাম। তিনি বলিলেন। তাহার পর আর একটি বিষয় মনে করিলাম, তত শীঘ্র বলিতে পারিলেন না, একটু বেশি সময় লইলেন। তাহার পর আর একটি বিষয় মনে করিলাম, আর বলিতে পারিলেন না। প্রায় একঘন্টা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হইতেছে না। তখন রাত্রি প্রায় ২টা। বাবাজী পার্শ্বের ঘর হইতে বলিতেছেন, "আর হবে না। যা হয়েছে যথেষ্ট।"

বলিতে বলিতে নাচিতে নাচিতে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া বিছানায় বসিলেন। সেই লোকটিকে বলিতে লাগিলেন, "উপেন্দ্র মনে করুক, আর তুমি বলিয়া যাও, কেমন?" সেই লোকটি বলিল, "কি, আর হয় না যে, আপনি কি করিয়া দিলেন?"

গুরুজী। কি করিব? তোমার মাকে আমি হুড়পীর ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছি। বাহির করিয়া নেও। আর তোমার সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি ছিল, তাকে কোথায় রেখে এসেছ! বেটা ভণ্ড, গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছ। যা হবার হয়ে গেছে, আর হবে না।"

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "বেশ, আমি কিছু পাইবার আশায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে সব হারাইয়া গেলাম।" বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিল।

গুরুজী কিছুক্ষণ বসিয়া, সকল গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। আমি আলো লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। গভীর রাত্রি, আর সেই কঠিন শীত। জলে

ডুবিয়া প্রায় আধঘন্টার উপর থাকিলেন। আমি শীতে জড়-সড় হইয়া কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়মান।

স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আসিলেন, ধুনা দেওয়া হইল, পরে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরা উভয়েই ভোর পর্য্যন্ত বাবার কথা লইয়া কাটাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া সেই লোকটি বলিতে লাগিল, "অনেক সাধু-সন্তের নিকট গিয়াছি, কিন্তু এরূপ উগ্র তপস্বী দেখি নাই। কি গাম্ভীর্য্য, কি চক্ষু, আর কি গন্ধ! আপনি বাস্তবিকই দেবতা লইয়া আছেন। আমার সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইয়াছেন।"

আমি। গুরুজী, একটি স্ত্রীলোকের কথা কি বলিতেছিলেন?

তিনি বলিলেন, "কৈ, কিছু না।"

প্রাতে যথাসময়ে ঠাকুর উঠিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অনেক কাঁদাকাটি করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি কিছু দেন আর নাই দেন, আমার দ্রব্যটি আমাকে ফিরাইয়া দিন্।"

বাবাজী বলিলেন, "তোমাকে অনেক শিক্ষা দিতে হইবে। অনেকের সর্ব্বনাশ করে বেড়াও। অনেক হারামজাদ্‌কি তোমার আছে, আজ সকলই দেখাইব। আজ থেকে সেই মেয়েমানুষটাকে কোথায় রাখ্‌লে? শুনিয়া ব্রাহ্মণ চকিত ও চমকিত।

আমার ট্রেণের সময় হইল। স্নান-জল ও প্রসাদ লইয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া আমি চলিয়া গেলাম। পুনরায় একদিন গিয়া শুনিলাম যে তিনি সেদিন ছিলেন। উত্তম শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন পত্র পাইলাম। প্রভু লিখিয়াছেন, "আমি তোমার নিকট বিশেষ কার্য্য জন্য বর্দ্ধমান যাইব। তুমি ষ্টেশনে আসিবে।" নির্দ্দিষ্ট দিনে ষ্টেশনে ছুটিলাম। বেলা প্রায় যায়-যায়, শীতকাল, গাড়ি গুষ্করা হইতে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। আমি দ্রুতপদে এ-গাড়ি ও-গাড়ি খুঁজিতেছি, কতক্ষণে শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল করিব। দেখি, আমি তাঁহার গাড়ির নিকট পৌছিবার আগেই তিনি প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতেছেন। সেই সহাস্যবদন, সেই পদ্মসম চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, "কি গো, ভাল আছ?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, ভাল আছি।" বলিয়া শ্রীচরণধূলি মস্তকে লইয়া কৃতার্থ হইলাম। জানি না, আজ আমার জীবনের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, জানি না, আজ অঙ্গার অগ্নিস্পর্শে অগ্নি হইবে, আজ শ্রীগুরু ভবকাণ্ডারী যথার্থরূপে আমাকে তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে স্থান দিবেন।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া গাড়িতে উঠিবার সময় আবার তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, "কেন মানসিক বৃত্তি দুর্ব্বলতায় পূর্ণ কর, কেন বিক্ষোভ আনিয়া

অন্তর কলুষিত কর? অমূল্য-নিধি লাভ করিতে হইলে সুখ-দুঃখ উভয়ই জলাঞ্জলি দিতে হয়। সামান্য বিষয়ে উতলা হওয়া কর্ত্তব্য নয়।”

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। প্রভুকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে যাইবার কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে। তাতেই আমার মন খারাপ হয়। সেই মন ও মুখ লইয়া আমি প্রভুকে আনিতে গিয়াছিলাম। আর যায় কোথা! একবার মাত্র মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্তর্য্যামী অন্তরের সমস্ত ব্যাপার জানিলেন, আমি অধোবদনে দণ্ডায়মান।

সেদিন প্রভুর সঙ্গে গুষ্করা স্কুলের হেড্ মাস্টারবাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। তিনিও সমস্ত দেখিলেন ও বুঝিলেন। গাড়িতে উঠিয়া সকলে কাছারির নিকট আমার বাসায় আসিলাম। তখন সামান্য বেলা আছে। প্রভু তামাক খাইতেছেন। এমন সময়ে শুনিলাম, শ্যামসাগর পুষ্করিণীর নিকট ৺ঈশানেশ্বর শিবঠাকুরের মন্দিরে এক অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্না ভৈরবী আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

ঠাকুর বলিলেন, “চল, দেখিয়া আসি কেমন ভৈরবী।”

আমরা তিনজনে যাইতেছি। এমন সময়ে প্রেমচাঁদ ঘোষ নামক আমার জনৈক বন্ধু আসিয়া জুটিলেন। ইঁহার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার তালডাঙ্গলা থানার অন্তর্গত ফুলমতি গ্রাম। পুলিশ সাহেবের অফিসে কার্য্য করিতেন। পরে আমার গুরুভাই হইয়াছিলেন।

সকলে ৺ঈশানেশ্বর শিবঠাকুরের মন্দিরে গেলাম। শ্যামসাগরের ঈশানকোণে ৺ঈশানেশ্বর দর্শন করিলাম। ভৈরবী তথায় নাই। শুনিলাম পূর্ব্বপারে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে এক কুঁড়েঘরে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। আমরা তথায় যাইয়া দেখিলাম, পদ্মাসন করিয়া ভৈরবী দেবী পূর্ব্বমুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ের রাজা অন্তরের ধন বিশ্বপতির চিন্তা করিতেছেন। আমরা গিয়া সম্মুখে বসিলাম। তখন চক্ষু মুদ্রিত। বাবাজীর গাত্র হইতে স্বর্গীয় গন্ধ বাহির হইতেছে,—তখনও চক্ষু মুদ্রিত। বাবাজী বলিলেন, “আর কেন, চক্ষু মেলা হউক।” বলিতে না বলিতে যেন দুটি চক্ষু নহে, দুইটি শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল।

চেহারা নিটোল, যেন দুধে-আলতা-গোলা রং। নাসিকা লম্বা, প্রশস্ত ললাট, গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা, কপালে রক্তচন্দন, ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে সিন্দুরের বিন্দু, পরণে গেরুয়া, বয়স দেখিলে ষোড়শী বলিয়া মনে হয়। প্রভুকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নমস্কার করিলেন। প্রভু ‘নারায়ণ’ বলিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন। হাসিতে হাসিতে উভয়ে কথা বলিতে লাগিলেন। ভৈরবী মা হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন। সব কথা আমরা ধরিতে পারিলাম না। তবে বাবাজী শেষে বলিলেন, “যাও আর বুজরুকী করতে হবে না, সব জানা গেল।” তাহাতে

ভৈরবী মাতা একটু রাগের লক্ষণ দেখাইলেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই যে, রাগও আছে।" তখন উভয়েরই হাসি আর ধরে না। সন্ধ্যা হইয়াছে। আমরা তথা হইতে উঠিলাম। পূর্ব্বমুখে রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর আসিলে বাবাজী বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ এইখানে আছে, দেখা করে যাব।"

ইন্দ্রনাথ বাবাজীর খুল্লতাত-ভ্রাতা, বর্দ্ধমান কলেজে পড়িতেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমরা তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম। বাবাজীর সন্ধ্যা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় বসিলেন! রাখাল মাস্টার ও আমি হলে বসিয়া নানা কথা কহিতে লাগিলাম!

ভৈরবী মাতার সম্বন্ধেই কথা। প্রভু রাস্তায় আসিতে আসিতে বলিতেছিলেন, "উহার স্বামী আছে। এক পুত্র ছিল, কিন্তু পুত্র মারা যাওয়ায় উভয়েই এই পথ ধরিয়াছে। ও দেশ-বিদেশে তীর্থ করিয়া বেড়ায়। একত্রে হিমালয়ে মিলিয়া তথায় কঠোর তপস্যা করে।" রাত্রি প্রায় ৮৷৹ টার সময় বাবাজী ঘরের কপাট খুলিলেন! প্রভু সন্ধ্যা করিয়া উঠিয়াই জল-সেবা করেন, তাই সকল দ্রব্য প্রস্তুত ছিল! তাঁহার সেবার পর রাখাল মাস্টার, প্রেমচন্দ্রবাবু ও আমরা সকলে আহার করিতে বসিলাম!

গুরুদেব। বাবা স্বার্থ ত্যাগ ভিন্ন ঠিক ঠিক তপস্যা হয় না। ত্যাগী না হলে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব হয় না। তিনি সর্ব্বঘটে, সমভাবে বিরাজমান, জীব মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, 'আমার আমার' করিয়া অসত্য, দুঃখদায়ক জিনিষকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। এই জগৎ যাঁহার, যিনি না থাকিলে ইহা ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারে না, হাত চলে না, মুখ চলে না, চক্ষু দেখে না, সেই প্রাণের প্রাণকে পর করিয়া, বিস্মৃত হইয়া, মিথ্যা মায়া বিকারে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কেন মানবগণ দুঃখ পায়, কেন শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে হা-হুতাশ করে, কেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, তাহার একমাত্র কারণ সত্যকে সত্য বলিয়া, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিযা জানিতে পারে নাই, শিখে নাই। যতই জীব নিঃস্বার্থ হইবে, ততই সত্য-সত্য সদ্‌গুণ আশ্রয় করিবে।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল। বাবাজী আমার কুটীরের পশ্চিম দিকের তক্ত্যাপোশে ও রাখাল মাস্টার আর আমি পূর্ব্বদ্বারের তক্তাপোশে—শুইয়া শুইয়া ঐ সকল কথা হইতেছে।

বাবা দক্ষিণ শিয়রে শুইয়াছিলেন, হঠাৎ মাথা ফিরাইলেন, বলিলেন, "পায়ের দিকে আমার ঠাকুর আছে।" আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "উপেন্দ্র ঘুমাল নাকি?" রাত্রি প্রায় ১টা, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "উপেন্দ্র, আমি ঘুমাইতে আসি নাই, তোমাকেও ঘুমাইতে

দিব না।" বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া বিছানা হইতে উঠাইলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

গুরুদেব মাস্টার রাখালবাবুকে বলিলেন, "তুমি অন্য ঘরে যাও। উপেন্দ্র ও আমি এই ঘরে থাকিব।" তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি দয়া করিয়া আজ আমাকে আপন করিবেন। তখনও জানি না যে তাঁহার ভালবাসা স্মরণ করিয়া চিরজীবন চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে হইবে।

বলিলেন, "ঘরে ধুনা দাও।" ধুনা দেওয়া হইল। ঘর পরিষ্কার করা হইল। বলিলেন, তৈল আন।" তৈল দিলাম। তিনি মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "তুমিও মাখ। তোমাকেও রাত্রে স্নান করিতে হইবে।" বলিলাম, "এত শীতে কি করিয়া স্নান করিব?" বলিলেন, "শীত কি রে?"

আমিও তৈল মাখিলাম। পূর্ব্বাহ্নে বিল্বপত্র, তুলসী, পুষ্প চয়ন করিয়া রাখা হইয়াছে। লণ্ঠন লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিকটবর্তী পুষ্করিণীর ঘাটে গেলাম। ভয়ানক শীত, পশ্চিমের বাতাস জোরে বহিতেছে। বৃক্ষের নিকটে আমি লণ্ঠন হস্তে দণ্ডায়মান। বাবা জলে ডুবিলেন, প্রায় অর্দ্ধঘন্টা পরে উঠিলেন। আমাকে বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন? জলে নাম।" আমি জলে নামিলাম। কন্‌কনে শীত। কোন রকমে স্নান শেষ করিয়া লণ্ঠন লইয়া পিছু পিছু বাসায় প্রবেশ করিলাম। তাঁহার মুখে সেই দেবীর স্তোত্র শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া গিয়াছি। ঘরে কিছুই শীত অনুভব হয় নাই। বাবা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অপূর্ব্ব গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ হইল।

নিজের বেশভূষা করিয়া আমাকে ভিতরে যাইতে আদেশ করিলেন। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য নহে।

আমার ইষ্টদেব, সেই প্রসন্ন-গম্ভীর মূর্ত্তিতে পূর্ব্বমুখে আসনে উপবিষ্ট, আমাকে উত্তর মুখে আসনে বসিতে বলিলেন। আমি বসিলাম।

আমার বসা ঠিক হইল না। বলিলেন, "এইরূপ ভাবে বসিলে ঠিক হবে না।" একটি আসন দেখাইয়া দিলেন। ঐ আসন আমি অনেক চেষ্টায় পূর্ব্বে অভ্যাস করিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম, "ঐরূপ আসন করিয়া কি বসিতে পারিব?"

গুরুদেব। হাঁ, তোমার অভ্যাস আছে, খুব হবে।

তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যেমন বাহির হইল, অমনি অতি সহজেই আমার তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল। আহা কি শুভদিন! দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু হইতে দুইটি ৺শিব বাহির করিলেন। তাঁহার জ্যোতিঃ দেখিলে মণি-মাণিক্যের জ্যোতিঃ লজ্জা পাইবে। এমন রং নাই, যাহা ঐ শিবের অঙ্গে না দেখিলাম! দেখিতে দেখিতে মস্তকে আঘাত করিলেন। অমনি মুখ হইতে দুইটি শালগ্রাম শিলা বাহির হইল। দেখিতে দেখিতে নানা জাতীয় ফুলে ঘর আমোদিত করিল!

আহা! তাঁহার সেই রাত্রের অপূর্ব্ব ও স্বর্গীয় ছটা হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি তখন কোথায়। স্বর্গীয় পুরুষের সঙ্গে স্বর্গে থাকিয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সম্মুখে তখন জগৎ নাই, জাগতিক ব্যাপার নাই, মায়ার সীমা ছাড়াইয়া যেন আমাকে দেবপুরী মধ্যে দেবাঙ্গনার সঙ্গে, আমার কল্পতরু ভগবান শ্রীগুরু আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। আর বলিতেছেন, 'উপেন্দ্রের শত অপরাধ হইলেও গ্রহণ না করিয়া ইহাকে অন্তরঙ্গের লোক বলিয়া ধরিতে হইবে।' তিনি প্রত্যেক ঠাকুরের স্নানকার্য্য শেষ করিলেন। তাঁহাদিগকে অপরূপ সাজসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। তাঁহারা যেন ঠাকুরের নিজের হইয়াছেন, যেন দেবতারা তাঁহার সহিত দেবভাষায় কথা কহিতেছেন, আর আমি তাহাদের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া মনকে শত শত ধিক্কার দিয়া সমস্ত বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়া যাইতেছি।

একটি ঠাকুর লইয়া আমার চক্ষের নিকট ধরিলেন। বলিলেন, "বেশ করিয়া দেখ।" আমি তাহার উপর কিছুতেই দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছি না। যেন চক্ষু ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কত কত মূর্ত্তি, কত কত জড়িত রূপরাশি, কত রকমের আলোক তাহার মধ্যে দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ তাঁহার পূজা শেষ হইল। আমার ললাটে ভস্ম ও চন্দন লেপন করিলেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আমার উভয় ভ্রূ-র মধ্যস্থানে যখন এক অপূর্ব্ব দ্রব্য স্পর্শ করাইয়া দিলেন, তখন আমি কি সুখ অনুভব করিলাম তাহা বলিবার ভাষা যদি দিতেন, আমি বলিয়া অন্যকে তৃপ্ত করিতে পারিতাম।

এখন যদি আমি কখন পীড়িত হই, সেই অঙ্গুলি স্পর্শ-জনিত সুখের অনুভূতি কিয়ৎক্ষণের জন্য আনিলে দেহ-মন পবিত্র হয়, রোগের জ্বালা কোথায় চলিয়া যায়।

আমাকে পূজা করাইলেন, আমাকে পুনর্জীবন দান করিলেন। আমার মন ও দেহ পবিত্র হইয়া গেল, আনন্দ রাশি চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল।

আমাকে বলিলেন, "এখন তুমি বাহিরে যাও।" আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমার মন আনন্দে ভরা, চক্ষু বহিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল। আমি দেখি, তখন আমি এ দেশের মানুষ নয়। আমার সব পাল্টাইয়া গিয়াছে, যেন সদাই নিত্যরাজ্যে দেবতা-সহ বাস করিতেছি। জীবনের স্রোত বদলাইয়া গেল।

ভাবি, আমি কি পাগল হইলাম! তাই বা কি! পাগলে ত যা-তা করে, যা-তা বলে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়। কই আমার ত তা হয় না। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া কেবল কাঁদিতেছি কেন? কাহার জন্য, কি জন্য কাঁদিতেছি, তাহাও জানি না। তবুও কাঁদি কনে? মাস্টার রাখালবাবু বলিলেন "অত কাঁদিতেছ কেন?" দেখিতে দেখিতে ঠাকুর ঘরের দরজা খুলিলেন, তখন প্রায় ৭॥০ টা হবে। তামাক

সাজিয়া দিলাম। তিনি একটা চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মাষ্টার বলিলেন, "উপেন্দ্র এত কেন কাঁদিতেছিল?" ঠাকুর বলিলেন, "পাগল আর কি?"

ঠাকুর বলিলেন, "উপেন্দ্র জল খাইয়াছ?" বলিয়া স্নান-জল রম্ভা মিষ্টান্ন দিয়া জল খাইতে বলিলেন। আমি জল খাইয়া নিকটে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলাম।

ঠাকুর। বাবা, সাধন-ভজন করিতে হইলে মন খাঁটি করা চাই। চিত্তে অসৎ চিন্তা আসিলে বিচার-দ্বারা তাহাকে সরাইয়া দিবে। চিত্তের মধ্যে অসৎ চিন্তাকে কিছুতেই আসিতে দিবে না। যে ক্রিয়া দিলাম, কিছুদিন অভ্যাস করিলে সমস্তই বুঝিতে পারিবে।

(মাস্টারের প্রতি) উপেন্দ্রের চিত্তবৃত্তি খুব ভাল। মাথা বেশ, একটু রাগ আছে। তা যাবে। পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা না থাকিলে কি সকলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ধরিতে পারে? সবই মায়ের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছায় সবই শুভ হয় গো!

এত শীত, কিন্তু ঠাকুর যখন ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন, দেখিলাম সর্ব্বাঙ্গে ঘাম।

ঠাকুর বলিলেন, "আমি অদ্য আহারের পর বণ্ডুল যাইব। দুই-একদিন পর ফিরিব। তোমাকে সংবাদ দিব।" বলিতে বলিতে প্রভুর সেবার সমস্ত প্রস্তুত হইল। তিনি আহার করিয়া বাহিরে বসিলেন। আমি তাঁহার পাত্রেই বসিয়া খাইলাম। মাস্টার ও প্রেমবাবু আমার সঙ্গে আহার করিলেন।

বাবাজী যাইবার জন্য ব্যাগ প্রস্তুত করিতেছেন, তাই দেখিয়া আমি বড়ই কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম, "বাবা, আজ থাকুন, কিছুতেই আজ আপনাকে ছাড়িব না।"

আমার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে দেখিয়া বলিলেন, "তবে থাক গো, আজ যাওয়া হবে না। বেটা কেঁদে কেঁদেই আমাকে গলিয়ে ফেল্‌লে।"

আমি তাঁহার বিশ্রাম করিবার বিছানা ঠিক করিয়া দিয়া অফিসে চলিয়া গেলাম। আমি তখন Reserve Subinspector, তাই অফিসে কাজ করিতে যাইতে হইত। অফিসে কাজ করি, আবার মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাই, ঠাকুর কি করিতেছেন। বৈকালে বাসায় আসিলাম। দেখি, বর্দ্ধমানের শ্রীপতি সাধু বাবাজীকে তাঁহার বাড়ি লইয়া যাইবেন বলিয়া গাড়ি আনিয়াছেন। গুরুজী আমার আসিবার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

আমি হাত-পা ধুইয়া তাঁহার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে শ্রীপতি সাধুর বাড়ি গেলাম।

শ্রীপতির বাড়িতে পৌছিয়া দেখি, বাহিরের ঘরে অনেক লোক ঠাকুরের আসার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর গাড়ী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায়

প্রবেশ করিলে সকলেই প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। কিছুক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, উপায় কি? আজন্ম 'হরি-হরি' করিলাম, কিন্তু কোন বিষয়েই পরিবর্ত্তন ত দেখিতে পাইলাম না।"

ঠাকুর কতক্ষণ স্থিরভাবে যেমন ছিলেন, তেমনই থাকিলেন। তাহার পর স্থির নেত্রে তাঁহার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বাবা মনকে ঠিক না করিয়া যাহাই করুন, কার্য্য সফল হয় না। মানসিক চঞ্চল বৃত্তিসমূহ স্থির সূর্য্যকে দেখিতে দেয় না। সংসারের নানা জটিল বৈষয়ির ব্যাপারে মন সর্ব্বদাই অস্থির, দিবা-রাত্রি ইন্দ্রিয়-সুখ, ভোগ-বিলাস লইয়া ব্যস্ত, তাই ফল হয় না। স্বার্থত্যাগ ভিন্ন সংসারে সৎপথে যাওয়া যায় না। সাধনা দ্বারা সদ্‌গুরুর কৃপা উপলব্ধি করিতে হয়। কিছুদিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়া মনকে ভালরূপে মায়িক সংসারের কার্য্যপ্রণালী যে অনিত্য, তাহা বেশ করিয়া বুঝিয়া সংসারের বা বিষয়ের প্রতি যাহাতে ঘৃণা জন্মে, তাহাই করিতে হয়। তবে মন বৈরাগ্য লইয়া ক্রম-অনুসারে সাধন-মার্গে ছুটিতে থাকে। সকল কার্য্যই নিয়ম ও প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।"

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবা, পরজন্ম কি আছে?

বাবা। হাঁ বাবা, পরজন্ম আছে, শাস্ত্রকারগণ বলেন। আর আমারও বিশ্বাস, পরজন্ম আছে।

ব্রাহ্মণ। বাবা, শুনিয়াছি আপনার খুব শক্তি, আমাদিগকে কিছু দেখান।

বাবা। দেখে কি হবে বাবা? ওসব দেখতে নাই। সেতার শিক্ষার সময় গান বাজাতে নাই, গত বাজাতে হয়। হাত সাফা হলে গান বাজাতে কষ্ট হয় না—শিক্ষাও পৃথক্‌ভাবে করতে হয় না। জীবের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি-বিশ্বাস সহসা আসে না।

ব্রাহ্মণ। আমরা ক্ষুদ্র জীব। কি বুঝি বাবা! সবই আপনাদের কৃপা।

গুরু। হাঁ, ভগবানের কৃপা তো সর্ব্বদাই আছে, উপলব্ধি করে কে, বাবা?

এ সময়ে সূর্য্য প্রায় অস্ত যায়-যায়। শ্রীপতি বাবাজীকে কিছু প্রসাদ করিয়া দিবার জন্য বলায় তিনি বাড়ীর মধ্যে গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

শ্রীপতি অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়াছেন। প্রভু ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। সামান্য মাত্র আহার করিলেন। শ্রীপতিকে বলিলেন, "উপেন্দ্রকে বেশ করিয়া খাওয়ান হউক।" আমি প্রসাদ লইলাম। তাহার পর গাড়ীতে বাসায় ফিরিলাম। ঘরে ধুনা দেওয়া গেল। বাবাজী কপাট বন্ধ করিলেন। রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় কপাট খুলিলেন। বাবার আহার্য্য দ্রব্য সমস্তই প্রস্তুত। তিনি আহার করিয়া একটি চেয়ারে বসিলেন। আমরা আহার করিতে লাগিলাম। তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমাদের খাওয়া শেষ হইল।

তাঁহাকে ঘিরিয়া আমরা সকলে বসিলাম। তিনি শাস্ত্রালাপ করিত আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, “চিত্ত নির্ম্মল কর, ভগবানের কৃপা বা শক্তি অনুভব করিতে পারিবে। নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম জিনিষে সূর্য্য রশ্মি শীঘ্রই কাজ করে। দেখ, কোথায় সূর্য্য আর কোথায় বালুকারাশি, সামান্য তাপেই বালি গরম হইয়া উঠে। অত শীঘ্র কি এক চাপ মাটি গরম হয়? তা হয় না। কেননা, মাটি হইতে বালুকারাশি পরিষ্কার ও মার্জ্জিত।”

নানা কথা কহিতে কহিতে প্রায় রাত্রি ১১টা হইল, প্রভু শয়নের জন্য ঘরের মধ্যে গেলেন। আমরা বিল্বপত্র, তুলসী, পুষ্প প্রভৃতি পূর্ব্বাহ্নেই ঘরের মধ্যে রাখিয়াছি। আবার কল্য প্রাতে ৮টার পর দর্শন করিব। রাত্রি ২ টার সময় উঠিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। ভোরে উঠিয়া ঠাকুরকে উঠাইয়া দিলাম। তরকারি-পত্র কুটিতে আরম্ভ করাইয়া দিলাম। গুরুজী ৯টার মধ্যে সেবা করিয়া বণ্ডুল যাইবেন।

প্রায় ৭৷৷০ টার সময় কপাট খুলিলেন। সেই পদ্ম-চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, “আহারের কতদূর কিরে, বাপু।”

আমি বলিলাম, সমস্তই প্রায় ঠিক হইয়াছে। প্রণাম করিয়া মস্তকে পদধূলি লইলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া স্নান-জল ও প্রসাদ লইলাম। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও দিলাম। তামাক সাজিয়া দিলাম। আমাদের মধ্যস্থানে বসিলেন, যেন রাজ-রাজেশ্বর। একটু বেলা হইতেই বাবার আসন করা হইল। তিনি সেবায় বসিলেন। এদিকে যাইবার সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে লাগিল। তিনি উঠিলেন। তামাক খাইয়া বলিলেন, “আজ আসি” অমনি আমার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। তিনি বলিলেন, “কান্না কি রে?” আমি ব্যাগ হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। ষ্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে গেলাম। তিনি বণ্ডুল রওনা হইলেন।

গুরুদেব বণ্ডুল আশ্রমে চলিয়া যাওয়ার পর ফাঁকা মন, উদাস ভাব ও ঊর্দ্ধগতিহীন মনের অবস্থা লইয়া বাসায় ফিরিলাম। যে-ঘরে ঠাকুর কয়েকদিন ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মন হু-হু করিয়া উঠিল। সেই বিছানা, সেই বসিবার স্থান, সবই রহিয়াছে—নাই কেবল সুঠাম-গঠন সেই নশ্বর-দেহ, নাই সেই পদ্মপত্রের ন্যায় উজ্জ্বল-চক্ষু-বিশিষ্ট মহাপুরুষ।

হরিকে কেহই একঘেয়ে আপন করিতে পারে না। সকলেই মনে করে, হরি আমার; সকলেই মনে করে, ভগবান গুরুদেব আমাকেই বেশী স্নেহ করেন, ভালবাসেন, কিন্তু তাহা ভ্রম। তিনি ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসেন না, তিনি প্রতি জীবের হৃদয়-কমলে অবস্থিত পুরুষকে ভালবাসেন। তিনি জানেন, অন্য সমস্তই মা-প্রকৃতির খেলা। কিন্তু মাও ভালবাসার জিনিষ, আদরের জিনিষ।

ভগবান্ বিশুদ্ধানন্দ স্থূলের উপর ভালবাসা দেখাইলেও বস্তুতঃ সেই দেহ-

মধ্যস্থিত পরমপিতাকেই ভালবাসেন, কিন্তু বদ্ধ জীব মনে করেন যে, আমাকে (স্থূলদেহকে) ভালবাসেন।

গোপীরা যতদিন শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ ভাবিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা বা ভালবাসার আস্বাদ পান নাই। অনেক প্রকার শিক্ষা দিয়াও যত দিন গোপীদের খণ্ডিত ভাবকে অখণ্ড ভাবের সহিত এক, করিতে, মিলাইতে, পারেন নাই, ততদিন নানা কৌশল পাতিয়া খেলা করিতেছিলেন। তাহার পর যখন ক্রমানুসারে গোপীদের ঈষৎ স্বার্থজড়িত ভাব তিরোহিত করিলেন, খণ্ডভাব যখন মহাভাবে মিলিবার জন্য নক্ষত্রবেগে দৌড়িতে শিখিল, একটু অভাব আসিল, অমনিতর নিকটে আসিয়া হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। গোপীদিগকে পার করিবার জন্য ভবপারের কাণ্ডারী তরী লইয়া যখন ধীরে ধীরে তরী বাহিয়া তীরের দিকে আসিতে লাগিলেন অমনি গোপীদের হৃদয়-মধ্যে একটু খণ্ডিত ভাব-রূপ মেঘের উদয় হইল। অমনি তড়িদ্বৎ তরী নিজেই নিমেষ মধ্যে দৃষ্ট পথের বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তখন দ্বৈত ভাব গেল, ব্যষ্টি সমষ্টিতে আসিয়া প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ করিল। অভাব আসিলেই গোপীরা বিলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বাবা গুরুদেব বণ্ডুল গিয়াছেন, এখনও গুষ্করা ফেরত যাওয়ার সংবাদ পাই নাই।

আমার একজন গুরুভাই, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ফুলমতি গ্রামবাসী প্রেমচাঁদ ঘোষ সর্ব্বদাই আমার নিকট থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই গুরুদেবের আশ্চর্য্য শক্তি ও অপার করুণার কথা প্রসঙ্গ করিয়া আনন্দ লাভ করিতাম। একদিন সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর বাড়ি হইতে গুষ্করা গিয়াছেন, ট্রেণের সময় হওয়ায় আমাকে দর্শন না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন।

দুই এক দিন পরে গুষ্করার কালীপদ ঘোষ আসিয়া বলিলেন, "গুরুজী আপনাকে গুষ্করা যাইবার আদেশ করিয়াছেন।" তখন একটু একটু শীত আছে। বৈকালের ট্রেণে 'শ্রীগুরু কি জয়' বলিয়া রওনা হইলাম। ট্রেণ যতই গুষ্করার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই অপরূপ গন্ধ আসিয়া আমাকে উন্মত্ত করিতে লাগিল।

সঙ্গী প্রেমবাবু বলিলেন, "তুমি এত কাঁদ কেন? আমাদের চক্ষে এক ফোঁটা জল কিছুতেই আসে না। তোমার মনে কি হয়, তুমি কি দেখ, যে চক্ষের জলে তোমার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যায়?"

আমি। ভাই, আমার ভাব তোমাকে বুঝাইবার ভাষা নাই। আমি যে কেন কাঁদি, কে কাঁদান, কি জন্য কাঁদান, তাহা অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুই জানেন, আমি বলিতে শিখি নাই—শিখান নাই।

গাড়ী আসিয়া গুষ্করায় পৌঁছিল।

ইহা ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারীর কথা। একটু শীত আছে, গায়ে গরম কাপড় চলিতেছে। গাড়ী কিছু লেট্ ছিল, তাই একটু রাত্রি হইয়াছে।

প্রভু সন্ধ্যা করিয়া আহারান্তে বঙ্কবিহারী সাধুর দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছেন। সন্ধ্যার ভোগ হইয়া গিয়াছে। রতনবিহারীকে বলিয়াছেন, উপেন্দ্র আসিতেছে, তাহার জন্য প্রসাদ রাখিবে। রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সৌম্যমূর্ত্তি মাথা নাড়িয়া কথা কহিতেছেন, মনে হইল যেন মস্তকের চুলের ও দাড়ির চুলের অগ্রভাব দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তড়িদ্বৎ বাহির হইয়া দিগ্বিদিক ছুটিতেছে। হীরকবৎ চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুৎরাশি চর্তুদ্দিক আলো করিয়া দৌড়িতেছে। তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছি।

ভাবিলাম, এখন সম্মুখে যাইলে পাছে ঐ রূপ-রশ্মি অন্তর্হিত হয়, তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, গোপনে দাঁড়াইয়া, ভাল করিয়া মন-প্রাণ ভরিয়া আগে দেখিয়া লই। সম্মুখে পাইলে এখনি ভুলাইয়া দিবেন, আর কাঁদিব। প্রেমবাবু ‘চল হে, দাঁড়ালে যে। গুরুজী দোকানে রয়েছেন, চল” বলিয়া যাইবার জন্য যতই ব্যস্ত, আমি ততই বলি, “ভাই একটু দাঁড়াও। ওহে, এখান থেকেই দেখ না। ঠাকুর দূর হতে দেখাই ভাল, নিকটে যেও না। ঐ রূপে ডুবে যাবে, আস্বাদ পাবে না, ভালবাসা চলে যাবে, পূর্ব্বরাগ, সুখপ্রদ রাগ, চলে গেলে, মিশে গিয়ে কি নিয়ে থাক্‌ব ভাই। একটু দাঁড়াও।”

সাধ মিটিল না। প্রণাম করিলাম। বলিলেন, “উপেন্দ্র, এসেছে। এই যে প্রেমচাঁদ এসেছে। কেদারকে (কেদার মোদক, গুরু ভাই) ডাক, এদের জলখাবার ঠিক করে দিক্।”

বাবাজী। উপেন্দ্রকে প্রসাদ দাও, প্রেমচাঁদকেও দিও।

আমরা প্রসাদ লইলাম। গুরুজী উঠিলেন। বলিলেন, “চল গো কাছারী বাড়ীতে যাই, এরা সব এসেছে। কেলেকে খবর দাও।” ভক্ত কালীপদ ঘোষকে সংবাদ দেওয়া হইল।

কাছারি ঘরের বারাণ্ডায় কতকক্ষণ বসিলেন। আমি পদসেবা করিতে লাগিলাম, প্রেমচাঁদ তামাক সাজিল। দেখিতে দেখিতে কালীপদ ঘোষ মহাশয় কতকগুলি পান হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে পৌছিলেন। আসিয়াই আমাকে সরাইয়া দিয়া নিজেই পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত সময় আমরা তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতেছি, রাত্রি প্রায় ১টার সময় কালীপদ ঘোষ চলিয়া গেলেন, আমি বসিয়া আছি, গুরুদেব তামাক খাইতেছেন। হঠাৎ উঠিয়া তেল মালিশ করিতে বলিলেন। বোতলে খাঁটি সরিষার তেল ছিল, সর্ব্বাঙ্গে বেশ করিয়া লেপন করিলাম।

তাঁহার সঙ্গে পুষ্করিণীর ঘাটে গেলাম। তিনি স্নান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। ঘরে কি অপূর্ব্ব গন্ধই উঠিয়াছে, স্বহস্তে বাবাজী সম্মুখের ফুলের

বাগান হইতে ফুল তুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি ভিজা কাপড় ও লেঙ্গট শুকাইতে দিলাম ও অন্য ঘরে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে যোগ দিলাম।

প্রাতে উঠিয়া দেখি, গুরুজী তখনও উঠেন নাই। কি আশ্চর্য্য ও এক নিয়মে কঠোর তপস্যা! যেমন চন্দ্র-সূর্য্য যথানিয়মে হরির আজ্ঞামত কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, ইহাও তাহা অপেক্ষা কম নহে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হয়, চন্দ্রে গ্রহণ হয়, কিন্তু আমার ভগবানের বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, আলস্য নাই, রোগ নাই, শোক নাই, মান নাই, দ্বিধা নাই—যেমন বায়ুভরে নৌকা আপনিই যায়, ইহাও তাই।

দেখিতে দেখিতে প্রায় ৭টা বাজে, প্রভু একটু পরেই কপাট খুলিয়া বাহির হইলেন। স্নান-জল তাম্রপাত্রে আনিয়া রাখিলেন। আমি পদধূলি লইলাম। বলিলেন, "স্নান-জল নাও, একটু জল খাও।"

এই কথা বলিয়া তক্তাপোষের উপর বসিলেন। আমি পাখা করিতে লাগিলাম। সমস্ত গাত্রে ঘাম। জল খাইয়া ট্রেণের সময় হওয়ায় তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেই বলিলেন, "সময় কি হয়েছে? আচ্ছা এসো, আর একদিন আস্‌বে, আমিও সঙ্গে যাব।" "যে আজ্ঞা" বলে আমি প্রণাম করিয়া ষ্টেশনে ছুটিলাম।

বাড়ি আসিয়া অফিসে গেলাম, মন কিন্তু আর কিছু করিতে চায় না, যেন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, কাহার চিন্তায় উদাসভাবে থাকিয়া দিন কাটাই, তাহা হৃদয়-স্বামী ভিন্ন আর কেউই জানেন না।

দেখিতে দেখিতে একদিন পত্র পাইলাম। প্রভু লিখিয়াছেন, "তুমি আসিবে, আমি বর্দ্ধমান যাইব।"

তাহার পরদিন আবার পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, "আর আসিতে হইবে না। আমিই আগামী কল্য যাইব। তুমি ষ্টেশনে আসিবে।"

যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। শুনিলাম গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে। প্ল্যাটফরমে বেড়াইতেছি, হঠাৎ যে মূর্ত্তি চক্ষের উপর পড়িতে লাগিল, শিহরিয়া উঠিলাম। মন আর থামে না—কতক্ষণে গাড়ী আসিবে, দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব।

গাড়ী সবেগে আসিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে গাড়ীর কামরা-পানে দেখিতেছি, কোন্ কামরায় আমার প্রভু আছেন।

দেখি, একটি মধ্যশ্রেণীর গাড়ীর মধ্যে রহিয়াছেন। চক্ষের উপর চক্ষু পলকের মত পড়িল, বিদ্যুৎ খেলিল, মন মাতিয়া গেল। গাড়ী ধরিতে ছুটিলাম। গাড়ীর নিকট আসিতে না আসিতে দেখি, গুরুদেব নামিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রণাম করিলাম। জুতা খুলিলেন, পদধূলি লইলাম। আমি পশ্চাতে পশ্চাতে

ব্যাগ লইয়া চলিলাম, বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বাসায় আসিয়া নিজেই পদ ধৌত করিয়া দিলাম। তামাক সাজিয়া দিলাম। অনেক প্রকার প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। অনেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। সকলের সঙ্গেই সমভাবে ব্যবহার। সকলকেই সৎশিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঘরের মধ্যে ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ঘরের কপাট বন্ধ করিলেন। আমরা অনেকেই বাহিরে বসিয়া তাঁহর সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। আমি মধ্যে মধ্যে গিয়া তাঁহার সেবার দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কত বিলম্ব, তাহাই দেখি—সন্ধ্যা করিয়া উঠিলেই জল খাইবেন।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় প্রভু উঠিলেন। তামাক সাজিয়া দিলাম, গল্প চলিতে লাগিল। বলিলেন, “বাপু, মানুষ চেনা বড়ই কঠিন, সকলের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবার জো নাই। তা করো না, ঠক্‌বে। সাধন ভজন ঠিক ঠিক মত করলে কিছুদিন পরই প্রত্যেক জীবের মনের ভাব বুঝিতে পারবে। তখন মনে মনে হাসবে, আর বলবে, ‘বাবা এই মানুষ জামায়, কাপড়ে, ঘড়িতে, ঘড়ির চেনে বাবু, যেন ফিট্ বাবু বাহিরটা সাদা ফিট্‌ফাট্ কিন্তু ভিতর যে একেবারে নরক অপেক্ষা পায়খানা অপেক্ষা ঘৃণিত।’ বাপু, এই সব জীব নিয়ে সংসারে চলা বড়ই কঠিন, মন্দকে মন্দ বলবার জো নাই, ঠিক-ঠাক্ বল্‌লে গাল দিবে, নিন্দা করবে। ঐ শক্তি তোমার শীঘ্রই আস্‌বে। এসেছে—সব কথা বল না, ভাব গোপন করবে। তারাপ্রসন্নবাবু (গুস্করার জমিদার তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদার) আমাকে (গুরুজীকে) গণনা করিয়া তাহার বিষয় বলিবার জন্য জেদ করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছি উপেন্দ্র আসিলে বলিয়া দিবে। সে বেশ বলতে পারে। তুমি একবার তাঁর বিষয় সব বলে দিও।

গুরুদেবের জলখাবার প্রস্তুত হইল, তিনি সেবায় বসিলেন। তাঁহার সেবার পর আমরা প্রসাদ পাইলাম। লুচি, ছোলার ডাল, ভাজা তরকারী, ক্ষীর, মিষ্টান্ন দিয়া সকলের ভোজন করান হইল।

রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় প্রভু শয়নে গমন করিলেন। আমরাও পার্শ্বের ঘরে শুইলাম।

রাত্রি আড়াইটা কি তিনটার সময় ‘উপেন্দ্র, উপেন্দ্র’ বলিয়া ডাক দিলেন, অমনি বিছানা হইতে লাফ্ দিয়া উঠিলাম। আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। হাত মুখ ধুইয়া তৈল মাখিলেন, পুষ্করিণীর জলে স্নান করিলেন। ধুনা দেওয়া হইল, ঘরে প্রবেশ করিলেন, সেদিন ঘর ফুলের গন্ধে পরিপূর্ণ হইল।

বৈকালে তাঁহার সঙ্গে বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রী ৺ঈশানেশ্বর ঠাকুর শিবকে দর্শন করিতে গিয়া অপূর্ব্ব ও মনোহর দৃশ্য দর্শন করি। তাহার পরদিন ঠাকুর গুস্করা রওনা হইলেন। সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিলাম।

একদিন রাত্রি ২টার সময় ধুনা দিয়া ঘরের মধ্যে স্বীয় অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি। হঠাৎ সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। ইহসংসার ছাড়িয়া কোন্ অজানা রাজ্যের সীমায় পৌঁছিলাম, অতি সুগঠন সুঠামদেহযুক্ত নরনারী ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত স্থান। পুরুষ-প্রকৃতি অভেদ জ্ঞানে ব্যবহার চলিতেছে। স্ত্রীলোকেরা দেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উল্লসিত মনে বিচরণ করিতেছেন। একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-শ্রেণী সমারোহ করিয়া দণ্ডায়মান, ঐ পুষ্করিণীতে নানাজাতীয় পুষ্প সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে ছোট ছোট বৃক্ষ নানাপ্রকার ফল বিতরণ করিতেছে। একটি গাছের তলায় আমি এক বালগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান, আর ইষ্টদেব সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছেন। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, কোথায় চলিয়া আসিয়াছি, ইহা স্বপ্ন না প্রকৃতই! আমি স্বর্গে দেবদেবীর সঙ্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছি। আশা মিটে না, দর্শন শেষ হয় না, কাছ ছাড়িতে মন যায় না, যেন যবনিকা পতনের ন্যায় ঐ দৃশ্য আমার সম্মুখ হইতে নীরবে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় পতিত হইলাম—দেখি সেই স্থিরাসনে বসিয়া অভিষ্ট চিন্তা করিতেছি।

কিছুদিন পরে প্রভুর নিকট হইতে পত্র পাইলাম, "উহা স্বপ্ন নহে। ভাবাবেশে দেহের মধ্যে যে যে গুণে মন থাকিয়া যে দৃশ্য দেখায়, উহা তাহাই জানিবে। চিত্ত এক একটি গুণ অবলম্বন করিয়া এক এক ভাব সৃষ্টি করিতেছে। আর বিশ্বপতি তাঁহার পশ্চাতে আকাশে দ্রষ্টা হইয়া আছেন। আর কখনও বা চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়া নির্গুণ ভাব আনিতেছেন।" পত্র পাইয়া—বলিবার আগে পত্র পাইয়া, ক্রমশঃ যতই আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল, ততই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা আমার নয়ন-পথে পড়িতে লাগিল। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অকৈতব উদ্যমে প্রাণপণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম। ভগবচ্চিন্তায় মন-প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। গুরুদেব আমার অসাক্ষাতে লোকের নিকট আমার উদ্যম ও বিশ্বাসের কথা বলিয়া শক্তির অনেক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজের শক্তি আমাতে আরোপ করিতেছেন, ইহা আমি ক্রমশঃ বেশ বুঝিতেছি। নিজে প্রায় লোকের ভাল-মন্দ, কোষ্ঠীবিচার ছাড়িয়া দিয়াছেন; কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই "উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে, সে সমস্ত বলিবে" বলিয়া আমার নিকট লোক পাঠাইয়া দেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। সেই সময় গুস্করার মহাবিষ্ণু চোঙ্গদার মহাশয়ের পুত্র যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পীড়িত আছেন, প্রায় ৪২ দিন জ্বর ত্যাগ করে নাই। ডাক্তারেরা আশা ত্যাগ করিয়া

দিয়াছেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু গুরুদেবকে "কি হবে বাবা" বলিয়া ধরায় তিনি আদেশ করেন, "উপেন্দ্র অদ্য আসিবে, সে আসিলেই সব ঠিক হইবে।" আমি পৌঁছিলে যজ্ঞেশ্বরবাবু আমার নিকট আসিয়া সমস্ত কথা জানাইলে গুরুজী আমাকে উঁহাদের বাড়ি যাইবার অনুমতি করিলেন। আমি যজ্ঞেশ্বরবাবুর সহিত রোগীর নিকট গিয়া দেখি, অস্থি-চর্ম-কঙ্কাল-সার একটি ১৪/১৫ বৎসর-বয়স্ক বালক বিছানায় মিলাইয়া শুইয়া আছে। কিছুক্ষণ বসার পর যজ্ঞেশ্বরবাবু আমাকে বলিলেন "কি প্রকার দেখিতেছেন? বাঁচিবার আশা কি আছে?" আমি বলিলাম, "ইঁহাকে মারে কে? যিনি ইহাকে কষ্ট দিতেছেন, দেখিতেছি তিনিই ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। আর ৭ দিন পরে জ্বর ত্যাগ হইবে, ক্রমশঃ সুস্থ হইবে।" বাবাজীর নিকট আসিয়া যজ্ঞেশ্বরবাবু সমস্ত জানাইলে তিনি বলিলেন, "উপেন্দ্র যাহা বলিয়াছ, তাহাই ঠিক হইবে।" ক্রমশঃ তাহাই হইল।

এই সময় বহু লোক গুরুজীর নিকট দীক্ষা লইবার জন্য আসা-যাওয়া করিতে আরম্ভ করিল। বণ্ডুল আশ্রম নির্ম্মাণের দ্রব্যাদি সংগ্রহ চলিতে লাগিল। কলিকাতার গুরুভাই রোহিণীকান্ত চেলও সে সময় আসা-যাওয়া করেন।

আমি প্রাতঃকালে গুষ্করা হইতে চলিয়া আসিলাম। এইবার আমার কিছু দিনের ছুটি লইবার প্রয়োজন হইল। পূর্ব্বে গুরুদেব যে ঔষধ ও দ্রব্য দিয়াছিলেন তাহার জন্য আমার পত্নী সসত্ত্বা আছেন। মহাত্মা স্বামী নিমানন্দ পরমহংসদেব কামাখ্যায় আমার পুত্র-কামনায় যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমার পুত্র জন্মিবার কাল নিকট হইয়া আসিয়াছে। আমার বাড়ি যাওয়া আবশ্যক। একদিন প্রভুর নিকট গুষ্করা আশ্রমে আসিয়া সকল বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমি নিকটে দণ্ডায়মান, বাবজী প্রাতে পূজাদি শেষ করিয়া তক্তাপোষে বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন, "উপেন্দ্র, দু'-এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ি যাও। বাড়ি যাওয়া দরকার। দাদা গুরুদেব স্বামী ভৃগুরাম পরমহংস পত্র লিখিয়াছেন, 'উপেন্দ্রকে বলিবে, আগামী ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে রাত্রি ১১-৫৮ মিনিটের সময় এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে। উপেন্দ্র যেন বাড়ি যায়।" বলিয়া যে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তাহার কোষ্ঠী চক্র আমাকে দিলেন।

বলিলেন, "যাও, কোন চিন্তা নাই।" আমি প্রণাম করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া দুই মাসের ছুটির দরখাস্ত দিলাম। সাহেব ছুটি মঞ্জুর করিলেন। আমি বাড়ি চলিয়া আসিলাম। আমার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার অধীন ওন্দা থানার অন্তর্গত দামোদরবাটী গ্রাম। বাড়ি আসিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হওয়ায় মনের কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। মন-প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ-মত কার্য্য করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্নেহমাখা পত্র পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে নামিলাম। দেখিতে দেখিতে ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী

তিথি আসিয়া উপস্থিত। রাত্রি ১১-৫৮ মিনিটের সময় পুষ্যা নক্ষত্রে এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। গণনাকারী দৈবজ্ঞগণ প্রাতঃকালে আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া লগ্ন প্রস্তুত করিলেন, সেই একই। আমি বালকের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে কোষ্ঠীচক্র পাইয়াছি বলায় 'উহা হইতে পারে না' বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কি কোষ্ঠী প্রস্তুত হয়! ইহা তাঁহারা এই প্রথম শুনিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "আপনি নিজে কোষ্ঠীচক্র প্রস্তুত করিতে জানেন, বোধ হয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর উহা প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন।" কি বলিব? বলিবার ভাষা নাই। এই জগতে কত শত নূতন নূতন আশ্চর্য্য ও অমূল্য নিধি আমাদের চক্ষের উপর ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। কত শত দেবের আরাধ্য ধন ঐ কৌপীনধারী, গুহাবাসী ঈশ্বর-প্রেমিক ভিক্ষুকের ঝুলির ভিতর রহিয়াছে, তাহা দেখিবার, পাইবার, উপলব্ধি করিবার জন্য হে বদ্ধ জীব, তোমরা কি একবার একদিনের জন্যও চক্ষুর জল ফেলিয়া, ভগবানের নিকট কাঁদিয়া তাঁহার কৃপা-ভিখারী হইয়াছ? না, নিজের উদরকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া, যেন-তেন-প্রকারেণ উদরপুর্ত্তির জন্য, আত্মশ্লাঘার জন্য, বড় মানুষ হইবার জন্য, দেশের নিকট, দশের নিকট, আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট ধনী, গুণী, মানী বলিয়া নিজেকে দেখাইবার জন্য, অর্থ উপায়কল্পে জীবন-উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ! তাই বলি ভাই সকল, জগৎ ভুলিয়া, প্রাণ মাতাইয়া, সেই চক্রধারীর চক্র ভেদ করিয়া নিজে কৃতার্থ হও—পূর্ব্ব-পুরুষকে কৃতার্থ কর।

দেখিতে দেখিতে আমার ছুটি শেষ হইয়া আসিল, কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিবার জন্য মোট বাঁধিতে লাগিলাম। মোট বাঁধা, যাওয়া-আসা আর ঘুচে না, প্রভু! হে কর্ম্মরূপী গুরু! আমায় কর্ম্মনাশ হইতে মুক্ত করুন প্রভু! আপনার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মবন্ধন যায় না। প্রভু! সম্মুখে দস্তর কর্ম্মসাগর দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি, কী করিয়া অসীম কর্ম্ম সমুদ্র পার হইব! আমায় শক্তি দিন। কাতর প্রাণে কৃতাঞ্জলিপুটে এই ভিক্ষা করি, প্রভু আমায় বল দিন, হে দুর্ব্বলের বল, শ্রীগুরু! কৃপা করিয়া আমায় বল দিন। পিতা অপরাধ ধরিলে দাঁড়াইবার স্থান নাই।

দুইদিন ছুটি থাকিতে থাকিতে বর্দ্ধমান রওনা হইলাম। বর্দ্ধমানে গিয়া শুনিলাম, আমার পরম শত্রু ত্রৈলোক্যনাথ দাস আমার স্থানে রিজার্ভ সাব্ইন্সপেক্টর হইয়াছেন। আমি ছুটিতে থাকার সময় তিনি শত্রুরূপে আমার শ্রীগুরুর নিকট গমনাগমন করিয়া আমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় আমার আর এক শত্রু বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষ আসানসোলে দারোগা থাকার কালে অশেষ বিপজ্জালে জড়িত হইয়া আমার কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছেন। শুনিলাম, প্রভু আমাকে বহু বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন জানিয়া ত্রৈলোক্য ও নিবারণ বিপদে পড়িয়া বিপদ-কাণ্ডারীর শরণ লইয়া মনপ্রাণ শীতল করিয়াছে। ত্রৈলোক্যের সহিত আমার ব্যাক্যালাপ ছিল না। ছুটির পর হাজির হইয়া এই প্রথম দিন অফিসে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ত্রৈলোক্য প্রেমবাবুকে বলিয়াছেন, "উপেন্দ্র কোন্ থানায় যাইতে চাহে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। গুরুজী তাঁহাকে ভাল থানায়, জলবায়ু ভাল এমন থানায় দিবার জন্য বলিয়াছেন।" আমি বলিলাম "আমি ভাই কোথায় যাইব? ভগবান্ শ্রীগুরুদেব যেস্থানে দিবেন তথায় যাইব। যমের ঘরে দিলেও হৃষ্টমনে যাইব। ত্রৈলোক্য কি পৃথিবীর কর্ত্তা?" তাহার পর সন্ধ্যাবেলা গুরুজীর নিকট গমন করিলাম। বহুদিন দর্শন করি নাই, আজ প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তাই শ্রীচরণ দর্শন জন্য দৌড়িলাম। গুষ্করায় পৌছিয়া দেখি, গুরুদেব তখনও উঠেন নাই, দরজা বন্ধ। বাহিরে বসিলাম, প্রায় ১ ঘন্টা পরে কপাট খুলিলেন, আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। গুরুজী বলিলেন, "এসেছ, সব ভাল ত?"

আমি আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবা।

আমি তামাক সাজিলাম। তাহার পর পাখা করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ত্রৈলোক্য আমার পরম শত্রু, সে আবার আমার শ্রীগুরুর নিকটে দীক্ষা লইল! গুরুজী কেন আমার শত্রুকে ভালবাসিলেন! হিংসায় রাগে দুঃখে আমার মন বড়ই বিচলিত হইতে লাগিল।

এই সময় গুরুজী দুইবার আমার মুখপানে তাকাইলেন, কিছু বলিলেন না। তাহার পর সন্ধ্যায় সেবায় বসিলেন। আমি বারেণ্ডায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। সেবা করিয়া প্রভু বলিলেন, "উপেন্দ্র, আমার পাতেই বসো, জল খাও।" আমি জল খাওয়ার পর বারেণ্ডায় তাঁহার পদসেবা করিতেছি, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "বাবা, তোমার মন খারাপ করিবার কোন কারণ নাই। কেন বৃথা মন খারাপ কর? কাল আবার ত্রৈলোক্যের সঙ্গে ভাব ও ভালবাসা হইবে, এই সকল চিন্তা করার জন্য তোমার আত্মগ্লানি আসিবে। বাবা, কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র নয়। কালের প্রবল গতিতে এই সকল ভাব আনিয়া দেয়। ত্রৈলোক্য তোমার অনেক অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছু কি করিতে পারিয়াছে? তাহারও বিশেষ আত্মগ্লানি আসিয়াছে—সে বুঝিয়াছে, কাহারও দ্বারা কিছু হয় না, ভগবান্ যাহা করেন, যাহা করান, তাহাই ঠিক। জীবের কি সাধ্য ইষ্টানিষ্ট করিতে পারে? কেহ তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিলে, তুমি তাহার ইষ্ট চিন্তা করিবে। বাবা, ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। ইহা বহি পড়িয়া, চিন্তা করিয়া, হইতে পারে না। বেশী পড়িলে তর্ক উঠিয়া মনকে সন্দেহ-বাতাসে দোলায়। বহু মুনির বহু মত, নানা শাস্ত্রে নানা উপায় ও নানা পন্থার কথা লেখা

আছে। কলিকাল, জীব অল্পায়ুঃ, সকল বিষয় দেখিতে গেলে চলে না। গুরুর আজ্ঞা-মত কর্ম্ম করিয়া যাও। মন যখন যে গুণের স্থানে থাকে, তখন তাহার সেই ভাব হয়। শ্রীগুরুর আজ্ঞায় কর্ম্ম করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় ও সদ্‌গুণের আশ্রয়ে থাকিয়া মন সর্ব্বদাই আনন্দ-রস পান করিতে থাকে। একে তোমরা কিছু বুঝ না, তাহার উপর ঐ বুদ্ধি লইয়া সবটাই একেবারে বুঝিয়া লইতে যাও—সুতরাং কোন রসই পাও না। মন সর্ব্বদাই এক একটি গুণে থাকিয়া মোহিত হইতেছে ও মোহিত করিতেছে, গুণাতীত-ভাব পাইতেছে না। 'তুরীয়ম্, চতুর্থম, দ্বৈতা-দ্বৈত-বিবর্জ্জিতম্'-ভাব কি গুণে থাকিলে পায় বাবা? এখন তোমার মন যে গুণকে অবলম্বন করিয়া 'ত্রৈলোক্য আমার শত্রু, গুরুজী তাঁহাকে বেশী ভালবাসিয়াছেন', এই কল্পনা বা ভাবের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাকে ধরিতে চেষ্টা কর। মনকে সেই স্থান হইতে ধীরে ধীরে সরাইয়া ভিন্ন স্থানে রাখিতে পারিলে, এই ভাব তিরোহিত হইয়া আবার এক নূতন ভাবের নিশ্চয় অবতারণা করিবে। তাই বলি, সর্ব্বদাই আত্মভাবে থাকিতে চেষ্টা কর। ত্রৈলোক্যকে তোমার পরম শত্রু বলিতেছ, আবার সময়ে এমন ভাব হবে যে, ছাড়া দায় হবে, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে ভালবাসা যাবে না। সর্ব্বদাই সৎচিন্তা করিবে, সৎ-অসৎ বিচার করিবে, 'নেতি-নেতি' করিয়া বিচার করিলে ভগবান্ শ্রীগুরু নিজেই এমন মার্জ্জিত বুদ্ধি দিবেন যে, অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু ধারণায় আসিবে। তখন কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করিবার মত তোমার মধ্যে ভাব অসিয়া তোমাকে পাগল করিবে। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কিছু বল্লে?"

আমি। না বাবা, সে নিজে কিছু বলে নাই। প্রেমবাবুকে বলেছে, 'উপেন্দ্র কোথায় যেতে চায়, জিজ্ঞাসা করিবে। গুরুদেব বলেছেন উপেন্দ্রকে ভাল স্থানে দিবে।'

গুরুজী। ওগো, নিবারণ বলে একটি ছেলেও ত্রৈলোক্যের সঙ্গে ক'দিন এসেছিল, তারও নাকি ভারি বিপদ—সাহেব নাকি বড় চটেছে। বেটারা চাকরী নিয়েই গেল। তার সঙ্গে তোমার ভাব কেমন?

আমি। ত্রৈলোক্য ও নিবারণ দুয়ে একজোড়, তাহারা পূর্ব্বে আমার শত্রুতা করেছে, এখন নিজের দোষ নিজেই দেখছে।

গুরুজী। বাপু, যাই বল, ত্রৈলোক্যের আধার ভাল। ক্রিয়া নিয়ে খুব খাটছে। তার ভাই রাধাচরণ শিষ্য হয়েছে।

আমি। তাঁদের বাড়ি কোথা?

গুরুজী। মালদহ জেলা, বাচ্চামারি গ্রাম। তাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন উভয়েই আসবে।

আমি। তাকে বললে আমার সঙ্গে কি আসবে?

গুরুজী। খুব আসবে। সে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। আসি সব বলেছি।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় টোলের অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে তামাক সাজিতে বলিলেন। আমি তামাক সাজিয়া বাবাকে দিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে যোগের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। অনেক বিষয় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেবল বাবাজীর নিকট গন্ধ লইতেই আসিতেন। বাবাজী নানা প্রকার স্বর্গীয় গন্ধ তাঁহার গাত্রে মাখাইয়া দিতেন। ভট্টচার্য্য মহাশয় প্রায় বলিতেন, "আমাকে এই গন্ধ আনাটি শিখাইয়া দাও।" দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় ১২টা হইল। বড় গরম, বাবাজী বারেণ্ডায় ষ্ট্রেচারের খাট পাতিয়া মশারী খাটাইয়া শুইলেন। আমি নীচে মাদুর পাতিয়া ঘুমাইলাম। রাত্রি শেষে ঘুম ভাঙ্গিল, উঠিয়া দেখি, গুরুজীর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। তিনি এর মধ্যেই স্নান আদি করিয়া জগৎ পিতার আরাধনায় বসিয়াছেন আমিও বিছানা ত্যাগ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ইষ্ট-চিন্তায় বসিলাম। আমি উঠিয়া দেখি, তখন সাতটা,—গুরুজী উঠেন নাই। প্রায় ৭॥ টার সময় উঠিলেন। আমি স্নান-জল লইয়া বিদায় হইলাম। বর্দ্ধমান ফেরত আসিলাম। অফিসে ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা হয়। দেখিবামাত্র সে নিজেই দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "তুমি কি কল্য গুষ্করায় গিয়াছিলে? আমাকে বলিলে আমিও যাইতাম"—অনেক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কোথায় আমার বদলি হবে তার ঠিক নাই। দুইটার সময় অফিস হইতে চলিয়া যাইবার সময় ত্রৈলোক্য আমাকে বলিল, "আমার বাসায় সন্ধ্যার সময় যাইবে, ঐখানেই ভোজন ও শয়ন হবে। আমার মেয়ে-ছেলে নাই, একাই আছি।" "আচ্ছা" বলিয়া আমি পুলিশ-ক্লাবে চলিয়া গেলাম। বৈকালে ৫ টার সময় দেখি, ত্রৈলোক্য নিজেই গিয়া হাজির। কতকক্ষণ বসার পর বলিল, "চল ৺ঈশানেশ্বর শিবঠাকুরের দর্শন করিয়া শ্যামসাগরের তীরে বেড়াইব।" আমরা উঠিলাম। সঙ্গে প্রেমবাবুও চলিলেন। গুরুজীর বিষয় নানা কথা বলিতে বলিতে আমরা ৺ঈশানেশ্বর শিবঠাকুরের মন্দিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। বাহিরে জুতা রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ৺শিবঠাকুরকে দর্শন করিলাম, ঠাকুরের মাথার উপর পর্য্যন্ত ফণা বিস্তার করিয়া একটি সর্প দাঁড়াইয়া আছে, বেশ নির্জ্জন স্থান, সম্মুখে বৃহৎ শ্যামসাগর পুষ্করিণী, চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত রাজপথ চারিদিকে নানাজাতীয় বৃক্ষ, বিস্তৃত স্বচ্ছ জলরাশি পুষ্করিণীর মধ্যে থাকিয়া কি শোভা ধারণ করিয়াছে! পুষ্করিণীর উত্তর ধারে সাধু-সন্তদিগের থাকিবার আশ্রয় একটি লম্বা খড়ের ঘরের চালা ঘর। (এখন পাকা হইয়াছে শুনিয়াছি।) তথায় ২/৫ জন সাধুবেশধারী আশ্রয় লইয়া আছেন। তা ছাড়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলেও ধুনী

জাগাইয়া ইতস্ততঃ কৌপীনধারী মহাত্মাও রহিয়াছেন। দক্ষিণে প্রশস্ত বাঁধান ঘাট, তাহার পার্শ্বে ৺রাসবিহারী ঘোষ (প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের উকিল) মহাশয়ের দোতলা বাসা বাটী। পশ্চিমে বাগান, এখন এই স্থানে প্রকাণ্ড হস্‌পিটাল ও মেডিক্যাল ইস্কুল হইয়াছে। পূর্ব্বধারে প্রশস্ত রাস্তা ছাড়া বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। ইতিপূর্ব্বে এই পূর্ব্বধারের রাস্তার নিকট জলের কিনারায় পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাত গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংসদেবের সতীর্থ স্বামী অভয়ানন্দ পরমহংস আসিয়া তিন দিন স্থিতি-লাভ করিয়াছিলেন।

মন্দিরের ভিতর ৺শিবঠাকুরের হিন্দুস্থানী পূজারী মহাশয় বহুদিন হইতে এখানে আছেন প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে ৺শিবঠাকুরের প্রসাদ কিছু কিছু ভাঙ্গ বিতরণ করিলেন। লোকটি বেশ হাসি-হাসি মুখ, বয়স প্রায় ৪৫/৪৬ বৎসর হবে। আমরা কিছু কিছু করিয়া ৺শিবঠাকুরের প্রণামী বলিয়া তাঁহাকে দিলাম।

হঠাৎ বর্দ্ধমান ষ্টেশনে একজন অপূর্ব্ব সাধু নামিয়া শহরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এই শব্দ শহরে প্রচার হইল, আমি তখন রিজার্ভ সাব্‌-ইন্সপেক্টর। সকলে সাধুর অন্বেষণ করিতে করিতে এই শ্যামসাগরের তীরে আসিয়া উপস্থিত। গৌরবর্ণ, বিস্তৃত দেহ, আজানুলম্বিত বাহু মস্তকে বৃহৎ জটাভার, ত্রিপুণ্ড্রধারী, বিস্তৃত ললাট, নাতিদীর্ঘ দাড়ি, আকর্ণ পূরিত পটল-চেরা চক্ষু—যোগিরাজ জলের অতি কিনারায় পদ্মাসনে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তন্ময় মনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট। দর্শকবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়নে একদৃষ্টে ঐ মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাষ্ঠবৎ দণ্ডায়মান, কাহারও মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নাই। প্রকৃতি যেন নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছেন, ব্যষ্টিভাবসমূহ দর্শকবৃন্দের পৃথক্ পৃথক্ দেহ হইতে দৌড়িয়া যেন সমষ্টিবিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল ঐ যোগিরাজের ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত। কে এ অপরূপ রমণীয়-দর্শন? দুইজন চেলা কোথা হইতে আসিয়া নিজেরা ধুনী জ্বালিতেছে। বৃষ্টির আশঙ্কায় শহর-দারোগা গণেশ সিং (বেনারস জেলা, ফুলপুরী থানাবাসী) ছুটিয়া আসিয়া খড়ের চালা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। সকলে মহাত্মার শ্রীমুখ দর্শন করিবার সুবিধা পাইতেছেন না। তাই কেহ কেহ ভাল করিয়া মুখ দেখিতে পাইবে বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া মুখ দেখিতে লাগিল, লোকের হাট বসিয়া গেল, পান-বিড়ির দোক্কান বসিল, সাধুর ধুনীর নিকট টাকা সিকি দুয়ানি পয়সা পড়িতে লাগিল। কেহ ডাব, কেহ সন্দেশ, রম্ভা, যাহার যা-মন, সাধুর সেবার জন্য আনিয়া ফেলিতে লাগিল, সাধুর দৃষ্টি সেই একইভাবে আবদ্ধ, লক্ষ্য একদিকে, অন্য কোন দিকে চাওয়া নাই, ধীর ও স্থিরচিত্তে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীর ভাবে সমাসীন রহিয়াছেন। বিশাল উদর, উঠা নাই, সন্ধ্যা নাই, পূজা নাই, রাত্রি ৮টা হইল, তথাপি ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। রাত্রি যত বেশী হইতে লাগিল দর্শকবৃন্দ ততই কমিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত থাকিলাম, লোক নাই বলিলেই হয়, তখনও

সাধুর সেই এক ভাব। খাওয়ার চেষ্টা, কি কোন দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ, কিছুই নাই—'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্'। কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেলাম, মনে করিলাম, প্রাতে আবার আসিব। গুরুজীর শ্রীমুখে এই স্বামীজির কথা শুনিয়াছিলাম। দেখি নাই, কি প্রকারে জানিব ইনিই তিনি। প্রাতে আসিয়া দেখি, যে ভাবে দেখিয়াছিলাম ঠিক সেই এক ভাব, চেলাদিগকে জিজ্ঞাসায় বলিল, রাত্রি প্রায় ২টার পর তাঁহারা চলিয়া যায়। দেখিলাম একই ভাবে আছেন, যেখানের দ্রব্য সেইখানেই রহিয়াছে। সাধুও নিশ্চল, তিন দিবস কোলাহলপূর্ণ জনতার ভিতর ছিলেন, কিন্তু কেহ স্নান, ভোজন, সন্ধ্যা, পূজা কিংবা মলমুত্র পরিত্যাগ, কিছু দেখেন নাই। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। শেষ দিবস গুরুজী আসিয়া দেখা করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মাত্র হইয়াছিল। সমস্ত পয়সা টাকা খাদ্যদ্রব্য যথাস্থানে রহিল। তিনি আসন উঠাইলেন। ষ্টেশনে পৌঁছিলে কত লোক কত জায়গার টিকিট কিনিয়া কমণ্ডলুতে ফেলিয়া দিল। কোথায় যাইবেন, তাহা কেহ জানে না। গাড়ী আসিল, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল না। গাড়ী পশ্চিম মুখে ছুটিল। গুরুজীর নিকট শুনিয়াছি, উনিই অভয়ানন্দ স্বামী।

শ্যামসাগরের পশ্চিম ধারে একটি ছোট বাঁধান ঘাটে বসিয়া ত্রৈলোক্যের সঙ্গে গুরুজীর বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ত্রৈলোক্য বলিল, "ভাই, আজ সব বলি দাদা-তোমাকে, উপর্য্যুপরি বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে দেখিয়া আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই যে, তুমি কি উপায়ে উদ্ধার পাইলে। অনুসন্ধানে জানিলাম তুমি মধ্যে মধ্যে গুষ্করায় যাও, তথায় এক সাধু আছেন, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিতেছেন। শুনিয়া তুমি ছুটিতে যাওয়ার পর আমরা তাঁহাকে দেখিতে যাই। আমার দুই তিন বারের পর গিয়া তাঁহাকে তোমার বিরুদ্ধে দুই এক কথা বলিলে তিনি বলিলেন, উপেন্দ্রের সম্বন্ধে কেহ কিছু বলো না। যদি বল, তোমরা এখানে এস না।' আমরা শুনিয়া অবাক্। তাহার পর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে বলেন, না বলিবার পূর্ব্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম, তুমি ছুটি হইতে আসিলে নিজেই তোমার সঙ্গে আলাপ করিব।" তাহারা গুরুজীর আশ্চর্য্য শক্তি ও অকৈতব ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছে, বলিল। দুই-একদিন পর দুইজনেই বিকালের গাড়ীতে শ্রীগুরু দর্শনে গুষ্করা গমন করিলাম, গাড়ীতে উঠিয়া উভয়েই নিস্তব্ধ। গাড়ী খানা জংসন পার হইয়া গেল। বনপাশ ষ্টেশন পার হইবার পর অতি সূক্ষ্মভাবে পদ্মগন্ধ আসিতে লাগিল। উভয়েই তাহা পাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ গাড়ী-ভর্ত্তি গন্ধ। আরোহীরা সকলেই তাহা পাইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছে, নিকটে কি পুষ্করিণীতে পদ্ম ভরা আছে। আমরা হাসিতেছি, বলি, "হাঁ মহাশয়, গুষ্করায় পদ্মগন্ধের পুষ্করিণী নহে—দীঘি আছে।" আমরা যাইবার পূর্ব্বেই আশ্রমের সাহানি নামক চাকরকে

গুরুজী বলিয়াছেন, "ত্রৈলোক্য ও উপেন্দ্র আসিতেছে। কেদারকে, (কেদার মোদককে) বল, তাহাদের জল-খাবার প্রস্তুত করে।" বলিয়া কপাট বন্ধ করিয়া সন্ধ্যায় বসিয়াছেন, আমরা পৌঁছিলাম, সাহানি চাকর হাসিতে লাগিল। বলিল, গুরুজী আপনাদের জল-খাবার প্রস্তুত করাইবার জন্য বলিয়া সন্ধ্যায় বসিলেন। কেদারের চাকর আমাদের জন্য কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া জল খাইতে দিল। বাবাজী উঠিলে খাইব বলিয়া রাখিয়া দিলাম। বসিয়া আছি, দুই-চার জন গুষ্করার লোক গুরুজীকে প্রণাম করিতে আসিলেন। তাঁহারা আমাকেই চিনিতেন, ত্রৈলোক্যের পরিচয় করাইয়া দিলাম। দেখিতে দেখিতে গুরুজী কপাট খুলিয়া বাহির হইলেন। সকলেই একে একে প্রণাম করিলাম। তিনি দ্বার দেশে পূর্ব্ব-পরিচিত তক্তাপোষে বসিলেন। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম। আমি পাখা করিতে লাগিলাম। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জল খাইতে আদেশ করিলেন, আমরা কচুরি, মিহিদানা দিয়া জল খাইয়া নিকটে বসিলাম। গুরুজী তামাক খাইতে খাইতে ত্রৈলোক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপেন্দ্রের কি কোথাও বদলি হইয়াছে?"

ত্রৈলোক্য। না বাবা, কোথাও হয় নাই।

গুরুজী। উপেন্দ্রের মন্তেশ্বর থানায় বদলি হলে ভাল হয়।

ত্রৈলোক্য। তথায় পাকাভাবে দারোগা একজন আছে, খালি নাই।

গুরুজী। খালি হবে, উপেন্দ্রকে সেইখানেই দিও।

বদলি হইবার পূর্ব্বেই, ভগবান আমার বদলি করিয়া দিলেন। কোথা সাহেব—কোথা বা পাকা দারোগার থাকা, কাহার হুকুম কে দেয়, ত্রৈলোক্য চুপ করিয়া আছেন। গুরুজী জল খাইবার জন্য উঠিয়া গেলেন। বলিলেন, "তোমরা বস, আমি জল খাইয়া আসি।"

ত্রৈলোক্য। হাঁ দাদা, কিছু বুঝি না, তোমার বদলি মন্তেশ্বরে কি করে হবে? নতুন সাহেব তোমাকে চেনে না, পাকা দারোগাকে সরিয়ে কেন তোমাকে দিবে?

আমি। ত্রৈলোক্য, তোমার মনে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় যে আমার মন্তেশ্বরে বদলি হবে না? ভাই, তুমি স্থির নিশ্চয় জেনো, কাহারও সাধ্য নাই যে ঐ বদলি বন্ধ করে। উহা নিশ্চয় হইয়া আছে, হাতে হাতে দেখিবে।

ত্রৈলোক্য। আচ্ছা দেখি।

আমি। তবে আজ প্রায় দুই মাস কি জন্য আসা যাওয়া করিতেছ? শুধু লুচি-কচুরি ফল মিষ্টান্ন সেবা দিতে না কি হে?

ত্রৈলোক্য। কি জানি দাদা, এখন পর্যন্ত ঠিক করিতে পারি নাই। যদিও দুই একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি যায় নাই।

উপন্দ্রে। ভাই, উহা কি এত সোজা যে শীঘ্র শীঘ্র হবে? তোমার দোষ নাই, বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া বড়ই কঠিন তপস্যা-সাপেক্ষ। বিশ্বাস কি সহজ কথা দাদা? তাঁহার দয়া।

ত্রৈলোক্য। দয়া কি আপনিই হয়?

উপেন্দ্র। দয়া ত হয়েই আছে। উনি বলেন। তবে দয়া বোধে আনা শক্ত, উহা কর্ম্ম-সাপেক্ষ।

এমন সময় গুরুজী আসিলেন। আমরা শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। তিনি আসনে বসিলেন। বলিলেন, "কি গো, তোমাদের কি-সব বিচার হচ্ছে?"

আমি। বাবা, ত্রৈলোক্যের সঙ্গে বিশ্বাসের কথা হচ্ছিল।

গুরুজী। বিশ্বাস কি সহজে হয়, বাবা। বিশ্বাস দৃঢ় হলে ত সবই হল। কত তপস্যায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়। এই দেখ তুমি এত কাঁদ, তোমার বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য কত প্রকার জিনিষ প্রত্যক্ষ করাইতেছি, কিন্তু তবু তুমি পরীক্ষা করিতে গিয়া আমার আদেশের বিপরীত কার্য্য করিয়া কত বড় বড় বিপদে পড়িতেছ। তবু ত ছাড় না। সংস্কার নষ্ট হওয়া সময়-সাপেক্ষ। নষ্ট হবে বাবা, কারিকরের হাতে ঠিক ঠিক পড়লে সোজা হয়ে যাবে। পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজে কষ্ট পাও, আমাকেও কষ্ট দাও। তাতে তোমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হচ্ছে, তাই বাধা দিই না। ওতেও তোমার বিশেষ মঙ্গল আছে।

ত্রৈলোক্য। অবিশ্বাস এলে, গুরুর আদেশের বিপরীত কর্ম্ম করিলে, ত অধোগতি হয়।

গুরুজী। না, ওর তা হবে না, ওর বিশ্বাস আছে, বিপদে পড়িলে শ্রীগুরু রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাস ওর আছে, তাই ওকে নিয়ে আমি খেলা করি, দুর্ব্বল চিত্তের লোক হলে যা বল। ও সে দুর্ব্বল নয়। সেদিন অন্ধকার রাত্রি, ঝড়-বৃষ্টি, গুষ্করা ষ্টেশন হইতে এখানে আসা বড়ই কষ্ট কিন্তু ও বিপদকে গ্রাহ্য না করিয়া, সাপের মুখে ভূতের মুখে নির্ভীক চলিয়া আসে ত! একেই একাগ্রতা বলে। বাপু, চোর হোক, ডাকাত হউক, পারা খুনে হউক, যায়—যদি চরিত্র ভাল হয়, যদি পরস্ত্রীতে মাতৃ-বোধ থাকে। তাদের স্রোতের মোড় ফিরিয়ে দিলেই হয়। তাদের ভিতরে যে-কোন পথ অবলম্বন করিয়া হউক একটা বেশ একাগ্রতা থাকে ত। তাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও ধারাল। যাদের খস্‌খসে বুদ্ধি তাদের কোন জন্মে কিছু হবার নয়। তোমরা নিজের নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন ক্রমশঃই বুঝিবে।

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময় আমাদের জল-খাবার আনা হল। আমরা খাইতে বসিতেছি, এমন সময় গুরুদেব বলিলেন, "কৈ আমি যে প্রসাদ রাখিয়াছি কোথা তাহা?" প্রসাদ আসিল, আমরা সেবায় বসিলাম। প্রভু স্বহস্তে বিতরণ করিতেছেন। প্রথমে রম্ভা ইত্যাদি ফল, তাহর পর লুচি, কচুরী, পটল ভাজা, তরকারী, বরফী, গজা, মিহিদানা, ক্ষীর দিয়া আমাদের খাওয়াইলেন। আমরা হাত মুখ ধুইয়া পান চিবাইতে শিষ্ট বালকের ন্যায় নিকটে বসিলাম।

গুরুজী। উপেন্দ্র, মন্তেশ্বরের থানায় গিয়া বগুল আশ্রমের দিকে লক্ষ্য

রাখিবে। ইট হইতেছে না, উহার কার্য্য বন্ধ আছে, সব দেখে শুনে করিও। মন্তেশ্বর থানার জল ভালো গো। আমাদের বাড়ি বগুল ঐ থানার এলাকায়। ভাল ইট আনাবে। আর যা যা করতে হবে, দেখে শুনে করো, করোগেট রোহিণী কলিকাতা হতে পাঠাবে, কাটোয়ায় খুদুকেও লিখেছি।

খুদু বাবু গুরুভাই। তাঁহার ভাই রাধাবল্লভ বাবু মনিপুরে সৈন্যবিভাগে রসদের ঠিকাদারী করে অনেক পয়সা টাকা উপায় করেছেন। বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ায় খুব ঘর-বাড়ি করেছেন। তাঁহারা গুরু ভাই। বাবাজী পাঁচ-সিকা পয়সা দিয়া লক্ষ টাকার ফর্দ্দ করিলেন। আমি বলিলাম, "পয়সা কোথা?"

গুরুজী। পয়সার অভাব কি রে, তোরা থাকতে টাকা বৃষ্টিপাতের মত বর্ষণ হবে।

গুরুজী। দাদা গুরুদেবকে এত অনুনয় করে বলেছি, আমি আশ্রম করিব না, ৺শিব প্রতিষ্ঠা করিব না, কিন্তু কি তাঁহাদের অভিপ্রায়, তাঁরা কিছু শুনিবেন না। টাকা-কড়ি যাহা ছিল, তাহাও লইলেন। জ্যোতিষালোচনা বন্ধ করিলেন। আবার বলেন, 'আশ্রম কর, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কর।' কি করি বাপু বল দেখি। তোমরা যাও, ঘরে বিছানা হয়েছে, শোও গিয়া।

আমরা গিয়া শুইলাম, রাত্রি দুইটার সময় দেখি, তাঁহার ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে।

ত্রৈলোক্য। উপেন্দ্র দেখ, ঐ প্রকারে পার্‌বে। ত্যাগ দেখ, উগ্র তপস্যা দেখ।

ত্রৈলোক্যকেও নানা বিষয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু ত্রৈলোক্য কিছু চাপা, সব কথা বলে না। আমি কৌশলে বুঝিলাম, তাহাকেও বিশেষ ভাবে কৃপা করিয়াছেন। আমার সঙ্গে ত্রৈলোক্যের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, কড়্‌ডে খাঁকি বাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাদের অপূর্ব্ব ত্যাগ ও একনিষ্ঠ তপস্যার বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল।

ত্রৈলোক্য। তুমি জান রামকৃষ্ণ পরমহংসের গুরু কে?

আমি। না ভাই জানি না, তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম, অদৃষ্টে না থাকলে হয় না। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার না থাকলে হবার নয়। উনি কি একজন্মে ঐরূপ সাক্ষাৎ মায়ের সঙ্গে কথা কহিবার পাত্র হয়েছেন! কত জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করিয়া আসিতেছেন। ভগবানের সঙ্গে, মা আদ্যাশক্তির সঙ্গে, মানুষের মত কথা কহা কি সহজ ব্যাপার হে, ভাই? শান্ত সচ্চিদানন্দ, অসীম নিরাকার ব্রহ্ম কি অপূর্ব্ব একাগ্রতা ও ত্যাগ, কি একটানা ভালবাসার গুণে বশীভূত হইয়া ভক্তের জন্য রূপ ধারণ করেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মস্তিষ্কের লোকের পক্ষে উহা কি সম্ভব, ভাই? তবে শ্রীগুরুর কৃপা হলে সবই হয়।

ত্রৈলোক্য। কৃপা করিলে হয়, কিন্তু কি করিলে কৃপা হয়!

আমি। কৃপাময়ই জানেন। শ্রীগুরুর মুখে শুনিয়াছি, শ্রীগুরু ও ভগবানের কৃপা ত রয়েছে, উপলব্ধি কে করে। তাঁর কৃপা অনুভূতিতে আনতে হলে বিধির বিধান মেনে চলতে হয়। গুরুদেব একদিন বলেছিলেন, 'জগৎ সচ্চিদা-নন্দময়, ভূত ভাবলেই ভূতে ঘেরে লয়।' ভাই, যে যা ভাবে হরি তাঁকে তাই দিয়ে থাকেন। ভূত ভাবলেই ভূত, হরি ভাবলেই হরি আপন হন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ বালক ছিল, কিন্তু ভূত ভাবে নাই, নির্ব্বিকার মনে 'হা মধুসূদন, পদ্মপলাশ লোচন' 'হা হরি' বলে কত ডেকেছিল, কত কেঁদেছিল। অনাহারে, অনিদ্রায় বিপদ-সমুদ্রের ভিতর শ্রীহরির রূপ চিন্তা করে জালে হড়হড় করে মাছ টেনে আনার মত ব্রহ্ম সমুদ্র হতে নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার করে টেনে এনে ছেড়ে ছিল। আহা, গুরুদেবের এই কথাটি আমার হৃদয়-মাঝে আঁকা রয়েছে।*

কিন্তু ভাই চিঁড়ে ভিজে না। যা যা করলে ভগবৎ লাভ হয়, তা তা ঠিক ঠিক ভাবে করতে হয়।

ত্রৈলোক্য। তবে কর না কেন?

আমি। সামর্থে কুলায় না যে দাদা। শ্রীগুরু শক্তি দিলে হবে। পরে দেখবে, আমিও কি হই, তখন তোমায় ভাল করে চেলা করব।

ত্রৈলোক্য। তুমি ত দাদা চেলা হয়েই আছ।

ভোর হইয়া গেল। আমরা মুখ হাত ধুইবার জন্য নদী-তীরে গেলাম। আসিয়া দেখি, প্রভু উঠিয়াছেন। আমরা প্রণাম করিলাম, স্নান-জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছি।

গুরুজী। ভাল করে জল খাও।

সন্দেশ, আম সেবা করিয়া উভয়ে পদধূলি লইয়া বর্দ্ধমান চলিলাম। সেই দিন অফিসে গিয়া শুনিলাম, আমার বদলির হুকুম হয় নাই। বৈকালে শুনিলাম,

---

*একদিন ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার বেশ মনে হয়, বরিশাল জেলার দেশবিখ্যাত ও পূজ্য বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত যখন মানভূম জেলার ধানবাদ মহকুমার গোবিন্দপুর নামক স্থানে জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আসিয়াছিলেন, আমি তখন ধানবাদে ইন্সপেক্টর্ ছিলাম। প্রায় তাঁহার নিকট যাইতাম, তিনিও আমায় ভালবাসিতেন। বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ঐ স্থানে স্কুল-ইন্সপেক্টর্ ছিলেন। একদিন গীতা পাঠ হইতেছিল। কথা-প্রসঙ্গে আমি গুরুদেবের ঐ উক্তি—'এ জগৎ সচ্চিদানন্দময়—ভূত ভাবলেই ভূতে ঘেরে লয়' এই কথাটি বলিবামাত্র অশ্বিনীবাবু একটু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন,—"হাঁ হে, এযে বড় জবর কথা দেখছি, তুমি ত কম নও। শুধু পুলিশ নও। এ অতি উত্তম কথা। এক কথায় সবই আছে। ও ভাবকে ধরে কে?" বলিয়া নোট বহিতে ঐ কথা লিখিয়া লইয়াছিলেন। একদিন ভালবেসে বলেছিলেন, তুমি আসবে, তোমায় দেখতে মন চায়।" আমি তথায় গেলে তিনি ও তাঁহার গুণময়ী ভার্য্যা আমাকে উপাদেয় দ্রব্য দিয়া নিকটে বসিয়া ভোজন করাইতেন।

তথাকার দারোগা বিনোদবিহারী উপাধ্যায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছে।

ত্রৈলোক্য। তোমার বোধ হয় মন্তেশ্বর থানায় বদলি হয়।

আমি। কেন হে।

ত্রৈলোক্য। শুনিতেছি বিনোদ উপাধ্যায়—দারোগা ছুটি লইবে। অসুস্থ হইয়াছে।

অপরাপর সকলে চলিয়া গেল।

আমি। ভাই দেখ, কোথা থেকে কি হয়। তোমার এখনও বোধ হয়' গেল না। কেমন হে, নিশ্চয় বলতে পার না?

ত্রৈলোক্য। যতক্ষণ না হয় কি করে বলি।

আমি আমরা অন্ধ, ঘোর অবিশ্বাসী, তাই সর্ব্বদাই সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া বেড়াই। গুরুদেব কি বলিলেন মনে নাই?

ত্রৈলোক্য। হাঁ, আছে বৈ কি।

আমি। তবে কেন ও কথা বল।

ত্রৈলোক্য। বলায় তাই বলি।

আমি। কে বলায়?

ত্রৈলোক্য। মন বলায়।

আমি। মন তোমার কে হে। তুমি মনের, না মন তোমার? তুমি মনের, তাই তোমার অবিশ্বাস। সন্দিগ্ধ মনকে নিজের করলে ও ভাব থাকে না। কথায় বলে, যার মন ঠিক তার সব ঠিক। আমার বদলি কার সাধ্য বন্ধ করে।

ত্রৈলোক্য। দেখা যাক।

পরদিন অফিসে গিয়ে শুনি, আমার বদলি হয়েছে। ত্রৈলোক্য বলিল, সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া হুকুম দিয়াছে।

আমি। ভাই দেখলে, কার হার হয়েছে?

আমার সঙ্গে সেই সময় আমাদের গ্রামের শশিভূষণ অধিকারী নামে একজন জিতেন্দ্রিয় সৎ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। মন্তেশ্বর যাইবার পূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণ সহ আমি গুষ্করায় বাবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সন্ধ্যার সময় পৌছিলাম তখন ঘরের কপাট বন্ধ। আমরা বঙ্ক সাধুর দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছি, দরজার কপাট খোলার শব্দ পাইয়া তথায় গেলাম, গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম। তাঁহার গাত্রে অত্যন্ত ঘাম দেখিয়া পাখা করিতে লাগিলাম।

গুরুজী। তোমার বদলি হইয়াছে?

আমি। আজ্ঞে হাঁ হয়েছে, তাই দেখা করতে এলাম।

গুরুজী। কবে যাবে?

আমি। দুই তিন দিন মধ্যে যাব মনে করছি।

গুরুজী। তাই যাও, দেরী করে কাজ নাই।

আমি। বাবা, বদলি ত আপনি অনেক দিন করেছেন।

গুরুজী। হাঁ, ভগবানের ইচ্ছায় সবই হয়, বাবা। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে জীব স্বীয় ইচ্ছা সমসূত্রপাতে আনিতে না পারায় জগৎ অন্ধকার দেখে। জীব মনে করে 'সবই আমি করিতেছি'। তুমি মনে কর আর না কর তোমার যে নিশ্বাস বয়, তা বন্ধ হয় কি? মনে করি নাই, তাই নিশ্বাস বন্ধ হয়েছে—এ কথা কি হয়? সে নিজের কাজ করে যাবে। কে তাকে চালায়, বাবা?

আমি। কি করলে সব জানা যায়, বাবা? আপনার এই সকল দেখে শুনে মনে হয় কি করে আমরা ঐ রকম হব!

গুরুজী। হবে, তাঁর কৃপায় সবই হয়। একটু চরিত্র ঠিক রাখিয়া শঠতা না শিখিয়া সরল মনে ডেকে চলে, সব হবে। শাস্ত্র তাই বলে গো। ত্রৈলোক্য কেমন আছে?

আমি। ভাল আছে।

গুরুজী। সে এল না কেন?

আমি। তাঁর কি জরুরী কাজ পড়েছে, তাই আসতে পারলে না।

গুরুজী। দেখবে তোমার সঙ্গে কেমন তার মেল হবে—তোমাগত প্রাণ হবে।

একটু পরেই সেবা করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। ঐ দিন তাঁহার অন্যতম ভক্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ৺কালিদাস ঘটক মহাশয় বাবাজীর সেবার জন্য তাঁর বাড়ি হইতে নানা রকম খাবার দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাবাজী যাইবার সময় বলিলেন, উপেন্দ্র, আজ এসেছে ভাল, আজ দেখবে কত রকম জিনিষ খাবে। ঘটক মহাশয় পাঠিয়ে দিয়েছেন।" দেখিতে দেখিতে ঘটক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত।

ঘটক। এই যে উপেন্দ্রবাবু কখন?

আমি। এই সন্ধ্যার গাড়ীতে।

ঘটক। (বাবাজীকে সম্বোধন করিয়া) এই যে এঁরা এসেছেন, আরও বেশী বেশী জিনিষ আনি।

গুরুজী। না, দরকার নাই, ওই ওতেই হবে। অত কে খাবে?

প্রভুর সেবা হল, তামাক সাজিয়া দিলাম। আমি পদ-সেবা করিতেছি, কোন দিন পদ-সেবা করিতে ভুল হলে পা বাড়াইয়া দিতেন। আমি তাঁর সেবা করিয়া নিষ্পাপ হই। শরীরের মধ্যস্থ গ্লানি দূর করিবার জন্যই এত আয়োজন। সেই সময় টোলের অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম তিনি রাত্রে বাবাজীর নিকট প্রায় থাকেন।

গুরুজী। এই যে ভট্টাচার্য মহাশয় এসেছেন, তাঁর জন্য ভাগ রেখো, অনেক দ্রব্য আছে, কেলেকে ডাকা হউক।

ভট্টাচার্য। খাবার কে দিলে?

গুরুজী। ঘটক মহাশয়ের বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ভট্টাচার্য। বেশ বেশ, দেখুন আপনার আড্ডায় এলে সব রকমই মিলে,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

গুরুজী। কেন গো?

ভট্টাচার্য্য। দেখুন শাস্ত্রালোচনাও প্রত্যক্ষভাবে দেখা—এমন আর কোথাও শুনি নাই। তার পর সেবা—এমন সেবার জুত বাবা দেখি না। ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেবা পেলেই সন্তোষ।

গুরুজী। দেখবেন ভট্টচার্য্য মহাশয়, যেন সেবা-অপরাধ না হয়।

ভট্টাচার্য্য। দেখুন আমাকে এক-আধটু শিক্ষা দেন, যখন আপনার এখানে আসি আমি মনে মনে করি, উনি ত বেশ আছেন, আমিও ঐরকম হতে চেষ্টা করব। কিন্তু আবার দেখি মনটা যেমন ঠিক তেমনই, কি করি বাবা।

গুরুজী। কেন আপনি ত বেশ আছেন। ব্রাহ্মণের সবই ত করছেন। শাস্ত্র পাঠ, টোলে ছাত্রদিগকে সৎশিক্ষাদান, পূজা-সন্ধ্যা সবই ত করছেন। তবে বেশ নাই কেন বলছেন?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, তা বটে, কিন্তু চাকরি স্বীকার করেছি, পরাধীন হয়েছি। স্বাধীন না হলে কি ঠিক ঠিক হয়। আনন্দ ত পাই না।

গুরুজী। দেখুন, ভগবান যা করেন ভালর জন্য—ও সবও ত চাই। আপনার দ্বারায় ঐ রকম কাজ করান তাঁর দরকার, তাই করাচ্ছেন। ওতে দ্বিধা আনা ঠিক নয়। আবার যখন অন্য রকম করান দরকার হবে, তিনিই মোড় ফিরিয়ে দিবেন। তিনি যাঁকে যে কর্ম্মে রাখেন, একাগ্রতাসহ তাতে থাকলে তিনি প্রোমোশন্ দেন, আর ঠিক-মন না থাকলে দণ্ড দেন।

ভট্টাচার্য্য। ঠিক করলে উত্তম যোগী হওয়া যায়।

গুরুজী। "সাধ হয় বৈষ্ণব হতে, পোঁদ ফাটে মচ্ছব (মহোৎসব) দিতে"। জানেন, যোগী হতে হলে ঠিক ঠিক ভাবে সাধন করতে হলে, বড় কষ্ট স্বীকার করতে হয়। অধিবাস সহ্য করাই দায়। বাঘের অধিবাসের গল্প জানেন? এই বলিয়া ব্যাঘ্রের বিবাহের একটি সুন্দর গল্প বলিলেন।

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা, যে যা চায় সে তা পায়। এটি কি ঠিক কথা?

গুরুজী। হাঁ খুব ঠিক। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। পণ্ডিত হয়ে আবার ভুল করছেন যে।

ভট্টাচার্য্য। আমরা মুখে পণ্ডিত। লোককে বলবার বেলা খুব—যেন ব্যাস,

বশিষ্ঠ; কিন্তু কার্য্যকালে দেখি, আর এক রকম। যে ভাগ্যবান্ আপনার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বাল্যকাল হ'তে ত্যাগী, অনুরাগী, তাহারাই ঠিক জানতে পারে। এই আমরা ছাত্রদিগকে এত জ্ঞানের উপদেশ দিই, কিন্তু তাতে কি হয়?

গুরুজী। দেখুন আপনারা ঐটি ভুল করেন। অজ্ঞানীকে কিছুতেই জ্ঞানমার্গের উপদেশ দিবেন না। তাহাদিগকে 'তুমিই ভগবান্' এমন শিক্ষা দেওয়া ঠিক নয়, কারণ তাহা হইলে বাল্যকাল থেকে তাদের কর্ম্মে অশ্রদ্ধা হয়। আর অজ্ঞানী কর্ম্ম না ক'রে শুধু জ্ঞান-আলোচনা করলে নিতান্ত পাপাচারী হয়ে উঠে। তাহাদিগকে কর্ম্মের উপদেশ দেওয়াই ভাল, যাতে নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন আত্মোন্নতি হয় না, যেমন বিকারগ্রস্ত রোগীকে কি ভূতে পাওয়া লোককে হাজার বলুন যে, 'তুমি বিকারী রোগ নও হে, তোমাকে ভূতে পায় নাই, সে কিছুতেই তা ধরবে না, শুনবে না। একজন একাগ্রতা সহকারে গাড়ুর বিষয় চিন্তা করতে করতে গাড়ুর ভাব পায়, যে স্থানে বসেছিল সেখানে থেকে আর উঠে না, কেন জিজ্ঞাসা করলে কথা বলে না। কেবল বল্ত, "ঢক্ ঢক্—যেন গাড়ু হতে জলে বের হচ্ছে; এমনি সংস্কার। তাই অধিকারী দেখে শিক্ষা দিলে মূলে ভুল হয় না, মঙ্গল হয়।

রাত্রি অনেক হল। খাবার প্রস্তুত ছিল—সমস্ত দ্রব্য আনা হল। প্রভু সম্মুখে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। লুচি মাল্‌পো, তরকারী ছানার সন্দেশ, ক্ষীর, মিহিদানা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি নানা দ্রব্য দিয়া ভোজন করা গেল। আমরা মুখ হাত ধুইয়া পান খাইতে খাইতে তাঁহার নিকট বসিলাম। একটু পরে বলিলেন, "যাও ঘুমাও। আবার রাত্রি থাক্‌তে উঠতে হবে।" আমরা বারেণ্ডায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। গুরুদেবের আহার বালকের ন্যায়—দুই একটা লুচি, একটু মিষ্টান্ন, অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধ। নিদ্রা ত নাই, সমস্ত রাত্রিই ভগবদারাধনায় যায়। বড় গরম, ঘুম হয় না, বসিয়া আছি, নিকটে আসিয়া বসিলেন।

গুরুজী। ঘুমাও নাই যে?

আমি। বাবা, ঘুম হয় নাই। বড় গরম।

গুরুজী। তোমার সঙ্গী লোকটি ত বেশ নাক ডাকাচ্চে। ওরা খেতে ঘুমতেই এসেছে। দেখ, সংসার কত রকম নিয়ে। রকম বলেই তো সংসার। যে স্থানে রকম নাই, সেই স্বর্গ রে, বাপু। অনেক লোক এখানে আসতে আরম্ভ করেছে। তারাপ্রসন্ন বাবু (গুষ্করার জমিদার) বলেন যে, এত লোক ভোলানাথের নিকট কি করতে আসে, তাঁর মনে মনে হিংসা এসেছে, বাপু। বলব কি? উঁহার পত্নী গেল, ছেলে গেল, "বিবাহ করব না' ব'লে নদীর ধারে আশ্রম করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, উহা বৈরাগ্য নয়, উহা শ্মশান-বৈরাগ্য—হটকা বান, থাকবে না। আবার কি করি, পশ্চিমে তাঁদের (দাদা গুরুর) নিকট গেলাম, ফিরে এসে বিবাহ দেওয়া গেল।

বলিলাম, তোমার স্ত্রী মরবে না, আবার পুত্র হবে। তাই হল গো, ঐ ধনেশ্বর ছেলেটি হল, তবু অবিশ্বাস বাপু। ওঁর স্ত্রীর খুব বিশ্বাস, খুব সাধ্বী স্ত্রী, বড় ভাল বৌ, সংসার যাবার নয়। ওঁর পিতা ৺হরিশ্চন্দ্রচংদার মশাই ভাগ্যবান্ লোক ছিলেন। দয়া-ধর্ম্ম ছিল। ধন-সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য তিনিই করে যান—এ সব ঘুচাবে।

প্রায় ভোর হয়ে এল, হঠাৎ উঠিয়া স্নান করিতে গেলেন, আসিয়া পূজায় বসিলেন। আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণটিকে উঠাইয়া মুখ হাত ধুইতে গেলাম।

ব্রাহ্মণ। তুমি এখানে এত আসো কেন?

আমি। আমার আসতে ভাল লাগে, তাই আসি। ভাল না লাগলে আসব কেন, আপনি ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

ব্রাহ্মণ। আমার ভাল লাগে না।

আমি। কেন, এখানে গুরুগিরি কর্ত্তে পান না, তাই ভাল লাগে না। দেখুন আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেহ সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। তাঁর তপঃপ্রভাবে অনেক শক্তি হয়েছিল। তাই আলোর কাছে যেমন পোকা, আলোর জ্যোতিতে মুগ্ধ হয়ে আসে, তেমনি বহু লোক আসিত। আলোর নিকট মরিবার জন্য পোকা আসে, আর মহাপুরুষদের নিকট শান্তি পাবার জন্য লোক আসে। তাই আপনার পূর্ব্বপুরুষদের শক্তিতে আনন্দ পেয়ে অনেক লোক শিষ্য হয়েছিল, এখন সেইটি আপনাদের জমিদারী হয়েছে, জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা শিষ্যের কি উপকার ও আত্মোন্নতির চেষ্টা করছেন, বলুন।

ব্রাহ্মণ। না, তা বলি না। তবে আমার ভাল লাগে না, তাই বলছি।

আমি। পরে দেখবেন খুবই ভাল লাগবে। আপনাকেও ঐ পদ আশ্রয় করিতে হইবে, ইহা যেন স্মরণ থাকে।

আমরা আশ্রমে ফেরত আসিয়া বসিলাম। ব্রাহ্মণ শশীবাবুর মুখ একটু ভার-ভার দেখিয়া বলিলাম, "মশায়, চট্‌লেন না কি?"

ব্রাহ্মণ। না, চট্‌ব কেন? বলি, ট্রেণের সময় হল, যাবে না?

আমি। উনি না উঠিলে যাইব না।

ব্রাহ্মণ। যদি ট্রেণ ফেল হও?

আমি। কোনদিন হই নাই, হব না। আর যদি ফেলই হই, জলে ত পড়ি নাই, সে ত ভাল হয়, আরও দুই পাঁচ ঘন্টা নিকটে থাকিতে পাই।

ব্রাহ্মণ। তোমাকে পারব না। তাই ভাল!

এমন সময় মহাবিষ্ণু চংদার মশায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়াই দূর হইতে আমাকে দেখিয়া বলিলেন "এই যে, আপনি কখন?" এঁর ছেলেরই অসুখ হয়েছিল, গুরুদেব আরোগ্য করান।

আমি। কাল সন্ধ্যার ট্রেণে এসেছি।

মহাবিষ্ণু। এখন কোথায় আছেন?

আমি ছুটিতে ছিলাম, মন্তেশ্বর থানায় বদলি হইয়াছি, তাই প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

বিষ্ণুবাবু। আপনার বিশ্বাস ও গুরুভক্তি আশ্চর্য্য। আমরা ও রকম পারি না। আমাদের ঘরে শালগ্রাম, তবু দুই বেলা আসিতে পারি না। ইনি (গুরুদেব) উঠেন নাই?

আমি। না, উঠেন নাই। আপনার ছেলেটি কেমন আছেন?

বিষ্ণু। হ্যাঁ ভাই তোমাদের গুরুর কৃপায় ভাল হয়ে উঠেছে।

গুষ্করার চংদার বংশের আজকাল সময় খুবই ভাল।

পূর্ব্বপুরুষ হরিশ্চন্দ্র চংদার ও গিরিশচন্দ্র চংদার বড়ই ভাল লোক ছিলেন। তাঁহারা জমিদারি রংমহল বালাখানা বার মাসে তের পর্ব্ব করিয়া গিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র চংদারের পুত্র তারাপ্রসন্নবাবু আর ৺গিরিশচন্দ্রের পুত্র মহাবিষ্ণু চংদার উভয়ে অনেক পার্থক্য। তারাপ্রসন্নবাবু খুব সংসারী, আর মহাবিষ্ণু চংদার যেন গৃহস্থ বৈষ্ণব। মহাবিষ্ণুবাবুকে দেখিলেই মনে হয়, উদারপ্রকৃতি, নির্ম্মলচিত্ত দীর্ঘকায়, হাত পা লম্বা সুগঠন। ইনি ভগবদ্ভক্ত, দয়াধর্ম্মশীল, প্রজাপীড়ক নন। শুনিয়াছি, সাধন-ভজন লইয়া থাকেন। তারাপ্রসন্নবাবু একটু গোড়া, তীক্ষ্ণবিষয়-বুদ্ধি, উগ্রস্বভাব, এক কথায় সত্ত্ব ও রজোগুণে দুই ভাইয়ের উপর পূর্ণ মাত্রায় খেলা করিতেছে। তারাপ্রসন্নবাবুর মাথা গরম হয়—অনেক চিকিৎসায় ও ঔষধ এবং তৈলব্যবহার করিয়াও ফল পান নাই। তিনি দীর্ঘনগর আশ্রমের ৺শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, যাঁর কৃপায় আমি আমার ইষ্ট লাভ করিয়াছি, সেই মহাপুরুষের নিকট গিয়া স্বীয় পীড়ার কথা উত্থাপন করিয়া কিসে ভাল হয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে ব্রহ্মচারী মশায় বলিয়াছিলেন, “উহা ভাল হবার নয়। ভাল হবে না। বাবা, ঐ ব্যাধি তোমার পরম মিত্র জানিবে। তোমাকে ঐ ব্যাধি অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে। ভগবান্ কৃপা করিয়া তোমাকে উহা দান করিয়াছেন। উহা বৃথা তাড়াইবার চেষ্টা করিবে না। ঐ ব্যাধি না থাকিলে তুমি যাহা মনে আসে তাহাই করিতে।” এই কথা শুনিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করেন। মহাবিষ্ণু চংদার মহাশয়ের অনেক সদ্গুণ আছে। গুরুদেবের কোন অসুবিধা না হয়, ইহাই তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য। তারাপ্রসন্ন বাবুর পিতা ৺হরিশ্চন্দ্র চংদার বলিয়াছিলেন, “এই শালগ্রামটি (গুরুদেবকে) যেন বাড়ীতে সযত্নে রাখা হয়। বহুভাগ্যে আসিয়াছেন, যে দিন এই স্থান ত্যাগ করিবেন, সেইদিন ওঁর সঙ্গে সব চলিয়া যাইবে। কার্য্যেও তাহাই হইতে বসিয়াছে, পরে দেখিবেন।”

গুরুদেব কপাট খুলিলেন। যেন প্রাতঃকালীন সূর্য্য উদয় হইল। সে মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণ গলে, পাহাড় টলে, মরুতে বারি দেখা দেয়। উপস্থিত সকলেই

দাঁড়াইলেন। পদধূলি মস্তকে লইলেন, কেবল আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণটি উঠিলেন না। সকলে কিছু কিছু প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেলেন, যে সকল আতুর ঔষধের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই গেলেন না। আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। দেখিয়া বলিলেন, "গাড়ির দেরী আছে। একটু তামাক কর।" আমি তামাক দিয়া পাখা করিতেছি। তখনও বেশী কথা কহিবার ইচ্ছা নাই। যেন নেশা কাটে নাই। আস্তে আস্তে বলিলেন, "জল খাওয়া হয়েছে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, বাবা।"

গুরুজী। উনি (শশী ব্রাহ্মণ)?

আমি। উনি খাবেন না।

গুরুজী। তা হলে এসো, পত্র দিও।

"যে আজ্ঞা" বলে আমি বিদায় হইলাম, বেলা প্রায় দশটার সময় বর্দ্ধমানে পোঁছিলাম। স্নান আহার করিয়া অফিসে গেলাম, বদলীর হুকুমী কাগজ লইলাম। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা করিলাম।

ত্রৈলোক্য। কি হে, কাল গুস্করা গিয়েছিলে?

আমি। হাঁ গেছলাম, তুমি গেলে ভাল হত। অনেক ভাল ভাল কথা হল, খাবার ধুম আবার তাহতে বেশী।

ত্রৈলোক্য। তুমি কাল মন্তেশ্বর যাবে?

আমি। হাঁ, কাল নিশ্চয় যাব। তিনিও কাল যেতে বলেছেন। তুমি নিকটে থাকলে, তোমার ভাগ্য ভাল, আর আমি দূরে গিয়ে পড়লাম।

ত্রৈলোক্য। দূরে থাকা ভাল, মনের একাগ্রতা, বাড়ে, সর্ব্বদা ভয় থাকে।

আমি। তাঁর কৃপা। বণ্ডুল আশ্রমের জন্য অনেক কাজ করতে হবে। তুলি তোপের মুখে থাকলে। যেদিক থেকে যে দ্রব্য আসবে তুমিই বণ্ডুল পাঠাবার ভার নিয়েছ। কাষ্ঠ কয়লা ইত্যাদি—কেমন?

ত্রৈলোক্য। সে সব আমি ঠিক করব, চিন্তা নাই।

ত্রৈলোক্য ওজনে ভারী, কথা ভারী, তার ফাঁকা আওয়াজ নহে। মুখে যা বলে, কাজে তা করে। সে হাল্‌কা থাকের লোক নহে। একবার যা ধরবে, তা ছাড়ে না, সাহেব-টাহেবকে ভয় আদৌ নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, ধীর ও মন্দ মন্দ গতিতে কাজ করে। এই ত্রৈলোক্য পরে চাকরী ছাড়িল, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে তীর্থে তীর্থে সাধন ভজন করিয়া বেড়াইতেছে। আর আমি সংসারাশ্রমেই কাটাইলাম,—ইহাই দুয়ের প্রভেদ! রাত্রে ত্রৈলোক্যের বাসায় সেবা করিলাম। পরদিন প্রাতে একটি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া মন্তেশ্বর চলিলাম, বেলা দশটার সময় সেখানে পোঁছিলাম। গ্রামের এক প্রান্তে থানা, থানার সম্মুখে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ও তাহার পাহাড়ে পুষ্পোদ্যান। অনেক রকম ফুল ফুটিয়া

রহিয়াছে, মনে মনে করিলাম, এ বেশ হল, কাজ-কর্ম্ম ও শুনিলাম খুব কম, বসে বসে তাঁকে ডাকা যাবে। খাবার বন্দোবস্ত—একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম থেকে আনা হল, তিনিই পাক করিলেন। আমার এক আত্মীয় এই থানায় জমাদার রহিয়াছেন। তিনিও বিশেষ যত্ন করিলেন। আমার সঙ্গী শশীঠাকুর প্রায় চুপচাপ থাকেন, বেশী কথা কন না। একধারে একটি কম্বলের আসন করিয়া বসিয়া জপ করেন। বলেন, আমি দারোগা উপেন্দ্রের গুরু। পশার বেশ হল, সকলে মানতে লাগল, আদর যত্ন বেশী হল সিপাহীরা প্রায় কাছ ছাড়া হত না। তিনি কবচ-টবচও দিতেন, দয়া শ্রদ্ধা করে যে যা পারত টাকাটা সিকিটা দিত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র নদী, প্রায় সেইখানে স্নান করতাম। আর সন্ধ্যা-সকাল ভগবান্‌কে ডাকিয়া চলিতে লাগিলাম, দুই দশ দিন থাকার পর পুলিশ সাহেব inspection করিবার জন্য আসিলেন। থানা পরিদর্শন করিলেন, অসন্তুষ্ট হইলেন না। আমি মেয়ে-ছেলে আনিব বলিয়া ৪ দিনের ছুটি চাহিলাম, ছুটি মঞ্জুর হল। তারপর দিন শশীঠাকুর সহ বাড়ী চলিলাম। বাড়ীতে আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়া ছেলেটি ও মেয়েটিকে লইয়া বাঁকুড়া গেলাম। দাদা ৺দুর্গাদাস চৌধুরী বাঁকুড়ায় ওকালতী করিতেন, তাঁহার শক্ত পীড়া, তাই দেখা করিয়া যাইতে লিখিয়াছিলেন। শরীর বড়ই দূর্ব্বল, এই তাঁকে বাঁকুড়ায় শেষ দেখা দেখিয়া গেলাম। বৈকালের গাড়ীতে বর্দ্ধমান চলিলাম, তথা হইতে প্রাতে গো-গাড়ীতে বর্দ্ধমানে রওনা হইলাম। পথে কুড়মন গ্রামে অনেক দেরী হইল। বৈশাখ মাস, বড়ই রৌদ্রের উত্তাপ, তাই বাগানে গাড়ী রাখিয়া স্নান করিয়া জল খাইয়া রৌদ্রের তেজ কিছু কম পড়িলে গাড়ী ছাড়িলাম। পথিমধ্যে শুশুনী গ্রামে সন্ধ্যা হওয়ায় তথাকার বাবু রাসবিহারী ঘোষাল কিছুতেই ছাড়িলেন না। ব্রাহ্মণ নিরীহ, আমাদের অশেষ যত্ন করিলেন ও যত্ন-সহকারে যথারীতি খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিলেন। রাত্রি প্রায় একটার সময় থানায় পৌছিলাম। সরকারী বাসা-ঘর অতি কদর্য্য, উপায় কি? তাহাতেই প্রবেশ করিলাম। কাজকর্ম্ম এক প্রকার চলিতেছে, কিন্তু মন স্থির নাই—সেই গুস্করার কথা সর্ব্বদাই মনে হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বাবাজীর বাড়ীর সংবাদ পাই। যাই-যাই করিয়া সরকারী কার্য্যের জন্য ব্যস্ত, সময় হয় না।

একদিন গুরুজীর পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, "আমি শীঘ্রই বণ্ডুল যাইব।" দুই চার দিন পর বণ্ডুল আসার সংবাদ পাইয়া আমি রাত্রেই বণ্ডুল চলিলাম, অতি প্রত্যুষে পৌছিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছি। লোক কেহ উঠে নাই, সামান্য রাত্রি আছে। দেখি, দক্ষিণ দিক হইতে আমার গৌর নাচিতে নাচিতে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে উত্তর মুখে স্নান করিয়া আসিতেছেন। প্রথম দেখিয়া গা রোমাঞ্চিত হইল। নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। আমি বাহিরের ঘরেই বসিয়া রহিলাম, এই প্রথম শ্রীগুরুর জন্মভূমি

দর্শন। গ্রামটি তত বড় নয়, গ্রামের চর্তুদ্দিকেই বিস্তৃত ধান্য-ক্ষেত্র। উত্তরে শ্মশান-ভূমি ও একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীমাতা ৺সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। ইনি বাল্যকালে এই সিদ্ধেশ্বরী মাতার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সহসা বাহির হইতেন না, আর স্থান ছিল ঐ শ্মশান ক্ষেত্রের বটবৃক্ষ। আমি বসিয়া আছি, সকাল হইল, দুইটি আট নয় বৎসর বয়স্ক বালক আসিয়া দাঁড়াইল যেন কৃষ্ণ-বলরাম। এ দুটি প্রভুর সন্তান, বড়টি শ্রীমান দুর্গাপদ ও ছোটটি শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ। উভয়ের মুখশ্রী, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সবই প্রভুর ন্যায় ছোটটি যেন গুরুদেবের সকল অংশই অধিকার করিয়াছে, বড়র রং কিছু ফর্সা। কিছুক্ষণ পরে বাবাজীর খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীমান্ ইন্দ্রনাথ আসিলেন। তাঁহারা কেহই বিশেষরূপে আমাকে জানেন না। প্রতিবেশী দুই পাঁচ জন ক্রমশই জুটিতে আরম্ভ হইল। সকলেই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এই গ্রামে হঠাৎ আসার কারণ জানিবার জন্য উদ্গ্রীব, কি জানি এত সকালে থানার দারোগা কেন আসিল। এঁদের বাড়ীতেই বা কি হয়েছে। ইঁহাদের মুখভঙ্গী ও জিজ্ঞাসার কায়দা-কানুনে বুঝিলাম, ইঁহারা উদ্দেশ্য জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছেন।

আমি। মহাশয়, আমি কোন বিশেষ সরকারী কার্য্যে আপনাদের গ্রামে আসি নাই। আমি যাঁহার বাড়ী আসিয়াছি, তাঁহাকে দর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।

গ্রামবাসী, "তা বেশ, উনি লোক ভাল, কিছু মন্দ বটেন তা নন। কি হে ভোলানাথ, ভাল লোকই বটে," ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। উহার মধ্যে একটি ব্রাহ্মণ আমাকে ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। পরে জানিলাম, ইনিই প্রভুর খুড়ো, বাবাজীর সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখেন। প্রায় দুই তিন ঘন্টা পরে বাড়ীর মধ্যে আমাকে ইন্দ্র খুড়া ডাকিয়া লইয়া গেলেন, গুরুদেব পূজা সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণ দ্বারী ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া তামাক সেবা করিতেছেন। আমি গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিয়া পদরেণু লইয়া কৃতার্থ হইলাম। জল খাইতে বলিলেন। চাঁছি, মিহিদানা লইয়া জল সেবা করিলাম। গুরুজী আমাকে সঙ্গে লইয়া বাহির বাটিতে আসিলেন। গ্রামের লোকের অনেকেই উপস্থিত, নিকটবর্ত্তী গ্রামের চৌধুরী মহাশয়েরাও কেহ কেহ আসিলেন। তাঁহারা ঐ গ্রামের তালুকদার, অবস্থাশালী লোক। জাতিতে উগ্র-ক্ষত্রিয়, স্বভাব উগ্র ও অভিমানী। বর্দ্ধমান জেলায় এই জাতির বসবাস বেশী ও আধিপত্য আছে। নিকট গ্রামবাসীরা গুরুজীর অসাধারণ শক্তির বিষয় বিশেষ অবগত নন। ইঁহারা বাবাজীকে সাধারণ মানুষ বলিয়া ধরেন। জ্ঞাতি কি স্বগ্রামবাসী কেহ কাহারও কোন বিষয়ের উন্নতি দেখিতে বা স্বীকার করিতে চান না।

গ্রামবাসী। দারোগাবাবু হঠাৎ আপনার বাড়ী কেন এসেছেন। বিশেষ কোন কাজ আছে বুঝি?

গুরুজী। না, ও আমার শিষ্য, তাই দর্শন করিতে আসিয়াছে।

গ্রামবাসী। ও তা বেশ বেশ। দারোগা বাবু লোক ভাল, শুনি উনি ধার্ম্মিক লোক। কতদিন মন্তেশ্বরে আসা হল।

আমি। এই অল্পদিন।

তাঁরা 'শিষ্য' এই কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে একে একে পলাইবার পথ দেখিতে লাগিলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, কেহ কোন বিপদে পড়ে নাই, এঁদের বাড়ীতে কোন মোকর্দ্দমা পড়ে নাই, দারোগার ঘুষের বন্দোবস্ত কিছু করিতে হইবে না। তাই কেহ হাই তুলিতেছেন, কেহ বা 'চল যাওয়া যাক্' বলিয়া মুখ চাওয়াচায়ি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে একে একে সকলেই অদৃশ্য হইলেন। বাঁচিলাম বাবা। একবার বাবাজীর সঙ্গে নির্জ্জনে দুটা কথা বলিয়া বাঁচি।

গুরুজী। দেখলে লোকের ব্যবহার, এই মানুষ। এদের ভিতরে যে কি আছে বা ছিল, তা তবু সম্যক্ জান না। অনেক প্রকার মতলবে এসেছিল। যাই শুনলে শিষ্য, অমনি পালাবার পথ খুঁজতে আরম্ভ কর্‌লে। কেহ কি কারও ভাল দেখতে পারে, হিংসা দেশময় প্রবল হইয়াছে। দিন দিন কলিকালের প্রভাব বাড়িতে চলিল, অতি গোপনে কার্য্য করা দরকার, তবে কাজ হাঁসিল হয়। কাকেও কিছু বলিবে না, এখানের আশ্রমের কাজ যাহা করিতে হয় কালীপ্রসন্ন খুড়ার সঙ্গে যুক্তি করে কর।

আমি। আজ্ঞেঁ হাঁ, আপনার কাজে বাধা দেয় এমন লোক এ জগতে দেখি না।

গুরুজী। না গো, বিশ্বাস ক'র না, জগতে সব রকম আছে। সকল রকম নিয়ে জগৎ। ভাল মানুষ আছে, মন্দ মানুষও আছে। যেমনি ভাল গাছ আছে, তেমনি বিষফলের গাছও আছে, সাবধানে থাকতে হয়। এর পর দেখলেই ভাল মন্দ বুঝবার শক্তি হবে। ত্রৈলোক্য চিঠিপত্র দেয়?

আমি। আজ্ঞে, ক'বার পত্র দিয়েছিল। গুষ্করা যায়?

গুরুজী। হাঁ গো, প্রেমচাঁদ, ত্রৈলোক্য, আর অনেকেই যায়-আসে, ক্রমশই বাড়িতেছে। এখানেও বহুলোকের জনতা হবে। তাই শীঘ্র শীঘ্র আশ্রম না করিলে থাকিবার স্থান কোথা? এস, আশ্রমের স্থান দেখাই।

এই বলিয়া প্রভু উঠিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। বাড়ীর নিকটেই আশ্রমের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমে খুব ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, নিকটেই একটি পুষ্করিণী, জলও ভাল, জায়গাও অনেক, যে প্ল্যান করেছেন, যে স্থানে যে ঘর ও গুহা, শিবমন্দির স্ত্রীলোকের থাকিবার স্থান পাকশালা, ভাঁড়ার ঘর হবে সমস্ত দেখাইলেন।

গুরুজী। হরিদাসের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে কি?

আমি। হাঁ, বাবা, হয়েছে।

গুরুজী। বর্দ্ধমানের ডিষ্টিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হরিদাস প্রায় গুষ্করা আসে, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই? তোমার নাম সে আমার নিকট শুনেছে। বেশ লোক। এখানে বাড়ী আরম্ভ হলে আসবে বলেছে। ভাল রাস্তা করবার সব খরচ দিতে চায়।

আমি। ৺হরি-হর প্রতিষ্ঠা কতদিনে হবে?

গুরুজী। এই মন্দির হলেই হবে। এখানে যে কেন তাঁরা ৺শিবপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য জেদ করছেন, কিছু বুঝি না। তাঁরাও মধ্যে মধ্যে এখানে আসবেন, ভৈরবী মা-রাও আসবেন। স্নান কর।

আমি স্নান করতে গেলাম। গ্রামের দক্ষিণধারে একটি অতি উত্তম পুষ্করিণী, প্রভু রাত্রি শেষে ঐ পুকুরেই স্নান করিয়াছিলেন। গ্রামের সকল লোকই ঐ পুকুরে স্নান করেন ও উহার জল খান। আমি স্নান করিয়া আসিলাম, আবার আম সন্দেশ দিয়া জল খাইলাম। বাবাজীর বাড়ীতে দিদিমা, মাঠাকুরাণী, পিসিমি, খুড়িমা, ইন্দ্র খুড়া ও প্রভুর সন্তান দুটি প্রায় থাকেন। পিসিমা শ্রীমতী কাশীশ্বরী দেবী ঘরের কাজ দেখাশুনা করেন। খুব বুদ্ধিমতী। বাবাজীর বড়ই আদরের। বাল্য-বিধবা প্রভুর খুব সেবা করেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। মা-ঠাকুরাণী উদার-বুদ্ধি, কোন বিষয়ে দেখাশুনা নাই। যেন মা আমার সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী। দিদিমা (বাবাজীর মাতা) অতি সরল ও সেকেলে, সরলবুদ্ধি। যেন সকলেই আপনার লোক, তাঁর চক্ষে জগতের সবই ভাল। প্রভু মাকে সাক্ষাৎ ত্রিজগতের মা জ্ঞানে পূজা করেন। এমন মাতৃভক্তি দেখি নাই, ইহা দুর্লভ। তিনি মায়ের কোন ইচ্ছাপূরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রভুর মাতা যখন মৃত ছেলেদের জন্য কাঁদিতেন, বাবজী বলিতেন, বৃথা মরা মানুষের জন্য কেন কাঁদ মা? কেহ কি মরে গা? তুমি যদি কাঁদ, আমি আর বাড়ী আসব না।"

মা। আমি বাবা তাদের জন্য কাঁদি না, পাছে তোর আবার কিছু হয়, তাই কাঁদি।

বাবাজী। মা, আমার জন্য কেঁদ না, বেঁচে থাকতে থাকতে এত কাঁদবে, ত মরে গেলে না জানি কি করবে। মা, তুমি থাকতে আমি মরব না। যমের সঙ্গে কথা হয়েছে। সে চিন্তা ক'র না।

প্রভুর মধ্যাহ্ন-সেবা হবার পর পিসিমা বললেন, "ওঁর (আমার) কোথায় খাবার স্থান হবে?

গুরুজী। আমার পাত্রেই উপেন্দ্র খেতে ভালবাসে গো, আমার পাত্রেই দাও। পিসিমা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বাবার পাত্রেই বসিলাম, অমৃততুল্য সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া বহুদিনের পাপ নষ্ট করিলাম। জগদ্বন্ধু শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম, নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। আমি

বলিলাম, "অদ্য বৈকালে মন্তেশ্বরে আমার সঙ্গে চলুন।"

গুরুজী। তা বেশ, চল, যাওয়া যাক্।

বেলা আড়াইটা কি তিনটার সময় গো-গাড়ীতে রওনা হইলাম। শুনিয়াছি, গুরুবাড়ী আসিয়া সকলকে প্রণামী দিতে হয়। আমি বাড়ীর সকলকে প্রণাম করিয়া কিছু কিছু প্রণামী দিলাম। দিদি ঠাকুরাণী বলিলেন, "কেন বাবা উপেন্দ্র, প্রণামী কেন?"

বাবা। নাও গো নাও, উপেন্দ্র আমার শিষ্য, গ্রহণে দোষ নাই। ওতে উপেন্দ্রের মঙ্গল হবে।

"বেঁচে থাক বাবা" এই বলিয়া দিদিঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দিদিমা। দেখ ভুরি, (গুরুদেবকে দিদিমা 'ভুরি' বলিয়া ডাকেন) উপেন মন্তেশ্বর থেকে প্রায় ছেলেদের জন্য কত জিনিস পাঠায়। ছেলেদিগকে কত ভালবাসে।

শুনিলাম, আমি মন্তেশ্বর আসিবার কালে বাবাজী বাড়ীতে চিঠি দিয়াছিলেন, 'উপেন্দ্র বণ্ডুল গেলে যেন আদর যত্ন করা হয়। সে আমার ছেলে দুর্গা বিষ্ণুর চেয়ে কম নয়, সে কথা দিদিমা বলিলেন। বাবাজী রথে উঠিলেন— যেন জগন্নাথ, আমি হাঁটিয়া হাঁটিয়া পিছু পিছু যাইতে লাগিলাম, দুই বার তিনি বলিলেন, "উঠ, হেঁটে কেন যাবে।" তার পর পাকা রাস্তায় উঠিয়া বলিলেন, "গাড়ীতে উঠ।"

আমি। না বাবা, আপনার সঙ্গে এক বিছানায় কি করিয়া যাই, উঠিতে ভয় হয়। গুরুজী "আচ্ছা এস" বলিয়া, পাতা বিছানার উপর নিজের গায়ের গরদের চাদর বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া বলিলেন, "এই ত আমার পৃথক্ আসন হল। আয়রে বাপু, ছেলে বাবার কাছে বসিবে তাতে ভয় বা দোষ কি?"

আমি। আগে আপনার কোলে বসিবার মত করুন, তবে ত। চাকর, দাস, এরা কি প্রভুর বিছানায় বসতে পারে?

গুরুজী। হ্যাঁ পারে,—প্রভু যদি ডাকিয়া ভালবাসিয়া আপন ভাবিয়া বসান, তবে পারে।

আমি। আপনার মনের মত হতে পারচি্ কৈ—আগে ঠিক ঠিক ভাবে 'আমি আপনারই' এ কথা বলিতে ভাবিতে দৃঢ়রূপে শিখি্।

গুরুজী। হাঁ, এ বেশ কথা! প্রথম 'আমি তোমার' তার পর 'তুমি আমার' তার পর 'তুমিই আমি' হইয়া যায়, কিন্তু বাপু ঐ ভাব রাখা দুষ্কর। অহঙ্কারই সব মাটি করে। শাস্ত্র মেনে গুরু-বাক্য ধ'রে ক'জন চলে! তা হলে জীবের এত দুর্গতি কেন? কাল-মাহত্ম্য ত আছে, কলিতে অধিকাংশই মুখ-সর্ব্বস্ব, কর্ম্মী পাওয়া কঠিন। দেশের ব্রাহ্মণেই সব মাটি করলে, বাবা। তাই বিভীষণ

বলেছিলেন, আমি কলির ব্রাহ্মণ হব। জ্ঞান-চক্ষে দেখেছিলেন, কলির ব্রাহ্মণের অধোগতি নিশ্চয়। তা বলে কি ভাল নাই, অবশ্যই আছে, তবে খুব কম। তাও বহু কষ্ট পেয়ে যদি স্বীয় ধর্ম্ম রাখতে পারে। কিন্তু সে কজন।

আমি। কলিতে কি সত্য একবারেই নষ্ট করবে?

গুরুজী। নষ্ট কি জান? জগতে কোন দ্রব্য নষ্ট হয় না, সবই থাকে ও আছে। তবে কথা এই, যার যখন সময়, তখন তারই অধিকারে অন্য সমস্ত নিস্তেজ হয়ে থাকে। কলিতে সত্য আছে, আবার সত্যেতেও কলি থাকে—না থাকার মত। যারা এ-কালেও সত্য ধরে আছে তাদের কাছে সত্য আছে, তবে বহু ব্যভিচার অনাচার বিকর্ম্মের মধ্যে ভাব ধরে রাখা বড় শক্ত। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সম্মুখে ঘোর কলিযুগে জীব কি সনাতন ধর্ম্ম, বেদবিহিত কর্ম্ম করিতে পারিবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, কলিতে সত্যধর্ম্ম রাখা বড়ই কঠিন হবে। অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি বহু কষ্ট স্বীকার করে রাখবে, তবে সে প্রকার সৌভাগ্যবান অতি কম হবে। বোধ হয়, আমার মন বুঝিবার জন্যই বলিলেন, "ত্রৈলোক্য খুব কর্ম্ম করছে, শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবে—যদি ঐ প্রকার একাগ্রচিত্তে কর্ম্ম ক'রে যায়।" আমি উহাতে হিংসাভাব আনি কি না, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য উহা উত্থাপন করিলেন! আমার মনে একটু হিংসার ভাব এসেছিল, পাছে ত্রৈলোক্যই গুরুজীর সব ভালবাসা লইয়া ফেলে। কিন্তু তাহা কি আর বলিব? "হাঁ বাবা, তা বেশ" ইত্যাদি বলিলাম। কিন্তু শ্রীগুরু সমস্তই বুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন।

গুরুজী। দেখ হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা বড়ই খারাপ। সৎপথে যারা যেতে চেষ্টা করে, তাদের ঐ সকলের দিকে খুব লক্ষ্য রাখা চাই, তবে ঠিক রাস্তায় যেতে পারে। দেখ মনে কত ভাব উঠে। জন্ম-জন্মান্তরের স্তূপীকৃত রাশি রাশি সংস্কার একত্র হইয়া আছে। সেই সকল লইয়া মন সর্ব্বদাই খেলা করিতে চায়, চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে চায়। ঈশ্বর মুখে যাইতে হইলে, এই প্রবল শত্রুকে স্বীয় বশে আনিতে হইবে, নতুবা উহা সম্মুখের দিকে তোমাকে টানিয়া লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবে। মন-মাতুয়া সকলের অনিষ্টের মূল।

আমি। আমাদের দ্বারা হবে কি?

গুরুজী। কেন হবে না, মানুষেই ত করে, পশুতে কি করে?

আমি। মানুষ ত সবাই। কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, কৈ সব মানুষে কি ঐ পথে যায়?

গুরুজী। হাঁ, অনেকে যাচ্চে; তুমি ক'জনকে জান? দেখ হিমালয়, গিণরি, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি নানা স্থানে গুহায় গুহায় মহা মহা স্থানে কত কত মহাত্মা গোপনে আছেন। আবার গ্রামে, তীর্থে, নগরেও মধ্যে মধ্যে বেড়ান, কে ধরবে?

ক'জনের ধরবার চক্ষু আছে? তবে এ কথা সত্য যে মানুষ—দুই পদ দুই-হস্ত-বিশিষ্ট মানুষ—হলেই মানুষ হয় না। উহার মধ্যে মনোবৃত্তি অনুসারে পশু সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি জাতির মানুষও আছে। তাহাদের কলুষিত বুদ্ধিতে তাহাদিগকে ঐ-জাতীয় জীব বানাইয়া রাখিয়াছে। হিংসা-ভাব উহাদের এতই বেশী যে, সর্প ব্যাঘ্র ত ভাল। কামবৃত্তি এত প্রবল যে পশু হার মানিবে। তাহারা পশুর ন্যায়, সর্ব্বদাই আহার নিদ্রা আর মৈথুন লইয়া ব্যাপৃত আছে। তুমি কি সেই মানুষের কথা বলিতেছ?

আমি। হাঁ বাবা।

গুরুজী। না, তা ব'ল না। এর পর মানুষ চিনিতে পারিবে। এতদিন ত বৃথা সময় নষ্ট করিলে, এখন বয়স হয়েছে, এখন থেকে প্রাণপণে লাগ।

আমি। কত বয়স হইতে আরম্ভ করা ভাল?

গুরুজী। কি জান, একটু জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ১০/১২ বৎসর বয়স হইতে গুরুর নিকটে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন দরকার। সেকালে শিষ্যে প্রথম প্রথম প্রায় ১২ বৎসর কাল হইতে ২২/২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করিয়া কেহ সংসারে প্রবেশ করিত, আর কেহ বা সন্ন্যাস লইয়া তীর্থে পাহাড়ে গুহায় হরি-সাধনা করিয়া জীবন সার্থক করিত। এখন কি আর সে সব দিন আছে বাবা?*

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুলিশ অফিসার, আলিপুর—২৪ পরগণা

১। যেবার দুর্গাদাদার (বাবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের) বিবাহ হয়, সেবার বিবাহের দিন ও ৺শিবরাত্রি খুব সামান্য ব্যবধানে হইয়াছিল। দুর্গা-দার বিবাহান্তে বর্দ্ধমানে আসিয়া পুনরায় শিবরাত্রে বগুল যাইয়া শিবরাত্রি করা যায় না। সেজন্য আমি ও প্রেমচাঁদ ঠিক করিয়াছিলাম যে, সাত দিনের ছুটি লইয়া যাইব এবং বিবাহ ও শিবরাত্রের ব্রতান্তে ফিরিয়া আসিব। এমন সময় আমাদের অফিসে চিঠি আসিল যে, আমাদের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার জেনেরাল টমাস সাহেব আমাদের অফিস

---

*এই বিবৃতি-লেখক উপেন্দ্রনাথ অল্পদিন হইল মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কাহিনী অসমাপ্তই থাকিয়া গেল। তাঁহার নিকট চতুর্দ্দশ বৎসরের বহু বিবরণ প্রাসঙ্গিক ভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তাহাতে শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে এমন অনেক কথা ছিল, যাহা এখন অন্যত্র পাওয়ার আশা নাই। আশা করি, তাঁহার যোগ্য পুত্রগণ তাঁহার উদ্ধার ও প্রকাশ সাধনে যত্নপর হইবেন।—গ্রন্থকার

পরিদর্শনে ঠিক সেই সময় আসিবেন। এই সংবাদে দুইজনেই দুঃখিত হইয়া বাবাকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া বলিলাম যে, ডি. আই. জি.-র পরিদর্শন-কার্য্য বন্ধ না হইলে আমাদের বণ্ডুল যাওয়া হইবে না। বাবা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাহা হয় হইবে।" আমরা তখন নিশ্চিন্ত হইলাম। যথাসময়ে সাহেব বর্দ্ধমানে আসিলেন। পরিদর্শনের এক দিন পূর্ব্বে বাবাকে সংবাদ দিলাম। জেনেরাল সাহেব সেদিন সমস্ত দিন ঘুমাইয়া রহিলেন। তিনি দুপুরে ঘুমাইয়াছিলেন; আর পাঁচটার সময় উঠিলেন। উঠিবার একটু পরেই কলিকাতা হইতে প্রেরিত তার পাইলেন তাঁহাকে তখনই কলিকাতায় যাইতে হইবে। তিনি তখনই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, "এখন পরিদর্শন হইবে না, যখন হইবে পরে জানাইব।" আমরা বিবাহ ও শিবরাত্রির পর আসিলে অনেক দিন পরে পরিদর্শন হইয়াছিল।

২। একদিন রবিবার দুপুর বেলায় বাবা বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জের বাসায় বারেন্দায় খাটের উপর নিদ্রিত আছেন, সম্মুখে মুন্সেফ নরেনবাবু ও উকীল রজনীবাবু দুজনে বসিয়া আছেন। আমি পিছনের দিকে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলাম। সহসা চাহিয়া দেখি রজনীবাবু ও নরেনবাবু দুজনে কি কুড়াইতেছেন। আমি দেখিলাম, সেখানে বহু আঙ্গুর ফল পড়িয়াছে, আমি অনেকগুলি কুড়াইয়া লইলাম। এমন সময় বাবা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গো, কি হচ্চে?" আমি বলিলাম, "বাবা, এখানে সহসা অনেক আঙ্গুর আসিয়া পড়িতেছিল, নরেনবাবু ও রজনীবাবু অনেক কুড়াইয়া লইয়াছেন আমিও অনেকগুলি কুড়াইয়াছি।" বাবা তখন বলিলেন, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন রূপার গাছে আঙ্গুর ফলিয়াছে। "আঙ্গুর" এই কথা যেমন মনে হইয়াছে, অমনি আঙ্গুর আসিয়া পড়িয়াছে।"

৩। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবার আহ্নিকের আসন করিতে যাইয়া দেখি, গুগ্‌গুল ফুরাইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানে ভাল গুগ্‌গুল পাওয়া যাইত না বলিয়া কলিকাতা হইতে গুগ্‌গুল আনান হইত। বাবাকে বলিলাম, "বাবা, গুগ্‌গুল ফুরাইয়া গিয়াছে।" বাবা যথাসময়ে আহ্নিক করিতে গেলেন এবং আহ্নিকান্তে ঘরের দরজা খুলিয়াই আমাকে ডাকিলেন, আমি কাছে যাইতেই বলিলেন, "ঐ গুগ্‌গুল নাও।" আমি ঘরের মধ্যে তাকাইয়া দেখি অতি উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুল সমস্ত ঘরময় ছড়ান রহিয়াছে। আমি তখন ঐ সমস্ত গুগ্‌গুল কুড়াইয়া একত্র করিলাম। তাহার পরিমাণ প্রায় সাত আট সের হইবে। ওরূপ গুগ্‌গুল আর জীবনে কখন দেখি নাই।

৪। একদিন দুপুরবেলা রাসেশ্বরী তৈল তৈয়ার করিবার জন্য একটি লোহার কড়াতে করিয়া পাকী অর্দ্ধ মণ তৈল জ্বাল দেওয়া হইতেছিল। তেল

যখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল, বাবা তখন সেই ফুটন্ত তৈল হাতে করিয়া কড়াই হইতে তুলিয়া পাক ঠিক হইয়াছে কিন না দেখিতেছিলেন। আমি ও দুই চারিজন লোক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম্‌। আমার কেমন ইচ্ছা হইল, আমিও ঐভাবে ঐ ফুটন্ত তেল মধ্যে হাত দিয়া দেখি। যেমন ইচ্ছা হইল অমনি বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আমি ঐ তেলে হাত দিব?" বাবা বলিলেন, "দিতে পার।" আমি তৎক্ষণাৎ ঐ ফুটন্ত তেলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া দিলাম,—ঐ ফুটন্ত তেল আমার নিকট ঈষৎ গরম বলিয়া বোধ হইল।

৫। একদিন দুপুরবেলা বাবা খাটের উপর শুইয়া আছেন, আমি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছি। কিন্তু দেখিতেছি, নাক দিয়া নিশ্বাস লওয়া বা প্রশ্বাস ফেলার কোন শব্দ পাইতেছি না। তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করিলাম "বাবা" আপনার নাক দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে না?' বাবা বলিলেন, 'না।' তাহাতে মনের সন্দেহ না যাওয়ায় প্রথমে হাত দিয়া, পরে তুলা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই নাক দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে না। তখন বাবা বলিলেন, "আমার শ্বাস-প্রশ্বাস নাভিদেশ দিয়া পড়ে।" তখনই নাভি-প্রদেশে হাত দিলাম। দেখিলাম বালকের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় নাভিদেশ দিয়া বায়ু বর্হিগত হইতেছে এবং সেইরূপ শব্দও পাওয়া যাইতে লাগিল।

ইহাঁর পর অন্য কথা-প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, তাঁহার চক্ষের মধ্যে একটি লাল বর্ণের দেবী মূর্ত্তি আছেন। ঐ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বাবাকে ধরিলাম। বাবা তখন চক্ষু মেলিয়া বলিলেন. "আমার চোখের দিকে তাকাইয়া থাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে।" ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিবার পর দেখিলাম, একটি দিব্য লাল বর্ণের দেবী-মূর্ত্তি বাবার চক্ষের অপাঙ্গ দেশ হইতে বাহির হইয়া চক্ষের মধ্যে পর্য্যন্ত আসিয়া তখনই আবার অপাঙ্গদেশে অন্তর্হিত হইলেন। সে মূর্ত্তিটি এখনও যেন আমার চোখে লাগিয়া রহিয়াছে।

৬। বর্দ্ধমানে থাকিবার সময় বাবার পূজায় কর্পূর লাগিত। সেজন্য বাবা আমাকে একটি অক্ষয় কর্পূরের কৌটা দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আবশ্যক মত কর্পূর বাহির করিয়া লইয়া কৌটা বন্ধ করিয়া রাখিতাম আবার যখনই যাইয়া খুলিতাম, তখনই দেখিতাম কৌটা কর্পূরপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি বর্দ্ধমান হইতে যশোহর বদলী হইয়া গেলে ঐ কৌটাটি কি হইয়াছিল, তাহা জানি না। আমারও যাইবার সময় উহা লইয়া যাইতে মনে ছিল না।

৭। একদিন কথা-প্রসঙ্গে ক্ষেতুবাবুকে (ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—মহারাণী নারায়ণকুমারীর পোষ্যপুত্র) বাবা বলিলেন যে আগুনের তেজ শরীরের ভিতর দিয়া অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারা যায়। তাহাতে তিনি সে বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিতে চাহিলেন এবং ইহা হইতে পারে না বলিয়াও একটু তর্ক করিলেন। বাবা

তখন তাঁহার (ক্ষেতুবাবুর) দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিতে বলিলেন এবং সেই হাতের পিঠে একটি দোয়াতের টিনের গোল মুখ রাখিয়া তাহার উপর নিজ বাম হস্ত রাখিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত একটি অগ্নিপূর্ণ কলিকার উপর রাখিলেন। এইভাবে বোধ হয় এক সেকেণ্ড রাখিয়া বাবা হাত উঠাইয়া লইলেন। তখন দেখা গেল, ক্ষেতুবাবুর হস্তপৃষ্ঠ ঐ দোয়াতের মুখ-পরিমাণ, আগুনে পুড়িলে যেরূপ ফোস্কা হয়, সেইরূপ একটি ফোস্কা পড়িয়াছে। ক্ষেতুবাবু তখন নির্ব্বাক্।

৮। একদিন রাত্রে বাবা মুড়ি সেবা করিলেন। বাবার আহারান্তে প্রায় পনেরো ষোল জন আহার করিতে বসিলেন। সকলেই মুড়ি খাইবেন। আমার স্ত্রী ও শরৎ-দার স্ত্রী সমস্ত গুছাইয়া দিতেছিলেন এবং আমি পরিবেশন করিতেছিলাম, প্রথমবার মুড়ি পরিবেশন করিয়া মুড়ির পাত্র ঘরে রাখিয়া যখন অন্যান্য উপকরণ পরিবেশন করিতেছিলাম, তখন আমার স্ত্রী দেখিল, পাত্রে মুড়ি সামান্যই আছে। যাঁহারা আহার করিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুড়ি লাগিবে এবং স্ত্রীলোকও ছয় সাত জন্য খাইতে বাকী আছে। আমার স্ত্রী তখন চিন্তিত হইয়া বাবাকে বলিল, "বাবা, মুড়ি ত সামান্যই আছে, কিন্তু এখনও ত যাঁহারা খাইতে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুড়ি লাগিবে এবং স্ত্রীলোকও ছয় সাত জন খাইতে বাকী আছে।" বাবা তখন মুড়ির পাত্রটি হাতে লইয়া একবার হাত দিয়া মুড়িগুলি নাড়িয়া, পরে পাত্রটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "উহা হইতেই দাও।" ঐ মুড়ি হইতে, যাঁহারা খাইতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে পরিমাণ আবশ্যক দেওয়া হইল এবং যে সব স্ত্রীলোকেরা খাইতে বাকী ছিলেন, তাঁহারাও খাইলেন অথচ সেই মুড়ির পাত্রে পূর্ব্বে যে পরিমাণ মুড়ি ছিল, সকলের আহারান্তে দেখা গেল, সেই পরিমাণ মুড়িই রহিয়াছে।

৯। একদিন একটি দুষ্ট বালক আমার কনিষ্ঠ পুত্রের কপালে একটি ঢিল মারিয়া গভীর ক্ষত করিয়া দিয়াছিল। ঐ ক্ষত আরোগ্য না হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল। বাবা তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন না। পরে বাবা যখন বর্দ্ধমানে আসিলেন, তখন বালক একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিল এবং বলিল, "দাদা-গুরুদেব, আমার মাথার ঘা সারাইয়া দিতে হইবে।" বালকের বয়স চারি বৎসর হইবে। বাবা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন যে, ঔষধ দিয়া তিনি সত্বরই তাহার ক্ষত সারাইয়া দিবেন। সে কিছুতেই তাহা না শুনিয়া বাবার কাপড় ধরিয়া রহিল এবং বলিতে লাগিল, তাহার মাথার ঘা আজই সারাইয়া দিতে হইবে। বাবা যখন দেখিলেন, বালক কিছুতেই ছাড়িবে না, তখন তাহার যেখানে ক্ষত ছিল সেখানে হাত দিয়া বলিলেন, "কই তোমার কপালে ঘা কই?" সে তখন হাত দিয়া স্থান দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "এইখানে ঘা আছে।" বাবা বলিলেন, "কই তোমার কপালে ত ঘা নাই।" সে বাবার কথায় বিশ্বাস না করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে

লাগিল, 'না আছে।' তখন বাবা আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কই গো, তোমার ছেলের কপালে ঘা কই?" আমার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, তাহার কপালে ক্ষতের চিহ্নমাত্র নাই। তখন তাহাকে বলিল, "লালু, (বালকের নাম) ঘা সারিয়া গিয়াছে।" লালু তখন কপালে হাত দিয়া বুঝিল ক্ষত আর নাই। সে তখন বাবার কাপড় ছাড়িয়া মহা আনন্দে খেলিতে গেল। দুঃখের বিষয়, সে এখন পরলোকে।

১০। বর্দ্ধমানে থাকা কালে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমরের একবার রেমিটেন্ট জ্বর হয়। ১৪/১৫দিন হইয়া গেল—জ্বর কিছুতেই কমে না। ঔষধাদি রীতিমত দেওয়া হইতেছিল। বাবা তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন না। পরে বাবা যেদিন বর্দ্ধমানে আসিলেন, সেই দিন রাত্রে তিনি যখন আহারান্তে বাহিরের ঘরে গিয়া বসিয়াছেন তখন অমর অতি কষ্টে উঠিয়া কোনমতে যেখানে বসিয়া তিনি আহার করিয়াছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। তখন আমার স্ত্রী প্রসাদ-অন্ন রাখিবার আয়োজন করিতেছিল। সে সেইখানে তাহাকে ধরিয়া বসিল, বাবার প্রসাদ খাইবে। তখন তাহার বয়স ১২/১৩ বৎসর হইবে। আমার স্ত্রী তাহাকে অনেক বুঝাইল যে, এরূপ জ্বরের মধ্যে দুধ, লুচি ও কলা খাইতে নাই। বাবা তখন রাত্রে লুচি খাইতেন। প্রসাদ দুধ, লুচি ও কলা ছিল। সে কিছুতে তাহা না শুনিয়া আমার স্ত্রীকে ধরিয়া বসিয়া থাকিল। সে কি করিবে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে বাবা বাড়ীর মধ্যে আসিলেন, তখন সে বাবাকে বলিল, "বাবা, আপনার নাতি আপনার প্রসাদ না খাইয়া কিছুতে ছাড়িবে না।" বাবা বলিলেন, "অল্প করিয়া দাও"। অমর বাবার অনুমতি পাইয়া বেশ করিয়া দুধ, লুচি, ও কলা দিয়া মাখিয়া পেট ভরিয়া বাবার প্রসাদ খাইয়া শুইয়া থাকিল। সকাল বেলা দেখিলাম, তাহার জ্বর কিছুই নাই—দিব্য সুস্থ শরীর। সেই দিন হইতে অন্ন পথ্য করিতে লাগিল।

১১। যখন রাণীগঞ্জের বাসা হয় নাই, তখন বাবা বর্দ্ধমানে আসিলে নটবর বাবুর বাসায় থাকিতেন। তখন বর্দ্ধমানে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা খুবই কম। একবার গ্রীষ্মকালে বাবা বিন্ধ্যাচল গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিবার সময় বর্দ্ধমানে নামিলেন এবং ২/৩ দিন বর্দ্ধমানে ছিলেন। এক দিন রাত্রি ৮টার সময় আহারাদি করিয়া, আমি, প্রেমচাঁদ ও দুর্গাদাস তিন জনে বাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। বাবা তখন আহারাদি করিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। আমরা চারি জন মাত্র ছিলাম। পশ্চিমের ও অন্যান্য স্থানের অনেক কথা বাবার নিকট শুনিতেছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে একজন কিছু যোগ-বিভূতি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাবা তাহাতে আমাদের চারিজনকে পৃথক স্থানে থাকিয়া চারিখানি কাগজে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিতে বলিলেন। আমরা চারি জন উঠিয়া গিয়া পৃথক পৃথক স্থানে বসিয়া চারিখানি ক্ষুদ্র কাগজে যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখিলাম। ঐ কাগজ ভাঁজ করিয়া হাতে লইয়া বাবার ঘরে ঢুকিলাম। বাবা তখন ঐ কাগজ হাতে না

লইয়া উহা কলিকার আগুনে আমাকে পুড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন। আমি চারখণ্ড কাগজ লইয়া বেশ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলাম। যখন দেখিলাম কাগজের চিহ্নমাত্র নাই, তখন কলিকা সমেত রাখিয়া দিলাম। বাবা একখানি কাগজে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই লিখিয়াছিলেন, এবং আমাদিগকে সেই কাগজখানি দিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা লিখিয়াছিলে, দেখ ঠিক তাহা লেখা হইয়াছে কি না" আমাদের তিন জনের লিখিত বিষয় মিলিল, কেবল প্রেমচাঁদ বলিল, "আমার লিখিত বিষয় প্রায় সবই মিলিয়াছে কেবল একটি 'শ্রী' কম হইয়াছে। বাবা বলিলেন, তুমি একটি 'শ্রী' কম লিখিয়াছ।" প্রেমচাঁদ বলিল, "না, আমি দুইটি 'শ্রী' লিখিয়াছি।" বাবা তখন কলিকার উপর যে ছাই ছিল তাহা হাতে মুঠা করিয়া তুলিয়া লইলেন এবং হাতের মুঠো খুলিয়া আমাদের হাতের লেখা সমেত ঠিক সেই চারিখানি কাগজ দিলেন। আমরা দেখিলাম যে আমরা যে কাগজে লিখিয়াছিলাম, ইহা ঠিক সেই কাগজ। বর্ণ, আকৃতি বা কোন বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। প্রেমচাঁদের কাগজে দেখা গেল দুইটি 'শ্রী'-ই আছে। বাবাকে দেখাইলে তিনি একটু হাসিলেন মাত্র। আর কিছু বলিলেন না।

ইহার পর বাবা জানালার একটি গরাদের দুই পাশে দুইখানি হাত দিয়া আমাকে বেশ করিয়া তাঁহার হাত বাঁধিতে বলিলেন। সেই বাঁধন না খুলিয়া দিলে আর সেখান হইতে মুক্ত হইয়া অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। কিন্তু যেমনই তাঁহার হাত বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সরিয়া আসিলাম, অমনই দেখি বাবার হাত যেমন বাঁধিয়াছিলাম সেইরূপ বাঁধাই আছে, অথচ তিনি গরাদের পাশ হইতে মুক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই ভাবে ২/৩ বার বাঁধিয়াছিলাম। কিন্তু একবারও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই। হাত যেমন বাঁধা তেমনই বাঁধা থাকিত, অথচ তিনি গরাদের পাশ হইতে মুক্ত হইয়া দূরে চলিয়া আসিতেন।

১২। একদিন বেলা বারোটা বা সাড়ে বারোটার সময় একজন শিষ্য রাণীগঞ্জের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলের আহার হইয়া গিয়াছে, কেবল আমার স্ত্রীর আহার বাকী। হাঁড়িতে যে অন্ন ছিল, তাহাতে একজনের হয় না। অথচ তখন রাঁধিয়া দিবার সময়ও নাই, কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় বাবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাত আছে কি না। আমার স্ত্রী বলিলেন, "আছে।" তখন তিনি জায়গা করিয়া দিতে বলিয়া বাহিরে গেলেন। জায়গা করিয়া শিষ্যটিকে আহার করিতে দেওয়া হইল, তিনি পেট ভরিয়া আহার করিলেন এবং পরে আমার স্ত্রীও আহার করিলেন এবং হাঁড়িতে সামান্য ভাত থাকিল। আমার স্ত্রী নিজে রাঁধিয়াছিলেন ও পরিবেশন করিয়াছিলেন। সুতরাং কি পরিমাণ কি ছিল তাহা তাঁহার অজানা ছিল না!

১৩। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা আহ্নিক করিতে যাইবার সময় আমাকে

বলিলেন, "একখানি পরিষ্কার থালা ঘরে রাখিয়া যাও।" আমি একখানি থালা ঘরে রাখিয়া আসিলাম। বাবা আহ্নিক করিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "ঐ থালা লইয়া যাও এবং উহাতে যাহা আছে সকলকে দাও।" আমি যাইয়া দেখি, কে যেন পরম যত্নে সেই থালাখানি ভরিয়া সন্দেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। সেই থালা আনিয়া যথাসময়ে সকলকে ঐ সন্দেশ দিলাম।

১৪। একবার বণ্ডুলে শিবরাত্রির দিন সকালবেলা বাবা পূজা করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় আমি দরজার ধারে গিয়া বসিলাম। বাবা বলিলেন, "দেখ, শিবের গা দিয়া কেমন তেল বাহির হইতেছে।" আমি চাহিয়া দেখি, শিবের গা দিয়া যেন তৈলের উৎস বাহির হইতেছে এবং ঐ তৈলে সমস্ত গৌরীপাট ভরিয়া যাইতেছে। বাবা সেই তৈল খানিকটা হাতে করিয়া লইয়া আমার হাতে দিলেন। ঘ্রাণ লইয়া দেখি, অতি মিষ্ট মনোমোহন গন্ধ। পরে দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ অনেকখানি গব্য ঘৃত আসিয়া শিবের গায়ে পড়িল। বাবা সেই তৈল ও ঘি শিবের গাত্রে মাখাইয়া দিলেন। পরে তিনি পূজায় বসিলে আমি উঠিয়া আসিয়া সেই তৈল সকলকে দেখাইলাম।

১৫। রাণীগঞ্জে থাকাকালীন মধ্যে মধ্যে বাবার গা সাবান দিয়া ধুইয়া দিতাম। সেই সময় দেখিতাম, বাব সাবান-জল নাভিদেশ দিয়া টানিয়া পেটের মধ্যে লইতেন।

১৬। গ্রীষ্মকালে অনেক বরফের টুকরা মাথার মধ্যে রাখিয়া দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উহা আমাদের বাহির করিয়া দিতেন।

১৭। আহারান্তে ধৌতি করিবার সময় দেখিতাম, যে দ্রব্যটি বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা হইত, শুধু সেইটিই বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতেন। নারিকেল কোরা দিয়া শাক রান্না হইলে, শুধু নারিকেল বাহির করিয়া ফেলিতেন, শাক থাকিয়া যাইত। দুধ কলা খাইলে, শুধু কলা বাহির করিয়া ফেলিতেন, দুধ থাকিয়া যাইত।

শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত শিবরাম বন্দোপাধ্যায়

গোস্বামীপাড়া লেন, হাবড়া।

ইং ১৯০৮/৯ সালের কার্ত্তিক মাসে ৺শারদীয়া পূজার ৪/৫ দিন পূর্ব্বে পুরুলিয়া হইতে জনৈক গুরুভ্রাতার সহিত প্রাতঃকালে রওনা হইয়া বেলা ২টার সময় বর্দ্ধমানে আসিয়া ৺রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী উখরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক

মহাশয়ের সহিত ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইল। গরুর গাড়ী অথবা অন্য কোনও প্রকার যানের অভাবে পদব্রজেই বণ্ডুল যাওয়া স্থিরীকৃত হইল। শ্রীশ্রীগুরুদর্শনে যাইতেছি, এই ভাবিয়া আমি নগ্নপদে গিয়াছিলাম এবং আমিই তিন জনের মধ্যে অল্পবয়স্ক থাকায় (আমার বয়সতখন ২১/২২) সকলের ভার বোঝা আমিই বহিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। সন্ধ্যা ৭-৩০-এর সময় কুড়মুন-পলাশী গ্রামের উপকণ্ঠে আসিলাম। সেখানে জনৈক ব্রাহ্মণ আমাদিগকে উত্তর দিকের রাস্তায় যাইতে দেখিয়া পূর্ব্বদিকের রাস্তা অপেক্ষাকৃত অনেক সরল হইবে বলিয়া উক্ত পথে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দাদারা ঐ ব্রাহ্মণের কথায় বড় একটা কান দিলেন না। ক্রমে কোথাও হাঁটু অথবা কোমর অবধি জল ও কাদা ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে রাত্রি বারটার পর আমরা ৺বণ্ডুল ধামে পৌঁছিলাম। ৺রাধিকা দাদা মহাশয় দুই একবার 'বাবা', 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেই বাবা স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর বাবা যেন তিরস্কার ছলে রাধিকা দাদাকে বলিলেন, "সন্ধ্যা ৭-৩০-এর সময় কুড়মুন গ্রামের উপকণ্ঠে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণের কথা শুনিলে এত কষ্ট হইত না।" আমি চমকিয়া উঠিলাম। মনোহার মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথম সাক্ষাতেই আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল যেন বাবা কতদিনের পুরাতন—কতকালের চেনা, কত আপনার জন। একেবারেই নিঃসঙ্কোচে "বাবা, বাবা" বলিতে লাগিলাম। আহারাদির পর পান দিবার সময় বাবা আমার ডান হাতের তালু যেন একটু ঘষিয়া দিলেন। আমি একটু কৌতূহলী হইয়া রহিলাম। খালি পায়ে ১২/১৪ মাইল হাঁটিয়া আমার দু'পা দিয়া অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতেছিল। এমন কি, আমার ভয় হইল যে, হয়ত ক্ষত হইয়া অন্ততঃ ছয় মাস ভুগিতে হইবে। রাস্তার যত ক্লেস সাক্ষাৎ মাত্রেই দূরীভূত হইয়াছিল। শয্যা গ্রহণ করিবামাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একঘুমে রাত্রি শেষ করিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বাবাকে শ্রীশ্রী ৺বণ্ডুলেশ্বরের মন্দিরের দাওয়ায় দণ্ডায়মান দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, তোমার পা কেমন আছে?" চকিতে পায়ের দিকে চাহিয়া, আমার দরবিগলিতধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, আমি কথা কহিতে পারিলাম না। তখনি মনে হইল, নগ্নপদে এত রাস্তা হাঁটিয়া আসার সমস্ত ক্লেশ হরণ করিবার জন্যই বুঝি হাতটা ঘষিয়া দিয়াছিলেন। আহা, দয়াময়, নগ্নপদে আসিয়া কত অপরাধই করিলাম। সন্ধ্যার পর শিবমন্দির হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় বসিবার পর পদ-সেবার অধিকারী হইয়া নিজেকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করায়, পদ্মাসন দেখাইয়া দিলেন এবং গায়ত্রী জপ করিতে আদেশ দিলেন। "দীক্ষার এখনও দেরী আছে," এই কথা বলিলেন।

পূজার কয়েকদিন কি স্বর্গীয় আনন্দে যে কাটাইলাম, তাহা বলিতে পারি না। বাহিরের কোনও চিন্তা তিলার্দ্ধের জন্যও মনে স্থান পায় নাই। পরে আসিবার দিন প্রাতে বাবাকে তৈল মাখাইতে মাখাইতে বলিলাম, "বাবা, এই নিকটস্থ বড়বেলুন গ্রামে ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে আমার ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইয়াছে। তাহাকে একবার দেখিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বাবা, ভয় হয়, পাছে আমায় জোর করিয়া মদ খাওয়াইয়া দেয়। শুনিয়াছি, তারা মদ খায়।" এই কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "ব্যাটা, ভারি সাধু, নিজে যেন কখনও মদ খায় নি। খাও নি? বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি।" আমি আঁতিপাঁতি করিয়া খুঁজিয়া কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। অবশেষে নিজেই বলিতে আরম্ভ করিলেন, সামান্য বলাতেই আমার সমস্ত স্মরণ পথে উদিত হইল, আমি কিন্তু আর বাধা দিলাম না।

বলিলেন, "তুমি যখন পুরুলিয়ায় ৪র্থ ক্লাসে পড়, তোমার বড় দাদা আসানসোলে Labourer Supply-এর কাজ করেন। গ্রীষ্মাবকাশে তথায় আসিয়া তুমি দেখ যে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষে প্রায়ই কলহ হয়। ইহার হেতু মদ্যপান। তোমার দাদা একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মদ খাইয়া চলিয়া যাইবার পর, কেমন লাগে পরীক্ষা করিবার জন্য সমস্ত দ্বার-জানলা বন্ধ করিয়া, তুমি খাওনি কি? বৎস, সুরা এবং নারী শিব-ভোগ্য বস্তু, কখনও ইহাদের নিন্দা করিবে না।"

আমি শুনিয়া বিমুগ্ধ ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমেষ নয়নে বাবার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পরে বলিলেন, "বৎস, ইহা ত সামান্য কথা, দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তোমাদের প্রত্যেকেরই তিন জন্মের ব্যাপার আমায় দেখিতে হয়।"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়া আমার মনে হইল, এই দুস্তর সংসার-সাগরের একটি ভেলা পাইলাম; অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। পরে ১৯১০ সালের শারদীয়া পূজার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রী ৺বণ্ডুলেশ্বরের মন্দিরে আমার দীক্ষা হইল।

৺শিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষ্যে বণ্ডুলাশ্রমে তৎকালে বহু লোকের সমাগম হইত। আমরা ৫/৬ জন শিষ্য শুদ্ধ জলখাবার দিবার জন্য নিযুক্ত থাকিতাম। ৺শিবরাত্রির দু-একদিন পূর্ব্ব হইতে দু-একদিন পর পর্য্যন্ত আমরা ২০/২৫ জন শিষ্য এত অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিতাম যে, মানুষের স্বাভাবিক শক্তিতে সে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়া অসুস্থ না হওয়া অসম্ভব। আমরা পরস্পর বলিতাম, "ভাই, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের কি কৃপা, কই আমাদের শরীরে একটু ব্যথাও ত হয় না।"

পরে ৺শিবরাত্রির ভিড় কমিয়া গিয়াছে, সর্ব্বসমেত হয়ত ১০/১৫ জন শিষ্য আশ্রমে আছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত ভিক্ষুরাম ঘোষাল দাদা মহাশয় কোনও কার্য্যব্যপদেশে ৺বণ্ডুলেশ্বরের মন্দিরের পশ্চিম

দিক্‌পানে যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পা-পা করিয়া পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিয়া দ্বিতল বাটীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে বাবা সে ঘরে আসিলে পর ভিখু দাদা বলিলেন, "বাবা, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আপনি মন্দিরের দালানের মেঝেতে শয়ন করিয়া কুর্ম্মের ন্যায় হস্ত পদ ও মস্তক ধড়ের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছিলেন, আমি না জানিয়া গিয়া পড়ায়, হয়ত আপনার বিঘ্ন হইয়া থাকিবে, আমি বড় ভয় পাইয়াছি।" বাবা হাসিতে হাসিতে সুমধুর স্বরে বলিলে, "ভয় কি গো, না দেখিলে তোমরা শিখিবে কি প্রকারে? ওগো, ছেলেরা এই কটা দিন যা পরিশ্রম করিয়াছে, যদি আমি তাদের সমস্ত পরিশ্রম আকর্ষণ পূর্ব্বক এই ক্রিয়া দ্বারা নষ্ট না করি, তাহা হইলে বাছারা যে পীড়িত হইয়া পড়িবে।"

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাদার উপনয়ন উপলক্ষে বহু গ্রামস্থ-ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ হয়। আশ্রমের সমস্ত স্থানেই ঠাঁই হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণও বসিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তথাপি অনেক ব্রাহ্মণ স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া আছেন এবং রৌদ্র এত বেশী প্রখর যে, ক্ষণমাত্র উঠানে বা অনাবৃত স্থানে দাঁড়ান যায় না। উঠান ব্যতীত আর অন্য কোথাও স্থান না পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি, এমন সময়ে বাবা আদেশ করিলেন, "উঠানে আসন পাতিয়া বসিবার জায়গা করিয়া দাও। তোমরা দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ?" আমরা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঠাঁই করিয়া দেওয়া মাত্র সমস্ত উঠানের আকাশ জুড়িয়া চাঁদোয়ার (চন্দ্রাতপের) ন্যায় একটি কালো মেঘ আসিয়া দাঁড়াইল এবং যতক্ষণ ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিসমাপ্তি না হইল ততক্ষণ ভৃত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; অথচ এই সীমানার অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থান মাঘ-ফাল্গুনের সূর্য্যালোকে যেন পুড়িয়া যাইতেছিল।

অদ্য হইতে ১৬/১৭ বৎসর পূর্ব্বে যে অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়াছিল, সেই যোগে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য আমরা নানা স্থান হইতে প্রায় ৫০/৬০ জন শিষ্য বর্দ্ধমানে রাণীগঞ্জ বাজারের আশ্রমে সমবেত হই। পরে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকালে উপস্থিত হই। সমস্ত শিষ্যের সহিত গঙ্গায় অবতরণ করিবার সময় পরিধানের ধুতি ও গামছাখানি ব্যতীত বাবা আর কিছুই লন নাই। কিন্তু পূজা করিবার সময় কত রকমের ফল ও কত পুষ্প ও উপকরণ দিয়া যে পূজা করিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সে সময় আমি বাবার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। যাত্রীর সমাগম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় আমরা ভাবিতেছিলাম, কি প্রকারে ট্রেনে স্থান পাইব। কিন্তু গাড়ী আসিবামাত্র বাবা প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া বসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যাইতে বলিলেন। আমরা নির্ব্বিঘ্নে বর্দ্ধমানে পৌঁছিলাম।

একবার (১৯১১) ৺শিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষ্যে ৺বণ্ডুলাশ্রমে যথারীতি গমন করি। ব্রত উপবাস, ব্রাহ্মণভোজনাদি সমস্ত কার্য্য শেষ হইবার পর, বাবাকে একাকী

পাইয়া, হঠাৎ মনের চাঞ্চল্য অবস্থা কেন আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, বাবা বলিলেন, "অদ্য হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ম্লেচ্ছদের দেশে অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইবে; তোমায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ দিবস তথায় অনেক বিপদ-সঙ্কুল স্থানে থাকিতে হইবে। কিন্তু কোনও চিন্তা নাই, তোমার পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে না। সেজন্য এবং আরও দু-একটা ঘটনা ঘটিবে বলিয়া মনের চাঞ্চল্য আসিয়াছে। ভাল করিয়া কাজ করিয়া যাও, সব ভাল হইবে।"

দীক্ষিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে মানসিক অবস্থা এরূপ হইল যে, নিজ গুরু-ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গ ভাল লাগিত না। তখন ভগবৎ-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথায় কান দিতাম না। ক্রমে এরূপ ব্যাপার দাঁড়াইল যে, আমাকে পুরুলিয়ার চাকরী ত্যাগ করিতে হইল। চাকরী ছাড়িয়া প্রায় ২/৩ মাস যথেচ্ছাক্রমে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, বাড়ীর কোনও সংবাদ রাখিতাম না। তৃতীয় মাসের শেষাংশে, একদিন বালীগ্রামের বারেন্দ্রপাড়ায় গঙ্গার ঘাটে বেলা দুইটার সময় নিজমনে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন যুবা সন্ন্যাসী আসিয়া আমায় বড়ই মধুরস্বরে বলিলেন, "বাবুজী, আপ্ ইস্ হাল্‌মে রহনেসে ঠিক নেহি হোগা। ফির বাবু, ঘর বাপিস্ যাও। পছিম্ মে যানেহীসে আপকা সরকারি নোকরি হোগা।" অথচ প্রাতে শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয় আসিয়া মিরাটে লইয়া যাইবার জন্য কত খোসামোদ করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই।

কথাগুলি প্রাণে আঘাত করিল। খানিক পরে উঠিয়াই সন্ন্যাসীটির চতুর্দ্দিকে অনেক সন্ধান করিলাম, কিন্তু আর দেখা পাইলাম না। মনে হইল, বাবা যেন রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া আমায় একথা বলিয়া গেলেন। সেই রাত্রেই রাঁচি এক্সপ্রেসে চড়িয়া পুরুলিয়া যাত্রা করিলাম এবং পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় মিরাট যাত্রা করিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার Assistant Director of Supplies and Transport অফিসে চাকরী হইল। পরে জানিলাম, পুত্রের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া, বাবা এই কার্য্য করিয়াছিলেন।

চাকরী গ্রহণ করিবার দেড় বৎসর জর্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল ৪ঠা আগষ্ট ১৯১৪ সালে ইংরাজ-গর্ভণমেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৪ই তারিখে আমরা প্রস্তুত (mobilized) হইলাম। ২০শে মিরাট হইতে রওনা হইয়া, লাহোর হইয়া ২৪/২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত করাচি পৌঁছিলাম। পরে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখ City of Lahore জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে চড়িয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিলাম। কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, একথা তখন অজ্ঞাত রহিল। জাহাজ তীর হইতে ৩/৪ মাইল দূরে গিয়া নঙ্গর করিয়া রহিল। বোম্বাইতে অবস্থিত ৩২ খানি জাহাজের দ্বিতীয় G.O.C.-র (১৬ খানি করাচি হইতে এবং ১৬ খানি বম্বে হইতে এক সময়ে ছাড়িয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমুদ্রে মিলিত হইবে) বেতার হুকুমের

অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রিতে জাহাজ কখন ছাড়িয়াছে টের পাই নাই। পরদিন প্রাতে ১০॥ টা নাগাদ জাহাজের সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত ও ভীত হইয়াছে দেখিলাম। বোম্বাই হইতে যে বহর ছাড়িয়াছে তাহারই ২/১টা মাস্তুল দেখিয়া শত্রুপক্ষ সাবমেরিন জ্ঞানে এত ভীত হইয়াছিল। পরে ছাদ হইতে Flag করিয়া ও দুটি Dreadnaught অগ্রগামী হইয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিল। ৩২ খানি জাহাজ গতির বেগ অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চলিতে লাগিল।

প্রথম যখন জাহাজে উঠি, খাকী হাফপ্যান্ট, কোট ও হ্যাট পরিয়াছিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্নান ইত্যাদি করিয়া সন্ধ্যায় বসিলাম। সঙ্গে গঙ্গাজল ছিল এবং জপিবার রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ হইবার পর, আমার সহযাত্রী দুইজন পাঞ্জাবী গোমস্তা, যাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমাকে কেবিন হইতে বাহির করিতে পারেন নাই, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ জী, বাবুজী,. আপ্ হিন্দু হ্যাঁয়, ভগৎ হ্যাঁয়, ব্রাহ্মণ হ্যাঁয়, হামলোগোঁকো মাপ করনা, হামতো আপকো ঈশাই সম্‌ঝা থা।" ছাড়িবার তৃতীয় দিন হইতে রসদ বিভাগের ভার আমার উপর পড়িল। ২০০০/২৫০০ লোকের ভরণপোষণ আমার উপর। সুতরাং জাহাজের মধ্যে ব্যানার্জিবাবু বা মিষ্টার ব্যানার্জি একটা কেউ-কেটা নয়; আবার কোট প্যান্টের ভিতরেও একটু 'হিন্দুয়ানি' দেখিয়া অনেকে বেশ একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। সেপ্টেম্বর মাসে আরব্য সমুদ্র অত্যন্ত বাত্যাহত হইয়া থাকে এবং জাহাজ অত্যন্ত দোদুল্যমান হওয়ায় আরোহিগণ প্রায় সকলেই বমি করিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। বাবার কৃপায় আমার একটি দিনও মাথা ধরে নাই বা বমি হয় নাই। হিন্দু সিপাহীদের রান্না হইয়া গেলে পর চৌকা দিয়া আমার দেহরাদূন হইতে আনীত পাহাড়ী ক্ষত্রিয় চাকরটি বেলা তিনটার সময় খিঁচুড়ি রাঁধিত এবং রাত্রি এবং পরদিন প্রাতঃকালের জন্য পরোটা তৈয়ার করিয়া রাখিয়া দিত। জাহাজে বেশ আনন্দের সহিত কাটিয়া গিয়াছিল। সুয়েজ ক্যানেলে আমাদের জাহাজে একরাত্রি ক্যানেলের ধারে লাগিয়া Stranded হইয়া যাওয়া ব্যতীত এমন বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

১৪ই অক্টোবর মারসেল বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলাম। ১৫ই তারিখ ট্রেণের বন্দোবস্তে গেল। ১৬ই বেলা ১০টার সময় ট্রেণে চড়িয়া ক্রমান্বয়ে আট দিন ধরিয়া যাই। কেবলমাত্র প্রাতে দুই ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুই ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী দাঁড়াইত—স্নান, রান্না, খাওয়া ইত্যাদির জন্য। মালগাড়ীতে বেঞ্চ পাতিয়া কোনও প্রকারে যাইবার উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল। গাড়ীতে আর কুলাইতে পারে নাই। কষ্টের সীমা ছিল না। যে ষ্টেশনেই গাড়ী থামিত, সেইখানেই ফরাসী ভদ্র পুরুষ ও মহিলারা, দুধ, ফল, রুটি, মদ ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য সৈন্যদের উপহার দিতেন। ২৫শে আগষ্ট Orleans শহরে আসিয়া

পঁহুছি। শহরের প্রান্তে ময়দানের উপর তাঁবু গাড়িয়া রহিলাম। ক্রমে এক একটি করিয়া unit form করিয়া সমবেত লোকদের বিভিন্ন স্থানে (firing line) -এ পাঠাইতে লাগিল। রেলওয়ে ষ্টেশনে আমাদের ৫/৭ জনের কাজ পড়িল।

এই স্থানে একদিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া তাঁবুতে সন্ধ্যা আটটার সময় ফিরিয়া আসি। মনে করিলাম, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার পর সন্ধ্যাহ্নিক করিব। কিন্তু শুইবামাত্র এত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম যে, রাত্রি বারটার পর শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার শিরোদেশে সেই মনোহর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সুমধুর স্বরে আমায় ডাকিয়া জাগ্রত করিলেন—"শিবরাম, কই আজ আহ্নিক করিলে না।" আমি মূর্ত্তি দেখিয়া ও শব্দ শুনিবামাত্র "জয় গুরু নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া এত জোরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম যে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা জাগিয়া উঠিয়া, আমার কোন বিপৎপাত হইয়াছে ভাবিয়া আমায় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, শুধু এই কথা বলিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিলাম বটে, কিন্তু নিজে বাকী সমস্ত রাত্রি প্রায় বসিয়া রহিলাম। অনেক কাঁদিলাম, অনেক নালিশ করিয়া বাবাকে পত্র লিখিলাম।

কিছুদিন পরে বেলজিয়াম্ ও ফ্রান্সের সীমানাস্থ এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে First Indian Cavalry Division ডিভিসনাল ট্রুপস-এ আসিয়া যোগদান করিল। সেই হইতে প্রায় প্রত্যেক তৃতীয় দিবসে ৪০/৪৫ মাইল মার্চ্চ করিতে হইত। শীতকালে তিনটার এবং গ্রীষ্মকালে নয়টার সময় সন্ধ্যা হইত। এরোপ্লেনে দেখিতে পাইবে বলিয়া শীতকালে তিনটায় মার্চ্চ আরম্ভ হইয়া রাত্রি তিনটায় শেষ হইত, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু মাঠে ঘাটে যেখানে সেখানে কাটাইয়া, প্রাতঃকালে আবার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। সেদেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় ১০ মাস বাদল, বৃষ্টি, কুয়াশা ও বরফে কাটিয়া যায়। সূর্য্যদেব ছয় সাত সপ্তাহমাত্র দর্শন দেন।

এ সব প্রাকৃতিক বৈষম্য ত আছেই। তা ছাড়া ট্রেঞ্চ হইতে শেল এবং এরোপ্লেন হইতে বোমা প্রত্যহই পড়িত। পাশাপাশি, পথে, মাঠে এত লোক বোমা বা শেল হইতে মারা যাইত যে, এ সমস্ত দেখিয়া "রাখে হরি মারে কে" এই কথাটি মাত্র স্মরণ করিয়া দিনপাত করিতাম। কিন্তু আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে ১৯১১ সালে তিন বৎসর পূর্ব্বে যে শুনিয়াছিলাম আমার পায়ে কুশাগ্র বিদ্ধ হইবে না, বাস্তবিক তাহাই হইল। আমি একটি দিনের জন্য অসুস্থ পর্য্যন্ত হই নাই।

Kut-El Amara-তে জেনারেল টাউনসেণ্ড ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে তুরস্ক ও জর্ম্মাণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলে বেলজিয়াম ও ফ্লাণ্ডার্স হইতে আমরা পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব, এই অজুহাতে মার্সেলে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া শুনিলাম, তাহা নহে; হয় ডার্ডানালেস্, নয় বসরা যাইতে

হইবে। ভূমধ্যসাগরে তখন জর্ম্মাণিরা প্রায়ই সৈন্যের জাহাজ সাবমেরিন দ্বারা ডুবাইতে লাগিল। সুতরাং জাহাজে চড়িয়া এলেক্‌জান্দ্রিয়া যাইতে হইবে শুনিয়া সকলেরই অত্যন্ত ভয় হইল, মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মিলিটারী হুকুম, অগ্রাহ্য করিবার যো নাই। সুতরাং অম্লানবদনে 'জয় গুরু' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ২৩শে ডিসেম্বর City of Barala-তে চড়িয়া রওনা হইলাম। কোথায় যাইব, কেহ জানে না। মার্সেল হইতে এলেক্‌জান্দ্রিয়া সাত দিনের রাস্তা, কিন্তু আঠার দিনের রেশন লইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ছাড়িয়া ঘণ্টা খানেক যাইতে না যাইতেই একটি ছোট মোটর বোট তরতর করিয়া আসিয়া কাপ্তেনকে জাহাজ থামাইতে সঙ্কেত করিল। জাহাজ থামিলে ফরাসী অফিসারটি megaphone দ্বারা বলিল, "পথ অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল। এই কিছু পূর্ব্বে ২টি ফরাসী বা ১টি ইটালীয় জাহাজ জর্ম্মাণ সাবমেরিন ডুবাইয়াছে। আপনারা অদ্য রাত্রি শেষ অবধি আমাদের নেভাল বেস ফুলনে নঙ্গর করিয়া থাকুন।" তাহাই হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করিতাম না। তিনি কত ভাবে কত প্রকারে অভয় দান করিয়াছেন যে, ভয় আর হৃদয়ে স্থান পায় না, সুতরাং বেশ ঘুমাইলাম।

পরদিন বেলা ১২টার পর—জাহাজ অবশ্য ভোর বেলাই ছাড়িয়াছে—বিপদ উপস্থিত হইলে কি ভাবে কাজ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। জাহাজ চার বার বাঁশী বাজাইবে। আমাদের দ্বিতলের ডেক-এর দক্ষিণ দিকের বারেণ্ডার কোণে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। লাইফ বেল্ট বা লাইফ বয়টি সমস্ত দিন পড়িয়া থাকিতে হইবে ও রাত্রিতে মাথার নীচে রাখিতে হইবে। Roll call হইবে। একজন ব্রিটিশ সৈনিক রাইফেল হাতে সুমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং একজন কাপ্তেন পদবী প্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসার থাকিবেন। জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ করিলে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সম্মুখস্থ লঞ্চ বোটে অফিসারের হুকুম ব্যতীত উঠিতে যাইলেই ব্রিটিশ সৈনিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলি করিয়া মারিবে। কর্সিকাও সার্ডিনিয়া বেশ পার হইয়া আসিলাম। সিসিলি এবং ইটালীর মাঝখান দিয়া আসিবার পরই বিপদ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিন অন্ততঃ পক্ষে ২/৩টি Wireless আসিত যে সাবমেরিনের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য তোমরা নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে তিন মাইল উত্তরে চলিয়া যাও—ইত্যাদি। এইভাবে উত্তর-দক্ষিণ, পশ্চিমে বাহিয়া মালটা দ্বীপে আসিলাম। মালটা বন্দরের ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের বন্দর হইতে বাহির হইবার জন্য অপর একটা জাহাজকে একই সঙ্গে সিগনাল দেওয়ায় গেট পার হইয়া কিঞ্চিৎ যাইতে না যাইতে দুই জাহাজে ভয়ানক সংঘর্ষ হইল। আমি তখন জাহাজের ডেক-এর উপর। মনে করিলাম যদি ডুবে, জাহাজ হইতে লাফ দিয়া সমুদ্রে পড়িব। অপর জাহাজের কাপ্তেন বোটটা একটু

বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তত্রাপি শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় জল হইতে এক বিঘৎ উপরে একটি চার ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া গহ্বর হইয়া গেল এবং বামদিকের সমস্ত লঞ্চ বোটগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। আমরা মালটায় ৮/১০ দিন রহিলাম। জাহাজ মেরামত হইতে লাগিল। জাহাজ হইতে নামিয়া শহরে যাইতে নিষেধ হইল। ৭/৮ই জানুয়ারি আমরা পুনরায় মালটা ছাড়িয়া এলেক্‌জান্দ্রিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ডার্ডানালেস Expeditionary Force-এর 'বেস' (base) ছিল মালটা, সুতরাং মালটা হইতে এলেক্‌জান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত স্থানটি অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল। মালটা ছাড়িবার পর দিন বেলা দুইটার সময় আমাদের সামনের পথের দুই মাইল মধ্যে P &O, জাহাজ জর্ম্মাণ সাবমেরিন টরপেডো দ্বারা ডুবাইল। অনন্তর ৫/৭ দিন বহু কষ্টের পর এলেক্‌জান্দ্রিয়াতে আসিয়া পঁহুছিলাম। তখনি জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং-এর একজন সহকারী মোটর বোট-এ আসিয়া হুকুম দিয়াছিলেন, "You are meant for another theatre of war' and not for India', সুতরাং ভারতবর্ষ ফিরিয়া যাইবার ক্ষীণ আশা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল। আবার জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম! তথা হইতে সুয়েজ কেনাল, লোহিত সাগর, ভারত সাগর, পারস্য উপসাগর পার হইয়া ৩১শে জানুয়ারী ১৯১৭ টাইগ্রীস নদী ও পারস্য উপসাগর পার হইয়া ৩১শে জানুয়ারি ১৯১৭ টাইগ্রীস নদী ও পারস্য উপসাগর-সঙ্গমে আসিলাম। নদীর লাল জল এবং সমুদ্রের কাল জলের মিশ্রণ দেখিয়া কবি কালিদাসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের বর্ণনা মনে উদয় হইল। ২রা ফেব্রুয়ারী বসরাতে নামিলাম।

ইহার পর হইতে দুঃখ বিশেষভাবে আরম্ভ হইল। ২/৪ দিনের পর ফ্রন্টে যাইবার জন্য হুকুম হইল। একটি ফেরী ষ্টীমারের দুই পাশে দুইখানি বার্জ বাঁধিয়া ঘণ্টায় ২/৪ মাইল হিসাবে টাইগ্রীস নদী বাহিয়া বোগদাদ অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। ফ্রান্স এবং মেসোপটামিয়াতে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের ন্যায় পার্থক্য। সন্ধ্যা হইলেই অনিয়ত আরব ট্রুপস নদীর দু-পাশ হইতেই ফেরী ষ্টীমার ও বার্জের উপর বন্দুক ছুড়িত, সুতরাং মৃত্যু যে-কোনও মুহূর্ত্তে হইতে পারে এবং নদীর একটানা সমুদ্রমুখী গতি অত্যন্ত খরতরা; হঠাৎ গাদা বোট বা ফ্লাট (তাতে রেলীং নাই) হইতে পড়িয়া গেলে আর কোনও প্রকারে তীরে উঠিবার আশা নাই। এরূপ ভাবে কত লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ১০/১২ দিন এ ভাবে যাইয়া আবু রোমান বলিয়া কুট হইতে ৫/৭ মাইল নীচে বা দক্ষিণে এক স্থানে ষ্টীমার হইতে নামিলাম। সেখানে তখন কিছু কিছু শীত ছিল। নদীর ধারে তাঁবু পুতিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছি, হঠাৎ বাতাসে সমস্ত উঠাইয়া লইয়া গেল এবং সমস্তই ভিজিয়া গেল। পরে যখন গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল, উত্তাপ উঠিল ১২২° ডিগ্রি। প্রত্যহ ৫০/৬০ জন করিয়া রেজিমেণ্ট পিছু লোক মরিতে লাগিল। G.O.C., হুকুম দিলে, বেলা ১২টা হইতে

৩টা অবধি সাধ্যমত কোনও কার্য্য হইবে না। এপ্রিল মাসের প্রারম্ভেই তুর্কীগণ গ্রীষ্মাগমনের ভয়ে ১৫ মাইল পিছাইয়া গেল। ২/১ দিন মধ্যে এরোপ্লেনে যাইয়া তাহা জানিতে পারিয়া আমাদের ট্রুপসও অগ্রগামী হইল। কিন্তু যাইবার পর দিনই শুনিলাম, জলাভাবে শতকরা ১০ জন লোক মারা পড়িয়াছে। আমাদের অফিসের লোকেরা মন্ত্রণা করিল, রাত্রিকালে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাইবে। আমি বলিলাম, আগামী প্রাতেই চারিটা সাড়ে চারিটার সময় জেনেরল সাহেবের সহিত পদব্রজে যাইব। আমার সহিত হেডক্লার্ক পণ্ডিতজী একমত হইলেন। কিন্তু ঠিক পথ কোন্‌টি জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুলভাবে একাকী বাবাকে ডাকিতে লাগিলাম। দিব্য শুনিতে পাইলাম "তিলার্দ্ধ থাকিবে না, সিপাহীদের সহিত যাওয়াই ঠিক।"

এই পথে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছি, সেরূপ দৃশ্য ফ্রান্সেও দেখি নাই। বলা বাহুল্য, আমি পরদিন পদব্রজে ১৫ মাইল হাঁটিয়া বেলা ২টার সময় যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম, পথে সমস্ত জলাশয় শত্রু-কর্ত্তৃক বিষাক্ত করা হইয়াছে। আমাদের অফিসের প্রায় ১৫ জন লোক আমাদের কিট (তৈজসপত্র) ও অফিসারের অনেক জিনিস লইয়া রাত্রিতে যাত্রা করিয়া ৩০০ গাড়ি 'রেশন কনভয়' (৫০০ সংখ্যক ব্রিটিশ ও ভারতীয় অশ্বারোহী ও পদাতি কর্ত্তৃক অনুগত) ধরিবার জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিয়াও তাহাদের ধরিতে না পারিয়া, (কারণ রাতারাতি শত্রুর গতিবিধি দেখিয়া টেলিগ্রাফ দ্বারা রাস্তা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল) রাত্রি ৪টার সময় ৭০ তুর্কী কেবলরি বা ৩০ ইরেগুলর আরব দ্বারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া বন্দী হইল। জেনেরলের ৩০ জন দেহরক্ষক তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না। ভাবিয়া দেখুন, এই আমার সঙ্গীদের পরামর্শ ও ভয় প্রদর্শন অনুসারে কার্য্য করিলে আমার অবস্থা কি হইত।

সেপ্টেম্বর মাস অবধি নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিয়া একটি সারকুলার অনুসারে ছুটির জন্য আবেদন করিয়া যখন বিফল-মনোরথ হইলাম, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় বাবাকে ডাকিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, 'বাবা, আজ গত তিন বৎসর ৺শ্রীশ্রীশারদীয়া পুজা দেখি নাই। আমি এবার যেন ঠিক ষষ্ঠীর দিন বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারি।' এই বলিয়া কেবলমাত্র একটিন দুগ্ধের উপর (sterilized milk) নির্ভর করিয়া ২২ দিন উপবাস করি। বাবা একটু ধৌতি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাই সাহেবকে বুঝাইলাম, আমি যাহা খাইতেছি কিছুই পেটে থাকে না, বমি করিয়া ফেলি। ২২ দিনের দিন জ্বর হইতে ভয়ানক ভয় হইল। এত দুর্ব্বল হইয়াছি—উঠিবার শক্তি নাই। সাহেবকে ডাকিয়া বলিতেই সাহেব বড় ডাক্তার-সাহেবকে দেখাইতে বলিলেন। তিনি বলিলেন এপেণ্ডিসাইটিস হইয়াছে। সেই দণ্ড হইতে খুব যত্ন হইতে লাগিল। তার পরদিন মোটর বোট-এ করিয়া প্রায় ১২ মাইল নীচে এক হাসপাতালে আরব গ্রামে যাইলাম। শ্রীশ্রীগুরুজীর কৃপায় এখানকার বড় সাহেব ২/৪ দিন

রাখিয়া একেবারে বসরায় পাঠাইয়া দিলেন। একটু একটু খাইতে আরম্ভ করায় চেহারার পরিবর্ত্তন হইতেই ভয় হইল, পাছে পুনরায় উপরে পাঠাইয়া দেয়। অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া একদিন বাবার কৃপায় বোম্বাই যাইবার জন্য হুকুম হইয়া গেল। বলিতে কি, বাস্তবি[illegible]ক্ষে আমার কোনও ব্যাধি ছিল না। ক্রমে একদিন শুভক্ষণে Hospital জাহাজে চড়িয়া সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বোম্বাই আসিয়া পঁহুছিলাম।

জাহাজ হইতে নামিয়া (লর্ড) হার্ডিঞ্জ হাসপাতালে আসিয়া উঠিলাম। দুই চারি দিন পর সাহেব বড় ডাক্তার বলিলেন যে, আমার এপেণ্ডিসাইটিসে অস্ত্র করিবেন। যে সমস্ত রোগীর অস্ত্র হইয়াছে তাহাদের ফোটো দেখাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন যে আমায় লিখিয়া দিতে হইবে যে মৃত্যু হইলে কেহ দায়ী নন। উত্তরে আমি সাহেবকে বলিলাম—"Sir, in consideration of my active service for more than two years all along the firing line, please release me from this Hospital and let me be operated on by medical men in the Medical College, Calcutta, amongst my own men, whom I did not see for years. If, in the very act of operation, I may meet death, I shall die a peaceful death," সাহেবের কিরূপ দয়া হইল। তারপর দিনই আমাকে রেলওয়ে ওয়ারেণ্ট দিয়া হাসপাতাল হইতে বিদায় দিলেন। আমি মেলে চড়িয়া মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে তিন দিন পর রাত্রি ১২টার সময় আসিয়া পঁহুছিলাম। পরে সেখান হইতে ঠিক ষষ্ঠীর দিন প্রাতে ৬টার সময় পুরুলিয়ায় নিজ বাটীতে পৌছি ও যথাসময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্দ্ধমানে সমস্ত নিবেদন করি।

অত্যন্ত সংক্ষেপে কেবলমাত্র দু-একটা ঘটনা দেওয়া হইল! ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, শ্রীশ্রীগুরুজীর কৃপা অবলম্বনে এ অবস্থায় আমাদের মত ভীরু বাঙ্গালী এরূপ ভীষণ যুদ্ধস্থলে কি প্রকারে একদিনের জন্যও ভীত হয় নাই এবং প্রত্যহ সাধ্যমত জপ করিয়া আসিয়াছে।

শ্রীশিবরাম বন্দোপাধ্যায

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পেন্‌সন্-প্রাপ্ত সাবজজ

আমি লেখক নহি, লিখিতে জানি না। আমি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের একজন দাসানুদাস শিষ্য মাত্র। কিছুকাল যাবৎ মনে হইতেছিল যে, পরমারাধ্য সাক্ষাৎ ভগবান আমার উদ্ধারের উপায় করিতেছেন। কিন্তু কই আমি ত তাঁর

কিছু করিতেছি না।

১৯১১ সালে আমি বর্দ্ধমানের চতুর্থ আদালতের মুন্‌সেফ ছিলাম। তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর কথায় আমি একটানে সাড়ে পাঁচ বৎসর ছিলাম। সেই সময় গুষ্করায় বাবাজীর আশ্রম ছিল। বর্দ্ধমানে হরি দে ময়রার জামাতার একটি বাড়ী লওয়া হইয়াছিল। তথায় আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাবাজী থাকিতেন। আমার উপর কোন মহাপুরুষের আদেশ ছিল, এই সময়ে আমি আমার চিরকালের গুরু পাইব এবং তিনি এক মহাপুরুষরূপে প্রকট হইবেন। তিনিই ইনি, ইহা জানিয়া ও বাবাজীর নাম ও গুণ শুনিয়া ইঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। প্রথম দিনে যখন গিয়া প্রণাম করিলাম, আমার সহিত ব্যবহার করিলেন যেন কত কালের আলাপী; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে আমার মন-প্রাণ যা-কিছু সব ঐ শ্রীচরণ দুখানিতে অর্পণ করিলাম। সেই অবধি আমি বাবাজীর শ্রীচরণের তলায় মিশিয়া গিয়াছি। সে সময় আমি বাবাকে যে কি দেখিলাম, তাহা আমি লেখনীতে বর্ণনা করিতে পারি না। অপূর্ব্ব ভাব। আমি জানিলাম, ইনিই আমার তিনি, ইনি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব—আমার চিরকালের ধন। বাবা প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া আসিয়া বসিয়াছেন, সেই সময় আমি কৃষ্ণবাবু ও বিনোদবাবুর সহিত গেলাম যাইয়া এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাইতে লাগিলাম। আমি চারিদিক অনুসন্ধান করিলাম। ক্রমে জানিলাম, বাবাজীর অঙ্গ হইতে এই সুগন্ধ বাহির হয়। আমি বর্দ্ধমানে থাকিতে থাকিতে ৩০০ টাকা হইতে ৪০০ টাকা, পরে ৫০০ টাকা বেতন পাইয়া পরে সাব-জজ হইয়া কিছুদিন কাজ করিয়া ঢাকায় যাই। বাবাজী শিষ্যদিগকে যোগে উৎসাহ দিবার জন্য দাদাগুরু মহারাজের উপদেশ-মত কিছু কিছু বিভূতি দেখাইতেন। তিনি বলিতেন, যোগের অসাধারণ ক্ষমতা এবং দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কত কি দেখাইতেন। সেই সময় হইতে আমি আশ্রম ছাড়িতাম না, ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতাম। চাকর কাপড় আনিত, ঐখানে কাপড় ছাড়িতাম। চাকর আমার গয়ার তামাক গুল-টীকা আনিত, আমি সাড়ে পাঁচ বৎসর যাবৎ তামাক সাজিয়া বাবাকে খাওয়াইয়া সুখ ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহাতে কেহ কেহ হিংসা করিতেন। তাঁহারা দুদিন তামাক সাজিলেন, ধোঁয়া একেবারে বাহির হইল না। আমি আবার ঢালিয়া সাজিয়া দিতাম, তবে ধোঁয়া বাহির হইত। সেই অবধি ঐ কাজটি সকলে আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। এই ঘটনা হইতে সকলের একটু জ্ঞানলাভ হইল। বাবাজী একটি আঙ্গুল দিয়া এক সময়ে পর পর কত যে গন্ধ বাহির করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সব বিপরীত গন্ধ পর পর বাহির হইত। ফেনাইন দিয়া পরেই পদ্ম-গন্ধ, কি ভায়লেট, কি গোলাপ-গন্ধ বাহির করিতেন। ধোপার বাড়ী হইতে কাপড় কাচিয়া আসার পরেও ঐ গন্ধ থাকিত। অবিশ্বাসীর দল কেহ বলিত, আঙ্গুলে লাগান আছে, কেহ বলিত, পেটে আছে। মৃত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় উকিল একদিন সাবান দিয়া প্রত্যেকবার আঙ্গ

ুল ধুইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে কিন্তু গন্ধ আরও বেশী হইতে লাগিল। বাবাজী তাঁহাকে বলিলেন, "উহাতে যে তড়িৎ আরও বেশী হয়। তখন তিনি বলিলেন, "তবে পেটে গন্ধ আছে", কিন্তু পেট অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। একদিন ঐরূপ একটি বাবু বলিলেন, "দুইটি সদ্‌গন্ধের মধ্যে বিষ্ঠার গন্ধ দিন।" এই কথা শুনিয়া বাবাজী উপর ঠোঁটে তর্জ্জনী ঠেকাইয়া দিলেন, তাতে বাবু বমি করিয়া বাবার কাছে আসিয়া পড়েন। তখন যেমন ছিল তাই হইল। আশ্রমের চাকর ও আমার একটি চাকর প্রত্যহ বাবাজী আহ্নিক উঠিবার পরে আসনে একটি করিয়া গাঁজা পাইত। ঐরূপ জিনিস বাজারে পাওয়া যাইত না। একটা চাঁপাফুলের বড় কুঁড়ি গাঁজা হইয়া থাকিত। নিত্য আমি পদসেবা করিতাম। একদিন রাত্রে যেমন পায়ের তলা ঘসিয়া দিয়াছি, ঝর ঝর করিয়া চন্দ্রকিরণের মত আগুন পড়িতে লাগিল। আমি চম্‌কাইয়া উঠিতেই বলিলেন "ভয় নাই, আর হইবে না।" গায়ে মাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, চড়াইপাখী ইত্যাদি বসিলে পুড়িয়া মরিয়া যাইত এবং আমরা চুল পোড়ার গন্ধ পাইতাম। এই অবস্থা এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত থাকিত। বগুলের গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তামাক খাইতে খাইতে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ভাল মশলাদার তামাক বুঝি আমরা খাইতে পাই না? শিষ্যের তামাক বলিয়া কি একলা খাইবে?" তৎক্ষণাৎ বাবা তাঁর কলিকার দিকে দৃষ্টি করিলেন। তখন ঘোষাল মহাশয় ভ্যাবাচাকা খাইয়া হাঁ করিয়া বলিলেন, "এ কি হইল, এই দা-কাটা খাইতেছিলাম, কি করিয়া মশলাদার ভাল তামাক হইল? সেই অবধি ঘোষাল মহাশয় আর কিছুই বলিতেন না। একদিন একটি সন্ন্যাসী একগাছি কাচের মালা আমায় দিয়া একটি পুরাতন দুই টাকা মূল্যের ঘড়ি লইয়া যায়। আমি তাহা লইয়া আশ্রমে বাবার কাছে গিয়া দেখাই। তিনি বলিলেন, "কিরে বাবা, তোকে ঠকাইয়া বুঝি কেউ কাচের মালা দিয়া পাঁচ টাকা লইয়া গিয়াছে?" আমি বলিলাম, "না বাবা, আমি ছেলেদের দুই টাকা দামের একটু পুরাতন ঘড়ি দিয়াছি।" বাবা বলিলেন, "মজা দেখ্‌বি, যদি উহা কাচ হয়, আমি চক্ষে দেখিলে ফাটিয়া যাইবে, আর স্ফটিকত হইলে কিছু হইবে না।" বাবাজী মালাছড়া চক্ষের সামনে এক হাত তফাতে ধরিলেন। তাহাতে ৮/১০টি ফুটকড়াইয়ের মত ফাটিয়া গেল। আমি সেগুলি বাঁধিয়া ছাঁধিয়া অনেক দিন রাখিয়াছিলাম। সকলেই অদ্ভুত ক্ষমতায় আশ্চর্য্য হইত—বিশেষতঃ অবিশ্বাসীর দল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় বাড়ীর মেয়েরা গোলাপজল খাইতে চাহিয়াছিল। তাহাতে সেইদিন কন্যাদের বাড়ীতে যত জল ছিল সব গোলাপ-জল হইয়া গেল। এমন কি, তাহারা গোলাপ-জলে আঁচাইয়াছিল। বাবাজীর মাথায় স্ফটিকের একছড়া মালা ও একটি বাণলিঙ্গ শিব আছে। যখন বাহির করিয়া পূজা করেন, সকলেই দেখিতে পায়। একদিন বলিলেন, "স্ফটিক শরীরের লোমকূপ দিয়া ঢোকাইয়া যেখান দিয়া ইচ্ছা বাহির করা যায়।" তার পরে তিনি দক্ষিণ হস্তের বুড়ো-আঙ্গুলের তলা দিয়া একটি

স্ফটিক পুরিয়া বরাবর লইয়া গিয়া একদিন নাভি দিয়া, একদিন কলার-বোনের নিম্নস্থান দিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

৺ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহারাণী নারায়ণকুমারীর ভিক্ষাপুত্র। তাঁহার অত্যন্ত তমোগুণ ছিল। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন বলিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার করিতেন। তিনি গুরুদেবের নিকট সকল রকম উপকার এবং সাহায্য লইতেন, কিন্তু গুরুদেবের নিকট হইতে বাহির হইবামাত্র তাঁহাকে নিন্দা করিতেন এবং গালি দিতেন। ক্ষেতুবাবুকে শিক্ষা দিবার জন্য একদিন প্রাতে বাবাজী বলিলেন, "দেখ ক্ষেতু, তুমি রহিয়াছ মাটিতে, আমি রহিয়াছি তক্তাপোষের উপর। তোমার হাতের উপর আমি হাত রাখিলে তোমার হাত পুড়িয়া যাইবে, আমি কেবল একবার আগুন ছুঁইয়া লইব।" বোধ হয় ক্ষেতুবাবু ইহা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বাহাদুরি করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং হাত পাতিলেন। বাবাজী তাঁহার হাতের উপর হাত দিলেন, কেবল মধ্যে একটি পাথরবাটী রাখিলেন; নতুবা হাত একবারে পুড়িয়া যাইত। প্রথমে ক্ষেতুবাবু বলিলেন, কিছুই জানিতে পারিতেছেন না, তারপর বলিলেন, একটু চিন্‌চিন্ করিতেছে, তারপর গুরুদেবের হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া মুখে পুরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বাবা নিষেধ করিয়া ঘৃত আনাইয়া সেই স্থানটিতে মাখাইয়া দিলেন। ঠিক টিকা পড়িলে হাত যেমন পুড়িয়া লাল হয়, সেইরূপ হইয়াছিল। বিশ্বনিন্দুকের আশ্চর্য্য গতি। এই ক্ষেতু ইহার পূর্ব্বে শক্তিবলে আনয়ন-করা কত জিনিস খাইয়াছে, কত কি দেখিয়াছে। আমরা কত রকমের জিনিস যে খাইয়াছি, কত রকম জিনিস ইচ্ছাশক্তি বলে আনয়ন করা দেখিয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। তিনি আমার সহিত বাবাজীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রথমে, যোগ ও আসন সম্বন্ধে উপদেশ লয়েন, তারপর গন্ধে মোহিত হইয়া নানারূপ গন্ধ লয়েন, তারপরে যোগ ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব দেখিতে চাহেন। বাবাজী খুব বড় পুষ্ট টাটকা আঙ্গুর তাঁহাকে দেন। তেজবাবু মুক্তকণ্ঠে ক্ষমতা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, "এরূপ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না।" বাবু রাজেন্দ্র দত্ত বর্দ্ধমানে ডিষ্ট্রিক্ট জজ থাকাকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র-বধূ এবং আরও একজন লোক ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন তিনি আমার সহিত গুরুদেবের কাছে যান, ও ক্ষমতা দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন। একদিন গুরুদেবের কাছে যান, ও ক্ষমতা দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন। একদিন গুরুদেবের পায়ের উপর পড়িয়া কনিষ্ঠ পুত্রের জ্বরের জন্য অনুরোধ করেন। বাবাজী আমাকে বলেন, "ছেলেটির ক্ষয় রোগ দাঁড়াইবে এবং উহা শিবের অসাধ্য;" পরে রাজেন্দ্রবাবুকে একটি ঔষধ দেন ও বলেন, "খুব উচ্চস্থানে পাথরবাটীতে গঙ্গাজলের মধ্যে ইহা রাখিবেন, প্রাতে উঠিয়া ইহা ধুইয়া জল খাইতে দিবেন। যদি ঔষধটি থাকে, ছেলেটি

ূল ধুইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে কিন্তু গন্ধ আরও বেশী হইতে লাগিল। বাবাজী তাঁহাকে বলিলেন, "উহাতে যে তড়িৎ আরও বেশী হয়। তখন তিনি বলিলেন, "তবে পেটে গন্ধ আছে", কিন্তু পেট অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। একদিন ঐরূপ একটি বাবু বলিলেন, "দুইটি সদ্‌গন্ধের মধ্যে বিষ্ঠার গন্ধ দিন।" এই কথা শুনিয়া বাবাজী উপর ঠোঁটে তর্জ্জনী ঠেকাইয়া দিলেন, তাতে বাবু বমি করিয়া বাবার কাছে আসিয়া পড়েন। তখন যেমন ছিল তাই হইল। আশ্রমের চাকর ও আমার একটি চাকর প্রত্যহ বাবাজী আহ্নিক উঠিবার পরে আসনে একটি করিয়া গাঁজা পাইত। ঐরূপ জিনিস বাজারে পাওয়া যাইত না। একটা চাঁপাফুলের বড় কুঁড়ি গাঁজা হইয়া থাকিত। নিত্য আমি পদসেবা করিতাম। একদিন রাত্রে যেমন পায়ের তলা ঘসিয়া দিয়াছি, ঝর ঝর করিয়া চন্দ্রকিরণের মত আগুন পড়িতে লাগিল। আমি চম্‌কাইয়া উঠিতেই বলিলেন "ভয় নাই, আর হইবে না।" গায়ে মাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, চড়াইপাখী ইত্যাদি বসিলে পুড়িয়া মরিয়া যাইত এবং আমরা চুল পোড়ার গন্ধ পাইতাম। এই অবস্থা এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত থাকিত। বণ্ডুলের গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তামাক খাইতে খাইতে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ভাল মশলাদার তামাক বুঝি আমরা খাইতে পাই না? শিষ্যের তামাক বলিয়া কি একলা খাইবে?" তৎক্ষণাৎ বাবা তাঁর কলিকার দিকে দৃষ্টি করিলেন। তখন ঘোষাল মহাশয় ভ্যাবাচাকা খাইয়া হাঁ করিয়া বলিলেন, "এ কি হইল, এই দা-কাটা খাইতেছিলাম, কি করিয়া মশলাদার ভাল তামাক হইল? সেই অবধি ঘোষাল মহাশয় আর কিছুই বলিতেন না। একদিন একটি সন্ন্যাসী একগাছি কাচের মালা আমায় দিয়া একটি পুরাতন দুই টাকা মূল্যের ঘড়ি লইয়া যায়। আমি তাহা লইয়া আশ্রমে বাবার কাছে গিয়া দেখাই। তিনি বলিলেন, "কিরে বাবা, তোকে ঠকাইয়া বুঝি কেউ কাচের মালা দিয়া পাঁচ টাকা লইয়া গিয়াছে?" আমি বলিলাম, "না বাবা, আমি ছেলেদের দুই টাকা দামের একটু পুরাতন ঘড়ি দিয়াছি।" বাবা বলিলেন, "মজা দেখ্‌বি, যদি উহা কাচ হয়, আমি চক্ষে দেখিলে ফাটিয়া যাইবে, আর স্ফটিকত হইলে কিছু হইবে না।" বাবাজী মালাছড়া চক্ষের সামনে এক হাত তফাতে ধরিলেন। তাহাতে ৮/১০টি ফুটকড়াইয়ের মত ফাটিয়া গেল। আমি সেগুলি বাঁধিয়া ছাঁধিয়া অনেক দিন রাখিয়াছিলাম। সকলেই অদ্ভুত ক্ষমতায় আশ্চর্য্য হইত—বিশেষতঃ অবিশ্বাসীর দল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় বাড়ীর মেয়েরা গোলাপজল খাইতে চাহিয়াছিল। তাহাতে সেইদিন কন্যাদের বাড়ীতে যত জল ছিল সব গোলাপ-জল হইয়া গেল। এমন কি, তাহারা গোলাপ-জলে আঁচাইয়াছিল। বাবাজীর মাথায় স্ফটিকের একছড়া মালা ও একটি বাণলিঙ্গ শিব আছে। যখন বাহির করিয়া পূজা করেন, সকলেই দেখিতে পায়। একদিন বলিলেন, "স্ফটিক শরীরের লোমকূপ দিয়া ঢোকাইয়া যেখান দিয়া ইচ্ছা বাহির করা যায়।" তার পরে তিনি দক্ষিণ হস্তের বুড়ো-আঙ্গুলের তলা দিয়া একটি

স্ফটিক পুরিয়া বরাবর লইয়া গিয়া একদিন নাভি দিয়া, একদিন কলার-বোনের নিম্নস্থান দিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

৺ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহারাণী নারায়ণকুমারীর ভিক্ষাপুত্র। তাঁহার অত্যন্ত তমোগুণ ছিল। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন বলিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার করিতেন। তিনি গুরুদেবের নিকট সকল রকম উপকার এবং সাহায্য লইতেন, কিন্তু গুরুদেবের নিকট হইতে বাহির হইবামাত্র তাঁহাকে নিন্দা করিতেন এবং গালি দিতেন। ক্ষেতুবাবুকে শিক্ষা দিবার জন্য একদিন প্রাতে বাবাজী বলিলেন, "দেখ ক্ষেতু, তুমি রহিয়াছ মাটিতে, আমি রহিয়াছি তক্তাপোষের উপর। তোমার হাতের উপর আমি হাত রাখিলে তোমার হাত পুড়িয়া যাইবে, আমি কেবল একবার আগুন ছুঁইয়া লইব।" বোধ হয় ক্ষেতুবাবু ইহা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বাহাদুরি করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং হাত পাতিলেন। বাবাজী তাঁহার হাতের উপর হাত দিলেন, কেবল মধ্যে একটি পাথরবাটী রাখিলেন; নতুবা হাত একবারে পুড়িয়া যাইত। প্রথমে ক্ষেতুবাবু বলিলেন, কিছুই জানিতে পারিতেছেন না, তারপর বলিলেন, একটু চিন্‌চিন্‌ করিতেছে, তারপর গুরুদেবের হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া মুখে পুরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বাবা নিষেধ করিয়া ঘৃত আনাইয়া সেই স্থানটিতে মাখাইয়া দিলেন। ঠিক টিকা পড়িলে হাত যেমন পুড়িয়া লাল হয়, সেইরূপ হইয়াছিল। বিশ্বনিন্দুকের আশ্চর্য্য গতি। এই ক্ষেতু ইহার পূর্ব্বে শক্তিবলে আনয়ন-করা কত জিনিস খাইয়াছে, কত কি দেখিয়াছে। আমরা কত রকমের জিনিস যে খাইয়াছি, কত রকম জিনিস ইচ্ছাশক্তি বলে আনয়ন করা দেখিয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। তিনি আমার সহিত বাবাজীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রথমে, যোগ ও আসন সম্বন্ধে উপদেশ লয়েন, তারপর গন্ধে মোহিত হইয়া নানারূপ গন্ধ লয়েন, তারপরে যোগ ও ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব দেখিতে চাহেন। বাবাজী খুব বড় পুষ্ট টাটকা আঙ্গুর তাঁহাকে দেন। তেজবাবু মুক্তকণ্ঠে ক্ষমতা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, "এরূপ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না।" বাবু রাজেন্দ্র দত্ত বর্দ্ধমানে ডিষ্ট্রিক্ট জজ থাকাকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র-বধূ এবং আরও একজন লোক ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন তিনি আমার সহিত গুরুদেবের কাছে যান, ও ক্ষমতা দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন। একদিন গুরুদেবের কাছে যান, ও ক্ষমতা দেখিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়েন। একদিন গুরুদেবের পায়ের উপর পড়িয়া কনিষ্ঠ পুত্রের জ্বরের জন্য অনুরোধ করেন। বাবাজী আমাকে বলেন, "ছেলেটির ক্ষয় রোগ দাঁড়াইবে এবং উহা শিবের অসাধ্য;" পরে রাজেন্দ্রবাবুকে একটি ঔষধ দেন ও বলেন, "খুব উচ্চস্থানে পাথরবাটীতে গঙ্গাজলের মধ্যে ইহা রাখিবেন, প্রাতে উঠিয়া ইহা ধুইয়া জল খাইতে দিবেন। যদি ঔষধটি থাকে, ছেলেটি

বাঁচিবে।” পর দিন প্রাতে ঔষধ ধুইয়া জল খাইতে দিতে গিয়া সকলে দেখিল, ঢাকার ভিতর হইতে পুটুলি-শুদ্ধ ঔষধ উবিয়া গিয়াছে। আমি স্থানটি দেখিয়াছি, অতি উচ্চ স্থান, কড়িকাঠের কাছ বরাবর। তারপর রাজেন্দ্রবাবু সব বুঝিতে পারিলেন। ছেলেটি পরে মারা গিয়াছিল। বনোয়ারিহাটী বাবু বর্দ্ধমানের পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন। হঠাৎ তাঁর এমন হইল, বাম হস্ত বুকের নীচে আর নামে না, হাত আড়ষ্ট হইয়া গেল। গুরুদেবকে বলিবার জন্য তিনি আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি গুরুদেবকে বলায় তিনি প্রাতে আহ্নিকের পর লইয়া যাইতে বলিলেন। একদিন প্রাতে বনোয়ারিবাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। বাবাজী ঠিক সেই সময় বাহির হইয়া আসিলেন। তখন গুরুদেব তাঁহার কাঁধের উপরে দুই দিকে আঙ্গুল দিয়া ধরিলেন। প্রথমে বনোয়ারিবাবু কিছু বুঝিতে পারেন নাই, পরে কাঁধটি চিন্‌চিন্ করিতে আরম্ভ করিল। যখন গুরুদেব বলিলেন, “এইবার দেখ দেখি”, তখন বনোয়ারি বাবু হাত নামাইলেন—হাত ঠিক হইয়া সহজ হইয়া গেল। একদিন দুপুরবেলায় আমরা কয়েকজন—তার মধ্যে ক্ষেত্রনাথবাবু, বনোয়ারিবাবু প্রভৃতিও ছিলেন—একশত আট মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সব ঘুরিয়া যখন বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিলাম, তখন সকলকার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, বাবাজী বলিলেন, “সকলের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, কিছু খাবে?” আমরা বলিলাম, “পেলে আর মাঠের মাঝখানে কে না খায়?” বাবা তখন “কি খাইবে” জিজ্ঞাসা করায় বনোয়ারিবাবু বলিলেন “পেড়া খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।” বাবাজী বলিলেন, “বৈদ্যনাথে একটি মাড়ওয়ারি পেড়া পূজা দিল—আনিয়া দিতেছি।” তারপরে অতি উৎকৃষ্ট পেড়া বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন। পরে যখন গাড়ী করিয়া বাড়ী আসিতেছিলাম, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “নরেন্দ্র, ধর ধর, অনেক পেড়া আসিয়াছে।” আমি তখন অম্লান বদনে সমস্তটা হস্তগত করিয়া পকেটে আনিয়া বাড়ীতে ছেলেদের দিলাম।

একদিন প্রাতে আমি আশ্রমে যাইয়া বাবার কাছে বসিয়া আছি। ইতিমধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (ওরফে নেড়ু; সে এখন হাইকোর্টের উকিল—আলিপুরে কার্য্য করে এবং এখন শিষ্য্য হইয়াছে, কিন্তু তখন ক্ষেতুবাবুর পাল্লায় পড়িয়া বিরুদ্ধবাদী ছিল) হঠাৎ ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষেতুবাবু এবং বাড়ীর অপর লোকে ডাক্তার খুঁজিয়া পাইল না। নেড়ুর হার্ট কেমন করিতেছিল, আমার হঠাৎ মন খারাপ হওয়ায় আমি এক রাস্তা দিয়া বাড়ী আসিতেছি, উক্ত ক্ষেতুবাবু অপর রাস্তা দিয়া গুরুদেবের কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মহাশয়, আপনি কি রকম গুরু—আপনার প্রিয় ও প্রধান শিষ্যের জ্যেষ্ঠপুত্র হঠাৎ মর-মর, আর আপনি এখানে মজা করিয়া বসিয়া আছেন।” তাহাতে গুরুদেব স্থিরভাবে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,

"দেখ ক্ষেতু, চালাকি করিও না, ছেলেতে আর শিষ্যতে কোন প্রভেদ নাই। নেড়ুর কিছুই হয় নাই, গর-হজমের জন্য পাকস্থলী ফুলিয়াছিল, গিয়া দেখ গে এখন ঠিক হইয়া গিয়াছে ও ভাল আছে।" আমি বাড়ী আসিয়া দেখি, নেড়ু ভাল হইয়া গিয়াছে ও সোডা খাইতেছে। ক্ষেতু দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "আপনার গুরুদেব এই সব কথা বলিলেন।" তখন তিনিও দেখিলেন, নেড়ু ভাল হইয়া গিয়াছে। গুরুদেব যাহা বলিয়াছেন। ডাক্তার অটলবাবু তখন আসিয়া সেই সব কথাই বলিলেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গুরুদেবের যত শিষ্য প্রত্যেকেই মনে করেন, 'আমাকে গুরুদেব সকল অপেক্ষা বেশী ভালবাসেন আমি সকলের অপেক্ষা প্রিয়।' তাঁহার কাছে উচ্চ-নীচ, ধনী ও গরিব, বিদ্বান্ বা মূর্খ, কিছুই প্রভেদ নাই, তিনি সকল সময়ে একাধারে পিতা, গুরু ও ঈশ্বর—তিনি এত স্নেহময় যে, নিজের পিতাও সেরূপ ভালবাসিতে পারেন না, নিজের পিতাও পুত্র-সম্বন্ধে এত খোঁজ রাখেন না।

একবার শিবরাত্রির আগে আমার মধ্যম পুত্র সর্দ্দারের (রমেন্দ্রর) পেটে একটা বেদনা হইল। ডাক্তার অটলবাবু কিছু করিতে পারিলেন না। সর্দ্দার গোঁ ধরিল যে, বণ্ডুলে গুরুদেবের কাছে গেলে ও তিনি হাত বুলাইয়া দিলে নিশ্চয়ই ভাল হইবে। কয়েক টাকা খরচ করিয়া কোঁতাইতে কোঁতাইতে গরুর গাড়ী করিয়া সে বণ্ডুল গেল। পর দিন প্রাতে সে গুরুদেবকে ধরিয়া বসিল যে, তার পেটে হাত বুলাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গুরুদেব পেটে হাত বুলাইয়া দিয়া মহাদেবের স্নান-জল খাইতে বলিলেন। সে নিম্নে গিয়া স্নান-জল খাইয়া আসিয়া বলিল, "একেবারে ভাল হইয়া গিয়াছে, আর সেরূপ হয় নাই।" ডাক্তারে বলিয়াছিল, উহা কলিক্ পেন।

আমার তৃতীয় পুত্র কানুর (রত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ—এখন হাইকোর্টের উকিল) জ্বর আরম্ভ হইল—কিছুতে ছাড়ে না। অটলবাবু ও অমূল্যবাবু দুজনে দেখিয়া কিছু করিতে পারিলেন না—ক্রমে দ্বৈকালীন জ্বরে পরিণত হইল। ডাক্তারেরা বলিলেন, "আমাদের আর কিছু নাই—চেঞ্জে লইয়া যান।" গুরুদেব বলিলেন, "কিরে বাপু, ডাক্তারদের বিদ্যাবুদ্ধি ফুরাইয়া গেল? আমি ঔষধ দিতেছি, লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া দাও।" প্রথম তিন দিনের ঔষধ দিলেন, তাতে কিছু উপকার হইল, পরে আর তিন দিনের দিয়াছিলেন, দুই দিন খাইতে জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল, আর হয় নাই।

আজ ১৩ই আগষ্ট, ১৯২৮ সাল। এই ছেলের (কানুর) ১৬ই জুন হইতে প্রত্যহ জ্বর হইতেছিল। ৪ঠা ও ৫ই জুলাই জ্বর হয় নাই, আবার ৬ই জুলাই হইতে রোজ বৈকালে জ্বর হইতেছিল। ইতিমধ্যে বরাবর ডাক্তার পরেশবাবু, জগদ্বন্ধুবাবু এবং নলিনীকান্ত সেন, এম. ডি., দেখিয়া ডিস্‌পেনসারী উজাড় করিয়াছেন। তিনটি এসেটিক ইনজেক্‌সন, ছয়টি ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড

ইন্‌জেকসন এবং পাঁচটি ব্রুসেটিনিসিরো ভেক্‌সিনো ইনজেক্‌সন দিয়াও কিছু হয় নাই। ৪ঠা আগষ্ট শনিবার বাবাজীর কাছে গিয়া দুই মোড়া ঔষধ আনি। রবিবার এক মোড়া ও সোমবার এক মোড়া ঔষধ খাইয়া ৭ই মঙ্গলবার ৯৯° ডিগ্রির নীচে জ্বর নামে, ৮ই বুধবার একেবারে হয় নাই, ৯ই বৃহস্পতিবার ৯৯° ডিগ্রির নীচে হইয়াছিল। শুক্র ও শনিবার জ্বর হয় নাই, কেবল রবিবার দুই ঘণ্টা কাল রাত্রি ৯টার পর ৯৯° ডিগ্রি হইয়াছিল। ১০ই শুক্রবার বাবাজী বলিলেন, "আরও ২/৩ মোড়া কানুকে খাওয়াইতে হইবে, কোন ভয় নাই—কোন ভাবনা নাই। কিন্তু এতদিন কি করিতেছিলে?

এক সময়ে বর্দ্ধমানে আমার দক্ষিণ পায়ের হাঁটু ধরিয়া গিয়াছিল। বাবাজীর কাছে খোঁড়াইতেছিলাম। বাবা বলিলেন, "এ দিকে আয় রে বাপু, দেখি।" যেমন কাছে গেলাম, আমার হাঁটুটা আঙ্গুল দিয়া ধরিলেন, একটা তৈল গড় গড় করিয়া পড়িতে লাগিল এবং স্থানটি সুগন্ধে ভরিয়া গেল। বাবা হাঁটুতে সেই হাতটা মাখাইয়া দিলেন এবং কতকগুলি নাগেশ্বরী চাঁপাফুলে বাকি তৈল দিয়া লাগাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, "কাল যদি ভাল না হয়, এই তৈল দিয়া মালিশ করিও।" কিন্তু ঐ স্থানে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই আমার একেবারে ভাল হইয়া গেল। 'এটা কি জিনিস' জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলিলেন, "বাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ আহ্বান করিয়াছিলাম, এটা আসিয়াছে বিটেল অয়েল।" একদিন কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বাবার বড় জ্বর, চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। আমি পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে খুব দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বলুন, কার অসুখ টেনে লইলেন।" বাবা বলিলেন, "পরশু জানিতে পারিবে। এক বিধবার একমাত্র পুত্র—সে আজ আত্মহত্যা করিত। তাই এই কার্য্য করিয়াছি। তার পর দিন প্রাতে আশ্রমে বসিয়া আছি, ডাক আসিল। এমন সময় বাবাজী বলিলেন, "ঐ পত্রখানি খুলিয়া পড়।" পত্র পড়িয়া আশ্চর্য হইলাম। পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ—"বাবা, সাধ করিয়া কি লোকে আপনাকে স্নেহময় দয়াল পিতা বলে! আমার ছেলের এত জ্বর হইয়াছিল, গত পরশু ঠিক করিয়াছিলাম যে যদি আপনি জ্বর না ছাড়ান, ভাল না করেন, তাহা হইলে আত্মহত্যা করিব। এমন সময় বেলা ৩টার সময় আমার ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মা, মা, গুরুদেব এসেছে।' আমি ঘরে গিয়া দেখি, আপনার গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সেই সময় হইতে ছেলে ঘামিতে আরম্ভ করিল, রাত্রি ৯টার সময় জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে।" বাবাজী রাত্রি ৯টার সময় ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। এইরূপ কত যে দেখিয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। বাবজীর সবই অদ্ভূত, সবই আশ্চর্য্য, সবই অমানুষিক। যদি কেহ ভগবানের ক্ষমতার সীমানা দেখিতে চাহেন, একবার এই মানুষটিকে দেখিয়া যান।

একদিন বাবা ঘুমাইতেছিলেন, আমি ঘাড় হেঁট করিয়া পা টিপিতেছিলাম

এমন সময় বাবু রজনী কোঙার, রজনী মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া বাবার বিছানা হইতে আঙ্গুর লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি একটু দূরে ছিলাম, উহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি চটপট কতক মুখে পুরিলাম, কতক হস্তগত করিলাম। আমাদের গোলমালে বাবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বসিয়াই বলিলেন, "নরেন্দ্র, মুখের ভিতর আঙ্গুর রহিয়াছে, নে নে।" আমি তৎক্ষণাৎ হাত পাতিয়া হস্তগত করিলাম। স্বপ্নাবস্থায় কেন এরূপ হইল, জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী বলিলেন, "ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, যে রূপার গাছে সোনার আঙ্গুর ফলিয়াছে—আমি গাছতলায় বসিয়া পূজা করিতেছি এবং ঠাকুরদের আঙ্গুর নিবেদন করিতেছি।" একদিন সন্ধ্যার সময় নায়িকা শক্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইতেছিলেন। বলিলেন, "তোমরা কাগজে কিছু লিখিয়া সেইটা আগুনে পোড়াইয়া ছাইগুলি জলে গুলিয়া ফেলিয়া দাও; তারপর সেই কাগজ আনিয়া দিব।" রজনী কোঙার উকিলবাবু লিখিলেন, "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। (এই স্থানে 'জানাম্যধর্ম্মং' শব্দটি কাটাকুটি করিয়াছিলেন, তাহাতে কালী কাঁচা থাকায় কাগজ পাট করিতে এ ধারের কালী ওধারে লাগিয়াছিল) ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি"—সেই কাগজ আমাকে ও আরও ৮/১০ জন ভদ্রলোককে দেখাইলেন। আমি সেই কাগজ আগুনে পোড়াইয়া জলে গুলিয়া ঘরের নর্দ্দমা দিয়া বাহির করিয়া দিলাম। পরে বাবাজী আপন আসনে বসিয়া সেই কাগজখানি আনিয়া আমার হাতে দিলেন। দেখিলাম, সেই এ ধারের কালি ওধারে লাগা কাগজখানি। এই কাগজখানি আমার কাছে ছয় মাসের উপর ছিল। এক দিন বাবার বৈবাহিক জগৎবাবু (দুর্গার প্রথম পক্ষের শ্বশুর) বলিলেন, "আমি ৪টা প্রশ্ন মনে মনে করি, তার উত্তর দিন।" কিছুক্ষণ পরে কলিকাতার ডাক আনিয়া বাবার তক্তার উপর রাখিলেন। তার মধ্যে একখানি খাম তুলিয়া বাবা জগৎবাবুকে বলিলেন, "এইখানি খুলিয়া পড়।" জগৎবাবু সেই খাম ছিঁড়িয়া খুলিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, তাঁর চারিটি প্রশ্ন রহিয়াছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে তার জবাব,—এইটি কাল কালিতে ছিল। আর একখানি খাম ছিঁড়িয়া দেখাইলেন, সেই ৪টি প্রশ্ন ও উত্তর লাল কালিতে এক টুকরা কাগজে লেখা রহিয়াছে। আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইলাম। জগৎবাবু হতভম্ভ হইয়া গেলেন। কারণ তিনি ঠাট্টা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁরই বাড়ীতে বিবাহের সময় গোলাপ-জল হইয়াছিল।

একদিন প্রাতে গিয়া দেখি, বিছানায় সবুজ ছোব লাগিয়াছে ও আঙ্গুরের খোসা নেপ্‌টাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ হইয়াছিল।"

একদিন সন্ধ্যার সময় বলিলেন, 'ইচ্ছা-শক্তির বলে ময়রার দোকানের থালা-শুদ্ধ জিনিস আসে।" আমরা দেখিতে—কেহ কেহ বিশেষ খাইতে—উৎসুক হওয়াতে তিনি বলিলেন, "সন্ধ্যা-আহ্নিকের স্থানের কাছে জানালার

উপর দেখ।” আমরা গিয়া দেখি, সত্যই এক থালা রসগোল্লা।

একদিন প্রাতে কাগজ পড়িবার জন্য চশ্‌মা আবশ্যক হইল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথাকার চশ্‌মা আনিব?” আমরা বলিলাম, “জেম্‌স মরের বাড়ীর চশমা।” তৎক্ষণাৎ সোনার খাপের ভিতর সোনার চশমা আসিয়া হাজির! আমরা রাখিতে বলায় বলিলেন, “ঐটি বাদে সব পারিব। লোভ করিয়া রাখিলে, এমন কি ক্রি-য়া পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যাইবে।” একদিন সন্ধ্যার সময় দুইটি বাবু আসিলেন। একজন কেবল চুল-বুল করিতেছিলেন। বাবা বলিলেন, “আপনি বুঝি আফিঙ্গ সেবন করেন?” তিনি বলিলেন, “দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।” তখন বাবাজী তর্জ্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল ঘষিতেছিলেন। সেই বাবুকে শুঁকিতে বলায় বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “আফিঙ্গের গন্ধ কোথা হইতে আসিল।” তার পর বাবা বলিলেন, যতটুকু দরকার লও।” তিনি তাঁর মাত্রানুযায়ী লইলেন।

খাইবার পরে দুগ্ধ তরকারী ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাহির করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান-বিরোধী, দুগ্ধ পেটে গেলে জমিয়া যায়, তরকারি চর্ব্বণের পর মিশিয়া যায়। যখন বাবাকে বলিয়াছি, “বাবা, একটু দুধ বাহির করিয়া দিন্” তখনই ওয়াক্ করিয়া দুধ বাহির করিয়া দিয়াছেন। সেইরূপ আলু ইত্যাদি বাহির করিয়া দিয়াছেন। কাঠের টবে বসিয়া একদিন স্নান করিতেছিলেন, আমি নাওয়াইতেছিলাম। দেখি, জল বহু কমিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “পেটের ভিতর পুরিয়াছি।” আবার বাহির করিতে বলায় টব জলে পুরিয়া গেল। ১৯১১/১২ সালে একদিন ডাক্তার চন্দ্রবাবু, নেপালবাবু, দেবেনবাবু ও আমি বাবার সঙ্গে গিয়া গুষ্করা হইতে সমস্ত জিনিস-পত্র উঠাইয়া লইয়া আসি। চোঙ্গদাররা গুষ্করার জমিদার ও বড়লোক—উঁহাদের ছোটবাবু তারাপ্রসন্ন বাবার বড় হিংসা করিতেন, বাবাকে, খেলো করিবার চেষ্টা করিতেন, ভারি নিন্দা করিতেন, অথচ দরকারের সময় কিংবা পীড়ার সময় মিষ্ট কথা বলিযা কাজ উদ্ধার করিয়া লইতেন। তিনি ভূতের ভয় পাইতেন। একদিন বলিয়া কহিয়া বাবাজী চিন্তা-মূর্ত্তি সৃজন করিয়া শূন্যে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দেখান। সেই দিন হইতে তিনি বাবাজীকে ভয় করিতে লাগিলেন এবং বলিতেন, “উঁহার দুইটা ভূত পোষা আছে, উঁহাকে ঘাঁটানো হইবে না।” যখন টাকা ধার করিবার আবশ্যক হইত, বাবার কাছে আসিয়া কত রকম বাহানা করিতেন। কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না সত্য, তথাপি স্বভাবতঃ যে সব গাঁট হয় সেই সব স্থান একটু কেমন-কেমন হয়। বর্দ্ধমান আশ্রম তৈয়ারী হইবার পূর্ব্বে তিনি কত কি রটনা করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, এ বাড়ীতে কড়ি উঠিবে না। যেদিন কড়ি তোলা হয়, তাঁকে হাতে-পায়ে ধরিয়া কড়ি উঠান দেখিতে আনিয়াছিলাম। তাঁর ছেলেরা এবং বড় বাবুর ছেলেরা—যজ্ঞেশ্বরবাবু প্রভৃতি—বাবাজীর খুব সম্মান করিতেন। গুষ্করায় থাকিবার সময়েও অনেক বড় বড় লোক—Chief Justice, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদি—

বাবার কাছে যাইতেন। একদিন বাবা ডাক্তার সরকারকে বলেন যে, যদি একখানি সিল্কের চাদরে ঘি মাখাইয়া মুখ দিয়া পুরিয়া দেওয়া হয়, তাহা নাভি দিয়া বাহির করা যায় এবং খুব চমৎকার ধৌতি হয়। ডাক্তার সরকার হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি সায়েন্সের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন।" তাতে বাবা বলেন, "যোগের দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমাদের শরীরে সব স্থানেই গর্ত্ত আছে।" এই বলিয়া একখানি সিল্কের চাদর লইয়া কোণাকুণি ভাবে পাকাইয়া ঘি মাখাইয়া মুখ দিয়া পুরিতে আরম্ভ করেন, পরে যখন কুণি নাভি দিয়া একটু বাহির হয়, তিনি টানিয়া লইতে বলেন ও চাদরখানি টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। সেই সময় লোমকূপ দিয়া স্ফটিক ঢোকাইয়া চালনা করিয়া ডাক্তার সরকারের নির্দ্দেশমত স্থান দিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

আমি ভাল করিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, বাঁকুড়ায় থাকার সময়ে এক রাত্রে প্রমথবাবু, দেবেনবাবু প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। তখন বাবা তামাক খাইতেন। গভীর রাত্রে তামাক খাইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু দেশলাই ছিল না, আগুন জ্বালিবার কোন সরঞ্জাম ছিল না। তখন বাবার আদেশ-মত প্রমথবাবু কতকগুলি নারিকেল ছোবড়া নুটি করিয়া বাবার মুখের সামনে ধরেন। বাবাজী সেই নুটিতে ফুঁ দেওয়াতে নুটিটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

একদিন দুপুরবেলা বসিয়া পা টিপিতেছি, হঠাৎ বলরামপুর থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "বাপু হে আসন কি মেয়েমানুষ ভাবিবার জন্য?" তখন তিনি বলেন, "বাবা, এরূপ আর কখন হইবে না।" পরে আমি যখন বাহিরে যাই, তিনি আমাকে বলেন, "গত কল্য একটি স্থানীয় তদন্তে গিয়া একটি ১৭/১৮ বৎসরের বিধবাকে দেখিয়া মন বিচলিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় আহ্নিকের ঘরে যাইয়া আসনে বসিয়া সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ভাবিয়াছিলাম। সেই আসনের মাথার উপরে বাবাজীর একখানি ফটো ছিল। সেই দিকে নজর পড়িতে দেখি, ফটোখানি নড়িয়া উঠিল। আমি ভৌতিক কাণ্ড মনে করিয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিলাম। সেই সময় ফটোর ভিতর হইতে আওয়াজ হইল, 'থাম্ পাজি কোথাকার! সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। তখন আমার কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তাই প্রাতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি গুরুদেবের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

'গেঁয়ো যোগী ভিক্ষা পায় না',—বর্দ্ধমানে গুরুদেব সম্বন্ধে প্রথম প্রথম সেইরূপ হইয়াছিল। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতে করিতে প্রাণ বাহির হইত। যেদিন ১০/১৫টি বচসা ও ঝগড়া না হইত এমন দিনই ছিল না। নিন্দুক এবং অবিশ্বাসী লোকেরা গন্ধ লইতে ও খাবার খাইতে দলে দলে দৌড়িয়া যাইত। উপকারের জন্য সকলেই তাঁহার কাছে ছুটিত। বাবাজী যখন বাড়ীতে আসিতেন, শিশুদের সহিত মিলিয়া শিশু হইয়া খেলা করিতেন,—গন্ধ দিতেন আঙ্গুর দিতেন এবং অন্যান্য

ফলও দিতেন। একদিন একজন শিষ্য (সম্ভবতঃ নীরদবাবু) দীক্ষা লইবেন বলিয়া স্থির হয়। বাবা পুনঃপুনঃ বলিয়া দিয়াছিলেন, খুব ভোরে দীক্ষা দিবেন। খুব ভোরে উঠিয়া তাঁহার ঘরে ছেলেরা চ্যাঁ-ভ্যাঁ করিতেছিল। তিনি আশ্রমে আসিবেন বলিয়া ঠিক হইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, গুরুদেব ডাকচেন—দেরি করছ কেন?" তিনি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখেন, গুরুদেব বেঞ্চের উপর গেরুয়া কাপড় পরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার গন্ধে স্থানটি ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু খিল খুলিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই, তবে তাঁহার সামনে সামনে গন্ধ যাইতেছে; এইরূপ অবস্থায় তিনি আশ্রম পর্য্যন্ত গেলেন। যাইবামাত্র বাবাজী বলিলেন, "কিগো, দেরি হইতেছিল, সময় উত্তীর্ণ হয় বলিয়া ডাকিতে গিয়াছিলাম।" তখন আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না।

বর্দ্ধমানে একজন সাহেব আসিয়াছিলেন, তাহার নাম এখন মনে হইতেছে না। তিনি বাবাজীর একজন বড় ভক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি একদিন বাবাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার মেম, ছেলে-মেয়ে সব আসিয়া জুটিল। সাহেব ও তাঁহার মেম ভাইওলেট গন্ধের ভক্ত, কিন্তু বাবাজী পুরা পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে। ভাইওলেট ফুল কিরূপ অথবা ভাইওলেট গন্ধ কিরূপ কখনও জানেন না। সাহেব ও মেম ফরমাইস করিলেন, "আমাদের ভাইওলেট গন্ধ দিন।" যাঁহার অসীম শক্তি। যাঁহার যোগবল অমানুষিক, তাঁহার কাছে অসাধ্য অথবা আশ্চর্য্য কি আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ যোগবলে সব জানিয়া ও স্থির করিয়া বলিলেন, "তোমার লিখিবার টেবিল হইতে কাগজ-চাপাটি আন দেখি।"একটি মেয়ে সেটি আনিতে আনিতে গন্ধে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সাহেব আশ্চর্য্য! তার পর সেই ঘরের সব জিনিসে তাঁহারা ভাইওলেট গন্ধ পাইতে আরম্ভ করিলেন। ঘরটি ভাইওলেট গন্ধে ভরিয়া গেলে সাহেব ও মেম আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। সাহেব সব সময়ে যাইবার ও আসিবার সময় ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদের মত প্রণিপাত করিতেন। মেমসাহেবের গর্ভ হইয়াছে বলিয়া অনেকগুলির ডাক্তার খুব ভুল করিয়াছিলেন। বাবাজী স্থির বলিয়া দেন যে, উহা গর্ভ নহে।

ক্ষেতুবাবু বনোয়ারিবাবুর পুত্র পঞ্চার মৃত্যুকাল বড় ঠিক ও আশ্চর্য্য গণিয়াছিলেন। বনোয়ারিবাবু আমার সহিত আশ্রমে গিয়া গুরুদেবের পায়ের উপর পড়েন। গুরুদেব বলেন, "পীড়া শিবের অসাধ্য। অমুক দিন ছেলেটি মরিবে। যাহা হউক, কার্য্য করিয়া দেখিব, কি করিতে পারি।" শিবরাত্রের আগের দিন বহু কষ্টে একটু গব্য ঘৃত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বগুলে তাঁহার স্থাপিত শিবের ঘরে ঢুকিবার আগে ঘৃতের দিকে পিছন করিয়া পা ধুইতেছিলেন, ইত্যবসরে একটা কুকুর আসিয়া ঘৃতের বাটি মুখে করিয়া লইয়া যায়। তার পরে বাবা আমার কাছে লোক পাঠান যে, আর কিছু হইবে না, প্রতীকার শিবের অসাধ্য, অমুক দিন দুর্ঘটনা ঘটিবে। পরে ঠিক সেইদিনে পঞ্চুর মৃত্যু হয়।

একদিন সন্ধ্যার সময় কে আসিয়া আমাকে খবর দেয় যে, গুরুদেবের দাঁতের গোড়া দিয়া অজস্র রক্ত পড়িতেছে। দৌড়িয়া আশ্রমে গিয়া দেখি, গুরুদেব উপরে শুইয়া আছেন। তিনি আমাকে খবর দিতে বারণ করিয়াছিলেন। তখন ডাক্তার থার্স্টন সাহেব বর্দ্ধমানে ছিলেন। আমি গিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। তখন বাবাজী আমায় বুঝাইলেন ও পত্র দেখাইলেন যে পাঞ্জাবের উপরওয়ালাদের আদেশ-মত একটি শিষ্যের অকাল-মৃত্যু নিবারণের জন্য কাঁচা দাঁত তুলিতে হইয়াছিল। আদেশ আসিয়াছিল যে, তাঁহার কোন শিষ্যের অকাল-মৃত্যু হইবে, কিন্তু তিনি যদি কোন অঙ্গহানি করিতে পারেন, তাহা হইলে সে বাঁচিবে। সেই জন্য বাবাকে ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। ডাক্তার দাঁত অর্দ্ধেক তোলার পর রক্ত দেখিয়া ভয় খাইয়া আর তুলিতে পারেন নাই। পরে বাবাজী নিজে তাহা তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। শিষ্যের জন্য গুরুর কিরূপ হয়, সকলের ভাবিবার বিষয়। শিষ্য তাঁহার প্রাণ—শিষ্য তাঁহার সব। শিষ্যের সদিচ্ছায় তিনি যাহা করেন, লোকের পিতামাতা তাহা করিতে পারেন না। তাঁহাকে পাইয়া সংসারের সব ভুলিয়া যাইতে হয়।

যখন তিনি আঙ্গুলে করিয়া গন্ধ-দ্রব্য আনয়ন করেন, তখন আঙ্গুলের প্রতি দৃষ্টি করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আঙ্গুল দিয়া কোন তৈলাক্ত পদার্থ আসিতেছে। এক সঙ্গে এক সময়ে কেহ বলিতেছে পদ্ম-গন্ধ, কেহ বলিতেছে গোলাপের গন্ধ, কেহ খশের গন্ধ, কেহ ভাইওলেট গন্ধ, কেহ ফেনাইনের গন্ধ, এইরূপ যে যত গন্ধ বলিতেছে, তিনি পর পর দিয়া যাইতেছেন—হাত ধোওযা নাই, পোঁচা নাই, কেবলই দিয়া যাইতেছেন। এইরূপ কতবার দেখিয়াছি তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

একদিন কয়েকটি শিষ্যসহ পুরুলিয়া হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, একটি লোক এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা আনিতেছিল। সকলে বসিয়া সেই কলার প্রশংসা করিতেছিল। বাবাজী বলিলেন, "কলা দেখিয়া সকলের লোভ হইয়াছে। তোরা খাবি?" সকলে বলিয়া উঠিল, "খাইব, খাইব।" তৎক্ষণাৎ বাবাজী পর ৮/১০টি কলা বাহির করিয়া দিলেন, সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

এক রবিবারে আমার বড় ছেলের গলায় মস্ত একটা কাঁটা বিঁধিয়া গেল, কিছুতে বাহির হইল না। সেই সময় আমার ছেলে বিপক্ষবাদী। আমি তাহাকে আসিতে বলিয়া নিজে আশ্রমে আসিয়া আগে বাবাকে বিপদের কথা বলিলাম। পরে আমার ছেলে আসিল। বলিলেন, "নেড়ু, বাহিরে এস।" তাহার পর নেড়ুকে সূর্য্যের দিকে হাঁ করিয়া বসিতে বলিলেন। তিনি নিজে কাঁটাটি দেখিয়া সকলকে ডাকিয়া দেখাইলেন; পরে বলিলেন, "ঢোক গিলিয়া দেখ দেখি নেড়ু।" নেড়ু ঢোক গিলিয়া বলিয়া উঠিল, "আর ও কাঁটা নাই।" তারপর আমরা দেখিলাম, যেস্থানে কাঁটা ছিল সেখানে আর কিছু নাই। যে কাঁটার জন্য

এত চেষ্টা করা গেল—কিছুতে গেল না, সেই কাঁটা দৃষ্টিমাত্রে কোথায় চলিয়া গেল! সেই সময় আমার জানিতে ইচ্ছা হইল, নেড়ু, বাবার নিকট দীক্ষা লইবে কিনা! বাবাজী বলিলেন, “আমার পায়ে মাথা মুড়াইবে, কিন্তু এখনও সময় হয় নাই। দেরি আছে, যখন সময় আসিবে, বলিব।” পরে ঠিক সময় আসিলে নেড়ুকে দীক্ষা দিয়াছেন। মেজ ও সেজ ছেলে নিজ হইতে দীক্ষা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে এবং বাবা তাহাদের দীক্ষা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

বাবাজীকে বর্দ্ধমানে আনিয়া স্থাপনা করা হইতে বরাবর আমার যে কি সুখের, সৌভাগ্যের, তৃপ্তির ও আরামের দিন গিয়াছে তাহা আমি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। সংসারের কোন খোঁজ রাখিতে হইত না। সব যেন গুরুদেব আপনা হইতে করিয়া যাইতেন, আমি কেবল দিবা-রাত্রি গুরু-সেবা করিয়া নিজ হাতে তামাক সাজিয়া গুরুদেবকে খাওয়াইয়া স্বর্গীয় সুখ ও তৃপ্তি লাভ করিতাম। গুরুদেবের মধ্যে মধ্যে একটা সময় আসিত, যখন তিনি যে সিল্কের কাপড় ও চাদর পরিয়া আহ্নিক করিতেন তাহা পচিয়া গলিয়া যাইত, হাতে করিয়া তুলিতে গেলে খসিয়া আসিত। কাপড় ও চাদরে ঘাম লাগিয়া একটা সবুজ আভা (greenish) পড়িত ও পচিয়া গলিয়া যাইত। নূতন কাপড় চাদর ১৫ দিনের বেশী যাইত না। এই সময় গায়ে মাছি ইত্যাদি বসিলে পুড়িয়া মরিয়া যাইত। একদিন বাবাকে লইয়া ‘গোলাপ-বাগ’ দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় খুব বড় বড় বাঘ, সিংহ ও সিংহী ছিল। প্রথম দেখিলাম, যতগুলি ছোট বাঘ আছে, বাবার চক্ষের দিকে তাকায় আর দাঁত খিঁচাইয়া কোণে গিয়া বসে। বাবাজী বলিলেন, “বাঘেরা আমার তড়িৎ সহ্য করিতে পারে না, পলাইয়া যায়।” তখন একজোড়া বড় সুন্দরবনের বাঘের কাছে আসিলাম। এ দুইটি বাস্তবিক রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমাদের দেখিয়া মহারাজেরা কত রকম গর্জ্জন করিতে লাগিল। যেমন বাবাজী সেই স্থানে আসিলেন, অমনি তাঁহার চক্ষের দিকে নজর করিয়া মাথা নীচু করিয়া দুইটা পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চক্ষু ঘষিতে আরম্ভ করিল। তারপর কোন রকমে মাথা তুলিলে বাবার চক্ষুর নজর পড়িতেই গাঁক্ করিয়া চীৎকার করিয়া লাফাইয়া গুরুদেবের দিকে পিছন করিয়া দরজার কাছে গিয়া বসিল, নড়িল না উঠিল না। তারপর বাড়ী আসিয়া কেহ কেহ কামাখ্যার ঘটনা বর্ণনা করিলেন। একবার ডাক্তার প্রতাপবাবু, কালী ঘটক, বঙ্কুবাবু এবং আরও অনেক লোক বাবার সহিত কামাখ্যা গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরে যখন লুচি ভাজা হইতেছিল, ঠিক উহাদের পিছনে একটি মহাপ্রভু আসিয়া পড়ে। গুরুদেব অন্যত্র ছিলেন, সকলে বাঘ বাঘ, করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠেন। তখন বাবা তাড়াতাড়ি আসিয়া সকলকে ঠেলিয়া দিয়া সামনে গিয়া পড়েন। বাঘটা বাবার চক্ষের দিকে দেখিয়া সামনের দিকে লাফাইতে ভুলিয়া গিয়া গাঁক্ করিযা চীৎকার করিয়া পিছন দিকে লাফাইয়া পড়ে এবং অনেক নীচে গিয়া পড়িয়া ডাকিতে ডাকিতে পলাইয়া যায়। বর্ণনার

সময় কামাখ্যার সাথী অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বাবাজীর সাক্ষাতে এই সব বলিয়াছিলেন। বাঘ যে বাবাকে দেখিয়া, বাবার খরদৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, পলাইয়াছিল, সকলেই নানা রকমে বলিলেন। মহারাজের 'গোলাপ-বাগে' স্পষ্টভাবে সকলে দেখিয়াছি এবং প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঘ মহাপুরুষদের দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। এই জন্যে বলে, বাঘ সন্ন্যাসী-যোগী-ঋষিদের হিংসা করে না, তাঁহাদের কাছে কুকুরের মত বেড়ায়। বাবাজীর এক গুরুভাই-এর সুন্দরবনের দুইটি বড় বড় বাঘ আছে, তাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়, লোকালয়ে গেলে দুইটিকে সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এ সব বাগবাজারের গল্প মনে করিবেন না। এই সব মহাপুরুষদের কিছুই অসম্ভব নহে। ইহারা যে কত বড় দৈবশক্তি-সম্পন্ন, তাহা কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিবেন না। যখন আমি এই সব দেখি নাই, তখন এ সব বাগবাজারের গল্প বলিয়া মনে করিতাম। ভোজবাজির দ্বারা যে-সব জিনিস আসে বা হয়, তাহার স্থিতি নাই, সে সব দৃষ্টিভ্রম-জনিত। কিন্তু যাহা লিখিলাম প্রায় সমস্ত বিষয় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রায় সমস্তই আমার নিজের জ্ঞানের কথা।

বাবাজী যে কি জিনিস, তাহা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিবেন না। একবার বাবাকে দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। একবার কাছে গেলে মনে হয়, আবার যাই, আবার যাই। বাব যেন যাদুকর, কাছে গেলে মনঃপ্রাণ যাহা কিছু আমার বলিতে আছে, সব কাড়িয়া লয়েন।

তাঁহার আহার অতি অল্প। তাঁহার দাদা গুরুদেব যখন যেরূপ আদেশ করেন, তাঁহাকে তখন সেইরূপ আহার করিতে হয়, স্নান করিতে হয়, জল পান করিতে হয়। তিনি কয়েক বৎসর একেবারে জলপান করেন নাই। দারুণ গ্রীষ্ম ও চৈত্র-বৈশাখ মাসেও জল পান করেন নাই। তিনি মাথা নাড়িলে, তাঁর কপালে হাত দিয়া থাকিলে, মাথার ভিতর অন্য জিনিস্ আছে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বাহিরে উপর উপর দেখিলে মনে হইবে তিনি একজন নিরীহ ভদ্র বাবুলোক। একদিকে বাবাজী অতি কোমল—অতি মিষ্ট, অপর দিকে বড় কঠোর-স্থির প্রতিজ্ঞ।

বিনোদ মাকড়ের বি. এ পাশ হইয়া খেয়াল হইল যে, হিন্দুধর্মে কিছু নাই—তিনি খৃষ্টান হইবেন। খৃষ্টান হইবার সব ঠিক। কি একটা কার্য্যে তিনি গুরুদেবের কাছে আসেন। বাবাজী তাঁহাকে বলিলেন, "বাপু তুমি কর্ম্মী দেখ নাই, হিন্দু ধর্ম্মের কি বা জান। এমন ধর্ম্ম কি আর আছে? তোমাকে সব দেখাইব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মতের পরিবর্তন হইবে।" তিনি বলিলেন, "যদি কিছু প্রত্যক্ষ দেখান, আমি মাথা মুড়াইয়া আপনার কাছে দীক্ষা লইব।" ঠিক হইল, পরদিন প্রাতে বিনোদবাবু স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া বণ্ডুলের শিব-মন্দিরের রোয়াকে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তার পরে গুরুদেব বিনোদবাবুকে

লইয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বিনোদবাবু চীৎকার করিতে করিতে মন্দিরের খিল খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "হিন্দু-ধর্ম্মে সব আছে, এতদিন লোক দেখি নাই, আমি এ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না।" বিনোদবাবু বলিলেন, "বাবাজী আসনে বসিয়া ক্ষণিক ধ্যান করিলেন। তার পরে বাবাজীর গলা হইতে মস্তক ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া গেল, আসনে পা এবং কোমর পর্য্যন্ত রহিল এবং মধ্যে ধড়টা শূন্যে রহিল, পরে মস্তক এবং ধড় নামিয়া পায়ের সহিত এক হইয়া কুর্ম্মের মত হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় আমি ভয়বশতঃ চীৎকার করিয়া বাহির হইয়া পড়ি।" এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দীক্ষা লইলেন। এখনও তিনি জীবিত আছেন।

বণ্ডুলের মহাদেব এক অপূর্ব্ব জিনিস! কত রকম রং পরিবর্তন হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়, সময় সময় দেব-দেবীর মূর্তি প্রকট হয়। আমি নিজে তিন চারিবার বণ্ডুলে গিয়াছি। একবার পূজার ছুটিতে গিয়া আট দশ দিন ছিলাম। যে কয়দিন আমি তথায় ছিলাম, সেই কয়দিনই গুরুদেবের দয়ায় বেশ মনের আনন্দে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলাম। তখন আমার মন কি এক ভক্তি-রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা অর্ব্বাচীনতা ও ধৃষ্টতা মাত্র। মূক ব্যক্তি যেমন প্রকৃতির শোভা নয়নে দেখিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে ও বুঝাইতে অক্ষম, আমি তদ্রূপ শ্রীগুরুর চরণ-শোভায় আপনা-আপনি মুগ্ধ হইয়া নিজে অনুভব ছাড়া তাহা অপরকে প্রকাশ করিয়া বলিতে অপারগ। উপরি-উক্ত ঐ ভদ্র ব্যক্তি যে অনায়াসে ভক্তি-রসাস্বাদনে বিগলিত হইয়াছেন, তাহা সকলে অবশ্য অতি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি এখন অলৌকিক ভক্তিরসে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া, বাবার শ্রীচরণে একান্ত মনঃসংযোগে কৃতাঞ্জলিপুটে আপন প্রগাঢ় ভক্তি নিবেদনে পরমানন্দে এই সংসার-মরুভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

একদিন প্রাতে আশ্রমে না গিয়া বাড়িতে বৈঠকখানায় বসিয়া কাজ করিতেছিলাম। গুরুদেবের ছবি হইতে হঠাৎ তাঁহার অঙ্গগন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ছেলেরা সকলে চেঁচাইয়া উঠিল, "বাবা, গুরুদেব আসিয়াছেন। না হয়, রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন।" আমার পুরাতন চাকর দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল—বাবাজী যাইতেছেন কি না দেখিবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ছবি হইতে গন্ধ বাহির হইতেছে। তৎক্ষণাৎ আমি আশ্রমে গিয়া বাবাকে দেখি এবং জিজ্ঞাসা করি, কি হইতেছিল। বাবাজী উত্তর করিলেন, "কি করিতেছিলে, তাই দেখিতেছিলাম।"

গুষ্করায় বাবাজীর দুইটি বড় বড় বিষধর সর্প ছিল। অনেকে সেই পোষা সাপ দুইটিকে ঘরে বেড়াইতে দেখিয়াছে, ঘরে দুধ ও কলা খাইতে দেখিয়াছে। এক সময় ঘরে অপর সাপ ঢুকিয়াছিল, বাবা মশারি খাটাইবার সময়ে তাঁহার পেটে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। পরে তিনি দেখিলেন যে, সাপটি কামড়াইয়া মরিয়া আছে,

তাঁহার কিছুই হয় নাই, কেবল একটু নেশার মত হইয়াছিল। বাবাজীর তীব্র ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা ছিল। গুস্করায় বহু দিন যাবৎ অনেক লীলা দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যবস্থায় একদিন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, এক ভদ্রলোক ধমক দিয়া বলিল, "অত বড় বলিষ্ঠ দেহ, তুমি কোদাল মারিয়া খাইতে পার না?" বাবা ইহা মস্তক পাতিয়া লইয়া নির্ব্বাক হইয়া চলিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় রাগ করিতে নাই, তাহার উপর স্বভাবতঃ বাবাজীর রাগ নাই। এখন যদি সেই ভদ্রলোক বাবাজীকে দেখেন, তাঁহার যে কি অবস্থা হয়, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করে। বাবাজীর কাছে শিব, বিষ্ণু ও শক্তিতে প্রভেদ নাই। তিনি ক্ষেত্র দেখিয়া বিচার করিয়া দীক্ষা দেন। তিনি যুগল মন্ত্র, শক্তি মন্ত্র, শিব মন্ত্র প্রভৃতি সবই দেন। তাঁহার আশ্রমে মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী, গোপালজী সবই আছেন। বাবাজীর পুত্র দুর্গাদাদা একজন কর্ম্মী হইয়াছেন, বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সব-সময় যোগ-মার্গে বেড়ান, যোগ আলোচনা লইয়া আছেন। আমার বোধ হয় গুরুদেবের আসন তিনি বজায় রাখিতে পারিবেন।

আমার বর্দ্ধমানে এক-সঙ্গে সাড়ে পাঁচ বৎসর থাকার পর যেমন বদলীর কথা হইল, বাবাজীকে বলাতে তিনি দরখাস্ত দিতে বলিলেন। ছয় মাস ফুরাইবার পূর্ব্বে আবার থাকিবার জন্য দরখাস্ত দিলাম। তাহাতে হুকুম হইল, আর কিছুদিন থাকিতে পাইব, কিন্তু আর আমাকে ঐ স্থানে রাখা হইবে না। মুন্সেফ ও ডেপুটিবাবুরা তিন বৎসরের বেশী এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিতে পায় না। আমার উপর হুকুম আসিল, "প্রস্তুত হও, শীঘ্র বদলী হইবে।" গুজব উঠিল, আমায় বদলী করিয়াছে। বাবাজীকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমার জন্য উপরওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" কয়েকদিন পরে বলিলেন, "দে রে দরখাস্ত, দেখি কার সাধ্য তোকে এখান হইতে নড়ায়।" দরখাস্তের জন্য একটি তারিখ বলিয়া দিলেন, আমি দরখাস্ত লিখিয়া বাবার পায়ে ঠেকাইয়া দিলাম। তাহার পর হুকুম হইল, "উহার বদ্‌লী রদ হইল, যে পর্য্যন্ত উহার স্ত্রী ভাল না হয় অথবা সে সব-জজ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার বদ্‌লী হইবে না।" সেই অনুযায়ী সব-জজ হওয়া পর্য্যন্ত আমি বর্দ্ধমানেই ছিলাম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

উকীল, বৰ্দ্ধমান।

১। শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দবাবু প্রভৃতি প্রায় ২০/২২ জন গুরুভ্রাতার সহিত আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিন মাসে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে যাই। সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনের পর প্রত্যাগমন পথে মাদুরা, চিদম্বরম্, শ্রীরঙ্গম, ট্রিচিনাপলি, প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া চিঙ্গলপুট ষ্টেশনে আসি এবং তথা হইতে পক্ষিতীর্থ দর্শনে যাওয়া হয়। পক্ষিতীর্থ দর্শন করিয়া পুনরায় চিঙ্গলপুটে ফেরত আসার পরেই শ্রীশ্রীগুরুদেব কাঞ্চীতীর্থে তখনি যাইতে হইবে বলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিকালের ট্রেণেই আমরা কাঞ্চী যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮টার সময় কাঞ্চীতে পহুঁছি এবং পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট একটি স্থানে উঠি। সেখানে জলের কল ছিল, কিন্তু সে সময় কলে আদৌ জল ছিল না এবং থাকিবার নিয়মও নহে, নিকটে কোন কূপ বা জলাশয় ছিল না। আমরা চাকর বামুনসহ প্রায় ২৪/২৫ জন ছিলাম। সকলেরই মুখ-হাত ধুইতে এবং খাবার প্রস্তুত জন্য ও পানের জন্য জল দরকার হওয়ায়, অভাবের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিলে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিলেন, "দেখ, কলে জল আসিয়াছে। এক ঘণ্টাকাল জল পাইবে।" দেখি, সত্যই কলে জল আসিয়াছে এবং আমরা ইচ্ছামত এক ঘণ্টাকাল সেই জল ব্যবহার করি। সেই সময় ঐরূপ ভাবে জল না পাইলে আমাদের সকলের বিশেষ কষ্ট হইত।

২। আজ ১৮/১৯ বৎসর হইলে, যখন বৰ্দ্ধমান আশ্রমের বাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল কিন্তু শেষ হয় নাই, সেই সময় বৰ্দ্ধমান রাণীগঞ্জ বাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পূজ্যপাদ গুরুদেব সময়ে সময়ে থাকিতেন। সেই সময় বৰ্দ্ধমানে শ্রীযক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মুন্সেফ ছিলেন,—তিনিও বাবার শিষ্য হইয়াছেন। ঐ বাড়ীতে গরমের সময় একদিন নরেন্দ্রবাবু বাবার পদ-সেবা করিতেছিলেন এবং আমি ও আরও কয়েকজন শিষ্য নিকটে বসিয়াছিলাম। সেই সময় নরেনবাবু পায়ের তলায় যখন হাত দিয়া রগ্‌ড়াইতেছেন, তখন দেখা গেল, পায়ের তলায় বিদ্যুৎ বাহির হইতেছে। তাহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম।

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দে

কোর্ট ডি. এস. পি., আলিপুর, ২৪ পরগণা

বর্দ্ধমানে রাণীগঞ্জ বাজারের নিকট মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পিছনে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন আমাদের আশ্রম ছিল। সেই সময় আমি বর্দ্ধমানে কোর্ট-ইনস্পেক্টর ছিলাম ও রাণীগঞ্জে একটি বাসায় থাকিতাম এবং প্রত্যহ দুইবেলা আশ্রমে গিয়া পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ-দর্শন-সুখ লাভ করিতাম। আমার স্ত্রী, ছোট ছেলে অমূল্য ও মেয়ে বিমলাও প্রায় প্রত্যহই আশ্রমে আসিয়া গুরুদেবকে দর্শন করিত।

সেই সময় বাবাজীর দেহ হইতে সর্ব্বদাই নানাবিধ স্বর্গীয় সুগন্ধ বাহির হইত। সেই গন্ধের মধ্যে খস ও চন্দনের গন্ধই প্রধান। তখন গুরুদেব চাহিবামাত্রই আমাদের সকলকেই আমাদের ইচ্ছানুসারে গন্ধ দিতেন। হাত বাড়াইলেই হাতের উপর নিজ অঙ্গুলি স্পর্শ করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধযুক্ত তরল পদার্থে হাত ভিজিয়া উঠিত। সেই গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী হইত।

আমার ছেলে-মেয়ে বাবাজীর নিকট আব্দার করিয়া সিল্কের রুমালে গন্ধ চাহিলেই বাবাজী সেই রুমাল মুঠোর মধ্যে ধরিবামাত্র সমস্ত রুমাল সুগন্ধ আতরে ভরিয়া উঠিত। সেই গন্ধ বহুকাল স্থায়ী হইত।

বাবাজী আমার ছেলে ও মেয়েকে বড় আদর করিতেন। তাহারা বাবাজীর পাকা চুল ও দাড়ী তুলিয়া দেওয়ার অছিলায় রসগোল্লার আব্দার প্রায়ই করিত। আশ্চর্য্য, প্রত্যেকটি পাকা চুল বাছিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেদের হাতে রসগোল্লা আসিয়া পড়িত। ছেলেদের আনা সেই রসগোল্লা আমিও খাইয়াছি।

একদিন বৈকালে আমরা অনেকগুলি গুরু-ভাই বাবাজীর কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় বাবাজী বলিলেন, “এই যে রেলগাড়ী যাচ্ছে, এতে একটি বাবু বড় সুন্দর এক কাঁদি পাকা মর্ত্তমান কলা লইয়া যাইতেছেন। এরূপ সুন্দর বড় কলা সচরাচর দেখা যায় না।” একথা শুনিয়াই আমরা আব্দার জুড়িয়া দিলাম, “বাবা, আমাদের ঐ কলা খাঁওয়াইতে হইবে। বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, “বাপু, বাবুটি অনেক কষ্ট করিয়া ছেলেদের জন্য ঐ কলা লইয়া যাইতেছেন, উহা লওয়া ঠিক নয়।” আমরাও নাছোড়বান্দা। তখন বাবাজী শূন্যে একবার হাত উঠাইয়া মুঠি ধরিলেন ও হাত বাড়াইয়া বলিলেন, “সুন্দর কলা।” মুঠির বাহিরে একটি কলার কতক অংশ দেখা গেল। প্রত্যেকের কাছেই বাবাজী হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং প্রত্যেকেই বাবার হাত হইতে বড় বড় এক এক খণ্ড কলা লইলেন। লইয়া ভাঙ্গিয়া খাইয়া দেখিলাম অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট কলা। এইরূপে প্রায় ১৫/২০ জনে সেই কলা লইয়া খাইলাম, কিন্তু সে হাতের কলা আর ফুরায় না। তাহার পর বাবাজী উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। সেখানে মেয়েরা বাবাজীকে কলা খাওয়াইবার জন্য ধরিল। সেখানে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েও ছিল। তাহাদের

সকলকেই বাবাজী এক একটি আস্ত কলা শূন্য হইতে ধরিয়া দিলেন। সেই কলার দুইটি বাসায় আনায় আমিও তাহার কিছু খাইয়াছিলাম।

আর একদিন ছুটির দিনে আমরা বাবাজীর কাছে বসিয়া আছি। দুপুর বেলা বাবাজী তক্তাপোষের উপর শুইয়াছিলেন—দেখিলাম, ঘুমাইতেছেন। আমরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করিতেছিলাম। ঘরের মধ্যে আমরা প্রায় ২৫/৩০ জন গুরু-ভাই উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ দেখি, ঘরের মধ্যে আঙ্গুর বৃষ্টি হইতে লাগিল। আঙ্গুর বেশ বড় বড়, সুপক্ক ও সুমিষ্ট, চারিদিকে থোলো থোলো পড়িতে লাগিল। আমরা যে যত পারিলাম, কুড়াইয়া খাইলাম। কাড়াকাড়িতে অনেকগুলি চট্‌কাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী তক্তাপোষের উপর পাশ ফিরিলেন। তক্তাপোষের উপর অনেক আঙ্গুর পড়িয়াছিল, সেগুলিতে আমরা হাত দিতে সাহস পাই নাই। বাবাজী পাশ ফেরায় অনেকগুলি চটকাইয়া গেল। বাবাজী জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তাইতো এখানেও আঙ্গুরের ছড়াছড়ি দেখ্‌ছি।" আমরা বাবাজীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন বাবাজী বলিলেন, "বাপু, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যে লক্ষ্মী-নারায়ণজীকে আঙ্গুর খাওয়াচ্ছিলাম। তাঁহারা আঙ্গুর সেবায় বড়ই পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। দেখছি এখানেও আঙ্গুর বৃষ্টি হয়েছে।" তখন আমরা বলিলাম, 'লক্ষ্মীনারায়ণজী যত না খান, আমরা সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইয়াছি।"

একদিন আমার স্ত্রী আশ্রমে আসিয়া দেখেন, বাবাজী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হন নাই। ঘরের দরজা ঠেলিয়া দেখেন, দরজা ভেজান। দরজা ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন, কোথাও বাবাজী নাই—তক্তাপোষের উপর চাদর-ঢাকা একটি শিশু শুইয়া আছে। ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া আমার স্ত্রী বাহির হইয়া আসিয়া চন্দ্র-দা প্রভৃতি দাদাদের ডাকিয়া বলেন। বাবাজী তাহার কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া হাস্যমুখে তিরস্কার করেন।

একদিন রাত্রে বাবাজী সেবা করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা, আজকের ঘী-টা বড় খারাপ, এটা তুলিয়া ফেলা দরকার; নচেৎ অম্বল হইতে পারে।" এই বলিয়া একটি বাটি আনিতে বলিলেন। বাটিতে যেটুকু ঘী উদরস্থ করিয়াছিলেন, সেইটুকু মাত্র মুখ দিয়া বাহির করিয়া বাটিতে ফেলিলেন। বাবাজী সেদিন রাত্রে কয়েকখানা লুচি, কিছু তরকারি ও অল্প দুধ খাইয়াছিলেন। বাহির করিলেন শুধু ঘীটুকু, আর কিছুই নয়।

বাবাজী সন্ধ্যা করিয়া সকাল ৭টা, ৭টার সময় ঘর হইতে বাহির হইতেন। আমরা বাহিরে বারান্দায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম। বাহির হইলেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরে কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতাম। একদিন এইরূপ প্রণাম করিয়া যেমন উঠিয়াছি, অমনি বাবাজী আমায় বলিলেন, "প্রিয়, এবার আইন

(বি. এল.) পরীক্ষাটা দাও না। তবে দেখো, পরীক্ষায় পাশ হবে বটে, কিন্তু চাকরিটা ছেড়ো না।" আমিও বলিয়া ফেলিলাম, "আচ্ছা, এবার বি. এল., পরীক্ষাটা দেব।" বহুদিন পূর্ব্বে যখন আমি হুগলী কলেজে পড়িতাম, তখন আমার বি. এল. ক্লাশের লেক্‌চার (বক্তৃতা) শুনা শেষ করা ছিল। এ সময় আমি বর্দ্ধমানের কোর্ট-ইনস্পেক্টর ছিলাম। খাটুনি খুব বেশী ছিল। বাবার আদেশে কয়েকখানা বইয়ের জোগাড় দেখিতে লাগিলাম। টাকা জমার দিন আসিয়া পড়ায় পোষ্ট অফিস হইতে টাকা বাহির করিয়া টাকা জমা দিলাম। একটি উকিল বন্ধু কয়েক দিন পরেই ৪/৫ খানা আইনের বই পড়িতে দিলেন। পরীক্ষার আর বেশী দিন নাই দেখিয়া কয়েক দিনের ছুটি লইয়া পড়া শুরু করিয়া দিলাম। ৫/৭ দিন একটু চাপিয়া পড়ার পর মাথার অসুখ হইল, স্মরণশক্তিও লোপ পাইল, ঘুম হয় না। এরূপ অবস্থায় একদিন বাহিরের ঘরে বসিয়া বৃথা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় উপেনদা (উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী) আসিয়া বলিলেন, "কি করছিস্, বই-পত্র ফেলিয়া দে।" এই বলিয়া বই ও কাগজগুলি জড় করিয়া বাঁধিয়া যাহার জিনিস তাহাকে ফেরত পাঠাইলেন। তখন পরীক্ষার ৫/৭ দিন মাত্র বাকী। পরীক্ষার দুদিন আগে গুষ্করায় বাবাজীর নিকট গেলাম। (তখন কয়েক দিনের জন্য তিনি গুষ্করায় ছিলেন) তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, পরীক্ষা দিতে কলিকাতা যাইব কি না। তিনি বলিলেন, "যাও, পরীক্ষায় পাশ হইবার ভাবনী কি?"

দুদিন পরে কলিকাতায় এক গুরু-ভাইয়ের বাড়ীতে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে লাগিলাম। পরীক্ষা-মন্দিরে প্রত্যেক দিন সকাল ও বিকালের প্রশ্ন-পত্রে দেখি সব প্রশ্নগুলিই আমার অজানা। কাজেই, প্রশ্ন বাছিয়া লিখিবার আমার কোন আবশ্যকতা হয় নাই। আমি প্রত্যেক দিন প্রত্যেক বেলায় প্রশ্ন-পত্রের প্রশ্নের ক্রমাবলি ধরিয়া সকল প্রশ্নগুলির উত্তর সাধারণ বুদ্ধিতে যতদূর জোগায়, গড়িয়া লিখিয়া দিলাম। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে ২/৪ পাতা লিখিয়া গেলাম। কি লিখিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত জানি না। আমি পরীক্ষা-মন্দিরে পরীক্ষা দিতেছি, আর এদিকে বাবজী আমার গুরু-ভাইদের নিকট বলিতেন, "প্রিয় পরীক্ষায় ভালই লিখচে!" এইরূপে পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল, সে বৎসর যতগুলি ছেলে বি. এল. পরীক্ষায় পাশ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আমিও একজনা ও আমার নাম পাঁচজনার নীচে ও অনেক জনার উপরে। বাবাজী পরীক্ষার ফল দেখিয়া আবার বলিলেন, "প্রিয়, পাশ হলে, কিন্তু চাকরি ছেড়ো না।"

ইনস্পেক্টর জেনারেল (পুলিসের) সাহেব বর্দ্ধমান সদর কোর্ট অফিসের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া গেলেন, "প্রিয়বাবু বহুদিন কোর্টে আছে। উহাকে এইবার সারকেলের কাজে দেওয়া হোক।" তার পরেই পুলিস

সাহেব আমায় কোর্ট হইতে সরাইয়া সদর সারকেল ইন্‌স্পেক্টর করিয়া দিলেন। সারকেল ইন্‌স্পেক্টর হইয়াই প্রথম যেদিন এলাকায় ঘুরিতে বাহিরে হইলাম, সেই দিনই সে বৎসরের বর্ষার প্রথম বৃষ্টি-ধারা নামিল। সেই দিন ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সুধু পায়ে জল-কাদার মধ্যে দিয়া গলসী থানার এলাকায় দামোদর নদের তটস্থ কয়েকখানি গ্রামে যাইতেছি—পথে রাত্রি হইল। রাত্রে অন্ধকারে মাঠের উপর আইল পথ ধরিয়া যাইতেছি। সঙ্গে ৫/৭ জন লোক—২টা হ্যারিকেন আলোও আছে। সঙ্গে দুই জন আলো লইয়া যাইতেছে। তাহারা একটু সরু জোল পার হইয়া গেল। পশ্চাৎ আমি যেমন উহা পার হইবার জন্য একটা পা মাটিতে পাতিয়াছি, অমনি মনে হইল যেন একটা মোটা সাপের পেটে পা দিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ফোঁস শব্দে ছোবল পড়িল—ছোবল আমার পা ডিঙ্গাইয়া মাটিতে পড়িল। তখনই লাফ দিয়া পা সরাইয়া লইলাম। তখন হ্যারিকেনের আলো পড়ায় দেখিলাম, একটা বৃহৎ কৃষ্ণ গোখুরা সাপ লাফাইয়া পার্শ্বের জলাশয়ে পড়িল। সঙ্গের লোক সকল ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ খুব বাঁচিয়া গিয়াছেন।" এইরূপে দিন-রাত জল-কাদায় বৃষ্টির মধ্যে কাটিয়া গেল, পর দিনও ঐরূপে গেল। সন্ধ্যার আগে যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় ব্যথা ও নাক-মুখ দিয়া অনবরত কাঁচা সর্দ্দি ঝরিতেছে—চলৎশক্তি প্রায় রহিত। এমত অবস্থায় বাবাজীকে প্রণাম করিবার জন্য আশ্রমে গেলাম। বাসায় বলিয়া গেলাম—কিছুই খাইব না, রাঁধবার দরকার নাই। তখন রেলষ্টেশনের নিকট বিশুদ্ধাশ্রম বলিয়া নূতন আশ্রম হইয়াছে। বাবাজীকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। তখন বাবাজীর সন্ধ্যার জন্য উঠিবার প্রায় সময় হইয়াছে। আমি বসিলে বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, "কিগো, সর্দ্দিটা খুবই হয়েচে—সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিলে, কামড়ায়ানি তো? কামড়ালে আমাকেই বেগ পেতে হ'তো। অনেক দিন কোর্টের চাকরি ব'সে ব'সে করে শরীরটা খুবই অপটু হয়েছিল—কয়েকদিন বাহিরে ঘুরে ফিরে একটু শক্ত হোক।" এই বলিয়া উঠিয়া একবার উপরে গিয়া তখনই আবার নামিয়া আসিলেন। আমার দিকে চাহিয়া তখন বলিলেন, "কি গো, সর্দ্দিটা একটু কমেছে?" শরীরের ব্যথা ও সর্দ্দি তখন একেবারে দূর হইয়াছে। শরীরে দ্বিগুণ বল পাইয়াছি। বাবাজীকে তাহা জানাইলাম। তখন "উঠি গো" বলিয়া উপরে গেলেন। বাসায় আসিয়া তখনই আমার স্ত্রীকে কিছু খাবার করিতে বলিলাম। সন্ধ্যা করিয়াই অন্য দিন যাহা খাই, তাহার দ্বিগুণ খাইলাম। পরদিন ভোরেই আবার জল-বৃষ্টির মধ্যে কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে যাইতে হইল। এইরূপ জল-কাদা ও বৃষ্টির মধ্যে দিন কয়েক কাটিল। সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পরিণামে ১০/১২ দিন পরেই বর্দ্ধমান-বাঁকুড়ার দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ বন্যা হইল। সেই বন্যার শেষেই আমার বর্দ্ধমানের সারকেল ইন্‌স্পেক্টরি করা ঘুচিল। আমি সারদা পুলিসট্রেণিং কলেজে শিক্ষকের পদে বদলি হইলাম।

যখন আমি বসিরহাট-বারাসতের ডি. এস. পি., তখন একদিন সন্ধ্যার

আগে আমি ও বসিরহাটের ইন্‌স্পেক্টর সাইকেল চড়িয়া স্বরূপনগর থানা হইতে বসিরহাটে ফিরিতেছি। মাঠের মধ্য দিয়া কাঁচা রাস্তা; দুইধারে গভীর খানা। পথের ধারে গরু বাঁধা চরিতেছে। এরূপ অনেক গরুর দড়ির উপর দিয়া সাইকেল চালাইয়া আসিয়াছি। একটা গরু পথের একধারে চরিতেছিল, তাহার খোঁটা অপর ধারে। রাস্তার উপর দড়ি পড়িয়া আছে। যেমন উহার উপর দিয়া সাইকেল লইয়া যাইব, অমনি গরুটা লাফ দিয়া অপর পারে দৌড়িল। অমনি সাইকেল সমেত আমি বামদিকের দু' মানুষ-ভোর গর্ত্তে পড়িলাম। যখন শূন্যে পড়িতেছি তখন গুরু-পাদপদ্ম স্মরণ করিলাম। আশ্চর্য্য, সাইকেলটা পড়িয়া একটু বাঁকিয়া গেল মাত্র, কিন্তু আমায় যেন কেউ কোলে করিয়া গর্ত্তের নীচে বসাইয়া দিল। শরীরের কোন স্থানে কোন চোট লাগিল না। সঙ্গী ইন্‌স্পেক্টর দৌড়িয়া গর্ত্তে নামিয়া আসিয়া ধরিয়া তুলিল। ভাবিল, আমার দফা রফা। কিন্তু যখন আমি সহজভাবে উঠিলাম ও কোন স্থানে গুরুতর জখম হয় নাই দেখিলেন, তখন তিনি অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সাইকেলটা টানিয়া তুলিয়া একটু ঠুকিয়া সোজা করিয়া লইয়া আবার চড়িয়া বাসায় ফিরিলাম।

যখন আমি আলিপুর কোর্টের ডি. এস. পি., তখন একদিন সদর সাব-ডিভিসনের ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁহার মোটর গাড়ীতে একটা মামলার জন্য মফঃস্বলে যাই। ফিরিবার সময় বাক্‌ডার হাট পার হইতে পথের ধারে একটা পুলের থাম্বায় গাড়ী লাগিয়া সাম্‌নের একটা চাকা ফাটিয়া যায়। গাড়ী বেগে আসিতেছিল; সেই বেগে পুলের পরেই একটা বৃহৎ খানার গা দিয়া গিয়া একটা গভীর পুকুরের পাড়ের নীচ দিয়া উঠিয়া উপরে রাস্তায় গাড়ী থামিল। গাড়ীর কল খারাপ হইয়া গেল। আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অনেক লোক জড় হইল। দেখা গেল, গাড়ীর বাঁ দিকের চাকা পথের ধারের খানা ও পুকুরের ঢালু দিয়া গিয়াছে ও ডানদিকের চাকা ঐ ঢালুর উপরে পথের ধার দিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রায় বিশ হাত গিয়াছে। যেরূপ কাত হইয়া গাড়ি গিয়াছে তাহাতে স্বভাবতঃ গাড়ী উল্টাইয়া পুকুরের নীচে জলের মধ্যে গিয়া আমাদের পুঁতিয়া রাখিবার কথা। বেশ বুঝা গেল, গুরু-কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি। অলক্ষিতে তিনি গাড়ী টানিয়া ধরিয়া রাখিয়া উপরে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। নচেৎ রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সকলেই এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল। গাড়ীর চালক অনেক টানাটানি করিয়া গাড়ী আর চালাইতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরেই সামনের দিকে দুইখানি ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল। ঐ ট্যাক্সির লোকেরা তাহাদের যন্ত্রপাতি দিয়া আমাদের গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠিক করিয়া দিল। ঐ সময় বাবাজী কলিকাতায় ভবানীপুর আশ্রমে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়াই তথায় গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। বাবাজী বলিলেন, "কি গো, কোথা থেকে। পথে গাড়ীর কোন গোলযোগ হয়নি তো?" আমি তখন বলিলাম, "বাবা, এই মৃত্যু-মুখ থেকে ফিরে আসছি।" বাবাজী

তখন বলিলেন, "গাড়ী ওল্টাবার যো কিরে, বাপু।" তখন উপস্থিত গুরুভাই সকল জানিতে উৎসুক হওয়ায়, সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম।

বর্দ্ধমানে বাবাজী যখন পুরাতন আশ্রমে ছিলেন, সেই সময় একদিন আমার রাণীগঞ্জের বাসায় বসিয়া আমার ছোট ছেলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল; বাবাজীর সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। আমার স্ত্রী পুত্রকে কথায় কথায় বলে, "কিরে, তুই সাহেব হবি, না যোগী হবি।" আমার ছেলে বলে, "আমি যোগী হব।" এই কথার কয়েক দিন পরে বাবাজী একদিন আমাদের বাসায় আসেন। বাসায় প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে আমার ছেলেকে বলেন, "কিহে, তুমি যোগী হ'বে বলেছ, না? যোগী হওয়া বড় সোজা নয়।" পরে বাবাজী আমার স্ত্রীকে বলেন, "মিণ্টু ছেলে ভাল, বেশ লেখাপড়া শিখবে ও উন্নতি করবে।" আমার ছেলে (মিণ্টু) এখন ইনকাম্-ট্যাক্স অফিসের একজন একজামিনার অব্ একাউন্টস্।

এই সময় আমার স্ত্রী ও ছোট ভাই বাসায় নানারূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ও মধ্যে মধ্যে বাবাজীকে ও গুরুভাইদের খাওয়াইতে ভালবাসিত। একদিন বাবাজীর জন্য সন্দেশ ও পান্তুয়া তৈয়ারি করিয়া ইচ্ছা করে, বাসায় বাবাজীকে আনিয়া খাওয়াইবে। আমায় বাবাজীকে বলিবার জন্য অনুরোধ করায়, আমি আশ্রমে যাই ও অনেকক্ষণ বসিয়া থাকি, কিন্তু মুখ ফুটিযা বলিতে পারি নাই। মনে করিলাম, বাবাজী তো সবই জান্‌ছেন—যে জন্য এসেছি তা আর কথায় বলার দরকার কি? অনেকক্ষণ বসার পর যখন বাবাজী আমাদের বাসায় আসিবার কোন ভাব দেখাইলেন না, তখন আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বাবাজী না আসায় আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই কিছু না খাইয়া বসিয়া থাকিলাম। বেলা প্রায় যায় যায়, আর আসার আশা নাই দেখিয়া, আমরা সদর দরজা বন্ধ করিয়া না খাইয়া শুইয়া পড়িব মনে করিতেছি, এমন সময় সদর দরজা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে 'মিণ্টু, মিণ্টু' বলিয়া ডাক শুনিয়া আমার ছেলে দৌড়িয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাবাজী বাসায় ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "কিগো, কত সন্দেশ পান্তুয়া করেছ যে বাবা এলো না—খেলো না বলে এত বড় রাগ করে বসে আছ? কই কি করেছ নিয়ে এস, বাপু" বলিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আমার স্ত্রী ও আমি তখন আনন্দে গদগদ হইয়া পদধূলি লইয়া বাবাজীকে সন্দেশ পান্তুয়া খাইতে দিলাম।

বাবাজী তখন সন্দেশ পান্তুয়া দেখিয়া বলিলেন, "ওগো, এ যে দেখছি বেশ হয়েছে। বেশ, ঠাকুরের পূজা দিয়া আমিও খাইব ও ছেলেরাও খাইবে—আশ্রমে পাঠাইয়া দিও।" তখন আমরা বাবাজীর কথা-মত ঐ মিষ্টান্ন আশ্রমে লইয়া গেলাম। পূজা দেওয়ার পর, বাবাজী খাইয়া ছেলেমেয়েদের সকলকে প্রসাদ দিলেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ দে

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

পোস্ট ও গ্রাম—অণ্ডাল
জেলা ঃ বর্দ্ধমান

১। আমি সন ১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রী৺দূর্গাপূজার পরই ত্রয়োদশীতে বহুপুণ্যফলে শ্রীশ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করি। সন ১৩১৬ সাল হইতে কয়লা কুঠীর ডাক্তারের কার্য্য করিতেছিলাম এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমার যাবতীয় পান-দোষ, আচার-দোষ ও চরিত্র-দোষ ঘটে। বিশেষ অত্যাচারের ফলেই হউক, আর পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলেই হউক, সদ্‌গুরু লাভের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে এবং কোন প্রকারে শ্রীশ্রীচরণে আশ্রয় পাই। দীক্ষা গ্রহণের কালে আমার মানসিক প্রার্থনা ছিল,—ঐ সমস্ত দোষ যাহাতে আর আমার নিকট স্থান না পায়। প্রার্থনানুযায়ী ফলও পাইয়াছিলাম, তবে তিনি কেমন ভাবে আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন বা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহারই একটা বিবরণ লিখিতেছি।

১৩২০ সালের বৈশাখ-জ্যেষ্ঠমাসে আমি আমার কোন গুরু-ভ্রাতার নিকট ঝরিয়ার অধীন বড়াগড় কয়লা কুঠীতে চাকরীর চেষ্টায় ছিলাম। একদিন বৈকালে উক্ত কুঠী হইতে আমাদের গুরু-ভাই পূজনীয় শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলাম। মধ্যে একটা ডাঙ্গায় একটা দুষ্টা স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহার অঙ্গভঙ্গী ও চালচলনে আমার কু-সংস্কার জাগিয়া উঠিল এবং আমি সেই বাসনার বশবর্তী হইয়া তাহার নাগাল পাইবার জন্য দ্রুত চলিতে লাগিলাম। সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে দ্রুত আসিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। তাহাকে ধরিতে আর বেশি দেরী নাই। মধ্যে মাত্র বিঘা কয়েক জায়গা—নীচের কয়লা কাটিয়া লওয়ায় বসিয়া গিয়াছে। সেইটি পার হইব, হঠাৎ সেখানে শ্রীশ্রী৺বাবার গায়ের সৌরভ পাইলাম। সৌরভ এত বেশী হইল যে, সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। মনে মনে সভয়ে প্রণাম করিলাম। গন্ধ প্রায় ১০/১৫ মিনিট অনুভব করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া শ্রীশ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ গন্ধ অন্তর্হিত হইল। আমি উঠিয়া পূজনীয় দক্ষিণা দাদার নিকট আসিলাম ও শ্রীশ্রীগুরুপদ স্মরণ করিতে করিতে ঝরিয়া থানায় উপস্থিত হইলাম। এই ভাবে কতবার—প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া বাবাজী আমার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি বেশ অনুভব করিয়াছি।

২। সন ১৩২২ সাল—আমি তখন ইছাপুরে থাকি। পূজ্যপাদ বাবাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু মাসাবধিকাল অপেক্ষা করিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। আরও কিছুদিন পরে একটা সাংসারিক চিন্তায় আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। আহ্নিক করিবার সময়ে আসনে বসিয়া কেবল ঐ চিন্তা এবং তাহার নানাবিধ উপায় বিধান কল্পনা করি। মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা নূতন করিয়া

আরম্ভ করি। এইরূপে পুনর্ব্বার বিকল হই এবং বড় অশান্তিতে থাকি। চতুর্থ দিবসে একখানা অভয় লিপি পাইলাম—"বাবাজীবন, কোন বিষয়েই চিন্তা করিবে না। উপদেশ-মত কার্য্য ঠিকভাবে করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে চিন্তার কোন কারণই থাকিবে না।" পোস্টকার্ডখানি পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। পত্রখানি মাথায় রাখিয়া কৃপার কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ চিন্তার কারণ দূর হইল। এইভাবে দয়া না করিলে, এমন পাষণ্ডকে এমন কৃপা না করিলে, কি করুণাময় বলে?

৩। কোন সময় (সন, তারিখ দিলাম না, বেশ মনে আছে) আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতে চুরি হয়। আমি কোন কোন আত্মীয়কে সন্দেহ করি এবং পুলিশে সংবাদ দিই। বেশী টাকার তালিকার জন্য সেই আত্মীয়ের খানাতল্লাস করা হয়, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব এবং আমার মেজো মেয়েটির সমস্ত অলঙ্কার চুরি যায়। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী৺বাবাকে পত্র লিখি—"আমাদের যাহা গিয়াছে, না গিয়াছে, তাহার জন্য বিশেষ দুঃখ করি না, কিন্তু মেজো মেয়েটির অলঙ্কার আমি জীবনে দিতে পারিব কি না সন্দেহ এবং শ্রীশ্রীচরণ-কৃপায় দিতে পারিলেও চির কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে," ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে—কেবল পঁহুছিতে মাত্র দেরী—উত্তর পাই—"চিন্তার কারণ দেখি না," ইত্যাদি। নয় দিন পরে রাত্রে হঠাৎ সেই আত্মীয়ার পুত্রের হাতে কিসে কামড়াইল। হাতটা চড় চড় করিয়া ফুলিয়া উঠিল। ছেলে জ্বালায় অস্থির হইল, সে তার স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইল। স্বামী সেই সব দেখিয়া বলিল, "কি করলি, ছেলেটাকে ঘুচাতে বসেছিস। মুনীন্দ্রের গুরুদেব সাক্ষাৎ ঈশ্বর, শুনেছি আবার চিঠিও লিখেছেন, কোন চিন্তা নাই।" এই সব কথা-বার্ত্তা স্ত্রী-পুরুষে হইতেই স্ত্রী বলিয়া ফেলিল, "এই নাও, দিয়ে এসো। যেন আমার ছেলেটির কিছু না হয়, আর আমরা কোন বিপদে না পড়ি, এর জন্য বলো এবং স্বীকার কোরো!" কি আর বলিব! সেই অলঙ্কারের পোঁটলা আমার অন্য আত্মীয়কে দিয়ে এসে দেখে, ছেলের হাতের ফুলাও সারিয়াছে, জ্বালা-যন্ত্রণাও নাই—ছেলে বেশ হেসে-খেলে কথা কহিতেছে। স্ত্রী-পুরুষে শান্তি পাইল। আমিও আমার আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম এবং মনে মনে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম এবং তাঁর করুণার কথা স্মরণ করিয়া কি পর্য্যন্ত যে নিজেকে ধন্য মনে করিলাম তাহা আর কি বলিব। শ্রীশ্রীচরণ দর্শন জন্য ধানবাদে গেলাম। দেখেই বললেন, "কিরে বাপু, মেজো মেয়ের অলঙ্কারগুলি তো পেয়েছিস্?" বলেই হাসিতে লাগিলেন।

৪। বেশী দিনের কথা নয়, গত জ্যৈষ্ঠ মাসেই মনে হয়, সন্ধ্যায় ইছাপুর হইতে ফিরিতেছি; মধ্য রাস্তায় আরতি গ্রামের একটা পুকুরের মধ্য দিয়া রাস্তা। আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হইতেছে, তজ্জন্য তাড়াতাড়ি দ্রুত হাঁটিতেছিলাম। ঐ পুকুরের রাস্তায় একটা সাপ পড়িয়াছিল, তার উপর পা দিতেই সাপটা আমার গোড়ালীর উপর

কামড়াইয়া দেয়, একটি দাঁত বেশ ঢোকে, একটি মাত্র দাগ পড়ে। অন্ধকারে সাপটা দেখিলাম না,—তাড়াতাড়ি হইয়াছিল, আহ্নিক হয় নাই। মনে করিলাম ঢোঁড়া বা মেটেলি। সঙ্গে ঔষধের বাক্স ছিল, নামাইতে বলিয়া তাহা হইতে আয়োডিন বাহির করিয়া বেশ করিয়া লাগাইয়া লইয়া আবার রাস্তা চলিতে শুরু করিলাম। মুটেটা ইছাপুর ফিরিয়া রোজাদের নিকট যাইতে বলিতেছিল। না শোনায় চুপ রহিল; কামড়ের জায়গায় প্রথমতঃ চিন চিন, পরে জ্বালা, বোধ হইতে লাগিল। বাড়ী পৌছিলাম; মুটেটা আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে দুইজন রোজা আসিয়া উপস্থিত। তাদের ঝাড়তে ফুঁকতে দিলাম, কিন্তু তাদের ঔষধ খাইলাম না। আমার স্ত্রীর অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবার নিকট যে ঔষধ শেখা ছিল এবং যাহা বাড়ীতে তোলা ছিল, তাহা একমাত্র খাইলাম এবং আহ্নিক করিতে বসিলাম। ইত্যবসরে রোজারা আহার ও নিদ্রা বন্ধ করিবার উপদেশ দিয়া গেল। আহ্নিক করিয়া উঠিয়া খাবার চাহিলাম। স্ত্রী রোজাদের উপদেশ শুনাইয়া দিল। কোন প্রকারে বুঝাইয়া এবং অতিরিক্ত ক্ষুধা জানাইয়া স্বল্প খাবার ও দুগ্ধ পাইলাম। তামাক খাইতে নিষেধ ছিল, তাহাও মানিলাম না। নানা প্রকার কথায় আমারও মনে সঙ্কীর্ণতা আসিল। যেন জ্বালার বৃদ্ধি মনে হইতে লাগিল, কাজেই নিদ্রা যাইতেও ভয় হইতে লাগিল। তখনই সাহস হইল, কারণ শ্রীশ্রীবাবা কতবার বলিয়াছেন, দুই সন্ধ্যা আহ্নিকে অবহেলা না করিলে তাহার অপমান বা অপমৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু সঙ্কীর্ণতার জন্য দৃঢ় হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, "নিদ্রা যাইব না, বিশ্রাম করিগে" বলিয়া বিছানায় যাইয়া শুইলাম। আমার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ডাক দিয়া জাগাইতেছিল। রাত্রি ১২টার সময় একটু তন্দ্রা আসিয়াছে মনে হইল। উত্তর দিকের জানালা কে খুলিল। আলোটা হঠাৎ কমিয়া গেল, চোখ মেলিয়া চাহিলাম—অন্ধকার। হঠাৎ দেখি একটা জ্যোতিঃ, যেন ঘরে শতসহস্র সার্চ্চলাইট জ্বলিয়াছে; দেখিবামাত্র চোখ বুজিলাম। আনন্দে ও ভয়ে, শ্রীশ্রীবাবাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিলাম। এমন আনন্দ অনুভব হইল যে তাহা আর প্রকাশ করিতে পারি না। আমার স্ত্রীও সেই শব্দ অনুভব করিয়া নীচে হইতে আমাকে ডাক দিয়া, "কিসের শব্দ" জিজ্ঞাসা করিয়া সাড়া পাইল। উঠিয়া দেখি, জানালাও বন্ধ, আলোও পূর্ব্ববৎ জ্বলিতেছে, কিন্তু ঘরে শ্রীশ্রীবাবার গায়ের সৌরভ বেশ রহিয়াছে। আমি স্ত্রীকে জাগাইলাম, অভয়দাতার অভয় পাইয়া সকলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলাম। জ্বালা-যন্ত্রণা সব জুড়াইল।

৫। সরপী নিবাসী আমাদের গুরুভাই শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার চোখের অসুখ। বাঁকুড়া ও বালেশ্বরের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সিভিল সার্জ্জনের ব্যবস্থা পত্রানুযায়ী ঔষধে কোন ফল না হওয়ায় শ্রীশ্রী৺বাবাকে তাঁহারা জানান। তিনি বলেন, "তোমাদের বাড়ীতে কে চিকিৎসা করে জান কি? সে ভাল চিকিৎসক। তাহাকে দেখাইয়া ঔষধ লইবে, তাহাতেই

আরোগ্য হইবে।” আমাকে তাঁহারা ডাকিয়া পাঠান এবং সমস্ত কথা বলেন। আমি সেই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, খেলোয়াড় ঠাকুরের নূতন খেলা। বুঝিলাম পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইবেন। তখন সামান্যমাত্র ঔষধ দিলাম, ঠিক রোগানুযায়ী নহে। তবে সেই ঔষধেই ৩/৪ দিনের মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন না আরোগ্য বোধ হইল। উচ্চ-শিক্ষিত চিকিৎসক দ্বারা অনেক দিন ধরিয়া চিকিৎসায় কোন ফল লাভ হয় নাই, অথচ আমার মত একজন সামান্য চিকিৎসকের ঔষধে শীঘ্রই রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। রোগিণী আমাদের গুরু-ভগিণী। গুরুদেব কত প্রকারে যে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহা অন্যে কি জানিবে বা বুঝিবে? এমন বহু ঘটনা হইয়াছে—তার মধ্যে এই কয়টা সম্প্রতি দিলাম।

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়

প্যারিচাঁদ মিত্র লেন, বর্দ্ধমান।

১। একদিন বিশুদ্ধাশ্রমে দেখিলাম, বালক-বালিকাগণ আসিয়া বাবাজীকে “গোলাপ-জল দিন” বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। পরে বাবাজী বলিলেন—“আচ্ছা, জল নিয়ে এস।” তাহারা গ্লাসে করিয়া জল আনিয়া নিকটে ধরিল। বাবাজী ঐ জলে অঙ্গুলি ডুবাইয়া দিলেন, অমনি সেই জল উত্তম গোলাপ-গন্ধময় হইল। আমরা অনেকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। এরূপ একবার নয়, অনেকবার দেখিয়াছি।

২। একদিন বাবাজীর নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “গন্ধ কি যখন তখন আসিতে পারে?” বাবাজী বলিলেন, “দেখিবে? এই দেখ।” তখন তিনি দক্ষিণ হস্তের তালু দেখাইলেন। আমি ঐ হস্তের আঘ্রাণ লইয়া দেখিলাম, ঠিক পদ্মফুলের গন্ধ ছুটিতেছে। আবার তিনি বাম হস্তের তালু দেখাইলেন। উহাতেও ঐরূপ গন্ধ পাইলাম। পরে দক্ষিণ হস্তের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পরে তিনি দক্ষিণ পদের তালু ও বাম পদের তালু দেখাইলেন, তাহাতেও অতি মনোহর সুগন্ধ পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তখনও আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় তিনি হস্ত-পদের ঘ্রাণ লইতে বলিলেন। তখন আমি ঘ্রাণ লইয়া দেখিলাম, সেই উৎকৃষ্ট গন্ধের লেশমাত্রও আর পাইলাম না। সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিল ও কোথায় গেল ভাবিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। আর সন্দেহ রহিল না।

৩। কোন কোন সময় বাবাজী আমার হাতে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া দিয়াছেন,

কখন কখন বস্ত্রে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই হস্তে ও বস্ত্রে সুন্দর গোলাপ-গন্ধ, কখন কখন বা বেল ফুলের গন্ধ, কখন চম্পক-গন্ধ হইয়াছে। একবার নয়, এরূপ অনেক সময় দেখিয়াছি।

৪। বিশুদ্ধাশ্রমে যাইবার পথে একটা ফুলের গাছে সাদা থোপা থোপা ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া আমি এক থোপা ফুল তুলিয়া আনিয়া আশ্রমে গিয়া বসিলাম। বাবাজীকে দিলাম। বাবাজী বলিলেন, "ইহাতে কোন গন্ধ নাই।" আমরা অনেকে ফুল লইয়া শুঁকিয়া দেখিলাম, সে ফুলে কোনই গন্ধ নাই। পরে বাবাজী ফুলটি হাতে লইয়া পুনরায় আমাদিগকে দিলেন। তখন আমরা দেখিলাম, সেই ফুল উৎকৃষ্ট সুগন্ধময় হইয়াছে।

৫। একদিন বাবাজীর নিকটে অনেকে বসিয়া আছি, একটু দূরে একটি ঘড়ী রহিয়াছে। বাবাজী বলিলেন, "ঘড়ীতে কত বাজিয়াছে, দেখ।" আমরা দেখিলাম পাঁচটা কয়েক মিনিট হইয়াছে। বাবাজী বলিলেন, "ঐ ঘড়ী আর চলিবে না, এখনই বন্ধ হইবে।" কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা দেখিলাম, ঘড়ী চলিতেছে না, বন্ধ হইয়া আছে। তারপরে তিনি বলিলেন, "এখন দেখ দেখি ঘড়ী চলে কি না।" আমরা দেখিলাম, তখনই ঘড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

৬। একদিন আমরা আশ্রমের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছি, সকলেই দেখিলাম, একটা কাঠবিড়ালী আশ্রমের কার্ণিসের ধারে যাইতেছে। বাবাজী তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন, অমনি কাঠবিড়ালীটি স্থির হইল। একটু পরে দেখা গেল কাঠবিড়ালীটি মরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি বাবাজীর তীব্র দৃষ্টিপাতে অনেক সর্প স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পরে মরিয়া গিয়াছে।

৭। অনেকবার দেখিয়াছি, মাছি বাবাজীর গায়ে বসিয়াছে। আমি মাছি উড়াইতে গিয়া দেখি মাছিটা পড়িয়া গেল, সে মরিয়া গিয়াছে। আশ্রমের গাভী ও বৎসের নিকট বাবাজী দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা নিকটে আছি, একটা বড় ডাঁশ মাছি বাবাজীর পৃষ্ঠে বসিয়া আছে, দেখিয়া আমরা বলিলাম, "একটা বড় ডাঁশ আপনার পৃষ্ঠে বসিয়াছে।" বাবাজী বলিলেন, "উহাকে আর তাড়াইতে হইবে না, ওখানেই উহার শেষ হইবে।" পরে আমরা দেখিলাম, ডাঁশমাছি আর উড়িল না, সেইখানেই মরিয়া পড়িয়া গেল।

৮। আমরা অনেক দেখিয়াছি, বাবাজী একটা বাটীতে ঘৃত মাখাইয়া মুখ বাঁধিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিলেন। কয়েক ঘণ্টার পরে দেখা গেল, সেই বাটীর মধ্যে সন্দেশ প্রস্তুত হইয়া আছে। সকলেই তাহা মুখে দিয়া দেখিলাম, অতি সুমিষ্ট সুঘ্রাণযুক্ত সন্দেশ হইয়াছে।

৯। একটা রৌপ্য কৌটা বাবাজীর কাছে ছিল। আমরা দেখিলাম, তিনি সেই কৌটার উপরে বারে বারে অঙ্গুলি দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "এই দেখ।" বাবাজী কৌটার মাথায় অঙ্গুলি দিলেন এবং অঙ্গুলি উচ্চে

তুলিলেন, কিন্তু কৌটা পড়িল না, অঙ্গুলিতে লাগিয়াই রহিল।

১০। একদিন প্রাতে আমি ও একটি উকিলবাবু বসিয়া আছি। বাবাজী বলিলেন, "একটা তামাসা দেখিবে?" আমরা বলিলাম, "হাঁ"। তিনি বলিলেন, একটা কাগজে কিছু লেখ।" আমরা একটু কাগজ লইয়া যুক্তি করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম। প্রথমেই 'My Dear' লেখা হইল। পরে তাহা একটি কালির দাগ দিয়া কাটা হইল। তৎপরে বাঙ্গলাতে পত্র লেখা হইল। দশ বার লাইন লিখিয়া উহা জড়াইয়া ভাঁজ করিয়া বাবাজীর হস্তে দেওয়া হইল। তিনি উহা কলিকার আগুনে নিক্ষেপ করিলেন। কাগজ পুড়িয়া গেল। পরে ৫ মিনিটকাল বাবাজী চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন,—"চিঠিখানিতে প্রথমেই 'My Dear' লিখিয়া আবার কাটিয়া দিয়াছ।" আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পরে তিনি সমস্ত পত্রখানির লেখা বলিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম, যাহা লেখা হইয়াছিল অবিকল তাহাই তিনি বলিয়াছেন।

১১। আমি একদিন একটু কাগজ হাতে করিয়া জড়াইতেছি। বাবাজী বলিলেন, "ওটা কী?" আমি বলিলাম, "একটু ছেঁড়া কাগজ।" বাবাজী বলিলেন "দেখি।" আমি দিলাম। কাগজটুকু লইয়া বাবাজী বলিলেন "গাঁদা ফুল।" আমি বলিলাম, "সে কি!" তিনি কাগজটুকু হাতে রগ্‌ড়াইয়া আমাকে বলিলেন, "দেখ কিসের গন্ধ?" আমি শুঁকিয়া দেখি, ঠিক গাঁদা ফুলের গন্ধ সেই কাগজে মাখা। তখন বলিলেন, "এই ত গাঁদা ফুলের গন্ধ বাহির হইতেছে।" বাবাজী বলিলেন, দেও।" কাগজটুকু তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি হাতের অঙ্গুলিতে রগ্‌ড়াইয়া আমার হাতে দিলেন, আমি দেখিলাম, কাগজ নাই। সেটা একটা গাঁদা ফুল হইয়াছে।

১২। আশ্রমে অনেকে বসিয়া আছি। জিলাপীর মত পেঁচ দেওয়া এক রকম মশার ঔষধ একজন আনিলেন। বাবাজীকে দেখিতে দেওয়া হইল। বাবাজী তাহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া হাতে লইয়া অঙ্গুলিতে টিপিতে লাগিলেন। সেই পেঁচগুলি সরু সরু ছিল। বাবাজীর হস্তস্থিত সরু অংশ ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হইল। আমরা হাতে করিয়া দেখিলাম, সেই অংশ চর্তুগুণ মোটা হইয়াছে। এক মিনিটের মধ্যে এত দূর মোটা কিরূপে হইল, ভাবিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। দেখিয়া দেখিয়া এই সব সম্বন্ধে আর আমার কোন সন্দেহ রহিল না। আমি বুঝিলাম, বাবাজীর অলৌকিক শক্তিতেই এসকল সম্ভব হয়। ভগবানের শক্তিতে কি না হইতে পারে। বাবাজী ভগবৎ-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীকুমার নাথ মুখোপাধ্যায়।

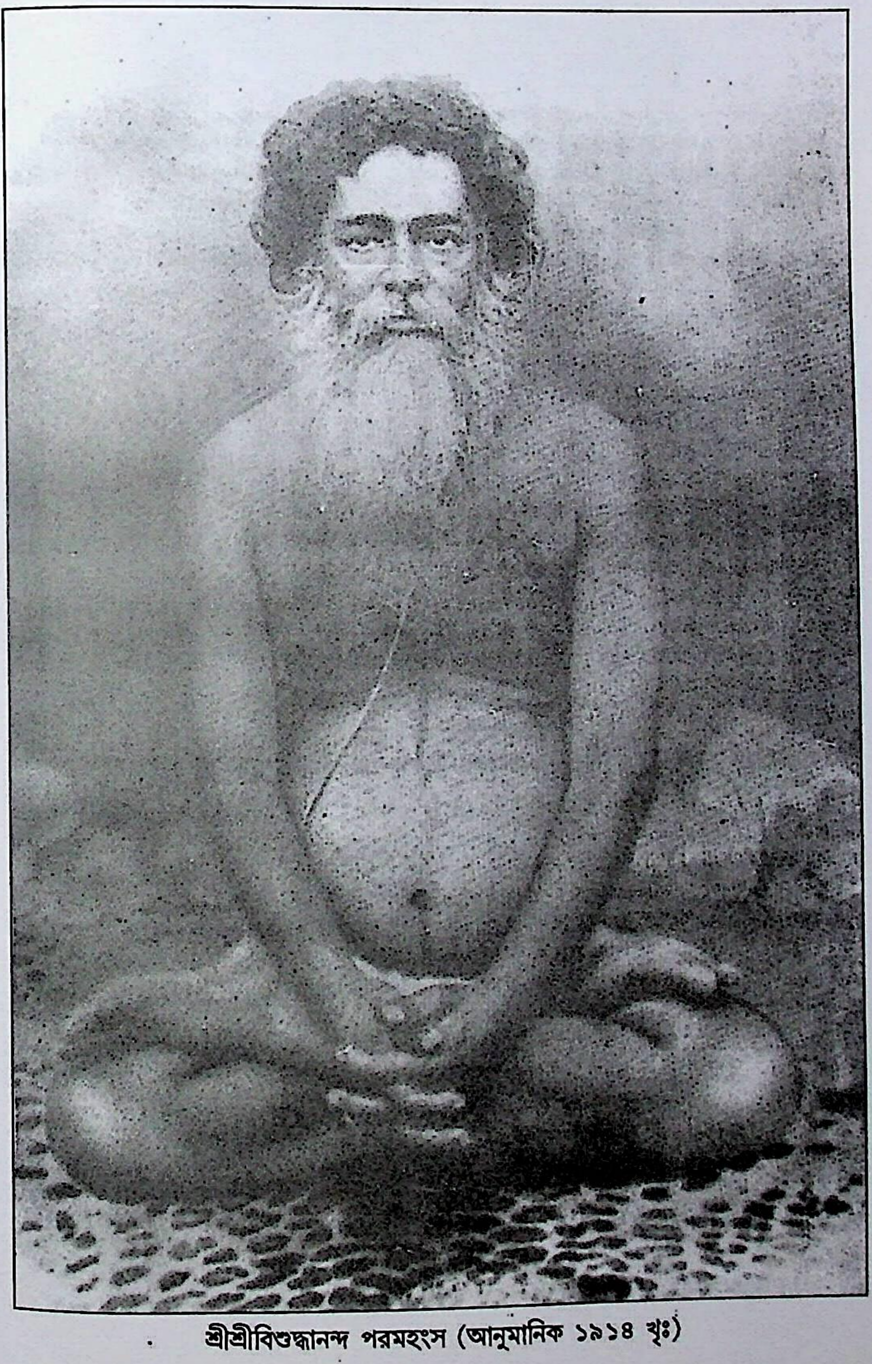

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস (আনুমানিক ১৯১৪ খৃঃ)

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পাঠ

লীলা-কথা

(উত্তরার্দ্ধ)

শ্রীচন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, এম, এস

পোঃ অযোধ্যা, জেলা বাঁকুড়া।

সন ১৩১৬ সাল ১৭ই তারিখে আমার দীক্ষার দিন স্থির হয়। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় (পুলিস সাহেব) আমাকে তাঁহার কুঠিতে গিয়া দীক্ষা লইতে বলিলেন, কিন্তু আমার তাহা মনঃপুত হয় নাই। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার বাসায় এক দিবস সশিষ্য অবস্থান করেন। যথা সময়ে তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—তখন তাঁহার সহিত বিদেশী শিষ্য সংখ্যায় প্রায় ২০।২৫ জন ছিলেন। আমি সকলকেই ঐ তারিখে আমার বাটীতে আহ্বান করি। বাবাজীর ইচ্ছা অনুযায়ী 'ভুনি খিঁচুড়ী' তৈয়ারি করা হয়। মৎস্য তখন সেবায় দেওয়া চলিত, সুতরাং মৎস্যের কালিয়া ও অন্যান্য তরকারীও করা হয়। বাবাজীর আহার শেষ হইবার পর শিষ্যদের জন্য যখন পাতা করা হয়, সেই সময় পুরুলিয়া হইতে হঠাৎ ২০।২৫ জন-শিষ্য ডাউন গোমো প্যাসেঞ্জারে আসিয়া উপস্থিত হন। আমি তাঁহাদিগকে ঐরূপ অসময়ে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হই, কারণ মোটে ৩০।৩২ জনের উপযুক্ত আহার্য্য প্রস্তুত করান হইয়াছিল, এ সময়ে ঐ সকল আহার্য্য পুনরায় প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ। আমার মানসিক অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন "বাবা, চিন্তা কি? সকলের পাত করিয়া দাও। রান্না ঘরে তুমি ও বধূমাতা ভিন্ন অন্য কেহ যেন প্রবেশ না করে। খিচুড়ীর হাণ্ডার মুখ সর্ব্বদা ঢাকা রাখিবে, বধূমাতা অন্ন বাহির করিয়া গামলায় দিবেন, তুমি উহা ঘর হইতে বাহিরে আনিয়া পরিবেশনকারিগণকে দিবে।" তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য

করিয়া দেখা গেল যে একবার হাণ্ডা হইতে অন্ন বাহির করিয়া পরিবেশনকারীদের হস্তে দেওয়ার পর পুনরায় যখন অন্ন বাহির করিবার জন্য ঢাকনা খোলা হইল, তখনও হাণ্ডা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রায় ৪০/৪৫ জন শিষ্য পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করার পরও হাণ্ডা রিক্ত হইল না। বাবাকে ঐ ব্যাপার সংবাদ দেওয়ায় তিনি বলিলেন যে তুমি ও বধূমাতা যতক্ষণ আহার না করিবে ততক্ষণ ঐ হাণ্ডা পূর্ণই থাকিবে।

সন ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব তেলিবেড়া গ্রামে পুনরায় শুভাগমন করেন এবং তথায় মাসাবধি থাকিয়া মাঘ মাসে বাঁকুড়ায় আসেন ও আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ অপূর্ব্বকুমারকে বাবাজী দীক্ষা দেন। ঐ ঘটনার এক মাস পরে গুরুদেব গুস্করা হইতে একখানি পত্রে আদেশ দেন—'তুমি পত্রপাঠ মাত্র শ্রীমান্ অপূর্ব্বকে সঙ্গে লইয়া গুস্করায় আসিবে'। তাঁহার আজ্ঞামত তৎপর দিন রওয়ানা হইয়া, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করি। আহারাদির পর শ্রীশ্রীগুরুদেব একটি তক্তার উপর বসিয়াছিলেন এবং শ্রীমান্ অপূর্ব্বকুমার পদসেবায় নিরত ছিল। আমি নীচে বসিয়া বাঁকুড়ার অন্যান্য শিষ্যগণের কুশল সমাচার জ্ঞাপন করিতেছিলাম। হঠাৎ বাবাজী অপূর্ব্বকে বলিলেন—'নেহাৎ ভাঁড় নইরে বাপু'। তাঁহার এই আকস্মিক উক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইয়া দেখি যে শ্রীমান্ অপূর্ব্বকুমারের ডান হাতের চারিটি অঙ্গুলি বাবার বাম পায়ের ডিমের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে ও সে টানিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। বাবা আমাকে বলিলেন যে তোমার ভাগিনেয়ের মনে সন্দেহ হয় যে আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া একজন ঐন্দ্রজালিকের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তিনি অঙ্গুলি মুক্ত করিয়া দিয়া অপূর্ব্বকে বলিলেন,—"দীক্ষার পর গুরুকে সন্দেহ করা নিতান্ত অন্যায়, তাহাতে নিম্নগামী হইতে হয়। প্রথমে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া পরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু একবার দীক্ষা গ্রহণের পর আর বিন্দুমাত্রও দ্বিধার ভাব মনে না রাখিয়া গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এখনও যদি তোমার মনে সন্দেহ থাকে জানাও, "তুমি যে কোনও যোগ বিভূতি দেখিতে ইচ্ছা করিবে আমি তাহাই তোমাকে দেখাইতে প্রস্তুত।" তখন তাহার প্রার্থনামত তিনি তাহাকে নাভিধৌতির ক্রিয়া দেখান। নাভিদ্বার প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ প্রসারিত করেন ও একটি বড় স্ফটিক লইয়া ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেন। তাঁহার এই আলৌকিক ক্ষমতায় ভীত হইয়া অপূর্ব্ব তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা করে।

সন ১৩১৭ সালে ফাল্গুন মাসে ৺শিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষে ৪।৫ দিন পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য আমরা বাঁকুড়া হইতে পাতা ও তরকারী একটা গো-যানে করিয়া হাঁটা রাস্তা দিয়া বণ্ডুলে পাঠাই এবং আমরা নিজে একদিন পূর্ব্বে ট্রেনে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার সময় আশ্রমে পৌছাই। আমরা গিয়া শুনিলাম আমাদের প্রেরিত গো-যান তখন পর্যন্তও আসিয়া পৌঁছে নাই। চিন্তায় আমাদের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, কারণ বণ্ডুল বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাতা

পাওয়া যায় না। শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন গোযানের কোনই সংবাদ মিলিল না, তখন আমরা হতাশ হইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"রাস্তায় তোমাদের গাড়ীর ব্যাঘাত হইয়াছে। কল্য প্রাতে কুমারী ভোজন বা ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে ঐ গাড়ী আসিতে পারিবে না।" আমরা তাঁহার পদযুগল ধরিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা করায় তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন—"চিন্তা কি বাবা? ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছায় তোমাদের কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে—তোমাদের সাধু সঙ্কল্প কখনই ব্যর্থ হইবে না। জগদম্বার কৃপায় কি না হয়?" আমরা পরদিন অতি প্রত্যুষে আশ্রমের চৌকীদার যদুকে পাতার গাড়ীর সন্ধানে বর্দ্ধমানের রাস্তায় পাঠাই। সে বেলা ৮টার সময় ফেরৎ আসিয়া সংবাদ দিল যে কুড়মুন পর্য্যন্ত গিয়াও সে গাড়ীর কোনও সন্ধান পায় নাই, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় ভাঁড়ারডিহির রাস্তায় একগাড়ী কলাপাতা আশ্রম অভিমুখে আসিতে দেখিয়াছে এবং চালককে জিজ্ঞাসা করায় জানিয়া আসিয়াছে যে বণ্ডুল আশ্রমই ঐ গাড়ীর গন্তব্য স্থান। কিছুক্ষণ পরেই ঐ কলাপাতায় গাড়ী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে কায়গ্রামের এক জন কায়স্থ ভদ্রলোক ঐ পাতা পাঠাইয়াছেন। ঘণ্টাখানেক পর ঐ পাতার প্রেরক স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তিনি আমাদের সকলেরই অপরিচিত। তাঁহাকে হঠাৎ এই পাতা পাঠাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন—"গত বৈকাল বেলায় আমি আমার একটি পাঁচবৎসর বয়সের ছেলের সঙ্গে একটি নূতন পুকুরের পাড়ে বেড়াইবার সময় হঠাৎ সেই ছেলেটি বলিয়া উঠে,—'বাবা, বণ্ডুল আশ্রমে পাতার অভাবে আগামী কল্য কুমারী ভোজন ও ব্রাহ্মণ ভোজন পণ্ড হইতে বসিয়াছে। তোমার ত এত কলাগাছ আছে, এক গাড়ী পাতা আশ্রমে পাঠাইয়া দাও না।' তাহার এই কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কারণ বন্ডুল আশ্রমে কুমারী ভোজন ও ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা লোকপরম্পরায় শুনিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ঐ ছোট ছেলেটির সে সম্বন্ধে কোনও সংবাদ জানার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং উহাকে দৈব-প্রত্যাদেশ ভাবিয়া আমি ঐ রাত্রেই এক গাড়ী কলাপাতা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করি।" বাবাজী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আমাদের বলিলেন—"বাবা, সকলই ব্রহ্মময়ীর খেলা, তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। নির্ভরশীল হও, তখন বুঝিবে যে অভাব কিছু থাকিতে পারে না।"

পৌষ মাসে এক দিবস পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের বর্দ্ধমান রাজার প্রতিষ্ঠিত ১০৮ শিবালয় ও ৺দুর্ল্লভা দেবীকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাঁহার কথামত এক রবিবারে বেলা একটার সময় দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ৮/১০ জন তাঁহার সঙ্গে যায়। শিবালয়ে যাইয়া দর্শন করিবার পর উহারই হাতার মধ্যস্থলে একটি ছোট পুকুরের বাঁধান ঘাটে সকলে বসিয়া গল্প করিতে থাকেন। এমন সময়ে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব তামাক খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেস্থানে কেবল একজন দারোয়ান ভিন্ন অপর কোন লোকের বসতি

ছিল না। আমরা দারোয়ানের নিকট গিয়া তামাকের সাজ সরঞ্জাম আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে কেবল মাত্র একটি কলিকা দিয়া জানাইল যে সে তামাক খায় না, শুধু গাঁজা খায়! কলিকা লইয়া বাবাকে তামাকের অভাবের কথা জানাইতেই তিনি বলিলেন, 'তামাকের জন্য চিন্তা নাই, এখনই আনিতেছি।' এই বলিয়া হস্ত মুঠা করেন ও পরক্ষণেই খুলিয়া দেখান যে সেই মুঠার মধ্যে কাল রঙ্গের তরল পদার্থ মাখা রহিয়াছে। আমরা আঘ্রাণ লইয়া দেখিলাম যে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বিষ্ণুপুরের তামাকের গন্ধ বাহির হইতেছে। পুনরায় হস্ত মুঠা করিয়া একটু পরে তাহা হইতে এক কলিকা আন্দাজ তামাক বাহির করিলেন। আমরা পাতা ও শুকনা ডাল পোড়াইয়া আগুন করিয়া ঐ তামাক তাঁহাকে দিই। তিনি তামাক সেবন করিয়া উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমরা বলিলাম,—"বাবা' আপনার সহিত ঠাকুর দর্শন করিলাম, কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ ত আমাদের ভাগ্যে মিলিল না। অতএব আমাদিগকে কিছু প্রসাদ দিন।" ঐ কথা বলাতে তিনি হস্ত মুঠা করিলেন, ও হাত পাতিলে প্রত্যেক শিষ্যকে ৺বৈদ্যনাথে যে প্রকার পেঁড়া পাওয়া যায় সেই প্রকার একটি করিয়া টাটকা ও অত্যন্ত সুস্বাদু পেঁড়া দিলেন। আমাদের মধ্যে একজন গৌরাঙ্গ ভক্ত অত্যন্ত গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাকে প্রসাদ লইতে বলায় তিনি বাবাকে জানাইলেন যে, তিনি শিবের প্রসাদ খাইবেন না, উহা তাঁহাদের অস্পৃশ্য! বাবা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন—"দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদের অবমাননা করার অপরাধে তোমাকে বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ রাত্রেই ঐ ভদ্রলোক প্রবল শূলরোগে আক্রান্ত হয়েন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কোনও প্রকার চিকিৎসায় বেদনা নিবৃত্ত না হওয়াতে প্রাতে আসিয়া বাবাজীর শরণাপন্ন হয়েন ও অনেক কাকুতি-মিনতির পর ৺শিবের স্নানজল খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন। ঐ তারিখে প্রাতঃকালে বর্দ্ধমানের অন্যান্য শিষ্যগণ আসিয়া সমবেত হইলে গতদিনের শিব দর্শন ও প্রসাদ বিতরণের কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট ৺শিবের প্রসাদ বিতরণের জন্য অনুযোগ করেন। তিনি তাঁহাদের একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমাকে আদেশ দেন,—"পূজার ঘরে গিয়া থালাতে যে পেঁড়া আছে তাহা লইয়া আইস।" ঐ থালা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নিত্যকার মত ধুইয়া রাখা হইয়াছিল। ঐ ঘরে কখনও কোনও খাদ্য দ্রব্য রক্ষিত হইত না, ইহা আমরা জানিতাম। কিন্তু তাঁহার কথা মত যাইয়া দেখি, ঐ থালা পেঁড়াতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং পেঁড়াগুলি অতি টাটকা। প্রসাদ বিতরিত হইল।

মাঘ মাস, ১৩১৮ সাল। একদিন প্রাতে বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জস্থ নেপাল বাবুর বাসায় বাবাজীর অবস্থানের সময় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (মুনসেফ), রজনীকান্ত কোঙর প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দ উপস্থিত হয়েন ও পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে কিছু যোগ বিভূতি দেখাইতে অনুরোধ করেন। তিনি দয়া করিয়া বলেন,—"তোমরা একখানা কাগজে যে কোনও একটি সংস্কৃত শ্লোক আমার অসাক্ষাতে লিখিয়া আন ও তাহা মুড়িয়া আনিয়া

আমার কলিকার আগুনে পুড়াইয়া দাও। আমি ঐ শ্লোকটি তোমাদের নিকট আনিয়া দিব।" তাঁহারা বাহিরে আসিয়া একখানা কাগজে—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।" এই শ্লোকটি লিখিয়া ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া আনিয়া বাবাজীর কলিকার আগুনে ফেলিয়া দিলেন। কাগজ সম্পূর্ণ পুড়িয়া যাওয়ার পর গুরুদেব উঠিয়া গিয়া আহ্নিকের ঘরে কিছুক্ষণ থাকিয়া বাহির হইয়া আসিয়া আমাদিগকে একখণ্ড কাগজ দিলেন। ঐ কাগজে উপরি উক্ত শ্লোকটি লেখা ছিল। দেখা গেল "জানামি অধর্ম্মং" এই দুই পদ লাল কালি দ্বারা কাটা রহিয়াছে, ও তাহার পরিবর্ত্তে "জানাম্যধর্ম্মং" লেখা রহিয়াছে। কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গুরুদেব বলিলেন —"তোমরা ভুল লিখিয়াছিলে। নায়িকাগণ তোমাদের ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।" আমরা অনুযোগ করিলাম যে ঐ কাগজটি ঠিক আমাদের লেখা কাগজ নহে এবং লেখাও বিনোদ দাদার হস্তাক্ষর নহে (বিনোদ দাদাই কলিকার অগ্নিতে দগ্ধ কাগজ খানিতে লিখিয়াছিলেন) এবং ভুলও আমরা, করি নাই। তাহাতে তিনি বলিলেন,—"কাগজ ও লেখা পৃথক বটে তবে ভুল তোমরাই করিয়াছ।" আমরা অস্বীকার করায় তিনি বলেন,—"যদি তোমরা ১০৮টি কুমারী ভোজন করাইতে স্বীকৃত হও, তবে তোমাদের লেখা কাগজ, যাহা পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে পারি।" আমরা স্বীকৃত হওয়ায় তিনি উঠিয়া যান ও কিছুক্ষণ ক্রিয়ার ঘরে কাটাইয়া ফিরিয়া অবিকল সেই কাগজখানি আমাদিগকে দেন ও দেখান যে ভুল আমরাই করিয়াছিলাম। আমরা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বৈকালে পাঁচটার সময়ে একটি ৫৫।৫৬ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ ভদ্রলোক শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য আসেন। তিনি বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আমাকে বলেন,—'নীরদের দাদা আসিয়াছেন, তাঁহাকে জল খাবার দাও।" ৺নীরদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাবাজীর একজন পুরাতন শিষ্য ছিলেন এবং তখন বর্দ্ধমানের সদর পুলিশ ইন্সপেক্টার ছিলেন। আমরা তাঁহাকে জলযোগ করিতে আহ্বান করিলে তিনি বলেন যে একটু পরে খাইবেন। যথা সময়ে গুরুদেব সন্ধ্যা করিতে উঠিলে পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাটীর ভিতর চলিয়া আসেন ও বাবাজীর নিকট তৎপর দিন দীক্ষিত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব তদুত্তরে বলিলেন,—"এই সবেমাত্র তোমার সঙ্গে আলাপ হইল। এখন পর্য্যন্ত তুমি আমাকে কিছুমাত্রও জান না। দীক্ষা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। উভয় পক্ষের দায়িত্ব খুব বেশী। অতএব ভাল করিয়া না জানিয়া শুনিয়া কাহারও নিকট আত্ম-সমর্পণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তুমি বহুদিবস হইতে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বহু তীর্থস্থানে ঘুরিয়াছ ও আজ পর্য্যন্ত অনেক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ, কিন্তু কাহাকেও পছন্দ কর নাই। হঠাৎ খেয়ালের বশে এক মুহূর্ত্তের আলাপে দীক্ষা প্রার্থনা করা

উচিৎ নহে।" ঐ কথা শুনিবার পরও তিনি নিরস্ত না হইয়া আরও অনুনয় বিনয় করিতে থাকেন। তাহাতে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব "পরে দীক্ষা হইবে" এই কথা বলিয়া সন্ধ্যা করিতে চলিয়া যান। অল্পক্ষণ পরেই ৺নীরদ দাদা আসিয়া উপস্থিত হন। বাবাজী ক্রিয়া করিয়া উঠিবার পর তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া আবার অনুনয় বিনয় করেন। বাবা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা দুইজনে রাত্রি ৯টার পর বাসায় যান। আন্দাজ ভোর চারিটার সময় আশ্রমের সদর দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখি যে নীরদ বাবুর দাদা দাঁড়াইয়া আছেন ও হাঁপাইতেছেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বাবা কোথায় আছেন ও কি করিতেছেন?" প্রত্যুত্তরে আমরা জানাইলাম যে তিনি ক্রিয়ায় বসিয়াছেন ও প্রাতে ৬টার পূর্ব্বে বাহির হইবেন না। কিন্তু তিনি ঐ কথা বিশ্বাস করিলেন না, ও প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার বাসায় গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে সেই দিনই দীক্ষা দেওয়া হইবে এই আদেশ জ্ঞাপন করিয়া আশ্রমে আসিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। নীরদ বাবুর দাদামহাশয় বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে শুইয়াছিলেন। তিনি বাবাকে একখানা বেঞ্চের উপর গায়ের চাদর পাতিয়া বসিতে দেখিয়া নীরদ বাবুকে বাবার আগমনের সংবাদ দিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে যান ও তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকেন। নীরদ বাবুর স্ত্রী ঐ ডাক শুনিয়া উঠিয়া খোলা জানালা হইতে বারান্দায় পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পান ও তাড়াতাড়ি খিল খুলিয়া বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু বাহিরে আসিয়া আর কিছু দেখিতে পান না। নীরদ বাবুর দাদাও বাহিরে আসিয়া বাবাকে না দেখিতে পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আশ্রমে আসেন। আশ্রম তাঁহার বাসা হইতে আধ মাইলের কিছু বেশী হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব রাত্রি ১২।১ টার সময় ক্রিয়ায় বসেন ও বেলা ছয়টার পূর্ব্বে ক্রিয়াস্থান হইতে বাহির হন না। সুতরাং তাঁহার স্থূল শরীরে রাত্রি চারিটার সময় নীরদ বাবুর বাসায় যাওয়া অসম্ভব। ঐ তারিখে দুইজন মহিলার দীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। দীক্ষার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সে সব উপকরণও সংগৃহীত ছিল। মহিলা দুইটি প্রত্যুষে স্নান সারিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। নীরদবাবুর দাদাও স্নান সমাপন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব ছয়টায় সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই নীরদবাবুর দাদাকে দীক্ষা দেন।

গুস্করার নিকটস্থ কোন গ্রাম নিবাসী একজন ভদ্রলোক কলিকাতায় ব্যবসায় করিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে নিজের নৌকাতে মাল লইয়া গিয়া ডায়মণ্ড হারবারে জাহাজে বোঝাই দিতেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। কলিকাতার জনৈক খ্যাতনামা জ্যোতিষী তাঁহার ও তাঁহার কন্যার কোষ্ঠী দেখিয়া বলেন যে তাঁহার ঐ কন্যার ফল ভাল নহে,---তাঁহার বংশ থাকিবে না ও তাঁহার নিজেরও এক বৎসরের মধ্যে প্রবল মৃত্যু-যোগ আছে। তিনি ঐ গণনায় অতিশয় বিচলিত হইয়া বাবাজীর শরণাপন্ন

হন। বাবাজী তাঁহাকে বলেন যে জ্যোতিষী গণনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার উপর ব্রহ্মশাপ হইয়াছিল তাহার ফলে এ জন্মে নির্ব্বংশ যোগ ঘটিয়াছে ও তাঁহার নিজের ও জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে। ভদ্রলোক ঐ বিপদের প্রতিকারের নিমিত্ত বাবাজীর নিকট কাঁদাকাটা করেন, কিন্তু বাবা তাঁহাকে কোন প্রকার ভরসা দিতে স্বীকৃত হন নাই। ভদ্রলোকটি অতিশয় কাকুতি-মিনতি করাতে তাঁহাকে শুধু জানাইলেন যে পশ্চিম হইতে তাঁহার গুরুদেবের আদেশ না পাইলে কোন প্রকার প্রতিকার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তিনি অনুমতির জন্য পত্র দিতে স্বীকার করেন এবং ঐ পত্রের মর্ম্মার্থ যাহা হইবে ঐ ভদ্রলোকটিকে তাহা যথা সময়ে জানাইবেন বলেন। কিছুদিন পরে বাবার পত্রের উত্তর আসে যে ঐ ব্রাহ্মণের প্রাক্তন কর্ম্মের ফলাফল যাহা ঘটিবে তাহার উপর যেন কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না করা হয়। ঐ সংবাদ ভদ্রলোকটিকে জানান হয়। তিনি আবার নিজে আসিয়া বাবার পায়ে ধরিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি অনুনয় বিনয় করেন ও অভুক্ত অবস্থায় আশ্রমে পড়িয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকায় বাবার সেবার ব্যাঘাত হয়। তিনি সন্ধ্যার পর ক্রিয়া হইতে উঠিয়া তাঁহাকে জানান যে তাঁহার নিজের প্রাণ তিনি রক্ষা করিবেন, তবে তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে তিনি কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ঐ ব্রাহ্মণ কতক পরিমাণে শান্ত হইয়া ফিরিয়া যান। তিনমাস পরে তিনি সংবাদ দেন যে হঠাৎ সর্পাঘাতে তাঁহার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার ৪।৫ মাস পরে একদিন অপরাহ্নে ৩টা বা ৩॥ টার সময় বাবা তাঁহার নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাকে ডাকেন। আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়া গিয়াছে এবং কর্দ্দমাক্ত জলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানিও মলিন হইয়া গিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"এই ভদ্রলোকের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া আমার এই অবস্থা হইয়াছে। ডায়মণ্ড হারবারের পথে নৌকা জলমগ্ন হইয়া তিনি ডুবিয়া যান। আমি তাঁহাকে তুলিয়া নিকটস্থ চড়ায় রাখিয়া আসিয়াছি।" কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া বর্দ্ধমান আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন তাঁহার প্রমুখাৎ আমরা সকল ঘটনা অবগত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই।

একজন প্রিয় শিষ্য পুলিশের দারোগার কর্ম্ম করিতেন। মানভুমের বাঘমুণ্ডি থানায় একবার তাঁহার বদলি হয়। সেখানে কার্য্যে যোগদানের কিছুদিন পরে নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে সংবাদ আসে যে একটি কুরমী খুন হইয়াছে এবং তাহার মৃত দেহ মাঠে পড়িয়া আছে। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যাইবার জন্য উদ্যোগ করাতে তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী তাঁহাকে জানান যে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী পাহাড় ও জঙ্গলে বাঘের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সে জন্য রাত্রে কোথাও তদন্তে যাওয়ার ব্যবস্থা সে থানায় কখনও হয় না, বরাবরই আবশ্যক হইলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। সহকারী কর্ম্মচারীটির কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া

দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন ও ২।৩ জন কনেষ্টবল ও ৪।৫ জন তাঁবেদার লইয়া রওয়ানা হইয়া যান। কিছুদূর যাইলে পর তিনি একটি ছোট পাহাড় দেখিতে পান। পাহাড়ের উপর তাঁহারা পঁহুছিলে হঠাৎ একটি বড় বাঘ তাঁহাদের রাস্তার সম্মুখে ৮।১০ হাত দূরে আসিয়া বসে। তাহার ভীষণ আকৃতি ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া দারোগাবাবু সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। তাঁবেদার ও কনেষ্টবল গণ চীৎকার করায় বাঘ পলাইয়া যায়। পরে তিনি চৈতন্যলাভ করিয়া গন্তব্য স্থানে যান ও তদন্ত শেষ করিয়া থানায় ফিরিয়া আসেন। দুই তিন দিন পরে তিনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে একটি পত্র পান, তাহাতে লিখিত ছিল,—"ইচ্ছা করিয়া বিপদের সম্মুখীন হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। স্থানীয় লোকদের নিষেধ সত্ত্বেও তুমি জয় গুরু’ বলিয়া থানা হইতে বাহির হওয়ার ফলে আমাকে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বাঘ তাড়াইয়া বেড়াইতে হইয়াছে। ইহাতে আমার ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইয়াছে। যে সকল বিপদ দৈবাধীন তাহার জন্য সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু ইচ্ছাধীন বিপদের জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে।

বাবাজীর জনৈক শিষ্য চিরকুন্ডা থানায় দারোগার কার্য্য করিতেন। তিনি একদিন প্রাতঃকালে ক্রিয়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হয়েন। সম্মুখে একটি ছোট চৌকীতে বাবার এক জোড়া খড়ম ও একখানি ফোটো বাঁধান ছিল। আহ্নিক করিতে আরম্ভ করিয়া তিনি নিকটস্থ কোন প্রতিবেশী স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। হঠাৎ তিনি পৃষ্ঠে একটি দারুণ আঘাত অনুভব করেন ও কাচ ভাঙ্গার শব্দ শুনিতে পান। সম্মুখে তাকাইয়া দেখেন যে বাবার ফোটোর কাচটি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে ও ফোটোটি মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ শব্দ শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী নিকটস্থ রান্না ঘর হইতে ছুটিয়া আসেন, কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় ক্রিয়ার ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া লোকজন একত্র করেন ও দরজা ভাঙ্গিয়া দেখেন তাঁহার স্বামী আসনে উপবিষ্ট হইয়া পিঠে হাত বুলাইতেছেন, ফোটো পড়িয়া রহিয়াছে ও ভাঙ্গা কাচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে পারেন নাই কিন্তু দই তিন দিন পরে বর্দ্ধমান আশ্রমে আসিলে বাবা তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলেন, "কিগো, খুব ক্রিয়া করছিলে যা হোক!"

শ্রীচন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায়—

পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত সবজজ।

আমি ১৯০৫ সালে যখন বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মুন্সেফ ছিলাম তখন তথাকার শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ধনী লোক আমার নিকট দেখা করিতে গিয়া কথা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তম্বর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম করিয়া বলেন যে, তিনি গুস্করা মোকামে ডাক্তারী কার্য্য করিতেছিলেন। অনেক পুলিস তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় রাধাবল্লভ বাবু তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি ত' ডাকাতে কালী হয়েছেন, দেখছি"। অর্থাৎ পুলিসের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হয়ত যথেচ্ছ উৎকোচ গ্রহণ করিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এই কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম যে পুলিস কর্ম্মচারী সংসারে কাহারও নিকট ন্যূনতা স্বীকার করে না, কিন্তু ইঁহার নিকট কেন এত পুলিস কর্ম্মচারী শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে? সুতরাং ইঁনি নিশ্চয়ই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু মহাপুরুষ হইবেন। এই ধারণা করিয়া আমি ৮।১০ দিন মধ্যেই বড়দিনের বন্ধ উপলক্ষ্য তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। দেখা করিয়া আমার পূর্ব্ববর্ণিত প্রতীতি বদ্ধমূল হইল এবং আমি দীক্ষা-প্রার্থী হইলাম। বাবাজী তাঁহার গুরুদেবের নিকট আমাকে দীক্ষা দেওয়ার অনুমতি চাহিতে সম্মত হইলেন এবং তাঁহার উত্তর আসিলে আমাকে জানাইবেন, বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে কি?" তিনি বলিলেন—"তোমার বাটী ঢাকা জেলা, আমার বাটী বর্দ্ধমান। তুমি এতদূরে আসিয়া যখন দীক্ষা-প্রার্থী হইয়াছ, তখন ইহার মূলে কোনও যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে।" এই উত্তর শুনিয়া আমি আশান্বিত হইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলাম। ইহার প্রায় তিনমাস পরে চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে আমি পত্র লিখিয়া জানিতে পারিলাম যে আমাকে দীক্ষা দেওয়ার অনুমতি আসিয়াছে এবং ১৩ই চৈত্র আমার দীক্ষার দিন ধার্য্য হইয়াছে। আমার তখন ছুটী পাওনা ছিল না বলিয়া বাবাজিকে আমি কাটোয়া আসিয়া দীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া গাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। বাবাজী ঐ গাড়ীতেই আমার বাসায় আসিয়া আমার দীক্ষার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহার অসীম দয়ায় পরম প্রীতিলাভ করিয়া উৎসাহের সহিত দীক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমার ও আমার স্ত্রীর দীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

কিন্তু চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে আমি শূলবেদনায় অত্যন্ত পীড়িত হইলাম। এমন কি, ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত আমার কোষ্ঠ বন্ধ ছিল। ৩।৪ জন ডাক্তার অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াও আমার কোষ্ঠ খোলাসা করিতে পারেন নাই। আমি এই সংবাদ বাবাজীকে জানাইলাম। কিন্তু

তিনি তখন বিন্ধ্যাচলে শ্রীযুক্তেশ্বরী ভৈরবী মাতাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমাকে লিখিয়া জানাইলেন,—"চিন্তার কোন কারণ নাই।" আমার ব্যারাম কঠিন বলিয়া আমি দুই মাসের ছুটি নিয়া কলিকাতা ডাক্তার দেখাইতে চলিয়া গেলাম। তথাকার ডাক্তার আমাকে দার্জ্জিলিং যাওয়ার জন্য বলিলেন, কিন্তু এরূপে আমি দার্জ্জিলিং যাইতে সাহস না পাইয়া গুস্করায় বাবাজীর নিকট চলিয়া গেলাম। বাবাজী আমার যাওয়ার ২।৪ দিন পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আমি যখন গুস্করা যাই, তখন আমার অন্নপথ্য মোটেই হজম হইত না, সাগু খাইয়া থাকিতে হইত। গুস্করা যাইয়া "আমি কি খাইব" জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী আমাকে সন্ধ্যার পর তাঁহার প্রসাদী লুচি ও বুটের ডাল খাইতে বলিলেন—আমি তাহাই খাইলাম। তাহার পর যে তিন চারি দিন তথায় ছিলাম, অন্ন লুচি, ডাল ইত্যাদি অতি সহজে হজম করিতে লাগিলাম। বাবাজী আমাকে বলিলেন,—"গুরুদেব দীক্ষার অনুমতি দিবার সময় লিখিয়াছিলেন যে, চৈত্র মাসের শেষ ভাগে তোমার অতি কঠিন ব্যাধি নিশ্চয় হইবে। সুতরাং তোমাকে ১৩ই চৈত্র তারিখে দীক্ষা নিতে হইবে। নতুবা আমাকে গুরু হত্যার পাতকী হইতে হইবে।" তিনি আরও বলিলেন,—"তুমি গাড়ী না পাঠাইলে নিজে গাড়ী ভাড়া করিয়া তোমার বাটী যাইয়া ১৩ই চৈত্র তারিখে দীক্ষা দিতে হইত।" আমার যেরূপ কঠিন ব্যাধি হইয়াছিল তাহাতে বাবাজীর পদাশ্রয় না পাইলে ঐ ব্যাধিতে ভবলীলা সমাধা হইয়া যাইত।

ইহার অনুমান ছয় বৎসর পরে পুনরায় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এক মাসের ছুটি নিয়া বাবাজীর নিকট বণ্ডুল গ্রামে গিয়াছিলাম। রাস্তায় আমার আমাশয় হয়। বাবাজীকে ঐ ব্যারামের কথা বলায় তিনি বলিলেন,—"তিন চারি মাস পূর্ব্বে গুরুদেবের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম যে দুর্গাকান্তের মৃত্যুযোগ দেখিয়াছি, তাহার মৃত্যুযোগ নিবারণের জন্য যেন পরমারাধ্যা ভৈরবী মাতারা ক্রিয়া করেন। তদুত্তরে গুরুদেব চিঠি লিখিয়াছেন যে তোমার জন্য যাহা করা হইতেছে তাহাই যথেষ্ট এবং তাঁহারা পূর্ব্বে না মরিলে তুমি মরিবে না।" এই কথা শুনিয়া আমি চোখের জল সংবরণ করিতে পারি নাই—বুঝিয়াছিলাম যে অতিশয় ভাগ্যবলে এরূপ পরম করুণাময় গুরুদেবের আশ্রয় পাইয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইতেছি।

বাবাজীর নিকট দীক্ষিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নদীয়া জিলার অন্তর্গত জুড়ানপুর নামক পীঠস্থানে আমার সহিত একজন সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়। ঐ সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে আমার কাটোয়ার বাসায় আসিতেন এবং আমি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম। বাবাজীর নিকট দীক্ষিত হওয়ার পর ঐ সন্ন্যাসী একদিন মুর্শিদাবাদ জেলার কাণ্ডি মহকুমায় থাকা সময় আমার বাসায় গিয়াছিলেন। আমি কার্য্যে অনবসর থাকায় সন্ন্যাসীকে আদর যত্ন করিতে পারি নাই। সন্ন্যাসী সেই জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন যে আমি তাঁহাকে অপমান করিয়াছি বলিয়া আমাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন। বাবাজী তদুত্তরে বলেন,—"দুর্গাকান্ত আমার শিষ্য। তাহার

কেশাগ্রও সে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসী আমার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, নিজেই অল্পদিন পরে বিপন্ন হইয়া বাবাজীরসাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমি সবজজ হইয়া অবসর প্রাপ্ত হওয়ার পর বাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে নানা তীর্থস্থানে বাস করিতেছি। আমার যখনই ব্যারাম হওয়ার উপক্রম হয়, বাবাজী অলক্ষ্য ভাবে উহার উপশম করিয়া দেন। তাঁহার অতুলনীয় স্নেহের সহিত মাতৃস্নেহ অত্যন্ত স্পষ্ট প্রতীত হয়। এত দয়া ও স্নেহ জগতে দুর্লভ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায়

—:o:—

শ্রীযুক্ত লালমোহন রায়চৌধুরী

মহাফেজ, হুগলী কালেক্টরী।

আমি দীক্ষিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে স্বপ্নে আমার উপাস্য দেবতার আদেশ পাইয়াছিলাম। সেই সময় হইতে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত নানা স্থানে অনেক সাধু পুরুষের নিকট গমন করি। আমাদের কৌলিক গুরুবংশ নাই। আমাকে এক একজন এক এক রকম প্রবোধ দিতেন। একজন বলিলেন,—"তোমার পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণী এখনও বর্ত্তমান। তুমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি কর, তিনিও তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তুমি কায়মনে তাঁহার সেবা কর। তোমার এখন আর অন্য দীক্ষার আবশ্যক নাই।" শুনিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। মাতৃসেবার ত্রুটি আমার ছিল না। মাতার স্বর্গ-লাভের পর পুনরায় চেষ্টা করি। তৎপরে একবার আর একজনের নিকট যাই। যাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন,—"বাপু হে, জাবর কাটাও।" আমি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আমি বুঝিতে পারিলাম না।" তিনি বলিলেন, "বাপু, গরুগুলো খাবার জিনিস পেলেই ক্রমাগত খেতে থাকে, আর খাওয়া শেষ হইলেই জাবর কাটায় (চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে). তখন আর খায় না। তুমিও পেট ভ'রে গেলে যখন সেই রকম জাবর কাটাবে তখন চেষ্টা ক'রো। ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রহ্মচর্য্যের দরকার—শুধু আতপ চাউল আর কাঁচকলা খেলেই হয় না।" আমি আমার স্ত্রী বিয়োগের পর থেকেই আতপ চাউল ও কাঁচকলা খাইতেছিলাম, তখন আমি সে কথা ঠিকই বুঝিলাম। পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী কতকগুলি নাবালক পুত্র কন্যা রাখিয়া স্বর্গগতা হয়। তখন আমার মন খুব খারাপ হওয়াতে অগত্যা কোনরূপেই শান্তি না পাইয়া সুরাদেবীর সেবা করিয়া মনকে ঠাণ্ডা করিতাম। কিন্তু মহাপুরুষের কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল—সেই দিন থেকেই অন্যায় খাদ্যসমূহ একেবারে ত্যাগ করিলাম। কিছুদিন

পরে তাঁহার সন্ধানে পুনরায় যাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন সন্ধান পাই নাই।

এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর শ্রীশ্রী৺পুরীধামে জনৈক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছে যাতায়াত করি। তিনি বলিলেন,—"বাবা, যেমন মানুষের জন্ম ও মৃত্যু বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তেমনি দীক্ষাও তাঁহারে নির্ব্বন্ধ। তুমি ব্যস্ত হইলে কি হইবে? তবে হতাশ হইতে নাই, সব কাজেই আগ্রহ দরকার। তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, গায়ত্রীই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব। তুমি দিনান্তে একমনে গায়ত্রী-দেবীর আরাধনা কর, তাহা হইলেই এখন হইবে।" কিছুদিন পরে শ্রীশ্রী৺কাশীধামে যাই। তথায় একজন সাধুর সন্ধান পাই। তাঁর কাছে গেলে তিনি কিছুক্ষণ গীতাপাঠ করেন এবং তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দেন। তিনি হিন্দুস্থানী, সুতরাং তাঁহার নিজ ভাষাতেই ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু আমি সবই বুঝিলাম। পরে তিনিও ঠিক পূর্ব্বমত উপদেশ দিলেন। তবে মাত্র এইটুকু বলিলেন,—"বাবা, তুমি ব্যস্ত হইও না, স্বপ্নাদেশমত সদ্‌গুরু তুমি সত্বরই পাইবে। তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি তোমাকে দীক্ষিত করিবেন।"

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া যায়। আমার একটি ভ্রাতা ৺নীরদমোহন (বাবারই শিষ্য) তখন বর্দ্ধমানে পুলিশ ইনস্‌পেক্টার ছিলেন, আমি তখন তাঁর বাসায় যাই। সন্ধ্যার পর তাঁর সহিত বাবার (অর্থাৎ শ্রীশ্রী৺ইষ্টদেবের) আশ্রমে যাই (তখন নূতন আশ্রম নির্ম্মিত হয় নাই)। আশ্রমে তখন অনেক লোক। বাবা আদেশ করেন,—"আগামী কল্য দিন স্থির করিয়া দিব, ঐ দিনে তোমার দীক্ষা হইবে।" পরদিন আশ্রমে গেলে দিন স্থির হয়। যেদিন দীক্ষার দিন স্থির হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বদিন রাত্রে আমার ভ্রাতার বাহিরের ঘরে আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম, অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। হঠাৎ বাহির হইতে ঘরের জানালায় আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। অনুমানে বুঝিলাম, আমাকেই ডাকা হইতেছে। অমনি উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া দেখি, সামনেই শ্রীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির কিছুই প্রভেদ নাই, প্রভেদের মধ্যে শুধু জ্যোতিঃ। স্পষ্ট চিনিলাম যে তিনিই আমার আরাধ্য। তিনি বলিলেন,—"একখানা আসন আন, তাহাতে বস, আমি এখনই এই স্থানে তোমায় দীক্ষিত করিব। যখন তুমি তোমার উপাস্য দেবতার আদেশ পাইয়াছ, তখন এই স্থানেই তাঁকে দেখ।" আমি খুব ব্যস্ততার সহিত দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখি, ঘরে সকলেই কথা কহিতেছে। বলিলাম,—"শীঘ্র একখানা আসন নিয়ে আয়।" তারা আমার স্বর শুনিয়াই উঠিয়া আসিল বটে, কিন্তু ইত্যবসরে আমি বাহিরে আসিয়া দেখি, ঘরের বারান্দায় কেহই নাই। সেই আলোটি চলে যাচ্ছে, আর তার মধ্যে একজন। আমি অতি কষ্টে সেই অন্ধকারে চলিলাম—বৃষ্টি মাথায়, শীতে শরীর জড়সড়, গায়ে কোন আচ্ছাদন নাই, কিছুদূর গিয়াই পা আবদ্ধ হয়ে বসিয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে ভায়া আসিয়া আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখেন ও কোলে করিয়া বাহিরের ঘরে আনেন। কম্বল চাপা দিয়া গুলের আগুন ক'রে সেঁক দিলে বহুক্ষণ পরে

চৈতন্য হয়। সে জ্যোতিঃ মনে করিলে আমার এখনও ভয় হয়। তার পরদিনই আমার দীক্ষালাভ হয় এবং আমার উপাস্য দেবতা, যাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন পাই, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হই। তখন ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা আমাকে নানারূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁদের কথা মনে পড়ে।

আমি একবার বর্দ্ধমান আমার ঐ ভাইয়ের বাসায় যাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাবার ওখানে থাকার পর ফিরিয়া আসিবার সময় পথ ভুলিয়া বহুদূরে চলিয়া যাই। পথে লোক নাই, যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিব। ভয় হইল, মনে হইল আমি ক্রমাগতই চলিতেছি। একবার ভাবি ভায়ার বাসাত এত দূরে নয়, এত সময়ও লাগে না। ফিরে এই রাস্তা ধরেই আবার বাবার কাছে যাই, সেখান থেকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরে আসব। আবার ভাবছি, ফিরে গিয়ে আবার কোন্ পথে যাব? "ভগবান কি করি, বাবা কি করি" বলিতেই হঠাৎ একজন পুলিশ কনেষ্টবল এসে বলিল,—"আপ্ এতনা রাতমে হিয়া কা কর্‌তা হ্যায়"। পুলিস দেখেই আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "বাপু, হাম চোর নহি। তুম নীরোদ বাবু পুলিশ ইনস্পেক্টরকো জানতা হ্যায়!" সে বলিল—"হাঁ বাবু খুব।" আমি বলিলাম,—"হাম উন্‌কা ভাই। হাম উন্‌কা বাসামে জায়েঙ্গে। লেকিন ডেরা মালুম হোতা নহি।" তখন সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পথে আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—"হমারা নাম দেওকী নন্দন।" বাসায় এসে ভায়াকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। তারাও ভাবিতেছিল। পরদিন ভায়া অনুসন্ধান করেন, কিন্তু ঐ নামে তখন পুলিসে কেহ ছিল না।

আমার ঐ ভ্রাতার কন্যার বিবাহে আমি ছেলে মেয়ে সহ ভায়ার বাসায় আসি। আমি তৎপূর্ব্বে আশ্রমে একবার রন্ধন করি। বাবার মুখে বোধ হয় ভাল লাগিয়াছিল, তাই তিনি এবারও বলেন—আমার রান্না খাবেন। আমি রসুই ঘরে ছিলাম, মেয়েরা বাবাকে নিয়ে বিরক্ত করিতেছিল। আমার বড় মেয়ে প্রথম একবার তাদের কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে, পরে শ্রীশ্রী৺পুরী ধামে (যেখানে তারা বর্ত্তমানে বাস করিতেছে) একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণের নিকট দ্বিতীয়বার দীক্ষিতা হয়। বাবা আমার ঐ মেয়েকে তার প্রথম ও দ্বিতীয় গুরুর নাম ধাম ও কি মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছে বলিয়া দেন। সে আশ্চর্য্য হইয়া আমাকে বলিতে আসে। বাবা পরে অনেক কথা বলেছিলেন। তারা বাবাকে দাদামশায় বলে। আমার ঐ বড় মেয়েটির টাইফয়েড্ জ্বর হইয়া একটি চক্ষু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সে জন্য সে বলেছিল,—"আমি যে এই চোখটাতে দেখতে পাইনে। কৈ দাদামশায় কেমন, তুমি ভাল করিতে পার, দেখি।" চোখটি বহুকাল হইল নষ্ট হইয়াছে, এখন কিন্তু ঐ চোখে সে দেখতে পায়, তবে অল্প। বাবা যে ইচ্ছা করিলে যেখানে যে কোন বিষয়ে হউক না কেন জানিতে পারেন, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর সম্বন্ধে যাহাই বলি বা করি, ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি আমার জ্ঞান বুদ্ধি এবং কল্পনারও অতীত।

তিনি কতবার সাক্ষাতে ও পরোক্ষে তাঁর এই অধম শিষ্যকে যে সকল

বিপদ হইতে উদ্ধার করেছেন তাহারই দুই একটি ঘটনার উল্লেখ ঃ—

আমি একবার অফিস বন্ধের সময় বর্দ্ধমান যাই। রাত্রে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ফিরে যাবে কবে ?” আমি বলিলাম,—“কাল সকালেই যাব।” আমি যখন বাসায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি তখন আমার একটী ভাইঝি বলে,—“জেঠামহাশয়, মা বলছেন এ বেলাটা খেয়ে দেয়ে ও বেলা যাবেন।” সুতরাং বাসায় ফিরে না এসে বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাই। কিন্তু যাওয়া মাত্র বাবা বলিলেন—“কৈ, তুমি সকালে যাবে, বলে গেলে না ?” অমনি মনে সন্দেহ হল, আর কোন কথা না বলেই একেবারে ষ্টেসনে এলাম। তখন গাড়ীখানি ষ্টেসনে দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট নিয়েই গাড়ীতে উঠে বাসায় এসে পৌঁছিবা মাত্র ঝি বলিল,—“বাবু ৩।৪ জন বাবু ও চাপরাশী দুই তিন বার এসেছে।” শুনেই অফিসে এসে দেখি, খৃষ্টানদিগের বিবাহের রেজেষ্টারী চেয়ে পাঠাইয়াছে। অফিসের অন্য আমলারা দুয়ার খুলিতে পারিতেছে না, আমি আসিয়াই চাবি নিয়া বইখানি দিই। বইখানি ঠিক সময়ে না পাইলে অবশ্য গোলযোগ হইত।

একবার বাবা তাঁহার একটী শিষ্যকে আমার নিকট পাঠান। শিষ্যটী খবরের কাগজে একটী নোটীশ দেখেন যে জামিন দিলে একটী জমিদারের সরকারে তাঁহার চাকুরী হয়। টাকা দরকার হওয়ায় লোকটী আমাকে বলিয়াছিলেন,—“টাকাটা বাবাই দিয়াছেন।” বাবা যখন টাকা দেন তাহাকে বলিয়া দেন,—“আগে লালমোহনের সঙ্গে দেখা করিয়া তবে অন্য বন্দোবস্ত করিবে।” লোকটি আমাকে এসে চাকুরীর কথা বলিতেই আমি বুঝিলাম এবং সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। আমি পূর্ব হইতেই ঐ ব্যাপার শুনিয়াছি এবং ২।১ জন যে গোলযোগে পড়িয়াছে, তাহাও জানি। আমি তাঁহাকে নিষেধ করিতেই তিনি বলিলেন,—“বাবাও ঐ কথা বলিয়াছেন।” পরম্পরায় অবগত হই, আমার গুরুভাইটী আরও দুই এক স্থানে সংবাদ নিয়া আমার কথা ও বাবার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমি কোন বিষয়ে সংবাদ লই না, যাহাতে আমার সংশয় নাই সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি না, তবে এটি যেন কার্য্যগতিকে পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। সুতরাং বাবার কাছে আমাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই।

একবার আমার মেজ মেয়ে রাত্রে রসুই ঘরে রসুই করিতে থাকাকালে কোথা থেকে একটি বিষধর সর্প আসিয়া তথায় ঢোকে। মেয়েটি যে চৌকীতে ব’সে রাঁধিতেছিল সাপটি তার নীচে দিয়ে গিয়া যেখানে হাঁড়ী থাকে সেখানে উঠিয়া প্রকাণ্ড ফণা ধরিয়া দাঁড়ায়। মেয়েটি নিতান্ত ছেলে মানুষ। বামুনঠাকুর আসেন নাই, অগত্যা তাহাকে কোন গতিকে রান্না করিতে হইতেছে। সে ভয়ে কাঁপিতেছে, কথা কহিতে বা উঠিয়া পলাইতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে সাপটি আপনিই আস্তে আস্তে ফণাটী নামাইয়া নালীর ভিতর যেমন যাইবার জন্য মুখ প্রবেশ করাইয়াছে, অমনি মেয়েটি কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া “বাবা” বলিয়া উঠিল। আমি দৌড়ে গিয়া দেখি, সাপটি চলিয়া যাইতেছে।

একবার আমার তিনটি কন্যা একটি ঘরে শুইয়াছিল। অধিক রাত্রে তারা

যখন বাহিরে আসিতে যায়, দুয়ার খুলিয়াই সামনে একটি মূর্ত্তি দেখে। তারা ভয়ে দুয়ার দেয় এবং ব'সে রাত্রি কাটায়, এবং অগত্যা ঘরের ভিতরই প্রস্রাব করে। ভোরে উঠে দুয়ার না খুলেই জানালা দিয়ে আমাকে ডাকে ও বলে.—"দাদামশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। আমরা বেরোতে পারছি না।" বুঝিলাম ঘটনা প্রকৃত, কারণ গন্ধটি তখনও আছে। উপরোক্ত দুইটি ঘটনাই বাবা মেয়েদের সঙ্গে দেখা হ'লে বলেছিলেন, আর তা নিয়ে অনেক আমোদও করেছিলেন।

একবার আমার শালী (মৃত জগৎচন্দ্র রায় ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী) আমার বাসায় গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে আমার ছেলে মেয়েদের দেখিতে আসেন। আমার ছেলে (ছেলে বুদ্ধিতে) উপরের ঘরের দেওয়ালে পেনসিল দিয়ে একটি মানুষের চেহারা আঁকিয়া তার লম্বা দাড়ী ও গোঁফ করে। আমার শালী তাকে বলেন,—"বটু, তোর বাবার গুরুঠাকুরকে বুঝি এঁকেছিস্, বেশতো লম্বা দাড়ী।" ঐ দিন রাত্রে বড় গরম হওয়ায় তিনি ঘরের ভিতরে বিছানায় না শুয়ে, বারান্দায় শুয়ে ঘুমাইতেছিলেন, শেষ রাত্রে বাহিরে যাইবার সময় দেখেন, বাহির থেকে শিকল বন্ধ, আর তিনি কাঁপিতেছেন, আর বলিতেছেন,—"আর বলব না রে, আর বলব না"। ঘর খুলিতেই গন্ধ পাইলাম, অনেকক্ষণ পরে তার কাঁপুনি থামিল আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমার ৬০।৬২ বৎসর বয়স, এমন ত দেখি নাই। একবার তাঁকে সশরীরে দেখা। আমি সেই হাসিমুখখানা দেখব।" কিন্তু তাঁর ভাগ্যে হয় নাই।

ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত আমার একটী কন্যার ও পুত্রবধূর পীড়ার সময় বাবাকে ক্রমাগত ডাকিয়া যে দিন ছায়ামূর্ত্তি ও গন্ধ পাই, সেইদিন থেকেই তাদের আরোগ্যের পথে দেখি, কিন্তু আমার একটী নাতী ও নাতনীর পীড়াকালে কত ডাকিয়াও বাবার কোন আভাস বা ইঙ্গিত না পাওয়ায় মনে মনে স্থির জানিতে পারি যে আশা নাই।

গত বৎসর আমার একটী ভাই ৺ললিতমোহন (বাবারই শিষ্য) কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া কলিকাতা হইতে রাঁচীতে হাওয়া পরিবর্ত্তনে যায়। যাইবার সময় পত্র লেখে,—"হাওয়া বদলাইতে রাঁচি যাইতেছি।" তিন মাস তথায় থাকে, কোন সংবাদই নাই। রাঁচির ঠিকানাও জানি না, পরে অগত্যা বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে একদিন রাত্রে আহ্নিকের সময় বিশেষ ব্যাকুল হইলে হঠাৎ ভাইয়ের সেই সময়ের অবস্থা সামনে শয়নাবস্থায় দেখিতে পাই। তৎপর দিন প্রাতেই অগত্যা কলিকাতার বাড়ীতে যাই। গিয়া দেখি—যাহা দেখিয়াছি ঠিক তাই। দুই দিন পূর্ব্বে এসেছে, আর দুই দিন পরেই ভাই আমার মারা যায়।

আমার গুরু ভাই ভগিনী ও মাতৃগণের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন যেন তাঁরা ও অন্যান্য পাঠক পাঠিকাগণ আমাকে বাতুল বা বাচাল না বলেন। ভগবানকে ব্রজ গোপীরাই চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁরা বহুলাঞ্ছনা অপবাদ সত্ত্বেও সেই জগৎপতি ভগবানকে পতি বলিয়াই অটল ভাবে

বরণ করিয়াছিলেন। আমি যদিও এখনও তাঁদের ন্যায় বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারি নাই, তথাপি তাঁর শ্রীচরণে আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমার ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের চরণে নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা যেন তাঁদের আশীর্ব্বাদে ও অনুকম্পায় আমার ঐ বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁর চরণে অচলা থাকে।

শ্রীলালমোহন রায় চৌধুরী।

শ্রীলীলাবতী গুপ্তা

পোঃ মাণ্ডলা, মধ্যপ্রদেশ।

একদিন কাটোয়ায় আমার সই বগলাদের বাসায় একটী ঘরে আমরা সকলে বসিয়া আছি। পরমারাধ্য গুরুদেব খাটের উপর শুয়ে আছেন, আমি তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। দেখছি তাঁর গায়ে যতগুলি মাছি বা মশা বসছে সবগুলিই মরে যাচ্ছে। তাই দেখে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে আর সকলকে বল্‌লাম,—"কেমন মজা দেখ।"—তাই শুনে বাবা বল্‌লেন, "আরও দেখবি?" এই বলে যেমন উঠলেন, দেখি, বিছানায় অসংখ্য ছারপোকা মরে রয়েছে। আমরা সকলে বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তাই দেখে বাবা বল্লেন,—"এতো কি? সে বার কেউটে সাপ আমার পেট্‌টায় কাম্‌ড়ে ধরে ছিল। যেমন ধরা অমনি উল্টে পড়া,—সকলে দেখলে সাপটা একেবারে ম'রে গিয়েছে।" এই বলেই পেট্‌টা খুলে আমাদিগকে দেখালেন। দেখলাম, পেটের এক জায়গায় দাগ রয়েছে। ঠিক বোঝা যাচেছ, সেখানটা গর্ত্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"আপনার কিছু হয় নি?" সকলেই বড় আশ্চর্য্য হলো। তাঁর যে কি অসীম শক্তি তা কে বুঝবে? আমার বাবা বল্‌তেন যে তাঁর শরীরে তাড়িতশক্তি এত বেশী যে জীব জন্তু তাঁর স্পর্শে জ্বলে পুড়ে যায়, কেউ টিঁকতে পারে না।

গুরুদেবের নাভির আধ হাত উপরে হাত রাখলে ঠিক বোঝা যেত যেন হু-হু করে একটা বাতাস বেরুচ্ছে, আর সেই বাতাসটা সুগন্ধে ভরা। তাঁর গায়ে সেই রকম গন্ধ সময় সময় খুব পাওয়া যায়।

আমাদের বাসায় সন্ধ্যার সময় সকলে বসলেই ছাদের উপরে খড়মের শব্দ হতো। আমার বাবা বলতেন,—"গুরুদেব এসেছেন, সকলে প্রণাম কর।" বল্‌তে বলতেই সেই জায়গাটা সুগন্ধে ভরে যেত, ঠিক তাঁর গায়ের গন্ধ।

সইদের বাড়ীতে আনারস হয়েছিল, একদিন আমরা সেই আনারস তুলে সকলে খেয়েছিলাম। ঠিক তার দুইদিন পরেই গুরুদেব সইকে লিখেছেন,—"আনারসটা নিজেই তুল্লে, নিজেই খেলে!" আমরা ত অবাক্। এই রকম ভাবে তিনি অনেক বার আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁহার অলক্ষ্যে আমরা কোন কাজ করলেও তিনি জানিতে পারেন।

একদিন গুরুদেব, আমার বাবা ও আর চার পাঁচজন শিষ্যসহ জুরনপুরে গিয়াছিলেন। ফেরবার সময় তাঁদের সঙ্গে জুরনপুরের এক সন্ন্যাসী তারা ক্ষ্যাপাও আসেন। এঁরা যাবার তিন চারিদিন পূর্ব্বে জুরনপুরের পূজারী বামুনের সঙ্গে তারা ক্ষ্যাপার কোন কারণে খুব ঝগড়া ও মারামারি হয়। তার ফলে তারা ক্ষ্যাপার মাথা ফেটে যায়। সে মাথায় যে পটী বেঁধে ছিল সেই রক্তমাখা পটীটী একটি ঘটির ভিতর করে সঙ্গে নিয়ে আসে, তা এঁরা কেও জানতেন না। আসতে আসতে উদ্ধানপুরে মরা ঘাটে মরা পুড়ছিল, ভয়ানক দুর্গন্ধ, সমস্ত শিষ্যই গন্ধে অস্থির হয়ে উঠেন। কেউ বমি করার মত করেন, কেউ নাকে কাপড় দেন.—এই রকম নৌকার ভিতর একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এমন সময় গুরুদেব হাসতে হাসতে সকলকে বল্লেন. "কিগো, বড় গন্ধ বেরুচ্ছে নাকি ? দেখ দেখি, কেমন সুন্দর গন্ধ। মা ভাগীরথী পর্য্যন্ত আনন্দে কল্লোল কচ্ছেন, আর তাঁর জলেও সুন্দর গন্ধ হয়েছে, দেখ।" এই বলেই নৌকার উপর থেকেই এক আঁচল জল নিয়ে সকলের নাকের কাছে ধরলেন। জলে কি সুন্দর গন্ধ, চারিদিক সুন্দর সুগন্ধে ভরা, আর জলও যেন আনন্দে নৃত্য করছেন। এমনি ভাবে কল্ কল্ শব্দে ঢেউ উঠছে যে নৌকার মধ্যে একটি আনন্দের রোল পড়ে গিয়েছে। সকলেই এক বাক্যে বলছেন, মা আজ তাঁর প্রিয় পুত্রকে বক্ষে ধারণ করেছেন, তাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সুগন্ধ বিস্তার করে উল্লাসে নৃত্য করছেন। উদ্ধানপুর কাটোয়ার গঙ্গায় কখনও উজান ভাটি নাই, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ গঙ্গা এমন বহিতে লাগিল যে নৌকা টল্‌মল্ করতে লাগল। ভয়ানক তুফান, নৌকা ডুববার উপক্রম, সকলেই অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। তারা ক্ষ্যাপা মালকোচা মেরে তৈরী হচ্ছেন যে নৌকা ডুবলেই লাফাইয়া পড়িবেন, নৌকা কাত হ'য়ে জল কল্ কল্ শব্দে নৌকার ভিতর ঢুকতে লাগ্‌ল। গুরুদেব অচল অটল হয়ে বসে আছেন। কারো কোন অনিষ্ট হ'লো না। কিন্তু তারা ক্ষ্যাপার ঘটির ভিতর থেকে পটিটা বেড়িয়ে জলের সঙ্গে ভেসে গেল। ঘটিটা যেমনই তেমনই থাকিল। তারা ক্ষ্যাপা মহাব্যস্ত হয়ে পটিটা ধরবার চেষ্টা করলে, নিজে না পেয়ে বিব্রত হ'য়ে মাঝিদেরও বল্লে, "ওরে আমার মহামূল্য জিনিষ ভেসে গেল, ধর্ ধর্।" মাঝিরাও তাই মনে করে সেটা ধরবার জন্য চেষ্টা করছে, এমন সময় গুরুদেব হেসে বললেন—"থাক্ থাক্, ও ধরবার দরকার নাই, ও কোন কাজের জিনিষ নয়। যা হয়ে গিয়েছে যাক্। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে ও সব মনে রাখা ভাল নয়।" পরে আমার বাবা প্রভৃতি শিষ্যদিগকে বল্লেন, "পূজারী ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তাই রক্ত মাখা পটিটা

যত্ন করে রেখেছিল। যত দেখ্‌তো ততই ওর রাগ বাড়তো, আর প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা হ'ত। ওটা কাটোয়া নিয়ে যাচ্ছিল যে ফৌজদারীতে দেখিয়ে নালিশ ক'রে বামুনকে জব্দ কর্‌বে। তাই মা গঙ্গা ওটা ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। তোমাদের কোন ভয় নেই, দেখ মা স্থির হয়েছেন, আর কোন তুফান নাই।" সভাই মা ভাগীরথী তখন আর কোন রকম চঞ্চলা নেই—একেবারে স্থিরা ধীরা শান্ত-সলিলা। সকলে বললেন,—"এ মায়ের ইচ্ছায় হয়নি, আপনার ইচ্ছাতেই হয়েছে।" ধন্য মহাপুরুষের শক্তি, কারোই কোন বিপদ আপদ হলো না, সকলেই নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন বাসায় এসে পৌঁছিলেন।

কাটোয়ায় আমাদের বাবার বৈঠকখানায় টেবিলের উপর কতকগুলি খোপওয়ালা কাঠের তৈরী একটা পায়রার খুপি ছিল। সেই খোপগুলির ভিতর বাবার আফিসের কাগজ পত্র থাকতো। একদিন বাবা সেই কাগজ পত্রগুলি আলমারির ভিতর বন্ধ করে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। যাবার সময় আমার মেজ ভাইয়ের অসুখ দেখে গিয়েছিলেন, তার পিঠে ঘা হয়েছিল। বাবা গুস্করায় গিয়ে দুই দিন ছিলেন। একদিন সকাল বেলায় উঠে চুপ করে খুব বিমর্ষ হ'য়ে আমার ভাইয়ের জন্য ভাবছিলেন, এমন সময় গুরুদেব আহ্নিক করে উঠেই বাবার কাছে এসে বল্লেন,—"কিগো, কি ভাবছো? আমি বাপু আহ্নিক করতে করতে তোমার বাসায় চলে গিয়েছিলাম, দেখলাম সবাই বেশ ভাল আছে। তবে তোমার ছেলেটীর পিঠে কতকগুলি ঘা হয়েছে দেখ্‌লাম। সে গুলো ভয়ানক পেকে উঠেছে।" বাবা অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন দেখে তিনি বল্লেন,—"হ্যাঁগো, বৈঠকখানায় টেবিলের উপর যে খোপগুলায় তোমার কাগজপত্র থাক্‌তো, কৈ তার ভিতর তো সে গুলো দেখলাম না। সে গুলো তুলে রেখেছ বুঝি?" বাবা বল্লেন,—"হ্যাঁ, ছেলেপিলে নষ্ট করে দেবে বলে সে গুলো আলমারিতে বন্ধ করে রেখে এসেছি।" তখন তিনি বল্লেন,—"হ্যাঁ, সে জন্যই দেখতে পেলাম না।" তার-পর বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা, খোকার পিঠে ঘা গুলা কি রকম? কোন ভয় নেই তো?" তিনি বল্লেন—"না, ভয় নেই। ও গুলো গরল হয়েছে। তা হলেও তুমি আজই ফিরে যাও, আর বর্দ্ধমান যাবার দরকার নাই। মেয়েরা সব ভয় পাচ্ছে।" বাবা বর্দ্ধমান না গিয়ে কাটোয়ায় ফিরে এলেন। বাসায় এসে আমাদিগকে বল্লেন,—"আমার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই খোপে কাগজপত্র নাই, সেইটা বল্লেন, কেন না তিনিতো সে কথা জানতেন না যে কাগজপত্র তুলে রেখে গিয়েছি।"

যখন আমরা কাটোয়ায় ছিলাম তখন আমি ছেলে মানুষ ছিলাম। গুরু-দেবকে সে সময় আমি 'দাদা গুরুদেব' বলে ডাকাতম। আমি, সই ও আমার আরও সঙ্গিনী, সকলে মিলে তাঁর কাছে গেলেই তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক রকম খেলা কর্‌তেন। কখনও তাঁর দাড়ি থেকে অসংখ্য ফুল ঝর্ ঝর্ করে পড়তো, আর তিনি আমাদের গায়ে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতেন। কখনও বা আমাদের প্রত্যেকের কাপড়ের খুঁট মুঠার মধ্যে চেপে ধরতেন। এক একজনার কাপড়ে এক এক রকম ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধ হতো, সকলেই বলতো আমার গন্ধ

ভাল, কিন্তু সব গন্ধই রকমারি সুন্দর। আবার কখনও বা আমাদের হাতে গায়ে চিমটি কেটে দিতেন, আর তাঁর নখ দিয়ে আতর বেড়িয়ে সেই জায়গাটায় লেগে যেত। আমার সেজ ভাইয়ের সর্ব্বাঙ্গে এক এক জায়গায় চিমটী কাটতেন, আর এক এক রকম গন্ধ হতো। সকলে তাঁকে আতরে বাবু বলতো, আর কোলে করে তাঁর গা শুঁকতো।

তারপরে আমার বাবা বর্দ্ধমান বদলি হন, তখন আমাদের বাসা বীরহাটে। আমার মেজো ভাই তখন কাতর হয়, একেবারে ডবল নিমোনিয়া। ভাইটীকে নিয়ে আমরা সকলেই বড় বিব্রত হয়ে পড়লাম। বিকারের ঘোরে সে এতই অস্থির হ'ত যে কেহই তাকে সাম্‌লে রাখতে পারত না। মা বাবা হতাশ হয়ে পড়লেন। যখন সে বিকারের ঘোরে কখনও উঠে বসে পড়ত আবার কখনও দাঁড়িয়ে পড়ত, তাকে তখন কেউ সামলাতে পারতেন না। আমি সেই সময় গুরুদেবের ফটোখানি তার মাথায় চেপে ধরে বলতাম, "ভয় কি দাদা? এই দেখ দাদা গুরুদেব তোমার মাথায় চরণ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।" তখনই মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত আড়াই বছরের ছেলে এমন শান্তভাবে শুয়ে পড়ত যে সে যে ব্যাধিগ্রস্ত তা মোটেই মনে হ'ত না। এই ভাবে পনর দিন কেটে গেল। তার বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল, তিন দিন খুব বাড়াবাড়ি হয়, শেষ দিন রাত্রি আর কাটেনা—এমন অবস্থা হল। খুব ভোরে বাবা আমার বড় ভাইকে ডেকে বল্লেন,—"তুমি সকালেই একবার গঙ্গানারায়ণ ডাক্তারকে নিয়ে এসগে, তিনি শিশু চিকিৎসা ভাল করেন। জীবনের আশা তো করা যায় না, তবুও একবার তাঁকে দেখান যাক। তারপর ভাগ্যে যা আছে তাত হবেই।" আমার বড় ভাই সকালেই ডাক্তার আনতে বেরিয়ে গেল। আমরা সকলেই ডাক্তারের প্রতীক্ষাতে আছি, মা বাবা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় আমার বড় ভাই টম্‌টম্‌ নিয়ে ফিরে আসছে। দেখা গেল ডাক্তার না এসে তাঁর বদলে গুরুদেব গাড়ীতে বসে আছেন। আমার মা আনন্দে বলে উঠলেন, "এঁকি, এতো ডাক্তার নয়, এ যে বাবা আসছেন। ছেলে সাক্ষাৎ গঙ্গানারায়ণ নিয়ে এলো।" বাবা বল্লেন,—"তবে আর কোন ভয় নেই।" বলেই তিনি বাইরে বেড়িয়ে গেলেন। গুরুদেব গাড়ী থেকে নেমেই বল্লেন, "কিগো তোমার ছেলে কেমন আছে?" বাবা সমস্ত তাঁকে বল্লেন, তিনি বল্লেন,— "চল দেখিগে।" তিনি ঘরের ভিতর এসে খোকার কাছে দাঁড়ালেন। আমি আনন্দে তাঁর চরণের ধূলা নিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিলাম। তাঁর চরণামৃত নিয়ে তাকে খাইয়ে দিলাম। তারপর গুরুদেব তাকে ভাল করে দেখে বল্লেন— "কোনও ভয় নেই। এ ছেলের কিছু হবে না। এ ছেলের যে জীবন হরণ করবে, এমন যমের এখনও সৃষ্টি হয় নাই।" তারপরেই আমার বাবাকে বল্লেন,—"বাপু, আজ কয়দিন হলো আমি কাটোয়া গিয়াছিলাম, আহ্নিক করতে কর্‌তে দেখলাম, তোমার ছেলের এমনি অসুখ। তিন রাত্রি আমি মোটেই ঘুমাই নি, এই তিন দিন আমাকে কঠোর ক্রিয়া করতে হয়েছে। তারপর দেখলাম, আর থাকা চলে না, তাই কাল সন্ধ্যায় উট-গাড়ীতে বেড়িয়ে পড়লাম। সকালে গাড়ী থেকে নেমেই দেখি, বিষ্ণু টম্‌টম্‌ নিয়ে ঐ দিকে

যাচ্ছে। তখন আমি তাকে ডেকে খোকার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে আমাকে সমস্ত বল্লে। তখন আমি সেই গাড়ীতে চড়েই তোমার বাসায় এলাম। যাক্‌, আর কোন চিন্তা নেই। তা হলেও যখন গঙ্গানারায়ণ ডাক্তারকে আনতে পাঠিয়েছিলে, তখন তাঁকে এনে একবার দেখাও।" তাই শুনে আমার বাবা বল্লেন, "আর কেন? যখন আপনি দেখলেন, চরণ ধূলি দিলেন, আপনি ওর জন্য যখন ক্রিয়া করেছেন, তখন আর ওর জন্য আমার কোনই ভয় বা চিন্তা নেই। আর ডাক্তারের আনার প্রয়োজন কি?" তাই শুনে গুরুদেব বল্লেন—"তা হলেও রোগের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিছু অর্থ-ব্যয় করা কর্ত্তব্য। অতএব ডাক্তারকে আরও কিছু অর্থ দেওয়া দরকার।" এই বলেই তিনি গুস্করা চলে গেলেন। তাঁর যাবার পর থেকেই খোকা একটু একটু করে ক্রমেই সেরে উঠতে লাগল, আর কথা কইল।

কিছুদিন পরেই গুরুদেবের ছেলেদের উপনয়ন উপলক্ষ্যে আমি বণ্ডুল গেলাম। সেখানে যাবার ৪।৫ দিন পরেই একদিন সকালে দেখি, আমার বাবা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। তার মুখে শুনলাম আমার মেজো ভাইয়ের উপরেই যে বোনটী তার বড় অসুখ। আমি যে দিন বর্দ্ধমান হতে এসেছিলাম সেই দিন ভোর থেকে তার জ্বর হয়। তারপর ক্রমেই বাড়ছে, অতএব আজ আমাদিগকে বাড়ী যেতে হবে। গুরুদেব সমস্ত শুনলেন, কিন্তু কিছু বল্লেন না, চুপ করে থাক্‌লেন। তবে আমাকে বাবার সঙ্গে সেই দিনই পাঠিয়ে দিলেন। আমার যাবার পরেই বোনটীর অসুখ ক্রমেই বাড়তে লাগল। সেবারেও আমরা বণ্ডুল হ'তে আসার দুই দিন পরেই গুরুদেব এলেন। আমরা তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে বোনটীকে দিতে গেলাম। তাতে তিনি বল্লেন, "ওকে আর পায়ের ধুলা দেওয়া না দেওয়া দুইই সমান।" তারপর ঠিক সন্ধ্যার সময় আমাকে বল্লেন—"এক গাড়ু জল দে, আমি বাইরে বাহ্যে ফিরতে যাব।" আমি এক গাড়ু জল দিলাম। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘুরে এলেন। কিন্তু গাড়ুর জল যেমনি, তেমনি আছে। আমি বল্লাম,—"একি? জল কি খরচ করেন নি?" তিনি বল্লেন,—"না আমি ভুত তাড়াতে গিয়াছিলাম।" আমরা যে বাসায় ছিলাম, সেটায় ভুতের উপদ্রব ছিল। তার পরেই তিনি গুস্করা চলে গেলেন, সেখানে গিয়েই কেদার দাদা প্রভৃতির কাছে বলেছিলেন রজনীর মেয়েটী মারা যাবে।

গুরুদেব সে দিন দুপুর বেলায় আমাদের বাসায় বসে আমাদিগকে একটী সুন্দর গল্প বলেছিলেন। তিনি চলে গেলে আমি আমার বাবার কাছে সেই গল্পটা সমস্ত বলি। বাবা শুনেই মাকে বল্লেন, "তোমার মেয়েটী বাঁচবে না, গুরুদেব গল্পচ্ছলে তোমাদিগকে বলে গিয়েছেন, তোমরা বুঝতে পার নি।" তারপর গুরুদেব যাবার পরদিন বৈকালে আমার সে বোনটী মারা যায়।

বণ্ডুলের প্রতিষ্ঠিত বাণলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলা তাঁহার মস্তকের ভিতর ছিলেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তিনি নাক দিয়ে তাঁকে বাহির করতেন, তারপর পূজাদির পর আবার সেই রকম ভাবে মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেন। সেই রকম নাকের ভিতর দিয়ে মাথাটা ঝাঁকড়াতেন, আর মনে হতো তাঁর ব্রহ্মতালুতে

ঠক্ করে শব্দ হলো। আর একবার দেখেছিলাম একটী মড়ার দাঁতের মালা তাঁর কাছে ছিল। কোন সন্ন্যাসী নাকি তাঁর কাছে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে মালাও তাঁর মাথার ভিতর ছিল। মাঝে মাঝে তাকে বার করে ছোলাভাজা মদ ইত্যাদি না দিলে সে কড়মড় করে শব্দ করতো। তার পরেই গুরুদেব বর্দ্ধমানে একটী আশ্রম করেন। ইহা পুরাতন আশ্রম। তিনি গুস্করা থেকে মাঝে মাঝে এসে এই আশ্রমে থাকতেন। আশ্রমের পিছনে একটী পুকুর ছিল, তার অপর পারেই তখন আমাদের বাসা। তিনি যখন আসতেন, তখন আমি প্রায়ই আশ্রমে থাকতাম।

একদিন নেপাল বাবু এসে আমাকে বল্লেন—“আমি কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি, আশ্রমে আর কেউ নেই, বাবা একা আছেন, তুমি আশ্রমে যাও।” আমি, আমার আর একটী বোন, আমাদের বাড়ীর আর একটী মেয়ে ও আমাদের বাসার পাশের বাড়ীর একটী মেয়ে,—আমরা চারজনে আশ্রমে গেলাম। বাবা তখন একটি তানপুরা নিয়ে একা বসে বসে গান কর্‌ছিলেন,—“মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়, হবে গো জননি জানি সমুদয়”, এই গানটী গাচ্ছিলেন। আমাদের মনে হল স্বয়ং কৈলাসপতি। আমাদিগকে দেখেই হেসে উঠলেন, বল্লেন,—“কি গো, এস সব।” এই বলেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমরা সকলে গিয়ে তাঁর কাছে বসলাম। আমাকে বল্লেন,—“মাথার চুল টেনে দাও।” আমি মাথার চুল টেনে দিচ্ছি, আমার বোন ও আমাদের বাড়ীর মেয়েটি পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর প্রতিবাসিনী মেয়েটি তাঁর পাশে বসে আছে। নানা রকম গল্প হাসি খেলা ইত্যাদি হচ্ছে, এমন সময় বেরির হাতে যে একটি খুব বড় চাবি ছিল সেই চাবিটি তার হাত থেকে নিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—“এ কিসের চাবি ?” সে বল্লে,—আমাদের ঘরের তালার চাবি।” তাই শুনে বাবা বল্লেন,—“চাবিটা তো আমি খেয়ে ফেলেছি, তবে কি হবে ?” আমরা কেউ সে কথা বিশ্বাস করলাম না। সকলেই বল্লাম—“হাঁ, চাবি আবার কেউ খেতে পারে ?” তিনি হেসে বল্লেন,—বিশ্বাস হলো না, দেখ্‌বি তবে ?” এই বলেই চিৎ হয়ে শুয়ে পেটটা খুলে দিলেন, আমরা সকলেই দেখলাম পেটের এক পরদা চামড়ার ভিতর যেন চাবিটা রয়েছে। চাবির আয়তনটা ঠিক ফুটে উঠেছে। আমরা সকলেই সেখানটায় হাত দিয়ে দেখলাম, দেখলাম, ঠিক মনে হলো চাবিটা রয়েছে। আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বেরি তো কাঁদতে আরম্ভ করে দিল, “মা আমাকে বক্‌বেন। ঘরের চাবি না নিয়ে গেলে তালা খুল্‌তে পারবেন না। আপনি আমার চাবি বার করে দিন,” বলে খুব দোরাত্ম্য করতে লাগল। তিনি গম্ভীর ভাবে আমাদিগকে সাক্ষী মানতে লাগলেন, বল্লেন,—“দেখ গো, আমি খেয়ে ফেলেছি এখন কেমন করে ওকে দেব - . পেটের ভিতরকার জিনিষ কি বার করা যায় ?” তারপর বল্লেন, —“আমি দিতে পারি, তবে চাবির বদলে আমাকে কি দেবে বল।” তাতে সে বল্‌লে, “কি আর দিব ?” তিনি বল্লেন—“বাঃ, চাবি বার করতে আমার পেটটা যে চিড়ে যাবে, তার ক্ষতিপূরণ কে করবে ?” সে বল্‌লে,—“তা আমি কি জানি ? আমি কি খেতে বলেছিলাম ?” এই রকম নানা প্রকারে তাঁর

সঙ্গে বচসা করার পর শেষে বল্‌লে,—"পাঁচটী পয়সা দিব।" বাবা বল্‌লেন,—"আচ্ছা তাই, আমার মেয়ে যখন তালা খুলতে পারবে না বল্‌ছিস, তখন আমি তাতেই রাজি হ'লাম।" এই বলেই পেটের সেই জায়গাটায় হাত দিয়ে টানতেই ফট্‌ করে শব্দ হলো, আর দেখি চাবিটা তাঁর হাতে, কিন্তু পেট চেরার কোনও লক্ষণ দেখলাম না।

আর এক দিন বাইরের ঘরে আমরা অনেকেই তাঁর কাছে বসে আছি। দুপুর বেলা। ঘণ্টা দুই পরে তিনি বল্‌লেন,—"তোমরা সব উঠে যাও।" আমি বল্‌লাম,—"না, এখন আমরা যাব না, আর একটু থেকে আপনার কিছু বাজি দেখে যাব।" তিনি হেসে বল্‌লেন,—"কি দেখ্‌বি? শীঘ্র উঠে যা, বুঝ্‌তে পার্‌ছিস না, কেমন একটা দুর্গন্ধ আসছে।" সত্যই তখন ঘরটাময় একটা যেন মড়া-পোড়ার গন্ধ বিশ্রীভাবে পাওয়া গেল। আমি বল্‌লাম, "আপনি যখন আছেন, তখন আমাদের এ গন্ধে কোনই কষ্ট নাই, এ আপনারই খেলা। আমাদিগকে উঠিয়ে দিবার জন্যই এমন দুর্গন্ধ বার কর্‌ছেন। তাই শুনে তিনি হাসতে লাগ্‌লেন আর আমার মাকে বল্লেন,—"দেখ্‌লে গো, তোমার মেয়ে আমার উপর দোষ চাপাচ্ছে। কোথা থেকে গন্ধ এল, আর দোষ হ'ল আমার। তবে আমারই যখন দোষ হ'ল তখন এই দুর্গন্ধের বদলে একটা সুগন্ধই তোমরা পাও।" এই বলা মাত্রই একটা সুন্দর সুগন্ধে ঘরটা ভরে গেল। সকলে হাসতে লাগল।

আর একদিন—সে দিনও আমরা সকলে বাইরের ঘরে বসে আছি। আমাদের দলের মধ্যে একজন আমাকে বল্লেন,—

বাবাকে বল না আমাদের গোটা কতক ফুল দিতে।" আমি তাঁকে সেই কথা বলায়, তিনি বল্লেন,—"কি ফুল নিবি?" আমি বল্লাম,—"চাঁপাফুল।' তিনি খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন,—"দুপুর বেলা চাঁপা গাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে, ফুলগুলা বোঁটা ছাড়ছে না।" এই বলেই কিছুকাল চুপ করে থেকে দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন, এমন সময় একটা ফুল তাঁর হাতে এল। সেই ফুলটা আমাকে দিলেন। তারপর যতই দাড়ি ধরে টানেন, ততই ফুল পড়ে, আর সকলকেই এক একটা করে দেন। তারপর ফুল আনা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটী বৌ ফুল পায় নি, সে চুপ করে আছে। এমন সময় উপরোক্ত মেয়েটী বল্লে,—"বাবাকে বল তোমার হাতের চাঁপা ফুলটা গোলাপ ফুল করে দিতে।" আমিও তাঁকে তাহা বল্লাম। বলা মাত্রই আমার হাত থেকে ফুলটা চেয়ে নিয়েই যে বউটী ফুল পায়নি তাকে বল্লেন,—"কিগো, তুমি ফুল পাওনি নয়? তোমার ভারি দুঃখ হয়েছে, এই ফুলটা তুমি নাও।" এই বলেই তাকে ফুলটা দিয়ে দিলেন। সে বৌ যে ফুল পায়নি তা আমরা কেহই জানতাম না। পরে তার মুখে শুনলাম তার ভারি কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু কাউকে সে কথা সে পূর্ব্বে জানতে দেয় নি। তাকে ফুলটা দিয়েই তিনি আমাকে বল্লেন,—"অতি লোভে তাঁতি ডোবে। তোমার লোভের শাস্তির স্বরূপ তোমার কাছ থেকে ফুল কেড়ে নিলাম; আর ঐ বৌমাটী ফুল পায়নি—ও কাউকে কিছু বলেনি, চুপ করে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, কিন্তু অন্তরের

ভিতর ভয়ানক ব্যথা পেয়েছে। গাছে আর ফুল নেই, কোথায় পাব, তাই তোর ফুলটী তাকে দিলাম।" ফুলটি অপহরণ হওয়ায় আমার কিন্তু বড় কষ্ট হলো। সভায় এমন ভাবে অপমানিত হওয়ায় অভিমানে আমার প্রাণটা ভরে গেল, চোখ ফেটে আমার কান্না এল, আমি কাউকে কিছু না বলে চুপ করে ঘাড় গুঁজে বসে থাকলাম। তাই দেখে তিনি সকলকে বল্লেন,—"দেখছো গো, লীলার খুব অভিমান ও রাগ হয়েছে, একটু কিছু সহ্য হয় না, আবার পরের কথায় লাফানও চাই।" তারপর একটু পরে আমাকে ডাকলেন। আমি কিন্তু তাঁর কাছে গেলাম না, তিনি নিজেই আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে, আমার পিঠ চাপড়ে বললেন,—"ভারি অভিমান হয়েছে? আচ্ছা সন্ধ্যার আগে তোকে একটা এমন জিনিষ দিব যা কেউ কখনও পায় নাই।" তারপরেই আমাদের সভা ভঙ্গ হলো। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি পায়খানা গেলেন। আমার কাজ ছিল তিনি পায়খানা থেকে আসার পর, তাঁর হাতে পায়ে জল ঢেলে দেওয়া, পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে চরণ মুছিয়ে দেওয়া। আমি নিজের কাজ কচ্ছি, এমন এমন সময় তিনি ডান হাতের মুঠার ভিতর থেকে একটী দ্রব্য আমার হাতে দিলেন, দেখলাম চন্দন মাখা একটী জবা ফুল। আমি বল্লাম,—"এ কি?" তিনি বল্লেন,—"বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পূজার প্রসাদী ফুল, তোর জন্য এনেছি। খুব যত্ন করে রেখে দিস্ যেন হারিয়ে না যায়, আর কোনও প্রকার অশুচি না হয়। এ ফুলে অনেক মহৎ কার্য্য সাধন হবে। কোনও কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই ফুল একটু গঙ্গাজল দিয়ে একটু বেঁটে খাওয়ালে সে রোগ-মুক্ত হবে।" এই বলে তিনি সন্ধ্যা করতে গেলেন, আমিও বাসায় গিয়ে ফুলটী একটী ন্যাকরায় বেঁধে একটী কৌটার মধ্যে বন্ধ করে, আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিলাম।

তারপর আর এক দিন সন্ধ্যার আগেই তিনি গুস্করা থেকে এলেন। সন্ধ্যা করতে যাবেন বলে এক জলচৌকীর উপর দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধুচ্ছেন, আমি তাঁর চরণ ধুইয়ে দিচ্ছি। তিনি সেই সময় আমাকে বল্লেন,—"আমি যখন ট্রেনে আসছি, সেই সময় আমি যে গাড়ীতে ছিলাম সেই গাড়ীতেই একটা লোক এক কাঁধি সুন্দর মর্ত্তমান কলা নিয়ে যাচ্ছে। দেখে খুব ইচ্ছা হল, এই রকম কলা কতকগুলা নিয়ে এসে তোদিকে খাওয়াই।" তাই শুনে আমি বল্‌লাম,—"যখন আপনার ইচ্ছা হয়েছে, তখন খাওয়াতেই হবে। আমরা অন্য কোনও ওজর আপত্য শুনব না।" তিনি বল্লেন,—"আচ্ছা, সন্ধ্যা করে উঠে দেখা যাবে, ছাদের উপর আমার বসবার জায়গা করিস্।" এই বলেই তিনি সন্ধ্যা করতে গেলেন। আমি ছাদের উপর তাঁর বসবার জায়গা করতে গেলাম। বৈশাখ মাস, জ্যোৎস্না রাত্রি, ছাদটা বেশ করে ধুয়ে এক খানা ক্যাম্পখাট পেতে দেওয়া হলো মেয়েদের বস্‌বার জন্য একখানা সতরঞ্চ পাতা হলো। অনেক স্ত্রীলোকই জুটেছিলেন। বাবা উঠেই ছাদে গেলেন, আমরা সকলেই তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম, তিনি খাটের উপর শুলেন, আমরা সকলেই নীচে সতরঞ্চির উপর বস্‌লাম। আমার মামা ও রাঁধুনি বামুন সিঁড়ির কাছে বসেছিলেন। এমন সময় বাবা বল্লেন,—"কি

রে, কলা খাওয়াতেই হবে ?" আমি বল্লাম,—"নিশ্চয়ই।" তিনি বল্লেন,—"আচ্ছা, তবে সব চুপ করে বসে থাক্, কোনও রকম গোলমাল করিস্ না।" আমরা সকলেই চুপ করে বসে থাকলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন, তারপর বল্লেন,—"কলাগুলো বড্ড মজে গিয়েছে, আনা যাচ্ছে না, সব বোঁটা ছেড়ে যাচ্ছে।" তাই শুনে আমি বল্লাম,—"তা বল্লে হবে না। যেমন করে হউক আনতে হবে।" তিনি আবার খানিকটা চুপ করে থাক্লেন। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে উপরের দিকে হস্ত সঞ্চালন করতে লাগলেন। খানিক পরে আমার নাকের কাছে ধরে বল্লেন,—"দেখ্ দেখি কোন রকম গন্ধ পাচ্ছিস্ কি না ?" আমি বল্লাম,—"হ্যাঁ সুন্দর পাকা কলার গন্ধ।" আবার সেই রকম উপর দিকে হাত সঞ্চালন করতে লাগলেন। মনে হল উপর দিকে কাকে ডাক্ছেন, তারপরেই আমার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর বল্লেন,—"বোঁটা ছেড়ে গেল, কলা এলো না।" আমি বোঁটাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লাম,—"আমরা কলা চাই, বোঁটা নিয়ে কি করব ?" আবার সেই রকম হাত করতে লাগলেন। একটু পরেই একটী বোঁটা ছাড়ান কলা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন,—"এখানে যত লোক আছে কলাটা ছাড়িয়ে একটু একটু করে খেতে দে। এ খুব ভাল জিনিষ। আর এর খোসাটা তুই ভাল করে রেখে দিস্, এও খুব উপকারী জিনিষ।" বলে উপরোক্ত ফুলের বিষয় যা বলেছিলেন, এ খোসার বিষয়ও তাই বল্লেন। আমি কলাটী ছাড়িয়ে সকলকে একটু একটু করে দিলাম, আমার মামা ও বামুনকেও একটু একটু দিলাম, আর খোসাটা যত্ন করে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখলাম। তারপর তিনি অসংখ্য কলা এনে সকলকে খাওয়াইলেন। উপর দিকে এক একবার হস্ত সঞ্চালন করেন, আর সাত আটটী ক'রে কলা সকলের কাছে ছুড়ে ছুড়ে ফেলেন। কলা খেয়ে সকলের পেট ভরে গেল, এমন সুন্দর সুস্বাদু কলা আমি জীবনে আর কখনও খাই নাই। তারপর ছাদের উপর একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল, নীচে বাইরের ঘর থেকে তাঁর শিষ্যরা সকলেই ছুটে উপরে এলেন। গুরুদেব সকলকে ধমকাইয়া তাড়িয়ে দিলেন। তারপরে সেই দিনকার মত সভা ভঙ্গ হল। আমি বাসায় গিয়ে সেই কলার খোসাটীও অতি যত্ন-সহকারে সেই ফুলের সঙ্গে রেখে দিলাম।

বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুদিন পরে কোনও বিশেষ কারণে যখন আমি সেই ফুল ও কলার খোসা বাহির করতে গেলাম, দেখলাম জিনিষই নেই,—কৌটা যেমন তেমনি আছে, ন্যাকরার টুকরাও আছে, কিন্তু ভিতর থেকে জিনিষ দুটীই অদৃশ্য হয়েছে। আমি ত অবাক্ হয়ে গেলাম, ঐ দ্রব্যের এরূপ ভাবে অদৃশ্য হবার কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর কিছুদিন পরে বোঝা গেল যে, কোনও দিন অশুচি অবস্থায় কৌটা ছোঁয়া পড়ায় ঐ দেব-দুর্লভ দ্রব্য অদৃশ্য হয়েছে।

ইহার কিছুদিন পরে আর একদিন ঐ প্রকার আমরা সকলে তাঁর কাছে বসে আছি। নানা রকম গল্প হচ্ছে। এমন সময় তিনি বল্লেন,—"দেখলাম, রাজবাড়ীতে ঝি গুলো পান সাজছে, তোরা খাস তো এনে দিতে পারি।"

আমরাও পেয়ে বসলাম। "হাঁ আনুন, আমরা খাব," সকলের মুখে এই কথা শুনে তিনি বল্লেন,—"যে যত খেতে পারবে তত পাবে, কিন্তু এর মধ্যে কেউ যদি বলে 'খেতে পারব না' তা হলে আর পাবে না, পান আনা বন্ধ হয়ে যাবে।" এই বলেই তিনি খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে দুই হাত উপর দিকে পাততেই এক আঁজল পান তাঁর হাতে এসে পড়ল, তিনি আমাদের দিকে পান ছুড়ে দিলেন। এই রকম করে বার বার পান দিতে লাগলেন, সকলেই পান খেতে লাগল। রাজবাড়ীর পান সুন্দর সুন্দর, নানা রকম মসলা দেওয়া লবঙ্গ-মোড়া সুন্দর খিলি, খেতেও অতি সুমিষ্ট, সকলেই খুব পান খেলে। তখন একটী মেয়ে বল্লে,—"বাবা, পান খেয়ে মুখ মেরে গেল, আর খেতে পাচ্ছি না।" অমনি পান আসা বন্ধ হয়ে গেল। অন্য একটী মেয়ে বলল,—"আমি আরও পান খেতাম, এরই মধ্যে পান বন্ধ করে দিলেন।" সে কথা শুনে তিনি বল্লেন,—"আমি ত' পূর্ব্বেই বলেছিলাম 'কেউ খেতে পারবে না বল্লেই বন্ধ হয়ে যাবে'।" তাতেও সেই বালিকাটী পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন তিনি বল্লেন,—"এখন বল তো একতাল গু এসে তোমাদের মাঝখানে পড়বে।" তাই শুনে কেউ বল্লে,—"বাবা, গু আনতে হবে না।" কেউ বল্লে, আচ্ছা আনুন।" তার কথা শুনে একজন বর্ষীয়সী বল্লেন,—"না বাছা, তা বলিস না, মহাপুরুষের কাছে চন্দন আর বিষ্ঠা দুই সমান। ও'র কি? তোরা বলবি আর উনি ভাববেন, অমনি সকলের মাঝখানে গু এসে পড়বে। রাত্রি বেলায় সকলকেই নাইতে হবে।" তখন সেই হুলুস্থুলের ভিতর সকলে ক্ষান্ত হল, আর গুরুদেবও উঠে গেলেন। অন্যান্য সকলে উঠে যে যার বাসায় গেলেন।

আর একদিন গুরুদেব তাঁর কোন শিষ্যার নিকটে কিছু জলযোগ করেছিলেন। তাঁর না কি খাবার ইচ্ছা ছিল না, শিষ্যা তাঁকে জোর করে খাইয়েছিলেন। তারপরেই তিনি আমাদের বাসায় এসে আমাকে বল্লেন,—"এক বালতি জল আন তো, অমুকলোক আমাকে কতকগুলো যা তা খাইয়ে দিলে, আমার কেমন অতৃপ্তি হয়ে গিয়েছে। পেটটা ধুয়ে ফেলতে হবে।" সেই কথা শুনে আমি একটা বড় বালতি করে এক বালতি জল নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে রাখলাম। সেই এক বালতি জল সবটা তিনি খেয়ে ফেললেন, তারপর সব জলটা তুলে ফেললেন। তাঁর সেই বড় এক বালতি জল খাওয়া দেখে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। জলটা তুলেই তিনি বল্লেন,—"পেটটা ধুইয়ে ফেলে বাঁচা গেল। পেটটা কেমন গজ্ গজ্ করছিল।"

একবার একদিন আমি আমার বড় ভাইকে সঙ্গে করে গুস্করা গিয়েছিলাম। আমি কোনও বিশেষ কারণে তাঁর নিকট গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময়েই আমি সেখানে পৌঁছেছিলাম। বাসায় ঢুকেই দেখি তিনি সন্ধ্যা করতে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন,—"এই যে তুই এসে পড়েছিস, এখনি তোর কথা এদিকে বলছিলাম।" এই কথা বলে আমার বসবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েই সন্ধ্যা করতে গেলেন। তারপর শুনলাম, তাঁর যে সব শিষ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে আমার কথা সব বলেছিলেন

এবং লীলা এখনই আসবে, সে কথাও বলেছিলেন। আমি কিন্তু সেখানে যাবার পূর্বে তাঁকে কোন সংবাদই দিই নাই। তারপর তিনি উঠে এসে আমার কাছে বসলেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বে আমার কিছুই জানাই নি, তথাপি তিনি সেই সব অজানা গোপন বিষয়ে নিজে থেকে আমার সব উত্তর দিলেন এবং আমাকে অভয় দিলেন। পরে আমার শয়নের ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি যে ঘরে শয়ন করেছিলাম, সে ঘরের জানালা কপাট সবই বন্ধ ছিল। আমার ভাইও সেই ঘরেই ছিল, আমরা খুব ঘুমাচ্ছি, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় দেখি তিনি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে, সমস্ত জানালা খুলে দিচ্ছেন, আর বলছেন,—"উঃ কি গরম, এত গরমে সব ঘুমাচ্ছে।" তাঁর সাড়া পেয়ে আমরা জেগে উঠলাম। আমি উঠে বসে বল্লাম,—"আপনি সব জানালা খুলে দিচ্ছেন?" তিনি বল্লেন,—"হাঁ, গরমে তোদের কষ্ট হচ্ছে, তাই জানালা গুলো খুলে দিলাম।" আমাদের খুব গরম লাগছিল বটে, কিন্তু অজানা জায়গা বলে ভয়ে জানালা খুলতে পারিনি। তারপরেই তিনি বল্লেন,—আমার বড় পিপাসা পেয়েছে, এক গ্লাস জল খাব।" সেই ঘরেই তাঁর জলের সরাই থাকতো, আর তার কাছেই একটা গ্লাস উপুর-করা ছিল। ঘরে অন্য কোনও আলো ছিল না, জ্যোৎস্নার আলো জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর আসছিল। তিনি সেই অবস্থাতেই এক গ্লাস জল ঢেলে নিয়ে খেলেন, কিন্তু জলটা খেয়েই বল্লেন,—"গেলাসে কি ছিল খেয়ে ফেল্লাম। লীলা, উঠ তো।" বলেই বাইরে গেলেন, আমরাও উঠে তাঁর পিছু পিছু গেলাম, তিনি বাইরে গিয়েই তাঁর চাকর সাহানিকে ডেকে বল্লেন,—"এক বালতি জল নিয়ে আয়তো, কি খেয়ে ফেলেছি দেখি।" তাই শুনে সাহানি তাড়াতাড়ি এক বালতি জল এনে তাঁর কাছে রাখলে। সেবারেও তিনি সেই এক বালতি জল খেয়ে ফেললেন, তারপরেই সেই জল তুলতে লাগলেন। একটু পরেই একটি ছোট সাপ বেড়িয়ে পড়লো। তিনি বল্লেন,—"দেখেছিস সাপ খেয়ে ফেলেছিলাম।" আমরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম সাপটা মরে গিয়েছে। কেউটে সাপের বাচ্চা! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সামান্য একটি চুল কি কুটা গলায় গেলেই ফেলে দিতে হয়, আর তাতে কত উপসর্গ হয়। আর তিনি অবাধে একটা কেউটে সাপের বাচ্চা খেয়ে ফেল্লেন. একটা বিষাক্ত দ্রব্য খেয়েও তাঁর কোন অনিষ্ট হল না, বরং সাপটাই মরে গেল! মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব হলাহল খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, আর আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবও তাই করেছিলেন।

আমার বাবার কাছে শুনেছিলাম, গুরুদেবের কোন শিষ্য নাকি তাঁর কোনও বন্ধুর কাছে গুরুদেবের গল্প করেছিলেন। কিন্তু বন্ধু বিশ্বাস করতে পারেন নি, তিনি নাকি বলেছিলেন,—"হাঁ, মানুষে আবার অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে।" তাতে শিষ্য বল্লেন, নিশ্চয়ই, তুমি গিয়ে দেখে আসতে পার।" সেই কথা শুনে বন্ধু নাকি বলেছিলেন,—"আচ্ছা চল, একদিন দেখে আসা যাক্। তবে আমি এখান থেকে একটা কথা মনে করছি। আমি আমি খুব রসগোল্লা খেতে ভালবাসি, তিনি যদি আমার মনের কথা জানতে

পেরে পূর্বেই রসগোল্লা আনিয়ে রেখে, আমি যাবামাত্রেই খেতে দেন, তবেই বুঝব তিনি ক্ষমতাবান্ মহাপুরুষ।" শিষ্য তাতেই রাজি হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গুরুকরা রওনা হন, এবং মনে মনে বলেন,—"গুরুদেব, দেখবেন আমার যেন লজ্জা নিবারণ হয়।"

এদিকে অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ সমস্ত জানতে পেরে খুব ভাল ভাল বড় বড় রসগোল্লা আনিয়ে তাঁর সামনেই তাকের উপর তুলে রাখেন। তারপর তাঁরা এসে প্রণাম করে বসবামাত্রই বল্লেন,—"সব মুখ হাত ধুয়ে জল খাওগে।" বন্ধু ভাবছেন দেখা যাবে, শিষ্য ভাবছেন কি হবে। তাঁরা নিকটেই মুখ হাত ধুয়ে বসতেই গুরুদেব চাকরকে বললেন,—"সামনের তাকে রসগোল্লা আছে, এদের জল খেতে দাও।" বন্ধু তাই শুনেই অবাক, তারপর খেতে দিলে শিষ্যের খুব আনন্দ হয়েছে, মনে মনে ভাবছেন, লজ্জা-নিবারণ গুরু শিষ্যের লজ্জা নিবারণ করেছেন। এই ভেবে বল্লেন,—"বাবা, বেশ সুন্দর রসগোল্লা তো।" গুরুদেব হেসে বললেন,—"হাঁগো, তোমার বন্ধু বাবুটি রসগোল্লা খেতে খুব ভালবাসেন জেনে ফরমাস দিয়ে আনিয়ে রেখেছিলাম।" বন্ধু আর আর খাবেন কি, উঠেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাতরভাবে বল্লেন,—"অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর্ত্তে হবে।" তাই দেখে তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন,—"অপরাধ কিগো, তোমরা দুইজনে এই রকম বলাবলি করছিলে, তাই আনিয়ে রেখেছি, যাও জল খাওগে।" তিনি আর জল খাবেন কি, ব্যাকুল হয়ে শিষ্য হবার জন্য কাঁদতে লাগলেন। তারপর নাকি তিনি শিষ্য হয়েছিলেন।

একবার শুনেছিলাম একজন নাস্তিক গুরুকরা গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে তর্ক করেন। তারপর বলেন,—"অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হতে পারে? তা যদি হয় তবে এই লণ্ঠনগুলা ঘরময় চলে বেড়াতে পারে কি? না, ওই জবা গাছে গোলাপ ফুল ধরতে পারে?" তাঁর মুখে সেই কথা শুনে গুরুদেব একটু হেসে বল্লেন,—"হাঁ, ভগবানের রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। তাঁর ইচ্ছা হলেই লণ্ঠনও চলে বেড়াতে পারে, জবাগাছে গোলাপও ফুটতে পারে।" তাঁর এই কথা শেষ হতে না হতেই সকলে দেখতে পেলেন, লণ্ঠনগুলা ঘরময় চলে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে সকলেই হৈ চৈ করছেন, এমন সময়ে গুরুদেব বললেন,—"দেখ তো গো, জবাগাছে দুইটা গোলাপ ফুটে রয়েছে না?" তখন সকলেই সেই দিকে গিয়ে দেখ্লেন সত্যই একটা জবার ডালে দুইটি গোলাপের ফুল ফুটে রয়েছে। নাস্তিক তখন পরীক্ষা করে দেখছেন যে গোলাপ দুটি কৃত্রিম কি প্রকৃত, কাছে গিয়ে ডালটী ভেঙ্গে দেখলেন যে কৃত্রিম নয়, সত্যই একটি জবার ডালে জবার পাতার মধ্যে দুইটি গোলাপ ফুটে রয়েছে। তখন তিনিও এসে গুরুদেবের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদাকাটা করেন। শুনেছিলাম কিছুদিন পরে নাকি তিনিও শিষ্য হয়েছিলেন।

আমরা সকলে সেবার গুরুদেবের সঙ্গে পুরী গিয়েছিলাম। সেই সময় তাঁর মুখে অনেক রকম আশ্চর্য্যজনক গল্প শুনেছিলাম এবং অলৌকিক ব্যাপার

দর্শন করেছিলেন। সে সব উল্লেখযোগ্য নয় বিবেচনায় এখানে আর উল্লেখ করলাম না। পুরী থেকে ফেরবার সময় ষ্টেসনে এক সাহেব নিভৃতে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়, সেখানে বহুক্ষণ দুইজনের গল্প গুজব হয়। তারপর গুরুদেবের কোনও অলৌকিক বিষয় দেখে সাহেব মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্য হতে চায়, কিন্তু তাকে দীক্ষা দিতে তিনি রাজি হন না।

এই রকম তাঁর অপার আশ্চর্যজনক বিষয় দেখে দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। কত ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তিনি আমাদিগের সঙ্গে খেলা করেছেন। আমার বাবার নিকটেও অনেক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার শুনেছিলাম। সকল বিষয় লেখা নিষ্প্রয়োজন। তাই এই খানেই আমি এ বিষয়ের শেষ করলাম। মহাপুরুষের কীর্ত্তি-কলাপ সমাপ্ত করা ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষমতাধীন নয়।

শ্রীলীলাবতী।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু—

কলেকটার, কলিকাতা করপোরেশন।

(৭, কুন্ডু রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।)

একদিন শ্রদ্ধেয় গিরীন্দ্র দাদা (রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বলিলেন যে তাঁহার বাটীতে একটী ভদ্রলোক আসিবেন, আসিলে আমাকে খবর দিবেন। খবর পাইয়া প্রকাশ (শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ) ও আমি প্রত্যেকে দুইটী করিয়া বড় গাঁদা ফুল লইয়া গিরীন্দাদার বাটীতে যা এবং গেরুয়া-পরা ব্যাঘ্রচর্ম্মাসীন একটী মহাত্মাকে দেখিতে পাই। আমরা উভয়ে (প্রকাশ ও আমি) প্রত্যেকে দুইটি ফুল দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি কেবল আমাদের দিকে মধ্যে মধ্যে চাহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তথায় থাকিয়া যখন আমরা উঠিতে চাহিলাম, তখন দুইটি গাঁদা ফুল তুলিয়া তাহার দিকে কেবল মাত্র চাহিয়া ফুল দুইটি আমাদিগকে দিলেন। মহাপুরুষের ক্ষণমাত্র-দৃষ্টি নিক্ষেপে আমার গাঁদা ফুল হইতে তীব্র খসের গন্ধ ও প্রকাশের ফুল হইতে অতি মনোহর গোলাপের গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এইরূপ হওয়ায় প্রথমে মনে হইয়াছিল বোধ হয় আমরা hypnotised হইয়াছি, কিন্তু আমরা বাটীতে চলিয়া আসার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত এই দুইটি ফুলে উক্ত দুই রকম গন্ধ ছিল। আমার দুই ভ্রাতা, আমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পরিবারস্থ স্ত্রী লোকেরা, যাঁহারা এই সব কথা কিছুই জানিতেন না, তাঁহারা আমার ফুলে খসখসের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না। গাঁদা ফুলে খসখসের গন্ধ অনুভব করিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ ফুলটি আমার পকেটে ছিল, বাহিরের লোকেরা

—যাঁহারা আমাদের বাটিতে কোনরূপ কর্ম্মসূত্রে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও—সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে এত সুন্দর খসখসের গন্ধ আসিতেছে?" আমরা এই সব দেখিয়া ভক্তিভরে মহাপুরুষকে মনে মনে প্রণাম করিলাম, এবং hypnotised হওয়ার সন্দেহ করিবার দরুণ মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

যে দিন এই ঘটনা হয়, সেই দিনই আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করি এবং তৎক্ষণাৎ তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দীক্ষার দিন ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

দীক্ষার পর তাঁহার প্রতি আমি ক্রমেই অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলাম এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাইবার অবসর খুঁজিতাম। ক্রমে তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে আনিতে এবং অবস্থিতির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। এ প্রার্থনাও তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই।

প্রথম প্রথম আমরা শুধু নিকট হইতে গন্ধ পাইতাম, কিন্তু পরে আমরা তাঁহার যে সকল বিভূতি দেখিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম।

এক দিন যখন তিনি অন্যমনস্ক-ভাবে মাথা নাড়িতেছিলেন, তখন আমরা ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিলাম। শুনিয়া তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে তাঁহার মস্তকের সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ কপালের অভ্যন্তরে শিলা আছেন, তাহাই তিনি পূজা করেন। আমরা দেখিতে চাহিলে তিনি দেখাইতে সম্মত হইয়া বলিলেন,—"কল্য সকালে আহ্নিকের পর যখন ঘর হইতে বাহির হইব, তখন দেখিও।" পরদিন প্রাতে আমরা সকলে, তিনি আমাদের বাটীর যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় বসিয়া রহিলাম। তিনি ঘর হইতে বাহির জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সকলে সকালবেলা এক জায়গায় জমা হইয়াছ কেন?" আমরা প্রণাম করিয়া তাঁহার কপালের ভিতরের শিলা দেখিবার প্রার্থনা জানাইলাম। ইহা শুনিয়া, আমরা মুখে মাছি বসিলে তাহাকে তাড়াইবার জন্য যেরূপে হস্ত সঞ্চালন করি তিনি কেবল একবার সেইরূপ করিয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে যেমন হাত রাখিলেন, অমনি দুইটি শিলা মুখের ভিতর হইতে তাঁহার হস্তে আসিল।

তিনি পূর্ব্বে আমাদের বাটীর যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরের সম্মুখে তিনটি দরজা আছে। ঘর হইতে বাহির হইতে হইলে উক্ত কোন দরজা খুলিয়া বাহির হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। সেই দরজার সম্মুখে বারাণ্ডায় তিনটি জানালা ছিল। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি এই জানালাগুলির ঠিক উল্টা দিকে; অর্থাৎ জানালাগুলি মধ্যবর্ত্তী উঠানের পূর্ব্বদিকে ও সিঁড়িটি পশ্চিম দিকে। এই সিঁড়ির দরজায় বসিলে ঘরের দরজাগুলির জানালার ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যহই সকালে এই সিঁড়ির দরজায় বসিয়া থাকিতাম এবং দরজা খুলিলেই উপরে গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পিছু পিছু স্নানজল লইয়া নামিয়া আসিতাম।

একদিন প্রকাশ ও আমি দুইজনে ঐ সিঁড়ির দরজার উপর বসিয়া আছি। দুজনে বসিলে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কেহ দরজা দিয়া বাহির হইতে

পারে না, বাহির হইতে হইলে আমাদের উপর দিয়া তাহাকে যাইতে হইবে। অনেক বেলা হইল, তথাপি দরজা খোলা দেখিলাম না। 'আজ এখনও গুরুদেব দরজা খুলিলেন না কেন,' আমরা এইরূপ বলাবলি করিতেছি, এমন সময়ে আমার অগ্রজ, যিনি বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"বাবা নামিয়া আসিলেন, তোমরা সিঁড়িতে বসিয়া কি করিতেছ?" ইহাতে আমরা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম এবং তাড়াতাড়ি গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া স্নান জল আনিবার জন্য উপরে গিয়া দরজা ঠেলিতে লাগিলাম; দেখিলাম তিনটী দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ। ইহাতে অবাক্ হইয়া নামিয়া আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরুদেব বলিলেন,—"দরজা ভাল করিয়া ঠেলিলে দরজা খুলিয়া যাইবে।" ইহাতে পুনরায় আমরা যেমন দরজার নিকট আসিলাম, অমনি আমাদের চক্ষের উপরে মাঝের দরজাটী খুলিয়া গেল, আমাদের ঠেলিতেই হইল না। ঘরের ভিতর হইতে স্নান-জল আনিতে গিয়া দেখি, দুই পাশের দরজায় খিল দেওয়া, ঘরের ভিতর কেহই নাই, অথচ যে দরজা অনেক চেষ্টা করিয়া আমরা ঠেলিয়া খুলিতে পারি নাই, তাহা আপনা-আপনি খুলিয়া গেল।

একদিন গ্রীষ্মকালে শনিবার দিন অফিসে আসিবার সময় দেখি, যে পাখা চলা সত্ত্বেও গুরুদেবের কোল হইতে ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছে। সে দিন আমার পকেটে একখানি নূতন সিল্কের রুমাল ছিল। আমি সেই রুমালে কোলের ঘুম মুছাইয়া দিয়া রুমাল খানা পকেটে রাখিয়াছিলাম। অফিসে আসিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। এক ঘরে আমি এবং অপর দুইজন কর্ম্মচারী বসিয়া কাজ করিতাম। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহারা সুন্দর গন্ধে বিমোহিত হইলেন, এবং গন্ধের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া তাঁহারা এবং অফিসের অপর কয়েকজন বন্ধু কতকগুলি উৎকৃষ্ট ও সুবাসিত গোলাপ ফুল কতকগুলি গন্ধ-বিহীন ফুল লইয়া আমাদের বাটীতে আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতির পর গুরুদেব গন্ধবিহীন ফুলের গুচ্ছটী লইয়া তাহার প্রতিক্ষণেক চাহিবামাত্র সেই সকল ফুলের সুন্দর গন্ধ হইল এবং গোলাপের গন্ধ কোথায় চলিয়া গেল। গন্ধবিহীন পুষ্প-গুচ্ছের যে দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন কেবল সেই দিকেই গন্ধ হইল, অন্য দিকের ফুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রহিল। যাঁহারা ফুলগুলি আনিয়া ছিলেন, তাঁহারা ফুলগুলি লইয়া গেলেন। যতদিন পর্য্যন্ত ফুলগুলি শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায় নাই ততদিন পর্য্যন্ত ঐ গুলি সেই অবস্থাতেই ছিল।

পূর্ব্বে তিনি প্রতি বৎসরেই বড়দিনের সময় কলিকাতায় আসিতেন এবং প্রথম কয়েকদিন আমাদের বাটীতে থাকিতেন। পরে স্থানান্তরে গমন করিতেন। একবারে ঐ সময়ে আসিয়া কয়েকদিন এ বাটীতে অবস্থান করিয়া গুরুভাই শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে গমন করেন। ঐ বাটীতে তিন চারি দিন অবস্থান করিয়া জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে বর্দ্ধমান আশ্রমে গমন করেন। আমি অফিসে যাইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—"বোধ হয় হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া প্রণাম করা আমার ভাগ্যে আর

ঘটিবে না।" তাহাতে গুরুদেব বলেন,—"এইত প্রণাম করিলে, আবার ষ্টেসনে যাইবার প্রয়োজন কি?" যাহা হউক, আমি অফিসে যাইয়াই ষ্টেসনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু হাতের কাজ সারিয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। যখন আমি ১০নং প্ল্যাটফরমের গেটের নিকট উপস্থিত হইলাম অমনি ট্রেনটা ছাড়িয়া দিল,—অন্যান্য গুরুভাইরাও দুই এক মিনিটের মধ্যে ১০ নং প্ল্যাটফরম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ইহাতে আমার মনে অত্যন্ত হতাশ—ভাব আসিল। বোধ হয় এইরূপ হতাশ-ভাব আমার আর কখনও হয় নাই। কেবলই মনে হইতে লাগিল যে গুরুদেব বলেন যে,—"আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক". তবে কেন এমন হইল? আমি এত ব্যস্ত হইয়া অফিস হইতে চলিয়া আসিলাম, তিনি কি জানিতে পারিলেন না? ট্রেনটীকে দুই এক মিনিট ধরিয়া রাখিলেই ত আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিতাম। এইরূপ চিন্তায় মন বড়ই আন্দোলিত হইতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিলাম। যখন হাওড়ার পোলের প্রায় মাঝখানে আসিয়াছি, তখন দেখি নূতন চকচকে সাজে জোতা একটী বড় কুচকুচে কাল ঘোড়া লাফাইতে লাফাইতে কলিকতার দিক হইতে হাওড়ার দিকে আসিতেছে। আমার গাড়ী-ঘোড়ার বরাবরই সখ ছিল। ঘোড়াটিকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাহার চাল দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে সেই কাল রঙ্গের গাড়ীখানি, আমি যে গাড়ীতে ছিলাম, তাহার পার্শ্বে আসিয়া পড়িল। তখন দেখি অবিকল গুরুদেবের মত একব্যক্তি ঐ গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। আমি ত দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, গুরুদেবের সহিত এত সাদৃশ্যের কোন লোক পূর্ব্বে ত কখনও দেখি নাই। যতক্ষণ ঐ চকচকে কাল গাড়ীখানি দেখিতে পাইলাম, ততক্ষণই চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমাদের গাড়ী পোল হইতে নামিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। মাথা গুলাইয়া গেল, সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই কি তিনি আমাকে দেখা দিয়া গেলেন, না, আমি তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম বলিয়াই এরূপ দৃষ্টিভ্রম হইল। মন নানারূপ সন্দেহ দোলায় দুলিতে লাগিল, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক রবিবারে আমরা (অর্থাৎ আমি, গিরীন দা ও অপর ২।১ জন গুরুভাই) বর্দ্ধমান আশ্রমে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই। তাঁহার প্রসাদ গ্রহণান্তে বেলা প্রায় একটার সময় নানা কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বলিলাম,—"যে দিন আপনি বিধুবাবুর বাটী হইতে উঠিয়া বর্দ্ধমানে আসেন, সেই দিন আমি যদিও বলিয়াছিলাম যে বোধ হয় আমার ষ্টেসনে যাওয়া ঘটিবে না, তথাপি আমি হাওড়া ষ্টেসনে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। আমি যেমন ১০নং প্ল্যাটফর্ম্মের গেটে পঁহুছিলাম, অমনি গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিল।" তাহাতে গুরুদেব বলিলেন,—"কেন, তুমি, কি আমায় দেখ ন্যাই?" আমি বলিলাম,—"ট্রেন যে আমি গেটের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ছাড়িয়া দিল।" তখন গুরুদেব বলিলেন,—"আমাকে হাওড়ার পুলের উপর দেখ নাই?" এই কথা শুনিবামাত্র আমার

সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং 'হয়ত আমার দৃষ্টি ভ্রম হইয়াছে', এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। কি শুভক্ষণেই বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। গুরুদেব সেদিন যে কি কৃপাচক্ষে আমাকে দেখিয়াছিলেন তাহা আর কি বলিব। নিম্নলিখিত ঘটনাটী ইহার পরিচয় দিতেছে।

তিনি প্রথমে গীতার কথা পাড়িলেন, বলিলেন,—"যোগীরা একবার ইচ্ছা করিলে বহু হইয়া প্রত্যেকের নিকট থাকিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপিনীর নিকট থাকিতেন, কিন্তু প্রত্যেক গোপিনী মনে করিতেন যে শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহারই নিকট আছেন।" এইরূপ ভাবে কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিলে এখনই তোমার মত একজন মানুষ সৃজন করিতে পারি, জান?" আমি বলিলাম,—"করেন না কেন?" তাহাতে, তিনি বলিলেন,—"তাহার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিবে কে?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর তিনি বলিলেন,—"বিশ্বাস হইল না?" উত্তর করিলাম,—"বিশ্বাস হইল না বলিলেও প্রত্যবায়, আর বিশ্বাস হইল বলিলেও সম্পূর্ণ ভাবে সত্য কথা বলা হয় না।" ইহার পর তিনি যে বাঘছালের উপর বসিয়াছিলেন তাহা হইতে একটী লোম ছিঁড়িয়া লইলেন, আর পাশে "বসুমতী" কি "বঙ্গবাণী" এই নামের একখানি খবরের কাগজ পড়িয়াছিল, তাহা হইতে একটি কোন্ ছিঁড়িয়া লইয়া দুইটী অঙ্গুলির অগ্রভাগের মধ্যে ধরিয়া রগড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে নানা প্রকারের দ্রব্য তৈয়ার হইতে লাগিল,—যথা লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, বেলফুল। খাইবার জিনিষ তৈয়ার হইলেই খাইতে দিলেন, চিবাইয়া খাইলাম। ইহার পর আবার পূর্ব্ব প্রকারে অঙ্গুলির অগ্রভাগ রগড়াইতে রগড়াইতে একটী জিনিষ প্রস্তুত হইল, তিনি বলিলেন,—'মুটো করিয়া ধর!', সে জিনিষটী কি, বলিতে পারিলাম না,—কাল রং এবং তরল পদার্থ জমিয়া শক্ত হইবার পূর্ব্বে যেমন একটু থক্থকে হয় সেইরূপ!. হাত হইতে গড়াইয়া পড়িবার ভয়ে আমি হাত মুটো করিলাম। তাহাতে মনে হইল, গঙ্গার পলিপড়া মাটী লইয়া মুটো করিলে হাতে যেরূপ বোধ হয় সেইরূপ। তিনি বলিলেন,—"আমাকে দাও।" আমি তাঁহাকে দিলাম। তারপর কি হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দুইটী ঘুরাইতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণের পর বলিলেন,—"ধর।" এবারেও তিনি আগের বারের মত কিছু দিবেন, এই মনে করিয়া আমি সেই জিনিষটীকেও মুটো করিয়া ধরিলাম, কিন্তু সেবার দেখি একটী জীবন্ত প্রাণী হাতে আসিয়াছে,—একটী নেংটে ইঁদুর। আমি তাহাকে ফেলিয়া দিলে সে ঘরের বাহির হইয়া নর্দ্দমায় প্রবেশ করিল। এই ঘটনায় তখনই আমার মনে হইল যে, যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ইঁদুরের সৃষ্টি হইতে পারে, সেই ইচ্ছাশক্তির প্রখরতায় আমার মত মানুষের সৃষ্টি হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

যখন বণ্ডুলে ৺শিবরাত্রির উৎসব হইত, সেই সময়কার কথা লিখিতেছি।

ভবানীপুর হইতে আমরা (আমি, গিরীনদা, প্রকাশ ইত্যাদি) প্রায় প্রতি বৎসরেই উক্ত উৎসব উপলক্ষে বণ্ডুল যাইতাম—কখনও গুরুদেবের সঙ্গে যাইতাম, কখনও বা তাঁহার যাওয়ার পর যাইতাম। একবার গুরুদেব বলিলেন,—"আমি এবার ৺শিবরাত্রির সময় বণ্ডুল যাইব না, তখন আমি গড়বেতায় থাকিব। তোমরা বণ্ডুলে যাইয়া ৺শিবরাত্রির উৎসব ও ব্রতাদি সম্পন্ন করিবে।" আমরা বণ্ডুল যাইলাম। ৺শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ৺শিবপূজার নৈবেদ্যাদি সমস্ত আয়োজন করিয়া ফুল বিল্বপত্র চন্দনাদি ও কোশা কুশি যথাস্থানে সাজাইয়া গাঁজা সাজিয়া কলিকাতে আগুন রাখিয়া মন্দিরের দুই দিকের দুইটী দরজা, একটি ভিতর হইতে এবং একটি বাহির হইতে, বন্ধ করিয়া দিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ বারেণ্ডায় বসিয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে একটি সুগন্ধ (যাহা গুরুদেবের গাত্র হইতে বাহির হয়) আমরা সকলেই পাইলাম, আমরা সকলে তখন বুঝিলাম যে এইবার পূজা আরম্ভ হইবে। বাহির হইতে ঘরের ভিতরে কোশাকুশি নাড়ার শব্দ পাইতে লাগিলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে সদ্য-সাজা গাঁজায় দম দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলে যেরূপ গন্ধ বাহির হয় সেইরূপ গন্ধ পাইলাম। তখন বুঝিলাম পূজা সাঙ্গ হইয়াছে। ঘরের ভিতর যাইয়া দেখা গেল, কোশা-কুশি ফুলের থালা প্রভৃতি যেখানে যাহা রাখা হইয়াছিল, তাহা কোনটা বাঁকাভাবে কোনটা স্থানচ্যুত হইয়া রহিয়াছে।

একবার বণ্ডুলে ৺শিব-রাত্রি উপলক্ষে অনেকে আসিলে কিছু আঙ্গুরের প্রয়োজন হয়। গুরুদেব বলিলেন,—"আঙ্গুরের জন্য ভাবনা কিসের? যাওনা ঐ দিকে, দেখিবে কত আঙ্গুর ফলিয়া রহিয়াছে।" যে দিকে দেখিতে বলিলেন, সেদিকে কেবল ভেরেণ্ডা বন। কিন্তু সেই ভেরেণ্ডা বনেই দেখা গেল যথেষ্ট আঙ্গুর ফলিয়া রহিয়াছে। আমরা সকলেই আনন্দের সহিত সেই আঙ্গুর নিয়া আসিলাম।

বণ্ডুলে গুরুদেবের কন্যার ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হয়। এই বিবাহ-উপলক্ষে লোক সংখ্যা যাহা হইবার কথা ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গিরীন্দ্রবাবু বিবাহের অনেক বন্দোবস্তের ভার লইয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে নির্দ্ধারিত লোক সংখ্যার প্রায় দশগুণ লোক হইয়াছে, তখন সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। গুরুদেব বলিলেন,—"বিচলিত হইও না। বিচলিত হইবার কিছুই নাই। পাতা করিয়া দাও।" পাতা করা হইল, কতকগুলি পাতে আহার্য্য দ্রব্যাদি দিবার পরই আয়োজন যাহা হইয়াছিল, সব ফুরাইয়া গেল। গুরুদেব বলিলেন,—"আমি ভাণ্ডার গৃহে যাইতেছি, আমার সঙ্গে কেহ আসিও না। আমি চলিয়া আসিলে পর তোমরা ভাণ্ডারে যাইও এবং খাদ্য-সামগ্রী যে-সব পাত্রে রাখা হইয়াছে, সেই সব পাত্রের দিকে না চাহিয়া যে জিনিসের দরকার সেই জিনিসের পাত্রের মধ্যে কেবল হাত দিয়া জিনিস লইবে।" ইহাতে এত জিনিস লাগিল যে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তির পরিতোষের সহিত আহারের পরও

প্রচুর লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী উদ্বৃত্ত হইল। গিরীন্দ্র বাবু তখন বলিলেন,—"আর খাদ্য সামগ্রীর ত কোন প্রয়োজন নাই, মিছামিছি নষ্ট করিয়া কি হইবে?" তখন আবার লুচির কড়া, তরকারীর গামলা ও মিষ্টান্নের পাত্রাদি শূন্য হইয়া গেল। এই অভাবনীয় ঘটনায় সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

একবার বণ্ডুলে গুরুদেবের সহিত অনেক শিষ্য ৺শিবরাত্রি উপলক্ষে আসেন। সেবারে সকলেই ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আসেন। প্রথম গাড়ীতে গুরুদেব ছিলেন এবং পরে তাঁহার শিষ্যেরা আসিতেছিলেন। গাড়ীর ছাদের উপর ময়দার বস্তা, চিনির বস্তা প্রভৃতি অন্যান্য সামগ্রী ছিল। গুরুদেব তখন ঘন-ঘন তামাক খাইতেন। অনেকদূর আসার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং অবিলম্বে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা হইল। তখন সর্ব্বপ্রথম গাড়ীখানি, অর্থাৎ যে গাড়ীতে গুরুদেব ছিলেন সেই গাড়ীখানি থামিল। তদনুসারে পর পর সব গাড়ীগুলিই থামিয়া গেল। হঠাৎ কেন থামিল, জানিবার জন্য আরোহিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। যখন তাঁহারা গুরুদেবের গাড়ীর নিকট আসিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন গাড়ী হইতে কেবল ধূম নির্গত হইতেছে,—গুরুদেব আকাশস্থ মেঘ টানিয়া লইয়া মুখ দিয়া ধূমরূপে নির্গত করিয়া দিতেছেন। বলা বাহুল্য, যতক্ষণ বণ্ডুলের পথে গাড়ী ছিল, আদৌ বৃষ্টি হয় নাই। বণ্ডুল আশ্রমে অনেকেই নানারকম দেখিয়াছেন, আমিও অনেক দেখিয়াছি, সব ঘটনা মনে নাই। মহাপুরুষের সকল কার্য্যই অলৌকিক এবং গুরুদেবের এই সকল অলৌকিক ঘটনার ইয়ত্তা নাই। আমি কেবল কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

একদিন বিলাতী বড় ঘরের কয়েকটী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা একজন দ্বিভাষী সঙ্গে লইয়া গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বাঙালী ভদ্রলোকের পরামর্শে তাঁহারা কলাপাতে আগা গোড়া মুড়িয়া এক ছড়া ফুলের মালা লইয়া আসেন, মালাটি কলা পাতে এমন ভাবে মোড়া ছিল যে বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। তাঁহারা জুতা খুলিয়া আশ্রমের মেঝেতে বসিলে গুরুদেব কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাতায় মোড়া জিনিষটি কি? চাঁপা ফুলের মালা বুঝি।" সাহেব মেমেরা দ্বিভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাত্মা কি বলিলেন?" দ্বিভাষী বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"What is Champak flower?" দ্বিভাষী বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা বলিলেন,—"আমরা অনেক সময় অনেক কথা এই সব মহাত্মাদের শুনি। কিন্তু আমরা ত সুগন্ধি ছোট সাদা ফুলের মালা আনিয়াছি, তবে মহাত্মা অন্য ফুলের মালার কথা বলিলেন কেন? We have brought a garland of jasmine and why does the Mahatma say differently?" যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, তখন গুরুদেব বলিলেন, —"পাতা-মোড়া মালা ছড়াটি কেন আনা হইয়াছে?" দ্বিভাষী বলিলেন,—"আপনার জন্য ইহা আনা হইয়াছে।" তখন গুরুদেব বলিলেন,—"আমার জন্য যদি আনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে দেওয়া হউক।" তখন

মালা বাহির করিবার জন্য কলাপাতের আবরণ খোলা হইল। কলা পাতা খুলিতে খুলিতে মালা ছড়াটির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়ে। তখন দেখা গেল যে মালার ফুলগুলির রং ও আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিলাতী মেয়েরা অতীব বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"Look, look, the whole thing is changing colour, and the petals are getting elongated." তাঁহারা এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে গুরুদেবের প্রসাদ খাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হন। অতঃপর তাঁহারা কম্বলের আসনে বসিয়া কলাপাতায় বর্দ্ধমানের মিহিদানা খাইয়া গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

বর্দ্ধমানে একবার তিনি ডাক্তার ডাকিয়া তাঁহার কাঁচা কসের দাঁত তুলাইয়াছিলেন। তাহাতে অজস্র রক্তস্রাব হইয়াছিল, উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী এই অভাবনীয় ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কতকক্ষণ রক্তস্রাবের পর তিনি উঠিয়া গেলেন এবং পরে স্বাভাবিক অবস্থা লইয়া উপর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায়, যেন কিছুই হয় নাই, এইভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। ইহাতে উপস্থিত শিষ্যগণ সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপে রক্তমোক্ষণ করিলেন কেন?" উত্তরে তিনি পশ্চিমের একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ পড়িলেন,—"তোমার কয়েকটি শিষ্যের মরণাপন্ন পীড়া; তাঁহাদের প্রাণদান করিতে হইলে তোমার শরীর হইতে রক্ত মোক্ষণ আবশ্যক।"

এই সঙ্গে একটী আধুনিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইল। এক দিন দিবাভাগের দ্বিপ্রহরে গুরুদেব তাঁহার পুত্রকে একখানি নূতন ছুরি দিতে বলিলেন। তাঁহার পুত্র নূতন (কাহারও ব্যবহৃত নয়) ছুরির পরিবর্ত্তে একখানি ক্ষুর দিলেন। এই ক্ষুর দিয়া তিনি তাঁহার ডান হাতের ভিতর পিঠ খানিকটা চিরিয়া ফেলিলেন এবং কতকটা রক্ত বাহির করিয়া দিলেন। সকলে হতভম্ব হইল। তিনি বলিলেন,—"আজ উদ্ধবের মৃত্যুযোগ ছিল, এরূপ না করিলে উদ্ধবের মাথা হইতে রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু হইত।" উদ্ধব গুরুদেবের একজন পরম ভক্ত (রায় বাহাদুর উদ্ধব চন্দ্র সিংহ-ঝালদার রাজা)। এই ঘটনার সপ্তাহে রবিবার যখন আমি বর্দ্ধমানে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই, তখন তিনি রাজা উদ্ধবের একখানি পত্র পড়িতে দিলেন। এই পত্রের মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

ঘটনার দিন রাজা মোটর বাইকে পুরুলিয়া হইতে ঝালদায় আসিতেছিলেন। পথের মধ্যে বাইকের ব্রেক বিকল হইয়া যায়। বেলা হওয়ায় বাইক খুব জোরে আসিতেছিল। ব্রেক বিকল হইবার ফলে তিনি গাড়ী হইতে সজোরে দূরে নিক্ষিপ্ত হন এবং তাঁহার মস্তক নিকটস্থ পাহাড়ে সজোরে আহত হয়। ইহতে তিনি যেমন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িবার মত হইলেন, অমনি গুরুদেব তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। গুরুদেবের ক্ষুর দিয়া হাত চিড়িবার সময় ও তারিখ এবং এই পত্রোল্লিখিত ঘটনার সময় ও তারিখ একই।

একবার তিনি ৺কাশীধাম হইতে বর্দ্ধমানে আসিবার পর আমি তাঁহাকে তথা হইতে ভবানীপুর ৭নং কুণ্ডু রোডে আনিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাই। ভূতপূর্ব্ব পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব সবজজ) মহাশয় গুরুদেবের সহিত ৺কাশী আশ্রম হইতে বর্দ্ধমানে আসেন। গুরুদেব বলিলেন,—"৺কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে বণ্ডুলে গিয়েছিলাম। মায়ের দেহ রাখিতে আর বেশী দিন বাকী নাই। অদ্য তোমার বাটী যাইলে, দিন আঠার তথায় থাকা হইবে।" পরে ভোগের পর তিনি বলিলেন,—"একবার বণ্ডুলে মায়ের খবর লইয়া আসি, তোমরা আহার কর।" এই বলিয়া তিনি আশ্রমের দ্বিতলে গেলেন, আমিও প্রসাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে স্থানে আহার করিতেছিলাম, তথা হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি দেখা যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি কাপড় পরিয়া ভবানীপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উপর হইতে নামিলেন এবং বলিলেন,—আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত, তুমি তৈয়ার হও।" আমি তাড়াতাড়ি আহার সমাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বন্ডুলের খবর কি পাইয়াছেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"বন্ডুলে গিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি" (বন্ডুল বর্দ্ধমান হইতে গাড়ীতে গেলেও প্রায় তিন ঘণ্টার পথ)। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত গিরীন দাদার ও হরগোবিন্দ দাদার পক্ষে ঐ দিন আসিবার কিছু অসুবিধা হওয়ায়, আমি একাকী ভবানীপুরে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহার দুইদিন পরে উঁহারা গুরুদেবকে ৭নং কুণ্ডু রোডস্থ বাটীতে লইয়া আসিলেন। তথায় পনর দিন অবস্থানান্তর তিনি মাতার মৃত্যুর জন্য ভবানীপুরের বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমাদের বাটীর সকলে আমাকে অফিসে খবর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সকলকেই নিরস্ত করিলেন। সুতরাং তাঁহার গমন সংবাদ আমি পাইলাম না, এবং অফিস হইতে ফিরিয়া যখন সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমাকে খবর দেওয়া হইল না কেন, সকলেই একবাক্যে বলিল,—"গুরুদেব খবর দিতে দিলেন না।" আমি তখন বুঝিলাম, তাঁহার গমনের সময় আমারই মনে রাখা উচিত ছিল এবং আমারই সময় মত 'বাটীতে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে একদিন রাত্রি এগারটার সময় সংসারিক হিসাব-পত্র দেখা শুনা করিয়া যেমন আমার পিছন দিকে অবস্থিত তাঁহার ফটোগ্রাফকে প্রণাম করিবার জন্য মুখ ফিরাইলাম, অমনি দেখি গুরুদেব কাছা গলায় দেওয়া অবস্থায় সশরীরে তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, কিন্তু পদ-ধূলি লইবার অগ্রেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

৺পুরীর আশ্রমের কয়েকটি ঘটনা যাহা আমার মনে পড়িতেছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই আশ্রমটি কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় সে বৎসর আমরা অনেকেই ৺পুরী ধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে একদিন ক্ষেত্র দাদার হঠাৎ অত্যন্ত জ্বর হয় এবং

তাহাতে তিনি কয়েক দিন ভোগেন। একদিন বৈকালে ক্ষেত্র দাদার জ্বর সম্বন্ধে কথা উঠে। কিন্তু thermometer কাহারও নিকট নাই, কিরূপে জ্বরের তাপমান নির্ণয় হইবে? এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে গুরুদেব অঙ্গুলি দ্বারা একটি জানালা দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখত, ঐ জানালায় একটি thermometer আছে কিনা?" জানালার নিকট যাইবামাত্র সত্যই দেখা গেল বটকৃষ্ণ পালের একটি আধ মিনিটের থারমোমিটার রহিয়াছে। জ্বর দেখা হইল। পরে তিনি বলিলেন,—"যেখান হইতে thermometer পাইয়াছ, আবার তথায় রাখিয়া আসিও।" অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল থারমোমিটর আর নাই। জিজ্ঞাসায় বলিলেন,—"বটকৃষ্ণ পালের আলমারির ভিতর হইতে উহা আসিয়াছিল, পুনরায় তথায় চলিয়া গিয়াছে।"

ঐ বৎসরই একদিন গুরুদেব বলিলেন,—"চল, আজ সমুদ্রে স্নান করা যাক।" আমরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সমুদ্র তীরে যাইলাম। তথায় যাইয়া তিনি বলিলেন,—"সমুদ্র দর্শন এক রকম অনন্ত দর্শন।" বলিয়া জলে অবগাহন করিয়া বলিলেন,—"ডুব দিয়া তোমরা একটু জপ করিয়া লও।" আমরা ডুব দিলাম বটে, কিন্তু উত্তাল তরঙ্গে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। গুরুদেব পিছন ফিরিয়াই বলিলেন,—"কি, দাঁড়াইতে পারিতেছ না?" এই বলিয়া তিনি হস্ত সঞ্চালন দ্বারা একটি গণ্ডী দিলেন—আমরা তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া জপ করিতে লাগিলাম, আশে পাশে চতুর্দ্দিকে উত্তাল তরঙ্গ রাজি ধাবমান, কিন্তু গণ্ডীর ভিতর কিছুই নাই। আমরা যেন একটি নির্ব্বাত নিষ্কম্প পুষ্করিণীর মধ্যে দাঁড়াইয়া জপ করিতে লাগিলাম।

গুরুদেব শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মন্দিরে যাইতাম। কিন্তু অনেক সময় দেখিতাম, যেন তিনি আমাদের অগ্রে চলিতেছেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার গাত্রের স্বাভাবিক সুগন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইত।

৺পুরী আশ্রমের চিরস্মরণীয় শ্রেষ্ঠ ঘটনাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশ্রমের দ্বিতলের বারান্দায় একটি তক্তাপোষ পাতা থাকে, তাহার উপর কম্বল ও চাদর বিছানা থাকে। গুরুদেব ক্রিয়ার পর ত্রিতল হইতে নামিয়া দ্বিতলে আসিয়া উক্ত তক্তাপোষে বসেন এবং শিষ্যেরা মেঝের উপর মাদুরে বসেন। একদিন শ্রীগুরুদেবের ক্রিয়ান্তে ত্রিতল হইতে নামিবার পূর্ব্বে দ্বিতলের বারাণ্ডাস্থিত তক্তাপোষের উপর একখানি নূতন চাদর বিছাইয়া দিয়া তাঁহার অবতরণ প্রতীক্ষায় পূর্ব্বোক্ত গিরীন্দ্র দাদা, অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত রায় এবং গুরুদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত দয়ানিধি দাস দ্বিতল হইতে নিম্নতলে যে সিঁড়ি গিয়াছে, সেই সিঁড়িতে নিম্নদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা গুরুদেবের উপরের ঘরের দরজার খিল খোলার শব্দ শুনিতে পাইলেন। গুরুদেব এইবার ত্রিতল হইতে নামিতেছেন জানিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য যেমন উঁহারা মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন যে কম্বল চাদরের উপর একটি ছোট শিশুর দুইটি পদ-চিহ্ন পড়িয়াছে এবং তাহার উপর

বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় বা তদপেক্ষাও উজ্জ্বল আলোক ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। আশ্রমের একতল হইতে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি এত অপ্রশস্ত যে সিঁড়ির উপরি ভাগে দুইজনে বসিয়া থাকিলে কেহ উপরে উঠিতে পারে না। এই পদচিহ্ন দেখিয়া উপস্থিত সকলে প্রায় আত্মহারা হইবার মত হইয়াছেন, এমন সময় গুরুদেব নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উপস্থিত শিষ্যগণ সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা কি অলৌকিক ব্যাপার ?" তাহাতে গুরুদেব বলিলেন,—"ক্রিয়া ও পাঠ শেষ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় অতর্কিত ভাবে আমার মুখে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্‌' এই কথা বাহির হওয়ায় শ্রীশ্রী৺ভগবান স্বয়ং আসিয়া এই পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।" জীবন চরিতের প্রথম ভাগে এই পদচিহ্নের উল্লেখ আছে। এই পদচিহ্ন ৭নং কুন্ডু রোডে অনেকদিন অবস্থিত ছিলেন এবং সম্প্রতি ৺কাশীর আশ্রমে বিশুদ্ধানন্দ কাননে অবস্থিতি করিতেছেন। এই পদচিহ্ন যতদিন পর্য্যন্ত কুন্ডু রোডে ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা সকলেই ইঁহার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রায় ইণ্টারের সময় গুরুদেব ৺পুরী আশ্রমে যাইতেন এবং শ্রাবণের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া পরে ভবানীপুরে আসিতেন। প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে একবার আমিও ছুটি লইয়া তাঁহার সঙ্গে ৺পুরীতে ছিলাম। আষাঢ় মাসের প্রায় শেষদিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি যে সময় সচরাচর কলিকাতায় যান এবারেও কি সেই সময় যাইবেন ?" তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?" আমি বলিলাম,—"আমার ছুটি ফুরাইতে আর অল্পদিন বাকী আছে, আমাকে তিন চার দিনের মধ্যেই কলিকাতা ফিরিতে হইবে।" গুরুদেব বলিলেন,—"তোমার কি ছুটি পাওনা নাই ?" আমি বলিলাম,—"ছুটি পাওনা আছে বটে, কিন্তু ছুটি লওয়া হয় নাই।" তাহাতে গুরুদেব বলিলেন,—"আর দিন আষ্টেক ছুটির কথা লিখিয়া দাও, তাহা হইলে একসঙ্গেই যাওয়া যাইবে।" তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমি ছুটির দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইবার জন্য মালীকে ডাকিতেছি, এমন সময় তিনি আবার বলিলেন,—"ডাকে চিঠি দিবার জন্য মালিকে ডাকিতেছ ? চিঠি ছিঁড়িয়া ফেল, আমি আজই যাইব। গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আইস।" জমিদার শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ ও অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় তখন ৺পুরীতে ছিলেন। আমি তখন চারিটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করিয়া আসিলাম এবং ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় আমরা (অর্থাৎ গুরুদেব, প্রকাশ, কামাখ্যাদাদা ও আমি) Puri Express-এ কলিকাতা ফিরিলাম। পহেলা শ্রাবণ বেলা বারটার সময় পরমারাধ্য গুরুদেব বলিলেন,—"কেন যে হঠাৎ চলিয়া আসিলাম বুঝিতে পেরেছ ?" আমি বলিলাম,—"না।" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"কল্য এমন সময় জানিতে পারিবে।" পরদিন অর্থাৎ দোসরা শ্রাবণ বেলা বারটার সময় আমার বৈবাহিক (পুত্রের শ্বশুর) ডাঃ যতীশচন্দ্র মুস্তফী আমাদের বাটীতে আসেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"গুরুদেব আসিয়াছেন কি ?" আমার

মুখে গুরুদেবের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"চলুন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসি। আমি তখনও আমার বৈবাহিকের আসিবার কারণ কিছুই জানি না। মনে করিলাম তিনি বুঝি কেবল গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আমার বৈবাহিক বলিলেন,—"একটি শুভ সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি ঐ সংবাদটি চিঠি দ্বারা জ্ঞাপন করিতে পারিতাম, কিন্তু আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া নিজেই সংবাদটি আপনাকে দিতে আসিয়াছি। সংবাদটি এই—গতকল্য পহলা শ্রাবণ আমার একটি নাতি হইয়াছে।" গুরুদেব বলিলেন,—"কখন হইল ?" তাহাতে আমার বৈবাহিক যে সময় বলিলেন গুরুদেবের সময়ের সহিত সে সময়ের একটু পার্থক্য হইল। গুরুদেব বলিলেন,—"ঘড়ি কি ঠিক সময় দিতেছিল ?" আমার বৈবাহিক বলিলেন,—"ঘড়িটি মিলাইয়া রাখিয়াছিলাম।" তাহাতে গুরুদেব তাঁহার বসিবার ঘর হইতে উঠিয়া গিয়া তাঁহার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং একখানি কাগজ হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"এই নিন আপনার নাতির কোষ্ঠী। এই সন্তান যে দিন গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দিনই আমি ইহার কোষ্ঠী করিয়া রাখিয়াছি। 'সৌভাগ্যশালী ও মেধাবী'—ইহাই এই সন্তানের কোষ্ঠীর ফল।" পরে আমায় বলিলেন,—"যোগেশ, তুমি যখন সে দিন মালীকে ডাকিতেছিলে তখনই আমার মনে হইল আগামীকল্য পহলা শ্রাবণ বৌমা প্রসব করিবেন। একে বৌমা রোগা, তাহাতে প্রথমবার প্রসব করিবেন, কষ্ট পাইবেন—সেই জন্য চলিয়া আসিলাম। ইচ্ছা হইল, আমি এমন একটা কার্য্য করিব যাহাতে বৌমা প্রসব-বেদনা বিশেষ অনুভব করিবেন না। এ কার্য্য আমি পুরী হইতেও করিতে পারিতাম ; কিন্তু যখন কয়েকদিন পরেই কলিকাতাতে আসিব তখন আর দেরী করিয়া লাভ কী ? এই জন্য তোমাকে চিঠি ছিঁড়িতে বলিয়া গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া ত আমার বৈবাহিক মহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি নিজে ডাক্তার, তাহাতে দুর্বল মেয়ে, প্রথমবার প্রসব করিবে, যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না পায়, তাহার জন্য ডাক্তার ধাই-এর বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়া সন্ধ্যার খানিক পরে মা আমার 'পেটটা কেমন করছে' এই বলিতে বলিতে একটি ঘরের মেঝের শুইয়া পড়িল, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল।" এই পুত্রটিই আমার বড় নাতি—ডাক নাম গরু, ভাল নাম শ্রীমান জগদীশ চন্দ্র বসু।

একদিন ৺পুরী আশ্রমের বাগানে বালির উপর ছোটো সরু লতা পড়িয়াছিল, এই লতাটীর দুই পাশে কয়েকটি ছোট তরমুজ ধরিয়াছিল। গুরুদেব বলিলেন,—"এই লতাটির একদিকে তরমুজ হইবে এবং অপরদিকে খরমুজা হইবে।" বাস্তবিকই তাহাই হইয়াছিল।

৺পুরী আশ্রমে একদিন সৈনিক বিভাগের একজন বড় কর্ম্মচারী—Captain Hunter, যিনি তখন সেনা বিভাগের। কার্য্য লইয়া ৺পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন—গুরুদেবের কথা শুনিয়া একদিন তাঁহার নিকট আসেন

এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি সুবিধা পাইলেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিতেন। গুরুদেব সূর্য্যবিজ্ঞানের দ্বারা পদার্থের রূপান্তর করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেন। একদিন কতকটা তুলাকে সূর্য্যবিজ্ঞানের দ্বারা একটি কর্পূরের কেকে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি অপরের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক হইলেও গুরুদেবের পক্ষে অতি তুচ্ছ ঘটনা এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নহে।

একবার আমার ৺পুরীর আশ্রমে অবস্থানকালীন আমেরিকা হইতে দুইটি খ্যাতনামা বিশিষ্ট লোক পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে আসেন। একজনের নাম Sir Thomas Lowell—তিনি একজন আমেরিকার বিজ্ঞানের অধ্যাপক; এবং অপরের নাম Major Brown, তাঁহারা গুরুদেবের নিকট বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা ছিলেন এবং ইহাতেই এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার ফটোগ্রাফ লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে The Times of India কাগজে একটি প্রবন্ধ বাহির করেন।

৺কাশীর আশ্রমে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তথাকার গুরুভাইয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। এত আশ্চর্য্য ঘটনা বোধ হয় আর কোন স্থানে ঘটে নাই। একদিন ৺কাশীধামের হনুমান ঘাটস্থ আশ্রমে গুরুদেবের নিকটে একটী 'প্ল্যানচেট' লইয়া কয়েকটী গুরুভাই প্রশ্ন গণনা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করায় গুরুদেব বলেন,—"প্রশ্নগণনা কাহাকে বলে, দেখিবে?" এই বলিয়া তিনি কয়েকজনকে অন্য একটী ঘরে যাইয়া প্রশ্ন লিখিতে বলেন। আমরা ৫।৬ জন একটী সাদা চিঠির কাগজে আমাদের প্রত্যেকে দুইটী করিয়া প্রশ্ন লিখিয়া কাগজটী মুড়িয়া যত ছোট করিতে পারা যায় ছোট করিয়া গুরুদেব যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে আসিলাম। গুরুদেব ভিক্ষু বাবুকে বলিলেন,—"একটি ছোট খুড়িতে চারি খানি টিকা ধরাইয়া লইয়া আইস।" ভিক্ষু বাবু তাহা করিলে গুরুদেব বলিলেন,—"দুইখানি টিকা খুড়ি হইতে তুলিয়া লও।" টিকা তুলিয়া লওয়া হইল। পরে ঐ দুইখানি জলন্ত টিকার উপর সেই কাগজের টুকরাটি রাখা হইল এবং তাহার উপর আর দুইখানি জ্বলন্ত টিকা চাপা দেওয়া হইল। তারপর গুরুদেব বলিলেন,—"তোমাদের প্রশ্নগুলি জ্ঞানগঞ্জে চলিয়া গিয়াছে।" বেলা ১১টা বা ১২টার সময় আমাদের প্রশ্নযুক্ত কাগজখানি আগুনে চাপা দেওয়া হইল; এবং তিন ঘণ্টা পরে গুরুদেব বলিলেন,—"জ্ঞানগঞ্জ হইতে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আসিয়াছে।" এই বলিয়া তুলট কাগজে লাল কালিতে লেখা আমাদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া প্রশ্ন ও তাহার উত্তর আমাদিগকে দিলেন। ভিক্ষু বাবুর একটি প্রশ্ন ছিল,—'রাখালের শত্রু কবে নিপাত হইবে?" এই প্রশ্নটি উক্ত কাগজে লিখিয়া উত্তর আসিয়াছিল—"ভিক্ষু এরূপ হিংসাবৃত্তিযুক্ত প্রশ্ন না করিয়া যদি ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব প্রার্থনা করিত তাহা হইলে সে তাহাই পাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া সে এরূপ প্রশ্ন করিল কেন? ইহাতে ভিক্ষুর যাহা কিছু পুণ্য-সঞ্চয় হইয়াছিল তাহার ক্ষয় হইল।"

উক্ত পুরাতন আশ্রমের অপর একদিনের ঘটনা এই:—একদিন সকালে বেলা ৯টা আন্দাজ ভিক্ষু বাবু ও দাশু বাবু (একটি স্থানীয় ভদ্রলোক)

দুইটি বড় ফুলকপি বাজার হইতে কিনিয়া আশ্রমে আসিতেছিলেন। আশ্রমের ত্রিতল গৃহে, গুরুদেব থাকিতেন। যে বড় রাস্তা হইতে আশ্রমের গলিতে প্রবেশ করিতে হয়, তথা হইতে উহা দেখা যায়। গলির ভিতর আশ্রমের সম্মুখস্থ একটি বাটিতে কয়েকটি তৈলঙ্গী স্ত্রীলোক বাস করিতেন। ভিক্ষু বাবু ও দাশু বাবু গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র শুনিতে পাইলেন যে তৈলঙ্গী স্ত্রীলোকেরা বলিতেছে,—"সাধু বাবাকা ক্যা তাজ্জব, সাধু বাবাকা ক্যা তাজ্জব।" ইহা শুনিবা মাত্র তাঁহারা উভয়ে আশ্রমের ত্রিতল গৃহের ছাদের উপর চাহিয়া দেখেন যে ছাদের উপর একটি ছোট মেঘ আসিয়া নামিতেছে। তাহার পর তাঁহারা দেখিলেন যে অন্তরাল হইতে গুরুদেব ছাদে নামিলেন এবং দীর্ঘাকার ধারণ করিয়া আশ্রমের কার্ণিশে পা লাগাইয়া ঝুলিয়া ঘরের ঘেঁস ঘেঁস গরাদে দেওয়া জানালায় মাথা ঠেকাইলেন এবং তাহার পর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ভিক্ষু বাবু ও দাশু বাবু আশ্রমে আসিবামাত্র যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্ণনা করেন। গুরুদেব তখন পূজার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হয়েন নাই। কিছুক্ষণ পরে তিনি দরজা খুলিয়া ঘরের বাহির হইলে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি ঘরের ভিতর ছিলেন এবং ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে?" তাহাতে ভিক্ষু বাবু ও দাশু বাবু যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বলিতে লাগিলেন। তখন গুরুদেব বলিলেন,—"দেখে ফেলেছ? আমার আজ বাহির হইতে দেরী হইয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি বলিলেন,—"অর্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি আশ্রমস্থ ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমে গিয়াছিলাম "ঝালদা", তৎপরে বর্দ্ধমান আশ্রম, তৎপরে খিদপুর, এবং তথা হইতে ভবানীপুরে যোগেশদের বাটী হইয়া আবার ৺কাশী ফিরিয়া আসি"। এই ঘটনা ৺শারদীয়া পূজার কয়েক দিবস পরে ঘটিয়াছিল। ৺পূজার ছুটির সহিত কয়েকদিন ছুটি লইয়া আমরা তখন ৺কাশীতে ছিলাম।

আমাদের ভবানীপুরের সম্মুখের দ্বিতলের ঘরগুলি তখন গুরুদেবের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইতেছিল, বড়দিনের সময় তাঁহাকে ঐ ঘরগুলিতে থাকিবার জন্য আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে যখন আমি কলিকাতা হইতে ৺কাশী যাই তখন দেখিয়া আসিয়াছিলাম যে আমার কন্ট্রাক্টর ঘরে কড়ি তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। কিন্তু পনর দিন পরে, যে দিন উক্ত ঘটনা ঘটে সেই দিন, গুরুদেব বলিলেন,—"তুমি আমাকে বড়দিনের সময় নূতন ঘরে থাকিবার কথা বলিতেছ; কিন্তু এখনও যে তোমার ঘরের কড়ি উঠে নাই।" ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ৺কাশী হইতে গোমো যাইবে, না ভবানীপুর হইয়া গোমো যাইবে?" সেই বৎসরই ৺কাশী হইতে আমার গোমো যাইবার কথা ছিল। আমি ভবানীপুর হইয়া যাইব শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"ভবানীপুরে যাইয়া বাটীর অবস্থা দেখিয়া আমাকে পত্র দিও।" খিদরপুর সম্বন্ধে গুরুদেব অপর শিষ্য বাবু (এক্ষণে ৺) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকিলকে বলিলেন,—"সতীশ, তোমাদের বাড়ী যাইয়া দেখি যে তোমার স্ত্রী ও ছেলে-

পুত্রেরা ৺বিজয়াদশমীর দিন তোমার মাকে প্রণাম করিতে যাইয়া অর্থাৎ খিদিরপুরে রহিয়াছে।” সতীশ বাবুর স্ত্রী অধিকাংশ সময়ই তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিতেন। উক্ত সময়ে সতীশ বাবুর বাটীর ভাঙ্গাগড়া হইতেছিল। সুতরাং তাঁহাদের খিদিরপুরে থাকার সম্ভাবনা কম ছিল। যাহা হউক, সে দিন সতীশ দাদা তাঁহার শ্বশুর বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতা অখিল মিস্ত্রীর লেনে পত্র লেখেন. এবং উত্তরে তিনি লেখেন যে—তাঁহার কন্যা কালী ছেলে-পুলে লইয়া বিজয়া দশমীর দিন হইতে খিদিরপুরের বাটীতে আছে এবং ভাল আছে। এই ঘটনার দিনই তিনি ভিক্ষু বাবুকে বলিলেন,—“ঝালদায় উদ্ধবকে পত্র লিখ।” (রাজা উদ্ধবচন্দ্র সিংহ গুরুদেবের শিষ্য।) গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, ভিক্ষু বাবু লিখিতে লাগিলেন। পত্রের মর্ম্ম—“উদ্ধব, গতবারে যখন আমি ঝালদার আশ্রমে গিয়াছিলাম, তখন আমি তোমাকে ব্যাঘ্র শিকার করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য সকালে আমি ঝালদায় যাইয়া দেখি, তুমি একটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছ। এখনও তুমি যদি ব্যাঘ্র শিকারে প্রবৃত্ত থাক তাহা হইলে ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তি কবে লোপ পাইবে? ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তি লোপ না পাইলে সাধারণ শিষ্যের পক্ষে ঝালদা আশ্রমে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িবে” ইত্যাদি। পত্রের উত্তরে ঝালদার রাজা ব্যাঘ্র শিকার করিতে কি প্রকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া অপরাধের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়াছিলেন।

গুরুদেবের আদেশমত বর্দ্ধমান আশ্রমে তাঁহার শিষ্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে ভিক্ষু বাবু একদিন পত্র লিখিলেন। বীরেন দাদা তখন কতকগুলি ইট প্রস্তুত করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছিলেন এবং বর্দ্ধমানের হলে বসিয়া (যে হলে বসিয়া গুরুদেব ধর্ম্মালোচণা করেন) কতকগুলি লোককে ইট গড়িবার জন্য দাদন দিতেছিলেন। এই সম্বন্ধে অনভিমত প্রকাশ করিয়াই বীরেন দাদাকে পত্র লেখা হয়। বীরেন দাদাও দোষ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন। এ সব পত্রের উত্তর আসিতে ঘটনার দিন হইতে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আমি তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া গোমো যাই। ভবানীপুরে আসিয়া দেখি তখন পর্য্যন্তও আমাদের নূতন ঘরে কড়ি উঠে নাই। গুরুদেবকে পত্রে সে কথা জ্ঞাপন করিয়া পরে আমি গোমো চলিয়া যাই।

অপর একটী ঘটনা গুরুদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তাহা এই। পূর্ব্বোক্ত সতীশ দাদার স্ত্রীর (কালী দিদির—উমেশ বাবুর কন্যার) একবার টাইফয়েড্ ফিভার হয়। সতীশ দাদা গুরুদেবের সহিত ৺কাশীতে ছিলেন। একদিন সতীশ দাদা একখানি চিঠি পড়িয়া বলিলেন,—তাঁহার স্ত্রীর কঠিন পীড়া, তাঁহার শ্বশুর তাহাই লিখিয়াছেন; ডাক্তারেরা বলেন পীড়া অতি গুরুতর এবং শেষ অবধি কি প্রকার দাঁড়াইবে কিছুই বলা যায় না। তাহাতে গুরুদেব বলেন—“সতীশ, তোমার মন চঞ্চল হয় ত তুমি যাও, কিন্তু আমি যাইবার কোন কারণ দেখি না।” সতীশ বাবু ইহা শুনিয়া আর গেলেন না। তৎপর দিন তাঁহার শ্বশুর টেলিগ্রাম করিলেন—“Kali is seriously ill.

Start at once. Otherwise you will miss her." সতীশ দাদা এই টেলিগ্রাম খানিও গুরুদেবকে শুনাইলেন। তাহাতেও তিনি পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন। তৎপরদিন পুনরায় টেলিগ্রাম আসিল—"Kali passed a tal this morning. Doctors pronounced the case positively hopeless. All will be over in an hour. Invoke blessings." সতীশ দাদা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া যখন এই টেলিগ্রাম খানি শুনাইলেন, (এই টেলিগ্রামখানি সকালে আসিয়াছিল) গুরুদেব বলিলেন—"টেলিগ্রামের উত্তর দাও।" ইহাতে নিম্নলিখিত উত্তর দেওয়া হইয়াছিল—"Father says no anxiety. He will visit the patient tonight. She will get round in a week." এই উত্তর পাইয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন এবং রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারেরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ও বলিলেন যে রোগী এখনও যে কিরূপে বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহাদের বোধাতীত। বলা বাহুল্য, সতীশ দাদার স্ত্রী শীঘ্রই সুস্থ হইতে লাগিলেন। যে দিন এই টেলিগ্রাম গুরুদেব পাঠান সেই দিন রাত্রি ১১টার সময় কালীদিদি—যিনি সম্পূর্ণ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলেন, তিনি—আশ্চর্য্যশক্তি প্রভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং 'বাবা আসিয়াছেন' বলিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছু অদ্ভুত ঘটনার জন্য বাড়ীর সকলে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন গুরুদেবের গাত্রে যেরূপ স্বাভাবিক গন্ধ সেইরূপ গন্ধ কালীদিদির মুখ হইতে বাহির হইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহার পর কালী দিদি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গুরুদেব ৺কাশী হইতে ৭নং কুণ্ডু রোডে আসেন। তখন আমরা দেখি তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সর্ব্ব শরীরে টাইফয়েডের স্ফোটক বাহির হইয়াছে। তাঁহাকে ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলেন,—"প্রসাদের লোভে ভোগ দিলে যাহা ইচ্ছা তাহা দিয়া ভোগ দিতে পার, কিন্তু আমার সেবার জন্য কেবল মাত্র তিসি দিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিয়া সেই দুগ্ধই যেন আমাকে দেওয়া হয়।" তিনি আরও বলিলেন,—"আমার শরীরে টাইফয়েড স্ফোটকগুলি এখনও রহিয়াছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় ইহাই আমার খাদ্য।"

যাহা হউক, পরে গুরুদেব সুস্থ হইলে পর আমি একদিন গুরুদেবকে বলিয়াছিলাম,—"আপনি কালী দিদির টাইফয়েড ফিভার টানিয়া লইয়া তাঁহাকে বাঁচাইলেন কেন? মেয়ে ছেলে—তাঁহার জীবন কি এতই মূল্যবান? তাহাতে তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিলাম। "সতীশের দ্বিতীয় বার স্ত্রীবিয়োগের পর সতীশ গুংকরায় আমার নিকট অত্যন্ত কাতর হইয়া আসিয়া পড়ে এবং সুস্থ হইলে পর যখন পুনরায় দারপরিগ্রহের কথা হয় ঐবং শ্রীযুক্ত উমেশ বাবুর কন্যা কালিদাসীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয় তখন সতীশ তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে অসম্মত হওয়ায়, আমি সতীশকে বলিয়াছিলাম,—"এই মেয়েকে বিবাহ করিলে তোমার স্ত্রী বিয়োগের আশঙ্কা থাকিবে না," এবং আরও বলিয়াছিলাম,—'যদি তোমার জীবদ্দশায় তোমার এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ কালীর

মত একটি কন্যা সৃষ্টি করিয়া তোমার নিকট পাঠাইব।' আমার আশ্বাস বাণী লইয়া সতীশ কালীকে বিবাহ করে, সুতরাং আমার সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই আমি কালীকে জীবন দান করিলাম।

এই সকল প্রধান ঘটনা ছাড়িয়া দিলেও সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য তিনি অনেক সময়ে তৈয়ার করিয়া শিষ্যদিগকে খাওয়াইয়াছেন এবং এক পদার্থকে ভিন্ন পদার্থে পরিণত করিয়া তিনি অনেককে দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বে গুরুদেব মাঘ মাসের প্রথম ভাগে ৺কাশীর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া হয় গোমোয় নয় ধানবাদে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বর্দ্ধমান আশ্রমে আসিতেন এবং কখন কখন ধানবাদ হইতে কয়েকদিন কুমারডুবীতে অবস্থান করিয়া তাহার পর বর্দ্ধমান আসিতেন এবং ৺শিব রাত্রির পর বর্দ্ধমান হইতে ৭নং কুন্ডু রোডে আসিতেন। তাঁহার ধানবাদে অবস্থান কালীন যখন প্রত্যহ সকালে তিনি বেড়াইতে যাইতেন তখন ছোট ছোট ছেলেরা কতকগুলি বড় বড় সাদা পাথর কুড়াইয়া লইয়া খেলা করিত। একদিন ছেলেরা এইরূপে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে প্রবোধ দাদার পুত্র গুরুপদকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—"গুরো, মিছরি খাবি ত একটা পাথর নিয়ে আয়।" গুরুপদ ঐ রূপ করিলে তিনি সূর্য্য বিজ্ঞান সাহায্যে ঐ পাথরখানাকে মিছরিতে পরিবর্ত্তিত করিলেন। এই মিছরি আমি খাইয়াছি ও ধানবাদস্থ অনেক শিষ্য শিষ্যারাও খাইয়াছেন। ঐখানে অবস্থান কালীন তিনি ছেলেদের সহিত তাহাদের পাথরগুলিকে মিছরিতে পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় তাহাদের সহিত খেলা করিতেন। একবার ধানবাদে অবস্থান কালীন দুই তিন দিন ধরিয়া অত্যন্ত মেঘলা থাকে। তাহার পর একদিন সূর্য্য উদয় হইলে বেলা প্রায় দুইটার সময় তিনি এইরূপ সাদা পাথর লইয়া সূর্য্যবিজ্ঞান সাহায্যে খেলা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে একটি পাথর বহুমূল্য হীরকে পরিণত হ'ল। এই হীরাখানি ধানবাদের অনেকে দেখিয়াছেন এবং কলিকাতার অনেক শিষ্যমন্ডলী ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন।

একদিন ৭নং কুন্ডু রোডে এই হীরার কথা লইয়া আন্দোলন হওয়ায় জনৈক শিষ্য বলিলেন,—"এত মূল্যবান হীরক রক্ষা করাই উচিত।" গুরুদেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে তিনি এ খানি রাখিতে চাহেন। গুরুদেব কিছু বলিলেন না। পরদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় তিনি এই হীরকখানিকে একখানি রুমালের একটি খুঁটে বাঁধিয়া অপর খুঁটে রাস্তার কতকগুলি পাথর বাঁধিয়া সজোরে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। যে শিষ্যটি হীরকখানি রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"হীরকখানি এইরূপে যদি জলেই ফেলিয়া দিলেন তবে কেন তৈয়ার করিয়াছিলেন?" উত্তরে তিনি এই সারগর্ভ উপদেশ দেন—"আমি এই সব তৈয়ার করিয়া তোমাদের দেখাই কেবল ইহাই বুঝাইবার জন্য যে আমি তোমাদের মত বিদ্যা উপার্জ্জন না করিয়াও কেবল সত্যনিষ্ঠ ও ভগবানের উপাসনা করিয়া কি করিতে পারি, আর তোমরা পাচ বৎসর হইতে বিদ্যারম্ভ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নানা চেষ্টা সত্ত্বেও কি করিয়াছে বা করিতে পার। যিনি নিত্য, শুদ্ধ ও সত্য তাঁহাকে অবলম্বন

করিলে মানুষ কি হইতে পারে তাহা আমাতেই দেখ এবং এখনও সময় থাকিতে থাকিতে সাবধান হও এবং অনিত্য সুখ স্বচ্ছন্দে অনাসক্ত হইতে চেষ্টা কর।”

একবার তিনি যখন কুমারডুবীতে ছিলেন, তখন আমি ও গুরুদেবের অপর এক শিষ্য শ্রীমান বীরেশ্বর দত্ত তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে কুমারডুবী যাই—সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলাম। তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে আমাদের সহিত কথা বহিলেন এবং রাত্রি নয়টার পর ঘরে চলিয়া গেলেন। পরদিন সকালে যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন তখন প্রণাম করিতে যাইয়া দেখি, তাঁহার করতল অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং যেন পুড়িয়া গিয়াছে। হাত মুঠা হইতেছে না এবং আঙ্গুলি নড়িতেছে না। চামচের সাহায্যে অতি কষ্টে সেদিন তাঁহাকে আহার করাইতে হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—“বিধুর (বিধুভুষণ চট্টোপাধ্যায় গুরুদেবের একজন শিষ্য) মধ্যম পুত্র কেষ্ট, কলেরার যাতনায় এবং শরীরের উত্তাপ ও পিপাসায় অতিশয় চীৎকার করিতেছিল, অতএব স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার উত্তাপ টানিয়া লইলাম। তাহা না হইলে কেষ্ট বাঁচিত না।” কুমারডুবী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যখন বিধুর বাটীতে খবর লই, তখন জানিতে পারি উক্ত রাত্রে কেষ্টর বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। এক্ষণে কেষ্ট ভাল আছে।

৭নং কুণ্ডু রোডের কতকগুলি ঘটনা। একদিন ‘সচ্ছিদ্র জগৎ’ এই কথার পোষকতায় গুরুদেব বলিলেন,—“আমার নিকট উত্তমরূপে stopper কর্ক দেওয়া খালি শিশি এবং ঔষধ পূর্ণ শিশি লইয়া আসিলে দেখাইয়া দিব কেমন করিয়া ঔষধপূর্ণ শিশি হইতে খালি শিশিতে চলিয়া যায়।” গুরুদেবের জনৈক শিষ্য বেঙ্গল কেমিকল ওয়ার্কস হইতে কয়েক শিশি Hypophosphite of lime লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। শিশিগুলি যেমন প্যাক করা ছিল তেমনি রহিল। তিনি কেবলমাত্র একটী প্যাক করা শিশির উপর একটা তার লাগাইয়া দিলেন এবং তারের অপরাংশ একটা খালি শিশিতে জড়াইয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে Hypophosphite of lime এর সমস্ত লাল অংশ ঐ খালি শিশির মধ্যে আসিল এবং প্যাক খুলিয়া দেখা গেল যে Hypophosphite of lime এর শিশিতে কেবল মাত্র জল রহিয়াছে এবং এই জলের রং ফ্যাকাশে নীল।

একদিন তিনি সূর্য্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সন্দেশ তৈয়ার করিয়া আমাদিগকে খাইতে দিয়াছিলেন। সন্দেশ নিম্নলিখিত প্রকারে তৈয়ার হয়। গুরুদেব একটী শ্বেত পাথরের গেলাসের অভ্যন্তরে ছোট কি-একটী জিনিষ রাখিলেন। এবং তাহার পর একটী টুলের উপর গেলাসটী বসাইয়া, গেলাসের উপর পুরু লাল রংএর একটি কাচ (রেলওয়ে সিগন্যালের লাণ্ঠনে যেরূপ কাচ দেওয়া থাকে সেইরূপ) দিয়া ঢাকা দিলেন। তখনই তাঁহাকে অপর এক শিষ্য তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিলে তিনি আমার ভাইপোকে বলিলেন,—

"আমি যাইতেছি। গেলাসের গা ভাঙিলে, ইহার চতুর্দ্দিকে নীল রংএর কাগজ জড়াইয়া দিবে।" গেলাস ভাঙিলে যখন আমার ভাইপো ঐ প্রকারে নীল রংএর কাগজ জড়াইবার উপক্রম করিতেছে, তখনই গুরুদেব পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘরের ভিতর গেলাসটী লইয়া আসিয়া মাথার উপরের লাল কাচখানি তুলিয়া লইলেন। দেখা গেল, একটি গেলাস ভরো সন্দেশ হইয়াছে। এই সন্দেশের আস্বাদ সাধারণ অপেক্ষা অনেক ভাল, আমরা সকলে পরিতৃপ্তির সহিত ঐ সন্দেশ খাইয়াছিলাম।

গুরুদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে একবার জনাই হইতে মনোহরা আনান হয়। ভারীরা নীচেই মনোহরার বাক্স লইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি উপর হইতে বলিলাম,—"মনোহরার ওজন ভাল করিয়া দেখিয়া লও।" গুরুদেব মনোহরার চেহেরাও দেখেন নাই। তিনি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মনোহরা দেখিতেছ কি রকম?" আমি উত্তর দিলে ক্ষণিকের মধ্যে তিনি দুইটি মনোহরা আনয়ন করিলেন। এই মনোহরা জনাইএর প্রেরিত মনোহরা সন্দেশ অপেক্ষা আকৃতিতে অনেক বড়, বেশী সাদা এবং খাইতে ঢের বেশী সুস্বাদু।

একদিন গুরুদেবের একটী শিষ্য শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বেলা সাড়ে নয়টার সময় গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আসিলে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৌমা কেমন আছে?" তাহাতে মণীন্দ্র, যাহার ডাক নাম "নিচু", উত্তর করিল,—"আক্কেল দাঁতের জন্য দুপাটী মেড়ে অত্যন্ত ফুলিয়াছে এবং গলায় কতকগুলি বিচির ক্ষত হওয়ায় মুখের হাঁ প্রায়ই বুজিয়া গিয়াছে, কোনমতে অতি কষ্টে তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিতেছে এবং যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে।" গুরুদেব এই সব শুনিয়া বলিলেন,—"দাঁতের যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা, একটি ডাক্তার ডাকিয়া মেড়েটী চিড়িয়া দিলে কষ্টের উপশম হইবে।" নিচু ও আমি ঐ দিন একত্রে আফিসের দিকে আসিতেছিলাম। নিচুর বাটী হইয়া ট্রামের রাস্তায় যাইতে হয়। আমি অফিস যাইবার সময় যখন নিচুকে ডাকিতেছি, তখন নিচু বলিল,—"আমার স্ত্রী বড় কষ্ট পাইতেছে। সাড়ে চারিটার সময় আমি অফিস হইতে ফিরিতে পারিব। ইহার মধ্যে যেন আমার স্ত্রীর মেড়ে চিড়িবার জন্য ডাক্তারকে উক্ত সময়ে আসিতে বলা হয়।" এই কথা তাহার ছোট ভাইকে বলিয়া আমার সহিত চলিয়া আসিল। নিচু বাটী ফিরিবার বা ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে যে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

ঐ দিন বেলা তিনটা আন্দাজ ৭নং কুণ্ডু রোডে গুরুদেব তাঁহার বিছানায় শুইয়া রহিয়াছেন এবং এক শিষ্য তাঁহার পদসেবা করিতেছে। সকলেই দেখিতেছেন গুরুদেব ৭নং কুণ্ডু রোডের উপরের হলে শুইয়া আছেন। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যার পর নিচু ও নিচুর স্ত্রী ও ভগিনী মহা উল্লাসে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"বেলা তিনটার আন্দাজ নিচুর স্ত্রীর দাঁতের যন্ত্রণা এত বাড়ে যে তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার শিশু সন্তানকে ঝিএর কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিকটস্থ একটী টেবিলের উপর মস্তক রাখিয়া প্রায় রোদন

করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ গুরুদেব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—'বৌমা, তোমার যে বড় কষ্ট হইতেছে, একবার হাঁ করত মা।' নিচুর স্ত্রী বলিলেন,—'হাঁ করতে পাচ্ছি নে যে বাবা?' তখন গুরুদেব তাঁহার উপর পাটীর দাঁতের তলায় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে হাঁ করাইলেন এবং অপর অঙ্গুলি তাঁহার মেড়ের উপর বুলাইয়া দিলেন। ইহাতে তৎক্ষণাৎ নিচুর স্ত্রীর কষ্ট দূর হইয়া গেল এবং তিনি এত স্বচ্ছন্দ অনুভব করিলেন যে তাঁহার একটু তন্দ্রার মত আসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল যে গুরুদেবের হাত এঁটো হইয়া গিয়াছে, হাতে জল দিতে হইবে, কিন্তু গুরুদেবকে আর দেখিতে পাইলেন না। অল্পক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। নিচু অফিস হইতে আসিলে পর স্ত্রীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ডাক্তারকেও আর আনিতে হইল না। গলায় যে বিড়ির মত হইয়াছিল, সমস্তই অতি অদ্ভুতরূপে মিলাইয়া গেল।"

আমারও পরিবারস্থ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম। আমার পুত্রের বিবাহের জন্য একটি ভদ্রলোক (আমাদের পুরাতন কুটুম্ব) আমাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন; আমি তাঁহাকে বরাবরই বলি যে, আমি বিবাহের কর্ত্তা নহি। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে আমাদের গুরুদেবের আজ্ঞাধীন। তিনি আদেশ করিলে আপনার কন্যা না দেখিয়াও আমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। ইহা শুনিয়া তিনি গুরুদেবকে ৺পুরীর আশ্রমে পত্র লিখেন এবং উত্তর পাইলে আমাকে বলেন,—"এ বিবাহে তিনি অনুমতি দিয়াছেন।" আমি কিন্তু পত্র পাঠে গুরুদেবের অনুমতি দেওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং তাঁহাকে বলিলাম,—"স্পষ্টরূপে তাঁহার আদেশ দেখিতে না পাইলে আমি এ বিবাহে অগ্রসর হইতে পারিব না। গুরুদেব ৺পুরী হইতে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিলে আপনি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন এবং তিনি আদেশ করিলে আমি তখনই সম্মতি দিব।" গুরুদেব ফিরিয়া আসিলে পর তিনি তাঁহার সহিত পুনরায় বিবাহ সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি এই কথোপকথনে গুরুদেবের কি অনুমতি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কন্যার পিতা কিন্তু বলিতে লাগিলেন, তিনি স্পষ্টরূপে গুরুদেবের অনুমতি বুঝিয়াছেন। গুরুদেবের কতিপয় শিষ্যদিগকে লইয়া সে দিন কোন স্থানে যাইবার কথা ছিল, আমি সে বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলাম। সুতরাং আমি সে দিনও কন্যার পিতাকে ফিরাইয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং এতই ক্ষুণ্ণ হইলেন যে আমার ও তাঁর উভয়ের আত্মীয়ের বাটীতে যাইয়া প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, আমাদের ফিরিয়া আসার পর গুরুদেব বলিলেন,—"বৈবাহিককে কি এমন করিয়াই প্রত্যাখ্যান করিতে হয়?" ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। গুরুদেব নিম্নলিখিতরূপে তাঁহার অনুমতি জ্ঞাপন করেন।

তিনি আমার পুত্রকে বলেন,—"যতীশ, তোমার বিবাহের জন্য একটী ভদ্র-

লোক অত্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, যোগেশের পুত্র যতীশের বিবাহ ডাক্তার মুস্তফীর কন্যার সহিত স্থির হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়াই তিনি বলিলেন,—"অপর কন্যাটি পরমাসুন্দরী।" তাহাতে আমার পুত্র বলিল,—"বাবা ত আজও মুস্তফী মহাশয়কে ফিরাইয়া দিয়াছেন। যদি একটি সুন্দরী কন্যার কথা জানিতেন, তবে তাঁহার পিতাকে ঐরূপ ভাবে উত্তর দিলেন কেন?" তাহাতে গুরুদেব বলিলেন,—"আমি ডাক্তার মুস্তফীর কন্যাকেও দেখিয়াছি। এ মেয়েটিও বেশ সুন্দরী। তবে অপর মেয়েটীর মত চামড়া অত কটা নহে। কটা চামড়া লইয়া কি করিবে? যাহার অদৃষ্ট সুন্দর, সেই প্রকৃত সুন্দর।" তারপর ডাক্তার মুস্তফীর বাটী কেমন, কিরূপে বাটীতে প্রবেশ করিতে হয়, কোন্ ঘর আমার পুত্রের বাসের ঘর হইবে, ইত্যাদি সমস্ত বিস্তারিতরূপে বলিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইহাই মনে হইল যে ডাক্তার মুস্তফী মহাশয় গুরুদেবের অভিপ্রায় ঠিক বুঝিয়াছিলেন, কেবল আমি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বৃথা কষ্ট দিয়াছি। এইরূপ চিন্তায় রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হইল না এবং পরদিন সকালে যখন গুরুদেবকে প্রণাম করিতে যাই, তখন তিনি বলিলেন,—"রাত্রে তোমার ঘুম হয় নাই দেখিতেছি, অফিস যাইবার পূর্বে সতীশ মুস্তফীর বাটীতে যাইয়া বিবাহে সম্মতি জানাইয়া এসো।"

গুরুদেবের আদেশ মত আমি তাহাই করিলাম। ভাবিয়াছিলাম আমি আসিয়াছি শুনিয়া মুস্তফী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কিন্তু তাহা করেন নাই। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। তিনি সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আমি বিবাহে সম্মতি জানাইলে তিনি বলিলেন,—"আপনি যে আজ আসিবেন তাহা আমি জানিতাম।" এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময়ে আমার যে আত্মীয়ের বাটী যাইয়া সতীশ বাবু (মুস্তফী মহাশয়) প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছিলেন সেই বাটীর গৃহকর্ত্তা তাঁহার ভগিনীপতি ডাক্তার মুস্তফীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন,—"গতকল্য আপনার বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সতীশ বাবু আমাদের বাটীতে আসিয়া প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এখন দেখিতেছি আপনি আবার তাঁহার কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহের জন্য ভাবিতেছেন।"

একি অদ্ভুত রহস্য। যাহা হউক, তাহার পর ডাক্তার মুস্তফী বলিলেন,—"আমি বাটীতে ফিরিয়া যাইয়া অতি দুঃখিত অন্তরে স্ত্রীকে বলি,—'ভবানীপুরে বোধ হয় কন্যার বিবাহ হইল না।' তাহাতে স্ত্রী বলেন,—'যদি যোগেশ বাবুর আদেশেই এই বিবাহ হয়, এস আমরা তাঁহার ধ্যান করি।' ঐ রাত্রের ভোরে ডাক্তার মুস্তফীর স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—"দেখ, এইরূপ একজন (গুরুদেবের আকৃতির বর্ণনা করিয়া আমাকে বলিলেন, 'মা, ডাকিতেছ কেন? এ বিবাহ হইবে এবং যোগেশ তোমাদের বাটীতে এই এল ব'লে'।" ডাক্তার মুস্তফী তাঁহার স্ত্রীর মুখে গুরুদেবের অবিকল বর্ণনা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং নিশ্চিন্তভাবে আমার আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন।

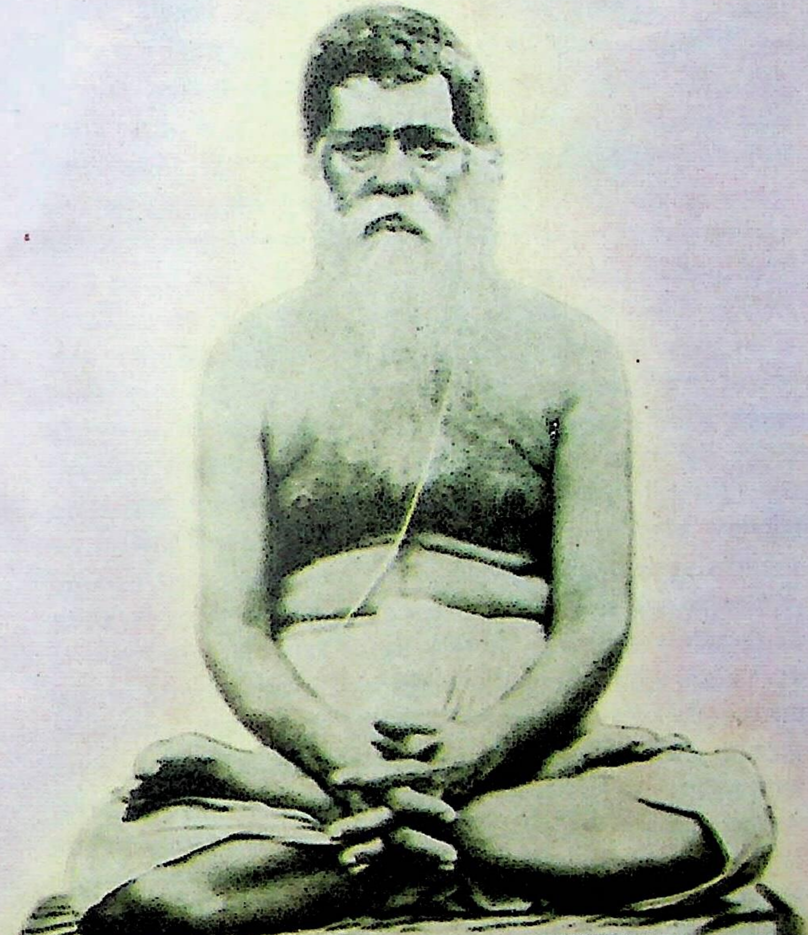

শ্রীশ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

একদিন অফিসে আসিবার সময় ফুটপাথের উপর পা পিছলাইয়া আমি পড়িয়া যাই এবং তাহাতে আমার উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। আমি তাহাতে উত্থান-শক্তি-রহিত হইলে দেখি আমার একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি অফিসে খবর দেওয়ায় অফিস হইতে অনেক লোক আসিয়া আমাকে অফিসে লইয়া যায় এবং আমার পুত্রকে খবর পাঠায়। আমার পুত্র তাঁহার সহিত দুই জন ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হয়। অফিসে আসিবার পূর্ব্বেই আমার পায়ের হাড় সেট্ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর এক্স্ রে দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া এম্বুলেন্স গাড়ী আনে। আমি বেলা তিনটার মধ্যে ৭নং কুণ্ডু রোডে আমার শুইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হই। এই দুর্ঘটনা আমার বাটীতে ঘটিলে বোধ হয় এত শীঘ্র এবং এত সুচারুরূপে এ সব সম্পন্ন হইত না। ইহাতেও আমি আমার উপর গুরুদেবের অভাবনীয় কৃপাই দেখিতে পাই। আমি প্রায় তিন মাস শয্যাগত ছিলাম; কিন্তু গুরুদেবের দয়ায় এত বিপদেও কোন বিশেষ কষ্ট অনুভব করি নাই। গুরুদেব তখন ৺কাশীতে ছিলেন। তিনি প্রায় প্রতি পত্রেই অসুস্থ অবস্থায় কি কি উপসর্গ হইবে তাহা লিখিতেন এবং সেই উপসর্গ দেখা দিতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন;—"অমুক দিন হইতে অমুক দিন পর্য্যন্ত যোগেশের অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ হইবে, হইতেছে কিনা লিখিও। অমুক দিন হইতে অমুক দিন পর্য্যন্ত তাহার রাত্রে ঘুম হইবে না, এরূপ হইতেছে কিনা লিখিও" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সমস্ত উপসর্গগুলি পর্য্যায়ক্রমে দেখা দিয়াছিল। তিনি ৺কাশীতে থাকিলেও আমি প্রত্যহ আমাদের ঘরে তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিতাম। রাসবিহারী নামীয় একটী বালক, যে আমাকে নার্স করিবার জন্য আসিয়াছিল, সে প্রত্যহই ঘরে একটি সুগন্ধ অনুভব করিত। এই ঘটনায় রাসবিহারী, যে আমাকে অল্পদিনের জন্য নার্স করিতে আসিয়াছিল, আমাকে আর ছাড়িতে পারিল না। অবশেষে সে গুরুদেবের নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। দুইজন ডাক্তার আমাকে প্রত্যহই বৈকালে দেখিতে আসিতেন তাঁহারা বলিতেন,—ছোট ছেলের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, তাঁহাদের পুস্তকের লিখন মত হাড় জুড়িতে প্রায় নব্বই দিন লাগে। আমার বয়সে যে কতদিন লাগিবে তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। অন্ততঃ ১৪০ দিন লাগিতে পারে। যাঁহারা আমাকে দেখিতে আসিতেন, ডাক্তারেরা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হাড় সোজা ভাবে ভাঙ্গিলে, হাড় জুড়িয়া গিয়া আমি চলনক্ষম হইতে পারিতাম, না হয়ত একটু ছোট হইয়া যাইত। কিন্তু বাঁকাভাবে যেরূপে আমার হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাতে আমাকে আর উঠিতে হইবে না। আমি কিন্তু ডাক্তারদের বলিতাম,—"আপনাদের কেতাবে যাহাই থাকুক না, আমি বোধ হয় ৯০ দিনের পরই চলনক্ষম হইব।" আমি যে কখনও উঠিয়া দাঁড়াইব, একথা ডাক্তারদের বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য এই যে ৯০ দিনের পরই আমি চলনক্ষম হইলাম এবং পাও আমার ছোট হয় নাই। ডাক্তারেরা ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন; তাঁহারা বলিতেন,—"এরূপভাবে পা ভাঙ্গিয়া এই প্রকার

আরোগ্য লাভের কথা যদি কেহ Medical Journalএ রিপোর্ট করেন তাহা হইলে তিনি পাগল বলিয়া পরিগণিত হইবেন।”

এই বৎসরের পর বৎসর আমার হারনিয়া নামিয়া যায়। বেলা ৯টার সময় আমার হারনিয়া নামিয়া পড়ে ও বেলা ১২টার সময় আমার অসহ্য যন্ত্রণা এবং বমি আরম্ভ-হয়। আমার অজ্ঞানা ভাবে গুরুদেব অপর ঘরে তাঁহার যন্ত্র লইয়া বসিয়া রহিলেন। ইচ্ছা ছিল একবার সূর্য্য উদয় হইলে তখনই সূর্য্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সেদিন আর সূর্য্যের উদয় হইল না। আমি বেলা প্রায় চারিটার সময় একটি নার্সিং হোমে গমন করি। সেদিন রবিবার, প্রায় ৪০ জন শিষ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার এই দুর্ঘটনায় কেহই চলিয়া যাইলেন না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চিন্তিত ভাবে সকলেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা সকলেই গুরুদেবকে ৭নং কুন্ডু রোডে দেখিতেছেন। অথচ আমার হারনিয়া অপারেশন-এর সময় গুরুদেব নার্সিং হোম-এ রহিয়াছেন। আমার ভাই, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নার্সিং হোম হইতে ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় সকলেই অতি চিন্তিতভাবে গুরুদেবকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন গুরুদেব জ্ঞানগঞ্জের চিঠি, যাহা এই ঘটনার বহু পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তথা হইতে পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, “উক্ত দিনে যোগেশের হারনিয়া নামিবে—বেলা ৯টার পর হইতে ব্যারামের বৃদ্ধি হইবে। সেদিন সূর্য্যোদয় হইবে না। অস্ত্র-চিকিৎসা অবশ্যম্ভাবী। প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই।” ইহা শুনিয়া উপস্থিত শিষ্যবৃন্দ আশ্বস্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাতেই ডাক্তারেরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। পা ভাঙ্গার সময় যে সব ডাক্তারেরা আমাকে দেখিতেন, নার্সিং হোম-এ তাঁহারাই আমাকে দেখিতে আসিতেন। অপারেশনের পরের দিন তাঁহারা আমার ব্যান্ডেজ খুলিলেন, এবং তাহাতে কোন রূপ রক্ত না দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন,—‘আপনার কি সবই অদ্ভুত রকমের? আমরা কেতাবে এমন কোন কোন কথা পড়িয়াছি যাহা আপনার এই অপারেশনেই প্রথম দেখিলাম।” গুরুদেব অশরীরী অবস্থায় আমাকে নার্সিং হোম-এ দেখিতে আসিতেন, আমি তাহা বেশ অনুভব করিতে পারিতাম। আমি সুস্থ হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে নার্সিং হোম-এ আমার যে দুইটি বিলাতী নর্স নিযুক্ত ছিল তাহারা আমাকে কিরূপে যত্ন ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করিত সেই সব কথা বলিতেন।

এইখানে একটি আধুনিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। গত ১১ই কার্ত্তিক (১৩৩৬), সোমবার, আমি আফিস হইতে বাড়ী যাইবার সময় ট্রামে করিয়া বাটী যাই। আমি সাধারণতঃ ট্রামে কখনও যাতায়াত করি না। বিশেষতঃ পা ভাঙ্গার পর মোটেই ট্রামে চড়ি না। কিন্তু সে দিন কি গ্রহবশতঃ ট্রামে চড়িয়া ছিলাম বলিতে পারি না। আমি যখন ট্রাম হইতে নামিলাম, তখনই একখানি বাস আমার একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ট্রাম গাড়ী ও বাস এর মধ্যে যে অপ্রশস্ত সামান্য জায়গা

ছিল, পাশ কাটিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং ২য় শ্রেণী ট্রামের হাতল ধরিয়া ফেলিলাম। কিন্তু ট্রাম তখন চলিতেছিল, সুতরাং হাতল ধরিয়া ২/৪ মিনিট পর আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, হাতল হইতে হাত খুলিয়া গেল। ইহাতে আমি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়া বিশেষরূপে আহত হইতাম। গুরুদেব তখন ৺কাশীতে রহিয়াছেন, কিন্তু কি তাঁহার মহিমা এবং অভাবনীয় কৃপা যে সেই মহাসঙ্কটের মুহূর্তে তিনি আমার শরীরে বল সঞ্চার করিয়াছিলেন। আমি পড়িয়া গেলাম না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

৺কাশীর শিষ্যগণ উক্তদিন গুরুদেবের একটু ব্যস্তভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি আমার কোন পত্র আসিয়াছে কি না পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যেরা একটু চিন্তিত হইয়া আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"অদ্য যোগেশের মৃত্যু-যোগ ছিল।"

কামাখ্যা দেবী দর্শন করিতে যে বৎসর যাওয়া হয়, সে বৎসর আমাদের যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে আশ্রমের সম্মুখস্থ দোকানে গুরুদেবের ৺কামাখ্যা যাওয়া সম্বন্ধে কথা হইতেছিল, এবং পরস্পর বলাবলি হইতেছিল যে কামাখ্যায় অত্যন্ত মশা এবং মশাগুলি অস্বাভাবিক বড়। এই সব কথা রূপনারায়ণ নন্দনস্থ আশ্রমের ঘর হইতে শুনা যাইতেছিল। আমার একটি ছোট নাতনী এই কথা শুনিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কামিখ্যার মশা কি রকম ?" গুরুদেব আমার নাতনিকে বলিলেন,—"টুনু, কামিখ্যার মশা দেখাবি ?" ইহা যেমন বলা, অমনি তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগে একটি চামচিকা ঝুলিতে লাগিল। এই চামচিকাটিকে তিনি রৌদ্রে রাখিয়া দিলেন, চামচিকা উড়িয়া চলিয়া গেল।

একদিন তিনি উক্ত আশ্রমে নিজের নাভিমূল স্ফীত করিয়া নাভিপদ্ম দেখাইয়াছিলেন। নাভিমূল যখন স্ফীত করেন তখন এক মনবিমোহনকারী গন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত হইয়া গিয়াছিল। এই পদ্মের কথা বর্ণনায় আনা যায় না। ইহা রূপক নহে, বাস্তবিকই সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়। যতই নাভি স্ফীত করিতে লাগিলেন, পদ্ম ততই প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।

আর একদিন শ্রীমান কেদারনাথ ভৌমিক নামক গুরুদেবের জনৈক শিষ্য, এক ছড়া বেলফুলের মালা লইয়া আসেন। গুরুদেব বলিলেন,—"এই বেল ফুলের মালা ছড়াটি বহু-মূল্য মুক্তার মালায় পরিণত হইতে পারে।" এই বলিয়া তিনি একটি বেলফুল লইয়া উহাকে বায়বিক বিজ্ঞানের সাহায্যে অতি উজ্জ্বল, সুন্দর ও সুগোল মুক্তায় পরিণত করিলেন। আমাদের সম্মুখে বেল ফুল আস্তে আস্তে মুক্তায় পরিণত হইল। মুক্তা জমিয়া শক্ত হইবার পূর্বে একজন মুক্তা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাতে মুক্তায় একটু গাঁটের মত হয়। গুরুদেব বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই মুক্তার ছালটী তুলিয়া লইলেন। মুক্তা আকৃতিতে একটু ছোট হইল বটে—যদিও এই আকৃতি সাধারণ মুক্তার আকৃতির অপেক্ষা অনেক বড়—কিন্তু অতি উজ্জ্বল ও সুডোল হইল। আমার পুত্র এখনও এই মুক্তা ধারণ করিতেছে। আমি, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ননীলাল

মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্‌ বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় এখনও এই মুক্তার ছাল মাদুলিতে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এডভোকেট, হাইকোর্ট, কলিকাতা

(১৫।২ রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা)

(১) দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, খিদিরপুরবাসী হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গোলাপ ফুলের গন্ধ আকর্ষণ ও ঐ সঙ্গে ঐ ফুলের পত্রগুলি ঝড়িয়া পড়া।

(২) বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি এখন ৺কাশীধামে ১00 নং সূর্য্যকুণ্ডুতে বাস করিতেছেন তাঁহার অনুরোধে গৃহ মধ্যে ফুলের গন্ধ ইচ্ছাশক্তিতে আনয়ন ও পুষ্প আনয়ন।

(৩) মস্তকেয় মধ্যে মাথার খুলির নিচে ৬টি ঠাকুর রক্ষা করা, ১টি শালগ্রাম শিলা, ২টি লম্বা, লাল ও শ্বেত আভাযুক্ত শিবলিঙ্গ ও তিনটি উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ। মাথা নাড়িলে ঐ গুলির খট খট শব্দ মাথার মধ্যে শুনিতাম। আমি নিজ হস্তে মাথা দুলাইয়াও ঐরূপ শব্দ পাইতাম। সাধারণতঃ প্রাতে পূজার সময় মুখ হইতে জিভ কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া বাবা মুখ-গহ্বর হইতে ঠাকুরগুলি বাহির করিতেন দেখিতাম।

আমাদের পরিচিত খিদিরপুর মুন্সীগঞ্জের অধিবাসী ৺যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ নাকের একদিকের ছিদ্রে তুলা গুঁজিতেন বলিয়া সাধারণতঃ "তুলা-ঘোষ" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি একদিন আমার সাক্ষাতে তাঁহার মনের কথা ও তাঁহার বিষয় বলিতে পারেন কি না বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং বলিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন তাহাতে বাবা তাঁহার গুহ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া কদর্য্য স্বভাবের পরিচয় যেরূপভাবে বিবৃত করিলেন তাহাতে যোগীন বাবু বিশেষ বিচলিত হইয়া একেবারে তাঁহার চরণ ধরিয়া অনুতপ্তভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উক্ত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যয়ের কোষ্ঠী দেখিয়া খিদিরপুরের কৃষ্ণধন আচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী-স্থানে দোষ আছে। তাঁহার পত্নী বাঁচিবে না, এবং পুত্রস্থানেও দোষ আছে—পুত্র জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার অল্প বয়সে দুই স্ত্রী বিয়োগের পর পিতামাতা যখন পুনরায় বিবাহের জেদ করেন তিনি প্রথমে সম্মত হন নাই। পরে গুস্করায় গুরুদেবের নিকট যাইয়া বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার অবস্থার কথা বলেন। বাবা তখন বলেন,—"তোমার কোষ্ঠীর ফল বদলাইয়া দিব। তোমার এই স্ত্রী তোমার জীবদ্দশায় মরিবে না—ইহাকে তুমি বিবাহ কর।" ১৩১২

সালে তিনি এই বিবাহ করেন। সেই পত্নী এখনও জীবিতা—তাঁহার ৩টি পুত্র ও ১টি কন্যা হইয়াছে।

এই সব উপলক্ষ্যে বাবা বলিতেন,—"তোরা দেখিতেছি কিছুই জানিস না। বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়াছিস অথচ আমাদের শাস্ত্রের বা যোগের কোন বিষয়েই চর্চ্চা করা হয় নাই। যাহা কিছু কেহ আমার নিকট শোনে বা দেখে তাহাতেই অবাক্ হইয়া যায়।" আরও বলিতেন,—"আমার উদ্দেশ্য যে কিরূপে গৃহী গৃহে থাকিয়া যোগসিদ্ধ হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিব। কিন্তু কার্য্য করা চাই, খাটা চাই। কেবলমাত্র পড়ায় বা কথায় চলিবে না। ঘর সংসার ছাড়িয়া বনে যোগ-সাধনায় অনেক কষ্ট ও বিঘ্ন আছে।" বাবা আর মাকে কষ্ট দিয়া স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া, বনে যাওয়া তাঁহার মতে ঠিক নহে। বনমধ্যে প্রথম অবস্থায় প্রাণ রক্ষার জন্য ও খাইবার অভাবে বিশেষ বিপদ ও কষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারে সে সব চিন্তা নূতন করিয়া করিতে হয় না। কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যায় একটু সময় করিয়া যোগ-সাধনা করিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। এইরূপে সাধনার প্রার্থী হইয়া আমি বাবার নিকট দীক্ষা লই। সাধনা-সিদ্ধ হইলে যোগ বিভূতি স্বতইঃ বিকশিত হয়। সূক্ষ্মদৃষ্টি, সুদূর-শ্রবণ ও ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত বলবতী হয় ও অন্যের মনের ভাব চিন্তা করিলেই নিজের আয়ত্ত হয় ও বলা যায়। এই সব বিভূতির স্ফুরণ আমি অনেকবার অনেক জায়গায় দেখিয়াছি। বাবা বলেন,—এরূপ দেখাইবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে এই সব দেখিলে লোকের যোগ-সাধনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবে। কিন্তু লোকে এখন এসব তামাসা দেখিবার মত দেখে এবং অন্য লোককে ডাকিয়া তাঁহাকে বারবার এসব তামাসা দেখাইতে বলে নিজেরা যাহাতে যোগাভ্যাস করিতে পারে ও বিভূতি সম্পন্ন হয় তাহার কোনও ব্যবস্থা করে না।

বাঙ্গালা ১৩২১ সালের ৺পূজার অবকাশে আমরা একদল আলীগড় হইয়া হরিদ্বার ভ্রমণে বাহির হই। কানপুরে বিশ্রাম করিয়া আহারাদির পর গাড়ীতে উঠি। একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বাবার সহিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (একজন অবসর-প্রাপ্ত সবজজ, বাড়ি বাঁকুড়ায়, তেলিপাড়া গ্রামে) হাইকোর্টের উকিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের খোসবাগের জমিদার ইন্দুভূষণ দত্ত ও আমি ছিলাম। তখন মধ্যাহ্নে গাড়ীতে বেশ গরম অনুভূত হইল। বাবা নিজের বাম হস্তের কনুয়ের পার্শ্বদেশ মর্দ্দন করিয়া সরিষা প্রমাণ ময়লা তুলিতে তুলিতে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, —"এইটা কি দেখিতেছ বল?" আমি বলিলাম,—"উহা আপনার গাত্রের সরিষা প্রমাণ ময়লা মাত্র।" তিনি বলিলেন,—"দেখ, জগতের সকল বস্তুই এই—কেবল নাম ও রূপের ভেদ মাত্র। আমি প্রত্যক্ষবাদী, তাহা ত জান। এক্ষণে তাহার দৃষ্টান্ত এই ময়লা হইতেই দেখাইব।" এই বলিয়া সেই হাতের ময়লাটুকু দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমিকা দ্বারা পাকাইতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ ময়লাটীর আকার ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল। বাবা বলিলেন,—"ছোট-বড়, আকার ভেদ মাত্র।" সেই সময় একটি তীব্র সুগন্ধ বাহির হইতে লাগিল। যখন ময়লাটির আকার বৃদ্ধি হইয়া একটী মটর অপেক্ষা বড় হইল,

তখন উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"দেখ, উহার বর্ণ কেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে।" আমি হাতে করিয়া দেখিলাম যে উহার বর্ণ ক্রমশঃ বেশ সুন্দর নীল ও স্বচ্ছ হইতেছে, কিন্তু তখনও বেশ নরম আছে। আমার হাত হইতে আরও তিনজনে উহা দেখিয়া পুনরায় উহা আমার হাতে দিলেন। তখন উহা একটি সুন্দর নীলা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম,—"বাবা, আমাকে উহা দিন, আমি উহা আঙ্গটিতে বসাইয়া লইব।" তাহাতে বাবা বলিলেন,—"নীলার তাড়িতশক্তি অত্যন্ত তীব্র। উহা ধারণ করিলে আমিরও হইতে পার, আবার ফকিরও হইতে পার। এইরূপ অনিশ্চিত বস্তু তোমাকে দিতে পারি না। উহা আমার হাতে দেও, আমি উহার তাড়িত বা তেজ কমাইয়া দিব।" আমি তাঁহার হাতে দিলাম। দিবামাত্র আবার সুগন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

১৩১৪ (ইং ১৯০৭) সালের ১লা বৈশাখ আমি বাবার নিকট দীক্ষা লই। তখন বাবা গুস্করায় কাছারি বাড়ীতে থাকিতেন। ১৩১৭ সালে যখন তিনি বর্দ্ধমানে ছিলেন তখন আমি একদিন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বর্দ্ধমানের বাসায় যাই। তখন বেলা প্রায় ১২টা। তিনি আমার সহিত কথা কহিয়া আমাকে বসিতে বলিয়া নিকটস্থ একটী লোকের অসুস্থ ছেলেকে দেখিতে যান। আমি সেই দিনই ডাউন বম্বে মেলে বেলা ২টার সময় রওনা হইয়া পুনরায় হাওরায় ফিরিব, এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলাম। তখন বম্বে মেলের সেইরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাবা প্রায় ২।০টার সময় ফিরিলেন এবং আমাকে জল খাওয়াইয়া বলিলেন,—"এইবার তুমি যাইতে পার।" আমি বলিলাম,—"আমার মেলে যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাকে লোকাল ট্রেনে যাইতে হইবে।" তাহাতে বাবা বলিলেন,—"দেখ, ষ্টেশনে এখন যাইলেই তুমি কোন না কোন ট্রেন পাইবে যাহাতে তোমার শীঘ্র হাওড়ায় যাওয়া হইবে। তুমি এখনই যাও।" আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম বোম্বে মেল দাঁড়াইয়া আছে, গাড়ী লেট ছিল।

ইহার প্রায় ৬ মাস পরে আশ্বিন মাসে পুনরায় একদিন বাবাকে দেখিবার জন্য বর্দ্ধমান যাই। তখন বর্দ্ধমানে বিশুদ্ধাশ্রমের জায়গাটা লওয়া হইয়াছে। তিনি আমাকে ঐ জায়গাটী দেখাইবার জন্য সঙ্গে আনিলেন এবং সেখানে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম,—"পাঁচটার ডাউন এক্সপ্রেসে আমাকে ফিরিতে হইবে।" তিনি বলিলেন,—"অদ্য এখানে থাকিলে ভাল হয়। যাহা হউক, আমি ফিরিয়া আসিলে সে সম্বন্ধে কথা হইবে।" আমি পৌনে পাঁচটা পর্য্যন্ত বসিয়া তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ষ্টেশনে এক্সপ্রেস ধরিলাম ও হাওড়ায় ফিরিয়া দেখিলাম কলিকাতায় ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া জলপ্লাবন হইয়াছে। কোনও গাড়ী যাইতে চাহিল না—অগত্যা পদব্রজে ষ্ট্রাণ্ড রোডে জল ভাঙ্গিয়া চারি ঘণ্টার পরে বাড়ী পৌঁছিলাম। এই ঘটনার কথা বাবাকে জানাইলে তিনি লিখিলেন, তিনি সেই জন্যই আমাকে সে দিন বর্দ্ধমানে থাকিতে বলিয়াছিলেন।

মথুরা বৃন্দাবন হইয়া হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। পাণ্ডা পান্নালাল কুঞ্জ

কর্ত্তার নির্দ্দিষ্ট একটি বাসাতে আমরা উঠিলাম। সেই সময়ে উক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর ভীষণ টায়ফয়েড জ্বর হয়। উঁহার পিতা কলিকাতার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যার ব্যারামে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া আমাদের হরিদ্বারের বাসায় বাবাকে তার করিয়া কন্যার অসুখের কথা জ্ঞাপন করিয়া উত্তরে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। বাবা ঐ তারের জবাব লিখাইয়া আমাকেই ডাক ঘরে পাঠান এবং বলেন,—"এখন সতীশের পত্নী মরিতে পারে না।" বাবার আদেশে উত্তর দিলাম—Accept my blessings. Wire present condition." পরদিন আবার তার আসিল। বাবা বলিলেন,—"কালীর জ্বরের প্রকোপে ফিট হইয়াছে। ডাক্তারেরা মনে করিয়াছে সে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। সে জীবিত আছে এবং শীঘ্রই সংজ্ঞালাভ করিবে। ক্ষেত্র, তুমি এই তারের জবাবে উমেশকে লিখিয়া দাও 'কালী উপস্থিত কেমন আছে জানাইবে।" আমিও সেই মত তার পাঠাইলাম। সেই দিনই বৈকালে উত্তর আসিল, "Kali regained consciousness, but condition still precarious." কালীর জ্ঞান আসিয়াছে বটে কিন্তু অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক। বাবা উত্তরে কালী কেমন থাকে সংবাদ দিতে বলিলেন। পরদিন একটি বড় তার উমেশ বাবু পাঠাইলেন, লিখিলেন,—"কালী যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে, আদৌ ঘুমাইতে পারিতেছে না।" তখন প্রায় সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। বাবা পূজায় বসিবার পূর্ব্বে বলিলেন,—"যাই, কালীকে দেখিয়া আসি। তাহার বিষম যন্ত্রণার উপশম করিয়া দিব, কিন্তু তাহার আরোগ্য লাভ করিতে এখনও বিলম্ব আছে।"

ইহার পরদিন আমরা ৺কাশীতে ফিরিয়া কেদারঘাটের উপর হরি বাবুর গদীতে উঠিলাম। আমরা দলে ২০।২২ জন ছিলাম। বাবাকে লইয়া আমরা যে ঘরটীতে বসিতাম উহার পার্শ্বেই প্রস্রাবের জায়গা ছিল। অনেকে থাকায় প্রস্রাবের দুর্গন্ধ ছাড়িত। আমি বাবাকে বলিলাম,—"ওখানে ফেনাইল ছড়াইলে ভাল হয়।" বাবা বলিলেন,—বেশ, ফেনাইল লইয়া আইস।" আমি বলিলাম,—"কেন আবার কষ্ট করিয়া দশাশ্বমেধে যাই—আপনি ত ইচ্ছাশক্তিতে ফিনাইল করিতে পারেন। খানিকটা তৈয়ার করিয়া দিন, আমি ছড়াই।" তিনি বলিলেন,—"বেশ আমি তোমাকেই বিজ্ঞানবলে ফেনাইল প্রস্তুত করিতে শিখাইব। তুমি একটি নূতন মৃন্ময়পাত্র জলপূর্ণ করিয়া লইয়া আইস। দেখ, সূর্য্যকে আমরা সবিতা বলিয়া থাকি। সূর্য্যরশ্মি হইতে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। আমি উহা দেখাইতে পারি। অদ্য তোমাকে শিখাইব। ইহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন নাই।" আমাকে উহার প্রক্রিয়া বা processটী দেখাইয়া দিলেন। আমি সেইরূপ করায় পাত্রটীর তলদেশে একটী শ্বেতবর্ণের সিকনির ন্যায় দাগ পড়িল এবং পরক্ষণেই ঐ দাগ হইতে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতে লাগিল। পার্শ্বে বাবা উপস্থিত ছিলেন, দেখিয়া বলিলেন—, দেখ, কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্রই জলটি ফিনাইলে পরিণত হইবে।" ৮।১০ মিনিটের মধ্যে তাহাই হইল। সেইরূপে ঐ বাড়ীতে আমি উপর্য্যুপরি তিন দিন ফিনাইল প্রস্তুত করিয়াছিলাম। পরে বাড়ী ফিরিয়া আমাদের

প্রতিবেশী আলিগড়ের উকিল ৺রাসবিহারী দাসকে দেখাইবার জন্য একদিন ঐরূপ ফিনাইল প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং বাবাকে জানাইয়াছিলাম যে আমি এইরূপ ফিনাইল প্রস্তুত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি। উত্তরে তিনি বলিলেন,—"এইরূপ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা নিষেধ। তুমি উহা বিক্রয় করিও না।" আমিও ফিনাইল প্রস্তুত করার অভ্যাস ছাড়িয়া দিলাম।

১৩১৯ সালের পূজার ছুটিতে আমরা ১৫।১৬ জন বাবাকে লইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণে বাহির হই। ভ্রমণ পথে বাবার অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। উহার মধ্যে ২।১টার কথা লিখিলাম। যখন প্রভাতে ট্রিচিনাপল্লী হইয়া শ্রীরঙ্গমজীর মন্দিরদ্বারের বাসায় উঠি, বাবা আমাকে আদেশ করিলেন,—"ক্ষেত্র, পদ্মফুল লইয়া আইস। আমি অদ্য পদ্মফুল দিয়া পূজা করিব।" আমি বলিলাম,—"এ বিদেশে কেহ আমার কথা বুঝে না, আপনি কৃপা করিয়া কোথায় পদ্ম পাইতে পারি, একটু নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" তিনি বলিলেন,—"দেখ, আমি পদ্মের দিব্য গন্ধ অতি নিকটেই পাইতেছি। তুমি সামনের দিকে রশি খানেক পথ গেলেই পুষ্করিণীতে পদ্ম পাইবে। শীঘ্র লইয়া আইস।" সকলেই অবাক্। আমরা কেহই কোনও পদ্মের আঘ্রাণ পাই নাই। কেবল বাবাই নিজ অপূর্ব্ব শক্তি প্রভাবে পদ্মগন্ধ অনুভব করিতেছেন। যাহা হউক, আমি আদেশ মত একটি বস্তী পার হইয়া একটি সরু রাস্তায় মেয়েরা বাসন মাজিয়া আনিতেছে দেখিয়া মনে করিলাম অদূরে পুকুর আছে। সেই রাস্তায় কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি, এক ক্ষুদ্র পুকুর। কিন্তু উহাতে অনেক পদ্ম কিনারার অতি নিকটেই ফুটিয়া রহিয়াছে। অনায়াসে অনেকগুলি তুলিয়া আনিলাম ও বাবাকে পূজার জন্য দিলাম।

আমরা যখন ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাঞ্চী ষ্টেশনে নামিয়া শিবকাঞ্চীতে যমুনা বাইয়ের ধর্ম্মশালায় উঠিলাম, তখন সেখানকার কলে জল ছিল না। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার বলিলেন,—"অনতিপূর্ব্বে জল চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। দূরে সর্ব্বতীর্থ নামে পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে হইবে।" বাবাকে বলিলাম,—"কল আছে, কিন্তু জল নাই। বড়ই কষ্ট, হাত মুখ ধুইতে পাইতেছি না, উপায় করিয়া দিন।" বাবা বলিলেন,—"কেন বলিতেছ জল নাই? যাও, পুনরায় দেখ দেখি জল পাও কি না।" বাবার আদেশ মত পুনরায় কলের ট্যাপ খুলিয়া দেখি, বেশ জোরে জল আসিতেছে। আসিয়া সে বিষয় বাবাকে বলায় বলিলেন,—"এ জল কিন্তু এক ঘণ্টার বেশী থাকিবে না। আবশ্যকমত জল সংগ্রহ কর।" তাহাই হইল। এক ঘণ্টার পরেই আবার জল চলিয়া গেল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মশালার ম্যানেজার ও তাঁহার আফিসের লোকজন বাবাকে অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন যোগী বলিয়া বিশেষ মান্য করিল এবং পরদিন দলে দলে স্থানীয় বাসিন্দা বাবাকে দেখিতে আসিল। আমাদেরও শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দেখিবার সময় খুব খাতির হইল।

গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় কতবার কত জায়গায় পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া ফুরান অসম্ভব। একবার কাশীতে অবস্থানকালে বাবা বলিলেন,

—"দেখ, শরীর ব্যাধি-মন্দির। শরীর থাকিলেই অসুখ আছে। আজ আমার বেলা ১টার সময় জ্বর আসিবে।" সঙ্গে অন্যান্য ভাইদের মধ্যে খিদির পুরের বড় বাড়ীর স্টেটের ম্যানেজার ভিখুরাম ঘোষাল মহাশয় ছিলেন। বাবা বলিলেন,—"ভিখু, অদ্য তোমরা সব শীঘ্র আহারাদি করিয়া লও।" পরে বেলা ১২টা ৫৩ মিনিটের সময় ভিখুদা বাবার হাত দেখিয়া বলিলেন,—"জ্বর নাই, নাড়ী সহজ।" ১২।৫৫ মিনিটের সময় বলিলেন,—"নাড়ীতে যেন সামান্য বেগ হইয়াছে।" ঠিক ১টার সময় দেখিলেন, জ্বর স্পষ্ট হইয়াছে। ভিখুদা বলিলেন,—"একটি থারমোমিটার পাইলে ভাল হয়।" বাবা গায়ে কম্বল চাপা দিয়া বলিলেন,—"ভিখু, আমার ব্যাগ খুলিয়া ঠিক নিম্নে হাত দাও। একটি থারমোমিটার পাইবে। লইয়া আমার উত্তাপ পরীক্ষা কর।" ভিখুদা বাবার ব্যাগে সেইমত হাত দিয়া একটি নূতন তাপমান যন্ত্র পাইয়া দেখিলেন, বাবার উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী উঠিয়াছে এবং তিনি জ্বরে কাঁপিতেছেন। আমরা সকলেই বিমর্ষ। বাবা বলিলেন,—"এ জ্বর দুই ঘন্টা থাকিবে।" তাহাই হইল। ঠিক তিনটার সময় দেখা গেল জ্বর নিবৃত্ত হইয়াছে। বাবা যেন সহজ মানুষ। কিন্তু একটু দুর্ব্বল হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল। আদেশ করিলেন,—"ভিখু, থারমোমিটারটি ব্যাগে রাখিয়া দাও। উহাকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব।" ব্যাগে রাখিয়া বন্ধ করিয়া পরক্ষণে ব্যাগ খুলিয়া দেখা গেল যন্ত্রটি আর ব্যাগ মধ্যে নাই।

১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে আমরা বাবাকে লইয়া অম্বুবাচীর দুই দিন পূর্ব্বে কামাখ্যা যাই। সেখানে আমি বাবার আদেশে রাত্রি ৪টার সময় ৺মায়ের পূজার জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করি। আমাদের মধ্যে অন্য কেহই বাবার সঙ্গে যাইবার অনুমতি পান নাই। পান্ডা ঠাকুরও নিয়ে আসেন নাই। গুরু ভাইদের মধ্যে কেবল ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু (যিনি এখন কলিকাতা কর্পোরেশনের কলেক্টর) ও সত্য গোপাল দত্ত (অমৃতবাজার পত্রিকার সব-এডিটর) মন্দির মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও নীচে যাইতে অনুমতি পান নাই। নীচে নামিয়া বাবা আসনে বসিয়া আমাকে নিকটে বসিতে অনুরোধ করিলেন। কতক্ষণ পরেই খরস্রোতের খরতর শব্দ ও চটাপট করিয়া অসংখ্য বিদ্যুতের শব্দ হইতে লাগিল ও সিংহনাদে মন্দিরাভ্যন্তর ধ্বনিত হইল। ইহার অধিক আর লিখিতে পারি না। মনে হইল মুহূর্ত্ত পরে বাবা আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন,—"এই মাও রক্ত-বস্ত্র, পীঠস্থানে হাত দিয়া দেখ উহা কিরূপ প্রদাহে উত্তপ্ত হইয়াছে।" আমি হাতে খুব গরম অনুভব করিলাম এবং মাকে প্রণাম করিয়া বাবার সহিত উপরে উঠিয়া মন্দির বাহিরে আসিলাম। এরূপ অলৌকিক ব্যাপার ইতি-পূর্ব্বে কখনও কোন মন্দিরে দেখি নাই। হিন্দুর পীঠগুলি যে সাক্ষাৎ মায়ের স্থান, তাহার উপলব্ধি সঙ্গে সঙ্গে হইল।

যোগীর নিকটে দেশ ও কালের ব্যবধান থাকে না—তাহার দৃষ্টান্ত অনবরত বাবার নিকটে পাইয়া থাকি। যখনই সুদূরে নিভৃতে বাবার বিষয় চিন্তা করি, তাঁহার দিব্যগন্ধ তখনই অনুভূত হয়। এমন কি, আমরা কয়েকজন গুরু-

তাই একত্রে থাকিয়াও বাবার এইরূপ উপস্থিতি অনেকবার দেখিতে পাইয়াছি। যখন আশ্রমের জন্য ৺কাশীতে বাগানবাটী খরিদ হয়, সে সময় জ্যৈষ্ঠ মাস, কাশীতে খুবই গরম। তখন আমি, পূর্ব্বোক্ত ভিখুরাম ঘোষাল, গোপীনাথ কবিরাজ (যিনি এখন বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল) ও সতীশচন্দ্র দে (যিনি কাশীর জমিদার ও উকিল) দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর বৈকালে বসিয়া বাবার কথা বিশেষ আলোচনা করিতাম। বাবা সেই সময়ে সুদূরে ৺পুরী আশ্রমে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অপূর্ব্ব গন্ধে আমাদিগকে একত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিভোর করিয়া দিতেন। এরূপ একদিন অথবা একবার নহে, বহুবার বহুদিন হইয়াছে। গোপীদাকে আমি এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"মহাপুরুষকে আসিতে হয় না, একটু দৃষ্টি করিলেই তাঁহার বিভূতি আমার অনুভব করিতে পারি।"

গুরুদেবের বিরাট ভাব আমি সম্যক্ অনুভব করি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার লোমকূপের যে বিরাট্ সম্প্রসারণ দেখিয়াছি তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইতে হয়। গাত্রে প্রদাহ হয় বলিয়া শীতল রাখিবার উদ্দেশ্যে বাবা গায়ের ভিতর অনেকগুলি স্ফটিক পুরিয়া রাখেন। এরূপ স্ফটিক মধ্যে মধ্যে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ঝাড়িয়া পড়ে এবং কখনও বা তিনি দেখাইবার জন্য লোমকূপ সম্প্রসারণ করিয়া বাহির করেন। কখনও আমরা হস্তের অথবা বক্ষের পার্শ্বদেশে স্ফীত মাংস দেখিয়া স্পর্শ দ্বারা অনুভব করি যে উহার অভ্যন্তরে স্ফটিক গজ গজ করিতেছে। কখনও বাবা উহা অঙ্গুলি স্পর্শে ভিতরে ঢুকাইয়া রাখেন, কখনও বা লোমকূপ ফাঁক করিয়া বাহির করিয়া লয়েন। একবার ৺পুরী ধামের আশ্রমে সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ একটি স্ফটিক নিজ গাত্র হইতে নির্গত করিয়া আমার একটি কন্যার হস্তপেশীর মধ্যে তাহার লোমকূপ প্রসারিত করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। ২।৩ ঘণ্টা উহা তাহার হাতের উপর স্ফীতভাবে অবস্থান করে। তাহাতে আমার কন্যা বিরক্ত হইয়া বাবাকে বলায় তিনি হাত দিয়া চাপিয়া ঐ স্ফটিকটি আমার কন্যার হস্ত মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। এখনও উহা সেই রূপেই আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু হাত দিয়া আমরা আর তাহা দেখিতে পাই না।

১৩৩৪ সালের কার্ত্তিক মাসে আমরা বাবাকে লইয়া কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল যাই। সেখানে ভগলু পাণ্ডার মুখে তাঁহার অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ভগলু বলিল,—প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাবা যখন বিন্ধ্যাচলে যোগাভ্যাস করিতেন, তখন তিনি লাহিড়ীয়া জঙ্গলের মধ্যে থাকিতেন এবং ভগলুর পিতা প্রত্যহ বাবাজীর জন্য রুটি দিয়া আসিতেন। একদিন ভগলু বিন্দুবাসিনীর ঘাটে খেলা করিতেছিল—তখন তাহার বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে। বাবা প্রায় ৫টার সময় সেই ঘাটে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ভগলুকে ডাকিলেন। ভগলু বলিল,—"কেন ভাইয়া?" বাবা গলা হইতে স্ফটিক মালা খুলিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং ঝুলিটি দিয়া বলিলেন,—"ভগলু, তুমি এইগুলি লইয়া একটু বস, আমি গঙ্গায় স্নান করিব।" ভগলু বলিল—"ভাইয়া, ঘাটের বাম

দিকে যাইও না, ঘূর্ণি আছে, ডুবিয়া যাইবে।” কিন্তু বাবা যেন সেকথা শুনিতে পান নাই-এরূপভাব দেখাইয়া পরক্ষণেই সেই ঘূর্ণি মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ঘূর্ণিতে একপাক ঘুরিয়া জলমধ্যে তলাইয়া গেলেন। ভগলু বলিল,—“আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।” চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া ঘাটের পুলিস সেপাহী নিকটে আসিয়া ভগলুকে এরূপে আকস্মিক চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ভগলু দেখিল মহাবিপদ, যদি বলে লোক ডুবিয়াছে, তাহা হইলে সেই লোকের দ্রব্যাদি তাহার হাতে দেখিয়া হয় ত সেপাহি উহাকে থানায় টানিয়া লইয়া যাইবে। এই ভয়ে সে প্রকৃত কথা না বলিয়া উত্তর করিল,—“এক সন্ন্যাসী তাহাকে এই দ্রব্য কয়টি দিয়া অনেকক্ষণ হইল গিয়াছে, সে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং সন্ন্যাসীও আসিতেছে না। পাহাড়াওয়ালা তাহাকে আরও কিছুক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করিতে বলিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। ভগলু কি করে—কি করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া তাহার পিতাকে ভাইয়ার জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ দিবে ভাবিয়া আকুল হইল এবং ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। যখন সন্ধ্যা হয়-হয় এবং ভগলু কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, বাবা তখন হাসিতে হাসিতে ভগলুকে পশ্চাৎদিক হইতে গা মুছিতে মুছিতে ডাকিলেন। ভগলু একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভিখুরাম ঘোষাল

খিদিরপুর বড়বাড়ী; কলিকাতা।

বিগত বাংগলা ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসে আমি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস গুরুদেবের সহিত ৺কাশীধামে বিশুদ্ধানন্দ-কুটীর নামক তাঁহার আশ্রমে আসি এবং ঐ আশ্রমে তাঁহার সঙ্গে প্রায় ৬।৭ মাস কাল থাকি। তৎকালে তাঁহার যে সকল অলৌকিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

ঐ সময়ে বাবার অনেক শিষ্য ও ভক্ত ঐ আশ্রমে যাওয়া-আসা করিতেন ও থাকিতেন। কিন্তু আমি তাঁহার কাছে প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতাম। একদিবস বিকালে বাবা আশ্রমের দ্বিতলে একটি গৃহে বসিয়াছিলেন—তথায় আমি ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাবার পান খাইবার ইচ্ছা হইল। তথায় অন্য কেহ না থাকায় আমিই পান তৈয়ার করিবার জন্য ত্রিতলের ভাড়ার ঘরের মধ্যে যাইয়া তথায় ৪।৫ মিনিটের মধ্যে পান তৈয়ার করিয়া বাবার ঘরের মধ্যে আসিলাম, দেখিলাম, বাবা তথায় নাই। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—“বাবা বাবা এই যে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন।” তারপর আশ্রমবাটীর দ্বিতল,

ত্রিতল ও একতালার সমুদয় গৃহাদি অনুসন্ধান করিলাম ও বাটীর বাহিরে যাইয়াও দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু বাবাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পরে দ্বিতলের যে গৃহে বাবা ছিলেন সেই গৃহে পুনর্বার বিহারী চট্টোপাধ্যায় ও আমি যাইয়া তথায় ২।১ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাবার কথা শুনিতে পাইলাম। বাবা আমাদের নিকটেই অথচ অদৃশ্য থাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি ত তোমাদের সামনেই আছি। তোমরা যদি আমাকে দেখিতে না পাও, আমি কি করিব ?" এইরূপে প্রায় ২।৩ মিনিটকাল তিনি অদৃশ্য থাকিয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অথচ আমরা সেই স্থানে থাকিয়া ও চতুর্দ্দিকে ঘোরাফেরা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তারপর হঠাৎ দেখি তিনি আমার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া আছেন ও হাসিতেছেন। তৎক্ষণাৎ আমরা আশ্চর্য্য ও পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহার জন্য যে পান তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিলাম তিনি আনন্দে তাহা খাইতে লাগিলেন।

একদিন এক বাজিকর বাজি খেলিতে আইসে। বাবার বাজি দেখিবার খেয়াল হইল এবং আশ্রমের সামনে বাজি খেলাও আরম্ভ করাইয়া দেওয়া হইল। বাজিকর ২।৩টি বাজি খেলিবার পর একটি কাপড়ের থলি তাহার ঝুলির মধ্য হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। তাহা ভাল করিরা দেখিলাম ও ঝাড়লাম—তাহার মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাজিকর সেই থলি মৃত্তিকার উপর রাখিয়া একখানি হাড় তাহাতে ছোঁয়াইয়া "হিজি বিজি" কত কি বকিতে লাগিল। তারপর থলিটি যেমন সে উঠাইয়া লইয়া ঝাড়িল অমনি ঝন্ ঝন্ করিয়া কয়েকটি টাকা তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল—গণিয়া দেখা গেল ১৬ টাকা, ষোলটি টাকা। তখন বাবা বাজিকরকে বলিলেন,—"ঐ টাকাগুলি পুনর্ব্বার থলির মধ্যে রাখিয়া থলিটি পুনর্ব্বার মৃত্তিকার উপর রাখ, তার উপর একখানি কাপড় চাপা দেও।" বাজিকর তাহা করিতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিল বটে, কিন্তু পরে বাবার কথানুযায়ী টাকাগুলি থলির মধ্যে রাখিয়া থলিটি মৃত্তিকার উপর রাখিল ও এক টুকরা কাপড় চাপা দিল। ২।১ মিনিট পরে বাবার আদেশমত বাজিকর কাপড়ের টুকরা সরাইয়া থলিটি লইয়া যখন ঝাড়িল তখন তাহার মধ্য হইতে টাকাগুলি পড়িল না, এমন কি থলির মধ্যে কোন টাকা দেখাই গেল না। বাজিকর আশ্চর্য্য ও বিষণ্ণ হইয়া টাকার জন্য বারংবার কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বাবার দয়া হইল এবং তাঁহার আদেশমত বাজিকর তাহার ঝুলি মৃত্তিকা হইতে উঠাইবামাত্র মৃত্তিকার উপর টাকাগুলি দেখিতে পাইল। টাকা ও ঝোলাঝুলি লইয়া বাজিকর তৎক্ষণাৎ ব্যস্তভাবে ও দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল। বারংবার বলা সত্ত্বেও সে আর বাজি দেখাইল না।

একদিন বেলা আন্দাজ দুইটার সময় কলিকাতা হইকোর্টের উকিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান জজকোর্টের উকিল কালাচাঁদ মজুমদার, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট পুলিপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা মিউনিসিপাল কালেক্টর যোগেশচন্দ্র বসু, ও জমিদার

প্রকাশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি দশ বারজন বাবার শিষ্য ঐ আশ্রমের দ্বিতলের গৃহে বসিয়া নিজেদের মনের কথা বলিয়া দিবার জন্য বাবাকে অতি যত্ন ও জেদ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। বাবাও খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া আদেশ করিলেন,—"তোমরা অপর একটি ঘরে বসিয়া একখানি কাগজে যে যাহার মনের কথা নিজ হাতে লিখ, কিন্তু যেন এক এক জনের লেখা এক এক ছত্রের বেশী না হয়।" আমরা সকলে বাবার ঐ আদেশানুসারে দ্বিতলের অপর একটি ঘরে বসিয়া যে যাহার মনের কথা ঐরূপ ভাবেই লিখিলাম। তাহা বাবাকে জানান হইল; কিন্তু কি কি লেখা হইল তাহা বাবাকে শুনান হইল না ও কাগজগুলিও তাঁহাকে দেখান হইল না। তাহার পর বাবার আদেশমত ঐ লিখিত কাগজগুলি ঐ ঘরে বসিয়া ক্ষুদ্রাকারে মুড়িয়া ঠিক অর্দ্ধ টাকা বা একটি আধুলীর মত ছোট আকারে আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইল ও তাহা বাবাকে জানান হইল। পরে বাবা আশ্রমের ত্রিতল গৃহে উঠিয়া যাইলেন। আন্দাজ দশ মিনিট পরে দ্বিতলের গৃহে নামিয়া আসিয়া, আমরা ঐ দগ্ধ কাগজখানিতে নিজ নিজ হস্তাক্ষরে যাহা যাহা লিখিয়াছিলাম, ঠিক ঠিক সেই সেই হস্তাক্ষরে লিখিত সেই সেই বিষয়-যুক্ত এক একখানা কাগজ আমাদিগকে দিলেন। আমরা অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম এবং উপরোক্ত গিরীন্দ্র বাবু বাবাকে বলিলেন,—"ইহাতে আমরা খুব আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি ও আনন্দ পাইয়াছি, কিন্তু আমাদিগের একটী প্রার্থনা এই যে, আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ভবিষ্যৎ ফলাফল দয়া করিয়া কিছু বলিয়া দিন।" তাহাতে বাবা পূর্ব্বোল্লিখিতমত অপর একটি ঘরে বসিয়া একখানি কাগজে এক এক ছত্রে যে যাহার প্রশ্ন নিজ নিজ হস্তে লিখিতে ও তাহা উপরোক্ত মতে মুড়িয়া পোড়াইতে সকলকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কাগজে প্রশ্ন লেখা ও পোড়ান হইল এবং তৎসংবাদ বাবাকে জানান হইল, কিন্তু কি কি লেখা হইয়াছিল তাহা বাবাকে শুনান হইল না বা লিখিত কাগজখানি তাঁহাকে দেখান হইল না। পরে বাবা সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে রাত্রি আন্দাজ নয়টার পর একখানি কাগজ আমাদের হস্তে দিলেন। ঐ কাগজখানির একপার্শ্বে আমাদের হস্তাক্ষরযুক্ত প্রশ্নগুলি এবং অপর পার্শ্বে অন্যের হস্তাক্ষরে সেই প্রশ্নের ভবিষ্যৎ ফলাফলের উত্তর বিস্তারিতভাবে লিখিত ছিল। ভবিষ্যতে ঐ উত্তর অনুসারে সকলেরই ফলাফল মিলিয়া গিয়াছে।

আশ্রমে আমি বাবার যথাসাধ্য সেবাদি করিতাম। আশ্রমের বাজার করা ও অন্যান্য কার্য্যের ভার তৎকালে আমারই উপর ছিল। বাবা তৎকালে প্রত্যহ রাত্রি ১০ টার সময় যোগ-গৃহে প্রবেশ করিতেন ও পরদিবস বেলা প্রায় নয়টার সময় সেখান হইতে বাহির হইতেন। কোন কোন দিন বাহির হইতে বেলা দশটাও বাজিয়া যাইত। অধিক বেলা হইয়া গিয়াছে এইরূপ কোন কথা বলিলে বাবা বলিতেন যে কোন কারণে তাঁহাকে কোন দূরস্থ প্রদেশে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ মধ্যে মধ্যে বেলা হইত এবং তাহা কথা প্রসঙ্গে উত্থাপন করিলে কোন দূরদেশে তাঁহার যাওয়া হইয়াছিল এইরূপ তিনি প্রকাশ করিতেন। এক সময়ে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ৺শারদীয়া পূজার অবকাশে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত গিরীন্দ্র বাবু, যোগেশ বাবু, সতীশ

বাবু, ক্ষেত্রগোপাল বাবু, প্রকাশ বাবু প্রভৃতি বাবার অনেক শিষ্য ৺কাশী-আশ্রমে আইসেন এবং প্রায় মাসাবধি কাল বাবার কাছে থাকেন। আমি প্রত্যহ প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাটের বাজারে বাজার করিতে যাইতাম এবং বাবার যোগ-গৃহ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ বেলা নয়টার মধ্যেই বাজার হইতে ফিরিয়া আসিতাম। এক দিবস বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিতে আমার বিলম্ব হইয়া যায়। তাহাতে আমি বিশেষ চিন্তিত হই। যেহেতু বাবা যোগ-গৃহ হইতে বাহির হইলেই শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে ৺পূজার স্নানজল বিতরণ করা ও বাবার সেবাদি কয়েকটি কার্য্য আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। সেই দিন বাজারে বিলম্ব হওয়ার দরুণ উক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী হইল বলিয়া বাজার হইতে ফিরিবার কালে রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে আসি। আমার সঙ্গে একটি ভদ্রলোক ও দ্রব্যাদি মাথায় দুইটী মজুরাণী ছিল। তাহারা আমার অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল। আমি যখন বেলা আন্দাজ দশটার সময় আশ্রমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম অর্থাৎ আশ্রমের পূর্ব্বদিকে আন্দাজ পঞ্চাশ হস্ত অন্তরে আসিলাম, তখন আশ্রমের ত্রিতলে বাবার থাকিবার গৃহের দিকে দৃষ্টি-পাত করিবামাত্র দেখিলাম যে, বাবা শূন্যমার্গে দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া ত্রিতলের গৃহের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডা ডিঙ্গাইয়া ঐ গৃহের পূর্ব্বদিকের জানালার লোহার গরাদের তিন ইঞ্চি ফাঁকের মধ্যে মাথা প্রবেশ করাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তৎকালে তাঁহার দেহ খুব সূক্ষ্ম ও শীর্ণ বোধ হইল কিন্তু মুখের কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। এই অবস্থায় আমি ছাড়া আমার পার্শ্ববর্ত্তী এক বয়ঃস্থা নাগপুরী মহিলা ও একজন মুসমানের দৃষ্টি তাঁহাতে পড়িয়াছিল। আমি ঐ অবস্থা দেখিবামাত্র ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, যোগ-গৃহ হইতে মধ্যে মধ্যে বাবার বাহির হইতে বিলম্ব হইলে বাবা যে বলেন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন তাহা আজ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মনের আশা পূর্ণ হইল ও ধন্য হইলাম। বুঝিয়াছিলাম, এই দাসের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া ও আশীর্ব্বাদ আছে।

শ্রীভিক্ষুরাম ঘোষাল।

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু

৭, কুন্ডু রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

১৯১২ সালে ১৫ বৎসর বয়সের সময় আমার মাতৃ-বিয়োগ হয়। তাহার পর হইতেই আমার পিতার মনে সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসীন্যের ভাব আসে এবং তিনি নানাস্থানে প্রকৃত সদ্গুরুর সন্ধান করিতে থাকেন। আমার

মেজজ্যাঠা মহাশয়, আমার পিতা ও বাবু প্রকাশচন্দ্র ঘোষ এই তিনজন প্রায় একত্রই সাধু-সন্ধানে যাইতেন। এই সময়ে বাবু গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ভবানীপুরে বাস করিতে ছিলেন। ক্রমে তাঁহার সহিত আমাদের পরিবারস্থ সকলের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে এবং তাঁহারই ভবানীপুরের বাসা বাটীতে ১৯১৪ সালে বাবা এবং মেজজ্যাঠা মহাশয় প্রথম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন করেন। রিক্ত হস্তে সাধুদর্শন অনুচিত বিবেচনা করিয়া দর্শন করিতে যাইবার সময় বাবা ও প্রকাশ বাবু আমাদের বাগান হইতে দুইটি গাঁদা ফুল লইয়া যান। ঐ দুইটি ফুলে গুরুদেব কটাক্ষপাত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ করিয়া দেন। বাটীতে তাঁহারা ঐ ফুল দুটি লইয়া আসিবার পরও এবং শুখাইয়া একেবারে নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে ঠিক সেইরূপ মিষ্ট গন্ধ ছিল। একটিতে খসখসের এবং অপরটিতে গোলাপ কিম্বা বেলের গন্ধ হইয়াছিল। তাঁহাদের মুখে গুরুদেবের সৌম্যভাব ও অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত কান্তির কথা শুনিয়া মেজজ্যাঠা মহাশয় যাইলেন এবং তিনিও ফিরিয়া আসিয়া শতমুখে গুরুদেবের দিব্যভাবের কথা বলিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার ৩।৪ দিন পরে গোপাল বাবুর শ্বশুরবাটীতে বৈকালে আমি তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করি। প্রথম দর্শনে আমি তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চভাব পোষণ করিতে পারি নাই,—বরং জ্ঞানগঞ্জ ও চন্দ্রলোক সম্বন্ধে কিছু কিছু গল্প শুনিয়া মনে একটু অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাবই আসিয়াছিল। বাটী ফিরিয়া আমার সমবয়সী বন্ধুদিগের সহিত সেই মর্ম্মেই শ্লেষ ও বিদ্রূপসূচক আলোচনা করিতে থাকি। সেই সময় ঐরূপ করিবার কারণও ছিল।

প্রায় ১২/১৩ বৎসর বয়সের সময় আমার মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হইয়াছিল এবং প্রথমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও তৎপরে বিবেকানন্দ স্বামীর বহি পড়িয়া মনে ধারণা হইয়াছিল যে, যোগ-বিভূতি একটা মস্ত ম্যাজিক ও "সিদ্ধাই", যাহারা দেখায় তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব যদিও থাকে, লোকপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম-প্রাধান্যলাভেচ্ছাই তদপেক্ষা বেশি এবং যুবকগণের সেই সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই যোগ বিভূতির কথা বিশেষ বিশ্বাসও করিতাম না এবং যাহারা করে বা দেখায় তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও হইত না।

যাহা হউক, ক্রমে আমার পিতা ও জ্যাঠা মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের যত্ন ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব কলিকাতায় আসিলেই প্রায় তিন চারি দিন করিয়া আমাদের বাটীতে কাটাইয়া যাইতেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অবস্থান সময় বর্দ্ধিত করিয়া বৎসরে প্রায় দুই তিন মাস করিয়াও থাকিতেন। এইরূপ ভাবে প্রায় সাত আট বৎসর চলিয়াছিল।

তাঁহার অবস্থানকালে আমাদের পাঠদ্দশায় তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। প্রথমে যে অশ্রদ্ধার ভাব ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পরিণত হইল। প্রথমে অবিশ্বাসের ভাব থাকিলেও আমি কখনও শ্রদ্ধাহীন হইয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিতাম না, বরং যথাসাধ্য সত্যাসত্য বিচার করিতে চেষ্টা করিতাম। ফলে দেখিলাম যে যাঁহাকে আমি পূর্ব্বে বুজরুক মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার ন্যায় সত্যাশ্রয়ী জগতে বিরল এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কেন যোগ বিভূতিকে ত্যাজ্য বলিয়া গিয়াছেন তাহাও বুঝিলাম। আমার এই সকল কথা বলিবার কারণ যে, আমি যে সকল স্বীয় অনুভূতি গ্রন্থকারের নির্ব্বন্ধাতিশয্য বশতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি তাহা এরূপ আশ্চর্য্য ও অনন্যসাধারণ যে শুনিলে লোকের মনে ভুল হওয়া সম্ভব যে আমি হয়ত কোন রূপে মোহাবিষ্ট ও একান্ত সরলভাবে এই সকল বিষয়ে বিশ্বাসী হইয়াছি।

আমি যে সকল অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি সে গুলিকে সাধারণ ভাবে চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ১ম—ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দ্রব্যাদি সৃষ্টি বা আনয়ন এবং তাহার রূপান্তর করা। ২য়—স্বীয় শরীরের উপর নানারূপ ক্রিয়াকলাপ। ৩য়—অপরের শরীরের উপর ঐরূপ কার্য্য। ৪র্থ—সূক্ষ্ম শরীরে এবং সময় সময় স্থূল শরীরেই বহুদূর হইতে গমনাগমন ও সূক্ষ্মভাবে অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার।

প্রথম বিষয়ের বিভূতি অনেক শিষ্যই দেখিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবে উহার উল্লেখ না করিয়া মোটামুটি বলিতে চাই—প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে থার্মোমিটর, ঔষধের টেবলেট, জনায়ের মনোহরা, সন্দেশ প্রভৃতি হস্ত প্রসারণ মাত্র আনিতে দেখিয়াছি।

দ্বিতীয়টির মধ্যে নিজ শরীরের ভিতর পদ্মবীজ, টাকা, মোহর প্রভৃতি প্রবেশ করান, মস্তক হইতে শালগ্রাম শিলা বাহির করিয়া পুনরায় তাহা মস্তকে স্থাপন এবং শরীরের ভিতর হইতে দেহে রক্ষিত স্ফটিক বাহির করা—এই সকল অলৌকিক বিভুতি বহুবার বহুস্থানে দেখিয়াছি।

অপরের শরীরে স্ফটিক প্রবেশ করাইতে আমি তাঁহাকে দুইবার দেখিয়াছি। প্রথম ঘটনা ৺পুরীধামে হইয়াছিল—বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ১০/১১ বৎসরের কন্যার হস্তে। একদিন আহারাদির পর ক্ষেত্র বাবুর কন্যার ডান হাতে কনুয়ের উল্টা দিকে একটি স্ফটিক লইয়া অল্প চাপিয়া দিতেই তাহা স্বচ্ছন্দে চামড়া ভেদ করিয়া শরীরের ভিতর ধীরে ধীরে ঢুকিয়া গেল—কোনও রক্তপাত বা ক্ষতচিহ্ন রহিল না—কেবলমাত্র সেই স্থানে সামান্য একটু লালচে ভাব প্রায় আধ মিনিট কাল ছিল। তৎপরে তাহাও মিলাইয়া গেল। কেবল হাতের ভিতর যেখানে স্ফটিকটি প্রবেশ করাইয়া দিয়েছিলেন সেই স্থানটি অল্প একটু উঁচা হইয়াছিল। আমরা সেই ফুলাটি টিপিয়া ঠেলিয়া দেওয়াতেই বেশ বুঝা গেল যে ভিতরকার জিনিসটি সরিয়া যাইতেছে। ক্রমে দেহের ফুলাভাবটি চলিয়া যাইলে পর শরীরের কোথায় সেই স্ফটিকটি আছে তাহা আর বুঝা যাইত না। তবে শ্রীশ্রীগুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেই স্ফটিকটি কোথায় আছে দেখাইয়া দিতেন। ঐ জিনিষটী এখনও তাহার শরীরের ভিতর আছে এবং সে জন্য বা তাহার গতির জন্য ঐ বালিকার কোনও কষ্ট বা

অস্বচ্ছন্দতা নাই। ঐরূপ বাবু বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের এক পুত্রের হাতেও স্ফটিক ঢুকাইয়া দিতে দেখিয়াছি। সেটিও এখন তাহার শরীরে আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলেন যে ঐভাবে স্ফটিক থাকাতে শরীরে হঠাৎ কোনও কঠিন পীড়া আসিতে পারে না এবং মানসিক বৃত্তিরও উন্নতি হয়।

বিনা কষ্টে বা রক্তপাতে কি করিয়া অপরের শরীরে কঠিন দ্রব্য ত্বগ্‌ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিলেন যে,—"জগতের সমুদায় বস্তুই সচ্ছিদ্র—কেবলমাত্র একের উপর এক, এবং তাহার উপর আর এক, সচ্ছিদ্র সূক্ষ্ম আবরণগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, দ্রব্যাদি কঠিন ও ছিদ্রহীন দেখায়। যে কেহ ঘনসন্নিবিষ্ট আবরণগুলিকে শ্লথ করিতে পারিবে তাহার নিকট কাঠিন্য বা অবরোধ বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না।"

দ্রব্যাদির রূপান্তর সাধনের মধ্যে এক পুষ্পকে অন্য পুষ্পে পরিণত করা —এক সুগন্ধি পুষ্পকে নির্গন্ধ করিয়া অন্য পুষ্পে বা দ্রব্যে ঐ গন্ধের সঞ্চার করা, ১০ টাকার নোটকে ৫ টাকার নোটে পরিণত করা ও একই টাকার উপরকার ছাপা বৎসরকে পরিবর্ত্তন করা, সুতার রুমালকে নানাবর্ণে চিত্রিত সিল্কের রুমালে পরিণত করা ইত্যাদি ব্যাপার বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই সকল রূপান্তর ইচ্ছাশক্তিতেও হইতে দেখিয়াছি এবং সূর্য্য-বিজ্ঞানের সাহায্যেও সাধিত হইতে দেখিয়াছি। উভয়ে প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানে একটু বিলম্ব হয়, আর ইচ্ছাশক্তিতে খুব শীঘ্র হয় এবং উহাতে কোনও রূপ যন্ত্রের সাহায্য দরকার হয় না। এতদ্ভিন্ন হস্তবিজ্ঞান বলিয়া এক অদ্ভুত বিজ্ঞানের সাহায্যেও এরূপ ঘটিতে দেখিয়াছি। তাহাতেও কোনওরূপ যন্ত্রসাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আমি যখন এম্ এ ক্লাসে পড়ি, বোধ হয় ১৯১৭ কি ১৯১৮ সালে, আমাদের বাটীতে আমরা প্রথম সূর্য্যবিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রীশ্রীগুরুদেবকে সাধিতকরিতে দেখি। আমার মনে সন্দেহ ছিল যে সূর্য্যবিজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিতে বিশেষ প্রভেদ নাই। সেই সময় একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেব এই দুইয়ের প্রভেদ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া উদাহরণ স্বরূপ বলেন যে,—"এই পান আমি দিতেছি এবং আমি ইচ্ছা করি যে ইহাতে পদ্ম-গন্ধ হউক" এই বলিয়া আমাকে পানটি দিলেন। দেখিলাম যে উহা অতি সুন্দর পদ্মগন্ধযুক্ত। তাহার কিছু পর অন্য কথা হইতে হইতে ডিবা হইতে আমাকে আর একটি পান দিলেন, দেখি যে সেটিও সেইরূপ পদ্মগন্ধযুক্ত। ইহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে ডিবাতে যতগুলি পান ছিল সবগুলিই পদ্মগন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের ক্রিয়া এক সময় একটি দ্রব্যের উপরই হইতে পারে এবং তাহাতে যন্ত্রের ও কিছু সময়ের আবশ্যকতা হয়। ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া ইচ্ছামাত্রেই পরিণত হয়, যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না এবং বহু দ্রব্যের উপর উহা একই সময়ে সাধিত হইতে পারে।

গত বৎসর ৺কাশীধাম আসিবার পূর্ব্বে ভবানীপুর আশ্রমে অবস্থানকালীন শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাকে নানারূপ পশুর ছবি আঁকা রুমাল কুমারীদিগকে দিবার জন্য আনিতে বলেন। ঐরূপ কত রকমের রুমাল পাওয়া যায়

বলিতে বলিতে তিনি একখানি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড লইয়া হাতের মুঠার ভিতর রাখিলেন এবং প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল পরে একখানি অতি সুদৃশ্য রুমাল মুঠা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—"এইরূপ রুমাল আনিতে পার ?" রুমালখানি বেগুনী রঙের সিল্কের এবং তাহার চারিকোণে ছোট ছোট সিংহ এবং মধ্যে একটি বড় সিংহ সুন্দরভাবে সোনার জলে ছাপা ছিল। অল্প সময় পরে রুমালটি পুনরায় ধীরে ধীরে সেই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হইল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কলিকাতার সমস্ত বাজার খুঁজিয়াও ঐরূপ একখানি রুমালও পাই নাই।

গত বৎসর শ্রীশ্রীগুরুদেব বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে ৺কামাখ্যায় যান। যাইবার পূর্ব্বে ৺কামাখ্যায় থাকার নানা অসুবিধার কথা হইতেছিল। এমন সময় আমার কন্যা—তাহার বয়স তখন ৩ বৎসর—বলে,—"সেখানে চড়াই পাখীর মতন মশা আছে।" শ্রীশ্রীগুরুদেব হাসিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি, ৺কামাখ্যার মশা ইহা অপেক্ষা বড় কিনা।, এই বলিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালন করিয়া মুঠা খুলিয়া এক চামচিকা বাহির করিয়া আমার কন্যার হাতে দিলেন সেটি জীবন্ত কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবে ছিল; অল্পক্ষণ পরে বেশ সজাগ হইয়া চলিতে লাগিল।

গত বৎসর বোধ হয় আষাঢ় মাসেই একদিন সকালে হঠাৎ গুরুদেব আমাকে বলিলেন যে,—'কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন তোমাদের অফিসে তহবিল তছরূপ হইয়াছে এবং সেই অভিযোগে পুলিশ তোমাকে ধরিতে উপক্রম করিয়াছে। এমন সময় সকলে ব্যস্ত হইয়া বলিল,-'বাবা! যতীশের বড় বিপদ; রক্ষা করুন।' আমি বলিলাম,—'কেন, তাহাদের বাটীতে শ্রীশ্রীগোপাল বসিয়া খালি কি সেবা মারিতেছে? যতীশকে কেন রক্ষা করিবে না?, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গোপালজীউ মস্ত এক গদা হাতে করিয়া হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হইয়া যে সকল লোকে তোমার নামে মিথ্যা দোষারোপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে গদা প্রহার আরম্ভ করিলেন এবং দোষীদিগকে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীশ্রীগোপালজীউ আমাকে রক্ষা করিতেছেন জানিয়া মনে বড় আনন্দ বোধ করিলাম। কিন্তু অফিসের অধীনস্থ সকল কর্ম্মচারীদিগের সদ্ভাবে আমার এতদূর আস্থা ছিল যে, এই ঘটনা যে কোন দিন সত্যে পরিণত হইতে পারে এই ধারণা আমার মনের কোণেও উদয় হইল না। পরে কিন্তু দেখা গেল যে সত্যই প্রায় ঐ সময় হইতে কতিপয় কেরাণী মিলিয়া এক ভীষণ প্রতারণা করিয়াছে এবং তাহার ফলে সুনাম বজায় রাখিয়া বাহির হইতে আমাকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের তাহার গুরুদেবের গুরুদেবের আদেশ অনুসারে ভবিষ্যৎ বিষয় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বলিয়া, নানাভাবে তিনি নিজের শিষ্যদিগকে আগত প্রায় বিপদ হইতে সাবধান করিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন—তবে 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।' শিষ্যগণ সৌভাগ্যবশতঃ তাহার ইঙ্গিত ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেই আচিরাৎ বিপন্মুক্ত হয়।

আমার মেজজ্যাঠা মহাশয়ের জীবদ্দশায় আমাদের বাটীতে একদিন রাত্রে

কথায় কথায় গুরুদেব বলেন যে, তাঁহার মস্তকের ভিতর ২।৩টি শালগ্রাম শিলা ও একছড়া স্ফটিকের মালা আছে। দেখিতে চাহিলে, অল্প অল্প মাথা নাড়িয়া ভিতরে খুটু্ করিয়া শব্দ হইতেছে শুনাইলেন। ভাল বিশ্বাস হইল না বলিয়া দেখাইতে অনুরোধ করাতে তিনি পরদিন প্রাতে দেখাইতে স্বীকার করিলেন। রাত্রে দেখান সম্ভব নহে, কারণ শালগ্রাম বাহির করিলেই তাঁহার পূজা করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আহ্নিকের পর আমরা সকলে তাঁহার ঘরে যাইলাম এবং তিনি মাথা একটু নাড়িয়া অল্প একটু হেঁচকা দিয়া দম লওয়াতেই মুখ দিয়া প্রথমে একটি পরে আর একটি শিলা বাহির হইল। পরে তাঁহাদের পূজা করিয়া আবার ঐ ভাবেই মাথার ভিতর তুলিয়া রাখিলেন।

আর একদিন প্রায় ঐ সময়েই তাঁহার ঘরের দ্বার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি নীচে সশরীরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ—প্রত্যহ সকালবেলা প্রায় আটটার সময় গুরুদেব আহ্নিকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দ্বিতলের ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে আসিয়া বসিতেন। আসিবার সময় একতালার একটি খোলা ছাদ পার হইয়া নীচে যাইবার সিঁড়ি দিয়া আসিতে হইত। আমরা সকলে প্রণাম করিবার জন্য সিঁড়ির নীচে একতালায় বসিয়া থাকিতাম। যেখানে বসিতাম সেই স্থান হইতে ঘরের দরজাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত। ঘটনার দিন আমরা যথানিয়ম নীচে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি পশ্চাতে গুরুদেব সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এবং প্রণামান্তে উপরের ঘরে স্নানজল আনিতে গিয়া দেখি ঘরের সকল দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ। গুরুদেব তখন নীচে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে বলাতেই তিনি বলিলেন,—"দেখ এতক্ষণে খুলিয়াছে।" আমরা উপরে যাইতে যাইতেই খিল খোলার শব্দ জোরে শুনিতে পাইলাম এবং গিয়া দেখি ঘরের দরজার খিল সব খুলিয়া গিয়াছে।

ঝালদার রাজা উদ্ধবচন্দ্র সিংহ প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, এইরূপ ঘটনা গুরুদেব যখন ৮।৯ বৎসরের বালক ছিলেন তখন একবার ঘটিয়াছিল। এই কথা রাজা উদ্ধব গুরুদেবের মাতার নিকট শুনিয়াছিলেন। দুষ্টামি করার নিমিত্ত জননী তাঁহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল দিয়া যান। বালকের ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য হঠাৎ প্রবল ইচ্ছা হইল এবং দরজার মধ্যে যে অল্প ফাঁক ছিল তাহার ভিতর দিয়া নিজের শরীর সঙ্কুচিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

নিজের শরীরের ভিতর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নীচে দিয়া পদ্মবীজ প্রবেশ করাইতে এই সময় প্রথম দেখি। বীজটি ঢুকাইয়া দিবার পর সেই স্থানে অল্প একটু লালচে ভাব কিছুক্ষণ ছিল, তৎপরে আর কোনও চিহ্ন ছিল না। বীজটি হাতের উপর দিয়া ঠেলিয়া বুকের কড়ার কাছে লইয়া আসিয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গুরুদেবের শরীরের উপর মশা, মাছি বোল্‌তা প্রভৃতি বসিলে তৎক্ষণাৎ ঝলসাইয়া মরিয়া যাইত। ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যে কীট যত জোরে দংশন করিত সেইটি তত শীঘ্র মরিয়া যাইত এবং পুড়িয়া যত

কাল হইত, ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

তাঁহার গাত্রের অপূর্ব মধুর গন্ধ যিনিই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া সে কথা আর বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম না। তবে এইটুকু হয়ত অনেকে জানেন না যে সিল্কের কাপড়, গেঞ্জি, আসন ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দেহস্থ তাড়িতের প্রভাবে ছেঁদা হইয়া, সুতা সরিয়া ৭।৮ দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইত। আশ্চর্য্য, এখন আর তত শীঘ্র নষ্ট হইতে দেখি না—গাত্রগন্ধও আর সব সময়ে তত তীব্রভাবে বহে না।

অশরীরিভাবে ভ্রমণের বা সঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপ মধ্যে মধ্যে মধুর পদ্মগন্ধ বা অন্য কোনও প্রকার মিষ্ট দিব্য গন্ধ পাওয়া যায়। পূর্বে গিরীন্দ্র বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত ব্যবহারের প্রায় তিন বৎসর পরে নিজের ঐরূপ উপলব্ধির সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখন আমি third year কি fourt year class-এ পড়ি। একদিন সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে আমি আমাদের বাটীর দ্বিতলের ছাদে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে হাওয়ার সহিত অতি তীব্র পদ্মগন্ধ ক্রমাগত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আমার কোন ভুল হইয়াছে ভাবিয়া আমি বাটীর অপরাপর অনেককে ডাকিলাম—তাঁহারাও সকলে সেই গন্ধ পাইলেন এবং ক্রমে ক্রমে সেই গন্ধ আমাদের সমস্ত বাটীতে ছড়াইয়া পড়িল। সেই দিনের পর হইতে বাটীতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ঐরূপ গন্ধ পাওয়া যাইত—বিশেষতঃ যখনই কোন গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত তখনই প্রায় ঐরূপ গন্ধ অনুভূত হইত। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি প্রায়ই যাইয়া থাকি এবং তোমরা কি করিতেছ লক্ষ্য করি।" বৈকালে যে দিন প্রথম গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল সে দিন তিনি প্রথমে খিদিরপুর গিয়াছিলেন ও তৎপরে আমাদের বাটীতে আসেন, এই কথা বলিয়াছিলেন। খিদিরপুর সত্যই আমাদের বাটীর দক্ষিণপশ্চিম কোণে অবস্থিত।

এই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে যে ঘরে গুরুদেব আমাদের বাটীতে অবস্থান কালীন থাকিতেন সেই ঘরে আমি যখন ধূপ ধুনা দিতেছিলাম তখন হঠাৎ মনে হইল অপর একজন লোক সেই ঘরে আছেন। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি যে প্রায় চারি হাত দূরে বিশাল বপু তুষার-শুভ্র এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—তাঁহার গাত্রচর্ম্ম এত মসৃণ যে দেখিলেই মনে হয় যেন সদ্যঃ তৈলসিক্ত। দেখিয়াই আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই সেই মূর্ত্তি হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। গুরুদেবকে মূর্ত্তির বিবরণ দেওয়াতে তিনি তাঁহাকে তাঁহার গুরুভাই মহাযোগী শ্রীমৎ নিমানন্দ পরমহংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

ক্রমে তাঁহার আবির্ভাবের সময় যে কেবল সদ্গন্ধই বাহির হইত তাহা নহে, তাঁহার মূর্ত্তিরও উদয় হইত—এমন কি শেষকালে গন্ধের বিকাশ ব্যতীত কেবল মূর্ত্তিরই সাক্ষাৎকার পাইয়া তাঁহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিতাম এবং সেই সময়ে মনেও একটা বিশেষ শান্ত স্থির ভাবের উদয় হইত। তাঁহার

সঞ্চারের মধ্যে একটি বিশেষ ক্রম দেখি। প্রথমে গন্ধ, পরে কঠিন বস্তুতে আঘাতজনিত শব্দ, তাহার পরে তাড়িতের শব্দ ও বিদ্যুন্মালার ন্যায় আলোক এবং সর্বশেষে কেবল মাত্র মূর্ত্তির উদয়।

প্রথম প্রথম সুগন্ধ দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিতাম। পরে হঠাৎ কাষ্ঠে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ শুনিয়া মন সতর্ক হইত। তৎপরে হঠাৎ চক্ষুর সম্মুখে আলোক মালা প্রকাশ করিয়া মনকে সেই দিকে আকৃষ্ট করতঃ স্বকীয় মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট প্রতীয়মান করাইয়া তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা জানাইতেন এবং মন যখন স্বাভাবিকই স্থির শান্ত ভাবে থাকে এবং কোনওরূপ বাহ্যভাব প্রকাশ করিয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়োজন না থাকে, তখন কেবলমাত্র তাঁহার শুদ্ধ রূপই সুস্পষ্ট জাগিয়া উঠে। বহুদূরে থাকিয়াও যে তিনি আমাদের অতি নিকটে থাকিয়া সদা বিপদ হইতে রক্ষা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, এই কথা জানিয়া মনে বল ও আশা উদিত হয়। আমি যাহা লিখিতেছি তাহা আমার অনুভূতি হইতেই লিখিতেছি।

আমি যখন sixth year class-এ পড়ি সেই সময় একদিন সকালে গুরুদেবের ঘরে বসিয়া ভগবৎ চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে সেই ঘরে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাঁহার গাত্রস্থ মধুর গন্ধ ও সেই সময়ে স্বীয় শরীরের রোমাঞ্চ অনুভব করিবার ঠিক পরেই ঘরের দরজার বাহির হইতে ছিটকানি বন্ধের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমিও সেই সময় আহ্নিক শেষ করিয়া বাহিরে আসিবার জন্য ঘরের ভিতরের খিল খুলিলাম। তখন বাহির হইতে গুরুদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, স্পষ্ট শুনিলাম—"বাহিরে আসিবার সময় আমার পা লাগিয়া ছিটকানি পড়িয়া দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে—তুমি পিছনের দরজার খিল খুলিয়া বাহিরে আইস।" আমি তাহাই করিলাম এবং যদিও অপর কাহারও সেই ঘরে তখন আসিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি বাটীস্থ সকলকে কেহ গুরুদেবের পার্শ্বের ঘরে গিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। সকলেই অস্বীকার করিল। বিশেষতঃ আমার পিতা তখন গুরুদেবের পার্শ্বের ঘরের পরের ঘরে অসুস্থ হইয়া শুইয়াছিলেন এবং কেহ গুরুদেবের পার্শ্বের ঘরে আসিলে তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া আসা সম্ভব ছিল না। তিনিও বলিলেন, তিনি কাহাকেও ঐ ঘরে আসিতে বা গুরুদেবের ঘরের দরজায় হাত দিতে দেখেন নাই।

এই রকমের আর একটি ঘটনা এই বৎসর গ্রীষ্মকালে গুরুদেব যখন ভবানীপুরের আশ্রমে ছিলেন তখন ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ—

এই সময় আমি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আশ্রমে আসিয়া গ্রামোফোন বাজাইতাম। একদিন কোনও কারণে দ্বিপ্রহরে আফিস যাওয়ায় গ্রামোফোন বাজাইতে আশ্রমে আসিতে পারি নাই—কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিতে প্রায় ১০ টা বাজিয়া গেল দেখিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য আমাদের নীচের বৈঠকখানায় শুইয়া রহিলাম—ইচ্ছা যে ১৫।২০ মিনিট বিশ্রামের পর আশ্রমে যাইব। ৮।১০ মিনিট এই ভাবে থাকিবার পরই শুনিলাম, কে আমাকে নাম ধরিয়া

ডাকিতেছে এবং বলিতেছে, "দুইটা বাজিতে চলিল, কখন গ্রামোফোন বাজাইতে আসিবে? কথার ধরণে বেশ বুঝিলাম যে গুরুদেবই বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহার স্বরের সহিত কথার স্বরে পার্থক্য রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি আশ্রমে গিয়া প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ অন্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিলাম, পরে আমাকে গ্রামোফোন বাজাইতে বলিলেন। আমি বাজাইতে লাগিলাম। কিন্তু দ্বিপ্রহরের ঘটনার কথা কিছুই উল্লেখ করিলাম না। কিয়ৎকাল বাজানোর পর গুরুদেব পার্শ্বের ঘরে উঠিয়া যাইলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই সেই ঘর হইতে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি শব্দ শুনিয়াই চমৎকৃত হইলাম। যে স্বর আজ বাটীতে ক্ষণকাল পূর্ব্বে শুনিয়া আসিয়াছি ইহা অবিকল সেই স্বর। আমি পার্শ্বের ঘরে গুরুদেবের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলায় তিনি বলিলেন,—"তুমি আর একটু ঐ ভাবে শুইয়া থাকিলে ঘুমাইয়া পড়িতে বলিয়া তোমাকে ডাকিয়া সজাগ করিয়া দিয়াছিলাম।"

১৯১৮ সালের শেষভাগে কিম্বা ১৯১৯ সালের প্রারম্ভে শীতকালে গুরুদেব আমাদের বাটীতে অবস্থানকালে সহসা তাঁহার মাতৃবিয়োগের তার আসাতে তিনি বাটী হইতে বণ্ডুল গ্রামে চলিয়া যান। চলিয়া যাইবার ৪।৫ দিন পরে আর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেটি এইরূপঃ—

আমার উপরের শুইবার ঘরে আসিতে হইলে সিঁড়ি উঠিয়া একটা লম্বা দালান পার হইয়া যাইতে হয়। আমি একদিন রাত্রে শুইতে ঘরে আসিতেছি; সিঁড়ি পার হইয়া দালানে উঠিতে আর প্রায় ৩'৪ টি ধাপ বাকি আছে। এমন সময় দেখি সাদা কাপড় গায় দিয়া একজন লোক আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া দালান পার হইয়া সিঁড়ির দিকে আসিতেছে। দালান এবং সিঁড়িতে কোনও আলো ছিল না—দূরের আলোয় অল্প একটু চক্‌চকে দেখাইতেছিল। সাদা কাপড় পরা মূর্ত্তিটিকে আমি আমার চাকর 'লক্ষ্মণ' বলিয়া মনে করিলাম—মূর্ত্তিটি যখন প্রায় আমার নিকট হইতে ৪'৫ হাত দূরে তখন আমি 'কে রে, লক্ষ্মণ' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এবং সে উত্তর দিবে আশা করিলাম। মূর্ত্তিটি কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া যেমন ধীরভাবে আসিতেছিল তেমনিই ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং আমাকে পাশ কাটাইয়া সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নামিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যখন আমাকে পাশ কাটাইতেছে, তখন দেখিলাম আর কেহ নহে, উহা স্বয়ং গুরুদেব। দেখিবামাত্রই মন ভয় ও আনন্দে এমন অভিভূত হইয়া গেল যে আমার আর পশ্চাদ্‌গামী হওয়া হইল না—ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতে এই ঘটনার কথা বাটীতে বলিতে গিয়া শুনিলাম যে আমার পিতা প্রায় সেই সময় আহ্নিক শেষ করিয়া যখন নীচের ঘরে গুরুদেবের ছবিকে প্রণাম করিতেছিলেন তখন ঐ ছবির পার্শ্বে যে দরজাটি খোলা ছিল সেই দরজার ধারে গুরুদেবকে শাদা কাপড় গায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। গুরুদেবকে এ বিষয়ে পরে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি গলার কাছা গায়ে জড়াইয়া ছিলেন বলিয়া ঐ ভাবে শ্বেতবস্ত্রাবৃত দেখিতে পাইয়াছিলাম।

১৯২০ স্যালে বৈশাখ মাসে আমার বিবাহের সময় গুরুদেব এঁড়িয়াদহের বাগান বাটীতে থাকিতেন। তিনি যেখানে যতদূরে থাকুন না কেন এই অধীনের জীবনের সকল গুরুতর ব্যাপারেই তিনি উপস্থিত থাকেন, এ বিষয়ে আমি ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি। কেবল মাত্র আমিই যে তাঁহার কৃপাপাত্র তাহা নহে—সকল শিষ্যই সমভাবে তাঁহার স্নেহপাত্র, তবে তাঁহার উপস্থিতি কেহ কেহ অনুভব করিতে পারেন, কেহ বা সেই সময় অপেক্ষাকৃত মানসিক ধীরতার অভাবে তাহা পারেন না।

আমার মামীমার এক ভাগিনেয়ীর সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রী-আচারের সময় কয় পাক ঘোরান হইল এই লইয়া মামীমার সহিত উপস্থিত অপর স্ত্রীলোকদের মত-বিরোধ হয়। বিবাহের পর গুরুদেবের সহিত সাক্ষাতের সময় যখন আমি বলিলাম;—"গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে আপনার আসনকে প্রণাম করিবার সময় আপনি আসিয়াছিলেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম," তখন তিনি বলিলেন,—"তোমার বিবাহের দিন আমি তিনবার গিয়াছিলাম। কেন, স্ত্রী আচারের সময় যখন তোমার মামীমা কয়বার ঘোরান হইল বলিয়া গণ্ডগোল করিতেছিলেন, তখন আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া—তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?" আমি অবশ্য তাহা পারি নাই।

বিবাহের পর সস্ত্রীক কোনও এক কুটুম্বের বাটী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় আমার পিতা আমার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গুরুদেব তখন কলিকাতায় ছিলেন না। কিছুদিন পরে যখন আমাদের বাটীতে আগমন করেন তখন কথাপ্রসঙ্গে সেই রাত্রের ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমার সেই সময়ের ব্যবহারের প্রশংসা করেন। ঐ ব্যাপার তিনি কি করিয়া জানিলেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—"সেই সময় আমি তোমাদের বাটী গিয়াছিলাম—যোগেশ খুব রাগিয়াছে দেখিয়া ভাবিলাম তুমি কিরূপ ব্যবহার কর দেখিয়া যাইব। তোমাদের যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন আমি তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলাম।"

১৯২০ সালে বিবাহের পর জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি ৺পুরীতে দিন কতক আশ্রমে ছিলাম। ঐ বাটীর মধ্যে এক হল ঘর এবং দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট ঘর ছিল। তন্মধ্যে বাম দিকের ঘরে গুরুদেব থাকিতেন। হল ঘর এবং গুরুদেবের ঘরের মধ্যে একটি দরজা—তাহা গুরুদেবের ঘরের দিক হইতে সব সময়ই বন্ধ থাকিত। একদিন রাত্রে প্রায় ১২টা আন্দাজ আমার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং মধ্যে বন্ধ দ্বার থাকা সত্ত্বেও আমি গুরুদেবের ঘরের ভিতর বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তাঁহার ঘরটি অতি স্নিগ্ধ মৃদু জ্যোৎস্নার ন্যায় এক আলোকে প্লাবিত এবং তিনি পদ্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ সচরাচর অপেক্ষা অধিক স্ফীত এবং সম্পূর্ণ দুগ্ধ-শুভ্র—কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি সবই তুষারধবল। তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব সৌম্যভাব এবং সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ বদনমণ্ডল, অতি সুগঠিত; অথচ তিনিই যে আমাদের গুরুদেব শ্রীমদ্‌বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তখনকার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল, উন্নত ললাট, অতি সুগঠিত নাসা ও

মস্তকের সহিত আমরা সচরাচর যাহা দেখি তাহার অনেক প্রভেদ। অল্প পরেই আবার আমার চক্ষুর সম্মুখে কে যেন আবার টানিয়া দিল—দেখি যে প্রাচীর সেই প্রাচীর, যে দ্বার সেই দ্বার। পরদিন প্রাতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ক্রিয়ার সময় আপনার শরীরের কিছু পরিবর্ত্তন হয় কি?" তিনি বলিলেন,—"হাঁ, একেবারে সাদা হইয়া যায় এবং দেখিতে অতি সুন্দর হয়।"

আমার বিবাহের পরদিনই আমার খুল্লতাত পুত্র অরুণচন্দ্র বসুর ফুলশয্যা ছিল। সেই ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যা হইতে নবোঢ়া কন্যা হঠাৎ বিষম শূল যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়েন। সেই কারণে বাটীস্থ সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। রাত্রি প্রায় ৭॥০ আন্দাজ আমি (আমারও মন ঐ কারণে একটু খারাপ হইয়াছিল) আমাদের একতলার বৈঠকখানায় টেবিলে মাথা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম—ঘরে তখন ২।৩ জন অন্য লোকও ছিলেন। হঠাৎ স্পষ্ট অনুভব করিলাম যে গুরুদেব আসিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মূর্ত্তি মানসচক্ষে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে (মনে মনেই) বলিলাম,—"অরুণের আজ ফুলশয্যার দিন, অথচ কন্যা যন্ত্রণায় মূর্চ্ছান্বিতা।" এই কথা বলিবামাত্রই চক্ষুর সম্মুখে যে ঘরে কন্যা ছিলেন সেই ঘরটি ছায়াচিত্রের ছবির ন্যায় জাগিয়া উঠিল এবং দেখিলাম যে গুরুদেব তর্জ্জনীর দ্বারা পেটের এক জায়গায় ছুঁইয়া অঙ্গুলিটি একটু একটু কাঁপাইতে লাগিলেন। ২।৪ সেকেণ্ড পরেই স্পষ্ট মনে হইল তিনি যেন বলিলেন,—'ফুলশয্যার কখনও ব্যাঘাত হইবে না—রাত্রি ৯।১০টা আন্দাজ কন্যা সুস্থ হইবে'। তাহাই ঘটিয়াছিল।

বিবাহের প্রায় ২।১ মাস পরে আমি দিনকতক আমার মাতুলালয়ে সস্ত্রীক ছিলাম। একদিন রাত্রে মাতুলের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত যখন ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্রের pan psychism এর আলোচনা করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ চক্ষুর সম্মুখে গুরুদেবের মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠিল—এবং পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম যে তিনি একেবারে দ্বিতলের বারেণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত বারাণ্ডাটি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—দেখিলাম সেখানে আমার স্ত্রী ও মাসীমা ভিন্ন অপর দুইটি মাসীমার মহিলাবন্ধু বসিয়া আছেন। গুরুদেব যেন আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমার মাতুলের পুত্রকে এই ঘটনার কথা বলিয়া ঐ চারিজন স্ত্রীলোককে কোন্ মুখ করিয়া বসিয়া আছেন বলিয়া দিয়া, আমার অনুভূতির সত্যতা পরীক্ষার্থে তাহাকে উপরে গিয়া দেখিয়া আসিতে বলিলাম। আমি যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম চারিজনই ঠিক সেই ভাবে বসিয়াছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে আমার কোন কৃতিত্ব দেখি না। এই ধরণের অনুভূতি সকল ঠিক কিনা এবং গুরুদেব বহুদূরে থাকয়াও ঐশী শক্তি সাহায্যে সত্য সত্যই ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারেন কিনা, এই বিষয় লইয়া আমার মনে প্রায়ই সন্দেহ হইত এবং তাঁহাকে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। বোধ হয় আমার সন্দেহ ভঞ্জনার্থে কৃপা করিয়া তিনি ঐ ভাবে প্রমাণ রাখিয়া যাইতেন।

এই সময় আমাদের বাটীতে অবস্থানকালীন গুরুদেব উপদেশচ্ছলে একদিন বলেন যে আধার প্রস্তুত করাই সর্ব্বাগ্রে বিশেষ আবশ্যক। আমি একলা আমাদের নীচের ঘরে বসিয়া ঐ কথারই মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় গুরুদেব যেন আমার মনের ভিতর বলিলেন,—"আধার ত্রিবিধ—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। আসনাদি দ্বারা শারীরিক, ওতপ্রোতভাবে কার্য্য করিতে চেষ্টার দ্বারা মানসিক, ও জপাদি ক্রিয়া দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।" এরূপ অল্পের মধ্যে ত এরূপ সরলভাবে বলিলেন যে, আমার বুঝিতে আর কোন গোল রহিল না। এ কথা তাঁহাকে পরে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,—"তুমি বিষয়টি লইয়া ভাবিতেছ দেখিয়া এবং তোমার পক্ষে উহা জানা প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, তোমাকে জানাইয়া দিলাম।

এইরূপ বহুদূরে থাকিয়াও অশরীরিভাবে ভ্রমণের আমি ভুরি ভুরি নিদর্শন পাইয়াছি এবং যথাসাধ্য সত্যাসত্যের বিচার করিয়া গুরুদেবের যে নিমেষ মাত্রেই বহুদূর বিচরণ করিবার ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। এই সকল অনুভূতি সব সময় স্পর্শেন্দ্রিয় জনিত নয় বলিয়া ইহাদের মূল্য অল্প নহে। কল্পনায় নিজের চেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে মন গুরুদেবের বিষয় চিন্তা করে না অথচ হঠাৎ তাঁহার মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে এবং পাছে অন্য চিন্তায় রত থাকিয়া এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয়গুলি ধারণা করিতে না পারা যায়, এইজন্য হঠাৎ কোনও রূপ শব্দ গন্ধ বা আলোক প্রকাশ দ্বারা মনকে আকৃষ্ট করা হয়—বিশেষতঃ যখন সেই সময়কার কথাবার্ত্তা বা উপদেশের বাহ্য জগতের সহিত ঠিক মিল রহিয়াছে। এই সকল অনুভূতি যে মিথ্যা নহে তাহার অন্য প্রধানতম কারণ গুরুদেবের নিজের স্বীকারোক্তি। Hallucination তখনই মিথ্যা বহির্জ্জগতে যখন তাহার মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু যে hallucination এর সহিত বাহ্য বস্তুর মিল রহিয়াছে তাহাকে আর hallucination বলা চলে না। এখন এইরূপ hallucination এর কারণ এক নিজের ভিতর হইতে আসিতে পারে বা বাহির হইতে আসিতে পারে। কারণ যদি সত্য হয় তবেই ফল সত্য হইবে। সত্য ফল কখনও accident ভিন্ন ভুল কারণ প্রসূত হইতে পারে না। বাহ্য জগতের সহিত মিল রহিয়াছে বলিয়া আমার অনুভূতি সত্য এবং সত্য অনুভূতির কারণ কখনই সদাচঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল দেহাভ্যন্তরীন ক্রিয়া হইতে পারে না।

আমাদের বাটীতে ৺পুরীর আশ্রমে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীগোপাল জীউর পাদপদ্ম রক্ষিত ছিল। তাঁহার নিত্য পূজা ও সেবা হইত। বিগ্রহকে ভোগ দিলে সত্য সত্যই প্রসাদ-চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, এই লইয়া একদিন আলোচনা হইতেছিল। গুরুদেব তাহাতে বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমরা একদিন শ্রীশ্রীগোপালের বিশেষ শুদ্ধভাবে ভোগের আয়োজন কর, প্রসাদ-চিহ্ন তোমাদের দেখাইব।" পরদিন এক থালা সন্দেশ ঘরে তৈয়ার করিয়া শ্রীশ্রীগোপালকে ভোগ দেওয়া হইল—গুরুদেব ভোগ দিয়া দিলেন। প্রসাদ আনিতে যাইয়া আমি দেখিলাম একটি সন্দেশের আধখানি কে-ভাঙ্গিয়া

লইয়াছে এবং অবশিষ্ট সন্দেশে ছোট ছোট অঙ্গুলিস্পর্শের চিহ্ন রহিয়াছে। আমি আসিয়া গুরুদেবকে সেই কথা বলায় তিনি বলিলেন,—"কেন একটি পুরা সন্দেশ খাইবার কথা।" পুনরায় ফিরিয়া গিয়া দেখি সেই অর্দ্ধ সন্দেশ ব্যতীত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আর একটি সন্দেশ কেহ তুলিয়া লইয়াছে—সন্দেশ নাই অথচ সেখানে সন্দেশের দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উপস্থিত বহু গুরুভ্রাতা সকলেই সেই চিহ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সকলে মহানন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আমার বাবা প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে হার্ণিয়া কাটাইবার জন্য এক নার্সিং হোমে ছিলেন। সে সময় গুরুদেব প্রায়ই তথায় যাইয়া বাবাকে দেখিয়া আসিতেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ তিনি নার্সিং হোমের প্লানটি সুন্দর ভাবে সকলকে বলিয়াছিলেন এবং কোন নর্স কিরূপ দেখিতে ও বাবার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে তাহা সব যথাযথ বলিয়া দিয়াছিলেন।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে ভবানীপুরে থাকার সময় একদিন সকালে হঠাৎ বলিলেন,—"একটি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এইস্থান দিয়া যাইতেছেন—তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে কিছু দিতে চাহেন।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন এবং ঠিক যেন শূন্য হইতে কে একটি সুন্দর অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত জবা ফুল গুরুদেবের হস্তে ফেলিয়া দিলেন। সেই ফুলটি এখনও আমার কাছে আছে—শুখাইয়া যাইলেও এতদিন পরেও তাহার পাপড়ীগুলি ভঙ্গুর হয় নাই।

এই বৎসর ৺পুরীতে থাকিবার সময় একদিন বায়ুক্রিয়ায় কিরূপে দেহ স্ফীত করা যায় বলিতে বলিতে তাঁহার হাতের তর্জ্জনীটি প্রায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফুলাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"ইহাকে আরও এত স্ফীত করা যায় যে তোমরা দেখিলে মূর্চ্ছিত হইয়া যাইবে।" আবার খানিক সময় পরে অঙ্গুলি সমভাব প্রাপ্ত হইল। আশ্চর্য্য এই যে এই প্রক্রিয়ার সময়ও তিনি যেমন কথা বলিতেছিলেন তেমনই বলিতে লাগিলেন—বিশেষ চেষ্টার ভাব কিছুমাত্র দেখিলাম না।

গত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার সময় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ :—

গুরুদেব সমভিব্যাহারে আমরা অনেকে রথ-যাত্রার দিন যে রাস্তা দিয়া রথ যায় সেই রাস্তায় এক বট বৃক্ষতলে বসিয়াছিলাম। সকলেই বসিয়াছিলেন, কেবল আমি অগ্রগামী হইয়া রথ আসিতে কত দেরী আছে দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন সুভদ্রার রথ আমার নিকট হইতে ২৫।৩০ হাত দূর, তখন দেখিলাম যে গুরুদেব রথের চারিদিকে যেখানে দড়ি ঘেরা থাকে এবং জনতাকে যাইতে দেওয়া হয় না, সেইখান দিয়া রথের দিকে যাইতেছেন—যে কাপড় জামা পরিয়া রথ দেখিতে আসিয়াছিলেন তাহাই পরা—হাওয়ায় পাঞ্জাবী উড়িতেছে। আমি প্রথমে মনে করিলাম যে ঐ রথের চার্জ্জে আমাদের গুরুভ্রাতা পুলিস ইন্সপেক্টর অক্ষয় বাবু আছেন বলিয়া গুরুদেবকে বিশেষ করিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং আশা করিতেছিলাম যে এখনই অপরাপর গুরুভ্রাতাদিগকে

তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী দেখিতে পাইব। মনে করিয়া একটু ক্ষোভের সঞ্চারও হইল—আহা গুরুদেবের সঙ্গে থাকিলে আমিও ভিতরে যাইতে পারিতাম। এইরূপ মনে হইতে হইতেই গুরুদেব রথের সম্মুখীন হইলেন এবং বিনা অবলম্বনে সাবলীল গতিতে রথের উপরে উঠিয়া যাইলেন—রথারোহণের ভঙ্গীতেই বুঝিলাম যে তিনি সাধারণ ভাবে আসেন নাই। রথের উপর তিনি ৫।৬ সেকেণ্ড থাকিয়া পূজাদি কিছু করিতেছেন বলিয়া মনে হইল। তৎপরেই ঝম্প প্রদান করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া জনতার মধ্যে মিলাইয়া যাইলেন। আমিও দ্রুত বটবৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তিনি যেমন চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন সেইরূপই করিতেছেন এবং যাইবামাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রথ আসিতে কত দেরী?" আমি বলিলাম,—"এতক্ষণ পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন?" তিনি বলিলেন,—"তোমাকে একটু ম্যাজিক দেখাইলাম।" (এইরূপ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন, ঠিক ঐ কথা বলেন নাই।)

৺সাক্ষিগোপাল দেখিতে গিয়াও মন্দিরে ঐরূপ হইয়াছিল। সকলে দর্শন করিয়া ফিরিবার পরও আমি বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম এবং গুরুদেবকে আসিয়া বিগ্রহের গলায় মালা দিতে দেখিয়াছিলাম অথচ মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি তিনি অপর শিষ্যগণের সহিত কত প্রসাদ লইতে হইবে তাহার আলোচনায় ব্যস্ত। স্থূল শরীরে এক কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সচরাচর অপ্রত্যক্ষ ভাবে কিরূপে অন্যত্র অন্য কার্য্য করা যায় এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন,—"তাহা আর শক্ত কি?"

আমার অনুভূতি ঠিক কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি মধ্যে মধ্যে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতাম তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

এই বৎসর ভবানীপুর আশ্রমে গুরুদেব যে ঘরে বসিতেন, সেই ঘরে নয় অপর একটি ঘরে আমি মাটিতে শুইয়াছিলাম হঠাৎ গুরুদেবের আবির্ভাব হইল। আমি মূর্ত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম,—"আজ আমার কন্যা টুনু আসিবার সময় আপনার নিকট হইতে ছেঁচা পান লইয়া যাইবে বলিয়াছে; আমি কিছুই বলিব না। যদি আপনি এখন সত্যই আসিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি না চাওয়া সত্ত্বেও আপনি আমাকে ছেঁচা পান দিবেন।" বলিতে বলিতেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। আমি নিজে কখনও ছেঁচা পান খাই না এবং মোটেই খাইতে ভালবাসি না বলিয়া গুরুদেবও আমাকে কখনও ছেঁচা পান দেন না।

যাহা হউক, ক্ষণপরে গুরুদেবের ঘরে তাঁহার নিকট গিয়া বসিলাম—তিনি সাদা পান দিলেন, সাধারণ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল আমার মন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি স্থির জানি গুরুদেব আসিয়াছিলেন অথচ পরীক্ষার সমাধান হইল না। যখন প্রণাম করিয়া উঠিতেছি তখন হাসিতে হাসিতে কৌটা হইতে ছেঁচা পান লইয়া বলিলেন,—"কি গো, মেয়ের জন্য পান লইবে না?" আমিও আনন্দে হাসিয়া উঠিলাম এবং সমস্ত ব্যাপার উপস্থিত সকলকে বলিয়া পান লইয়া চলিয়া আসিলাম।

গত বৎসর ভবানীপুর আশ্রমে বর্ষাকালে একটি নূতণ প্রকারের ব্যাপার ঘটিয়াছিল। 'ভূতেশ্বর' এই কথাটির সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত ইহা হইতে দেখা যাইবে। একদিন বেলা ২'৩টা আন্দাজ খুব মেঘ ডাকিতেছিল ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল, এমন সময় গুরুদেব আসন হইতে উঠিয়া গিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হাতটি ৪।৫ বার সঞ্চালন করিয়া অল্প পরে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া বলিলেন,—"দেখ, আর মেঘও ডাকিবেনা, বিদ্যুৎ ও চমকাইবে না।" বস্তুতঃ ইহা বলিবার ৪।৫ মিনিট পরেই আকাশে সে তাণ্ডব নৃত্য একেবারে থামিয়া গেল—বৃষ্টি যেমন পড়িতেছিল, তেমনই পড়িতে লাগিল। দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া গুরুদেব দেখাইলেন, হাতের কব্জি হইতে কনুই পর্য্যন্ত প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা হরিদ্রাবর্ণের এক রেখা পড়িয়া গিয়াছে।

কেবলমাত্র হস্ত সঞ্চালন দ্বারা এরূপ মেঘগর্জ্জন কি করিয়া বারিত হয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ—জানি না আমি তাঁহার ব্যাখ্যা ভুল বুঝিয়াছি কি না।

বহির্জগতে যাবতীয় পরমাণু আছে সমস্তই সূক্ষ্মভাবে আমাদের দেহে আছে। বিশেষ কতকগুলি পরমাণুর সমাবেশের ফলেই আকাশে মেঘ গর্জ্জন হইতেছিল—তাহার প্রতিরোধক পরমাণু সেই স্থান কোনও রূপে উত্তেজিত করিতে পারিলেই মেঘ গর্জ্জনের নিবৃত্তি হইবে। সে গুলিকে উত্তেজিত করিয়া মেঘ গর্জ্জনের স্থানে পাঠাইতে পারিলেই গর্জ্জনের নিবৃত্তি হইবে। হাতের পীত দাগটি সেই প্রতিরোধক পরমাণুর উত্তেজনার চিহ্ন। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ঐরূপ করিতে পারে না কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"পাচক ব্রাহ্মণকে একটু আগুন দিতে বল, সে হাতে করিয়াই একটি জ্বলন্ত কয়লা দিবে ; তুমি কিন্তু ঐরূপ একটি কয়লায় হাত দিলেই পুড়িয়া যাইবে। তাহার শরীরের একরূপ বিভিন্ন উপাদান হইয়া গিয়াছে। আমি যাহা করিলাম তুমি তাহা করিতে চেষ্টা করিলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।"

১৩:৫ সালে ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব হইয়াছিল। সেই দিন অন্যান্য গীত বাদ্যাদির আয়োজনের মধ্য —বাবু নামে এক ভদ্রলোকের পুত্রেরা কীর্ত্তনাদি গাহিয়াছিল। ঐ গান শুনিতে শুনিতে——বাবুর ভাব-সমাধি হয়—অর্থাৎ তিনি যে ভাবে বসিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। গোপীনাথ বাবু শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"বাবা,——বাবুর ভাব-সমাধি হইয়াছে।" শ্রীশ্রীগুরুদেব কিন্তু গোপীনাথ বাবুর কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিলেন বলিয়া মনে হইল না – বরং depreciating ভাবেই সামান্য কিছু উত্তর করিলেন।

সন্ধ্যা হইলে আহ্নিকের জন্য গুরুদেব উপরে চলিয়া যাইলেন– —বাবু কেমন ভাবে বসিয়াছিলেন তেমনই ভাবে বসিয়া রহিলেন। সেই ভাবে তখন প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। আমি পূর্ব্বে কখনও ঐরূপ অবস্থা কাহারও দেখি নাই। কাজেই ঐরূপ ভাব কি করিয়া হয় এবং ঐ ভাবের মূল্যই বা কি এইরূপ বিচার মনে মনে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ ভাবে করিয়া একটা সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব যেন ৩।৪টি কথায় সমস্ত ব্যাপারটি মনের ভিতরে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—তাঁহার ঠিক কথাগুলি আমার এখন মনে নাই এবং সেগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। Peculiar physiological complex এর সৃষ্টির ফলে——বাবুর যে অবস্থা হইয়াছিল সেইরূপ অবস্থা এক প্রকার রোগ বিশেষ। প্রথম যখন তিনি কীর্ত্তনাদি শুনিতেন তখন তিনি চেষ্টা করিয়া মনে একরূপ ক্রন্দনের ভাব আনিতেন। সেই ভাবটি, যাহাকে প্রথমে হয়ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া আনিতে হইত, তাহা বাড়িতে বাড়িতে প্রবল হইয়া উঠিল এবং শেষে যখন আয়ত্ত রাখার বহির্ভূত হইয়া পড়িল তখন তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন— যাহাকে সকলে ভাব-সমাধি আখ্যা দিতেছেন।

কীর্ত্তনের মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা, বিশেষতঃ বহুর একতে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা, অতি প্রবল। উন্মাদিনী বৃত্তির গুণ এই যে মানুষকে কেবল সেই বিষয়েই দুর্ব্বল করে না—তাহার সমস্ত মনোবৃত্তি গুলিকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। মনের সমতা (balance) রাখিবার জন্য মন সদাই সচেষ্ট। উন্মাদিনী বৃত্তির পরিপুষ্টির সহিত মনের যে স্বাভাবিক বৃত্তি ক্লান্তিরোধক আছে তাহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে—ফলে উত্তেজনা দমন করিবার ক্ষমতা কমিয়া কমিয়া আসিয়া ভাব, মূর্চ্ছা ইত্যাদির কারণ হইয়া উঠে।

——বাবুর অবস্থা উচ্চ কি নীচ, বা তিনি কতখানি ধার্ম্মিক, তাহা আলোচনা করিয়া লিখিতেছি না—যে অবস্থাকে সচরাচর আমরা ভাব-সমাধি বলিয়া থাকি তাহার মূল্য কি সেই প্রশ্নের উদয় আমার মনে হইয়াছিল এবং গুরুদেব কৃপা করিয়া সেই সমস্যা ঐ ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন। ব্যক্তি-বিশেষের কোনও রূপ আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে।

চৈত্র মাসে ৺কাশীতে আশ্রমে একদিন বেলা প্রায় ২টা আন্দাজ নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল—

আমি ঐ দিন ঐ সময়ে Stock Exchangeএ বিশেষ কাজ না থাকায় একটি বেঞ্চে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ দেখি শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার নিকট হইতে প্রায় ১৫ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী, গলায় অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের চাদর জড়ানো। তিনি কিন্তু আমার দিকে চাহিলেন না। ঐ গোলমালে ঐ সময় তাঁহার আবির্ভাবে আমি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ভাবিলাম যে বাজারের দর কিরূপ থাকিবে তাহা জানিয়া লই। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মনকে কথা কহিবার যোগ্য করিতে পারিলাম না। গলায় চাদর দেখিয়া আমি মনে করিলাম, এমন সময় বোধ হয় গুরুদেব কোনও শিষ্যের বাটী হইতে ফিরিতেছেন। মোহিনী বাবু ৺কাশী হইতে ফিরিবার পরে তাঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"না, গুরুদেব সেইদিন কোথাও যান নাই—ভুষণবাবু আশ্রমেই ভোগ দিয়াছিলেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাঁহার গলায় ব্যথা বা সর্দ্দির ভাব হইয়াছিল?" তাহাতে বলিলেন,—"না, গুরুদেব ভালই আছেন।" মনে কেমন খটকা লাগিল। যে দিন বর্দ্ধমান হইতে গুরুদেবকে কলিকাতা লইয়া আসি (Easter Monday) সে দিন তিনি

Stock Exchangeএ গিয়েছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় স্বীকার করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম শুনিয়া যেন আনন্দিত হইলেন। আমি তখন গলার চাদরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কিছু উত্তর না দিয়া তাঁহার গায়ে যে চাদর ছিল সেই খানি গলায় জড়াইলেন। দেখিয়াই চমৎকৃত হইলাম—ঠিক সেই ভাব, সেই রঙ্গ, এক কথায় যেন ঠিক সেই মূর্ত্তি রেলের গাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছেন।

আমার পূর্ব্ব হইতেই ধারণা ছিল যে সঞ্চার-অনুভূতি অপেক্ষা সেই মূর্ত্তির সহিত কথোপকথন আরও কঠিন—তাহা ঐ দিনের ঘটনায় বিশেষরূপে বুঝিলাম। আমি sordid motiveএ earthly ব্যাপার লইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করায় সক্ষম হই নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

এই বৎসর রথের সময় ৺পুরীধামে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি সমুদ্রের ধার হইতে বেড়াইয়া একলা ফিরিতেছিলাম। আশ্রম হইতে প্রায় ৩০০ হাত দূরে আছি, এমন সময় দেখিলাম আশ্রমের ছাদের উপর শুভ্রকায় নগ্নদেহ এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন—ঠিক যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর। দেখিতে দেখিতে আমি আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ মিনিট কাল পরে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। আমার বেশ মনে আছে সে দিন আমি প্রায় একঘণ্টাকাল বেড়াইয়াছিলাম এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ইষ্ট মন্ত্র জপের ফলে মন এক শান্ত আনন্দভাবে আপ্লুত ছিল। ঐরূপ মূর্ত্তি—ঠিক ঐ মূর্ত্তি নয়—আমি পূর্ব্বে দুইবার বর্দ্ধমান আশ্রমের ছাদে দেখিয়াছিলাম বলিয়া গুরুদেবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"হাঁ, আমি যেখানে থাকিব সেখানে কিছু একটা অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।" প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ৺পুরীর আশ্রমের একদিন রাত্রি প্রায় একটা আন্দাজ আমি নীচের বারেণ্ডায় নামিয়া আসি। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি সমস্ত প্রায়ান্ধকার। আমি অন্যমনস্কভাবে নামিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় দেখি বারাণ্ডার কোণে অপূর্ব্ব শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক অতি সুন্দর মূর্ত্তি যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি ভয়ে একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। প্রায় মিনিট খানেকের পর মোহ ভাব কাটিয়া যাইলে আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। স্বাভাবিক আমার ভয় কম, কিন্তু জীবনে আমি কখনও ঐরূপ ভয়-স্তম্ভিত হই নাই। গুরুদেবকে ঘটনা বলিয়া ঐরূপ ভয় পাইবার কারণ জিজ্ঞাস করায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"প্রবল তাড়িতের নিকট দুর্ব্বল তাড়িতের যে অভিভূত অবস্থা হয় তাহারই নাম ভয়। তুমি অতি প্রবল শক্তি বিশিষ্ট কোনও মহাপুরুষের সম্মুখীন হওয়ায় তোমার ঐরূপ ভাব হইয়াছিল।"

এই বৎসর গ্রীষ্মকালে গুরুদেব যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন একদিন সন্ধ্যায় আহ্নিক করিতেছি এমন সময় স্পষ্ট অনুভব করিলাম যে ঘরে গুরুদেব আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি একলা নহেন, সঙ্গে অপর আর একজন সেইরূপই অশরীরিভাবে রহিয়াছেন। অত্যল্পকাল পরে আহ্নিক শেষ করিয়াই আশ্রমে (২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনে) যাইয়া দেখি, ভৃত্য পরমেশ্বর পদসেবা করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ ঘরে কি আপনি একলা গিয়া-

ছিলেন ?" গুরুদেব বলিলেন,—"না, আর একজন ছিলেন।" "তিনি কে" বারংবার জিজ্ঞাসা করাতেও উত্তর দিলেন না, কেবল বলিলেন,—"কোনও এক বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন—তাঁহার নামে তোমার প্রয়োজন নাই।" আমার ধারণা ছিল যে যখন তিনি ঐরূপ অশরীরি-ভাবে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহাকে কাহারও স্পর্শ করা উচিত নয় এবং তিনিও ঐরূপ স্পৃষ্ট অবস্থায় ঐ ভাবে সঞ্চারিত হন না। এ ক্ষেত্রে ভৃত্য তাঁহার পদসেবা করিতেছিল, তথাপি তিনি অন্যত্র বিচরণ করিতেছিলেন। এই ভাবের কথা তাঁহাকে বলায় উত্তর দিলেন,—"তাহাতে কি ? আমার এই স্থূল শরীরই না হয় তাহার হাতের ভিতরে আছে—আমার মন কিংবা সূক্ষ্ম দেহ ত আর সে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই।

গত ৺জন্মাষ্টমীতে আমি বর্দ্ধমান আশ্রমে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বদিন রাত্রে আমি, আমার বাবা, রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও ২।১ জন, আমরা আশ্রমের এক তলার হলে গুরুদেবের আসনের দিকে মাথা করিয়া ঘুমাইতেছিলাম। মধ্য রাত্রে কাহার যেন অস্ফুট কথাবার্ত্তায় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া দেখি গুরুদেব উপস্থিত এবং তাঁহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণবর্ণের একটি ছোট বালক। আমাদের মাথার গোড়া দিয়া যাইতে যাইতে গুরুদেব যেন আমাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু বালককে বলিতেছেন বলিয়া মনে হইল। আমি তাঁহার ক্ষুদ্রকায় ও বর্ণ দেখিয়া ভাবিলাম ইনিই বুঝি শ্রীশ্রীগোপাল। পরদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন মহাযোগী শ্রীমৎ উমানন্দ স্বামী ঐ রূপ ধরিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঐরূপ দেহ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিশেষ কিছুই বলিলেন না, কেবলমাত্র বলিলেন,—"খেয়াল।"

সদ্‌গুরুকৃপায় কি করিয়া শিষ্যের কুগ্রহের প্রভাব হ্রাস হইয়া যায় তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে দিতেছি। দুর্ভোগ কম হইলেও শিক্ষার জন্য কিছুপরিমাণে শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন।

প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার পাটের বাজারে ফট্‌কা খেলি। এই খেলার নিয়ম অনুসারে যাহার সহিত খেলা হইবে তাহার নিকট কিছু টাকা অগ্রিম জমা রাখিতে হয়। আমি ১০০০ টাকা জমা রাখি। প্রথম কিছু কিছু লাভ হইয়াছিল। আমিও বেশ প্রফুল্ল ছিলাম। পরে হঠাৎ jute forecastএ সেই বৎসর আমার হিসাব অপেক্ষা প্রায় ১০লক্ষ গাঠ পাট বেশী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া লিখিল। প্রায় ৮ টাকা করিয়া দর নামিয়া গেল। ফলে আমার প্রায় ৪০০০ টাকা লোকসানের সম্ভাবনা হইল। শ্রীশ্রীগুরুদেব তখন কলিকাতায় ২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাটীতে থাকেন। সন্ধ্যার সময় ঐরূপ ক্ষুণ্ণ কেন জিজ্ঞাসা করায় আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে কাতরভাবে অনুরোধ করিলাম। তিনিও স্পষ্টরূপে ভরসা দিলেন। তাহার পরদিন বেলা ৪টার সময় যে দর থাকিবে সেই হিসাবে আমাকে লোকসান দিতে হইবে। বেলা প্রায় ২টার সময় হঠাৎ খবর আসিল দর ৮।০ বাড়িয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিলামএবং দালালী ইত্যাদি বাদে আমার

মোট ৬।০ লাভ রহিল। হঠাৎ এরূপ দর বাড়িয়াছে কেন, কারণ জিজ্ঞাসা করায় লোকেরা বলিল যে,—"যে সকল পাট গাঁঠ বাঁধিয়া চালান যায় সেই পাট এই বৎসর কম হইয়াছে-অন্যান্য রকমের পাট বেশী হইয়াছে।" কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তির উপর অবস্থিত ছিল, কারণ আবার ৩টা বা ৩।টা আন্দাজ দর ৭ টাকা নামিয়া যাইল। আমি কিন্তু যাহার সহিত খেলিতেছিলাম সে হঠাৎ ফেল হইয়া যাইল। আমার জমা ১০০০ টাকা আদায় করিতে প্রায় ৩ বৎসর লাগিয়াছিল। গুরুদেবের কৃপায় লোকসান কিছু হইল না বটে কিন্তু শিক্ষার জন্য নিজের প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে এত বিলম্ব হইল। গুরুদেবের কৃপায় যদি বিনা কারণে কেবলমাত্র আমার সওদার জন্য হঠাৎ ৮ টাকা দর বাড়িতে পারে তবে ১০০০ টাকা পাইবার সম্বন্ধেও কিছুকাল না হইতে পারিত।

নিজের জীবনে এরূপ ঘটনা আরও ৩।৪ বার বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে এরূপ দৃষ্টান্তের মূলে বিশ্বাসের কথা রহিয়াছে বলিয়া তাহা লেখা উচিত মনে করি না।

নিম্নে দুইটি ঘটনার বিষয় লিখিতেছি যাহা পড়িয়া প্রথমে ইচ্ছাশক্তির কার্য্য বলিয়া ভুল হইলেও উহা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ ভুতেশ্বরত্বের ফলে সাধিত হয়।

একদিন বৈকালে আমি ও কুঞ্জবাবু আশ্রমে বসিয়াছিলাম। খেলার ছলে একটি আধলা পয়সা লইয়া তাহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গিনি করিলেন এবং শেষে "আর একটু মজা দেখ" এই বলিয়া গিনিটি ছুঁড়িয়া দিলেন। ছুঁড়িবামাত্র electric spark এর ন্যায় শব্দ হইল এবং প্রায় ২।৩ হাত অবধি একটি স্বর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া গেল। আর গিনিটিও অদৃশ্য হইয়া গেল। ইচ্ছাশক্তির কার্য্য তৎক্ষণাৎ সাধিত হইবে—ইচ্ছা এবং কার্য্যের মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকিবে না এবং তাহাতে কোনওরূপ অঙ্গ চালনার প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে আধলা গিনি হইতে প্রায় অর্দ্ধমিনিটকাল সময় লাগিয়াছিল এবং অদৃশ্য করিবার জন্যও গিনিটি ছুঁড়িয়া দিতে হইয়াছিল।

শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বোধ হয় গুরুদেবকে অঙ্গুলি দ্বারা টাকা আকৃষ্ট করিয়া শূন্যে তুলিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেকে হয়ত ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে উত্থিত টাকাটি মাটিতে ফেলিবার সময় তিনি সজোরে ফেলিয়া দেন। ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"যে তড়িৎ দ্বারা আমি টাকাটি তুলিলাম ঐ তড়িৎ পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মিলাইয়া দিবার জন্য ঐরূপ করা প্রয়োজন।" গিনির বিষয়েও ঐ যুক্তি প্রযোজ্য। যে পরমাণু সমষ্টি আকর্ষণ করিয়া আধলাকে গিনিতে পরিণত করা হইল সেই পরমাণু সমষ্টিকে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিবার জন্য গিনিটি সজোরে শূন্যে নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

তিন দিন পূর্ব্বে সকালে Eden Gardenএ বেড়াইতে বেড়াইতে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাস্তা হইতে প্রায় ২০ ফিট তফাতে কেনা গাছে কেনা ফুল ফুটিয়াছিল। যেই গুরুদেব হাত নাড়িলেন অমনি একটি sparkএর ন্যায় শব্দ হইল ও একটি কেনা ফুল ছিঁড়িয়া আসিয়া তাঁহার হাতের মধ্যে পড়িল।

যে শক্তিতে ফুল বৃন্তে লাগিয়া থাকে সেই শক্তি টানিয়া লওয়ার ফলেই ঐরূপ ঘটিয়াছিল। গাছের অন্যান্য ফুল বৃন্তচ্যুত হইল না কেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে,—"আমি কেবলমাত্র একটি বিশেষ ফুলের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চার করিয়াছিলাম বলিয়া ঐটিই আসিল।"

এই প্রসঙ্গে পুনরায় পানে পদ্মগন্ধ হওয়ার ব্যাপার উল্লেখ করিতে হইতেছে। সূর্য্যবিজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিতে প্রভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়াছিলেন—"ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কেবলমাত্র ইচ্ছার ফলে ব্যাপক ভাবে সাধিত হয়।" একটি পান দিতে দিতে বলিলেন,—"ইচ্ছা করি ইহাতে পদ্মগন্ধ হউক। ফলে সেটিতে ত পদ্মগন্ধ হইলই এবং ডিবার সকল পানেই ঐরূপ গন্ধ হইল।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ

জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরী।

আমার জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া কাহারও হৃদয় কলুষিত করিতে চাহি না। কেবল এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমি এমন অনেক কার্য্য করিয়াছি, যাহা আমি জনসমাজে ব্যক্ত করিতে অক্ষম। এইরূপ ভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল, না ছিল আমার ধর্ম্মে বিশ্বাস, না ছিল আমার ভগবানে আস্থা। একদা আমার স্বর্গীয় পিতার জীবদ্দশায় ৺শশিশেখর রায় নামক জনৈক ভদ্রব্যক্তি পুরীতে Superintendent of Salt and Excise হইয়া আগমন করেন। ইঁহার একজন আলোকসামান্য "গুরু" পূর্ব্ব হইতেই এই পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা আমরা জানিতাম না। পরে এই মহাপুরুষটির সহিত আমরা পরিচিত হই এবং তিনি দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে প্রায় প্রত্যহই আসিতেন। ইনি শ্রীরঙ্গাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন এবং আমরা তাঁহাকে (দীক্ষা না লইলেও) "গুরুজি" বলিয়া ডাকিতাম। ইঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তারপর আমার পিতার মৃত্যু হয় এবং ইহার কিয়ৎদিবস পর ৺শশীবাবু দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইয়া যান। একদিন গুরুজী হঠাৎ আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আমি অমুকদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেহ রাখিব; তুমি শশীকে খবর দাও।" আমার মধ্যম ভ্রাতা শশীবাবুকে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিলেন। ২।৩ দিনের পর শশীবাবু সস্ত্রীক আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। যে দিন "গুরুজী" দেহ রাখিবেন সেইদিন আমরা সকলেই তাঁহার নিকট গেলাম, দেখিলাম সুস্থকায় মহাপুরুষটী একটি খাটের উপর বসিয়া আছেন—এতবড় সংসারটা ত্যাগ

করিয়া যাইবেন, কিন্তু বিষাদের ছায়াও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি হাস্যমুখে আমাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন ও শেষ কথা বলিলেন,—"ভগবানকে ডাকিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গলই করিবেন।" তারপর অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় তিনি আমাদের নিকট বিদায় লইয়া একটি নিভৃতকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"সূর্য্যাস্ত হইয়া গেলে কপাটটী খুলিও।" কপাটটী মাত্র ভেজান হইল, কিন্তু অর্গল বন্ধ হইল না। আমরা সব বসিয়া রহিলাম। যখন সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল, তাঁহার একটি শিষ্য আসিয়া দ্বার উন্মোচন করিল। আমরা গিয়া দেখি তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, অথচ দেহে প্রাণ নাই।

"গুরুজীর" জীবিতাবস্থায় আমার স্বর্গীয় মাতাঠাকুরাণী, আমার জন্য তাঁহাকে অনেক করিয়া ধরিয়াছিলেন। একদিন আমি, আমার মা ও "গুরুজী" বসিয়া আছি, মা আমার জন্য তাঁহাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া নিবেদন করিলেন। বলিলেন,—"বাবা, খোকার আমার সঙ্গতি করিয়া দাও।" "গুরুজী" প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"বেটী, ভাবিস না, ইহার সদ্‌গুরু লাভ হইবে।" তখন আমি ভাবি নাই যে আমার জীবনে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে ও আমি সদ্‌গুরু লাভ করিব।

উপরোক্ত ঘটনার পর আমার বড় ভগিনীপতির মৃত্যু হয়। তাহার কিছুকাল পর আমার মাতাঠাকুরাণী ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অল্পবয়সে উপর্য্যুপরি এইরূপ ধাক্কা খাইয়া আমার গুরুজীর কথাই মনে পড়িত। মনে পড়িত, ভগবান বাদ দিয়া এই সংসার কিছুই নহে। আমার এইরূপ মনের ভগ্নাবস্থায় "গুরুজীর" অলৌকিক শক্তির কথা মনে পড়ায়, আমার হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস হইল, মনে হইল ইচ্ছামৃত্যু যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র বর্ণিত সকল কথাগুলিই সত্য। তারপর অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক সাধু সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছি ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক লোকের সহিত মিশিয়াছি। এইরূপে ৩।৪ বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু মনে শান্তি আসিল না। আমার ধারণা আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গোঁড়ামি আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত অনেকদিন মিশিয়া, আমার মনের মধ্যে অন্ততঃ এই বিষয়টী বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কলিতে যোগ নাই—ও যোগী পুরুষের নিকট হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। সে যাহাই হউক, আমি কিন্তু ভগবানের নিকট প্রত্যহ প্রার্থনা করিতাম, "ভগবান, আমাকে সদ্‌গুরু মিলাইয়া দাও।"

এইভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হইবার পর আমার বড় ভায়েরাভাই কুমার যামিনীবল্লভ ৺পুরীতে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আগমন করেন। তিনি শাস্ত্র দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদী—আমি কিন্তু বৈষ্ণব প্রবর্ত্তিত ভেদাভেদবাদে বিশ্বাসী। আমাদের দুইজনের শাস্ত্র লইয়া অনেক সময় তর্ক বিতর্ক হইত। একদিন এইরূপ তর্ক হইতেছে, এমন সময়ে যামিনী দাদার কর্ম্মচারী আসিয়া খবর দেন যে, ৺পুরীতে "শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব" নামক একজন সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন। যামিনীদাদা শুনিয়া বলিলেন,—"আমি তাঁহাকে জানি, এরূপ মহাপুরুষের পদস্পর্শেও পুণ্য হয়।" আমি কিন্তু গোঁড়ামীবশতঃ বলিলাম,—

"আমি যোগীর নিকট যাই না।" তিনি আমাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। পরে আমি সাব্যস্ত করিলাম, আচ্ছা, সাক্ষাতে দেখিই না কিরূপ। তৎপর দিবস আমরা উভয়ে সেই মহাপুরুষের নিকটে আসিলাম, ইনিই যে আমার "গুরুদেব" হইবেন তখনও জানিতে পারি নাই।

যাহা হউক, সেখানে অনেক তত্ত্ব কথাই হইল এবং গুরুদেবের সহজ সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। শাস্ত্রকথা চলিতেছে, এমন সময় আমি মূত্র ত্যাগ করিতে বাহিরে আসিলে, যামিনী দাদা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভায়রাভাইটিকে কেমন দেখিলেন?" গুরুদেব নাকি যামিনী দাদাকে বলিয়াছিলেন,—"বেশ ছেলে।" আমি বাহির হইতে আসিয়াই পুনরায় তত্ত্বকথায় যোগ দিলাম ও সন্ধ্যা লাগিবার কিছু পূর্বে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি আপানার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" তাহাতে গুরুদেব আমাকে বলিলেন যে,—"বেলা ১০ টার পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার সঙ্গে যখন ইচ্ছ দেখা করিতে পার।" তারপর আমি ও যামিনী দাদা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে যামিনী দাদা আমাকে বলিলেন,—"ওহে, আমি তোমার বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে তুমি বেশ ছেলে।" এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ইনি ত বেশ যোগী। আমার মত দুশ্চরিত্র ছেলেকে যিনি "বেশ ছেলে" বলিয়া বর্ণনা করেন তিনি কোন মতেই যোগী হইতে পারেন না। এরূপ লোকের নিকট যাব কি যাব না, এরূপ চিন্তায় রাত্রি দুই প্রহর হইল। একবার মনে হইতেছে যাবার কোন প্রয়োজনই দেখি না, তারপর ভাবিতেছি গিয়া ব্যাপারটা দেখি না কেন? যাহা হউক, শেষে যাওয়াই স্থির করিলাম ও পরদিন ঠিক বেলা ১০ টার পর গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। 'গুরুদেব,' আমাকে দেখিয়াই আমাকে একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলেন ও আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই বলিলেন, যখন বাহিরে গিয়াছিলে, সেই সময় যামিনী তোমার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে তুমি—"তুমি বেশ ছেলে। আচ্ছা, বল দেখি আমি কেন যামিনীর কাছে তোমার কুৎসা কহিব!" আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। ইনি প্রথম হইতেই এই কথা উত্থাপন করিবার অর্থ আর কিছুই নহে। আমি যে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি এই কথা লইয়া অনেক আন্দোলন করিয়াছি তাহাতেই ইহা উঠাইলেন। তিনি শুধু এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পরন্তু আমার জীবনের দুই একটি কাহিনী কহিলেন যাহা কেবল আমিই জানি, আর কেহ জানে না। আমি যখন স্থির বুঝিলাম যে, তিনি আমার সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বলুন দেখি, আমার মত ছেলে, ভগবান পাওয়া তো দূরের কথা, ভগবানের দিকে যেতে পারে কিনা?" তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, -"বাবা, ভগবানের সত্তা যদি তোমাতে না থাকিত তাহা হইলে তোমার ফিরিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন শুধু ভগবানের দিকে যাওয়া কেন, চরিত্র বজায় রাখিয়া যথাবিধি যোগাভ্যাস করিলে ভগবদ্দর্শন হইবেই হইবে।" এইরূপ

জোরের কথা আর কোথাও শুনি নাই। অবশ্য ইহাতে প্রাণ শীতল হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তবে ফলে এই হইল যে যোগীর নিকট আসা বন্ধ না করিয়া প্রত্যহ বেলা সাড়ে দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার নিকটই থাকিতে লাগিলাম। এইরূপ ৩।৪ মাস ধরিয়া নিয়ত সঙ্গ করায় আমি তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করি ও অবশেষে তাঁহার শ্রীচরণে দীক্ষার প্রার্থী হই। অনেক দিনের পর তিনি মহাষ্টমীর দিন আমার দীক্ষার জন্য স্থির করিলেন। আমি এই পুণ্য দিবস দীক্ষা লইতে তাঁহার নিকট আসিলাম। এ দীক্ষার বিশেষত্ব এই ছিল যে ইঁনি দীক্ষার্থীর সম্মুখে তাহার ইষ্টদেবতাকে তাঁহার মস্তক হইতে বাহির করিরা দীক্ষার্থীর দ্বারা পূজা করাইলেন। গুরুদেব যখন তাঁহার মস্তক হইতে আমার ইষ্টদেবতাকে বাহির করিলেন তখন আমি স্তম্ভিত হইলাম। এখানে আর এক কথা বলিয়া রাখি; আমি কুলপ্রথামতে কুলগুরুর নিকট হইতে পূর্বেই মন্ত্র লইয়াছিলাম। এই মন্ত্রানুগত দেবতাকেই আমার বড় ভাল লাগিত। আমি গুরুদেবের নিকট দীক্ষা লইবার পূর্বে মনে মনে ভাবিতাম যে আমার এই দেবতানুযায়ী যদি মন্ত্র না হয়, তাহা হইলে আমার বড় কষ্ট হইবে। পরিশেষে দীক্ষার দিন গুরুদেব আমাকে বলিলেন,—"তুমি কুলগুরুর নিকট এই মন্ত্রই লইয়াছ এবং আমি বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে এই মন্ত্রানুগত দেবতাই তোমার ইষ্টদেবতা।" তবে তিনি ঐ মন্ত্রের কিছু পরিবর্তন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে উহাই আমার ঠিক মন্ত্র ও ঐ মন্ত্র জপ করিলে আমার ইষ্টলাভ হইবে। তারপর আমাকে যোগ প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইহাই হইল আমার দীক্ষার ইতিহাস।

আমাদের দুইজনের অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গুরুদেব তখন পুরীতে, এমন সময়ে আমার ভগিনীর বিবাহেব সম্বন্ধ ঠিক করিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। যখন কলিকাতা যাই তখন আশ্রমে গুরুদেবকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। আমি প্রণাম করিয়া উঠিলেই গুরুদেব আমার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এ মেয়ের বিবাহের ভাবনা ভাবতে হবে না।" কলিকাতায় গিয়া আমার ভগিনীর জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় যে ভগিনীর জন্য কোন পাত্র জোটে না বটে, অথচ যিনি আমার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে দেখেন, তিনিই তাহার জন্য একটী পাত্রের খবর লইয়া আমায় জেদাজেদী করেন। এইরূপে এত ভাল পাত্র জুটিল যে কাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব, স্থির করা দুরূহ হইল। অবশেষে একটী সুপাত্রের পিতাকে জবাব দিলাম। ইহার কিছুদিন পর আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া আমার স্ত্রী ও ছেলেদের তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়াই আমার কন্যার Influenza হয়। যখন আমার কন্যার অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল তখন গুরুদেব পুরী থাকিলেও সূক্ষ্ম শরীরে কলিকাতায় আমার শ্বশুর বাড়ীতে আসিতেন। আমার স্ত্রী চাক্ষুষ দেখিতে পাইত, কিন্তু আমি পাইতাম না। তবে তিনি সূক্ষ্ম শরীরে আসিলে সমস্ত ঘর গন্ধে ভরিয়া

যাইত। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে যখন কোন সূত্রে গন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই তখন তিনি সূক্ষ্ম শরীরে আসিলেই সমস্ত ঘরটী গন্ধে ভরিয়া যাইবে। যিনি সূক্ষ্ম শরীর চাক্ষুষ দেখিতে পান না, তাঁহার প্রতি ইহাই হইল সঙ্কেত। যাহা হউক, আমার কন্যার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে কন্যার বিবাহের ভাবনা কি জন্য মোটেই ভাবিতে হইত না।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ।

লীলা-কথা

(উত্তরার্দ্ধ)

শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী

পুলিশ ইনস্পেক্টর, চাইবাসা, জেলা সিংভূম।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমি আসানসোলে ইনস্পেক্টর অফিসে রাইটার কনষ্টেবল। তখন সাত টাকা বেতনের একটা রাইটারকে সব-ইনস্পেক্টরগণ যেন একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সেইজন্য আমি কোনও সব-ইনস্পেক্টরের সহিত বিশেষ ভাবে মিশিতাম না। কিন্তু থানায় বাসা না থাকায় অবশ্যই তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। এইরূপ অবস্থায় আসানসোলে যে সাত আট মাস কাল কাটাইয়াছিলাম তন্মধ্যে আসানসোল থানার সিনীয়র সব-ইনস্পেক্টর উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় কি জানি কেন আমাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং আমিও তাঁহাকে একটু ভালবাসিতাম ও সম্মান করিতাম।

সেই ভাবে দিনাতিপাত করা কালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺অন্নদা প্রসাদ রায় চৌধুরীকে উক্ত উপেন্দ্র বাবু তাঁহার একটী বন্ধুর সাহায্যে D. T. S. আপীসে একটী চাকরীতে ঢুকাইয়া দেন। ৺অন্নদা প্রসাদ, উপেন্দ্র বাবু ও আমি একদিন কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় উপেন্দ্র বাবু কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার গুরুর কথা কি বলিব? তিনি সাক্ষাৎ দেবতা।" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "অবশ্য বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিলে প্রত্যেকেরই গুরু তাঁহার নিকট সাক্ষাৎ দেবতা।" উপেন্দ্র বাবু তদুত্তরে বল্লেন, "ভাই, বিশ্বাস-ভক্তি কথাটি মুখে বলা সোজা হইলেও কার্য্যে বড়ই কঠিন। উভয়ে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তবে যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী, তাঁহারা সেটি বুঝিতে পারেন।" পাছে উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে আমার মন্ত্রদাতা কুলগুরুর প্রতি আমার মনে কোনরূপ দ্বিধা আসে সেই ভয়ে আমি অবিলম্বেই আলোচ্য বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া সারকেল ইনস্পেক্টর সাহেব, যাঁহার সঙ্গে উপেন্দ্র বাবুর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, তাঁহার কথা উঠাইলাম। বিষয়ের পরিবর্ত্তন হওয়ায় আর পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ হইল না। তৎপরে আসানসোল থানায় উপেন্দ্র বাবু আর দুই তিন মাস কাল থাকিয়া বর্দ্ধমান পুলিশ রিজার্ভে রিজার্ভ-সব-ইন্সপেক্টর

হইয়া বদলী হইয়া যান। যাইবার সময় বলেন, "তোমার কোনও উপকার যদি আমার দ্বারা হয়, আমি তাহা চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে 'রিজার্ভ' সব-ইন্সপেক্টর তোমার দরখাস্ত যেরূপ সাহেবের নিকট পেশ না করিয়া চাপিয়া দিয়াছিলেন, আমার সময় তাহা হইবে না। বরং আমার সময়ে তোমার কোনও দরখাস্ত গেলে আমি তোমার যোগ্যতার বিষয় বিশেষ ভাবে বলিব" ইত্যাদি। উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার ইন্সপেক্টরের শত্রুতা থাকায় আমার সঙ্গেও তাঁহার সেইভাব হওয়াই সম্ভব ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁহার সহিত আমার কেমন একটী ভ্রাতৃ-ভাব হইয়া গিয়াছিল—ইহার কোনও অতীন্দ্রীয় কারণ থাকাই সম্ভবপর বোধ হয়।

আসানসোলে থাকার সময় যতীন্দ্র নাথ মল্লিক নামে তথাকার থানার একটী রাইটার কনষ্টেবল, যিনি সুদূরে ভবিষ্যতে আমার গুরুভাই হইয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "ভাই, উপেন্দ্র বাবুর গুরুদেব একজন অদ্বিতীয় সাধক এবং এখানে উপেন্দ্র বাবু যাহা কিছু বলেন ও করেন, তিনি সেখান হইতে সে সমস্তই দেখেন।" যতীন্দ্র বাবু অবশ্য সে সময় তাঁহার শিষ্য হন নাই। তথাপি এইরূপে তাঁহার প্রশংসাবাদ করায় মনে হইল একবার যাইয়া দেখিলে হয়। যাহা হউক, দেখিতে কিন্তু যাই নাই।

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে বার টাকা বেতনের হেড কনষ্টেবলের পদে উপেন্দ্র বাবুর সাহায্যে প্রমোশন পাইয়া বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া পুলিশ আপীসে চৌকীদারী কেরাণীর পদে কার্য্য করিতে লাগিলাম। তখন উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আপীসে প্রতিদিন দেখা হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাসাতেও যাইতে লাগিলাম। এই স্থানে উপেন্দ্র বাবু তাঁহার শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেন। ঐ সব কথা শুনিতে শুনিতে একদিন তথাকার পুলিশ হেড্ মুহুরী বাবু প্রেমচাঁদ ঘোষ ও আমি উপেন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আমাদিগকে একদিন ওখানে লইয়া চলুন।" লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে উপেন্দ্র বাবুর শ্রীগুরুদেব কখন কখন কোনও কোনও লোককে তাহাদের ভিতরের গলদের কথা সাধারণের সমক্ষে বলিয়া দিয়া বড়ই অপদস্থ করিয়া ছাড়েন। তাই আমারও মনে মনে কিছু ভয় হইতেছিল। যাহা হউক, মনোমধ্যে নানারূপ বিচারের পর যাওয়াই স্থির করিলাম, এবং মনে মনে ভাবিলাম, "আমি যদি তাঁহাকে মনে মনে অগ্রাহ্য করি বা তাঁহার নিকট অহঙ্কার করি, তবেই ত তিনি আমাকে অপদস্থ করিবেন। আর আমি যদি মনে সেরূপ ভাব না পোষণ করি, যদি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার দুরভিসন্ধি আমার মনে না জাগে, তাহা হইলে আর ভয় কি?" এইরূপ ভবানাতে মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। আমি অবশ্য সে সময়ে জানিতাম না যে আমি আমার পরিত্রাতা ভবার্ণব-কর্ণধারের পদতরীতে আশ্রয় লইতে যাইতেছি, কিন্তু আমার সেই পতিত-পাবন পাতকি-তারণ দয়াল প্রভু ত জানিতেন যে অজ্ঞাত-ভাবে একটি মহাপাপী তাঁহার পাবনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ছুটিতেছে, তাই তিনি আমাকে অহঙ্কারযুক্ত ভাবে তাঁহার নিকট যাইতে না দিয়া যে-কোনও প্রকারে ভয়-ভক্তি-প্রীতি প্রভৃতি উপাদেয় চিত্তবৃত্তি আগে

হইতেই উদয় করাইয়া নিজ গুণে আমায় টানিয়া পদপ্রান্তে লইয়া গেলেন। উপেন্দ্র বাবু ও প্রেমচাঁদ বাবুর সঙ্গে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে মহাপুরুষের চরণ প্রান্তে আসিয়া পেঁাছিলাম। উপেন্দ্র বাবুর পরে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম ও তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া পদধূলি মাথায় দিলাম। যদিও আমার নিয়ম ছিল যে হঠাৎ কাহারও পদস্পর্শ করিব না, তথাপি এ ক্ষেত্রে আমার আরাধ্য দেবতার পদধূলি আমি তাঁহার কোন মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যে মস্তকে গ্রহণ করিলাম তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার পা দুখানি হইতে——সেই সুগোল সুঠাম ঈষৎ রক্তাভ পা দুখানি হইতে—করুণা ও স্নেহে মাখান মুখখানি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন আমার বড়ই ভাল লাগিল। কিন্তু ভয়ে কোন প্রশ্ন তুলিতে পারিলাম না। যাহা হউক, উপেন্দ্র বাবুর সহিত শ্রীভগবান্ সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় আমি, প্রেমচাঁদ দাদা ও আরও একটী ব্রাহ্মণ (উপেন্দ্র দাদার দেশের) অবাক্ ভাবে তাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া আলাপ শুনিতে লাগিলাম। আমি গোপনে একাকী যে প্রশ্ন করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আমার আর সে প্রশ্ন করিবার দরকার হইল না, কারণ উপেন্দ্রবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে দয়াল ঠাকুর আমার তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিলেন, এবং যে যে সময় আমার প্রশ্নের উত্তর হইতে লাগিল সেই সেই সময় তিনি কেবলমাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন, কামাখ্যাবাবু।" এইখানে বলা উচিত যে সেই সময়ে তিনি আমাকে 'দক্ষিণা' নয় বলিয়া কখনও কখনও 'কামাখ্যা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং এখনও সময় সময় 'দক্ষিণা' স্থলে 'কামাখ্যা' বলিয়াই ডাকেন। আমি আর কি উত্তর দিব? তাই অতি কাতর ভাবে বলিলাম, "আমি আর কি বলিব? কিই বা জানি? আপনি যা বলছেন, তাই ঠিক।" দয়াময় তদুত্তরে বলিলেন, "না, আমি বলছি বলেই যে ঠিক, তা নয়। ইহাই ধ্রুব সত্য।" প্রশ্ন তিনটির উত্তরের মধ্যে প্রথমটির উত্তর এই—"ধর্ম্ম অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, আর পাপ তুলারাশি। পর্ব্বত-প্রমাণ তুলা এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে যেরূপ ভস্মীভূত হয়ে যায়, ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে রাশীকৃত পাপও তদ্রূপ নষ্ট হইয়া যায়।" আমার তখন মনে মনে হইল—"একবার হরিনামে এত পাপ হরে। পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।" আমার মনে মনে এইটী উদয় হইতে না হইতেই প্রভু বলিলেন, "হাঁ তাই।" ইহা বলিয়াই ঐ বচন তিনিও স্পষ্টতঃ মুখে উচ্চারণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কথোপকথনে কাটিয়া যাওয়ার পর ভোরের ট্রেণে আমরা চারিজন ফিরিয়া আসিলাম। প্রেমচাঁদ ও আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু উপেন্দ্র বাবুর দেশের সেই ব্রাহ্মণটী, যাঁহার পৌরোহিত্য বা গুরুগিরি ব্যবসায় ছিল, তিনি যেন একটু কেমন-কেমন বলিয়া মনে হইল। উপেন্দ্র বাবুর টাকা দিয়া প্রণাম করা দেখিয়া তিনি যেন একটু অসূয়ার ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, কতিপয় বৎসর পরে এই ব্রাহ্মণটিও আমাদের গুরু-ভাই হইয়াছিলেন।

'এই প্রথম দর্শনের দিনের পর আমি বর্দ্ধমানে আরও নয় দশ মাস উক্ত

পদে পুলিশ আফিসে কার্য্য করিবার সময় প্রায়ই রবিবার ছুটির দিন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য যাইতাম। কেন যাইতাম, কোন্ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যাইতাম, জানি না, তবে না গেলে মনটা যেন খারাপ বোধ হইত। মনে হইল ইনি যদি আমায় একটু যোগশিক্ষা দেন, তবে শিক্ষা করি। তখন জানিতাম না যে "যোগ" জিনিষ কি, তার অর্থ কি বা কি প্রকারে তাহা সাধন করিতে হয়, তবে এইটুকু ধারণা ছিল যে পদ্মাসনে বসিয়া ষোল চৌষট্টি বত্রিশাদি টান মারার নাম "যোগ"। মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও দিন ৪।১৬।৮ এর স্থলে ১৬।৬৪।৩২ টান দিলাম। সেইরূপ দুই চারদিন একটু বেশী পরিমাণে ও বেশী সময় ধরিয়া টান দেওয়ার পর একদিন প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন জন্য গেলে পর প্রভু কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "নাক টানা প্রাণায়ামাদি যথারীতি করিতে না পারায় অনেক সময় গুরুতর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।" হঠাৎ এই কথা শুনিয়া আমি আর কোনও উত্তরাদি না দিয়া তদবধি উক্তরূপে বলপূর্ব্বক প্রাণায়াম করা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং প্রভুর নিকট হইতে যাহাতে কিছু যোগ-শিক্ষা পাই তৎপ্রতি একটু আকর্ষণ বাড়িল। কিন্তু মনে মনে কতকগুলি ভাব জাগিয়া রহিল—তখনও সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পন করিতে পারিলাম না; এবং যে পর্য্যন্ত তাহা না হইল সে পর্য্যন্ত আশ্রয় পাই নাই।

আমার অগ্রজদেব ৺রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পঠদ্দশায় আর্য্য-মিশনের আচার্য্য ৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যোগ-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তৎকাল অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুরুতর অম্লরোগে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ স্বভাবতঃই তাঁহার যোগের প্রতি একটী অশ্রদ্ধার ভাব আসায় তিনি তাহা ছাড়িয়া দিয়া তৎস্থলে পূজার পরিমাণ বাড়াইয়াছিলেন। আমি একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমার অগ্রজ-দেবতাকে বলিলাম, "দাদা, আপনি একদিন গুস্করা গিয়া তথায় যে একজন বড় যোগী আছেন যদি তাঁহাকে দেখিয়া আসেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। আমার মনে হইতেছে যে তাঁহার নিকট আমি কিছু কিছু যোগ-শিক্ষা লইব। তদ্বিষয়ে ও আপনার দ্বারা অনুমোদিত হইলে আমারও বেশ একটা তৃপ্তি হয়।" দাদা তদুত্তরে আমায় বলিলেন, "না ভাই, যোগ-টোগ সম্বন্ধে আমার কোনও আস্থা নাই। আমি এখন কোথাও যাব না, আর তোকেও যেতে নিষেধ করি। যদি ধর্ম্ম করতেই মন হয়, আমার মত পূজার মাত্রা বাড়িয়ে দে। ও সকল যোগের আশা ছেড়ে দে।" দাদা বাল্যকাল হইতে আমার নিকট শিক্ষকের মত ছিলেন। আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। তাই অতি ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বলিলাম, "দাদা, আমার মনে হচ্ছিল যে একবার দেখে আসায় ক্ষতি কি? তবে দেখুন, আপনি যা ভাল বুঝেন।" দাদা বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাক যদি মন হয়।" আমি যে মহাপ্রভুর নাম দাদার কাছে বলিলাম তাহাতেই উক্ত নামের শক্তি অল্পে অল্পে দাদার উপর কার্য্যকরী হইল, অবশেষে একদিন দাদাকে প্রভু শ্রীচরণ প্রান্তে টানিয়া লইয়া গেলেন।

আমাদের নিজ বাড়ী সর্পী গ্রাম হইতে ছয় মাইল তফাৎ ওয়ারিয়া ষ্টেশনে

পদব্রজে গিয়া ট্রেন ধরিবার মানসে দাদা একদিন রওনা হইলেন, এবং ষ্টেশনে পৌঁছিবার আগেই পথিমধ্যে জ্বরাক্রান্ত হইলেন। জ্বরে জ্বরে খানা জংসনে গিয়া পৌঁছিয়া গুস্করা যাইবার গাড়ীর দেরী আছে জানিয়া একটি দোকানে কিছু সাবু করাইয়া খাইলেন। পরে যথা সময়ে তিনি গুস্করায় গিয়া পৌঁছিলেন। আমি দাদার সঙ্গে ছিলাম না, তবে পরে দাদার নিকট অবগত হই যে তিনি যাইবা মাত্র শ্রীগুরুদেব তাঁহার পরিচয় লইয়া দস্তুর মত তাঁহাকে মিষ্টাদি দিয়া জল খাওয়াইয়া তাঁর জন্য মাছের ঝোল ভাত ইত্যাদিতে আদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য যে দাদাকে জল খাইতে বলার সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার গুরুতর অম্বলের ব্যারাম আছে, তদুপরি আজ জ্বর হইয়াছে। তার উপর জলখাবার খাইলে আরও অম্বল হইবে ও জ্বরে বেশী কাতর করিয়া ফেলিবে।" শ্রীগুরুদেব তদুত্তরে তাঁকে বলেন, "খান কিছু হবে না।" তিনিও ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে কোনও কথা না বলিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে ভাত খাইবার জন্য বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া দাদা ভীত হইয়া বলিলেন, "আর খাইলে আমার গুরুতর অবস্থা হইয়া পড়িবে, আমি আর কিছু খাব না।" শ্রীগুরুদেব তথাপি তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার কোনও ভয় নাই, পেট ভরিয়া খান। আপনি পেটুক মানুষ, অথচ এমন কতকগুলি যোগের ক্রিয়া লইয়াছেন ও করিয়াছেন যাহাতে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়। আপনার এরূপ ক্রিয়া করা উচিত ছিল, যাহাতে অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও পরিপাক হয়। আপনার রসনেন্দ্রিয় এখনও বশীভূত হয় নাই। তাহার দ্বারা চালিত হইয়া আপনি কতকগুলি খাইয়া ফেলেন, কিন্তু অযথা শ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা আভ্যন্তরিক যন্ত্র খারাপ হওয়ায় ভাল হজম হয় না। ঐ সকল ক্রিয়া বেশী দিন চালাইলে যক্ষ্মা পর্য্যন্ত হইতে পারে। আমার এখানে বেশ তৃপ্ত ভাবে খান, কিছু হয় আমি নিজে ডাক্তার প্রতিবিধান করিব। ভয় কি?" দাদা তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া সেদিন মধ্যাহ্নে আকণ্ঠ পূরিয়া খাইলেন এবং সন্ধ্যার পর আবার লুচি মিষ্টি তরকারী ইত্যাদি বেশ করিয়া খাইলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে বেশ সুন্দর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইল, শরীরে কোনও গ্লানি মাত্র রহিল না। ইহা দেখিয়া দাদা অবাক হইয়া শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, "আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে বাড়ীতে এইরূপ ভাবে জ্বরের উপর খাইলে আমাকে একেবারে শয্যাগত করিয়া দশদিন ফেলিয়া রাখিত। কিন্তু আমি কি প্রকারে এখানে এরূপ সুস্থ আছি? মনে হইতেছে আপনার নিকট আরও কতকদিন থাকিয়া পেট ভরিয়া খাই, কারণ আমি বহুদিন যাবৎ অম্ল রোগের ভয়ে পেট ভরিয়া খাই নাই। কাল আপনার কৃপায় খাইয়াও ভাল আছি, এই আশ্চর্য্য।" শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকুন।" দাদা ৮।১০ দিন তথায় থাকিলেন। এই আট দশদিনের মধ্যে শ্রীগুরুদেব দাদাকে কয়েকটী মুদ্রা শিখাইয়া দেন ও তিনি আর্য্য-মিশনের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া যে ভালই করিয়াছেন তাহা বলেন।

দাদা তখন উখরা হাই ইংলিশ স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন। কোনও কারণে স্কুল কখনও বন্ধ হইলেই তিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-প্রান্তে দৌড়িয়া

যাইতেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯০৪ খৃঃ এপ্রেল বা মে মাস হইতে ১৯০৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপাদি দর্শন করেন, কিন্তু ১৯০৮ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে প্রকৃত পদ্ধতি মতে দীক্ষা পান নাই। এই কয় বৎসরের মধ্যে এক দিন দাদা যে মন্ত্রে পূর্ব্বে কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত ছিলেন, সেই মন্ত্রটি শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন ও উক্ত মন্ত্রোক্ত দেবতা গুরুদেবের আপন চক্ষুর মধ্যে দেখাইয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে আমি একদিন বর্দ্ধমান হইতে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহাকে অবগত করি যে দাদার জ্বর হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাইতেছ, রাধিকাকে বলিবে যে তাহার এই জ্বরের মধ্যে মুখে সর্দ্দি সহ রক্ত উঠিয়াছে বা উঠিবে। তাহাতে যেন সে ভীত না হয়। দাদা-গুরুদেব বলিয়াছেন যে রাধিকার যক্ষ্মা-জনিত রক্ত-মোক্ষণ যাহা হইবে তাহাতে তাহার প্রাণহানি হইতে দেওয়া যাইবে না, তাহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিও।" এই রোগের মূল কারণ অনধিকারী হইয়া যোগাভ্যাস বা হস্তীর ভার ছাগলের ঘাড়ে চাপান। সে যে সকল ক্রিয়া করিয়াছে সে তাহার অধিকারী ছিল না বলিয়া যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়াছে। তবে প্রাণের ভয় যেন না করে, তাহাকে আশ্বস্ত করিবে।" আমি সেই দিনই বাড়ী গেলাম, এবং যাইবা মাত্র দাদা আমাকেও আমার ছোট ভাই ৺অন্নদাকে (তাহাকে দাদা খবর দিয়া আসানসোল হইতে আনাইয়াছিলেন।) কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ছেলেপিলে সব থাকলো। আমার শেষ সময় উপস্থিত।" দাদাকে আর বেশী কথা বলিতে সময় না দিয়া আমি তাঁহার মুখ হইতে এই কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম, "কেন, আপনার মুখ হইতে বোধ হয় রক্ত উঠিয়াছে, তাই আপনি এত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।" দাদা বলিলেন, "তুই কি করে জানলি? কাল হইতে রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "আমি কল্য শ্রীগুরুদেবের নিকট গিয়া শুনিলাম, যে পশ্চিম হইতে পত্র আসিয়াছে যে আপনার মরিবার ভয় নাই। আপনার উক্ত রোগ আরোগ্যের জন্য তথায় ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, উহা সত্যই যক্ষ্মা রোগ বটে, কিন্তু আপনি মরিবেন না। কারণ শ্রীগুরুদেব বিশেষ করিয়া বারম্বার বলিলেন যে রাধিকাকে ভরসা দিয়া বলিও যে তাহার মৃত্যু-ভয় নাই, সে কিছুতেই মরিবে না।" দাদা আশ্বস্ত হইলেন। গুরুদেব যে ঔষধ দিয়াছিলেন তাহা দাদাকে দিলাম। সেই ঔষধেই তাঁহার রক্ত-উঠা বন্ধ হইল, এবং তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে তৎপরে আস্তে আস্তে তাঁর অম্লের ব্যারামও সারিয়া গেল এবং তিনি ক্রমশঃ বেশ সবল হইলেন। ১৯০৮ সালের জুন মাসে তিনি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যথারীতি দীক্ষা লাভ করেন এবং প্রদত্ত ক্রিয়াদি করিয়া ১৯১৮ সালে পরলোক গমন করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে থাকার সময় আমি প্রায়ই গুস্করায় গিয়া ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতাম। এই ভাবে তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ মুদ্রা ও আসন প্রাপ্ত হই, কিন্তু তখনও পদ্ধতি-মত ক্রিয়া প্রাপ্ত হই নাই। ক্রিয়া গ্রহণের প্রস্তাব করিলেই তিনি বলিতেন, "দেরী আছে।" আমার

মানে তখনও পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ভাব আইসে নাই। তখন মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুদেবের এক একটী আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপারও দর্শন করিতাম। একদিন বৈকালে তিনি হঠাৎ বলিলেন, "আজ উপেন্দ্র আসিবে। তার ছেলের অসুখ করায় এবং কিছুতেই ভাল না হওয়ায় তাহারা স্ত্রী-পুরুষে উভয়েই ভীত ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর কাল একটী ভিক্ষুক তার মন্তেশ্বর থানার বাসায় গিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার স্ত্রীকে বলে, 'মা ছেলেটির কি অসুখ হইয়াছে? তাহাকে সাতটী তুলসীপাতা সহ, ঐ যে গাছটী দেখিতেছ উহার শিকড় একটু পিসিয়া খাওয়াইয়া দাও, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সে আরোগ্য লাভ করিবে।' উপেন্দ্রের স্ত্রী তাহাই করে। ভিক্ষুকটি সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া যায়। উপেন্দ্রের স্ত্রী মনে করিল যে ভিক্ষুকটী বুঝি ভিক্ষা না লইয়াই চলিয়া গেল, তাই বাসার চাকরকে দিয়া ভিক্ষুকটীকে ডাকিয়া ভিক্ষা দিতে যায়, কিন্তু তাহাকে না পাওয়ায় উপেন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ থানা হইতে ডাকাইয়া আনে ও এই কথা বলে। উপেন্দ্রও সিপাহীদের সাহায্যে বহু সন্ধান করিয়াও লোকটীকে না পাইয়া স্ত্রীকে বলে, "এ বোধ হয় গুরুদেবের লীলা, যাহাই হউক আমি তাঁহার নিকট গিয়া এ বিষয় জানিব।' তজ্জন্য সে আসিতেছে।" সন্ধ্যার সময় সত্যই উপেন্দ্র বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব আহ্নিকে বসিয়াছিলেন এবং আমি নিজের সন্ধ্যাকৃত্য সারিয়া বারাণ্ডার খাটে বসিয়াছিলাম। উপেন্দ্র দাদাকে দেখিয়া যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর আমি বলিলাম, "দাদা, কাল আপনার বাসায় গিয়া একটী ভিক্ষুক ঔষধ দিয়া আসিয়াছে কি?" উপেন্দ্র দাদা বলিলেন, "তুমি কিরূপে জানিলে? আমি ত এ বিষয় কাহাকেও বলি নাই, এমন কি বাবাকেও লিখি নাই। আর সেই জন্যই বাবার নিকট আসিয়াছি। তুমি কিছু শুনিয়াছ কি?" আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা উপেন্দ্র দাদাকে বলিলাম এবং বলিলাম, "শ্রীগুরুদেব বলেন যে দাদা, গুরুদেব স্বয়ং গিয়া ঔষধ দিয়া আসিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। উপেন্দ্র দাদা আমার কথা শুনিয়া একটু আনন্দাশ্রু ত্যাগের পর বলিলেন, "বুঝলে ত ভাই ব্যাপার খানা কি? যত শীঘ্র পার আশ্রয় নাও।" আমি বলিলাম, "তাঁর দয়া হলে ত পাইব, দিতেছেন কৈ!" উপেন্দ্র দাদা বলিলেন, "পূর্ণ নির্ভরতা আসিলেই দিবেন। তোমার পিতাকে আমি জানি, তিনি যেরূপ লোক ছিলেন, তাহাতে তোমাদের ভাল হওয়াই ত উচিত।"

শ্রীগুরুদেব আহ্নিক করিয়া উঠার পর উপেন্দ্র দাদা ও আমি প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, "কি গো উপেন্দ্র, হঠাৎ এসে পড়লে যে?" উপেন্দ্র দাদা প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "আপনার খেলা, সবই ত জানেন। দক্ষিণার কাছে সব শুনিয়াছি।" শ্রীগুরুদেব তাঁহার স্বভাবস্মিত মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দাদা গুরুদেবের লীলাই ঐরূপ রে, বাপু।"

একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীগুরুদেব গুস্করার বাটীতে শুইয়া আছেন, আমি তাহার পদসেবা করিতেছি, এমন সময় তিনি আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা

করিলেন, "মনটা কোন দিকে বেশী টানে কামাখ্যাচরণ ? ধর্ম্মের দিকে, কি চাকরীর উন্নতির দিকে ;" আমি বলিলাম, "আমার মনে হয় যে ধর্ম্ম যেন লোপ না পায়, আর সব-ইন্সপেক্টরের পদে প্রমোশনটা ও যেন নিশ্চয়ই হয়।"

শ্রীগুরুদেব—নিশ্চয়ই হবে। যাঁর* কাছে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এমন কি ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাঁর কাছে এ সামান্য প্রার্থনা নিশ্চয়ই মঞ্জুর হবে।

প্রথম প্রথম শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে আমার মনে হইত যে ইনি বেশ ভাল লোক। তখন ধারণা হইত না যে তাঁহার অমানুষিক শক্তি আছে বা তিনি নিজে ঈশ্বরবৎ সবই করিতে পারেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে বড়ই ভাল লাগিত। তাঁহার নিকট কোনও শনিবার না গেলে মনটা বড়ই ছটফট্ করিত। তাঁহাকে কেন এত ভাল লাগিত, কেন তাঁহাকে আপনার মনে হইত, কেন তাঁহার পানে ছুটিতাম, এই সকল প্রশ্ন অনেকবার মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অবশেষে মনে হইত যে এই ডাক্তার মহাশয় বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে আমার পিতামহ ৺বামাচরণ রায় চৌধুরী ছিলেন। তাঁহার সেই জন্মে অসাধারণ শিবভক্তি ও শিবপূজার জন্য বোধ হয় তিনি এ জন্মে এইরূপ যোগী হইয়াছেন। মনে হইত সেই জন্যই হয়ত আমার এত ভাল লাগে ও ইঁহাকে এত ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়—তাই পুনঃ পুনঃ দেখিলেও দেখার আশা মিটে না। নানা ভাবে তখন আমার মনটা আলোড়িত হইল, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। এইরূপ ভাবে বর্দ্ধমান হইতে বারংবার গুস্করায় গিয়া আমি তাঁহাকে দেখিয়া আসিতাম। অথচ মন তখনও একেবারে আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না। কোন কোন শনিবারে মেসের বাবুরা কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "কদমতলে বাঁশী বাজে, ঘরের কোণে রাধা সাজে। আজ আমাদের পুলিশ বাবু গুস্করার সাজে না কি ? আমি বেশী কিছু বলিতাম না, রাগ মনে মনে চাপিয়া শুধু বলিতাম, "আজ্ঞে হাঁ।" তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়াই আমার এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি নাই বলিয়া তিনি এখনও পূর্ণ আশ্রয় দেন নাই, শিষ্য করেন নাই, অথচ যাইতেও নিষেধ করেন নাই।

এইরূপ ভাবে তাঁহার নিকট যাতায়াত কালে একদিন বলিলেন, "দক্ষিণা, দাদা-গুরুদেব লিখেছেন যে তুমি এ বৎসর সব-ইন্সপেক্টর হবে এবং সব-ইন্সপেক্টরী পরীক্ষার ফল দাদা গুরুদেব স্বপ্নে জানাইয়া দিবেন।" সব-ইন্স-

---

* শ্রীগুরুদেবের বাক্যস্থ "যাঁর" শব্দে আমি সে সময় ধারণা করেছিলাম যে ইহার অর্থ "ঈশ্বরের"। কিন্তু ক্রমশঃ যতই তাঁহার সঙ্গে মিশিতেছি, যতই তাঁহার কৃপা অনুভব করিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে এই "যাঁর" শব্দের অর্থে যাঁহাকে বুঝায় তাঁহাতে এবং আমার পাতকি-তারণ শ্রীগুরুদেবে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। হায়! তখন এ কথা না বুঝিয়া আমি কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

পেক্টরী পরীক্ষার জন্য প্রতি পদে কোন অমানুষিক শক্তি আমাকে সাহায্য করিয়া যাইতেছিল। ঘোড়ায় চড়িতে পারি না- তথাপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঘোড়ার পরীক্ষার সময়, হাইড্রোসিল থাকা সত্বেও ডাক্তারী পরীক্ষার সময়, এমন কি competitive পরীক্ষায় সেনেট হ'লে পরীক্ষা কালীন, কতই সাহায্য পাইয়াছি, শেষে স্বপ্নযোগে পরীক্ষার ফলও জানিতে পারিলাম। যে দিন পরীক্ষার ফল পাইলাম সেই দিনই গুস্করা গেলাম। আমাকে দেখিয়া শ্রীগুরুদেব কহিলেন, "কি গো, ৪।৫ দিন আগে পরীক্ষার ফল স্বপ্নে জানিতে পার নাই?" আমি বলিলাম, "হাঁ জেনেছি।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "দাদা-গুরুদেব লিখিয়াছেন যে পরীক্ষার ফল জানাইয়াছেন। ভাগলপুর ট্রেনিং স্কুলে কবে যাবে?" আমি বলিলাম, "কাল এখান থেকে বর্দ্ধমান ফিরিয়া গিয়া তথা হইতে বাড়ী যাইব এবং বাড়ী হইতে বড় দিনের ছুটীর পরে ভাগলপুর যাইব।"

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তারিখে ভাগলপুর পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে প্রবেশ করিয়া উক্ত সনের ২০ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তথায় কাটিল, ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটনা নাই। মধ্যে মধ্যে প্রভুকে এক একটী পত্র দিতাম ও উত্তর পাইতাম। এই এক বৎসরের মধ্যে পেঁয়াজ খাওয়া, কসাই এর ঘরের কাটা মাংস খাওয়া, সাধারণ ভাবে সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি করিতে স্থান বা অবসরাভাব, এই সব নানা কারণে শ্রীগুরুদেবকে যেন মন হইতে একটু তফাৎ করিয়া ফেলিলাম বলিয়া ধারণা হইল। ডিসেম্বর মাসে উত্তীর্ণ হইয়া অন্তিম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলাম। পরে ভাগলপুর ট্রেনিং স্কুল হইতে আমার মানভুম জেলায় পোষ্ট হইল। ভাগলপুর হইতে যাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে গুস্করায় দেখা করিলাম, পরে মানভুম জেলাতে জয়পুর পুলীস ষ্টেসনের চার্জ গ্রহণ করিলাম। এই স্থানটি ঝালদা হইতে বেশী দূরবর্ত্তী নহে। সেই সময় আমার যে সারকেল ইন্সপেক্টর ছিলেন, তিনি মাতাল ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিতে থাকিতে ক্রমশঃ সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতিতে আমারও কেমন একটা শিথিলতা হইয়াছিল—এক্রম কি মাঝে মাঝে দুই পাঁচদিন কেবল মাত্র আঠার বার গায়ত্রী জপ করিয়াই দিনাতিপাত করিতাম। এইরূপে দিন চলিতে লাগিল। যে বংশে কেহ কোনও দিন মদ স্পর্শ করেন নাই, সেই বংশের কুপুত্র আমি মাঝে মাঝে এক আধ দিন ইন্সপেক্টর বাবুর সঙ্গে, বা তদ্রূপ কোনও সুসঙ্গী জুটিয়া গেলে তাঁহার সঙ্গে, দুই এক ডোজ চালাইতেও আরম্ভ করিলাম। ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল এবং অবশেষে একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। তাঁহার যে সকল ব্যবহারে এক সময় বর্দ্ধমানে থাকা কালে মহানন্দে দিনাতিপাত করিতাম ক্রমশঃ পূর্ব্বভাব দূর হইয়া সে সকলে এক প্রকার অবিশ্বাস আসিতে লাগিল।

যাহা হউক, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূজার পর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺অন্নদা প্রসাদের সঙ্গে আমার অগ্রজ ৺রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী আমার স্ত্রীকে ও আমার কন্যাদ্বয়কে আমার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। আমার অগ্রজ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে একবার আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া পুলিশ বিভাগের চরিত্র-

হীনতা ইত্যাদির গল্প শুনিয়া একাকী থাকিলে আমার চরিত্ররক্ষা ঠিক ঠিক হইবে কি না সে সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার স্ত্রীর পৌঁছাইবার পর তাহার ভয়ে কোনও দিন মদ্যপান করিতাম না বটে, তবে স্থানান্তরে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এক আধ দিন খাইতাম। কিন্তু তাহাকে উহা জানিতে দিতাম না। তবে ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺অন্নদা পরাধীন চাকরী করা কঠিন মনে করিয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য আমাকে অনুরোধ করায় আমি তাহাকে ডাক্তারী পড়িতে সাহায্য করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হই। সে আমার নিকট হইতে বাড়ী গিয়া বাড়ী হইতে গুস্করাতে যায়। সেখানে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তথা হইতে কলিকাতায় যায় এবং কলিকাতা হইতে আমাকে একটী পোষ্টকার্ড লেখে। তাহাতে তাহার পৌঁছানো সংবাদসহ নিম্নলিখিত বিষয়টি লেখা ছিল। সেই পত্র আমার স্ত্রীর হাতে পড়ায় সে তাহা পড়িয়াছিল। পত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ—"মধ্যম দাদা, আমি গুস্করায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিলাম, তাঁহার সঙ্গে আলাপে যতদূর বুঝিলাম তাহাতে মদ্যপান বা তদ্রূপ কোনও গুরুতর অন্যায় কার্য্য আপনার দ্বারা করা হইয়াছে বা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে বলিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল। মধ্যমদাদা, সাবধান, বিশেষ সাবধান—আমার পিতৃদেবের বংশে এরূপ কুকার্য্য করিলে বংশ থাকা বড়ই কঠিন। এমন কি গুরুতর বিপদে পড়িতে হইবে।" এই পত্রখানি পড়িয়া আমার স্ত্রীর মনে গুরুতর সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও সে ভয়ে আমাকে বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবল বলিল, "ঠাকুরপোর পত্রখানা পড়িয়া আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। একটু সাবধান থাকিবে। নইলে আমার শ্বশুর বড়-শ্বশুর যেরূপ ছিলেন, তাঁহারা তোমার ঔরসজাত পুত্রের হাতে পিণ্ড খাইবার ভয়েই তোমার পুত্র হইতে দিবেন না। দু-দুটো মেয়ে হয়েছে, সাবধান থেকো, ইত্যাদি।" কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলা সত্ত্বেও আমার সাবধানতা আসিল না

আমার ছোট ভাই ৺অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী সম্বন্ধে আমাদের সংসারের প্রত্যেকেরই খুব উচ্চ ধারণা ছিল বলিয়াই আমার স্ত্রীর মনে বেশী দুঃখ হওয়াতে সে আমার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে নজর রাখিতে আরম্ভ করে। শ্রীগুরু-কৃপায় একদিন আমার ঘোড়ার সহিশের নিকট হইতে প্রকাশ পাইল যে আমি সেই দিন সকালে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মদ্যপান করিয়াছি। তৎশ্রবণে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু আমি প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিতে বলায়, আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হই। তখন সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইল যে আমি যেন আর মদ্য স্পর্শ না করি। আমিও অগত্যা মদ ছাড়িলাম। কিন্তু মনে মনে নানা কুপ্রবৃত্তি আসিতে লাগিল। আমার স্ত্রী প্রসব জন্য ব্যড়ী যাওয়ায় সে সময় মদ খাইলাম না বটে, কিন্তু মনে মনে বিভিন্ন প্রকার কুপ্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। নানাভয়ে কায়িক পাপ না ঘটিলেও মানসিক দুশ্চিন্তায় শারীরিক প্রফুল্লতা যেন ক্রমশঃ হীন হইতে লাগিল। এই সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার ঘোরতর অবিশ্বাস উপস্থিত হইতে লাগিল। হঠাৎ এইদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি যে শ্রীগুরুদেবের

একটী ফটো যাহা আমার মাথার উপর থাকিত তাহা রাত্রি মধ্যে উইপোকায় খাইয়া দিয়াছে। এই ঘটনা আমি কাহাকেও বলি নাই, কিন্তু তথাপি আমার আমার দাদা ৺রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী ঘটনার দুই তিন দিন কি পাচ ছয় দিন পরে আমাকে একটী পত্রে লিখিলেন, "আমি গুষ্করায় গিয়াছিলাম। তথায় শ্রীগুরুজীর সহিত সাক্ষাতে ও কথাবার্ত্তাতে বুঝিলাম যে এখন তোমার তাঁর প্রতি ঘোর অবিশ্বাস আসিয়াছে। তজ্জন্য তিনি একদিন রাত্রে ইচ্ছা করিয়া উইপোকা দ্বারা তোমার নিকটে রক্ষিত তাঁর ফটোখানি ধ্বংস করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। যাহা হইক, আমি শীঘ্রই তোমার উদ্বোধন জন্য তাঁহার আদেশমত মেজো বৌমাকে পাঠাইতেছি। সাবধান।" ইত্যাদি।—

ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের এইরূপ বারংবার উদ্বোধন সত্ত্বেও, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য এইরূপ তাঁহার অপার দয়া সত্ত্বেও, আমি ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোনও মতে চেষ্টা কৃতকার্য্য হইতেছিল না। তাহাতে তখন মনে হইল যে পিতৃসত্তা ভাল আছে বলিয়া আমার রক্ষা হইতেছে। কিন্তু পরে বুঝিলাম ও জানিলাম যে উক্ত পিতৃসত্তা রক্ষার জন্য ভগবান্ শ্রীগুরুদেব অলক্ষিত ভাবে লক্ষ বার সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সেই সময় একদিন একটী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে পুরুলিয়া গিয়া দেখিলাম যে বাবু উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী কিছু দিন আগে তথায় ইনস্পেক্টর পদে প্রমোশন পাইয়া বর্দ্ধমান হইতে বদলী হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কোর্ট আপীসের বারাণ্ডায় দেখা হওয়ায় তিনি বলিলেন,—"কি হে, বেশ দারোগা হয়েছ দেখছি। কিন্তু অসৎ-সংসর্গে তোমার অবস্থা বড়ই মলিন হয়েছে। যাক, এখানে আর কথায় কাজ নাই। সন্ধ্যার পর বাসায় যাইও।" আমি সন্ধ্যার পব আমার শ্রীগুরুদেবের প্রিয়-শিষ্য কর্ম্মবীর উপেন্দ্র দাদার বাসায় গেলাম। উপেন্দ্র দাদা আমাকে জল খাইতে দিলেন। আমার জল খাওয়ার পর তিনি তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "কি হে, তোমার চক্ষু দেখিয়া যেন মাতাল ও লুচ্চার মত মনে হইতেছে। তোমার সে ব্রহ্মজ্যোতি, যেটী বর্দ্ধমানে দেখিয়াছিলাম, সেটী যেন লয় পাইয়াছে, তুমি ত্রিসন্ধ্যা শিবপূজা, বটুক ভৈরবের স্তবপাঠ প্রভৃতি যাহা বর্দ্ধমানে করিতে বন্ধ করিলে কেন? গায়ত্রী জপ পর্য্যন্ত বন্ধ করেছ নাকি?" "আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, কেবল গায়ত্রী জপই করছি। তাও মনের সহিত নয়—অমনি ভয়ে ভয়ে দোষ খালাস রকম। আমি ও সব বন্ধ করেছি, তা আপনি জানলেন কেমন করে?"

উপেন্দ্র দাদা বলিলেন, "আমি যেমন করেই জেনেছি জানি, কিন্তু অমন বাপের ছেলে হয়ে তোমার এ দুর্ম্মতি কেন? সহ্য হবে কি করে? কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাও মঙ্গল। মানসিক পাপও পাপ।" এই বলতে বলতে আমার বহু জন্মের সুহৃদ্ উপেন্দ্র দাদা ঘরের ভিতর হইতে আমার ভবকর্ণধার কল্পতরু শ্রীগুরুদেবের একখানি ফটো লইয়া আসিয়া আমাকে দেখাইলেই দেখিবামাত্র আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম ও বলিলাম, "আমার কি হবে, দাদা?"

উপেন্দ্রদাদা—ভয় কি আছে, ভাই? বাবা আমাদের পতিত-পাবন পাতকী-তারণ। আমিও মদ খেয়েছি,—আমিও ভদ্রলোক ছিলাম না—বাবার কৃপায় এখন ভদ্র হয়েছি। তুমি এক কাজ কর। আজ রাত্রি ১টার ট্রেনে গুস্করা গিয়ে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর চরণ দর্শন করে এসো, দেখবে অনেকটা উপকার হয়েছে।

আমি—কি করে যাব? কাল পুলিশ সাহেব আমার থানায় পরিদর্শনের জন্য আসবেন।

উপেন্দ্রদাদা—আরে, পুলিশ সাহেব ফুলিশ সাহেব ইত্যাদির ভয় করো না। যাও, তোমার কিছু হবে না। ভয় নাই, যাও। তাঁর খেলা তিনি খেলবেন।

আমি—তবে সে ভয় নাই। আচ্ছা, আজ রাত্রে আমি যাইতেছি।

পরদিন পুলিশ সাহেব আমার থানায় অর্থাৎ জয়পুর থানায় গিয়া আমার রাইটারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Where is your sub inspector?" সে বলিল, "হুজুর, পুরুলিয়া গবাই দেনে কো গিয়া।" তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "I am going to Jhalda P, S. Sadar. I will come later on for inspection," এই বলিয়াই তিনি ঝালদা চলিয়া যান—আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন নাই। আমি ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সুশীতল পদছায়া তলে বিশ্রাম করিবার জন্য পরদিন প্রাতে যেমন গুস্করা কাছারীতে যাইয়া উপস্থিত, অমনি দেখিলাম যে ভগবান্ নিজের প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। আমি প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলাম।

শ্রীগুরুদেব—কিগো, কেমন আছ?

আমি—ভাল আছি, বাবা।

শ্রীগুরুদেব—ভাল ত দেখছি না। চেহারাখানা যেন মাতালের মত হয়েছে, চোখ দুটো যেন লুচ্চার মত দেখাচ্ছে। আমার নিকট দারোগাগিরি চাহিয়াছিলে, আমি দারোগাগিরি দিয়াছিলাম, তাহার সারমর্ম্মটী কি বুঝিয়াছ বা পাইয়াছ আমাকে বল।

আমি—সার ত কিছুই পাই নাই, বা বুঝি নাই, দয়াময়।

শ্রীগুরুদেব—এরূপ হয়েছে কেন?

আমি—কি করব? আমি আপনার নিকট দারোগাগিরি চাহিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমাকে এইরূপ দুই তিন শত মাইল তফাতে না ফেলিয়া যদি এ জেলায় রাখতেন তাহলে বোধ হয় আমার এ দুর্দ্দশা ঘটতো না।

শ্রীগুরুদেব—দূরে কোথায়? নিকটেই ত?

আমি—দুই তিন শত মাইল তফাৎ, কি করে নিকটে হলো?

শ্রীগুরুদেব—নিশ্চয়ই নিকটে। তোমার সাধ্য কি যে আমার নিকট হইতে দূরে থাক, বরাবর আমার চোখে চোখেই আছ। কেন অন্নদার পত্রে, রাধিকার পত্রে, কি তার আভাস পাও নাই? তুমি একদিন জঙ্গল মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলে, তখন একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখিয়া পথ জানা সত্ত্বেও তাহার

সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার অছিলায় তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলে, এমন সময় জঙ্গলে একটী সুন্দর গন্ধ পাইয়া তোমার ৺পিতৃদেবের একটী কথা তোমার মনে পড়িল। তুমি ভাবিলে, বাবা বলিতেন যে হঠাৎ কোনও স্থানে সুন্দর সুগন্ধ পাইলে বুঝিতে হয় যে দেবলোক, পিতৃলোক বা তদ্রূপ উর্দ্ধ-লোকস্থ কোন মহাপুরুষ তথায় আসিয়াছেন ; আর কোনও দুর্গন্ধ পাইলে বুঝিতে হয় যে পিশাচ গুহ্যকাদি নীচলোকস্থিত কেহ তথায় আসিয়াছে।

তোমার ৺পিতার এই উপদেশ মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কথা তোমার মনে পড়ে এবং তুমি ভাব, “তাইত, আমি তাঁর শিষ্য হবার চেষ্টা করছি, আবার আমার এই দুর্ম্মতি হচ্ছে!” এই মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ঘোড়াকে চাবুক মার—ঘোড়া বায়ুবেগে এক মাইল দূরে যে গ্রামে তোমার বিশ্রাম করিবার কথা ছিল তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। এমন কি, পথে তোমার মাথার হ্যাট উড়িয়া যায়, সেই হ্যাট পরে তুমি চৌকীদার পাঠাইয়া কুড়াইয়া তোমার আবাস স্থানে লইয়া যাও। দেখ, সত্য বটে কিনা ? সেটা কেমন গন্ধ ?

আমি—(কাঁদ-কাঁদ ভাবে) বাবা ! সে এক অপূর্ব্ব গন্ধ—যেন নানা গন্ধ মিলিত হইয়া সেটী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাতে গুগ্গুল্, বাসযুক্ত ধূপাদি সব যেন আছে ;

শ্রীগুরুদেব—(নিজের হস্ত আমাকে শুঁকিতে দিয়া) দেখ দেখি, এই গন্ধ কিনা ?

আমি—হাঁ, বাবা (চক্ষে জল আসিল)।

শ্রীগুরুদেব—আমি দেখিলাম যে স্ত্রীলোকটী এরূপ খারাপ যে তুমি কথা কহিলেই সে দিন তোমার পতন অনিবার্য্য ছিল, তাই তাড়াতাড়ি তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। এমন একদিন নয়, দুই দিন নয়; বহুদিন বহু স্থলে, আমি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছি। এমন কি, ২৪ ঘণ্টাই তোমাকে দেখি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, জানিও। একদিন তোমার থানার জানালার নিকটে তুমি এইরূপ গন্ধ পাইয়াছিলে, একদিন রাত্রে হঠাৎ তোমার বাসার সদর দরজা হড়াম করিয়া খুলিয়া যায়। বৌমা জিজ্ঞাসা করায় তুমি তাহাকে বল, “আমি নিজে দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল লাগাইয়া দিয়াছিলাম। তবে এমন হলো কেন ? বোধ হয় বাতাসে খুলে গেল।” একদিন সন্ধ্যার সময় গায়ত্রী জপ করা কালে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি তোমার মনের সামনে ফুটিয়া উঠে ও সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে মশাতে কামড়ায় ও তুমি মশাটাকে চাপড় মারিতে যাও। মশাটা উড়িয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে সেই স্ত্রীমূর্ত্তিটীও তোমার মনের আড়াল হইয়া পড়ে। সেই মূর্ত্তি তুমি দেবী-ভাবে লইতে পারিতে না বলিয়া এই অভিনয় করিয়া দেওয়া গেল। কারণ তাহা একটী সামান্য রমণী মূর্ত্তির মত তুমি ভাবিতে আরম্ভ করিতে না করিতেই আমি এইরূপ করি। এখনও কি তুমি বলিতে চাও যে তুমি আমার নিকট হইতে দূরে আছ ?

আমি—তা আর কি করে বলি, বাবা ? আপনি সর্ব্বত্র ব্যাপক।

শ্রীগুরুদেব—না, আমিও মানুষ। ক্রিয়ার দ্বারা তোমারও এই অবস্থা হইতে পারে। তবে পরিশ্রম সাপেক্ষ, প্রাণকে পণে পরিণত করিতে না পারিলে সাধনা হয় না।

তৎপরে ভগবান্ শ্রীগুরুদেব আমাকে এইরূপ আরও কতিপয় উদাহরণ বলিয়া এইরূপ কতকগুলি লোকের নাম গ্রহণ করিলেন, যাহাদিগকে আমি বর্দ্ধমান জেলায় থাকার সময় কদাচারী ভাবিতাম, এবং জানাইলেন, যে তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমি—(একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ, সকলেই হলো।

শ্রীগুরুদেব—তার আর দুঃখ কি? তুমিও হবে।

আমি—কৈ, আমার ত এখন পর্য্যন্ত অনুমতি আসিল না।

শ্রীগুরুদেব—এসে যাবে, আবার পশ্চিমে লিখব। সাবধানে থেকো।

আমি—আপনি মালিক।

শ্রীগুরুদেব—তুই ও মালিকরে, বাপু।

আমি—আজ্ঞে।

সেদিন এই ভাবে শ্রীগুরুদেবের নিকট কাটাইয়া তাঁর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈকালের ট্রেনে রওনা হইলাম। পরদিন প্রাতে পুরুলিয়া পৌঁছিয়া উপেন দাদাকে সমস্ত জানাইলাম।

গুষ্করা হইতে ফেরত আসিয়া কিছুদিন বেশ ভালই ছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে পুনরায় নানা প্রকার কুচিন্তা কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি আমার মনে উদিত হইতে লাগিল। তবে কার্য্যতঃ তাঁহার ভয়ে কোনও রূপ পাপে ব্রতী হই নাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে বেলা আন্দাজ ১১৷১২ টার সময় আমি মফঃস্বল হইতে ফেরত আসিয়া থানার বারাণ্ডায় চেয়ারে বসিয়া সরকারী পোষাক খুলিতেছিলাম। পাতলুনখানি খুলিব, এমন সময় দেখি যে শ্রীগুরুদেবসহ আমার অগ্রজ ৺রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আমি আমার অঙ্গনের বাহিরে সরকারী রাস্তার উপরে গিয়া তাঁহাদের উভয়কে প্রণাম করিলাম এবং দাদাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, “দাদা, গুরুদেব কি রকমে এলেন?”

দাদা—তোমার ও বৌমার কল্য প্রাতে দীক্ষার দিন।

শ্রীগুরুদেব—দাদা-গুরুদেব পত্র দিয়েছেন যে শীঘ্র গিয়া দক্ষিণাকে দীক্ষা দিয়ে দাও, নতুবা সে পতিত হবে, আর তাকে রক্ষা করা কঠিন হবে।

আমি—আপনার দয়া।

শ্রীগুরুদেব—রাধিকা ত ভাবিয়া অস্থির যে দক্ষিণা ডাকাতি মোকদ্দমার তদন্তে মফঃস্বলে আছে, তাহাকে একটী টেলিগ্রাম করিয়া যাওয়াই ভাল।

এই সময় আমার থানার এবং কতিপয় পার্শ্ববর্ত্তী থানার কয়েকটি ডাকাতি মোকদ্দমা হয়। সেই সকল মোকদ্দমার তদন্ত সূত্রে আমি প্রায়ই মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলিয়া দাদা জানিতেন, কারণ সে বিষয়ে আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছিলেন। যখন শ্রীগুরুদেব নিকট প্রস্তাব করিলেন, “সর্পীতে তোমাকে ও বড় বৌমাকে দীক্ষা দিয়া সর্পী হইতে জয়পুর গিয়া তথায় দক্ষিণাকে ও মেজো বৌমাকে ৮ই জুন (১৯০৮) তারিখ দীক্ষা দিব এবং সেখান হইতে পুরুলিয়াতে ফিরিয়া উপেন্দ্রের বাসায় একদিন থাকিয়া ফেরত আসিব,” সেই সময় দাদা [illegible] [illegible], “দক্ষিণা [illegible] তথায় না থাকে, যদি ডাকাতি

মোকদ্দমার তদন্তে মফঃস্বলে থাকে, তাহা হইলে একটু অসুবিধায় পড়িতে হইবে। তজ্জন্য তাহাকে তারিখ জানাইয়া একটী টেলিগ্রাম করিয়া দিলে হয়।" তদুত্তরে শ্রীগুরুদেব দাদাকে বলেন, কিছু মাত্র দরকার নাই। . সমগ্র জগতের মধ্যে সে যেখানেই থাকুক সেদিন তাহাকে থানায় টানিয়া আনা যাইবে, তার আর কি ?"

ডাকাতি মোকদ্দমার ঘটনাস্থল হইতে হঠাৎ আমার উক্ত রোজ অর্থাৎ ৭ই জুন তারিখ বেলা ১১টায় থানায় আসার কারণ এই যে তার আগের দিন অর্থাৎ ৬ই তারিখ রাত্রি আন্দাজ ১০।১১ টার সময় পুলিশ সাহেবের নিকট হইতে একটী তার প্রাপ্ত হই যে জয়পুর জমিদার ও B. N. R. কোম্পানীর মধ্যে একটী ব্যালাষ্ট পাথরের খাদ লইয়া বিবাদের সম্ভাবনা আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "See to it personally at once" ইত্যাদি। তজ্জন্য আমি ৭ই তারিখ শ্রীগুরুদেবের আসার অব্যবহিত পূর্ব্বে থানায় আসিয়া উপস্থিত হই। এমন কি, পোষাক সম্পূর্ণ রূপে ছাড়িবার পূর্ব্বেই শ্রীগুরুদেব দাদাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপনীত হন।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীগুরুদেবের থাকিবার জায়গা কোন্ স্থানে করিবে ?" আমি বলিলাম, "ইন্সপেকসন রুমটাই ভাল। তবে ১৫।২০ দিন পূর্ব্বে একটী কনষ্টেবল কলেরা হইয়া উক্ত ঘরে কয়েক ঘণ্টা পড়িয়াছিল। তারপর তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া ঐ স্থান গোবরাদি দিয়া লেপিয়াছি বটে, কিন্তু ফেনাইল ইত্যাদি দিয়া ধোয়াই নাই।" দাদা বলিলেন, "তুই এতদিন পরে এই বুঝলি ?" শ্রীগুরুদেব কিছু উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এক গাড়ু জল আন ত বাপু।" আমি বাসা হইতে এক গাড়ু জল আনিয়া দিলাম এবং আমাদের সমক্ষে তিনি সেই জলভরা গাড়ুটির দিকে দৃষ্টি করিয়া দেওয়া মাত্রেই সেটী ফেনাইল-মিশ্র জল হইয়া গেল। সাদা রং ও গন্ধ সবই হইল। তখন তিনি বলিলেন, "ইনস্পেকশন ঘরে ছড়াইয়া দাও ও তোমার বাসাতেও ছড়াইয়া দাও। বাসার পায়খানাটা, বাপু, বড় কদর্য্য, সেটাতে ভাল করে দিবে।" বলা বাহুল্য, ইতঃপূর্ব্বে তিনি আমার বাসায় কখনও আসেন নাই বা পায়খানা দেখেন নাই, কিন্তু সেই সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্মাণ্ডবিহারীর নিকট না দেখা বা না জানা আর কি আছে ?

পরদিন ৮ই তারিখ প্রাতে আমার পাপ-জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। অজ্ঞান-তিমির-নাশী ভবরোগহারী বৈদ্য আমার ভবব্যাধির চিকিৎসক হইলেন। তখন আমার স্ত্রীর তিনমাস অন্তঃসত্ত্বাবস্থা, সেও সেই অবস্থাতে আশ্রয় পাইল। সেই গর্ভে শ্রীমান্ গুরুগতি রায় চৌধুরীর জন্ম হয়। সেও এখন তাঁহার পদাশ্রিত শিষ্য। উভয়ের দীক্ষা কার্য্য সমাধা হইয়া গেল এবং সেই তারিখ বৈকালেই ট্রেনযোগে শ্রীগুরুদেব জয়পুর হইতে পুরুলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

জয়পুর থানা হইতে জয়পুর ষ্টেশনে যাওয়া কালীন পথি মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে যাইতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক মিনিটের জন্য তাঁহাকে দেখা গেল না, আবার দেখা গেল। তিনি বলিলেন, "পুরুলিয়াতে উপেন্দ্র ও তার স্ত্রী তুমুল ঝগড়া করছে। তাই একটু দেখে এলাম। আমার উপস্থিতিতেই সেটা থেমে গেল।" পুরুলিয়াতে আসিয়া দেখি যে ষ্টেশনে উপেন্দ্র বাবু

আমাদিগকে নিতে আসিয়াছেন। বাবাজী উপেন্দ্র বাবুকে দেখিয়াই বলিলেন, “কি গো, রাগ-রাগ ভাবটী দেখা যাচ্ছে যে।” উপেন্দ্র বাবু বলিলেন, “আজ্ঞে।” পরে আর কোন কথা নাই। আমরা সকলে তাঁহার বাসায় পৌঁছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে আমি উপেন্দ্র দাদার নিকট জানিলাম যে তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত সেদিন একটু রাগারাগি করিয়াছিলেন।

শিষ্য হওয়ার পর হইতে দুই স্ত্রী-পুরুষে বেশ বুঝিতেছিলাম যেন একটি অনির্বচনীয় পরমা শক্তি আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং যদি সেই তেজ, সেইভাব, সেই নির্ভীকতাদি দৈবগুণ আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাব রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর কোনও ভয়ের কারণ থাকিত না, আর হা-হুতাশ থাকিত না,—আজ কি যে একটী হইতাম তাহার সীমা করা যায় না। যাহা হউক, নিজের দোষে সে অবস্থা আসতে দিলাম না। শিষ্য হওয়ার পর ছয় মাস বা আট মাস কাল পর্য্যন্ত পদে পদে দেখিয়াছিলাম যেন প্রত্যেক দোষ বা গুণের ফল সঙ্গে সঙ্গে পাইতেছি, সংশোধন যেন সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে। কিন্তু ক্রমশঃ কালস্রোতে নিজেকে আবার মলিন করিতে লাগিলাম।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল বা মে মাসে আমার বলরামপুর থানায় পোষ্ট হইল। তথায় থাকা কালীন একদিন খাইতে বসিয়াছি, সেই সময় আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্ত্তা বলিতে আমার হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হয়, আমি তাহাকে বলি, “খাবার সময় এ সকল কথার কি দরকার?” এই বলিয়াই আমি ভাতের থালাটী বারাণ্ডা হইতে আঙ্গিনাতে ছুড়িয়া দিয়া উঠিয়া গাড়ু লইয়া আঙ্গিনায় হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসি। এমন সময় আমার স্ত্রী বলিল, “ভাত লক্ষ্মী, এরূপ কি করে? চিরকাল কি ছেলেমানুষ থাকতে হয়?” এই কথা শুনিয়া আমার ক্রোধের উপশম না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইল। আমি গাড়ুটী যেমন উপরে তুলিলাম এবং পরক্ষণেই ছুড়িব এরূপ মনে করিতেছি, এমন সময় গাড়ুটী আমার হাত হইতে পাথরে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। আমার স্ত্রীর নজরে পড়িল যে গাড়ুটী আমার মাথার পশ্চাদ্দিকে থাকা কালীন একটী হাত যেন তাহা ধরিয়া পাথরে ফেলিয়া দিল। আমি কিন্তু সেই হাতটী দেখিলাম না। এ ঘটনা ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে লেখা হয় নাই, বা বলা হয় নাই, কিন্তু তিনি পুরুলিয়াতে থাকা কালীন তথায় সেই তারিখ ও সেই সময় একটী গুরুভাইকে বলেন, “আজ দক্ষিণার হাতে গাড়ুটী আমি কাড়িয়া ফেলিয়া না দিলে, সেটী বৌমার মাথার উপর পড়িত, কারণ দক্ষিণা রাগিয়া গাড়ুটা ছুড়িতে গিয়াছিল।”

আর একদিন বলরামপুর থানায় আমি সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করিতেছিলাম, আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েদিগকে বারাণ্ডায় শাসন করিতেছিল। আমার মনে ভয়ানক বিরক্তভাব হইল, আমি উঠিয়া আমার স্ত্রীকে রাগিয়া বলিলাম, “তোমার আহ্নিকের সময় কোনও গোলমাল করিলে তুমি বিরক্ত হও, আর আজ আমার আহ্নিকের সময় তুমি কেমন ছেলে মেয়েদিগকে শাসন করিতেছিলে? তোমার একটু আত্মাভিমান হইয়াছে যে তুমি খুব ভাল আহ্নিক কর আর মনে ভাব আমি কিছুই করি না, তাই তুমি আমার আহ্নিকের সময় এইরূপ অগ্রাহ্য করিলে। ইহা দ্বারা তোমার সমস্ত ক্রিয়া ধ্বংস করিলে।” এই সময় ভগবান্

শ্রীগুরুদেব বর্দ্ধমানে। পরদিন তিনি আমার একটী গুরুভাইকে (নরেন্দ্র নাথ মুখুর্জ্যে, সাং তেলিবেড়িয়া, জেলা বাঁকুড়া) বলেন, "বৌমা বেশ ক্রিয়া করিতেছিল ও উন্নতি করিতেছিল, কিন্তু দক্ষিণা স্বামী হইয়া তাহাকে অভিশাপ দেওয়ায় তাহার সমস্ত স্থগিত হইয়া গেল। আমি কি করিব? স্বামীর স্বামিত্ব কে নষ্ট করিবে?" ইত্যাদি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে নরেন্দ্র দাদা একদিন বলারামপুরে থানার বাসায় আসিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে এই কথা বর্ণনা করেন। আমার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলে, "আমি বাবাকে একথা লিখি নাই বা আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু করি নাই। তিনি স্বামী হইয়া বলিলেন, আমি কি করিব। আমার ছেলেকে আমি যদি দুধ দিতে গিয়া গলা টিপিয়া দিই, ছেলেটী কি করিতে পারে? আমার স্বামীও আমার গলা টিপিয়া দিলেন। দাদা, আমি কি করিব?"

বলরামপুর থানায় একদিন রাত্রে আমি আহ্নিক করিতে বসিয়া নানা বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া নিজের প্রকৃত কার্য্যে ভুল করিয়া আসনে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একটী চড় আমার গালে পড়িল বলিয়া মনে হইল। পরদিন প্রাতেই ভগবান্ শ্রীগুরুদেব বর্দ্ধমানে গুরুভাইদের নিকট বলেন, "কাল দক্ষিণার আহ্নিকের সময় তাকে একটী চড় মারিয়া দিয়াছি, কারণ সে বিশেষ অন্যমনস্ক হইয়াছিল।" আমি এ কথা কাহাকেও বলি নাই, বা লিখি নাই। কিছু দিন পরে বর্দ্ধমান গিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি সকলের মুখে ইহা শুনিলাম।

বলরামপুর থানার থাকায় সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব একবার আমার বাসায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। রাত্রে তাঁহাকে যে ঘরে শুইতে দেওয়া হইয়াছিল সে ঘরে তাঁহার শয়নের পূর্ব্বে পূজার জন্য ফুল ও অন্যান্য দ্রব্য সমস্ত দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু ভ্রমবশতঃ আতপ তণ্ডুল দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে যে ঘরে শুইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহার পার্শ্বের ঘরে আমি, আমার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ এবং আমাদের একটী গুরুভাই শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় আমার স্ত্রী আমাকে ও আমার গুরুভাইটীকে জানাইল যে শ্রীগুরুদেবের ঘরে আতপ চাউল নৈবেদ্যের জন্য দেওয়া হয় নাই, ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সময় শ্রীগুরুদেবের ক্রিয়ার সময় বলিয়া ভরসা করিয়া কেহই আর তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে উঠাইতে বা চাউল দিতে ভরসা করিলাম না। অগত্যা আমাদের ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে খিল লাগাইয়া আমরা সকলে শুইলাম। প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুদেব যেমন তাঁহার ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, অমনি আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে জ্ঞাপন করিলাম যে ভ্রমবশতঃ রাত্রে নৈবেদ্যের জন্য আতপ তণ্ডুল দেওয়া হয় নাই। শ্রীগুরুদেব তদুত্তরে বলিলেন যে তিনি আমাদেরই ঘরের আতপ তণ্ডুলে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া পূজাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম যে আতপ তণ্ডুল আমাদের ঘরের ভিতরে হাঁড়িতে ছিল এবং আমাদের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তিনি কি প্রকারে উক্ত তণ্ডুল পাইলেন এবং কি প্রকারেই বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "একবার তণ্ডুলের পাত্রটা দেখ না? তাহা হইলেই

বুঝিতে পারিবে।" আমরা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আতপ চাউলের পাত্র দেখিয়া বুঝিলাম যে আমাদেরই ঘরের আতপ চাউল গুলি তিনি নৈবেদ্যের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদের ঘরের মধ্যে যে পাত্র হইতে আতপ চাউল লইয়াছিলেন তাহাও আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। এই অমানুষিক কার্য্য দর্শনে আমরা সকলেই স্তব্ধ হইয়া বলিলাম, "সকলই আপনার কৃপা" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি উক্ত চাউল না লইয়াও পূজা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে তোমাদের মনঃকষ্ট হইত। তাই উক্ত ঘর হইতে চাউল লইয়া আসিয়াছি। সাধারণ দরজা, কপাট, দেওয়াল প্রভৃতিতে আমার গতিরোধ করিতে পারে না।"

১৯১২ সালে আমার চিরকুণ্ডা থানায় বদলী হইল। সেখানে থাকা কালীন কুমারডুবি পটারি ওয়ার্কস এর নরেন্দ্র নাথ মিত্র অনাথ নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির সঙ্গে আমার আলাপ ও ক্রমশঃ বন্ধুত্ব হয়। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের সহিত ভগবান্ শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আলাপ হয়। একদিন অনাথ-নাথ কালাচাঁদ প্রভৃতি আমায় বাসায় বেড়াইতে আসেন। অনাথনাথ বলেন, "তোমার গুরুদেবে সম্বন্ধে কতকগুলি নিন্দাবাদ লোকমুখে শুনিয়াছি। যদি রাগ না কর তাহা হইলে সেই সন্দেহ গুলি বলিয়া দূর করিতে চাই।" এই কথা শুনিয়াই আমার মনে সেই দয়াল গুরুদেবের স্মৃতি জাগিল এবং আমি তাঁহার শিষ্য বলে একটু আত্মাভিমানযুক্ত নির্ভরতা আসিয়া হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হ'ল "ভাই অনাথে, তুমি ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের যাহা কিছু নিন্দা শুনিয়াছ, বলিয়া যাও, আমি যদি প্রত্যেকটীই তাঁহার প্রশংসায় পরিণত করিতে না পারি তবে তাঁহার শিষ্যত্ব হইতে নিজেকে বর্জ্জিত বলিয়া মনে করিব।" এই বলিয়া আমি মনে মনে আমার হৃদয়-নাথকে স্মরণ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তর হইতে "জয় গুরু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" মনে মনে বলিয়া আমার প্রিয়বন্ধু অনাথনাথের মুখে আমাদের অনাথনাথের নিন্দাবাদ শুনিতে লাগিলাম এবং জানিনা কি প্রকারে সেই প্রত্যেক নিন্দাবাদটীকে প্রশংসায় পরিণত করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত আমাদের অনাথনাথের সম্বন্ধে কতই আলাপ হইল। সেই কথা-প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীশ্রীভৃগুদেব পরমহংসদেবের সম্বন্ধেও দুই চার কথা আলোচিত হইল। ১১টার পর তাঁহারা সকলেই আমার বাসা হইতে নিজেদের বাসাতে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার একটী বিশেষ কার্য্য বশতঃ তাঁহাদের সাহেবের নিকট ছুটী চান। কিন্তু ছুটী না পাইয়া চাকরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যান। নরেন্দ্রনাথ, অনাথনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে হারাইয়া অনাথনাথ অত্যন্ত কাতর হন, ও যাহাতে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় কুমারডুবি কারখানাতে চাকরী প্রাপ্ত হন এই প্রার্থনায়, ভগবান্ শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেবের নাম উক্ত রাত্রে যথাশক্তি জপ করেন। উদ্দেশ্য পরীক্ষা। রাত্রি প্রভাতে অনাথনাথ নিজ কার্য্যের জন্য আফিসে যথারীতি যাইয়া কিছুক্ষণ পরে সাহেব কর্ত্তৃক আহূত হন এবং সাহেব তাঁহাকে বলেন, "Send an intimation to Naren that his pay is increased by Rs. 5 and that he must join on expiry of his leave." অনাথনাথ এই

আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া একটু স্তম্ভিত হইয়া ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের প্রতি একটু আকৃষ্ট হন। যাহা হউক, সে আকর্ষণ কিন্তু তৎকালে সাময়িক ছিল, গাঢ়তর হয় নাই। তৎপরে একদিন আমি ও আমার স্ত্রী বর্দ্ধমানে শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে যাই, অনাথনাথও আমাদের সঙ্গে তথায় যান। আমরা বর্দ্ধমান বিশুদ্ধাশ্রমে বেলা প্রায় ১॥০টার সময় পৌঁছিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে অনেক আলাপ করি। যথা সময়ে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান্ শ্রীগুরুদেব আহ্নিক করিতে গমন করেন। সেই সময় আমি অনাথকে জিজ্ঞাসা করি, "কি ভাই, কি রকম দেখলে বা বুঝলে?" অনাথনাথ বলিলেন, "ভাই, আমার মনে ভক্তি হইল না। কারণ আমি যতোদূর দেখলাম ও বুঝলাম তাহাতে এই দেখলাম যে শিষ্যগণ তাঁহাকে একটি বড় রকমের বাবু সাজাইয়া রাখিয়াছে—আমার এখানে শিষ্য হওয়া হইল না বা হইবে না।" অনাথনাথ আমার একটী প্রিয় বন্ধু অথচ তিনি যে আমার গুরুভাই হইয়া সেই বন্ধুত্ব-সূত্রটী আরও গাঢ়তর বাঁধনে বাঁধিলেন না, তাই প্রাণে একটী ভয়ানক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আসিল, কিন্তু তাহা আর বাক্যে প্রকাশ করিলাম না, আর যে দীর্ঘনিশ্বাস আসিতেছিল তাহাও চাপিয়া দিলাম এবং মনে মনে বলিলাম, "ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" কিছুক্ষণ পরে ভগবান্ শ্রীগুরুদেব আহ্নিক সমাপন করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং আশ্রমের নীচের তালায় তাঁহার বসিবার তক্তাখানিতে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। সেই আলাপের মধ্যে অনাথনাথকেও দুই চার কথা বলিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ এইরূপ আলাপের পর তিনি পুনরায় উপর তালায় তাঁহার শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর অনাথনাথ বলিলেন, "ইনিই যে আমার গুরু ও কর্ণধার তাহা নিশ্চয়। আমি নিশ্চয়ই ইহার নিকট শিষ্য হইব; আমার আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী আদি কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না।" জানিনা কোন্ অতীন্দ্রিয় কারণে অনাথনাথের হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন হইল। আমি অনাথনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ তোমার এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি?" কিন্তু অনাথনাথ অত্যন্ত চাপা বলিয়া আমাকে সেটী বলিলেন না। ক্রমশঃ অনাথনাথ ও নরেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে পরিতৃপ্ত হইলেন।

একদিন বর্দ্ধমানে আমি, গিরিন দাদা (গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তখন পেনসন-প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), আমার অগ্রজদেব (৺রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী—হেডমাষ্টার, উখরা হাই স্কুল) ও আরও একজন গুরুভাই বসিয়া আছি, আর ভগবান্ শ্রীগুরুদেব একটু তফাতে শুইয়া আছেন। তাঁহার একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছে। এমন সময় চারিদিকে টুপটাপ করিয়া আঙ্গুর পড়িতে লাগিল। আমরা সকলেই দুই একটি করিয়া সেই আঙ্গুরগুলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খাইতেছি, এমন সময় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব তন্দ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে একটু তন্দ্রা আসায় তিনি তন্দ্রামধ্যে দেখিতেছিলেন যে, আঙ্গুর পাড়িতেছেন। যে আঙ্গুরগুলি পড়িয়াছিল তাহার দুই একটী তখনও ছিল। আমরা তাঁহাকে বলিলাম যে আমরা কয়েকটী আঙ্গুর খাইয়াছি এবং এইগুলি এখনও রহিয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হইলাম। আমরা

সকলেই বুঝিলাম যে স্বপ্নেও কোনও ইচ্ছা শ্রীগুরুদেবের মনে উদিত হইলে তাহাও কার্য্যে পরিণত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার অগ্রজ মৃত্যু-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কাঁদিয়াছিলেন এবং পরে ১৯০৮ সালে জুন মাসে ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তদবধি তাঁহার সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। প্রায় প্রত্যেক ছুটীতেই তিনি শ্রীগুরুদেবের নিকটেই থাকিতেন ও তাঁহার সঙ্গে তীর্থ-পর্য্যটনও করিতেন। ১৯১৮ সালের শেষ ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সে সময় তিনি মৃত্যুর জন্য এরূপ প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে মৃত্যু-চিন্তায় আর কাতর হন নাই। মৃত্যুর প্রায় ৮ মাস পূর্ব্বে তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে আমার মৃত্যুকাল নিকটস্থ। অতএব আমার এক্ষণে যথাসম্ভব ত্যাগ করা দরকার, বিশেষতঃ মায়াত্যাগ বড়ই দরকার হইয়াছে।" ৺অগ্রজ দেবের উপর আমি অত্যন্ত নির্ভর করিতাম বলিয়া তিনি আমাকে সংসার-সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিলেন এবং যাহাতে আমি তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক অপব্যবহৃত না হই তজ্জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রামগতি রায় চৌধুরীর সমক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাগতি রায় চৌধুরীকে আমার প্রতি তাঁহার অবর্ত্তমানে সে কি প্রকার ব্যবহার করিবে তদ্বিষয়ে কয়েকটী প্রতিশ্রুতি করাইলেন। সে সময় শ্যামাগতি অগ্রজ দেবের পদসেবা করিতেছিল। তাই দাদা শ্যামাকে বলিলেন, "সাবধানে কথা বলিবি, তুই আমার পা ছুঁইয়া আছিস।" শ্যামাও তদুত্তরে বলিল, "হ্যাঁ, আমি পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম" ইত্যাদি।

মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে অগ্রজদেব আমাকে পুনরায় কথাচ্ছলে তাঁহার অতিসন্নিকটবর্ত্তী মৃত্যুর কথা এবং ৺কাশীধামে তাঁহার নামে ৺শিবস্থাপনাদির কথা এবং আরও অনেক কথা অকাতরে বলিয়া গেলেন। কিন্তু তৎকালে বুঝিতে পারি নাই যে, দাদা এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। এই কতিপয় বৎসর গুরুদেবের সঙ্গে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ এবং তাঁহার সহিত একত্রে প্রত্যেক ছুটীর সময় কিছুকাল বাস করিতে করিতে অগ্রজদেব এতটা আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে আর তিনি মৃত্যুভয়ে কাঁদেন নাই। ১৯০৪ সালে যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন পরে আর সে কান্না ছিল না—তৎপরিবর্ত্তে পূর্ণ নির্ভরতা সহকারে মৃত্যুকালে "গুরু নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া জীবন ত্যাগ করেন। আমার জামাতা শ্রীমান্ বলরাম মুখোপাধ্যায় (সাং আকন্দাড়া পোঃ গোপালপুর, জেলা বর্দ্ধমান) আমার অগ্রজদেবের মৃত্যু কালে তথায় উপস্থিত ছিল, আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। উক্ত বলরাম বাবাজীবনের মুখে অবগত হইলাম যে দাদার মুখ হইতে "গুরু নারায়ণ ব্রহ্ম" শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দাদার চক্ষের সামনে দেওয়ালটী বৈদ্যুতিক জ্যোতিবৎ তীব্র অথচ মধুর জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া গেল এবং দাদাও সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহজগতের খেলা শেষ করিলেন।

১৯০৪ সালে যিনি মৃত্যুভয়ে কাতর হইয়া বালকবৎ কাঁদিয়াছিলেন, ১৯১৮ সালে তিনি মৃত্যুর জন্য নিজেকে এতটা প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে আর মৃত্যু-

ভয়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ববৎ কম্পিত হয় নাই, বরং মৃত্যুর ৮।৯ মাস পূর্ব হইতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ মধ্যে এইরূপ ভাবে আত্ম-সংশোধনের মূল কারণ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সম্পর্ক ও কৃপা। দয়াময় শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের বিশুদ্ধ আনন্দ রসে দাদার হৃদয় এতই আপ্লুত থাকিত যে তিনি যেন প্রত্যেক কার্য্য মধ্যেই দয়াল গুরুর কৃপা উপলব্ধি করিতেন এবং আমাদিগকেও তদ্বিষয়ে প্রায়ই উদ্বোধন করিতেন। দয়াময় শ্রীগুরুও দাদার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অনেক সময়েই অনেক অত্যাশ্চর্য্য বিভূতি তাঁহাকে দেখাইতেন। যিনি লীলা দেখিবার অধিকারী তিনিই দেখিতে পান, সকলে দেখিতে পান না। বর্ত্তমান কালেও আমাদের মধ্যে কতিপয় ভাগ্যবান্ কর্ম্মী গুরুভাই বাবার নাভিপদ্ম বিকাশ প্রভৃতি যোগতত্ত্বের গুহ্য গুহ্য বিভূতি দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু মাদৃশ পাতকী জনের কপালে তাহা জুটিল না।

অগ্রজদেবের নিকট হইতে ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের শত শত বিভূতির কথা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। সে সমস্ত লিখিতে হইলে বহু সময় আবশ্যক, কিন্তু নানা কারণে তত সময় নাই বলিয়া কয়েকটি মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ—

১। একদা আমার অগ্রজ আমার ও আমার স্ত্রীর কোষ্ঠী দুই খণ্ড লইয়া গুস্করা মোকামে শ্রীগুরুদেবের নিকট গিয়াছেন। তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য তাঁহাকে আমাদের কোষ্ঠী দেখাইয়া যাহাতে আমার একটি পুত্র হয় তদ্বিষয়ে গণনা করান ও প্রার্থনা। দাদা তথায় গিয়া পৌঁছিবা মাত্রই, শ্রীগুরুদেবকে কোষ্ঠীর বিষয় কিছু উল্লেখ না করা সত্ত্বেও বা তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বেই, শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, "কি রে, বাপু, দক্ষিণার পুত্রের জন্য এত চিন্তা কেন ? কোষ্ঠীটা ভুল আছে। দেখিবার দরকার নাই, একটি পুত্র হবে।" তিনি আর কোষ্ঠী দেখেন নাই এবং পর বৎসরই আমার পুত্র শ্রীমান গুরুগতির জন্ম হয়।

২। অনেক গুলি শিষ্য সহ একবার শ্রীগুরুদেব ৺হরিদ্বার ধামে গিয়াছিলেন—দাদাও সেই সঙ্গে ছিলেন। রাত্রের বেলায় ট্রেন হইতে নামিবার পর কোথায় যাওয়া হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, এমন সময় একটি পুরুষ তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া পথ-প্রদর্শক ভাবে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া একটি স্থানে বাসার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া যান। উক্ত লোকটিকে আর কেহই ফিরিয়া আসিতে দেখেন নাই। সাধারণতঃ পাণ্ডাগণ বা তাঁহাদের কর্ম্মচারী বা চাপরাসীগণ বিদেশী লোকের পশ্চাতে জোঁকের ন্যায় লাগিয়া যায়, কিন্তু উক্ত পথ-প্রদর্শকটিকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া দাদা শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, সেই রাত্রে যে পাণ্ডাটি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া বাড়ী ঠিক করিয়া দিয়া যান তিনি আর ফিরিলেন না কেন ?" গুরুদেব তদুত্তরে দাদাকে একটি পত্র দেখাইয়া বলিলেন, "দাদা গুরুদেবের (অর্থাৎ পরমারাধ্য ভৃগুরাম পরমহংসদেবের) এই পত্র পড়িলে বুঝিতে পারিবে যে তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদের পথ প্রদর্শক ভাবে বাসাদি স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, অথচ আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই।

তিনি আত্মগোপনের ইচ্ছা করিলে কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহাকে চিনিতে পারে। বহুপূর্ব্বে দাদা গুরুদেব একবার গুংকরা আসিয়া আমাকে ঔষধ দিয়া আরোগ্য করিয়া দিয়া যান, অথচ আমিও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই।” পরমারাধ্য ভৃগুরাম পরমহংসদেবের এই অমানুষিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার অগ্রজ একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিয়া না পাওয়ায় দিতে পারিলাম না। তবে উক্ত কবিতার কয়েক ছত্র যাহা আমার এখনও স্মৃতিতে আছে তাহা নিম্নে লিখিলাম ঃ—

তুমি এসেছ ভাই হেথা—
হরিদ্বারে শিষ্য সহ আসিয়াছ দেখি
পাণ্ডা বেশে সাথে সাথে ঘুরিলাম কত.
কেহ কিন্তু চিনিল না মোরে—

৩। একদা বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ বাসায় শ্রীগুরুদেব হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হন। অতি ভয়ানক জ্বর এবং ক্রমশই তাহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যথা সময়ে জ্বর-অবস্থাতেই তিনি আহ্নিক করিতে যান। আহ্নিক করিবার পর বাহিরে আসিয়াই তৎকালে উক্ত বাসায় অবস্থিত শিষ্যগণকে আদেশ করেন, “একটি ঘোড়াগাড়ী লইয়া আইস, আমাকে বণ্ডুল যাইতে হইবে।” অবিলম্বে শিষ্যগণ একটি ঘোড়াগাড়ী লইয়া আসেন। তিনি আমার অগ্রজকে আদেশ করেন, “রাধিকা, তুমি আমার সঙ্গে চল।” দাদাকে এইকথা বলায় তিনি নিরাপত্তিতে তাহার সঙ্গে গমন করেন। পথিমধ্যে যাইবার সময় শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিকট হইতে একটি বাণ-লিঙ্গ মহাদেব বাহির করিয়া দেখাইয়া বলেন, “এই শিবটি লইয়া ইঁহার সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া আমার জ্বরটি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু জ্বরটা এত দূষিত ও বিষাক্ত যে এই বাণেশ্বরের উক্ত জ্বর সহ্য করিবার শক্তি না থাকায় তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন। একমাত্র বণ্ডুল আশ্রমস্থ দাদা-গুরুদেবের আদেশে প্রতিষ্ঠিত ৺বাণেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ এই বিষাক্ত জ্বরের তাপ আকর্ষণ করিতে পারিবেন না। তাই বণ্ডুলে চলিলাম। উক্ত মহাদেবের কৃপায় ও আশ্রয়ে ১০৮ জন সাধু সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীশ্রীদাদা-গুরুদেবের (পরমারাধ্য ভৃগুরাম পরমহংসদেবের) আদেশ মত সাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে তথায় স্থাপন করা হইয়াছে। একমাত্র তিনিই সমস্ত তাপ আকর্ষণে সমর্থ। এই বিষাক্ত জ্বরে আমার সন্তপ্ত হইবার কারণ এই যে আমার একটি শিষ্যার একমাত্র পুত্র কয়েকদিন যাবৎ জ্বরাক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অদ্য অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শিষ্যাটি অল্প বয়সেই স্বামি-হীনা এবং এই বালক পুত্রটিই তার একমাত্র স্নেহের বস্তু। উক্ত পুত্রকে অদ্য মৃত্যু শয্যায় শায়িত দেখিয়া এবং তাহার জীবনের কোনও আশা নাই বুঝিয়া শিষ্যাটি কাতর হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়। সে রজ্জু লাগাইয়া ‘জয়গুরু’ বলিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইবে, এমন সময় সহসা আমি উক্ত বালকের শয্যায় উপস্থিত হইয়া বালকের গাত্রে হাত বুলাইয়া তাহার সমস্ত জ্বর ও গ্লানি আকর্ষণ করিয়া লইয়া বালককে বলিলাম, ‘তোর মাকে ডাকিয়া শীঘ্র বল যে আমি আসিয়া তোর জ্বর ভাল করিলাম, তোর মায়ের এত ভাবনা কেন?’ বালক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ‘মা গো মা!

গুরুদেব এসেছেন, আমার জ্বর ভাল করেছেন, তুই শীঘ্র আয়' বলিয়া ডাক দেয় এবং তাহার মা তথায় আসিয়া দেখে যে বালকের শরীরে আর জ্বর নাই এবং বালক সুস্থভাবে শয্যায় বসিয়া আছে। সেই তীব্র-তাপযুক্ত জ্বরটি আকর্ষণ করিয়া আমার এই অবস্থা। যেরূপ তীব্রতাপযুক্ত জ্বর, তাহার প্রতিকারও সেইরূপ তীব্র দরকার। তাই বন্ডুলে চলিলাম।" আমার অগ্রজ শ্রীগুরুদেবের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ে নানা প্রকার ভাবিতে থাকেন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী যদি কোনও অবস্থা কেহ অনুমান করিয়া থাকেন, দাদা বলেন যে তাঁহার মনের অবস্থা তখন ঠিক তদ্রূপ। এই অবস্থায় তিনি দুই দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিবস ডাকে একখন্ড পত্র ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের নিকটে আসিল। পত্রখানি দাদার সামনেই পিয়ন বন্ডুল আশ্রমে শ্রীগুরুদেবকে দেয়। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া উহা দাদার দিকে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ায় দাদা উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে ঐ পত্রখানির লেখয়িত্রী উক্ত শিষ্যাটী। তিনি কাতর হৃদয়ে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া নিজকৃত কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করার জন্য নানা প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দাদা পত্রখানি পাঠ করিয়া সাশ্রুনয়নে শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, "ক্ষমা করুন, ক্ষমাময়, এখনও বিশ্বাস দৃঢ় করিতে পারি নাই।" এই শিষ্যাটীর স্বামীর যখন মৃত্যু হয় তখনও ভগবান্ শ্রীগুরুদেব সশরীরে তাঁহার সমক্ষে উদয় হইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং আবার তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন, ইহাও আমার দাদার মুখে শুনিয়াছি।

৪। একবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে দাদা ও আরও কয়েকজন শিষ্য কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে ট্রেণে যাইবার সময় অসংখ্য পদ্ম-পুষ্প-সুশোভিত একটী পুষ্করিণী দর্শন করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন "এইরূপ পদ্মফুল যদি কামাখ্যায় পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মনের সুখে মায়ের পূজা করা যাইত।" তাঁহারা পৌঁছিবার পর তথায় প্রকৃতই একজন কামাখ্যায় লোক পদ্মফুল বিক্রয় করিতে আসিয়া পড়ায় প্রচুর পরিমাণে পদ্মফুল ক্রীত হইল এবং সেই পদ্মফুল সকল লইয়া সশিষ্য শ্রীগুরুদেব মায়ের মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকায় পূজার জন্য ভিতরে যাইতে একটু দেরী হইতে লাগিল। মায়ের মন্দিরের বহির্দ্বারের নিকটে শ্রীগুরুদেব, এবং দাদা ঠিক তাঁহার সন্নিকটে, অপরাপর শিষ্যগণের কেহ বা নিকটে কেহ বা কিয়দ্দূরে। তখন একটী কৃষ্ণবর্ণা বালিকা—বয়স সপ্তম হইতে নবম বর্ষ—আসিয়া শ্রীগুরুদেবের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি যাও, খাও গে তোমাকে আর পূজা করতে হবে না। আমি তোমার দেওয়া পদ্মফুল পেয়েছি, তুমি যাও।" শ্রীগুরুদেব কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিবার পর একটু দূরে আসিয়া আবার যেমন দন্ডায়মান হইলেন, অমনি বালিকাটী পুনরায় আসিয়া বলিল, "তুমি যাও না, খাও গে, ফুল ত দেওয়া হয়েছে।" দাদা তখনও শ্রীগুরুদেবের ঠিক পশ্চাতে দন্ডায়মান। শ্রীগুরুদেব দাদার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার সেই স্বভাব-স্মিত মুখ-কমলে ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলেন "কি রে বাপু, রাধিকা, আমি তবে চল্লাম, তোরা সব মায়ের পূজা করে আয়,

বুঝিল তো।" দাদা আমার গুরুদেবকে দেখলেই কেঁদে আকুল হতেন—তদুপরি এই দৃশ্যে ত তাঁর কান্নার কথাই নাই।

৫। দাদার স্ত্রী ৺বালিকা সুন্দরী দেবী তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক মাস যাবৎ শয্যাগতা ছিলেন। এই শয্যাগতাবস্থায় শেষ কয়েকদিন তিনি কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না আমার স্ত্রী মনে মনে ভয় করিলেন' "হয়ত দিদি আমার উপর রাগ করিয়াছেন।" তাই আমার স্ত্রী কাতর ভাবে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনে তাঁহাকে বলিলেন, "দিদি, আমি কোন দোষ করিয়াছি কি? কথা বলিতেছ না কেন, ভাই?" তিনি তদুত্তরে বলেন, 'দেখ, তোমাকে আমার জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে হইতেছে, তোমার মত এত ভাল কাহাকেও লাগিতেছে না, তাই শ্যামার বাবার বাসা ছাড়িয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি। আর আমার সময় নাই বোনটী, পথের সম্বল করিতেছি।" মৃত্যুর সময় তিনি খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া "ঐ গুরুদেব" বলিয়া হাত দুটী উপর দিকে উত্তোলন করেন এবং সেই বলা ও হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ-পাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর ঘটনা কেহই শ্রীগুরুদেবকে জানান নাই এবং মৃত্যুর পরই দাদা শ্রীগুরুদেবের নিকট অতি কাতর ভাবে আসিয়া তাঁহাকে মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই শ্রীগুরুদেব বলিয়া উঠেন, "রাধিকা! বৌমার যেরূপ মৃত্যু, এরূপ মৃত্যু কয়টা লোকের কপালে হয়, বল দেখি বাপু? হাসিতে হাসিতে গুরুর কোলে আরোহণ—ইহারই নাম মুক্তি।"

৬। বর্দ্ধমান জেলার ফরিদপুর থানার অন্তর্গত কুঁচিভ গ্রাম নিবাসী শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা গুরুদেব (পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব) পত্র দিয়েছেন যে অন্নদার মৃত্যু অনিবার্য্য, কোনও প্রকারে তাহার রোধ হইবে না।" যে প্রকারে, যে কারণে ও যে ভাবে মৃত্যু হইবে তাহা সমস্তই দুর্গাদাস বাবুর নিকটে বলিয়া, বলিলেন "রাধিকা বা দক্ষিণাকে আপাততঃ কোনও কথা বলিও না। তবে অন্নদার মৃত্যুর পর যখন তাহাদের মনে সন্দিগ্ধ ভাব আসিবে তখন বলিবে। তজ্জন্য তোমাকে অগ্রিম বলিয়া রাখিলাম। অন্নদার মৃত্যুর পূর্ব্বে কদাপি তাহাদিগকে বলিও না।" এই অন্নদাপ্রসাদ আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৭। যে দিন যে সময় ৺অন্নদার মৃত্যু হয় সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীগুরুদেব উক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটী শিষ্যের নিকট বলিলেন, "ওগো, অন্নদা এই ক্ষণেই এইরূপে মারা গেল।" পঞ্চাশ ষাট মাইল ব্যবধান হইতে তন্মুহূর্ত্তেই সেই মৃত্যু তিনি দেখিলেন। এই সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বদা সাক্ষিভূত শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে আমরা কি কখনও কিছু গোপন করিয়া রাখিতে পারি?

৮। একদিন ভগবান্ শ্রীগুরুদেব একখানি গো-গাড়ীতে এবং আমার অগ্রজ ৺রাধিকাপ্রসাদ ও অপর একটী গুরুভাই, আর একখানি গো-গাড়ীতে বর্দ্ধমান হইতে বণ্ডুল আশ্রমে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতে ছিল। চতুর্দ্দিকে বৃষ্টি, অথচ এই দুইখানি গো-গাড়ীতে

এক ফোটা মাত্র বৃষ্টি নাই। তাঁহারা উভয়ে দেখিতেছিলেন যে শ্রীগুরুদেবের গাড়ীর ভিতর হইতে হু-হু শব্দে ধূম বাহিরে হইতেছে। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের গাড়ীর ভিতরে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে শ্রীগুরুদেব মুখ হইতে ফুঁ-ফুঁ করিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে এই দুই খানি গাড়ীতে যে পরিমাণ বৃষ্টি পড়িতেছিল তাহাকে তিনি বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিতেছিলেন। দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে স্তম্ভিত হইলেন।

৯। একদিন বণ্ডুল আশ্রমে রাত্রি ১টার সময় হঠাৎ ৺শিবঠাকুরের মন্দির খোলার শব্দ হয় এবং খড়ম পরিয়া কেহ যেন উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন-এইরূপ জানা যায়। পরে অবগত হওয়া যায় যে তিনি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব।

১০। ৺কাশীধামের আশ্রমে ৺শিবঠাকুরের মন্দিরে শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস দেবের অনেক সময়ে শুভাগমন বৃত্তান্ত আমাদের অপেক্ষা ৺কাশীধামের গুরুভাইগণ অনেক বেশী অবগত আছেন বলিয়া তাহা আর উল্লেখ করিলাম না।

১১। একদা একটী গুরুভাই (শ্রীযুক্ত জগদানন্দ গোস্বামী সাং সপী, পোঃ উখরা, জেলা বর্ধমান) তাঁহার শিষ্য বাড়ীতে গিয়া রাত্রি বেলায় একটী গাড়ু লইয়া মলত্যাগের জন্য নিকটস্থ একটী স্থানে গমন করেন। পরে দেখিলেন একটী ব্যাঘ্র তাঁহার সম্মুখে কতিপয় হস্ত দূরে থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। ব্যাঘ্র কোনও জন্তুকে আক্রমণের পূর্বে যে ভাবে বসিয়া থাকে সেই ভাবেই ছিল। তাহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া জগদানন্দের মনে তখন সেই অপবিত্রাবস্থাতেই ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে মনে পড়িয়া পূর্ণ আত্মসমর্পণ-ভাব আসিয়া উদয় হইল। জগদানন্দ একদৃষ্টে সেই ব্যাঘ্রটীর চক্ষুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর ব্যাঘ্র তথা হইতে উঠিয়া পলায়ন করিল। এই ঘটনায় জগদানন্দের মনে শ্রীগুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস বাড়িল এবং তৎসহ নিজেরও একটী শক্তি আসিয়াছে বলিয়া ধারণা হইল। জগদানন্দ নিজ শিষ্য বাড়ী হইতে গ্রামে ফেরত আসিয়া আমাকে ও আমার অগ্রজ ৺রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে এই বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিলেন। তৎপরে জগদানন্দসহ দাদা ও আমি বর্ধমান আশ্রমে আসিলাম। আশ্রমে আসিয়া পৌঁছাইবার কিছুক্ষণ পরে ভগবান্ শ্রীগুরুদেব জগদানন্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কিরে বাপু, বাঘটা দেখে বড় ভয় হয়েছিল, না?" জগদানন্দ তদুত্তরে নম্রভাবে প্রেমাশ্রু নয়নে বলিলেন, "হাঁ বাবা, আপনি মালিক।" শ্রীগুরুদেব তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁরে বাপু, তা ত নিশ্চয়। তবে বাপু, তোর চোখের ভিতর দিয়া আমার তেজ এখান থেকে যোগ না দিলে বাঘটা সেদিন তোকে ধরিত। একা তোর তেজে বাঘটা পলায় নাই।" কথাটী শুনিয়া জগদানন্দ দাদা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা, আপনিই মালিক। কিন্তু ব্যাঘ্র চলিয়া যাওয়ার পর আমার মনে একটু অহঙ্কারও আসিয়াছিল। এক্ষণে বুঝিলাম যে আপনিই ত্রাতা, আমার কোনও ক্ষমতা বা কৃতিত্ব নাই।"

১২। কোনও একটী ব্যাপারে বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া আমার স্ত্রী একদিন ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া বাসায় তাঁহার ফটোটীর সম্মুখে গল-লগ্নীকৃতবস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে কতই কাঁদিল, কিন্তু আমি তাহা জানিতাম না। বিপদের কাণ্ডারী সাক্ষাৎ শ্রীহরি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিপদ্ কোথায় উড়িয়া গেল। কতকদিন পরে দুই স্ত্রী-পুরুষে বর্ধমান রাণীগঞ্জ বাসায় আসিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিবা মাত্রই শ্রীগুরুদেব বলিয়া উঠিলেন, "কিগো, বড় কাঁদিয়াছিলে, না ?" আমার স্ত্রী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, বাবা।" এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুদেব একখণ্ড পত্র আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখ, দাদা গুরুদেব তোমার বিষয় কি লিখিয়াছেন।" পত্রের ভাষা যতদূর মনে আছে তাহাতে আমার একটি বিপদের সূচনা হইবে অথচ বিপদ্ হইবে না ইত্যাদি বিষয় তাহাতে লিখিত ছিল, এবং বিপৎকাল অতীত না হইয়া গেলে উক্ত পত্রের মর্ম্ম আমাকে অবগত না করাইবার জন্য শ্রীগুরুদেবের প্রতি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ ভৃগুরাম পরমহংস দেবের আদেশ ছিল। উক্ত পত্রে অন্যান্য গুরুভাইদের বিষয়ও ছিল এবং তন্মধ্যে অর্ধছত্র মাত্র পড়িতে না পড়িতে শ্রীগুরুদেব আমার হস্ত হইতে পত্রখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার নিজের বিষয় ছাড়া অন্যের বিষয় যদি কিছু পড়িয়া থাক তাহা যেন আপাততঃ তাহাকে বলিও না।" আমি বলিলাম, "ক্ষমা করুন, বাবা—অমুক দাদার সম্বন্ধে একটু পড়িয়া ফেলিয়াছি।"

১৩। একদিন দেখি ভগবান্ শ্রীগুরুদেব একটি এক তালার ছাত হইতে ঠিক একটি সিঁড়ি হইতে অপর একটি সিঁড়িতে নামিবার ন্যায় শূন্যমার্গে নামিলেন—আমি ত দেখিয়া অবাক। বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

হে দয়াল গুরু, তোমার বিবরণ কলমে লিখিয়া শেষ করিতে পারে এরূপ অসীম কলমধারী এ জগতে কে আছে জানি না। তোমার তুলনা তুমি, তোমার তুলনা তুমি হে। ভক্ত যে অবস্থাতেই তোমাকে 'জয় গুরু' ব'লে ডাকে তুমি সেই অবস্থাতেই উপস্থিত হও। তোমারে চিনলাম না—চিন্তামণি চিনিবার শক্তিও নাই। তুমি পাতকি-তারণ পতিত-পাবন, এই আমার ভরসা। ইতি—

শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

শ্রীজগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্টেশন মাষ্টার, বরাকর (ই, আই, আর)

১৩১৬ সালের প্রাক্কালে পরমারাধ্য গুরুদেবের শিষ্যদের মধ্যে পুলিশের সংখ্যাই অধিক ছিল—ব্যবহারাজীবীদের সংখ্যাও প্রায় পুলিশের সমতুল্য, রেলের কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র দু-চারজন।

এই সময়ে ধানবাদে থাকা কালীন আমাদের কয়েকজন রেলওয়ে কর্মচারীর মনে (লেখক স্বয়ং, শ্রীবিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজানকী প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি) ধর্মভাব জাগিয়া উঠিল ও আমরা কোনও সাধু পুরুষের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। শ্রদ্ধেয় ঠাকুর হরনাথ তখন ধানবাদের মুনসেফ বিজয় বাবুর বাসায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমরা ব্যাকুল চিত্তে কয়েকদিন তাঁহার সেবা করিলাম ও তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণ কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম—কিন্তু আমাদের ন্যায় রেলের পাপীর পাপ রাশি আকর্ষণ করিতে হইলে আরও উচ্চাঙ্গের সাধকের প্রয়োজন বিচার করিয়া তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিলেন না। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে আরও একজন সাধু পুরুষের সেবা আমরা করিয়াছিলাম—কিন্তু তাঁহার নিকটেও আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। ছোট বড় অনেক সাধুরই সাক্ষাৎকার আমরা সে সময় পাইয়াছিলাম—কিন্তু আমাদের প্রাণের পিপাসা কাহারও নিকট মিটিল না।

অগ্রজ সদৃশ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী সে সময়ে ধানবাদে পুলিশ ইন্সপেক্টর। একদিন কথা-প্রসঙ্গে গুস্করায় এক সাধুর কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া সেই মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। তখন তিনি মধ্যে মধ্যে গুস্করা হইতে বর্দ্ধমানে আসিতেন। একবার বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়াই আমি, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ (ডেপুটি কমিশনারের সেরেস্তাদার) ও ডেপুটি কমিশনারের পেস্কার (নাম মনে নাই) বর্দ্ধমান যাত্রা করিলাম। সাড়ে সাতটার সময় বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ আশ্রমে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে বলিলেন, "কি গো, জগদীশ, ভাল আছ ত ?" আমাকে কোনকালে দেখেন নাই, আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত—অথচ আমার নাম ধরিয়া এরূপ স্নেহের সহিত আহ্বান করাতে আমি একেবারে বিস্মিত হইলাম। তাঁহার গাত্র-নিঃসৃত পদ্ম-গন্ধে সেই স্থান যেন দেবলোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমার সহযাত্রী দুইজনকে তিনি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন ও বিশেষ সম্মান দেখাইলেন। আমার পরদিন দীক্ষা হইল। তাঁহাদের হইল না, কারণ, তাঁহারা কৌতুহলী হইয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তি দেখিতে গিয়াছিলেন।

আমার দীক্ষা হওয়ায় আমার সাথীরা পরমারাধ্য গুরুদেবের ভিতর পাপী উদ্ধারের বিশেষ শক্তি আছে বুঝিতে পারিয়া সকলে তাঁহার চরণ প্রান্তে উপনীত হইল ও যথাসময়ে সকলেরই দীক্ষা হইল।

তাহার পর পরমারাধ্য গুরুদেব প্রতি বৎসরই একবার করিয়া ধানবাদে আমাদের আবাসে পদধূলি প্রদান করিতেন। সুবোধ দাদা সেই সময় গোমোতে একখানি বাংলা নির্মান করান ও তথায় বাবাকে লইয়া যান। আমরাও তাঁহার সঙ্গে তথায় গিয়াছিলাম। সুবোধ দাদার বাংলার পাশেই শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি সুবৃহৎ গোলাপ ফুলের বাগান ছিল—তিনি সেখাম হইতে প্রত্যহই গোলাপ ফুল কলিকাতায় চালান দিতেন। তিনি বাবাকে প্রত্যহই তাঁহার বাগানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। বাবা

যাইতেন না ও বলিতেন, "তোমার বাগানে গেলে তোমার একটি গোলাপফুলেও গন্ধ থাকিবে না—তাহার সমস্ত গন্ধই আমার দেহে আকৃষ্ট হইবে। তবুও নিবারণ বাবু ছাড়িলেন না।" একদিন বৈকালে বাবা আমাদিগকে লইয়া নিবারণ বাবুর বাগানে গেলেন। তাহার পর ফুল লইয়া দেখা গেল যে একটি গোলাপেও গন্ধ নাই।

ধানবাদে থাকা কালে একদিন তাঁহাকে একটি সাদা ফুলকে গোলাপ ফুলে পরিণত করিতে দেখিয়াছিলাম। ধানবাদে আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে ছোট ছোট সাদা পাথর পাওয়া যাইত। আমাদের ছেলেরা তাহা কুড়াইয়া আনিয়া বাবার কাছে লইয়া যাইত—তিনি সেই পাথরগুলি মিছরি করিয়া দিতেন ও ছেলেরা তাহা আনন্দে খাইত।

ইতিমধ্যে আমি বরাকরে বদলী হইয়া আসি। তখনও বাবা প্রতি বৎসরই ধানবাদে যাইতেন। আমি একদিন যাইয়া দেখি পাতা-ঢাকা কি যেন রৌদ্রে শুখাইতেছে। পরে দেখিলাম যে আমাদের ছেলেদের অনুরোধে তিনি সূর্য্য বিজ্ঞানে চম্ চম্ করিলেন ও তাহা ছেলেদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

ধানবাদে যখন তিনি শুভাগমন করিতেন তখন প্রবোধ দাদাই তাঁহার সেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন। একদিন দেখি বাবা একটি ফুলকে হাতে লইয়া স্ফটিকে পরিণত করিয়া প্রবোধ দাদাকে দিয়া বলিলেন, "এটি ধারণ করিও—তোমার সময় খারাপ।" ইহা এখন প্রবোধ দাদার নিকটে আছে।

একবার বাবার সহিত আমরা কয়েকজন শিষ্য হরিদ্বার যাই। বাবা সাধারণতঃ স্নান করিতেন না। সমস্ত বৎসর মধ্যে মাত্র দুই একবার স্নান করিতেন। হরিদ্বারে গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিলেন ও স্নানান্তে অঞ্জলি পূর্ণ গঙ্গাজল লইয়া গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলাম প্রতি অঞ্জলিতে একটি করিয়া পদ্মফুল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অথচ তিনি পদ্মফুল লইয়াও আসেন নাই, আর সেখানে পদ্মফুল ছিলও না। আমরা সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

পলাশডাঙ্গা নিবাসী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার ছোট মাসিমার কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অনিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আমার ভগিনী (জ্যোতিষ বাবুর স্ত্রী) বরাকরে আমার বাসায় আসে। আমি বিবাহ দিতে সম্মত হই ও বিবাহ এক রকম স্থিরই হইয়া যায়। বাবা ঐ সময় ধানবাদে আসেন—আমার স্ত্রী ধানবাদে যাইয়া এ বিবাহ সম্বন্ধে বাবার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করে। বাবা বলিলেন যে তিনি এক্ষণে যোগ-জ্যোতিষের গণনা করেন না, তবে ছেলে ও মেয়ে একত্রে দেখিলে বলিতে পারিবেন যে বিবাহ শুভ হইবে কি না। আমার তখন বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ জিদ চাপিয়াছে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিষ বাবুকে তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলাম। বাবা ইতিমধ্যে বরাকরে আসিলেন। টেলিগ্রামের উত্তর আসিল যে মেয়ের অত্যন্ত জ্বর—উত্থানশক্তি রহিত। আমার স্ত্রী বাবার নিকট পুনরায় বিবাহের কথা উত্থাপন করিল, তখন বাবা বলিলেন, "মেয়ের এমন

একটি দোষ আছে যাহা বলিলে মেয়ের বিবাহ হইবে না।" তাহার পর সে মেয়েটির অন্যত্র বিবাহ হইল, আমার পুত্রেরও ধাত্রী গ্রামে বিবাহ হইল। বিবাহের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই সেই মেয়েটি বিধবা হইয়াছিল (এখনও জীবিত)। পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণে সেই মেয়েটির বিধবা হওয়ার কথা বলায় তিনি বলিলেন, "ঐ জন্যই আমি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিষেধ করিয়াছিলাম—বৈধব্য-বার্ত্তা প্রথমে বলিলে কে সে মেয়েকে বিবাহ করিত?"

বাবা একবার পুরীতে ছিলেন। আমি ও যোগেশ দাদা (শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ভবানীপুর) পুরী গিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা আহ্নিক করিতে গেলে আমি ও যোগেশদাদা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাবা আহ্নিক সারিয়া বাহিরে বসিয়া আছেন। আমরা প্রণাম করিতেই বাবা বলিলেন, আমি মনে করিয়াছিলাম তোমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে যাইয়া আহ্নিক করিতেছ।" আমরা লজ্জিত হইয়া পরদিন উভয়েই একত্রে সন্ধ্যার সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে (শ্রীবিমলা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে) আহ্নিক করিতে বসিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বাবার গায়ের পদ্মগন্ধ পাইয়া চাহিয়া দেখি সত্যই বাবা সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। যোগেশ দাদাও আমার মত চাহিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে বাবা অন্তর্ধান করিলেন। আশ্রমে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি গো, আজ তোমরা মন্দিরে গিয়াছিলে?" আমরা তাঁহার গমন-বার্ত্তা নিবেদন করিতেই হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্ত কুমার ঘোষ যখন ধানবাদে ই, আই, রেলের ডিস্ট্রীক্ট ট্রাফিক ম্যানেজার (কোন একজন উচ্চ পদস্থ রেলওয়ে অফিসার) তখন পরমারাধ্য গুরুদেব বৎসরে একবার বরাকর অঞ্চলে আসিতেন। বসন্ত বাবুও পরমারাধ্য গুরুদেবের একজন অনুরক্ত ভক্ত। পরমারাধ্য গুরুদেব আমাদের ওখানে শুভাগমন করিলেই বসন্ত বাবু তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিতেন। বসন্ত বাবুর পদ-মর্য্যাদা অনুসারে ই, আই, রেলের কোল ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সাহেবরা ধানবাদে আসিলেই বসন্ত বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। সেইজন্য বসন্ত বাবুকে সাহেবদের ঠাট বজায় রাখিয়া তদুপযোগী পানভোজনাদি করিতে হইত। ইতিমধ্যে বসন্তবাবুর মনে পরমারাধ্য গুরুদেবের নিকট দীক্ষা লইবার ইচ্ছা বলবতী হইল। কিন্তু সাহেবী খানা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার উপায় নাই। বসন্ত বাবু নিজ মুখে আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে একদিন তিনি রাত্রে যখন শুইয়া দীক্ষার কথা ভাবিতেছেন তখন প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে পরমারাধ্য গুরুদেব তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী হলে যাইয়া সাহেবী খানার ব্যবস্থা দেখাইয়া বলিলেন, "এ সব থাকিতে তোমার বাপু দীক্ষা হইতে পারে না। আমি বলিলে তুমি এ সব ত্যাগ করিতে পার বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। আমি তোমাকে এই সকল ছাড়িতে বলিতে

পারি না। কারণ তোমার ইহাতে সম্পূর্ণ আসক্তি আছে, তাহাতে প্রত্যবায় হইবে।" এই বলিয়া পরমারাধ্য গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন। বসন্তবাবু ইহা স্বপ্ন কিনা ভাবিতে লাগিলেন—তখন পরমারাধ্য গুরুদেব পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে ইহা স্বপ্ন নহে। এই ভাবে তিনি পরমারাধ্য গুরুদেবকে তিন দিন তাঁহার বাংলোতে দেখিয়াছিলেন। তিনি আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছেন যে ইহা প্রত্যক্ষ—তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় ইহা অনুভূতি করিয়াছেন।

শ্রীজগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্যামাগতি রায়চৌধুরী

মেডিক্যাল অফিসর, লোদনা কলিয়ারী,
পোঃ ঝরিয়া, জিলা মানভুম।

পরমারাধ্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্যময় পবিত্র জীবনের বিভিন্ন প্রকার ঐশী শক্তির নিদর্শন স্বরূপ অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী হইতে আমি নিজের জীবনের মধ্যে পূর্ণ ভাবে প্রকটিত তদীয় লীলাতত্ত্ব যতটা উপলব্ধি করিয়াছি, তন্মধ্যে কিছু পরিমাণ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১। ১৯১৮ সালের শীতকালে একবার ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বড় বেশী হয়। তৎকালে আমি কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ি। হঠাৎ একদিন প্রাতে আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে; তজ্জন্য বাড়ী আসিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠি। অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম যে, তখন হাওড়া ষ্টেশনে এমন কোনও ট্রেণ নাই যাহাতে আমি অণ্ডাল (Ondal) পর্য্যন্ত আসিয়া অণ্ডাল-সিঁথিয়া শাখা লাইনে কোনও গাড়ী ধরিতে পারি। তবে মাত্র একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ছিল। তাহাতে অণ্ডাল পর্য্যন্ত আসা যাইত। যাহা হউক, মানসিক উৎকণ্ঠা বশতঃ কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মনের আবেগে তক্তাপোষের উপরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে কে যেন আমার কর্ণকুহরে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিল—"রাধিকার অসুখ" (৺রাধিকা প্রসাদ রায় চৌধুরী আমার পিতা)। তাহাতে আমার মানসিক চাঞ্চল্য আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। আমি উক্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেণে হাওড়াতে চড়িয়া রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় অণ্ডাল ষ্টেশনে নামিলাম। বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। যে, পদব্রজে অণ্ডাল হইতে আমার বাড়ী সর্পগ্রাম রওনা হইব এবং কার্য্যেও তাহাই পরিণত করিলাম। অণ্ডাল ষ্টেশন হইতে সর্পগ্রাম প্রায় নয় মাইল। প্রায় ১৷৷০ বা ২ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর দীঘনালা গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া একজন লোকের পদশব্দ শ্রুত হইল। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত ভয়ের

সঞ্চার হইল। সভয়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম যে একজন বলিষ্ঠ খর্বকায় লোক আমার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে—তদীয় আকার-প্রকার দেখিয়া মনে হইল যে, সে কোনও দুষ্ট-প্রকৃতির লোক ব্যতীত অপর কেহই নহে। তখন উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া এবং কে-ই বা আমাকে সেই গভীর নিশীথে উন্মুক্ত ময়দানে সাহায্য করিবে চিন্তা করিয়া, চক্ষের জলে নিজ বক্ষঃস্থল আপ্লুত করিতে করিতে "জয় গুরু, শ্রীগুরু, নিত্যানন্দ প্রভু, দয়াল প্রভু, দয়াল ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে যেন কোন্ অজানা দেশ হইতে অস্পষ্টস্বরে কে বলিল, "ভয় নাই রে, বাপ।" এই আশ্বাসবাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই আমি দ্বিগুণ উৎসাহে সাহসের উপর ভর করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, সেই চোর তখনও আমার পশ্চাদনুসরণ ত্যাগ করে নাই,—এমন কি উখরা ষ্টেশন পর্যন্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। তথাপি আমার কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই। পরিশেষে এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "যাক্, আজ খুব বেঁচে গেলি "

তৎপরে সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই গৃহে পেঁাছিয়াই দেখিলাম, বাস্তবিকই আমার পিতৃদেব রোগ-শয্যায় শায়িত। আমার তথায় উপনীত হইবার পরদিনই রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তিনি ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তিময় নিত্যধামে গমন করিলেন।

এই প্রসঙ্গ-ক্রমে তদীয় মৃত্যু বিষয়ে কিছু অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বিবৃত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। পিতৃদেবের মৃত্যুর প্রায় ১৫ মিনিটকাল পূর্বে তিনি হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া অর্ধশায়িত ভাবে তাকিয়াতে হেলান দিয়া হাত জোড় করিয়া নিজ মনে ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দয়াল ঠাকুর, এই ত আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তুমি বহুবার প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে যে, আমার অন্তিম সময়ে নিজের পূর্ণ আবির্ভাব বিকশিত করিয়া আমাকে শেষ মুহূর্তে সেই অসীম অনন্ত শান্তিময় রাজ্যে লইয়া যাইবে।" তাহার মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা নিঃসৃত হইবা মাত্রই দেখা গেল যে, গৃহমধ্যে এক অপূর্ব অনির্বচনীয় দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া সমস্ত গৃহটি এরূপ উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত করিল যেন একাধারে অগণিত 'ইলেক্ট্রিক্' বাতি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সেই মুহূর্তেই পিতৃদেব মহাশয়ের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দিব্যজ্যোতি শূন্যমার্গে উঠিয়া বিলীন হইয়া গেল।

পূর্বোক্ত রাস্তার ঘটনা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীগুরুদেব আমার দুঃখে কাতর হইয়া তাহার দেহ-নিঃসৃত মধুময় পদ্মগন্ধে স্বকীয় সূক্ষ্মদেহে আমার নিকট তদীয় আবির্ভাব জ্ঞাত করাইয়া আমাকে সমস্ত পথ ধরিয়া রক্ষা না করিলে সেই রজনীতে ঐ দস্যুর হাতে আমার নিশ্চয়ই প্রাণ সংহার হইত।

২। প্রায় আট বৎসর আগে বাবা একবার আমার গুরুভ্রাতা বরাকরের

স্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্তবাবু জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধানবাদস্থিত বাড়ীতে শুভাগমন করেন। তৎকালে একদিন প্রাতে বেলা প্রায় ৯টার সময় আমি একাকী বাবার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় বাবা আমাকে আমার ক্রিয়াদির দোষ গুণের কথা বলিতেছিলেন। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! আমার ক্রিয়াকালে যে এই প্রকার দোষ আসে তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন।" তদুত্তরে বাবা বলিলেন, "বৎস। আমি প্রত্যহ তোমাদের ক্রিয়াকালে তথায় গিয়া থাকি, এবং প্রতিনিয়তই তোমাদের সন্নিধানে থাকিয়া তোমাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখি। তোমরা সকল সময় তাহা উপলব্ধি করিতে পার না বা সে প্রকার বোধ শক্তি তোমাদের এখনও হয় নাই। ঠিক মত ক্রিয়া করিলে কত কি যে দেখা যায় এবং অপরকেও দেখান যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।"

৩। আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান ধর্ম্মদাস বাবাজীবনের বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৭ বৎসর ৯ মাস। ভুমিষ্ঠ হইবার ৬ষ্ঠ দিবস হইতে তাহার আমাশয় রোগ দেখা যায়। মলে রক্ত ও আম ছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ন্যূনকল্পে ৩০/৪০ বার মল নির্গত হইত। এই প্রকারে প্রায় তের মাস পর্য্যন্ত সে এই রোগে কষ্ট পায়। এই দীর্ঘ তের মাসের মধ্যে আমি আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনী চন্দ্র বসুর সহায়তায় কিছুদিন চিকিৎসা করার পর কোনও প্রকার আশাপ্রদ ফললাভ হইল না দেখিয়া ঝরিয়ার খ্যাতনামা ডাক্তার কাপ্তেন এন, এল, ঘোষ, আই, এম, এস (পেন্সন প্রাপ্ত) মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে লইয়া যাই। তদীয় চিকিৎসাতেও আশানুরূপ উপকার না পাইয়া আমি আমার ভগিনী-পতি ও গুরুভ্রাতা সিজুয়া কলিয়ারির ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ ক্রমে তথাকার চিফ মেডিকল অফিসর পরলোকগত সুবিখ্যাত ডাক্তার জি. সি. ঘোষ, এল. আর. সি. পি. এন্ড এস. এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন) মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রাখিয়া সুফল লাভ করিবার আশায় তথায় লইয়া যাই। বিধিমত তাঁহার আদেশ-অনুযায়ী অনেক দিন রাখিয়াও কোনও সুফল হইল না দেখিয়া তিনি স্বয়ং আমার ভগিনী-পতি মহাশয়কে বলেন, "শ্রীশ, খোকাকে শ্যামের কাছে পাঠিয়ে দাও, অনেক চেষ্টা ত করিলাম, বাপু। কি করি, উপায় নাই, এখন রাখে হরি মারে কে?" শ্রীযুক্ত শ্রীশবাবু আমাকে টেলিফোনে এই সংবাদ করিলে আমি শিশু ও তাহার মাতাকে ফেরত লইয়া আসি। অবশেষে বিরক্ত হইয়া একমাস কাল কোনও ঔষধ পত্রাদি ব্যবহার করাইলাম না; কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বাবস্থার কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। এখন বিধি-লিপি খণ্ডন করিতে পারে এমন শক্তি কাহার আছে? যাঁহার আছে তাঁহারই আছে। যিনি সেই শক্তিতে শক্তিমান্ বা স্বত্ববান্, যিনি সেই অসীম শক্তির নিগূঢ় রহস্য নিজ বোধ-পথে আনিয়াছেন বা নিজে সেই শক্তি লইয়া খেলিতে শিক্ষা করিয়াছেন তিনিই তাহা করিতে সক্ষম। তিনি আবশ্যকমত, বা শিশুর মত খেয়াল বশতঃ কখনও কখনও সেই শক্তির বিরুদ্ধভাবের কার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। অবশ্য তাহা ভক্তের সর্ব্বাঙ্গীন হিতের জন্য। পরে শুভ

মাঘ মাস সমাগত হইল পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব ধানবাদে শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবুর বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন। এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহানন্দে উৎসাহিত হইয়া সপরিবারে তদীয় চরণ দর্শন লালসায় একদিন মধ্যাহ্নে আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলাম এবং ছেলে মেয়েরা ভিতরের দিকে গেল। আমি বাবাকে প্রণাম করার পর তিনি বলিলেন, "বসো গো, বৌমারা এয়েছে, প্রণাম করিবে, আস্‌ছি!" আমার স্ত্রীর প্রণাম গ্রহণের পরেই তিনি আমার সেই শিশুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কি হে দাদু, এখনও কি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ভুলিতে পার নাই?" এবং শিশুর চিবুকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এবার ভাল হ'য়ে যাবে, কোন চিন্তা নাই।" কি আশ্চর্য! যে শিশু তের মাস যাবৎ আমাশয় রোগে ভুগিতেছিল এবং কত প্রকার সুচিকিৎসা সত্ত্বেও এক দিনের জন্যও কোনও সুফল লাভ করে নাই, আজ সেই শিশুর সেই উৎকট ব্যাধি সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে একবার মাত্র তদীয় করস্পর্শে কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহা বলিবার বা অন্যকে বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে যে জনসাধারণের বোধাতীত কত প্রকার গুহ্য রহস্য এবং এই মহাপুরুষের বিভিন্ন প্রকারের ঐশী শক্তি নিহিত থাকে তাহা যাঁহারা তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল অহোরাত্র কায়মনোবাক্যে পূজা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদেরই বিন্দু পরিমাণও বোধগম্য হয় নাই, সুতরাং সাধারণ লোকের ত কথাই নাই।

৪। বিগত ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে আমি একবার বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি। তখন আমি আমার লোদনার বাসাবাটীতে একা ছিলাম। পরিবারবর্গ দেশে ছিল। রোগাক্রান্ত হওয়ার দশম দিবসে রোগের প্রকোপ বশতঃ দৈহিক যন্ত্রণা আমাকে এতটা ধৈর্য্যহীন করিয়া দেয়, যে রাত্রি ১০টার সময় রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় কাতর প্রাণে বাবাকে ডাকিতে লাগিলাম এবং বিছানায় শুইয়া তাঁহার চরণ চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম। তন্দ্রাবেশে আমি দেখিতেছি, কে যেন আমার সমস্ত ক্ষতস্থান গুলিতে তুলি দিয়া এক প্রকার তৈল লেপন করিয়া দিতেছে। ক্ষণকাল পরে তন্দ্রার ঘোর অন্তর্হিত হইলে দেখিলাম, বাস্তবিকই আমার সমস্ত দেহ তৈলাক্ত, দেহ হইতে তৈল বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে এবং তাহা হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ গন্ধ নির্গত হইয়া প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে। তৎসঙ্গে গৃহটিও বাবার দেহ-নিঃসৃত পদ্ম-গন্ধে পরিপূরিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অল্পকাল মধ্যে আমার সকল প্রকার রোগ-যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া গেল এবং বোধ হইতে লাগিল যেন আমি সম্পূর্ণ রূপে রোগমুক্ত হইয়াছি। তৎকালে আমার কয়েকজন বন্ধু বারান্দায় শুইয়াছিলেন; আমি তাঁহাদিগকে আমার সেই তৈলাক্ত দেহ দেখাইয়াছিলাম, কেহ কেহ অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা তাহার ঘ্রাণও লইয়াছিলেন। আমি অল্প দিন মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলাম। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর দেখা গেল যে, আমার গায়ে বসন্তের দাগ একটী মাত্রও বিদ্যমান নাই।

৫। কয়েক বৎসর পূর্বে বাবা একবার গোমোতে আমার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শুভাগমন করেন। তৎকালে আমি তাঁহার চরণ দর্শনে যাইব এই কথা শুনিয়া আমার দুইটী বন্ধু পূজ্যপাদ গুরুদেবের অলৌকিক কার্য্যকলাপ জ্ঞাত হইয়া আমার সহযাত্রী হন। আমরা অতি প্রত্যুষে সেখানে পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, মাত্র ৫।৭ জন গুরুভ্রাতা সেখানে উপস্থিত আছেন। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত অন্য কোনও লোকের সমাগম দেখা গেল না। কিন্তু বেলা ১০ ঘটিকার পর হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ন্যূনতঃ ৬০।৭০ জন ভদ্রলোকের সমাবেশ হইয়া গেল। অযাচিত ভাবে এত লোকের সমাগম দেখিয়া আমার বন্ধুদ্বয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু, এত লোকের জন্য কি পুনরায় রান্না হবে, কিংবা উঁহারা অন্যত্র কোথাও আহার করিবেন?" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "দেখিতে পাইবে যে কয়জনের আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতেই এই সমস্ত লোকের অপরিমিত ভোজন হইয়া যাইবে। আর নূতন করিয়া রান্না করিতে হইবে না।" ইহার পর বাবা প্রবোধ দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রবোধ, আহারের জন্য সব জায়গা ক'রে দাও। সব ঠিক মত সঙ্কুলান হ'য়ে যাবে ত?" প্রবোধ দাদা কিছু বলিলেন না। যথাক্রমে বাবার আদেশানুয়ায়ী একত্রে সকলের আহারে বসিবার জায়গা হইয়া গেল। সকলেই আহারে বসিয়া পোলাও, ৫।৭ প্রকারের ব্যঞ্জন, ক্ষীর, মিষ্টান্ন ইত্যাদি অপরিমেয় ভোজন করিলেন। কোনও দ্রব্যেরই অনটন ঘটিল না। আহারান্তে আমার বন্ধু দুইটী বলিয়া উঠিলেন, "অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, সামান্য কয়েক জন লোকের পরিমিত আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া, কি প্রকারে এত লোকের পর্য্যাপ্ত আহার হইল? ইহা নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।" আহারান্তে তাম্বুল গ্রহণের পর বাবা একখণ্ড সাধারণ প্রস্তর হইতে সূর্য-বিজ্ঞান প্রভাবে একখণ্ড মিছরি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে খাওইয়াছিলেন।

৬। আমি বহুবার বাবাকে বিজ্ঞানপ্রভাবে গোলাপ ফুল, রক্তজবা, স্ফটিক, বহুমূল্য হীরক, মৌক্তিকা নানা প্রকার এসেন্স, উৎকৃষ্ট আচার, সুমিষ্ট সন্দেশ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি। ইচ্ছামত কোনও শক্ত পদার্থ তদীয় দেহাভ্যন্তরে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করাইয়া দিতে এবং পুনরায় তাহা বাহির করিতে দেখিয়াছি। বিগত শীতকালে আমি এবং আমার কতিপয় গুরুভ্রাতা বাবার কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন বেলা প্রায় ৪ ঘটিকা। তৎকালে পূজ্যপাদ গুরুদেব "একমাত্র যোগীই যোগ প্রভাবে বিধির বিধান খণ্ডন করিয়া কত প্রকার অঘটন ঘটনার সম্ভব করিতে পারেন তাহার ইয়ত্তা নাই'—এই কথা আমাদিগকে সবিশেষ বুঝাইবার জন্য কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন "শ্যামা, একটু কচি কলা পাতা নিয়ে আয়।" আমি উহা আনিয়া যেমন তাঁহার হাতে দিলাম অমনি তিনি সেই কচি কলা পাতার উপরে কয়েকবার মাত্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার উপরে এক প্রকার স্নেহময় পদার্থ আমাদের সকলের দৃষ্টি-গোচর হইল। অনতিবিলম্বেই এক অভিনব মনোমোহন সুগন্ধে সেই স্থানটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা,

এটী কি পদার্থ ? এই সুগন্ধ কিসের ? তদুত্তরে তিনি কহিলেন, "এইটি বিশুদ্ধ মনের সুগন্ধ। বিশুদ্ধ মন এমনই অপরূপ জিনিস। ইহা সকল মানুষেরই দেহে সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করিতেছে, তবে কায়মনোবাবাক্যে গুরুর উপদেশ মত পরিশ্রম করিয়া ক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে পরিস্ফুট করিয়া লইতে হয়।"

৭। জীবন বীমার প্রতি বরাবরই আমার একটা আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল। তথাপি ইংরেজি ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ রামগতি রায় চৌধুরী প্রাণাধিকের এর বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন আমি Great Eastern Life Assurance Co. তে ইনসিউর করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত কোম্পানীতে আইন অনুসারে ডাক্তারি পরীক্ষা করাইবার জন্য ঝরিয়াতে উক্ত কোম্পানীর নিযুক্ত ডাক্তার কাপ্তেন এন, এন. ঘোষের নিকট যাই। তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া একখানা ভাড়াটে এক্কা গাড়ী করিয়া ঝরিয়া হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিলাম ; কতক দূর আসার পর গাড়ীখানা হঠাৎ উল্টাইয়া গেল। গাড়োয়ান ঘোড়াসহ প্রায় ৩০ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। আমিও গাড়ী হইতে কিছু দূরে ভু-পতিত হইলাম বটে, কিন্তু ভু-নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলাম. যেন বাবা তদীয় দুই হাত দিয়া আমাকে ভুমি হইতে উত্তোলিত করিয়া ধীরে ধীরে বসাইয়া দিলেন ; গাড়োয়ান ও ঘোড়া বিশেষরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ গুরুদেবের কৃপা-বলে আমি বিন্দুমাত্র আহত হই নাই।

৮। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার সম্বন্ধী শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ সরকার মহাশয়ের ঘাড়ের উপর একটী ভয়াবহ কারবাঙ্কল হইয়াছিল। এই রামপদ সরকার মহাশয় আমার একজন গুরুভাই। উক্ত ব্যারামের সূত্রপাত দেশেই দেখা দেয়। তথায় ৮।১০ দিন রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি আমার শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চিকিৎসার জন্য আমার লোদনার বাসায় উপস্থিত হন। যখন তাঁহারা আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন বেলা প্রায় ২ ঘটিকা। আমি এবম্প্রকার ভীষণাকার কারবাঙ্কল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এপ্রকার কারবাঙ্কল হইতে তিনি কি উপায়ে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইবেন। সমস্ত বৈকাল এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাঁহার ঐ প্রকার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেখিয়া আমি ও আমার স্ত্রী উভয়েই কাতর প্রাণে তাঁহাকে বলিলাম, "বাবাকে ডাকুন, তিনি যদি রক্ষা করেন তবেই ; নচেৎ উপায় নাই।" তিনিও আমাদের উপদেশ মত প্রাণ ভয়ে পুনঃ পুনঃ বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আসিবার দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ন সময়ে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। ১০।১১ দিনের মধ্যে তাঁহার নিদ্রার লেশ মাত্র ছিল না। তন্দ্রাবশে তিনি হঠাৎ চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া আমি ও আমার স্ত্রী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সভয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ প্রকার চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "এই মাত্র বাবা শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে, শ্যামাগতিকে বলিও যেন কল্যই অস্ত্রোপচার করে'।" তদনুসারে তৎপর দিবসেই অস্ত্রোপচার হইয়া গেল। বলা

বাহুল্য, স্বপ্নাবেশে পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব হওয়ার পর মুহূর্ত্ত হইতেই, আমরা বিশেষ প্রকার লক্ষ্য করিয়াছিলাম, রোগী সেই উৎকট যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমশঃ উক্ত ব্যাধির করাল-গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন।

৯। বিগত ১৯২৯ সালের শীতকালে লোদনা কলিয়ারীর খ্যাতনামা কনট্রাক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রামভজু উপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পরলোকগত ব্রজেশ কুমার উপাধ্যায় টাইফো-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই উৎকট ব্যাধিতে প্রায় দুই মাস কাল ভুগিয়া মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল বলিয়া তদীয় খুল্লতাত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহারই গৃহে আমাকে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। পরে রাত্রি আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময় রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া এবং এমত সময়ে রোগীর গৃহে চিকিৎসকের উপস্থিতি নীতি বিরুদ্ধ মনে করিয়া আমি নিজের বাসায় আসিতে ইচ্ছা করি। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের মোটর গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের বাসা হইতে আমার বাসায় আসিতে হইলে একটি রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করিতে হয়। উক্ত লাইন পার হইবার উপক্রম কালে আমাদের উভয়ের (আমার ও ড্রাইভারের) অজ্ঞাতসারে ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান একখানা লাইট ইঞ্জীন আমাদের মোটর গাড়ী হইতে এক হাত দূরে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমরা গাড়ী হইতে সভয়ে নামিয়া পড়িলাম। তদ্দর্শনে ইঞ্জীন চালক আমাদিগকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনারা আজ খুব বাঁচিয়া গেলেন। আমি ত ব্রেক আঁটি নাই জানি না কোন দৈবশক্তিবলে গাড়ীখানা আপনা হইতেই থামিয়া গেল। ইহা আমার নিকট অত্যদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছে।" এবম্প্রকার কথোপকথন সময়ে আমি বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম, সেই স্থানটি এমন কি আমাদের মোটর গাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত, পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের দেহ নিঃসৃত পদ্ম গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমার প্রতীতি হইল যে, বাবা আমাদের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় স্বীয় ঐশী শক্তি দ্বারা উক্ত লাইট ইঞ্জীনের গতিরোধ না করিলে আমাদের গাড়ীখানি ত চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইত-ই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যে ভবলীলা সাঙ্গ হইত তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় ছিল না। পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়া ভক্তের প্রতি তদীয় অপার করুণার কথা চিন্তা করিতে করিতে গৃহে পৌঁছিলাম। হায় রে মূঢ় মন, তুমি প্রতি পলকে পলকে শ্রীগুরুদেবের এত দয়া, এত করুণা রাশি, এত অপরিমেয় সহায়তা, উপলব্ধি করিয়াও এ পর্য্যন্ত যাবতীয় কুসংস্কার বিধৌত করিয়া গুরু প্রদত্ত সেই পরম শান্তিরস পান করিয়া বিভোর হইতে প্রয়াস পাইতেছ না!

শ্রীশ্যামাগতি রায় চৌধুরী।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ সন ১৩৩৪ সালের প্রারম্ভে এক পুণ্যদিনে তাঁহারই কৃপাবলে আমি প্রথম দর্শন লাভ করিয়া বিমোহিত ও ধন্য হই। তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বসিবার পর তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কিগো, এসো।" এই অমৃতবাণী শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। তারপর আবার বলিলেন, "কিগো, কি বল।" আমি আরও অবাক হইয়া যাইলাম। আমাকে যেন আমার মনের ভাব—যাহা আমি বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলাম না—বলিবার জন্য ইঙ্গিত ও উৎসাহ দান করিলেন। আমি উৎসাহ পাইয়া বলিলাম, "বাবা, শান্তি ও আনন্দ কি করিলে পাইব?" তিনি বলিলেন, "বৎস, জল দেখিলে জলের পিপাসা যায় না, জল পান করিতে হয়।"

এই বাণী শুনিয়া আমি স্থির ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "চিন্তার কোন কারণ নাই, ঠিক উপদেশ মত সাধন-ক্রিয়া করিলে নিশ্চয়ই শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে।"

সেদিন বাটী ফিরিলাম। মনে সর্ব্বদাই সেই রূপ ও সেই স্নেহমাখা মধুর স্বর জাগিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে শ্রীচরণ দর্শন পাইতাম ও নানারূপ উপদেশ শুনিতাম। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অধিকতর বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই আমাদিগের কুলগুরুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি আমার ভ্রাতাদিগের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। এক দিকে শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল, অন্য দিকে দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা, এবং আমার পরম পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী ও আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা পুনরায় দীক্ষা গ্রহণে মত দিবেন কিনা এই সকল সংশয় মনের মধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। আমার পরম পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বেই ৺স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ মনের অবস্থা লইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম।

একদিন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের ও অন্যান্য সকলের নিকট গুরুদেবের বিষয় সমস্ত বর্ণনা করিলাম। তাহার ফলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন—অতি শীঘ্রই সকলের শ্রীগুরুদেবের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মাইল। ইতিমধ্যে আমি এক খানি ছবি বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম সকলেই মধ্যে মধ্যে সেই ছবির সম্মুখে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকে। এইরূপে শ্রীগুরুদেব আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সুবিধা করিয়া আনিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার নিকট আশ্রয় লইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বলি নাই।

একদিন তাঁহার নিকটে বসিয়া বসিয়া মনে এই সকল ভাবের উদয় হইল। মনোভাব যথার্থরূপে কি করিয়া প্রকাশ করি, এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গুরূপদিষ্ট নির্দিষ্ট পথে সাধন ক্রিয়া নিয়মিত রূপে করিতে না পারিলে কিছু হয় না।" আমি বিস্মিত হইলাম, তিনি বলিতে লাগিলেন—"যোগাভ্যাস না করিলে কখনও প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয় না,—যোগাভ্যাস ঠিক উপদেশ মত করিয়া যাইতে পারিলে আপনা আপনিই সংযম, রিপুদমন, অসৎচিন্তা ও অসৎকর্ম্মের প্রতি বিরাগ, সৎচিন্তা ও সৎ কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উপস্থিত হইবে, এবং সকল দিকেই উন্নতি হইবে ও অসীম আনন্দ অনুভব করিবে। একমাত্র যোগাভ্যাসের দ্বারাই প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয়, তখন এই জগতের যাবতীয় বিষয়ই সাধকের ইচ্ছাধীন হইয়া যায়।"

এইরূপ ভাবে শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার মনের সংশয় দূর করিয়া বলায় আমার সংকল্প আরও দৃঢ় হইল। আমি প্রথম দিন হইতেই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সুমধুর গন্ধ অনুভব করিতাম।

আমার বড়দাদা শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই অধিক হইয়া উঠিল ও তিনি আমাদের মাতাঠাকুরাণী ও কুলগুরুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তাঁহারা অতি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দান করিলেন। বড়দাদা ১৩৩৫ সালের শুভ ৩২শে আষাঢ় শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। আমার সেজদাদা শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি শুভ ১৩ই ভাদ্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি। দীক্ষা প্রাপ্তির পূর্ব্বরাত্রে আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দীক্ষার সময়ে স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ ভাবের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। আমার দীক্ষার পর তিনি এই মর্ম্মের অভয়বাণী বলিলেন যে আমার সম্পর্কীয় সকলেই তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় পাইবে। সত্যই তাহার পর তিনি কৃপা করিয়া বাটীর সকলকে ক্রমে ক্রমে দীক্ষা দান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের পূর্ব্বতন শিষ্য। সুরেশ দাদা আমার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাকে তাঁহার সন্ধান দেখাইয়া দেন।

গুরুদেব শিষ্য ও শিষ্যাগণের সমক্ষে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনানুসারে নানারূপ অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া থাকেন। আমার মনে হয় যে আমাদের সাধনক্রিয়ার যত্ন ও আগ্রহ বর্দ্ধিত করিবার এবং বিশ্বাস দৃঢ় রাখিবার জন্যই ঐরূপ ঘটনাগুলি আমাদের অনুরোধে, বা কখনও কখনও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াও, দেখাইয়া থাকেন। এইরূপ বহু ঘটনা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

১৩৩৬ সালের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমরা ৺পুরীধামের আশ্রমে যাই। ৺পুরীধামে আমরা যেদিন গিয়া পেঁছাই, সেদিন দেখি যে একেবারে হাওয়া গায়ে লাগিতেছে না অত্যন্ত গরম বোধ হইতেছিল দেখিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব আশ্রমের ত্রিতলের ঘরে গিয়া কিছুক্ষণ পরেই দ্বিতলের

বারাণ্ডার আমাদের নিকট আসিয়া কতকগুলি সরু তারের টুকরা দেখাইলেন এবং বলিলেন, "কি গো, বিজ্ঞানে এই তার দিয়া হাওয়া আনিলাম, কিন্তু তারগুলি পুরাতন হওয়ার দরুণ ভাঙ্গিয়া যাইল। হাওয়া হইয়াছে, দেখি কতক্ষণ হাওয়া থাকে, বন্ধ হইলে আবার হাওয়া আনিবার ব্যবস্থা করিব। ৺পুরীর হাওয়াটাই ভাল, যদি এখানে আসিয়া হাওয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কি হইল। কিন্তু এ হাওয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না, পুনরায় ব্যবস্থা করিতে হইবে।" আমরা দেখিলাম সেই হাওয়া প্রায় তিন চারি ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত রহিল, পরে বন্ধ হইয়া যাইল, আবার গুরুদেব উপরে ত্রিতলের ঘরে গিয়া কিছুক্ষণ পরে আমাদের নিকট দ্বিতলের বারাণ্ডায় আসিয়া বলিলেন, "এইবার হাওয়া আনিবার যে ব্যবস্থা করিলাম তাহা আর শীঘ্র বন্ধ হইবে না, কিছুদিন চলিবে।" আমরা তাহার পর হইতে খুব জোর বাতাস পাইতে লাগিলাম এবং আমরা যে কয়দিন ৺পুরীধামে ছিলাম সেই কয়দিনই এইরূপ জোর বাতাস পাইলাম।

একদিন এই দ্বিতলের বারাণ্ডার আমার এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাদিগের সহিত নানারূপ কথা-প্রসঙ্গে গুরুদেব আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "নরেন্দ্রের চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, সেই জন্য উহার বয়স যাহা দেখায় তাহা নহে।" এই বলিয়া আমার সেইদিন পর্য্যন্ত যাহা প্রকৃত বয়স তাহা উল্লেখ করিলেন।

সে বারে পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদা, শোভারাম দাদা ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভৌমিক দাদা ও তাঁহার স্ত্রী, বড় দাদা, সেজ দাদা ও আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এই বৎসর ভাদ্র মাসে একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার রূপনারায়ণ নন্দন লেনস্থ আশ্রমে আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত রহিয়াছি, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দাদা গুরুদেবের নিকট কোন অলৌকিক ঘটনা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সকলেই একমতে নাভিপদ্ম দেখিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া গুরুদেব আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আজ আকাশে একটু মেঘ রহিয়াছে, খুব প্রখর সূর্য্য-কিরণ থাকিলেই ভাল হইত। আচ্ছা, তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন দেখ, একটু গঙ্গাজল লইয়া এস।" আদেশ মত গঙ্গাজল আনা হইল। সেই গঙ্গাজল একটু লইয়া নাভিতে স্পর্শ করাইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে নিজ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর সমস্ত অংশ নাভি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সেই সময় গৃহ-মধ্যে অতি তীব্র মনোহর পদ্ম-গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। পরে তর্জ্জনীটী বাহির করিয়া লইলেন, এবং আমরা নাভির ছিদ্রটি বৃহৎ দেখিতে পাইলাম ও ক্রমে নাভির ভিতর প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় লাল রঙ্গের পদ্ম দেখিতে পাইলাম। পরে সেই পদ্ম-গন্ধ আরও তীব্র হইল। আমি ইহা দেখিয়া পুলকে, আনন্দে, বিস্ময়ে, গৌরবে, উৎসাহে ও আগ্রহে মুগ্ধ হইলাম। তারপর গুরুদেব নাভি পূর্ব্ববৎ সাধারণ অবস্থায় আনিলেন এবং আমাদিগকে ষট্‌চক্রের বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পূর্ব্বে একদিন তিনি গোপীনাথ

দাদা ও যতীশ দাদাকে এই নাভিপদ্ম দয়া করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া অবধি আমি প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম। আজ আমার সেই বাসনা তাঁহার কৃপায় পূর্ণ হইল। সেইদিন সেই সময় নৃপেন্দ্র দাদা, দুর্গাকান্ত দাদা, কেদার দাদা, মহেশ্বর দাদা, ইন্দুভূষণ দাদা, বড় দাদা, সেজ দাদা এবং আরও দু'একজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন।

একদিন আশ্বিন মাসে গুরুদেব শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ প্রস্তুত করিলেন। দুইটি খালি শিশি কলিকাতার আশ্রমের দ্বিতলে বারাণ্ডায় সূর্য্য-কিরণে স্থাপিত হইল। পরে তিনি একখানি ছোট লেন্স রৌদ্রে ধরিলেন। সেই লেন্সের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি শিশির উপর পড়িতেই দেখা গেল যে শিশি দুইটি এক লাল-আভা-যুক্ত অতি সুগন্ধময় জলীয় পদার্থে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থানটিও সেই সুগন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। এ এক অভিনব, মনোহর, আশ্চর্য্য-রকম গন্ধ। এইরূপে লেন্সের দ্বারা শিশির উপর সূর্য্য-কিরণ ফেলিবার সময় আমরা ক্রমান্বয়ে কর্পূর, মৃগনাভি প্রভৃতির গন্ধ অনুভব করিয়াছিলাম। পরে আমরা—শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু, অতুল চন্দ্র বসু, অরুণ চন্দ্র বসু, যতীশ, প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিম, কেদার দাদা, বড়দাদা, সেজদাদা, ও আমি—সকলেই একেকটি ছোট শিশি করিয়া প্রত্যেকে গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী, ঐ জলীয় গন্ধ পদার্থ ভাগ করিয়া লইলাম। আজ পর্য্যন্ত তাহা আমার নিকট রহিয়াছে।

একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার আশ্রমে গুরুদেব নানারূপ ব্যাপার বুঝাইতেছিলেন। এইরূপ বুঝাইতে বুঝাইতে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় দাদার হাত হইতে একটি হীরার আংটী চাহিয়া লইলেন; আংটীটি হাতে লইয়া হীরকটিকে, আকারে যাহা ছিল তাহার প্রায় দ্বিগুণেরও অধিক পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং সোনার আংটীটিরও আকার পরিবর্ত্তন করিয়া পরিমাণও প্রায় দ্বিগুণের অধিক করিলেন। কিরূপে ইহা হইল, এবং কিরূপে ইহা করা যায়, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। পরে শ্রীযুক্ত বিধুদাদার ইচ্ছা-অনুযায়ী আংটীটি পূর্ব্ববৎ করিলেন।

আর একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার আশ্রমে তিনি নিজ দেহ হইতে একটি বাণলিঙ্গ শিলা বাহির করিয়া দেখান। দেখিলাম তাঁহার বাম হস্তের উপরিভাগে অর্থাৎ বগলের কিছু নিম্নভাগে একটি স্থান কিছু স্ফীত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ঐ স্ফীত অংশটি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধরিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ অংশটিকে সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পরে দেখা গেল যে দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে অর্থাৎ বগলের কিছু নিম্নে স্ফীতভাব রহিয়াছে। তখন ঐ স্ফীত অংশটিকে বাম হস্তের দ্বারা পুনরায় ধরিয়া বলিলেন, "এইবার সেই শিলাটিকে দেহের মধ্য হইতে বাহির করিব।" পরে বাম হস্তের দ্বারা টানিতেই শিলাটির অর্দ্ধাংশ বাহিরে দেখা গেল বকি অর্দ্ধাংশ দেহের মধ্যে রহিয়াছে। পুনরায় বহিষ্কৃত অংশটি ধরিয়া টানিতেই সমস্ত অংশটি বাহির হইয়া আসিল। গুরুদেবের দেহের অংশটি স্বাভাবিক মতই দেখিলাম। ঐ শিলাটি তাঁহার দেহের মধুর গন্ধে সুগন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছিল—তাহা আমরা আঘ্রাণ লইয়া অনুভব করিলাম।

এইরূপ ভাবে তিনি নিজ দেহের মধ্যে, হস্তের তালু বা অন্য স্থান দিয়া, অনেকবার স্ফটিক প্রবেশ করাইয়াছেন ও বাহির করিয়াছেন। ইহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইরূপ ভাবে অপরের দেহের মধ্যেও স্ফটিক প্রবেশ করাইতে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।

আর একদিন কলিকাতার আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড লইয়া, সেটিকে প্রস্তর খণ্ডে পরিবর্ত্তন করাইয়া দেখাইলেন, এবং এ জগতের প্রত্যেক দ্রব্যেই যে প্রত্যেক দ্রব্যের অংশ বিদ্যমান আছে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই ভাবে তাঁহাকে একটি জিনিষকে অন্য জিনিষে পরিবর্ত্তিত করিতে আমি বহুবার দেখিয়াছি। ফুলকে স্ফটিক বা অন্য কোন দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত করিতে, ফুটন্ত পুষ্পকে কুঁড়ীতে এবং কুঁড়ীকে পুনরায় ফুটন্ত পুষ্পে ও একজাতীয় ফুলকে অন্য জাতীয় ফুলে পরিবর্ত্তিত করিতে, আমি বহুবার বিস্ময় ও আনন্দের সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

১৩৩৭ সালে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে ৺কাশীধামের আশ্রম হইতে তিনি আমাদের কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীর সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে গমন করেন। তিনি আমাদিগকে শ্রীশ্রী৺বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করাইয়া আনিলেন এবং বাসায় বসিয়া শ্রীশ্রী৺বিন্ধ্যবাসিনী ও ৺অষ্টভুজা মাতার পরমাণু আশ্চর্য্য রকমে ধরিলেন। দুইটি শিশি রাখিয়া তাহার উপর একখানি ক্ষুদ্র লেন্স ধরিতেই দেখা গেল, শিশি দুইটির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আসিয়া জমিতেছে। শিশি দুইটি ছিপি-বন্ধ-করা ছিল। একটি শিশি ফাটিয়া যাইল, আমরা শিশিটি ফাটিয়া যাইবার জন্য একটু অস্থির হইলাম, কারণ সেখানে আর শিশি ছিল না। যে শিশিটি ফাটিয়া গিয়াছিল তিনি তাহার উপর পুনরায় লেন্সখানি ধরিতেই দেখা গেল যে শিশিটির ফাটা অংশটি জুড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। তাহার পর শিশি দুইটি ক্রমে ক্রমে জলীয় পদার্থে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এইরূপ ভাবে খালি কোটার মধ্যে সন্দেশ প্রস্তুত হইতে, পানের মশলা প্রস্তুত হইতে, আমি বহুবার দেখিয়াছি।

৩রা চৈত্র কলিকাতা বাবুঘাটে তাঁহার সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাই। তিনি একখানি ঘোর গেরুয়া-রঙ্গের কাপড় পরিধান করিয়া স্নান করিতে নামিলেন। দুই চারি মিনিট পরে স্নান করিয়া উঠিবার সময় দেখিলাম যে ঐ পরিধেয় কাপড়খানির রং সাদা হইয়া গিয়াছে। একটু সামান্য জায়গায় পূর্ব্ববৎ গেরুয়া রং বিদ্যমান ছিল। কোন গুরুভ্রাতা বলিলেন, কাপড়ের রংটি বোধ হয় কাঁচা ছিল। শ্রীশ্রীগুরুদেব ঈষৎ হাস্য করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ফণিভুষণ মজুমদার দাদা ঐ কাপড়খানি লইয়া পুনরায় গঙ্গাজলে গিয়া সেই রংটুকু উঠাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই উঠাইতে পারিলেন না। পরে গুরুদেব কেন আমাদের সম্মুখে এইরূপে রংটি সাদা করিলেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সেদিন বড়দাদা, সেজদাদা, ইন্দুদাদা, শ্রীযুক্ত ফণিভুষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র বসু দাদা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

গুরুদেবের গাত্র হইতে যে বিশেষরূপ সুগন্ধ নির্গত হয়, তাহা তাঁহার

শ্রীচরণ সমীপে যিনি মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার পর আমি কলিকাতা আশ্রমে, তাঁহার পদসেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি দয়া করিয়া অনুমতি দান করেন। আমি, শ্রীযুক্ত প্রবোধ দাদা শ্রীযুক্ত ননীলাল দাদা ও শ্রীযুক্ত সুরেশ দাদা একত্রে পদসেবা করি। পদসেবার পর আমার হস্তে সেদিন সমস্ত রাত্রি সেই সুগন্ধ বিদ্যমান ছিল, এবং আমি পুলকে ও আনন্দে বিভোর ছিলাম।

একদিন কলিকাতার আশ্রমে গুরুদেব আসনে বসিয়া মুখ ধৌত করিতেছিলেন। আমি অতি সন্নিকটে বসিয়া ছিলাম এবং মুখ ধৌত করিবার জন্য তাঁহার হস্তে জল দিতেছিলাম। মুখ ধুইবার সময় জলকণা আমার শরীরে ও বস্ত্রে লাগিয়াছিল, আমি ইচ্ছা করিয়াও কতকটা লাগাইয়াছিলাম। পরে দেখিলাম, আমার সেই কাপড়ে বহুদিন যাবৎ সেই বিশেষরূপ সুগন্ধ বিদ্যমান ছিল। তাঁহার নিকট উপস্থিতি কালে কখনও তীব্র, কখনও বা মৃদু গন্ধ পাইয়া থাকি, এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুপস্থিতকালে, বহুদূরে থাকিয়াও, রাস্তায়, রেলপথে, কর্ম্মস্থানে, বাটীতে বহুবার সেই বিশেষরূপ সুগন্ধ অনুভব করিয়া আসিতেছি।

১৩৩৮ সালের ১০ই আশ্বিন কলিকাতা আশ্রমে নানারূপ উপদেশ দ্বারা বুঝাইবার সময় একটি আধলা পয়সাকে সোনার গিনীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখাইলেন। পুনরায় সোনার গিনীটিকে পূর্ব্ববৎ আধলা পয়সাতে পরিবর্ত্তিত করিলেন। সেই সময় বড়দাদা, সেজদাদা, শ্রীযুত অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ঘোষাল ও অন্যান্য কয়েকজন গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতি বৎসর ২৯শে ফাল্গুন তাঁহার জন্মোৎসব হইয়া থাকে। আমার দীক্ষার পর সর্ব্বপ্রথম যে জন্মোৎসব হয়, তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আমার মনে সাধ হইয়াছিল যে আমি উৎসবের দিন শ্রীশ্রীচরণে পদ্মফুল দিয়া অঞ্জলি প্রদান করিব। আমাদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-শিষ্যদিগের—এই জন্মোৎসবের দিন ছাড়া অন্য কোন দিন পদস্পর্শ করিবার অনুমতি নাই। সেই জন্যই আমাকে এই সাধ পূর্ণ করিবার জন্য ঐ দিনের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। আমি কিন্তু পূর্ব্ব হইতে পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে ঐ দিন একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। যখন একে একে অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ অঞ্জলি দান করিতে যাইতেছিলেন তখন হঠাৎ আমার মনে পূর্ব্ব বাসনা জাগিয়া উঠিল এবং আমার নিকট পদ্মফুল নাই ভাবিয়া চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন আর পদ্মফুল সংগ্রহের কোন উপায় নাই ভাবিয়া জোর করিয়া মন স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম। এমন সময় একজন গুরুভ্রাতা আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার হাতে কয়েকটি পদ্মফুল ছিল। তিনি আমাকে সহাস্য বদনে বলিলেন,—"আপনি পদ্মফুল লইবেন?" আমি তৎক্ষণাৎ চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া—"হাঁ, নিশ্চয়ই লইব"—বলিয়া হাত পাতিয়া দুইটি পদ্মফুল গ্রহণ করিলাম এবং সেই ফুল দুইটি অন্যান্য ফুলের সহিত গুরুদেবের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদিগকে পান প্রসাদ দিয়া থাকেন। আমি মধ্যে মধ্যে

ঐ প্রসাদী পান বাটীর অন্যান্য সকলের জন্য আনিয়া থাকি। একদিন আমি বৈকালে যাইলাম, তখন তাঁহার নিকট পান অল্প থাকায় আমাকে একটি পান দিলেন। আমার সেদিন বাটীর সকলের জন্য প্রসাদী পান আনিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একটি পান পাইয়া কি করিয়া লইয়া যাই এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পানটি নিজেই খাইয়া ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পান দরকার থাকে ত' লইতে পার।" এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি পান লইলাম ও বাটীতে আনিয়া সকলকে প্রসাদ দিলাম।

একদিন আহ্নিক করিতে বসিয়াছি, এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি যে স্থানে আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে সেই স্থান হইতে কিছু দূরে পশ্চাদ্দিকে একটি জানালা খোলা ছিল, এবং সেই জানালার নিকটে কতকগুলি পুস্তক ছিল। এই দিনের পূর্ব্বদিনেও এইরূপ আহ্নিক করিবার সময় ঐ পুস্তকগুলি বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। আজও এইরূপ বৃষ্টি আরম্ভ হইল বুঝিতে পারিয়া মনটি অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং আহ্নিকের অতি অসুবিধা বোধ করিলাম। গুরুদেবের শ্রীচরণ চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় হঠাৎ জানালাটি বন্ধ হইয়া যাইল। আমার মনের ঐ চঞ্চলতা ও অসুবিধা দূর হইল এবং আমি নিরুপদ্রবে আহ্নিক করিতে থাকিলাম।

শ্রীচরণ-তলে যেন রহিয়াছি এইরূপ কল্পনা করিয়া ও মনে মনে ছবি আঁকিয়া নিজে নিজে অনেক সময়ে আনন্দ অনুভব করি। বরাবর ইচ্ছা হয় যে এইরূপ যদি একখানি প্রকৃত ছবি হয় তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হইবে। কিন্তু সে সুযোগ কি করিয়া হইতে পারে? মনে হইত, এ তীব্র বাসনা কি পূর্ণ হইবে না! কিন্তু বাঞ্ছা কল্পতরু অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব এমন সুযোগ করিয়া দিলেন যে আমার অন্তরের সেই গোপন বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। গুরুদেবের যে ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল তাহাতে আমাকে আমার সেই বাঞ্ছিত স্থানে দেখিয়া গুরুদেবের অশেষ কৃপা অনুভব করিলাম।

শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা জগতের যাবতীয় ঘটনাবলীর মধ্যে নিত্য বিকশিত হইতেছে, তথাপি তিনি মানবের মঙ্গলের জন্য মানবের দ্বারাই তাঁহার মহিমা প্রকাশ করাইয়া থাকেন। সেই মহিমা প্রকাশের চেষ্টায় অতিশয় শান্তি ও আনন্দ আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শক্তি ও বিভূতি অনন্ত। আমি অতি ক্ষুদ্র; আমার শক্তিও অতি ক্ষুদ্র। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা সেই অনন্ত শক্তির পরিচয় কি করিয়া বুঝিব? তবে তাঁহারই কৃপাবলে আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি শক্তি দ্বারা যে যে বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আমার ক্ষুদ্র বোধ-শক্তি দ্বারা যে যে বিষয় অনুভব করিয়াছি, এবং যাহার চিন্তায় আমি শান্তি ও আনন্দ পাইয়া থাকি এবং পাইবার ভরসা করি, আমার সাধ্যমত তাহার কিঞ্চিৎ অংশ-প্রকাশ করিলাম। তিনি যে অনন্ত শক্তি ধরিয়া জগৎ সমক্ষে এরূপ গোপন ভাবে লীলা করিতেছেন ইহা কি শক্তির পরিচয়? তিনি আমাদের মধ্যে তাঁহার অসীম শক্তি ও কৃপা সর্ব্বদাই বিকাশ করিতেছেন। তিনি যেরূপ ভাবে সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া কৃপা করিয়া আমাদিগকে চালাইয়া

লইতেছেন, যেন চিরদিন সেইরূপ শ্রীচরণ তলে রাখেন, এই প্রার্থনা ও ভিক্ষা !!

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র খাঁ।

কোর্ট ইন্‌সপেক্টর, হাওড়া।

যতদূর স্মরণ হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে একদিন পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন জন্য গুস্করায় যাই। তখনও আমি অদীক্ষিত। আমার অত্যন্ত পেটের পীড়া হইয়াছিল—ন্যূনাধিক ২০ বার জলের ন্যায় দাস্ত হইয়াছিল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ, তোমার কি হইয়াছে?" আমি আমার পীড়ার অবস্থা জানাইলে তিনি একজনকে বলিলেন, "ভুট্টা খুব ধারক, শরৎকে কয়েকটা ভুট্টা পোড়াইয়া দাও।" যতদূর মনে হয় পূজ্যপাদ মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েকটি ভুট্টা পোড়াইয়া আমাকে খাইতে দেন। তারপর একটু সুজির পায়স ও কলা খাই। আমি তাহাতেই আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এই সময় পরমারাধ্যদেবের অঙ্গের সৌরভে দিক্ সকল সুরভিত হইত, সর্ব্বদাই হয় পদ্মগন্ধ, না হয় উৎকৃষ্ট চন্দনের গন্ধ কিংবা খস্‌খস্ বা গোলাপের গন্ধ, বাবার দেহ হইতে প্রবাহিত হইয়া সকলের মন প্রাণ প্রফুল্লিত করিত।

ইহার কিছুদিন পর আমি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ফরিদপুর গ্রামে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া যাই তথায় অবস্থানকালে পীড়িত হই ও অবসর লইয়া বর্দ্ধমানে আসি। বর্দ্ধমানে চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য লাভ করি। ফরিদপুরে ব্যারামে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহাতে ফরিদপুরের নামোল্লেখও আমার পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়াছিল। আমি আরোগ্য লাভ করিলে আমাদের পুলিশ সাহেব মিঃ আর, জে, হার্ষ্ট আবার আমাকে ফরিদপুরে পাঠাইতে কৃতসংকল্প হন, এবং আমার আপত্তি ও ভয়ের কারণ সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আমি ব্যাধি উপশমে কার্য্যক্ষম হইয়াছি কিনা পরীক্ষার্থে স্থানীয় সিভিল্ সার্জ্জনের নিকট আমাকে যাইতে আদেশ দেন। সিভিল্ সার্জ্জন সাহেব, তিনি কেবল শারীরিক অবস্থার পরিচয় প্রদানের অধিকারী। তখন বাবা আমাদের বাটীর সম্মুখে শ্রীযুক্ত নটবর ঘোষের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার কষ্টের কারণ জানিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার সাহেবকে বল যেন তিনি তোমাকে বর্দ্ধমানে রাখিতে লেখেন।" ডাক্তার সাহেব আমাকে দেখিয়া fit লিখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "What place would suit you? Do you think Burdwan will suit you?" আমি "হা" বলিলে তিনি আমাকে স্বাস্থ্যের অনুরোধে বর্দ্ধমানে রাখা উচিত লিখিয়া দেন, পুলিশ সাহেবও তদনুসারে কার্য্য করেন। ১৯০৯ সাল হইতে ১৯১০ সালের কিয়দংশ

পর্য্যন্ত আমি রাঁচীতে D.I.G. আফিসে একজন Assistant এর কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। পরে শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া নিবন্ধন ছুটী লইতে বাধ্য হই। তাৎকালিক D,I.G. মিঃ টমাস্ সাহেব বিদায়ান্তে আবার আমাকে রাঁচী যাইতে বলেন। কিন্তু রাঁচী তখন আমার পক্ষে বিষবৎ। আমি অনুনয় বিনয় করিয়া বর্দ্ধমান জেলায় আমাকে নিযুক্ত করিবার আদেশ গ্রহণ করি। সাহেব বেশ একটু বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন—"Oh, evidently you want to avoid me." তাহার পর ১৯১১ সালে তিনি বর্দ্ধমান পরিদর্শন করিতে যান। তখন আমি বর্দ্ধমান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। বিচার-বিমূঢ় মন ত অনেক রকমই কল্পনা করে—ছিন্ন কন্থায় শায়িত হইয়াও লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে। আমারও একদিন মনে হইয়াছিল, বোধ হয় আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ আসিয়াছে। যেন এই ভ্রম-সংশোধন জন্যই বিভু-প্রণোদিত হইয়া টমাস্ সাহেব আমার থানা পরিদর্শনার্থে আগমন করেন। তিনি এই সংবাদ আমাকে দিবার জন্য পুলিশ সাহেবকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নির্ম্মম আদেশ ক্রম-পরম্পরায় আসিতে আসিতে কোনও এক স্তরে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। আমি আর ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই। সাধারণতঃ যেরূপ করিয়া থাকি আমি সেইরূপ কাপড়-জামা পরিয়াই আসি,—থানার কার্য্যও অন্যান্য দিনের ন্যায় চলিতেছিল। সাধারণতঃ অশৃঙ্খলাই ইহার শৃঙ্খলা। এই অবস্থায় পুলিশ সাহেব সমভিব্যাহারে D.I.G. আগমন করেন। তাঁহার পরিদর্শন কালে যে ভাব সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হয়, তাহার অভাব দেখিয়া আমাকে বিস্তর অনুযোগ করেন। আমি তাঁহার আগমন বৃত্তান্তের সূচনাভাব হেতু প্রস্তুত হইতে পারি নাই জানাইলে, পুলিশ সাহেব বলেন, তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা বলবৎ থাকিতে বাধ্য। "আরম্ভসদৃশোদয়ঃ" —কলে জল পড়ছে, কনষ্টেবল কল বন্ধ করে নাই, সাহেব অমনি বললেন, "Damaned waste of public money. Give him a black mark for this;" ঘরের কোণে সামান্য মাকড়সার জাল আছে, তাহার জন্যও black-markএর ব্যবস্থা; এই ভাবে ১১টী black mark লিখিতে হইল। ৩টী black mark হইলে degraded ও ৯টী হইলে dismissed হইতে হয়। মরার উপর খাঁড়ার ঘা দরকার, সুতরাং আমার জন্য ১১টী black mark ব্যবস্থিত হইল। সাহেব চলিয়া গেলে আমি অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে বাবার নিকট আসি। বাবা সমুদায় ব্যাপার শুনিয়াও হাসিতে থাকেন এবং বলেন, "দেখ বেটার কেমন নির্ভরতা আসিয়াছে।" ভোজন বেলা অতিক্রম হইতে দেখিয়া এবং আমাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া "ভয় নাই—ওরাই কি জগতের মালিক। যাও, খাওয়া দাওয়া করগে" ইত্যাদি প্রবোধ বাক্য বলিয়া আমাকে আশ্বাস দেন। তারপর যখন ইনস্পেকসন রিমার্কের নকল আসিল তখন দেখি, আমার চক্ষুর সম্মুখে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছিল, তাহার কোন অংশই ইহাতে নাই। সাহেব সর্ব্বত্রই "Everything is in good order" লিখিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমার স্ত্রীর আংটী বা কোন একটি অলঙ্কার হারাইয়া যায়। ক্ষতি-জনিত দুঃখ অপেক্ষা "সোনা হারাইয়াছে" বলিয়া ভাবী

অমঙ্গল আশঙ্কায় সকলে ব্যথিত হইয়া গুরুদেবকে কাতর ভাবে স্মরণ করিতে থাকে। ২/৩ দিন পরে যে জায়গা চাকরে অনেকবার ঝাঁট দিয়াছে ও জল দিয়া পরিষ্কার করিয়াছে। বাড়ীর সেইরূপ অংশে, অর্থাৎ হয় ঘরের মেজেতে কিংবা বাইরের বারাণ্ডায়, সেই জিনিসটি পাওয়া যায়।

আমার প্রথম জাতা দুইটি কন্যা অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া স্ব-ধামে চলিয়া গেলে এবং কিছুকাল সন্তান হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া পূজ্যপাদ স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বাবাকে তাঁহার মনোবেদনার কথা জানাইলেন। বাবা বলিলেন, "আমার শিষ্য কখনও নির্বংশ হইবে না।" ইহার কিছুদিন পরে আমার অনুপস্থিতি কালে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া মা বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শন করিতে যান, আমার সতীর্থ (গুরুভাই) শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"শরৎ-দার মায়ের বড় ইচ্ছা শরৎ-দার একটু কিছু হয়।" বাবা তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁগো, শরতের একটী সন্তান হওয়া আবশ্যক।" তারপর একটি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া লোকাভাব হেতু পরমারাধ্য বাবা স্বয়ং ইহাদিগকে লইয়া আমাদের বাসায় রাখিয়া যান। ইহারই চতুর্থ দিবসে গর্ভের সঞ্চার হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর অত্যন্ত জ্বর হয়। দস্তুর মত এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইয়া ফল না হওয়ায় একটি ডি, গুপ্ত কিনিয়া আনি। সকালে এই ডি, গুপ্তের আরকের শিশিটি খুলিতেছি, এমন সময় পরমারাধ্য বাবা আমাদের বাসায় পদার্পণ করিলেন এবং আমাকে ও স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণীকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "তোমরা অতি বোকা। বউমা যে অন্তঃ-স্বত্বা।" পূর্ণ গর্ভাবস্থায় আমার স্ত্রী দোতালা হইতে একটি সিঁড়ি পার হইয়া চাতালে পড়িয়া যায়। তখনই বাবাকে সংবাদ দিয়া একটু স্নান জল আনি। তার পরদিনই আমার কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা ভূমিষ্ঠ হয়।

এই সময়ের মধ্যে বাবার অঙ্গ-ঘ্রাণ এবং সেই গন্ধ অন্য ব্যক্তি বা বস্তুতে সঞ্চার ব্যতীত আরও অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছায় অজস্র আঙ্গুর আসিয়াছে,—সকলে খাইয়াছি। দেখিয়াছি মুখের ভিতর হইতে ও শরীরের নানা স্থান হইতে আঙ্গুর বাহির হইয়াছে। কলা, সন্দেশ ও নানা দ্রব্য এই ভাবে খাইয়াছি। বিস্তর অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছি। কিন্তু লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখায় সকল কথা স্মরণ হইতেছে না। আমাদের গুরুভাই ৺নীরদ মোহন রায়চৌধুরীর দাদা শ্রীযুক্ত লালমোহন রায় চৌধুরী এখন হুগলীর রেকর্ড কীপার। ইঁহার দীক্ষার দিন ইনি সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০/১১-টা পর্যন্ত আশ্রমে ছিলেন। তারপর একাকী নীরদ বাবুর বাসায় প্রত্যাগমন কালে পথ হারাইয়া অন্যত্র যাইয়া পড়েন ও উদভ্রান্ত ভাবে বিচরণ করিতে থাকেন। তখন এক অপরিচিত পুলিশ প্রহরী 'দেওকীনন্দন" নামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া অযাচিত ভাবে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া বাসা পর্যন্ত আসে, কিন্তু পর দিবসে সে নামের বা আকৃতির কোন কনেষ্টবলের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় নাই। তারপর রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় লালমোহন বাবুর কক্ষে বাবা গমন করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করেন। তিনি উঠিয়া বসিবার

আসন ও তামাক সাজিয়া দেন এবং পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন। বাবা বলেন, "এত ঘুমাইলে চলিবে না, খুব ভোরে যাইবে।" তারপর লালমোহন বাবু পার্শ্বস্থ কক্ষে শায়িত নীরদবাবুর নিদ্রাভঙ্গ করেন। নীরদ বাবু বাহিরে আসিলে লালমোহন বাবু পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, বাবা নাই। অথচ পদ্ম-গন্ধে ঘরখানি আমোদিত। তারপর বিস্মিত ভাবে দেখেন যে প্রত্যেক দরজার খিল পূর্ববৎ বন্ধই রহিয়াছে। পরদিন আশ্রমে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই একবাক্যে বলেন, "বাবা আশ্রম ছাড়িয়া রাত্রে কোন দিন কোথাও যান না, সে দিনও যান নাই।" পুনরায় সেই রাত্রির শেষ ভাগে আমাদের গুরুভাই নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লালমোহন বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করেন এবং কিছুদূর তাঁহার সঙ্গে আসিয়া অন্য দিকে কার্য্যোপলক্ষে চলিয়া যান। আশ্রমে আসিয়া নেপাল বাবুকে ইঁহারা আশ্রমেই দেখিতে পান এবং তিনি ইঁহার বাসায় যাওয়া বা ডাকা অস্বীকার করেন।

তখন আমি খুলনার কোর্ট ইনস্পেক্টর। খুলনা হইতে সপরিবারে শ্রীশ্রী৺শিবরাত্রি উপলক্ষে বাটী আসিতেছিলাম, সঙ্গে একটি বৎসর দুই বয়সের কন্যা ছিল। সঙ্গে দুগ্ধ ছিল না। মেয়েটি অত্যন্ত কাঁদিতেছিল। লিলুয়া স্টেশনে গাড়ী থামিলে একজন গোয়ালা দুগ্ধের ভার সহ গাড়ীতে উঠে। উঠিবার সময় খুব আপত্তি করা হয়। সে বলিল, "মহাশয়, এখনই নেমে যাব, একটু দাঁড়িয়ে যাই।" অনিচ্ছাসত্ত্বে সকলে মত দিলেন। সে কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়াই বলিল, "আধ সের খাঁটি দুধ আছে, বিক্রী হয় নাই। সঙ্গে ছোট মেয়ে দেখছি। আপনারা দুধটুকু ঢেলে নিন। দাম চাই না।" দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে দিতে গাড়ী স্টেশনে আসিল, সে গাড়ী হইতে নামিয়া জনতায় মিশিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

হরিদ্বার হইতে একটী হিন্দুস্থানী সাধু কুম্ভক করিতে গিয়া পীড়িত হন। বুকের বেদনায় অস্থির হইয়া নানাস্থানে যান, কিন্তু কেহই ব্যাধির উপশম করিতে পারেন নাই। অনেক সন্ন্যাসীর নিকট যান। তাঁহাদের উপদেশে বাবার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় আরোগ্যের জন্য বাবা কোন ক্রিয়া দেবেন, কিন্তু বাবা তাহা দেন নাই। কিন্তু দুই দিনেই তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বিস্মিত ভাবে বাবার স্তুতি করিতে করিতে চলিয়া যান।

আমাদের গুরুভাই বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য আর একটি গুরুভ্রাতার পুত্রের বিবাহে বরানুগমন করেন। তাঁহার তথায় জ্বর হয়। বাবা তখন বর্দ্ধমানে। বাবা বলিলেন, "ওগো, বিনোদের জ্বর হয়েছে। আমোদ করতে গেল, জ্বর এলে সকলে ব্যতিব্যস্ত হবে, জ্বরটা টেনে নেওয়া যাক।" এই কথা বলার কিছু পরেই বাবার কম্প দিয়া জ্বর আসে। পরদিন আবার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

একবার শ্রীশ্রী৺শিবরাত্রিতে বণ্ডুল আশ্রমে আমার খুব জ্বর হয়। তারপর পারণের দিন প্রাতেও আন্দাজ ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। উপস্থিত অনেক ডাক্তার গুরুভাই হাত দেখিয়াছিলেন। আমি কি খাইব, জিজ্ঞাসা করায় যাহা

সকলে খাইবে আমিও তাহাই খাইব, এই আদেশ পাই। সুতরাং সরবত ফলমূল হইতে আরম্ভ করিয়া লুচি সন্দেশ প্রভৃতি সবই খাই। প্রসাদ পাওয়ার পরই জ্বর ছাড়িয়া যায়। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় এবং জ্বর-জনিত দুর্ব্বলতা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইতি—

শ্রীশরচ্চন্দ্র খাঁ। *

শ্রীকেদারনাথ ভৌমিক

উকিল, ১২৩/১, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩৩৪ সালের চৈত্রমাসে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে যখন ডিহিরি-অন-সোনে বেড়াইতে যাই, তথায় এক দিবস আমার ভায়রা-ভাই শ্রীযুক্ত ভুপতি ভুষণ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে অবস্থানকালে তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত মাখন লাল ভট্টাচার্যের (ইনি এবং উক্ত ভুপতি চরণ ভটাচার্য্য উভয়েই উপস্থিত আমাদের গুরুভাই) নিকট শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরিত কথা শ্রবণ করি এবং "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ" প্রথম ভাগ ('চরিত কথা') নামক একখানি পুস্তকে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবনী পাঠ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করি। এই সময় হইতেই এই মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন আকাঙ্খা মনে প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠে। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে একদিন আমাদের জোড়াবাগান কোর্টের লাইব্রেরীতে সম-ব্যবসায়ী শ্রীজানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দাদার নিকট কথায় কথায় বলি, "যথার্থ কোন মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন লাভ হইলে বড় পরিতৃপ্ত হই।" কথা প্রসঙ্গে উক্ত ভ্রাতা জানকী নাথ আমাকে কহেন, "তোমার যদি অন্তরের ইচ্ছা এই রূপই হয়, শীঘ্রই পাইবে।" আমি এই দিন পুনঃ পুনঃ এই মর্ম্মে কথা বলিলে জানকী দাদা আমাকে বিশেষ কোন কথা না বলিয়া চুপ রহেন এবং আমিও বাটী চলিয়া যাই। এই ঘটনার ২/১ দিবস পরে পুনরায় এই লাইব্রেরীতে উভয়ে মিলিত হইয়া কথা কহিতে আরম্ভ করি এবং আমি কহি, "আমি এক মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবের কথা কোন ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়া এবং তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইনি কোথায় থাকেন? জানকীদাদা, কিছু বলিতে পারেন কি?" ইত্যাদি। জানকীদাদা এই দিনও আমাকে বাবার বিষয় কিছু বলেন নাই। এই ঘটনার পর দিবস আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে ও কাতর ভাবে লাইব্রেরীতে জানকীদাদাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় জানকীদাদা তাঁহার নিজের ভাবে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া পরিশেষে আমার অশ্রুপাত দেখিয়া কেবল মাত্র কহিলেন, "২০।১, রূপনারায়ণ নন্দন লেনে বাবা আছেন।" কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না—বলিলেন, 'তোমার ইচ্ছা হয়

---

* সম্প্রতি ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

যাইয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পার, ইহাতে আমার সমভিব্যাহারের আবশ্যকতা কি?" এই দিন সময়াভাবে যাইতে না পারায় তৎপরদিবস অপরাহ্নে আমি একাকীই যাইয়া আশ্রমের নিয়মানুসারে অনুমতি লইয়া উপরে উঠিয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রণাম করি ও কিছুকাল থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া বাবার প্রদত্ত পান প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন মাত্রই আমার বিশেষ ভাল লাগিল এবং আমার মন শ্রীচরণে নত হইয়া পড়িল। কিন্তু আশ্রমের নিয়মানুসারে অধিকক্ষণ না থাকিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পরদিন পুনরায় যাইয়া প্রণাম করিয়া দীক্ষা লাভের জন্য প্রার্থনা করিলাম। বাবা বলিলেন, "কুলপ্রথা অনুসারে তোমার একবার দীক্ষা হইয়াছে বুঝিতেছি।" আমিও ইহা স্বীকার করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট দীক্ষা-প্রার্থী হই। বাবা কহিলেন, "অনুমতি আসিলেই দীক্ষা হইবে।" এই দিন হইতে শ্রীচরণ দর্শন করিবার অনুমতি লইয়া প্রায় প্রত্যহই আশ্রমে যাইয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিতাম। প্রায় একমাস পরে বাবা কহিলেন, "অনুমতি আসিয়াছে—আগামী ১০ই ভাদ্র (১৩৩৫ সাল) তোমার ও তোমার স্ত্রীর দীক্ষার দিন স্থির হইয়াছে।" বাবার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম এবং বাটী ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিয়া পরমানন্দ ভোগ করিলাম।

১০ই ভাদ্র ১৩৩৫ সালে আমার ও আমার স্ত্রীর দীক্ষা সম্পন্ন হইল এবং আমরা উভয়েই এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি অনুভব করিলাম।

দীক্ষার দিন হইতেই শ্রীগুরুদেবের যে সব অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার কতকগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। শ্রীগুরুদেব দীক্ষার সময় আমার স্ত্রীকে যে একটি মাদুলী ধারণ করিতে দেন তাহা আমার স্ত্রী দীক্ষার দিনই বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া হারাইয়া ফেলে এবং এই ঘটনায় বিশেষ কাতর হইয়া পড়ে। সমস্ত দিন কান্নাকাটিতে কাটাইয়া রাত্রিকালে মর্ম্মাহত অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে। পর দিবস অতি প্রত্যুষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ বেগে শয্যাত্যাগ করিয়াই ঘরের বাহিরে যাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মাদুলীটি হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করে ও আমাকে দেখাইয়া কহে—"স্বপ্নে বাবা আমাকে ছাদ হইতে মাদুলীটি আনিতে আদেশ করায় আমি ছাদে যাইয়াই এই মাদুলীটি পাইলাম।" পূর্ব্ব দিবস ঐ ছাদ ও অন্যান্য জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আমরা কেহ উহা পাই নাই।

২। সন ১৩৩৫ সালের ৺পূজার ছুটীতে আমি ও আমার স্ত্রী ৺কাশী আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ প্রান্তে ছিলাম। ৺পূজার পরেই বাবার সহিত আমি, আমার স্ত্রী ও অন্যান্য গুরুভাই ভগিনী অনেকে নৈমিষারণ্যে তীর্থ-ভ্রমণে যাই। লক্ষ্ণৌ হইতে প্রাতে রওনা হইয়া আন্দাজ দুপুর বার টার সময় নৈমিষারণ্যে পৌঁছি। রাস্তায় অত্যন্ত ধূলা থাকায় বাবার শ্রীচরণে অধিক ধূলা লাগে। নৈমিষারণ্যে পৌঁছিয়াই বাবার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া তাঁহার ব্যবহারের গামছা দ্বারা শ্রীচরণ মুছিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে দেব দেবী মুনি ঋষিদের আশ্রম পরিদর্শনের পর একটি গাছের তলায় বাবার উপবেশনের

আসন করিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় শ্রীচরণ ধৌত করিয়া উক্ত গামছাখানির দ্বারা পুছাইতে যাইবার ইচ্ছায় গামছাখানির তল্লাস করিয়া পাওয়া না যাওয়ায় একখানি গাত্রবস্ত্র দ্বারা বাবার শ্রীচরণ পুছিয়া দেওয়া হয়। গামছাখানি অনেক অনুসন্ধানেও না পাওয়াতে আমরা সকলে বিশেষ ব্যস্ত ও ত্রস্ত হই। বাবার ভোগপ্রসাদ পাইয়া সকলেই ঐ দিবস যাত্রা করিয়া পুনরায় লক্ষ্ণৌর বাসা বাড়ীতে উপনীত হই। সেখানে বাবার ঘর খুলিয়াই দেখি যে তাঁহার শ্রীচরণের ধুলাযুক্ত ঐ হারান গামছাখানি ঘরেই রহিয়াছে। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাবাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "এরূপ হয় গো।"

৩। ১৩৩৬ সালের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে বাবা ২০।১, রূপনারায়ণ নন্দন লেনের আশ্রমে ছিলেন। আমি প্রায়ই প্রতি রবিবারে বেলফুলের মালা লইয়া প্রাতে শ্রীচরণ দর্শনে যাইতাম। এক-দিন শ্রীচরণে অর্পিত একগাছি বেলফুলের মালা লইয়া বলিলেন, "৺কুমারী মাতাদের ভোগ দেওয়ায় স্বীকৃত হইলে এই বেলফুলের মালাটি এখনই বহুমূল্য মুক্তামালায় পরিণত করা যায়।" উপস্থিত গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সকলেই চুপ থাকায় বাবা দয়াপরবশ হইয়া আমাদের মঙ্গলার্থে ও শিক্ষার্থে উক্ত মালা হইতে একটী ফুল লইয়া তাহাকে একটি অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল মুক্তায় পরিণত করিলেন। মুক্তাটির নির্ম্মাণ কালে এবং কাঠিন্য ভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বে জনৈক গুরুভ্রাতা ইহা স্পর্শ করায় মুক্তাটির আকৃতি একটু খারাপ হয়। ইহাতে বাবা উক্ত নির্ম্মিত মুক্তাটির উপরের স্তরটি উঠাইয়া দেন। মুক্তাটি বিশেষ সুগোল ও উজ্জ্বল হইয়াছিল। এই মুক্তাটি এখনও গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র বসুর নিকট আছে। উক্ত স্তরের কিয়দংশ আমার কাছেও আছে।

৪। একদিন রবিবার প্রাতে যখন আমি, যোগেশদাদা, অরুণদাদা জানকীদাদা, রজনীদাদা, নরেনদাদা প্রভৃতি কতিপয় গুরুভাই রূপনারায়ণ নন্দন লেনে আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত ছিলাম এবং বাবা নানাবিধ সৎকথা দ্বারা আমাদিগকে নানারূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন, তখন কথায় কথায় কহিলেন—"বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উক্তি অতি সত্য।" এই বলিয়াই বাবা অরুণদাদাকে একটু গঙ্গাজল আনিতে অদেশ করেন। অরুণদাদা বাবার ঘর হইতে গঙ্গাজল আনিয়া বাবাকে প্রদান করিলে বাবা পরিহিত বস্ত্রখানি নাভিদেশ হইতে একটু নিম্নে সরাইয়া উক্ত গঙ্গাজলে নাভি স্পর্শ করিয়াই নাভিটি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিলেন। নাভির মধ্য হইতে একটি অতি সুন্দর লাল দিব্য পদ্ম-গন্ধযুক্ত কমল বাহির হইল এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ঘরটি পদ্ম-গন্ধে আমোদিত হইয়াছিল। এই সময় সমবেত গুরু-ভ্রাতারা সকলেই বিভোর হইয়া অশ্রুপাত করায় বাবা হাসিয়া সাদরে কহিলেন. "কান্না কিসের গো? আরও অধিক বহির্গত করিলে দেখিয়া তোমরা সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে—সে তেজ সহ্য করিবার যোগ্যতা এখনও তোমাদের হয় নাই।" এই বলিয়াই উক্ত কমলটি সঙ্কুচিত করিয়া নাভিদেশে পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক করিলেন।

৫। বাবা সূর্য্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সকল ঘটনা আমার সম্মুখে

দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে একটি আমি নিম্নে বর্ণনা করিতেছি :—

একদিন রবিবার প্রাতে কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সুগন্ধের কথা উঠে। বাবা কহিলেন, "এখন ফোকাস করিয়া উক্ত অঙ্গ-গন্ধের আরক নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। তোমরা কুমারী মাতাদের ভোগের দরুণ কিছু অর্থ সংগ্রহ কর।" উপস্থিত ভ্রাতাগণ মিলিয়া কুমারী মাতাদের ভোগ দেওয়া স্বীকার করিলে বাবা একটি নূতন খালি দুই আউন্স শিশি নীল কাগজে আবৃত করিয়া দুই কি তিন মিনিট রৌদ্র-তাপে রাখিয়া লেন্স দ্বারা চকিতে ফোকাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের আরকে শিশিটি পূর্ণ করিলেন। সমবেত গুরু-ভ্রাতারা প্রায় সকলেই এক ড্রাম নূতন ঔষধের শিশিতে করিয়া উহা নিলেন। এই আরক এখনও আমাদের অনেকের কাছে আছে।

৬। প্রয়াগে কুম্ভমেলা :—

সন ১৩৩৬ সালের বড় দিনের ছুটীতে, আমি যোগেশদাদা ও রায় সাহেব ননীদাদা ৺কাশীধামের আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া এলাহাবাদে যে বাটী বাবার জন্য ভাড়া করা হয় তাহার সবিশেষ বন্দোবস্তের জন্য এলাহাবাদে যাই। তথায় উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়া যখন সমস্ত গৃহগুলি দেখিয়া কোন্ ঘরখানি বাবার বাসোপযোগী হইবে ঠিক করিতেছিলাম সেই সময় এক অপূর্ব্ব দিব্য গন্ধ আমরা সকলেই পাই। বন্দোবস্তের পর সেই দিনই ৺কাশী আশ্রমে রাত্রিকালে পেঁছি। পরদিন প্রাতে বাবাকে বাটীটির বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেই বাবা শ্রীমুখে বলিলেন "বাড়ীটি ভালই হইয়াছে। তবে ত্রিতলের সিঁড়ি একটু খাড়াভাবের উঠিতে কষ্ট হইবে" ইত্যাদি। কহিয়া আমাদের চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়গুলি সবই বলিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের সহিত আমিও বাটীটি দেখিতেছিলাম।" উক্ত তীব্র গন্ধ যে বাবার উপস্থিতি-সূচক তাহা আমরা বেশ বুঝিলাম। পৌষ সংক্রান্তির সময় কুম্ভমেলায় স্নান ইত্যাদি হেতু যখন আমি ও আমার স্ত্রী উক্ত বাটীতে বাবার শ্রীচরণ সমীপে কয়েক দিবস অবস্থান করি তখন একদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুদেব আমার স্ত্রীকে গুণ্ডি তামাকের কণামাত্র তামাক হইতে একটি বিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্ফটিক এবং আমাদের গুরুভগিনী শান্তিদিদিকে একটি সুবর্ণের মটর প্রস্তুত করিয়া দেন। এই স্ফটিক আমার স্ত্রী গলায় ধারণ করিয়া আছে এবং সোনার মটরটিও শান্তিদিদির নিকট আছে। এই সময়ের আরও একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা এই ; একদিন প্রাতে বাবার সহিত আমি ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল গোপীনাথদাদা ত্রিবেণী-সঙ্গমের পূর্ব্বপারে ঝুঁসি নামক স্থানে মেলা উপলক্ষ্যে বহু সাধুমণ্ডলীর দর্শনে যাইতে যাইতে পথে এক জায়গায় ফোটো তোলার বন্দোবস্ত দেখি। বাবার সহিত আমরা উভয়ে একটি ফোটো রাখি এইরূপ ইচ্ছা বাবার শ্রীচরণে প্রকাশ করায় বাবা অনুমতি দিলেন। বাবাকে মধ্যে বসাইয়া আমি ও গোপীনাথদাদা উভয় বাবার শ্রীচরণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফোটোটি তোলাইলাম। সাধু-দর্শনের পর ফিরিবার সময় ফোটো-ওয়ালার নিকট হইতে ফোটোগ্রাফখানা পাইয়াই দেখি বাবার শিরোপরি স্পষ্ট অক্ষরে একটী প্রণব (ওঁ) অঙ্কিত হইয়াছে। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—কারণ

ফোটো তুলিবার সময় ব্যাক-গ্রাউণ্ডের চাদরে বা অন্য কোন স্থানে ওরূপ (ওঁ ছিল না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করায় বাবা কহিলেন,—"ফোটো তুলিবার সময় কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই ওরূপ (ওঁ) অঙ্কিত হইয়াছে।

৭। সন ১৩৩৭ সালের ১৫ই চৈত্র আমার ও অন্যান্য কয়েকটি গুরুভ্রাতাদের সমক্ষে যে একটি বিশেষ ঘটনা হয় তাহা বিবৃত করিতেছি ঃ—

কথা-প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, "জগতে সব বস্তু দেখিয়া তোমরা ঠিক বস্তু দেখিতেছ বলিয়া মনে কর, তাহা ঠিক নয়—এ সব প্রকৃতির বিকৃতি-ভাব।" এই বলিয়া একটি এলাইচের গুঁড়ার কোটা হইতে কিয়দংশ এলাইচের গুঁড়া হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ ইহাকে একটি গন্ধ-বিশিষ্ট চন্দন-বটিকায় পরিণত করিলেন এবং বলিলেন, "ইহা চন্দনবটিকাও নহে। এই দেখ, ইহা স্ফটিক।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে একটি উজ্জ্বল স্ফটিকে পরিণত করিলেন।

৮। সন ১৩৩৭ সাল ২২শে চৈত্র।

এই দিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৭নং কুণ্ড রোড ভবানীপুর গুরুভ্রাতা যোগেশদাদার বাটীতে বাবার অবস্থানকালে বাবা মৃত্যুর পরাবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—"সৎকর্ম্ম করিলে জীব স্বর্গে যায় এবং অসৎকর্ম্ম দ্বারা নরক ভোগ হয় এবং দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ কালে যমরাজ (ধর্ম্মরাজ) যুধিষ্ঠিরকে এক প্রকার পরম পবিত্র সুধাসম সন্দেশ খাইতে দেন (ইহা যমরাজের নিয়ম—সৎকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গারোহণের অধিকারীদের সকলকেই এইরূপ সন্দেশ দেন)। যমরাজ যেরূপ সন্দেশ এরূপ অধিকারীদের দেন তাহা বিজ্ঞান-বলে দেখান যায়।" বাবা এইরূপ বলিলে, সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলের আব্দারে প্রীত হইয়া তখনই কার্য্য আরম্ভ করিলেন—একটি পান-মসলাপূর্ণ কোটা আমার গাত্রের সিল্কের-চাদর দ্বারা আবৃত করিয়া উপস্থিত রায় বাহাদুর সুরেশ সিংহ দাদাকে হাতে ধরিয়া চাপিয়া রাখিতে বলিলেন। তদনন্তর বাবা নিজের বিছানার উপর একটি পানের কোটার উপর তিনবার আঘাত করিলেন এবং সুরেশদাদার হস্ত হইতে কোটাটি লইয়া সর্ব্ব সমক্ষে অতি স্পষ্ট ভাবে খুলিলেই কোটা-পূর্ণ উৎকৃষ্ট সন্দেশ দেখা গেল। ইহা আমরা সকলে বাবার অনুমতিক্রমে খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। এইরূপ বস্তু আমরা পূর্ব্বে কখনও খাই নাই। উহা অতীব সুগন্ধযুক্ত এবং অতিশয় সুস্বাদু ছিল।

৯। ৬ই বৈশাখ ১৩৩৮, উক্ত যোগেশদাদার বাটীতে ঘটনা ঃ—

এই দিন প্রাতে বাবা দুইটি প্রস্ফুটিত বেলফুল লইয়া আমার ও যোগেশদাদা প্রভৃতি অনেক গুরুভাইয়ের সম্মুখে নিমেষ মধ্যে উহাদিগকে ২টী উজ্জ্বল স্ফটিকে পরিণত করিয়া একটি আমার গাত্রে এবং অন্যটি যোগেশদাদার গাত্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। আমাদের গাত্রে স্ফটিক দুইটি প্রবেশিত হইলে উহা বেশ বুঝিলাম,—অনুভব এবং প্রত্যক্ষ করিলাম। এই স্ফটিক আমাদের দেহাভ্যন্তরে আছে। প্রবেশকালে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় নাই।

১০। সন ১৩৩৮ সাল বড় দিনের ছুটী ঃ—

এই সময়ে ৺কাশী আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ সমীপে অবস্থান কালে একদিন প্রাতে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে বুঝাইতে বাবা বলিলেন, "ত্রিজগৎ যোনি-পীঠ। প্রকৃতি হইতেই পুরুষের উদ্ভব হইয়া আবার এই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে প্রকৃতির ইচ্ছানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদির উৎপত্তি বা সৃষ্টি।" এইরূপ কহিতে কহিতে বাবা দক্ষিণ হস্তের তালু প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন তালুতে গাঢ় লাল বর্ণযুক্ত ঠিক যোনির আকৃতির একটি পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা হইতে প্রায় ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা একটি লিঙ্গ বহির্গত হইল এবং ঐ লিঙ্গটি পুনরায় যোনি-মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ সময় আমি, রায় সাহেব ননীদাদা ও জমিদার কুমার নৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দাদা উপস্থিত ছিলেন।

১১। বাবা কখনও সূর্য্য-বিজ্ঞানে, কখনও বায়ু-বিজ্ঞানে, কখনও ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে আমাদের সমগ্র গুরু-ভাইদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এবং শাস্ত্র-বাক্য ঋষিবাক্য প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা বাড়াইবার জন্য কতবার তুলা হইতে উজ্জ্বল হীরক, সামান্য একটু তাম্র-তার হইতে স্বুবর্ণের বলয়, যে-কোন পদার্থ হইতে সন্দেশ, স্ফটিক প্রভৃতি, আধুলা হইতে গিনি এবং জীব জন্তু সৃজন করিয়া দেখাইয়াছেন। সদ্‌গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই। সদ্‌গুরু শ্রীভগবানেরই প্রকট রূপ। স্নুতরাং শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা বর্ণনা করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। আমার ক্ষুদ্র জীবনে কয়েকটা দিনের লীলার কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণনা করিলাম। বাবার বহু সংখ্যক শিষ্য ও ভক্ত আছেন—তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনে তিনি অনন্তরূপে লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার কৃপায় যেন আমরা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে পারি, শ্রীচরণে ইহাই আমাদের একমাত্র ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীকেদার নাথ ভৌমিক।

শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এডভোকেট, আলীপুর, জর্জকোর্ট, ২৪ পরগনা

সন ১৩৩৪ সালের মধ্যভাগে আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের নিকট আমি প্রথম শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিষয় কিছু কিছু শুনি এবং তাহার কিছুদিন পরে "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ", প্রথমভাগ পুস্তকখানি পাঠ করি। পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হই, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি নাই ; আমি বরাবরই সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ-চিত্ত। একটা কথা কিন্তু মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম—যাঁহার বিষয়ে লেখা হইয়াছে তিনি বর্ত্তমান

রহিয়াছেন এবং কলিকাতাতেই আছেন (সে সময় শ্রীশ্রীগুরুদেব কলিকাতার আশ্রমে ছিলেন), যিনি লিখিতেছেন তিনি বহু ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি একজন উচ্চ-শিক্ষিত এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ। এই সব ভাবিয়া তাঁহাকে একবার দর্শন করিবার প্রবৃত্তি হইল। ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিতে গেলাম। দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করার পরই তিনি যোগী সাধুর কথা পাড়িলেন এবং বলিলেন, "আবু পাহাড়ে অনেক যোগী আছেন।" আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তুমি ত আবু পাহাড়ে গিয়াছিলে, কোন যোগী দর্শন করিয়াছিলে ? আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। বস্তুতঃ আমি তাহার পূর্ব্ব বৎসর কয়েকজন বন্ধুর সহিত আবু পাহাড়ে গিয়াছিলাম এবং একটি যোগীর দর্শন পাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। ইহার পর আরও দুই একবার দর্শন করিতে যাইয়া আমার দীক্ষা লইবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমাদের কুল-গুরুর নিকট আমি বহুপূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। সেই মন্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে আমার মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়, তাহার মধ্যে দুই একটি অতি গুহ্য বিষয়। সেইগুলির একটা সমাধান না হইলে আমার পক্ষে পুনরায় দীক্ষা লওয়া সম্ভব হইবে না এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থায় একদিন উপস্থিত হইলাম এবং নির্জ্জনে কিছু কথা বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, কাল বেলা ১২টার সময় আসিও, সে সময় কেহ থাকে না, তখন বলিতে পার।" আমি "যে আজ্ঞা" বলিলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "কি মুস্কিলে পড়িলাম, বেলা ১২টার সময় ত কাছারী যাইতে হইবে, মক্কেলের মোকদ্দমা চলিতেছে। কি করিয়া আসিব ?" কিছু প্রকাশ করিলাম না। একটু পরে মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমার ঐ সময়ে কি অসুবিধা হইবে ? তা এখনও বলিতে পার। এই ঘরে এস" বলিয়া আমাকে একটি নির্জন ঘরে লইয়া যাইলেন। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমার সমস্ত প্রশ্ন এবং অতি গুহ্যতর বিষয় পর্যন্ত স্বয়ং বলিতে লাগিলেন। আমি অতিশয় স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম এবং শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা প্রার্থী হইলাম।

শ্রীশ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করিবার পর হইতে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে দেন না। দীক্ষিত হইবার পর আমি প্রায়ই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে কলিকাতার আশ্রমে যাইতাম, কিন্তু কোন সুযোগে তাঁহাকে কোন প্রকারে স্পর্শ করা ঘটিত না, এজন্য কয়েকদিন পরে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করার ইচ্ছা আমার একটু প্রবল হইল। এইরূপ ইচ্ছা লইয়া একদিন আশ্রমে যাইলাম, যাইয়া প্রণাম করিয়া বসিবার পর তিনি আমার করস্পর্শ করিয়া আমার হস্তে দুইবার পান প্রসাদ প্রদান করিলেন। এইরূপ পান-প্রসাদ তিনি দিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ করস্পর্শ করেন না এবং প্রসাদও একবারই দিয়া থাকেন। মানুষের আশা ক্রমশঃই বাড়ে। ইহার কিছুদিন পরে আমি মনে করিলাম, কোনও সুযোগে একদিন তাঁহার চরণ স্পর্শ

করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব, কিন্তু আমি জানিতাম কোনও ব্রাহ্মণ শিষ্য আমার সম্মুখে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি ঐ শিষ্যকে তাহা করিতে দেন নাই এবং বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি আমি আমার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে আদৌ সাহস করি নাই। তবে একদিন তাঁহাকে এইরূপ নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে তদ্বিষয়ে কতকটা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে আমি ও অন্যান্য কয়েকটি গুরুভ্রাতা আশ্রমে শ্রীগুরুদেবের নিকটে বসিয়া আছি এমন সময় তিনি বাল্যকালে তাঁহাকে যে কুকুরে কামড়াইয়াছিল সেই কথা উত্থাপন করিয়া "এই যে তাহার দাগ এখনও আছে—ঐ স্থানটা শক্ত হয়ে রয়েছে" এই কথা বলিয়া 'পা'-টি বাড়াইয়া দিলেন। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া চরণ স্পর্শ করিলাম এবং সেই স্থানটি হাত বুলাইয়া দেখিলাম।

আমার দীক্ষার একমাস পরে আমার পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা অনুসারে তাঁহাকে, আমার ভগিনীকে ও আমার স্ত্রীকে লইয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ও অন্যান্য তীর্থ দর্শনে যাই। প্রত্যাগমনকালে 8 Down-Delhi Express—ট্রেণ ধরিবার জন্য মথুরা ষ্টেশনে আসিয়া দেখি প্ল্যাটফর্ম প্যাসেঞ্জারে ভর্ত্তি—এমন কি দাঁড়াইবার স্থানাভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং ষ্টেশনে শুনিলাম তাহার পূর্ব্বদিনও অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল এবং দুইটি লোক ট্রেণ ও প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পড়িয়া নিহত হয়। বৃদ্ধা মাতা এবং স্ত্রীলোক লইয়া ঐরূপ ভিড়ে গাড়ীতে ওঠা সম্বন্ধে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ আসিল। ট্রেণ যাত্রীতে পরিপূর্ণ। আমি হতাশ হইলাম, যাত্রিগণ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল, আমি ঐ ট্রেনে আসিবার আশা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ট্রেন ষ্টেশনে থামিল, দেখিলাম ঠিক আমার সম্মুখে একটি ইণ্টার ক্লাস কামরা একেবারে খালি, অন্য সকল কামরাই ভর্ত্তি, যাত্রিগণ অন্যান্য কামরায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইহাতে কেহ উঠিতেছে না। আমিও প্রথমে ঐ কামরায় উঠি নাই; মনে করিলাম ঐ কামরাটি বোধ হয় 'রিজার্ভড'—ভাল করিয়া দেখিলাম কোন লেবেল নাই, তখন আমরা ঐ গাড়ীতে উঠিলাম, এবং আমার যতদূর মনে আছে ঐ গাড়ীতে আর দু চারিটি যাত্রী ছাড়া কেহ প্রবেশ করেন নাই এবং আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে আসিয়াছিলাম। ঐ ষ্টেশনে যখন হতাশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেই সময় শ্রীশ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিতেছিলাম এবং একটি অতি সুন্দর গন্ধ পাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের গাত্রে ঐরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। ইহা পরে বুঝিলাম, তখন জানিতাম না। ষ্টেশনে শত শত লোক পড়িয়াছিলেন, গাড়ীতে উঠিতে পারেন নাই এবং ট্রেনের অন্যান্য কামরায় অতিশয় ভিড় ছিল। কেহ কেহ ইহা আকস্মিক (Accidental) মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা করি নাই।

সন ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের প্রথমে আমার স্ত্রী ও কন্যা (ইহারা উভয়েই শ্রীগুরুদেবের দ্বারা দীক্ষিত) কলিকাতা আশ্রমে শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে যায়। আমার কন্যার একটি আড়াই বৎসরের পুত্র তাহার সঙ্গে ছিল।

শ্রীগুরুদেব ঐ ছেলেটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উহাদের নিকট এই গল্পটি বলেন যে, তিনি এক সময়ে তাঁহার অন্য এক শিষ্যাকে তাহার এক শিশুপুত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরলোক গমন করিবে এইরূপ বলেন ; এবং পরে সত্যই ঐ শিশুটি মৃত হয় এবং তাহাতে তাহার জননী বিশেষ অভিভূত হয় না। বরং গুরুবাক্য সত্য হইয়াছে বলিয়া ঐ শিষ্যাটি শ্রীগুরুদেবের নিকট সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। পরীক্ষার জন্য এরূপ হইয়া থাকে, আবার ফিরিয়া পায়। ঐ শিষ্যার তাহার পর যমজ দুইটি পুত্র হইয়াছে এবং সেই ছেলে দুটি এখন বেশ সুস্থ এবং শিক্ষিত হইয়া জীবিত আছে। শ্রীগুরুদেবের মুখে ঐরূপ ভাবে ঐ কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী ও কন্যা একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। উহার অল্পদিন পরে হঠাৎ অসুখ হইয়া আমার কন্যার ঐ পুত্রটি পরলোক গমন করিল। ঐ সময় শ্রীগুরুদেব ৺কাশীধামের আশ্রমে ছিলেন। আমার কন্যা ইহার পর শ্রীগুরুদেবকে বলিয়াছিল, "আপনি কি আমাকে এই জন্যই ঐ গল্পটি শুনাইয়াছিলেন ?" তিনি একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র। সন ১৩৩৮ সালের ভাদ্রমাসে আমার কন্যাটির একটি পুত্র হইয়াছে এবং অনেকেই বলেন এই ছেলেটির আকৃতি ঐ পূর্ব্ব ছেলেটির মত হইয়াছে।

অনেক সময়ে মনে কোন বিষয়ে আন্দোলন করিতে করিতে তাহার সমাধান করিতে না পারিয়া আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু শ্রীগুরুদেবকে তদ্বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং ঐ বিষয়ের কথা উত্থাপন করিয়া আমার সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আমি সাংসারিক ব্যাপারে বহু টাকার ঋণগ্রস্ত ছিলাম, কিন্তু এ বিষয়ে আমি বা আমার ভ্রাতারা কেহ কখনও শ্রীগুরুদেবের নিকট কিছু প্রকাশ করি নাই। কিন্তু তিনি অনেক সময় আমাকে লক্ষ্য করিয়া "ঋণ মহাপাপ, উহাতে মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে নষ্ট হইতে হয়, যেমন করে হোক মানুষের ঋণমুক্ত হওয়া উচিত" ইত্যাদি বাক্য বলিতেন। ইহা সর্ব্ব সমক্ষে সাধারণ ভাবেই বলিতেন, কিন্তু আমি ইহার সার্থকতা বিশেষ করিয়া বুঝিতাম। পরে কোন প্রকারে ঋণমুক্ত হইয়া তাঁহার কাছে ঐ বিষয়ে প্রকাশ করি।

সন ১৩৩৬ সালে রথের সময় আমি, আমার দুই সহোদর এবং অন্যান্য কয়েকজন গুরুভ্রাতা শ্রীগুরুদেবের সহিত ৺পুরীধামে গিয়াছিলাম। সেখানে যখন উপস্থিত হই, তখন হাওয়া একেবারে বন্ধ, অত্যন্ত গুমট, গরমে সকলের অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। আশ্রমে পৌঁছিয়াই শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিজ কুটিরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "হাওয়ার ব্যবস্থা করা গেল, তবে তারগুলি পুরাণ হইয়া গিয়াছে, ভেঙ্গে গেল। যাই হ'ক, এখন পাঁচদিন ত' হাওয়া চলবেই। তার পরে না হয় আবার ব্যবস্থা করা যাবে।" এই বলিয়া কতকগুলি সরু ভাঙ্গা তার আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন. তাহার একটু পর হইতেই খুব হাওয়া চলিতে লাগিল। আমি ঐ সময় তিন দিন সেখানে ছিলাম এবং তিনদিনই বেশ হাওয়া ছিল।

ঐ সনের ভাদ্র মাসে একদিন কলিকাতার আশ্রমে মধ্যাহ্নে দশ বার জন

গুরুভ্রাতা শ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া আছি, যোগ-সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা হইতেছিল। শ্রীগুরুদেব এক সময়ে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদাকে কৃপা করিয়া নাভি-পদ্ম দর্শন করাইয়াছিলেন, এই বিষয়ের উত্থাপন হইলে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নাভি-পদ্ম দর্শন করিবার প্রার্থনা করিলে বাবা কৃপা করিয়া আমাদের সকলকেই নাভি-পদ্ম দর্শন করাইয়াছিলেন। নিজ হস্ত দ্বারা নাভিমুখ বিকশিত করেন ও নাভিমধ্য হইতে রক্তবর্ণ অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ন্যায় দ্রব্য বাহির হয়, আমরা সকলে তাহা বেশ ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করি। তৎকালে ঐ স্থান হইতে অতি তীব্র পদ্ম-গন্ধ বাহির হইয়াছিল। সেই গন্ধে আমি সমস্ত দিন মুগ্ধ ও অভিভুত ছিলাম।

বহুবার বাবাকে তাঁহার নিজ গাত্র হইতে স্ফটিক বাহির করিতে এবং পুনরায় তাহা গাত্রের নানাস্থানে প্রবেশ করাইতে দেখিয়াছি। একবার একটি বাণলিঙ্গ শিব, গাত্র হইতে বাহির করিয়া আমার ও অন্যান্য গুরুভ্রাতার হস্তে অর্পণ করেন। আমরা তাহা দেখিবার পর পুনরায় তাহা তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করান। তিনি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার গাত্রে আমার সম্মুখে স্ফটিক প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। গুরুভ্রাতা ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তীর প্রার্থনা অনুসারে অনেক গুরুভ্রাতার সম্মুখে একটি অর্দ্ধ ফুটন্ত বেলফুলকে স্ফটিকে পরিণত করিয়া তাহা উক্ত গুরুভ্রাতার হস্তে প্রবেশ করাইয়াছেন। তাঁহাকে একটি লেন্সের সাহায্যে সূর্য্য রশ্মি হইতে নির্ম্মল ছিদ্রযুক্ত স্ফটিক প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি, সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম পুষ্পকে মুকুলে পরিণত করিতে, গোলাপ ফুলকে জবাফুলে পরিণত করিতে, কলিকা-ফুল হইতে শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিতে, পাথর-কুচি হইতে হীরক প্রস্তুত করিতে ও ঐ প্রকার বহু অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছি। একবার দুইটি ছিপি-আঁটা এক ড্রাম কাচের শিশিতে লেন্স সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি হইতে আতর প্রস্তুত করেন—আমার নিকট সেই আতর এখনও কিছু আছে। বহুবার সূর্য্যরশ্মি হইতে সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়াছেন। ১৩৩৭ সালের শারদীয়া পূজার বিজয়ার দিন ৺কাশীধাম আশ্রমে এক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত সন্দেশ চন্দ্ররশ্মি হইতে প্রস্তুত করেন। অনেক গুরুভ্রাতা ও ভগিনী তাহা প্রসাদ পাইয়াছিলেন। আমি কিছু সন্দেশ কলিকাতায় আমার ভ্রাতাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ১৩৩৮ সালের শারদীয়া পূজার ছুটীতে কলিকাতার কোনও কলেজের অধ্যক্ষ একজন খ্যাতনামা ভদ্রলোক কাশীধামের আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে কয়েকদিন গিয়াছিলেন; একদিন তিনি তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যাকে লইয়া যান—ছোট কন্যাটি সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবার জন্য বাবাকে অনুরোধ করেন। আমার মনে হইয়াছিল কন্যাটি তাহার মাতার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াই এইরূপ অনুরোধ করে; শ্রীগুরুদেব সাধারণতঃ শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট এরূপ কিছু করেন না, কিন্তু ছোট বালিকাটির অনুরোধে একটি খালি টিনের কৌটা বালিকাটির হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এই কৌটা তুমি হাতের ভিতর ধরিয়া থাক এবং একটি সিল্কের চাদর তোমার হাতে চাপা দাও।" বালিকটি তাহাই করিল তাহার পিতা তাঁহার

নিজ সিল্ক চাদরখানি কন্যার হস্তে চাপা দিলেন ; শ্রীগুরুদেব আপন আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া বালিকার দুই তিন হস্ত দূর হইতে হস্তের দ্বারা একটু শব্দ করিলেন এবং বালিকাকে বলিলেন, "কৌটা খুলিয়া দেখ।" বালিকা কৌটা খুলিল, দেখা গেল কৌটা সুগন্ধযুক্ত সন্দেশে পরিপূর্ণ। বালিকাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "শব্দ করিতেই আমার হাতে ভার বোধ হইল এবং একটু গরম বোধ করিলাম।" এই সময় আমরা অনেক গুরুভ্রাতা এবং বাহিরের কতকলোকও উপস্থিত ছিলাম। এরূপ ভাবে সন্দেশ প্রস্তুত করিতে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।

১৩৩৭ সালে বারুণীর দিন আমি, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত জানকী নথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিষ্ঠ শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলাম। স্নান করিয়া শ্রীগুরুদেব জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতেছিলন এবং আমরা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ছিলাম। তর্পণান্তে জানু পর্য্যন্ত জলে থাকিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "গঙ্গাস্নানে ময়লা চলিয়া যায়, এই দেখ কাপড়ের রং উঠিয়া গেল।" শ্রীশ্রীগুরুদেব একখানি গৈরিক রঙ্গের ছোপান কাপড় পরিয়া স্নান করিতেছিলেন। আমরা দেখিলাল সেই সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত কাপড় জলের মধ্যে ছিল তাহার রং উঠিয়া গিয়া কাপড়ের সেই অংশ একবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন, "কাপড়ের রংটা বোধহয় কাঁচা ছিল, তাই উঠিয়া গেল।" শ্রীগুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাগো তাই বটে, রং ত সবই কাঁচা, কি বল গো।" তাহার পর শ্রীগুরদেব সেই কাপড় পরিবর্ত্তন করিলেন এবং গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফণিভুষণদাদা সেই কাপড়খানি পরিস্কার করিয়া কাচিবার জন্য পুনরায় গঙ্গার জলে লইয়া গেলেন এবং কাপড়খানার যে অংশের রং উঠে নাই তাহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রং আর উঠিল না, অর্দ্ধেক সাদা অবস্থায় এবং অর্দ্ধেক পূর্ব্ববৎ গৈরিক-রং-যুক্ত রহিল।

সন ১৩৩৮ সালে শারদীয়া পুজার ছুটীতে ৺কাশীধামের আশ্রমে আমি ও আর কয়েকজন গুরুভ্রাতা বাবার সম্মুখে বসিয়াছিলাম, তিন চারিটি কুমারী বাবার সহিত নানাপ্রকার আদর আবদার করিতেছিল এবং পানের মশলার টিনের খালি কৌটা লইয়া তাহারা পরস্পর কাড়াকাড়ি করিতেছিল। শ্রীগুরুদেব একটি কুমারীকে বলিলেন, "ও কৌটা লইয়া কি করিবে, তোকে আমি একটা ভাল কৌটা দিব।" এই বলিরা হাতটি মুঠা করিয়া তৎক্ষণাৎ হাত খুলিয়া দিলেন। দেখিলাম হাতে একটি কাঠের রঙ্গীন কৌটা রহিয়াছে ; উহাতে 'পতি পরম গুরু' লেখা আছে। কৌটাটি ঐ কুমারীকে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, কৌটাটি কি প্রস্তুত করিলেন, না অন্য কোথাও হইতে আনিলেন ?" বাবা উত্তর করিলেন, "আনিলাম।" ঐ কৌটাটি ঐখানে অনেক দিন ছিল, আমি দেখিয়াছি। একবার একটি লিলি অব্ দি ভ্যালী' নামক এসেন্সের শিশি ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য এক শিষ্য আনিয়া দেন, এসেন্সের শিশিটি কাঁচের ছিপি-আঁটা ও সম্পূর্ণ নূতন। শ্রীগুরুদেব

শিশিটি হাতে লইয়া বলিলেন, "ইহাতে এসেন্স অতি সামান্যই আছে, অ্যালকোহলেই ভর্ত্তি।" তাহার পর ঐ ছিপি-আঁটা শিশি হইতে এসেন্সটুকু বাহির করিয়া লইলেন, বলিলেন, "ইহতে আর এসেন্স নাই, মাত্র অ্যাল্কোহল্ আছে।" তাহার পর আমরা ঐ কাঁচের ছিপি খুলিলাম এবং দেখিলাম, এসেন্সের কোনও গন্ধ নাই, কেবল অ্যাল্কোহল্।

এরূপ অদ্ভুত ঘটনা যে কত দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করা যায় না। কয়েকটি মাত্র লিখিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিভুতি ও শক্তি যাঁহারা তাঁহার সমীপে গিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় সকলেই কিছু-না-কিছু অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিভুতি তাঁহার "দয়া"। তাঁহার দয়া যে কত তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নিকট নাই। তাঁহার নিকট একান্ত ও একমাত্র প্রার্থনা যেন তাঁহারই কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণে অচলা ভক্তি থাকে। ইতি—

শ্রীরজনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীজানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামবাজার, কলিকাতা।

১। আমি ৪৭ বৎসর বয়সে সন ১৩৩৫ সালের ৩২শে আষাঢ় তারিখে কেবল মাত্র বাবার অহেতুক কৃপা গুণে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় পাই অর্থাৎ দীক্ষিত হই। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে শিবাদহ পুলিশ কোর্টের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর (গুরু ভাই) মহাশয়ের নিকট বাবার চরিত্র-কথা শুনি। বাবার চরিত্র-কথা শুনিয়াই যে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একজন মহাপুরুষকে দর্শন করিতে হইবে এ ভাব আমার অবিশুদ্ধ চিত্ত বশতঃই হউক বা সুরেশদাদার কথায় বিশেষ শ্রদ্ধা স্থাপনের অভাবেই হউক, আমার উদয় হয় নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাদহ পুলিশ আদালতে মোক্তারি করায় এবং মাঝে মাঝে ঐ আদালতে ওকালতী করিতে যাওয়ায় আমি সুরেশদাদার সহিত পরম আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হই এবং সুরেশদাদা নিজ উচ্চ মহান্ চরিত্র-গুণে ভালবাসিয়া আমাদের কাছে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাবার কথা অনেক সময়ে বলিতেন এবং আমাকে শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইতে বলিতেন। এ সময়ে আমার চিত্তের অবস্থা অল্প কথায় লিখিতেছি। ইতি পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে, আমি আমাদের কুল-গুরু দ্বারা দীক্ষিত হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ ইত্যাদি করিতাম। ইহা যে আমার খুব প্রাণের জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া চলিতাম তাহা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বেশ দেবতুল্য সাধু মহাপুরুষ যথার্থ শ্রীভগবানের শ্রীচরণোদ্দেশী মহাজন পাইলে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য ভব-জ্বালা মিটাইব, প্রাণের এ

ভাবটা বেশ পরিস্ফুট ভাবে না হউক অস্পষ্ট ভাবে হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত ছিল। এই জন্য মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবের কথায় এধার ওধার ছুটাছুটি করিতাম এবং কখনও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে নিজ হৃদয়-ভাব লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টায় নিজ জ্ঞানবুদ্ধি মত পাঁচটা কথা-বার্ত্তা কহিতাম এবং নিজে নির্ব্বুদ্ধি পামর বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম। চিত্তের এরূপ অবস্থাতে একদিন শুভক্ষণে ২০নং রূপ নারায়ণ নন্দন লেনে (ভবানীপুরে) তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন ও প্রণাম করি ও তাঁহার অনুমত্যানুসারে তৎপ্রদত্ত পান-প্রসাদ গ্রহণ করি। যতদূর স্মরণ আছে বাবার শ্রীচরণ প্রান্তে প্রকাশদাদা, দুর্গাকান্তদাদা, যোগেশদাদা, বিধুদাদা, অরুণদাদা, প্রভৃতিকেও প্রথম দেখি। পূর্ব্বে যে সব জায়গায় গিয়াছিলাম তদপেক্ষা ঐ স্থান ভাল লাগিয়াছিল তবে মন প্রাণ-হরণকারীর আবাহনে আকৃষ্ট হওয়ার মত হয় নাই। ২।৪ মাসের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা হওয়ায় কখনও সুরেশদাদার সহিত এবং কখনও একাকী আরও কয়েকবার যাই—ক্রমশঃ ভাল লাগিতে আরম্ভ হয়। মনে মনে প্রায় সর্ব্বদাই নানা বিষয় আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলন করিতাম, বিড়ালের যেমন মাছে টান—কামাতুর পুরুষের যেমন নারীতে টান—দরিদ্রের যেমন অর্থে টান—জননীর যেমন শিশু-সন্তানে টান—বাবার চরণে আমার সেরূপ টান হচ্চে না কেন? ইনিই কি আমার তিনি? কই এখানে (আশ্রমে) বিশেষ প্রাণ-মাতানো ধর্ম্ম-চর্চ্চা ইত্যাদি ত পরিলক্ষিত হয় না—এটি বেশ একটি বড়লোক গুরু-শিষ্যের আশ্রম—আমার মত দরিদ্রের এখানে কি স্থান আছে ইত্যাদি চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইতাম। সুরেশদাদা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, "কেমন লাগছে দাদা?" হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিয়াই উত্তর দিতাম, "বেশ লাগছে। আমার ত ঠিক চক্ষু নাই যে দেখিয়া শ্রীচরণ চিনিব।" প্রশ্নের মতই জবাব দিতাম।

২। এইরূপ অবস্থায় দিন কাটাইতে কাটাইতে (অর্থাৎ দিবারাত্র অধিক সময়ই যখন বাবার শ্রীমূর্ত্তি মনে পড়িত তখন) একদিন শ্রীচরণ প্রান্তে পৌঁছিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলাম—আমি যে সন্ধ্যা আহ্নিক, জপ ইত্যাদি প্রতিদিন ঠিক নিয়মে করি নাই—ইহা কি আমার দোষ, না ইহাতে আরও কিছু আছে—এ কথাটি বাবাকে জিজ্ঞাসা করি না কেন? মনে মনেই ২।৩ মিনিট কাল এরূপ ভাবে চিন্তা করিতেছিলাম। এমন সময় দয়াল বাবা আমাদের স্বর্গীয় গুরুভাই শরচ্চন্দ্র খাঁকে—যিনি সে দিন সে সময় উপস্থিত ছিলেন—সম্বোধন করিয়া বেশ প্রাসঙ্গিক ভাবে পাঁচটা কথা কহিতে কহিতে বলিলেন,—"বিধবার যেমন একাদশী না করিলে পাপ—করিলে পুণ্য থাক আর না থাক, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিকাদি না করিলেও সেইরূপ পাপ—ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্মে অবহেলাতে পাপই হইয়া থাকে।" মনে মনে বেশ একটু স্তম্ভিত হইলাম এবং ইনি শক্তিশালী মহাপুরুষ হইতে পারেন এরূপও মনে হইল। শিরটি শ্রীচরণে মনে মনে নত করিলাম—কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইল না, আকস্মিক কিরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন (accidentaily) এই ভাব

আসিয়া জুটায় মিশ্রভাবে নরাধম সে দিনও পিতৃ-চরণে শরণাগত হইতে পারিল না।

৩। এ সময়ে আমি বাজারের কোন শাস্ত্রের পুস্তক কিছু কিছু পাঠ করিয়া ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ীর এবং ষট্‌চক্রের কোথায় স্থিতি anatomically possible তাহা চিন্তা করি এবং একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে মনে স্থির করি। সন ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে মধ্যাহ্নে একদিন যাইয়া শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হইয়া উপরোক্ত প্রশ্ন করিব কিনা মনে করিতেছিলাম। সে সময় ২।১ জন মাত্র লোক ছিল (নাম মনে নাই)। এমন সময় বাবা হাত-পোঁচা রুমালখানি লইয়া বিছানার উপর দুই একবার লম্বা ভাবে—বক্রভাবে বিস্তার করিতে করিতে আমার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখছ গো—ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ী কেমন ভাবে থাকে। এসব বাপু, বই পড়ে ঠিক বুঝা যায় না।" এমন সময় বেনারস্ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ দাদা (গুরু ভাই) —যিনি তখন গ্রীষ্মাবকাশে বাবার শ্রীচরণ দর্শনার্থে ভবানীপুর আশ্রমে ছিলেন —অন্য ঘর হইতে আসিয়া বাবাকে লাল-কাল রঙ্গে চিত্রিত একখানি ছোট কাগজ দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এখানি আমার কাছে ছিল—আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি।" তখন অন্য কথা পড়িয়া গেল। এ দিনেও আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কিন্তু নরাধম বলিয়া শ্রীচরণে কাঁদিয়া পড়িতে পারিলাম না—এটাও accidentally হইতে পারে ভাবিয়া লইলাম।

৪। বাবার কাছে প্রায়ই এরূপ ভাবে যাতায়াতে এবং তাঁহার স্বর্গীয় ব্যবহারে অনেকেই মনে করিতেন, আমি বাবার একজন শিষ্য; কিন্তু হতভাগ্যের তখনও সে শুভ দিন আসে নাই। ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠের মাঝে একদিন মধ্যাহ্নে শ্রীচরণে উপনীত হইয়া 'ভক্তি কাহাকে বলে'—'ভক্তি-প্রেমের উপর আর কিছু থাকিতে পারে না'—ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা হইল। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না বলিতে (এ দিন বাবা ও আমি ছিলাম —এ সময় আর কেহ থাকেন না) বাবা বলিলেন, "পূর্ব্বে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে শিষ্য গুরু সকাশে বার বৎসর থাকিয়া গুরুকে চিনিতে চেষ্টা করিত। যিনি সদ্‌গুরু তিনি ত শিষ্যকে একবার দেখিয়াই তার সব বুঝিয়া লয়েন, শিষ্যের ত গুরুকে ঠিক বুঝা চাই, নচেৎ হাবেভাবে পড়িয়া যেখানে সেখানে যাকে তাকে গুরু বলা ঠিক কি গো? গুরু ত একজন রে বাপু, যেখানে সেখানে যাকে তাকে গুরু বলা ঠিক নহে। মূল কথা বাপু, ভক্তি হওয়া চাই। ভক্তি কি যে-সে জিনিষ? ভক্তি যে প্রায় শেষের জিনিষ—এ ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে কর্ম্ম চাই।" এই বেদধ্বনি এই শুভদিনে জানকীর কর্ণকুহর পবিত্র করিল, আজ জানকী কাঁদিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিল, তবুও দীক্ষা-প্রার্থী হইল না। ক্রমশঃ ভিড় হইয়া গেল। জানকীও বহুক্ষণ থাকিয়া পরে বাড়ী ফিরিল।

৫। পরদিন প্রভাতে বাটীতে বিশেষ চিন্তা করিলাম, "কুল-গুরু ত্যাগ করছি না কি? এ কি ত্যাগ হবে না? একে কি ত্যাগ বলে না?" সিদ্ধান্ত করিলাম, "ইহাকে আমি ত্যাগ বলিতে পারি না।" এইরূপ চিন্তার পর এই দিন প্রভাতেই বাবার শ্রীচরণে ছুটিলাম, প্রণাম করিলাম, বাবার ভোগের পর বাবারই কাছে প্রসাদ চাহিলাম, বাবা বলিলেন, "হাঁ, প্রসাদ লইতে পার।" প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। এ দিনও জন্ম-জন্মান্তরের নরকে-পরা কঠিন-হৃদয় জানকী দীক্ষা-প্রার্থী না হইয়াই ফিরিয়া আসিল।

৬। পরদিন মধ্যাহ্নে নিজ কোষ্ঠী খানি (খেয়ালের ঝোঁকে) লইয়া শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইলাম। প্রণামান্তে কোষ্ঠীখানি বিছানায় স্থাপন করিবামাত্রই শ্রীমুখে কহিলেন (কোষ্ঠীখানি কাপড়ে বাঁধা) "কোষ্ঠী নাকি গো? জন্ম ত মঙ্গলবারে, বয়স ৪৭ বৎসর বোধ হয়। এ সব কোষ্ঠীতে ভূমিষ্ঠ সময় হইতে লগ্ন ইত্যাদি স্থির করা আছে। ইহাতে ঠিক গণনা হয় না। মাতা যখন গর্ভধারণ করেন তখন হইতেই লগ্ন ইত্যাদি ঠিক হইলে কোষ্ঠী ঠিক হয়।" কোষ্ঠীখানি লইয়া আর কথা কহিতে আদৌ ইচ্ছা না হওয়ায় উহা পকেটে রাখিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "বাবা দয়া করে একবার বাহিরে চলুন।" অধম সন্তান বলিবা মাত্রই বাবা মেয়েদের ঘরে ইজি-চেয়ারে বসিলেন, শ্রীচরণ দুইটি মাথায় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম। দয়াল তৎক্ষণাৎই কহিলেন, "এই মাসেই হইবে। ৺রথযাত্রায় পুরী যাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেই হইবে।" সন্তানকে অমৃত লাভের পথে চালিত করিবার জন্য কিছু আজ্ঞা করিয়া প্রতিপালন করিতে কহিলেন। ভবপারের কাণ্ডারী "কে যাবি রে আয় রে" বলে সন্তানকে কোলে লইতে কোল পাতিয়া আছেন, আর আমি তেঁদোড় সন্তান শুনি নাই। কেন এত দেরী করিলাম এই চিন্তা করিতে করিতে সে দিন বাটী ফিরিলাম।

৭। সুরেশদাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই 'শ্রীচরণে স্থান পাইব' এ কথা বলাতে তিনি এক মুখ হাসিয়া আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ঝাড়ে বংশে সবাই শ্রীচরণে স্থান পাইবে।" দাদার এ আশীর্ব্বাদ ফলিয়াছে। উপস্থিত আমরা তিন সহোদর—জানকীনাথ, রজনীকান্ত ও নরেন্দ্রনাথ—এবং আমাদের স্ব স্ব পত্নী এবং ভাইপো হরিহর সকলেই বাবার সন্তান-সন্ততি হইয়াছি। বাবা ৺রথযাত্রা দেখিয়া পুরী হইতে ভবানীপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ৩২শে আষাঢ় (সাল ১৩৩৫) দীক্ষার শুভ দিন ধার্য্য করিলেন এবং দীক্ষার আবশ্যকীয় দ্রব্যের একটি ফর্দ্দ করিয়া দিলেন। দীক্ষার ২।৩ দিন পূর্ব্বে কুল-গুরু বৎসরে যেমন একবার পদধূলি দেন সেইরূপ হঠাৎ আসিলেন। তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম, তিনি বিশেষ আহ্লাদের সহিত আমার মত সমর্থন করিয়া অনুমতি দিলেন। হৃদয়টি আমার বেশই নাচিয়া উঠিল। দীক্ষার পূর্ব্ব রাত্রে বৈঠকখানার ঘরে শয়ন করি। রাত্রি ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত নানা ভাবে নানা বিষয় চিন্তা করিতে থাকি—প্রধান চিন্তা এই ছিল, 'আমি যাহা চাই তাহা যদি না পাই তা হ'লে কি হবে।' আবার ভাবি, 'উনিই আমার তাহাই আমি তাহাই পাইব।' আবার ভাবি, 'আমার চিন্তা চিন্তাই নহে, উনি (বাবা)

যাহা দিবেন আমার তাহাই। আমি তাহাই শিরে লইয়া ধারণ করিব।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বেশ ঘুমাইয়া পড়ি এবং স্বপ্নে দেখি আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ স্পষ্ট ভাবে তিনবার ঘণ্টা ধ্বনি শুনিলাম। ঘুম ভাঙ্গিল, ঘণ্টা ধ্বনি কোথা হ'তে হইল অবিশুদ্ধ মন তাহা জানিতে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া উচ্চ-স্বরে মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলেরা কেহ ঘণ্টা লইয়া খেলিতেছে কি? তখন রাত্রি ১২টার উপর—আমাদের বাড়ীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর প্রতি প্রাণীই নিদ্রিত, কেহই ঘণ্টা বাজায় নাই। রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ী প্রভৃতি যাওয়ার সময় গো বা মহিষের গলায় বাঁধা ঘণ্টা নড়িবার শব্দ কি না এটিরও প্রমাণ লইতে রাস্তায় বাহির হইয়া চারিদিকে পাঁচ সাত বিঘা জমি দূর পর্য্যন্ত যতটা দৃষ্টি যাইতে পারে দেখিলাম, কোন দিকে কোন গাড়ী নাই। গরুর গাড়ী হইলে চাকার খড়খড় শব্দ থাকবে ত? কিন্তু সে সব কিছুই নাই। পুনরায় আসিয়া শয়ন করিলাম, বাবারই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি ৪টার সময় তুলিয়া দিবার জন্য বাড়ীর সকলকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম। ৪টার সময় আপনা-আপনি ঘুম ভাঙিয়া গেল. কাহাকেও তুলিয়া দিতে হয় নাই। ঘুম ভাঙ্গিতেই ঘড়িতে ৪টা বাজিল। গঙ্গা স্নানাদি করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে পৌঁছিয়া যথা সময়ে শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইতেই দয়াল বাবা আমার ভবপারের একমাত্র কান্ডারী শ্রীগুরু শ্রীহরি সন্তানকে শ্রীচরণে চিরকালের জন্য স্থান দিয়া ত্রাণ করিলেন—আমার সবই মিলিয়া গেল।

৮। দীক্ষার পর মধ্যে মধ্যে অবকাশ অনুসারে বেলা ৩টা বা ৪টার সময় কোর্টের ফেরত বাড়ী না যাইয়া ভবানীপুর আশ্রমে বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া বাড়ী যাইতাম। একদিন কোর্টের ফেরত অপরাহ্ন প্রায় ৪টার সময় ট্রামে চাড়বার সময় ভাবিতেছিলাম ভবানীপুরের দিকে যাইয়া আশ্রমে বাবাকে দর্শন করিয়া বাড়ী যাইব, কি সিধে শ্যামবাজারের ট্রামে চড়িয়া বাড়ী যাইব। ভাবিবার কারণ এত অপরাহ্নে যাইয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন হয়ত পাইব না, কারণ বাবা ৫টার সময় একটু মোটরে বেড়াতে বাহির হন। এরূপ চিন্তার পর সিধে বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্যেই শ্যামবাজারের ট্রামে চড়িলাম। ট্রামে বসিয়া ক্রমাগত এই ভাবিতে থাকি, কই আমার চিত্ত বাবার শ্রীচরণের দিকে ত নয়—মুখে বলি তিনি আমার, চিত্ত ত ঠিক তাহা নয়। যাহাদের অর্থাৎ যে ঘর বাড়ী স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে আপনার ভাবি সেই দিকেই চলিতেছি। চিন্তা করিতে করিতে বেশ মনে মনে লজ্জা ও বিষাদ উপস্থিত হইল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ১০।১৫ মিনিট ট্রামে আসিতে আসিতে ট্রামখানি যখন প্রায় কর্ণওয়ালিস থিয়েটার বায়স্কোপের কাছে আসিয়াছে (এ রাস্তাটায় যখন ট্রাম আসে তখন রাস্তার দিকে আমার আদৌ দৃষ্টি ছিল না) মানস চক্ষে হঠাৎ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—বাবা যেন একখানি কালরঙ্গের মটরে উপবিষ্ট এবং মটরখানি অতি দ্রুত বেগে রসা রোড দিয়া চলিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে নাসা-রন্ধ্রে দিব্য গন্ধ পাইলাম। উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাইলাম,

কাহাকেও কিছু বলি নাই। ঠিক এই দিন এই সময় প্রায় ৪॥০ টার সময় বাবা অরুণ দাদার সহিত রসা রোড দিয়া মটরে গড়ের মাঠ পরিভ্রমণ হেতু যাইবার কালীন অরুণ দাদাকে কহিয়াছিলেন, জানকী ট্রামে (ভবানীপুরের দিকে কালীঘাটের ট্রামে) যাচ্ছে—অরুণদাদাও আমাকে দেখিয়াছিলেন। পরদিন অপরাহ্নে আশ্রমে যাইয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিলে দয়াল সন্তানকে দেখিবা মাত্রই কহিলেন, "কাল ট্রামে যাচ্ছিলে না গো?" কি যেন হইয়া যাইলাম—মুখে বাক্য সরিল না। বাবার শ্রীচরণ-গত প্রাণযুক্ত পুত্র হইলে আমার সেই দিন সেই সময়েই শ্রীচরণে চিরশান্তি পাইবার কথা, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম-সংস্কারে মলিন পাষাণ হৃদয় ফাটিয়া না যাইয়া আজও সংসারের ঘূর্ণিপাকে বেশ ঘুরিতেছি। চক্ষে এক আধ ফোঁটা জল মাত্র পড়িলেও পড়িয়া থাকিবে। আশ্রমে আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দয়াল বাবা যোগেশ দাদা প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, "গত কল্য জানকীকে ট্রামে দেখিয়াছি এবং অরুণকেও দেখাইয়াছি।"

৯। শুভ ৯ই শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল ৺রথযাত্রা কালে বাবা যখন পুরী আশ্রমে ছিলেন বেলা ১১টা বা ১১।০ টার সময় তিনি ৮।১০ জন ৺কুমারী মাতাদের লইয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন। এ সময় কুঞ্জদাদা, দুর্গাকান্তদাদা, প্রকাশদাদা, বিজয়দাদা এবং অন্যান্য গুরু ভাইগণ বাবার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় বাবা পুরীধামের গুরু ভাই সুরেন চক্রবর্তীদাদার কন্যা ভিক্টু মাতাকে সূর্য্য-বিজ্ঞানে একগাছি অপূর্ব্ব খাঁটি সোনার হাঙ্গর-মুখো রুলি (ঠিক ভিক্টু মাতার হাতের মাপের) ১ কি ২ মিনিট মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ইহা আমরা চক্ষে দেখিয়া শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলাম। ইহার প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে বাবা যখন পুরী আশ্রমে ছিলেন তখনও ভিক্টু মাতাকে ঠিক ঐরূপ একগাছি রুলি সূর্য্য-বিজ্ঞানেই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।* ভিক্টু মাতার হস্তে ধারণ করিবার জন্য আজ ১ জোড়া অপূর্ব্ব খাঁটি সোনার রুলি হইল—আমরা সকলে দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম।

১০। গত ৩রা চৈত্র ১৩৩৭ সাল বারুণীর দিন বাবার সহিত আমরা অর্থাৎ ইন্দু মুখোপাধ্যায়দাদা, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়দাদা, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়দাদা, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দাদা, কেদার ভৌমিকদাদা, ফণিভূষণ মজুমদারদাদা, বিজয় গোপালদাদা ও অধম (জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

---

* এক টুকরা নীলরঙ্গের কাগজে বাবা একটু তুলা রাখেন এবং এই কাগজ ও তুলার মধ্যে ভিক্টু মাতার হাতের মাপের গোলাকৃতি তামার সূক্ষ্ম তার স্থাপন করেন। বাবার আজ্ঞায় কুঞ্জদাদা বাবার একটি লেন্সের সাহায্যে একটু দূরে থেকে এই তুলার উপর একটু রৌদ্র ফেলেন। ১/২ মিনিট কাল পরেই রুলি নির্ম্মিত হয়। বাবা ৺পুরী আশ্রমের উপরের বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে বসিয়া ইহা করিয়াছিলেন। কাগজ তুলা প্রভৃতি চেয়ারের এক পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রাতে কলিকাতা বাবু-ঘাটে গঙ্গাস্নান করি। বাবা স্নান করিতেছেন এবং আমরাও সকলে বাবার প্রায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া স্নান করিতেছি, এমন সময় পদ্মগন্ধ ভরিয়া উঠিল—মনে হইল যেন পদ্মগন্ধযুক্ত গঙ্গাজলেই স্নান করিতেছি এবং বাবার গৈরিক রঙ্গের বস্ত্র (যাহা পরিধান করিয়া বাবা স্নান করিতেছিলেন) সাদা ধপ-ধপে হইয়া গেল। বাবা স্নানান্তে যখন এই বস্ত্র ত্যাগ করেন যেন ডান দিকের কসির বস্ত্রের (যাহা গোঁজা ছিল) সামান্য জায়গায় সাবেক গৈরিক রং ছিল। ফণি মজুমদারদাদা কহিলেন, "রংটি বোধ হয় কাঁচা ছিল তাই এরূপ উঠিয়া গেল—কসির কাপড়ে রং উঠে নাই, ভাল করিয়া কাচিয়া উঠাইয়া আনি।" এই বলিয়া ফণি মজুমদারদাদা অনেকক্ষণ ধরিয়া কাচিয়া রং তুলিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সাবেক ঘোর গৈরিক রং (কসির কাপড়ের) দেখাইলেন। বাবা ঘটী হইতে একটু গঙ্গাজল ঢালিয়া ঐ রং-যুক্ত কাপড়ের অংশটুকুতে ঢালিলেন এবং ফণিদাদা এক কি দুই-বার রগড়াতেই উহাও ধপধপে সাদা হইল। সমস্ত কাপড়খানি দুগ্ধের মত সাদা হইল। বাবা হাসিয়া বলিলেন, ছেলেগুলোকে একটু দেখাইলাম।" বাবা আরও কহিলেন,—"মা এমনি করেই সন্তানের ময়লা ছাপ তুলিয়া দেন গো।" আমরা সকলে বাবার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম।

১১। ১৪ পৌষ সন ১৩৩৮ বুধবার কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী ইং ৩০।১২।৩১ বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে ৺কাশী আশ্রমে বিশুদ্ধানন্দ-কাননে বাবার শ্রীচরণ-প্রান্তে অবস্থান করিতেছিলাম। উপরোক্ত তারিখে তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্ত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অপরাহ্নে বেনারস এক্সপ্রেস ট্রেনে আমার কলিকাতায় আসিবার দিন। ঐ দিন প্রাতে আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতৃগণ—যথা রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায়দাদা, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষদাদা এবং শ্রীযুক্ত কেদার-নাথ ভৌমিকদাদা—আশ্রমের দৈনিক বাজার ইত্যাদি করিবার মানসে আশ্রমের বাহিরে যান। আশ্রমের অন্যান্য লোকজন—পূজক, ব্রাহ্মণ, রসুইকার ব্রাহ্মণ এবং পরমেশ্বর প্রভৃতি বাবার ভৃত্য ও সেবকগণ—সকলেই যাহার যাহার কার্য্যে যথা স্থানে নিযুক্ত থাকেন। এই বড় দিনের কয়েক দিবস বাবার শ্রীচরণ সমীপে অবস্থান কালে দেখিতাম—বাবা প্রত্যহ প্রাতে দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি স্থানে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য—কাঙ্গালি গরীবদিগকে পয়সা কড়ি দান—করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুক্ষণ নীচের গৃহে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সমবেত পুত্রকন্যাগণকে পান-প্রসাদ দানে এবং নানাবিধ অমৃতময় সদুপদেশ দ্বারা আনন্দিত করিয়া বেলা প্রায় ৮॥ টার সময়ে উপরে দ্বিতলে যাইতেন ও প্রায় ৯॥ টার সময় নীচে নামিয়া আপন আসনে বসিতেন। ঐ দিন বাবা যখন প্রাতে ৮॥ টার সময়উঠিলেন আমি তখন এই এক ঘন্টা সময়ের ভিতর ক্ষৌর-কার্য্য শেষ করিয়া কাপড় চোপড় ধৌত করিয়া লইব মনে করিয়া। পরিধানের বস্ত্র ও একটি গেঞ্জি কাচিয়া আশ্রমের গোপালগৃহের পূর্ব্ব দাওয়ায় উহা শুকাইতে দিয়া সেফটী রেজরে দাড়ি কামাইতে বসিলাম দাওয়ার উপর রৌদ্রে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া চক্ষু মুদিয়া দাড়ি কামাইতে কামাইতে ভাবিতে-ছিলাম, "আমি দাড়ি কামাইতেছি, এ সময় যদি বাবা সামনে আসিয়া পড়েন—

অপ্রস্তুত হইব।" এইরূপ ভাবিয়াই পরক্ষণে আবার ভাবিলাম, "আমার এরূপ ভাবনা হয় কেন? আমি কি আহাম্মক? বাবার কোনটি অগোচর আছে? দাড়ি কামান এমন কি কুকার্য্য যাহা বাবার সম্মুখে হইলে আমি লজ্জিত বা নিন্দিত হইব? আমি কত শত অন্যায় কার্য্য করিতেছি তাহা কি বাবার কাছে কিছু গোপন আছে? আমার এ ভাবটি ত ভাল নহে। বাবার চক্ষের আড়ালে কুকার্য্য কি সুকার্য্য করিয়া চলিয়া যাইব, বাবা জানিতে পারিবেন না, এ ত আমার চিত্তের বড় দুর্বলতা দেখ্‌ছি। বাবার কাছে আমার লুকাইবার কি আছে? আমি বাবার যোগ্য পুত্র হইব, সৎকার্য্য করিব, পুণ্য কার্য্য করিব—যোগ্যতা লাভ করিয়া বাবার শ্রীচরণ পাইব—এ আশা আমার দুরাশা। বাবা যদি কখনও নিজগুণে কৃপা করিয়া আমার সমস্ত দোষ-কলঙ্ক মুছাইয়া শ্রীচরণে টানিয়া লয়েন, তবেই আমার আশা—নচেৎ আমার মত সর্ব্ব দোষে দোষীর কোন আশাই নাই।" নিমেষের মধ্যে এইরূপ কত শত ভাবিতে ভাবিতে দাড়ি অর্দ্ধ-কামান হইয়াছে এমন সময় সম্মুখে শ্রীগুরুদেবের কণ্ঠস্বরে "কি গো, দাড়ি কামাচ্ছ" শুনিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখি সত্যই তিনি দাওয়ার নিম্নদেশে পুষ্প-প্রাঙ্গণে প্রস্ফুটিত গাঁদা ফুলের গাছগুলির মধ্যে স্থানটি আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান। ত্রস্ত হইয়া অর্দ্ধ কামান অবস্থায় ক্ষুরটি রাখিয়াই দাওয়া হইতে নামিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম। বাবা এক মিনিট কাল দাঁড়াইয়াই প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে প্রাচীরের গা দিয়া আশ্রম বাটী বেষ্টন করিয়া যে পথ আছে তাহা দিয়া আশ্রমাভ্যন্তরে বেড়াইতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিলাম। আমাকে চলিতে দেখিয়া বাবা দয়া-পরবশ হইয়া কহিলেন,—"কামাও গে গো।" আমি "না বাবা, থাক, পরে কামাইব" বলিয়া বাবার পিছু-পিছু চলিতে লাগিলাম এবং যেন কাহার প্রবর্ত্তনায় আমি বলিয়া ফেলিলাম, "আমি বেশ আছি বাবা—বেশ ভালই আছি। ঠিক ঠাওরাইয়া বলিতে না পারিলেও মনে হয়, সংসারের যথেষ্ট অভাব, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্যেও বেশ সুখ আছে। মনে হয় যেন সেটি অনেক সময় অনুভব করিতে পারি এবং অনেক সময় আরও মনে হয় যেন সর্ব্বদা আপনি সঙ্গে আছেন।"

দয়াল বাবা কহিলেন, "ক্রমশঃ প্রকাশ।" মুখে যখন এই কথা বলিতেছি চোরের মত চুপি-চুপি সঙ্গে সঙ্গে মনের সঙ্গেও কথা কহিতেছিলাম। 'বেশ মজা হইল ত', এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, "বাবার স্থূলদেহে অধীনের সম্মুখে প্রকাশ তাঁহার অনন্ত লীলার মধ্যে একটি লীলা হইতে পারে। তিনি একই সময়ে বহুস্থলে বহু শরীরে বহু জনের নিকট দয়া-পরবশ হইয়া আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু আমি যেরূপ নগণ্য ক্ষুদ্র ও অভক্ত সন্তান তাহাতে আমার এইরূপ চিন্তাতেই বাবা আসিয়া দাঁড়াইলেন ইহা বিশ্বাস করিতে আমার অশুদ্ধ মন কিছুতেই চাহিল না। বাবা ত' মাঝে মাঝে প্রাতে কোন কোন দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করেন, ইহা আমি পূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছি। এই এক ঘণ্টার ভিতর তিনি না হয় আজও পূর্ব্ব কোন দিনের মত দ্বিতল হইতে সকাল সকাল নামিয়া আসিয়া ইচ্ছা অনুসারে বেড়াইলেন।" ইহা যে দয়াল বাবার ক্ষুদ্র সন্তানের সম্মুখে বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ তাহা নির্ভুল-

রূপে ধারণা করিতে পারিলাম না। আমার মনের এ গণ্ডগোল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বাবা যেমন কথা কহিতেছিলেন তেমনই কথা কহিতে কহিতে বলিলেন,—"মানুষের সাধ্য কি গো যে সে পূর্ণভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়া তাঁকে (শ্রীভগবানকে) পাইতে পারে? আমি ত' অযোগ্য অপবিত্র বটেই—তবে তুমি কি করতে আছ। তুমি (শ্রীভগবান্) আমাকে শুদ্ধ, যোগ্য, পবিত্র করিয়া লও। মানুষ ভিতরে কুটিলতা না রাখিয়া তাহার ক্ষমতা অনুসারে একটু ভাল ভাবে চলিলেই এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিলেই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে।"

আমি আমার নিজেকে ও জগৎবাসী সকলকে এখন উচ্চ-কণ্ঠে করিয়া কহি,—"আমার বাবা আমার মত ক্ষুদ্র সন্তানেরও কার্য্যাকার্য্য লক্ষ্য করিয়া অহেতুক কৃপাগুণে আপন অভয়পদে টানিয়া লইতেছেন, এটি তাহারই চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত।" আমি আমার সমগ্র ভ্রাতা ভগিনীদের বিশেষ আনন্দ লাভের আশায় এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম। ইতি—

শ্রীজানকী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়

৺কাশীধাম।

সন ১৯২৪ সালে ও তাহার পূর্ব্বে ৩।৪ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুদেব পৌষ মাসের শেষভাগে কিম্বা মাঘ মাসের প্রথমে ৺কাশীধাম হইতে যাইবার সময় আমার চাকরীস্থল ধানবাদে প্রায় প্রতি বৎসর মাসাবধিকাল অবস্থিতি করিতেন। সেই সময় আমি ও আমার অন্যান্য গুরুভাই যিনি যে দিন উপস্থিত থাকিতেন প্রত্যহ প্রাতে এবং কোন কোন দিন বৈকালে বাবার সহিত মাঠে জঙ্গলে বেড়াইতে যাইতাম। একদিন প্রাতে বাবা ও আমি দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, একস্থানে কয়েকখণ্ড সাদা পাথর দেখিয়া বাবা ২।৩ খানি কুড়াইয়া লইলেন এবং তাহার মধ্যে একখানাতে সেখানে বসিয়া আমার চশমা লইয়া ফোকাস করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম—সূর্য্যের উত্তাপ লাগিতে লাগিল, আর পাথরখানির ভিতর হইতে বিন্দু বিন্দু কিছু বাহির হইয়া উপরে জমিতে লাগিল। একটু পরে বাবা বলিলেন, "খাইয়া দেখ, কিরূপ হইয়াছে।" আমি খাইয়া দেখিলাম—উত্তম সুগন্ধযুক্ত মিছরি, যাহা এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

একদিন আমার গুরুভাই শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬।৭ বৎসরের পুত্র ধানবাদে বাবা যে বাটীতে আসিতেন, সেইখানে কাশীর চমচম খাইতে চাহিল। বাবা তাহাকে একটুখানি ময়দার নেচি পাকাইয়া আনিতে বলিলেন। সে আনিলে বাবা সেই ময়দার টুকরাতে দুইখানি চমচমের মত গড়িলেন, পরে শাল পাতায় মুড়িয়া রৌদ্রে ধরিয়া লেন্স দিয়া ফোকাস করিলেন এবং বলিলেন,

যে চম্‌চম্‌ হইবে তাহার একটিতে সামান্য ন্যাপথেলীনের গন্ধ হইবে এবং অপর একখানির কতকাংশ চম্‌চম্‌ হইবে এবং বাকি অংশ যেমন তেমনি থাকিবে। ন্যাপথেলীনের গন্ধ হইবার কারণ এই যে, যে সময় ফোকাস্‌ করিতেছিলেন সে সময় ন্যাপথেলীনের পরমাণু সামান্য আসিয়াছিল এবং ফোকাস করিবার সময় প্রবোধের ছেলে উঁকি মারিয়া পিছন হইতে দেখিতেছিল। তাহার ছায়া যে অংশের উপরে পড়িয়াছিল, সে অংশ আর চম্‌চম্‌ ছিল না, যথার্থই ময়দা ছিল, অপরখানি সুন্দর চিনির চুর লাগান চম্‌চম্‌ ছিল। খাইয়া দেখিলাম, সমস্তই ঠিক, কেবল একখানি নাপথেলীনের গন্ধযুক্ত আর একখানির কতক অংশ চম্‌চম্‌ ও কতক অংশ ময়দাই ছিল।

এক বৎসর বাবা ধানবাদে দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রের সময় জঙ্গল হইতে কয়েকখানি কোয়ার্টস পাথর কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একখানি পাথরে তাঁহার লেন্স দিয়া ফোকাস করিয়া হীরক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পাথরখানির রং ফোকাস করিয়া পরিবর্ত্তন হইল দেখিলাম। কিন্তু তাহা যে বহু মূল্যবান্‌ হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিলাম কলিকাতায় গিয়া হ্যামিলটন প্রভৃতি কয়েকজন জহুরীর নিকট যাচাই করিয়া জানা গিয়াছিল যে তাহার মূল্য কোটি টাকাও হইতে পারে। পরে বাবা সেই পাথরখানি কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটে জেটির উপর দাঁড়াইয়া দূরে জলগর্ভে নিক্ষেপ করেন।

একদিন বাবা ভোগের পর পান চিবাইতে চিবাইতে ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। সেই সময় দেখিলাম তিনি তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে যেন কি একটি পাকাইতেছিলেন। বোধ হইল যেন চুণের গুলি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, কি করিতেছিলেন ?" বাবা বলিলেন,—"যা বল্‌বে তাই করব। ১০৮টি কুমারী-সেবার টাকা জমা দাও।" আমার ক্ষমতা না থাকায় আমি চুপ করিয়া বসিলাম। এমন সময় প্রবোধদাদা শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—১০৮টি কুমারীর সেবার জন্য কত দিলে হইবে। বাবা ১০৮ টাকা বলিলেন। পরে ৭৫ টাকা প্রবোধদাদা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বাবা বলিলেন, "ইহাকে কি করিতে চাও ?" প্রবোধদাদা তাঁহার হাতে ধারণ করিবার জন্য একটি স্ফটিক করিতে বলিলেন। কি আশ্চর্য্য! সেইটি আকৃতিতে ক্ষণকালের মধ্যে সুন্দর দুইটি বড় স্ফটিক হইল। ইহাতে লেন্স ব্যবহার করেন নাই। কেবল দুইটি আঙ্গুলের মধ্যে সূর্য্যের উত্তাপে পাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে ছিদ্র না হইলে কি করিয়া হাতে ধারণ করিব বলিবামাত্রই বাবা স্ফটিকটি প্রবোধের হাতে লইয়া দুইটি আঙ্গুলের মধ্যে রাখিয়া সূর্য্যের দিকে ধরিয়া ক্ষণকালমাত্র তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাহাতে ছিদ্র হইয়া গেল। সেই স্ফটিক এখনও প্রবোধদাদার হাতে আছে।

একদিন পোলাওয়ের জন্য জাফরাণ আবশ্যক হইয়াছিল। জাফরাণ বাজার হইতে আনান হয় নাই। বাজার অনেক দূরে। বাবা শুনিয়া বলিলেন, "জাফরাণের ভাবনা কি ? আমি জাফরাণ দিব।" আমি ও দুই একটি গুরুভাই বাবার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। মাঠে সুন্দর পলাশ ফুল ফুটিয়া-

ছিল। লাঠি দিয়া তাহার ২।৩।টি ফুল পাড়া হইল। বাবা লেন্স দিয়া তাহার পাপড়ীতে ফোকাস করিলেন এবং এমন সুন্দর জাফরাণ তৈয়ার হইল যাহা বাজারে পাওয়া যায় না। ইতি—

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

জঙ্গমবাড়ী, ৺কাশীধাম।

আমি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের একজন নগণ্য শিষ্য। মনে হয় প্রতিপদেই তাঁহার আদেশ পালনে অবহেলা করিয়া থাকি। আমার ন্যায় শিষ্য তাঁহার লীলার বিষয়ে লেখার অধিকারী নহে বলিয়া এতদিন চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু কতিপয় গুরুভ্রাতার তাড়নায় আমার নিজের সাংসারিক ব্যাপারে যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বিবৃত করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

আমার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, কিন্তু তদুপযুক্ত কার্য্য করিয়া থাকিতাম বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণ যখন ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিত এবং ব্রাহ্মণ স্বার্থপরতা হেতু অন্যান্য জাতিকে প্রবঞ্চনা করিয়া পদানত করিয়া রাখিয়াছিল এইরূপ তীব্র আলোচনা করিত, তখন হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইত, তখন মনে হইত কোথায় সেই আর্য্য-ঋষিগণ যাঁহাদের যোগ-প্রভাবে এককালে জগৎ স্তম্ভিত ছিল। তখন মনে হইত যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন একজনও কি আজ নাই যিনি নিজের তেজো-বল প্রকাশ করিয়া ঐ সব ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণের বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন এবং ঐ সকল অহেতুক নিন্দা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সাময়িক উত্তেজনার বলে ঐরূপ যোগ-সম্পন্ন কোন সাধু পুরুষের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রবল ইচ্ছা হইত, কিন্তু ঐ উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। অনেক দিনের কথা। বোধ হয় ইং ১৯০৪ বা ১৯০৫ হইবে। জনৈক লোকমুখে শুনিতে পাই যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গুস্করায় এইরূপ একজন সাধু পুরুষ আছেন যিনি তাঁহার তপঃপ্রভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন ও ইচ্ছাশক্তির বলে অলৌকিক ব্যাপার সংগঠনে সক্ষম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি হৃদয়ের উত্তেজনা সাময়িক মাত্র। কোথায় গুস্করা এবং কোথায় সেই সাধু, তাঁহার প্রকৃত অনুসন্ধান করিয়া সেখানে যাইবার যে একটি প্রবল বাসনা তাহা হৃদয়ে স্থান পায় নাই, কাজেই তাঁহার দর্শন ঘটে নাই। এখন মনে হয় সেই সাধু আর কেহ নহেন, তিনিই তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব যাঁহার শ্রীচরণে ইং ১৯২১ সালে প্রায় ১৬ বৎসর পরে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা-চক্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। হায়! দুর্ভাগ্য আমি, যদি কাল থাকিতে পিপাসার প্রাবল্য

যে চমচম হইবে তাহার একটিতে সামান্য ন্যাপথেলীনের গন্ধ হইবে এবং অপর একখানির কতকাংশ চমচম হইবে এবং বাকি অংশ যেমন তেমনি থাকিবে। ন্যাপথেলীনের গন্ধ হইবার কারণ এই যে, যে সময় ফোকাস করিতেছিলেন সে সময় ন্যাপথেলীনের পরমাণু সামান্য আসিয়াছিল এবং ফোকাস করিবার সময় প্রবোধের ছেলে উঁকি মারিয়া পিছন হইতে দেখিতেছিল। তাহার ছায়া যে অংশের উপরে পড়িয়াছিল, সে অংশ আর চমচম ছিল না, যথার্থই ময়দা ছিল, অপরখানি সুন্দর চিনির চুর লাগান চমচম ছিল। খাইয়া দেখিলাম, সমস্তই ঠিক, কেবল একখানি নাপথেলীনের গন্ধযুক্ত আর একখানির কতক অংশ চমচম ও কতক অংশ ময়দাই ছিল।

এক বৎসর বাবা ধানবাদে দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রের সময় জঙ্গল হইতে কয়েকখানি কোয়ার্টস পাথর কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একখানি পাথরে তাঁহার লেন্স দিয়া ফোকাস করিয়া হীরক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পাথরখানির রং ফোকাস করিয়া পরিবর্ত্তন হইল দেখিলাম। কিন্তু তাহা যে বহুমূল্যবান হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিলাম কলিকাতায় গিয়া হ্যামিলটন প্রভৃতি কয়েকজন জহুরীর নিকট যাচাই করিয়া জানা গিয়াছিল যে তাহার মূল্য কোটি টাকাও হইতে পারে। পরে বাবা সেই পাথরখানি কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটে জেটির উপর দাঁড়াইয়া দূরে জলগর্ভে নিক্ষেপ করেন।

একদিন বাবা ভোগের পর পান চিবাইতে চিবাইতে ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। সেই সময় দেখিলাম তিনি তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে যেন কি একটি পাকাইতেছিলেন। বোধ হইল যেন চুণের গুলি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, কি করিতেছিলেন?" বাবা বলিলেন,—"যা বলবে তাই করব। ১০৮টি কুমারী-সেবার টাকা জমা দাও।" আমার ক্ষমতা না থাকায় আমি চুপ করিয়া বসিলাম। এমন সময় প্রবোধদাদা শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—১০৮টি কুমারীর সেবার জন্য কত দিলে হইবে। বাবা ১০৮ টাকা বলিলেন। পরে ৭৫ টাকা প্রবোধদাদা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বাবা বলিলেন, "ইহাকে কি করিতে চাও?" প্রবোধদাদা তাঁহার হাতে ধারণ করিবার জন্য একটি স্ফটিক করিতে বলিলেন। কি আশ্চর্য্য! সেইটি আকৃতিতে ক্ষণকালের মধ্যে সুন্দর দুইটি বড় স্ফটিক হইল। ইহাতে লেন্স ব্যবহার করেন নাই। কেবল দুইটি আঙ্গুলের মধ্যে সূর্য্যের উত্তাপে পাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে ছিদ্র না হইলে কি করিয়া হাতে ধারণ করিব বলিবামাত্রই বাবা স্ফটিকটি প্রবোধের হাতে লইয়া দুইটি আঙ্গুলের মধ্যে রাখিয়া সূর্য্যের দিকে ধরিয়া ক্ষণকালমাত্র তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাহাতে ছিদ্র হইয়া গেল। সেই স্ফটিক এখনও প্রবোধদাদার হাতে আছে।

একদিন পোলাওয়ের জন্য জাফরাণ আবশ্যক হইয়াছিল। জাফরাণ বাজার হইতে আনান হয় নাই। বাজার অনেক দূরে। বাবা শুনিয়া বলিলেন, "জাফরাণের ভাবনা কি? আমি জাফরাণ দিব।" আমি ও দুই একটি গুরুভাই বাবার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। মাঠে সুন্দর পলাশ ফুল ফুটিয়া-

ছিল। লাঠি দিয়া তাহার ২।৩টি ফুল পাড়া হইল। বাবা লেন্স দিয়া তাহার পাপড়ীতে ফোকাস করিলেন এবং এমন সুন্দর জাফরাণ তৈয়ার হইল যাহা বাজারে পাওয়া যায় না। ইতি—

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

জঙ্গমবাড়ী, ৺কাশীধাম।

আমি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের একজন নগণ্য শিষ্য। মনে হয় প্রতিপদেই তাঁহার আদেশ পালনে অবহেলা করিয়া থাকি। আমার ন্যায় শিষ্য তাঁহার লীলার বিষয়ে লেখার অধিকারী নহে বলিয়া এতদিন চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু কতিপয় গুরুভ্রাতার তাড়নায় আমার নিজের সাংসারিক ব্যাপারে যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বিবৃত করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

আমার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, কিন্তু তদুপযুক্ত কার্য্য করিয়া থাকিতাম বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণ যখন ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিত এবং ব্রাহ্মণ স্বার্থপরতা হেতু অন্যান্য জাতিকে প্রবঞ্চনা করিয়া পদানত করিয়া রাখিয়াছিল এইরূপ তীব্র আলোচনা করিত, তখন হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইত, তখন মনে হইত কোথায় সেই আর্য্য-ঋষিগণ যাঁহাদের যোগ-প্রভাবে এককালে জগৎ স্তম্ভিত ছিল। তখন মনে হইত যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন একজনও কি আজ নাই যিনি নিজের তেজো-বল প্রকাশ করিয়া ঐ সব ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণের বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন এবং ঐ সকল অহেতুক নিন্দা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সাময়িক উত্তেজনার বলে ঐরূপ যোগ-সম্পন্ন কোন সাধু পুরুষের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রবল ইচ্ছা হইত, কিন্তু ঐ উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। অনেক দিনের কথা। বোধ হয় ইং ১৯০৪ বা ১৯০৫ হইবে। জনৈক লোকমুখে শুনিতে পাই যে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গুস্করায় এইরূপ একজন সাধু পুরুষ আছেন যিনি তাঁহার তপঃপ্রভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন ও ইচ্ছাশক্তির বলে অলৌকিক ব্যাপার সংগঠনে সক্ষম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি হৃদয়ের উত্তেজনা সাময়িক মাত্র। কোথায় গুস্করা এবং কোথায় সেই সাধু, তাঁহার প্রকৃত অনুসন্ধান করিয়া সেখানে যাইবার যে একটি প্রবল বাসনা তাহা হৃদয়ে স্থান পায় নাই, কাজেই তাঁহার দর্শন ঘটে নাই। এখন মনে হয় সেই সাধু আর কেহ নহেন, তিনিই তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব যাঁহার শ্রীচরণে ইং ১৯২১ সালে প্রায় ১৬ বৎসর পরে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা-চক্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। হায়! দুর্ভাগ্য আমি, যদি কাল থাকিতে পিপাসার প্রাবল্য

থাকিত এবং এই মহাত্মার কৃপা লাভ অদৃষ্টে ঘটিত, না জানি জীবনের কতই না পরিবর্ত্তন হইত।

ইং ১৯২১ সালে আশ্বিন মাসে ৺শারদীয়া পূজার অষ্টমীর দিন সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণের জন্য এই মহাপুরুষের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ৺কাশীধামে পৌঁছি। কিন্তু আমার চারি বৎসরের একটি পুত্র (সত্যেন্দ্র নামে পরিচিত) হঠাৎ টাইফড্‌ জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং উহাতে কৃমি-আদির উপদ্রব থাকায় রোগ জটিল হইয়া পড়ে। পীড়ার তৃতীয় কি চতুর্থ দিন হইতে ঐ বালকটি ক্রমান্বয়ে ১৭ দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। পীড়ার প্রথম দুই দিন আমি বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শনে যাইতে পারি নাই। তৃতীয় দিন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "কি গো, এ দুই দিন আস নাই কেন?" উত্তরে বলিলাম, "বাবা, ছেলেটির পীড়ার জন্য আসিতে পারি নাই।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "ভয় কি, পীড়া হইয়াছে, সারিয়া যাইবে।" পীড়ার প্রথমাবস্থায় বাসার নিকটবর্ত্তী একটি অল্প-বয়স্ক নব্য কবিরাজকে চিকিৎসার্থে নিযুক্ত করি, কিন্তু পীড়ার প্রাবল্য দেখিয়া পরে ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ কবিরাজ প্যারী মোহন সেনকে নিযুক্ত করি। তিনি ঐ সময়ে পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ মানসে ৺কাশীধামে আসেন, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিয়া এখানেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পীড়ার একাদশ দিবসে শেষ রাত্রে দেখা যায় ঐ বালকটির চোয়াল বাহিয়া রক্ত পড়িয়া বালিস ভিজিয়া গিয়াছে। রক্তের প্রাবল্য দেখিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল এবং উহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। ভোর হইতে না হইতেই কবিরাজের বাড়ী গেলাম—তাঁহাকে ঘটনার বিষয় বলিতেই তাঁহার মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া উঠিল—তিনি একজন ভাল ডাক্তার দ্বারা বুক আদি পরীক্ষা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং রোগীকে দেখিবার জন্য মৎসমভিব্যাহারে আমার বাসায় আগমন করিলেন। বাসায় আসিয়া দেখি কান্নার রোল উঠিয়াছে এবং আমার স্ত্রী একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কবিরাজ বালকের মুখের অভ্যন্তরাদি দেখিয়া বলিলেন, "রক্ত গলার মধ্য হইতে আসার কোন চিহ্ন দেখা যায় না—কীটদষ্ট দাঁতের গোড়া) হইতে বহির্গত হওয়াই সম্ভব।" কিন্তু এরূপ রক্ত-নিঃসরণের কারণ কিছু বলিতে পারিলেন না। বাসার পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তখন আমার স্ত্রীর কাছে নানা মত প্রকাশ করিতে থাকেন এবং 'কবিরাজী চিকিৎসায় রাখা সঙ্গত নয়, পাস-করা ডাক্তার হইলে দুই দিনে সারাইয়া দিত, এইরূপ অযাচিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এইরূপ বাক্যে আমার স্ত্রী কোন ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি তদানীন্তন দশাশ্বমেধঘাট রোডে অবস্থিত বাবু যদুনাথ গাঙ্গুলী, এম. বি. ডাক্তারকে আনয়ন করি। তিনিও কবিরাজ মহাশয়ের মত সমর্থন করেন, কিন্তু কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন না। তিনি পিচকারী দ্বারা রোগীর মল-নিঃসরণ করাইবার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দিনে পিচকারী প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই বালকটির হিমাঙ্গ হইতে থাকে এবং ঔষধাদি গলাধঃকরণের ক্ষমতা লোপ হয়। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর

সমস্ত পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাক্তার বাবু বালকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের অন্তিম কালের ঔষধ stimulant mixture-এর প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া দিয়া সরিয়া পড়েন—উহা কে সেবন করিবে তাহা চিন্তা করিবার আর অবসরও তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, বালকের মৃত্যু অনিবার্য্য বুঝিয়া আমি আমার পরিচিত সকলকে সংবাদ দিই এবং অন্ত্যেষ্টির জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলি। বালকের অবস্থা দর্শনে আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হওয়ায় বাসার বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াই ও ঐ সময়ে নানা চিন্তায় অভিভুত হইয়া পড়ি। মনে হইল, সুঠাম সুস্থকায় শিশুটিকে কি মণিকর্ণিকায় রাখিবার জন্যই কাশীধামে আনিয়াছিলাম? তাহার যেন মৃত্যু হইয়াছে, যেন মণিকর্ণিকায় তাহাকে লইয়া যাইতেছি, এইরূপ দৃশ্যই যেন মনঃ-পটে আবির্ভূত হইতে লাগিল এবং উহাতে বাহ্য জ্ঞান হারা হইলাম। কিন্তু চকিতে আমার স্মৃতিপথে উদয় হইল, "বাবাজী তো বলিয়াছিলেন, ছেলের পীড়া হইয়াছে, ভয় কি;" মনে মনে বলিলাম, "এই ছেলের যদি মৃত্যু হয়, জানিব যোগ মিথ্যা, যোগী মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, কাশী মিথ্যা, ধর্ম্ম জীবনের সহিত আর কোন সংশ্রব রাখিব না, যথেচ্ছা স্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিব।" তন্মুহূর্ত্তে দেখি যে পূর্বোল্লিখিত যুবা কবিরাজটি আমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। অমনি যেন কিসের প্রেরণায় তাঁহাকে বলিলাম, "কবিরাজ মহাশয়, আপনার সঙ্গে কি ভাল মকরধ্বজ আছে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, কি জন্য?" আমি বলিলাম, "যে বালকটিকে আপনি পীড়ার প্রথমাবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সেই বালকটি আজ মুমূর্ষু, বোধ হয় রাত টিকিবে না, আমার ইচ্ছা তাহার অন্তিমকালে কিছু মকরধ্বজ দিয়া দেখি কি ফল হয়। কবিরাজ মহাশয় আমার সহিত অভ্যন্তরে গিয়া বালকটির অবস্থা দেখিলেন এবং ভাল মধুর সঙ্গে কিছু মকরধ্বজ মাড়িয়া ১০ মিনিট অন্তর দুই বার জিহ্বার উপর ঘসিয়া দিলেন—জিহ্বার উপর একটি সাদা পুরু পরদা পড়ায় সোহাগার খই-গুড়া মধুর সহিত জিহ্বার উপরি ভাগে মুহুর্মুহু ঘসিয়া দিতে থাকিলেন। মকরধ্বজ দিবার অল্পকাল মধ্যে হস্তপদ গরম হইতে থাকিল। রাত্রি অনুমান একটার সময় রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, রোগী পূর্ববৎ কোমা অবস্থায় ছিল। রাত্রি তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিল। মুখ খুলিয়া দেখা গেল সে সাদা পরদা অন্তর্হিত হইয়া জিহ্বা রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বেদানার রস রোগীর মুখে দিলে ঢক করিয়া গিলিয়া ফেলিল। তখন আমাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল এবং উক্ত যুবক কবিরাজের সহিত পরামর্শ করিয়া ভোর হইতেই কবিরাজ বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্যের হস্তে এই রোগীর ভার দেওয়া স্থির করিলাম। পরদিন সকালে বসন্ত বাবু আসিয়া রোগীর অবস্থাদি পরিদর্শন করিয়া ঔষধ ও মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিলেন। তখন উঁহাকে আমি বাবাজীর একজন পরম ভক্ত বলিয়া চিনিতে পারিলাম। বসন্ত বাবুর সুচিকিৎসা ও যত্নের ফলে রোগী তিনদিন পর সংজ্ঞালাভ করিল ও তাহার অবস্থা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই সঙ্কটাবস্থায় বাবাজীর নিকট আমি যাইতে পারিতাম না। এক দিন

দশাশ্বমেধঘাটের পথে বাবাজীর দর্শন লাভ হওয়ায় তিনি ছেলেটির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বসন্ত কবিরাজ মহাশয়কে নিযুক্ত করা হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ, বসন্ত কবিরাজ খুব ভাল চিকিৎসক, তাঁহাকে দিয়াই চিকিৎসা করাও।" ৪৭ দিন পর ছেলেটিকে অন্নপথ্য দেওয়া হইল। কিন্তু ছেলেটি কঙ্কাল-সার হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী চারি মাস পর্য্যন্ত উত্থান-শক্তি-রহিত ছিল। বলা বাহুল্য, ছেলেটি কিঞ্চিৎ আরোগ্য প্রাপ্ত হইলে বাবাজী আমাদের আগ্রহাতিশয্যে কৃপা করিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিলেন। মাঘ মাস যায় যায়, তখনও ছেলেটি উত্থান-শক্তি-রহিত। আমার স্ত্রী একদিন ধরিয়া বসিল শ্রীগুরুদেবের তো অপার কৃপা—তিনি যদি ছেলেটিকে একবার আশ্রমে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার আদেশ দেন। পরদিন আমি বাবাজীকে বলিলাম এবং তিনিও সহাস্য বদনে আদেশ দিলেন। তৎপর দিন ছেলেটিকে আশ্রমে লইয়া গেলাম। ঐ সময়ে হনুমান্ ঘাটের সন্নিকট আউধ-গব্বীতে আশ্রম ছিল। বাবাজী আদেশ দিলেন, "ছেলেটিকে আমার ক্রিয়াস্থানে শোয়াইয়া রাখ।" সেই রূপই করা হইল। প্রায় ১৫ মিনিট পর বাবাজী সেখানে গিয়া ছেলেটিকে বলিলেন, "কি রে, কেমন আছিস ?" ছেলেটি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমার আর জ্বর হয় না। তবে আমি উঠিতেও পারি না, হাঁটিতেও পারি না।" তখন বাবাজী তাঁহার হস্ত প্রসারণ করিয়া বালকটিকে অঙ্গুলী ধরিতে বলিলেন অঙ্গুলী ধরিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরের মধ্যে বাবাজীর সাথে সাথে হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন বাবাজী বলিলেন, "যা, ফাল্গুন মাসের ৭।৮ দিন হইলেই হাঁটিতে পারিবি।" ঐ দিন কথা-প্রসঙ্গে আমার স্ত্রীকে বলেন, "কি গো, তোমার ছেলে তো ভালই আছে, আমি যখন উহাকে দেখিয়াছিলাম, উহার তো তখন কিছুই ছিল না।" প্রকৃত প্রস্তাবে বাবাজী আমার ছেলের পীড়ার সময় স্থূল-দেহে উহাকে দেখিতে কখনও যান নাই। কাজেই আমার স্ত্রী স্তম্ভিত হইয়া উঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। বাবাজী তখন অন্যান্য কথায় ঐ বিষয় চাপা দিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আমার স্ত্রী উহা ভুলিল না, পর মুহূর্ত্তে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার নিকট উহা প্রকাশ করিল। বুঝিলাম ছেলের চরম অবস্থায় কৃপা-পরবশ হইয়া বাবাজী সূক্ষ্মদেহে উহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন এবং আমার তদানীন্তন হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া তিনিই মঙ্গল পথে লইবার জন্য প্রেরণার দ্বারা আমাকে চালিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ৭ই ফাল্গুন সকালে দেখি যে ঐ বালকটি দাঁড়াইয়া একটি খট্টাঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী কাঠে ভর দিয়া হাঁটিতেছে ও খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যে ঐ বালকটি প্রাণ পাইয়াছিল এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাবাজী পরে আমাকে বলিয়াছিলেন যে কীট-দষ্ট দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত-নিঃসরণ বালকের জীবন-রক্ষার একটি প্রধান কারণ, নতুবা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হেতু উহার মৃত্যু ঘটিত।

ইং ১৯২৫ সালে আমি আমার প্রথমা কন্যার বিবাহার্থে সপরিবারে কলিকাতা গমন করি। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব ভবানীপুর ৭নং কুণ্ড রোডে

আমাদিগের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু যেগেশ চন্দ্র বসুর বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলে তিনি তাঁহায় স্বভাব-সুলভ স্নেহ-মধুর ভাষায় বলিলেন, "কি গো, মেয়ের বিবাহ দিতে কলিকাতা আসিয়াছ? বেশ, থাক।" বলা বাহুল্য, আমার কন্যাটি খুব সুরূপা না হইলেও কুরূপা নহে। বাবাজী বরাবর বলিতেন, "ও খুব সুপাত্রে পড়িবে।" কিন্তু আমি নয় মাস যাবৎ পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াও কোন মনোমত পাত্র স্থির করিতে পারিলাম না। বাবাজীর উপদেশ ছিল—'কন্যার বিবাহ দিতে পাত্র প্রকৃত ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত কিনা, অর্থাকাঙ্ক্ষী কি না ও ধর্ম্ম-ভাব-যুক্ত কি না, ইহাই দেখিয়া স্থির করিবে।' বলিতে কি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানে দেখি পাত্রীর সহিত কোন পাত্রের বিবাহ হয় না, অর্থ সম্বন্ধে বিবাদ। পাত্রী কিরূপ বংশজাত দেখিতে কিরূপ ইহার সন্ধনা না লইয়া পাত্র-পক্ষেরা জিজ্ঞাসা করেন, "ক হাজার টাকা খরচ করিবেন, মহাশয়?" কাজেই বাবাজীর উপদেশ-বাক্য এবং আমার আর্থিক অসচ্ছলতা এই দুটিই বিবাহের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি পুলিস বিভাগে সামান্য কাজ করিতাম। ৮ মাস কাল ছুটী লওয়ার পর আরও দুই মাস অর্দ্ধ বেতনে ছুটীর দরখাস্ত দিলাম, কিন্তু উপরিতন সাহেব Civil Surgeon এর Certificate চাহিলেন ও অর্দ্ধ বেতনও বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি সপরিবার বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতা ছিলাম। সুতরাং তখন ভয়ানক অর্থাভাব উপস্থিত হইল। কিন্তু আমি শ্রীগুরুদেবের আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া কায়ক্লেশে কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। ইতি পূর্ব্বে বাবাজী ৺পুরীধামে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে কলিকাতা ভবানীপুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, মেয়ের বিবাহ হইয়াছে তো?" উত্তর করিলাম, "না বাবা, হয় নাই।" তিনি পুনরায় বলিলেন, "কেন, তুমি পাত্র স্থির করিয়া আশীর্বাদ চাহিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলে। তাহার কি হইল?" বলা বাহুল্য, একটি পাত্রের সহিত বিবাহ স্থির হয়। ছেলেটি Law এর Final Examination দিবে। তাহার হৃদয়ে স্বাধীনভাব ছিল, কন্যা পছন্দ হওয়ায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার বাসায় আসিয়া প্রকাশ করে যে তাহার ২৬।২৭ বৎসর বয়সের কালে কোষ্ঠীর ফল বড় খারাপ—মৃত্যুযোগ আছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে বিবাহ করা এবং আমার পক্ষে তাহাকে কন্যা দান করা উচিত নহে। সে আমাকে কোষ্ঠীটি দেখাইল। আমি এই যুবকের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে তাহাকে তাহার সদ্-বিবেচনার জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহা হউক, উহাকে সঙ্গে লইয়া আমি ঝামা-পুকুরের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী যোগেন্দ্র বাবুর নিকট গেলাম। তিনি কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন যে যুবকের মৃত্যুযোগ নাই, তবে সে কঠিন পীড়ায় পতিত হইবে এবং এ অবস্থায় বিবাহ না হওয়াই ভাল। কাজেই আমরা উভয় পক্ষই এই বিবাহ-প্রস্তাব ত্যাগ করিলাম। বাবাজীকে আদ্যোপান্ত ঐ ঘটনা

বলিয়া তাঁহাকে আমার আর্থিক-অবস্থা, বেতন-বন্ধ প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাত করাইলাম ও তৎপরে নিবেদন করিলাম, "বাবা, বিবাহ দিতে কলিকাতা আসিলে আপনিই এখানে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই আদেশ-বাণীর উপর নির্ভর করিয়া এ কাল পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহের চেষ্টায় এখানেই আছি। অধুনা আর কলিকাতা থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহা আদেশ করেন তাহাই করিব।" এই সময়ে তিনটি পাত্র আমার সন্ধানে ছিল। দুইটির সহিত বিবাহ-প্রস্তাব অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। তৃতীয়টি বরাহনগরের, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। তবে ছেলেটি সদ্বংশ-জাত, সুশ্রী ও শিক্ষিত, এবং সংসারে ধর্ম্মভাবও আছে ও অর্থাকাঙ্ক্ষা নাই। আমার কন্যাটিও পাত্র-পক্ষের খুব পছন্দ হইয়াছিল। বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোন পাত্র সন্ধানে আছে কি?" আমি উত্তরে ঐ তিনটি পাত্রের উল্লেখ এরিলাম। বাবাজী আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার নিজের ঘরে উঠিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, এই সব কথা যোগেশ বাবুর দোতালার বৈঠকখানার ঘরে হইতেছিল। আমি জানিতাম বাবাজী এই সব সাংসারিক বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলেন না। কিন্তু বাবাজী যখন ঘর হইতে উত্তর দিকের বারান্দা দিয়া বৈঠকখানা ঘরে যাইতেছিলেন, আমি আমার তদানীন্তন অবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করিলাম। দয়ার অবতার মহাপুরুষ মৃদুস্বরে বলিলেন, "বরাহনগরের ছেলেটির চেষ্টা দেখ গে।" আমি সেই মুহূর্ত্তে উৎফুল্ল-হৃদয়ে তাঁহার চরণ বন্দনা কয়িয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম। কলিকাতায় উক্ত ছেলেটির অভিভাবক তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তিনি বলিলেন, "আপনার গুরুদেব যখন এই পাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, তখন আমাদের কোন অমত বা বক্তব্য নাই। যে দিন ইচ্ছা ঐ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন।" যৌতুক সম্বন্ধে যাহা আমি নিজ হইতে প্রস্তাব করিলাম তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। বলা বাহুল্য তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চালিত হইতে লাগিলেন। এই সময় আমার কৌতুক জম্মে যে শ্রীগুরুদেব তো পাত্র না দেখিয়া, পাত্র-পাত্রীর কোন কোষ্ঠী বিচার না করিয়াই, পাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, লৌকিক হিসাবে কোষ্ঠী-বিচারে জ্যোতিষী কি মত দেয় দেখি। পরদিন পূর্ব্বোল্লিখিত জ্যোতিষী ঝামা-পুকুরস্থ যোগেন্দ্র বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল তাঁহার জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বহিখানি দেখিয়া পাত্র-পাত্রীর রাশি-চক্র বিচার করিয়া বলিলেন, "এই উত্তম যোটক। এই ছেলের যদি গাছতলাতেও বসতি হয়, তাহা হইলেও ইহার সহিত বিবাহ দিতে পারেন। এই যুবকের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। বলা বাহুল্য, আট দিনের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর জামাইটি ইংরাজীতে M. A. পাস করিয়া Imperial Bankএ প্রবেশ করিয়াছে ও London Commercial Instituteএ member হইয়া কয়েকটি বিষয়ে Banking পাশ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে বক্রী বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছে। আমার কন্যাটিই এক্ষণে একরূপ গৃহকর্ত্রী এবং তাহার দাম্পত্য-সুখের অভাব নাই। ধন্য গুরুদেব! ধন্য আপনার মহিমা!

আপনার ন্যায় মহাপুরুষের চরণে স্থান পাইয়াও যে আপনাকে চিনিলাম না, আপনার নির্দিষ্ট পথে চলিলাম না, ইহা আমাদিগের দুর্ভাগ্য। ইতি—

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীদুর্গাকান্ত রায়

(পেন্সন-প্রাপ্ত সাব জজ, বেনারস)

তখন আমি পুরীর আশ্রমে ছিলাম। কুঞ্জবাবু তখন কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একটি Ford মটর গাড়ি কিনিয়াছিলেন। সেই গাড়ি লইয়া পুরীর আশ্রমে আসিলেন। উদ্দেশ্য সেই গাড়িতে বাবাকে বসান। সাক্ষীগোপাল যাওয়া স্থির হইল। আমিও সেই সময়ে গিয়াছিলাম। যে দিন যাওয়া স্থির হইয়াছিল বাবা সেই দিন যাইতে ততটা ইচ্ছুক ছিলেন না। যাই হোক, গাড়িতে উঠা গেল। তখন জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রাস্তায় লোকের ভীড়। আশ্রম ছাড়িয়া একটু উত্তরাভিমুখে যাইলাম। তিনকুনিয়া বাগানের অগ্রভাগে ও পুলিশ Quarter এর সম্মুখে একটি বড় মোড় পড়ে। ঠিক্ সেই মোড়ের উপর গাড়ি আসিয়া পেঁাছিল। গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতেছিল। চালক খুব পাকা ছিল না। গাড়ি মোড়ে আসিয়া যেই বাঁ-দিকে ঘুরিল সামনে একটি যাত্রী আসিয়া পড়িল। বোধ হয় সে মাদ্রাজী ছিল। একে গাড়ির বেগ অতি দ্রুত ছিল, তাহাতে আবার চালক খুব পাকা নহে। গাড়ির mudguard সেই লোকটির দক্ষিণ উরুর উপর ধাক্কা দিল। আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয় সে অবস্থায় কাহারও বাঁচা অসম্ভব। যাহা হউক, গাড়ি একটি শব্দ করিয়া কাঁপিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। সেই লোকটি রাস্তায় পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু পরেই একটু কষ্টে রাস্তার ধারে সরিয়া গেল। লোকের একটু ভীড় হইল। পুলিশ আসিয়া গাড়ির নম্বর লইল।

আমরা পুনরায় সাক্ষীগোপালের দিকে চলিলাম। দর্শনাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে আশ্রমে আসিয়া পেঁাছিলাম। কথায় কথায় আমরা বাবাকে বলিলাম, "বাবা কি করিয়া যে লোকটা বাঁচিল বোঝা গেল না।" বাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাপু, সমস্ত ধাক্কাটা আমি না লইলে তাহার বাঁচা সম্ভবপর হইত না।" এই বলিয়া বাবা দক্ষিণ পদের উরু পর্যন্ত কাপড় তুলিয়া যাহা দেখাইলেন তাহা ভীতি-প্রদ। লাল দগদগে একটা জায়গা। সেইটি দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, এই জায়গায় আমি সমগ্র ধাক্কাটি লইয়াছিলাম।"

এই ঘটনায় আমার চিন্তাধা । দ্বিধা বহিয়াছিল। একদিকে চিন্তা হইল, ও ব্যক্তির ওপর যে ধাক্কা লাগিল তাহা কেমন করিয়া বাবা লইলেন। তাহার

দক্ষিণ পদে ধাক্কা লাগিয়াছিল, বাবাও দক্ষিণ পদে ধাক্কা লইয়াছিলেন। এ রকম ভাবে একই স্থানে বসিয়া অপরের ধাক্কা লইলেন কি উপায়ে? ইহার দ্বারা কি পরকায়-প্রবেশ প্রমাণিত হয়? এর সমাধান মাদৃশ মূঢ়ের পক্ষে করা অসম্ভব। অন্যদিকে, যাঁহার পায়ে এত জোরে ধাক্কা লাগিয়াছে তিনি কেমন করিয়া এমন সহজ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কে বুঝিবে তাঁহার শরীরে কত বড় ধাক্কা লাগিয়াছে—বোধ করি যন্ত্রণা সেই অনুযায়ীই হইতেছিল। বস্তুতঃ যোগীরা শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সম্বন্ধ রাখেন না। কি অদ্ভুত ক্ষমতা! ইতি—

শ্রীদুর্গাকান্ত রায়।

আমাদের সদ্য প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ ঃ-

রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের

মৃত্যুর পরোপারে ৪০০্

(এই গ্রন্থে যাদের প্ল্যানচেডে আনা হয়েছে তারা হলেন মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, স্বামী নিগমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, রাখাল মহারাজ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার আশুতোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের। প্ল্যানচেডের উপর একমাত্র দূর্লভ গ্রন্থ)।

পরিব্রাজক গৌতম বিশ্বাস প্রণিত

মহামানব বুদ্ধ ও তাঁর দর্শন ২০০্

(মহামানব বুদ্ধ কর্ত্তিক প্রদর্শিত পথ ও তার দর্শন ও তাদের আচার ব্যবহার ও বুদ্ধের চরণ স্পর্শ সমূহ স্থানের বিবরণ রয়েছে এই পুস্তকে)।

প্রণবানন্দ গীরি কর্ত্তিক লিখিত ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তিক সম্পাদিত

সপ্তশ্লোকী গীতা ১০০্

(ক্রীয়াযোগ সাধনের এক উপযোগী গ্রন্থ)।

যোগীবর পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের

অবধূত গীতা ১০০্

(ক্রীয়াযোগ সাধনের এক অন্যতম দুর্লভ গ্রন্থ)।

স্বামী সোমেশ্বরানন্দের

মার্কস ও বিবেকানন্দের বিপ্লব চিন্তা ২০০্

(কার্লমার্কস ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রচিন্তা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে এই পুস্তকে)।

মহাযোগী শংকরনাথ জীর

যোগীর আত্মকথা (পটভূমি দণ্ডকারণ্য ও হিমালয়)

(বহু গুপ্তসাধনা ও সাধন পীঠের বিস্তৃত বিবরণ)।

প্রাচী পাবলিকেশন
৬৩বি, ন্যাশানাল প্রেস, বাকসারা
হাওড়া - ৭১১ ১১০
দূরাভাষ - ৯৩৩৯১ ০৮০২৪